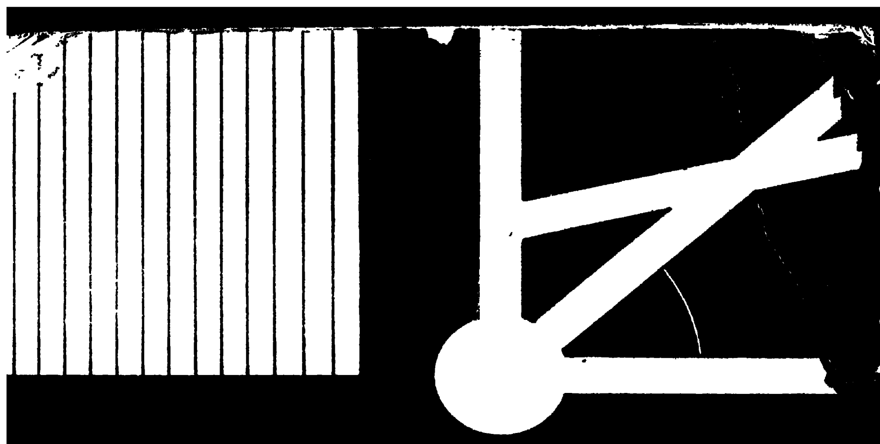
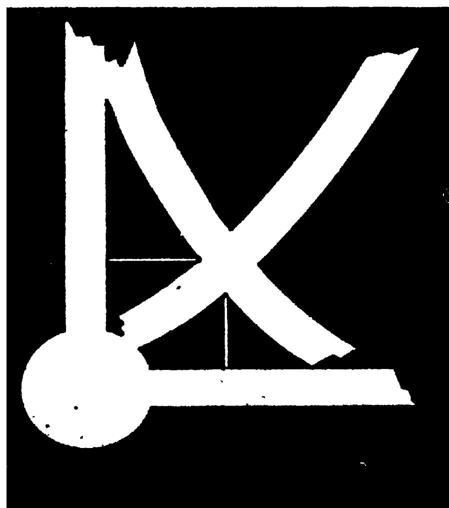
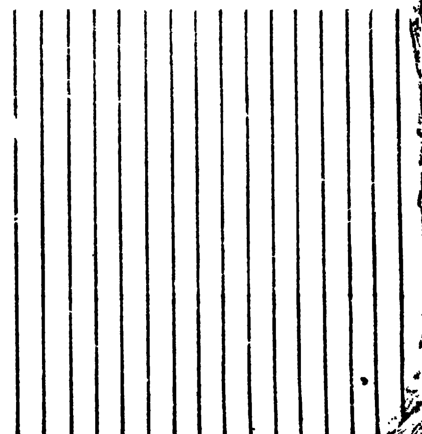


আধুনিক অর্থনীতি

হরিদাস আচার্য





আধুনিক অর্থনীতি

[কলিকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ এবং বিদ্যাসাগর
বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ও বি. কম.
ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য]

হরিদাস আচার্য
অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ।
বাঁকুড়া, খ্রীস্টান কলেজ।

পরিবেশক :
দে বুক কনসার্ন
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

অর্থনীতির ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত তত্ত্বের উপর পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বি. এ (পাস) ও বি. কম্. কোর্সের জন্য যে পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেই পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এই বইটি লেখা হয়েছে। এর ভাষা যাতে সহজ হয়, যাতে প্রত্যেকটি আলোচনা সংক্ষিপ্ত অথচ উন্নতমানের হয়—সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। "পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ইহা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে", "পূর্বেই বলা হইয়াছে"—ইত্যাদি বিরক্তিকর ও বিভ্রান্তিকর ব্যাপার কোথাও রাখা হয়নি। প্রত্যেকটি আলোচনাই যাতে সম্পূর্ণ হয় তার জন্য প্রয়োজনবোধে একই বিষয়কে একাধিকবার বলা হয়েছে। আজকাল অর্থনীতির বিষয়কে আঙ্কিক দৃষ্টিতে দেখার রীতি ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে। এটাই হল আধুনিক পদ্ধতি এবং এই বইতে সেই পদ্ধতিই গ্রহণ করা হয়েছে। তবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অঙ্কের ধারণাকে উদাহরণ দিয়ে, রেখাচিত্র দিয়ে, কিংবা অন্য কোনভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তবু কোথাও কোন অস্পষ্টতা বা ভুল থেকে গেলে সহৃদয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীগণ আমাকে সরাসরি জানালে আমি পরবর্তী পর্যায়ে সেই ত্রুটি দূর করার চেষ্টা করব এবং যাঁরা আমাকে নির্দেশ ও পরামর্শ দেবেন তাঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আপনাদের সাহায্য ছাড়া ভালো বই লেখার চেষ্টা সফল হতে পারে না। আমি এই সাহায্য চাইছি।

ভুল করা মানুষের স্বভাব এবং বোধহয়, সেই ভুল ক্ষমা করাই দেবতার ধর্ম। এই বইতেও অনেক জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভুল থেকে গেল। তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। পরবর্তী পর্যায়ে জ্ঞাত ভুলগুলি দূর করবার চেষ্টা করব।

কোন কাজই একার নয়। আমার এই বইটিও আমার একক চেষ্টার ফসল নয়। এর পিছনে বহু মানুষের হাত ও হৃদয় আছে। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়দ্বয় শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ চক্রবর্তী ও শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার চৌধুরী এবং আমার পরমবন্ধু ও সহকর্মী শ্রীযুক্ত তারাপদ ধরের নাম প্রথমেই বলতে হয়। পাণ্ডুলিপি দেখা থেকে শুরু করে সব ব্যাপারে ওঁরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাছাড়া আছে আমার অনেক সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রী বন্ধু, এ ব্যাপারে যাঁদের আগ্রহ ও আনন্দ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। সাধারণভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এদের ঋণ শোধ করা যায় না।

এই বই-এর প্রকাশনার সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থেকেছেন তাঁদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় দেখে আমি অবাক হয়েছি। নতুন প্রকাশক শ্রীআশিসকুমার মুখোপাধ্যায় (ভ্রাতৃসংঘ, বাঁকুড়া) উদ্যোগ নিয়েছেন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশক শ্রীপ্রশান্ত দে (দে বুক কনসার্ন, কলিকাতা) প্রাণ দিয়ে খেটেছেন। এঁদের উৎসাহ ও সাহসের জোরেই সব সম্ভব হয়েছে। তার সঙ্গে আছে উভয় প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য কর্মী ও অনুরাগী বন্ধু যাদের

মধ্যে শ্রীচঞ্চলকুমার শিকদারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। রেখাচিত্র এঁকে ছেন প্রবীর কর্মকার। প্রুফ দেখেছেন প্রণবকুমার ঘোষ। এঁদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞতা জানাই। চিরকৃতজ্ঞতা জানাই ছাপাখানা কর্মচারী বন্ধুদের প্রতি।

প্রায় পনের বছর ধরে কলেজে পড়াচ্ছি। অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা বুঝতে ও সেই অসুবিধা দূর করতে চেষ্টা করেছি। এই বই পড়ে তাদের উপকার হলেই সব ভাল হবে, সবার চেষ্টা সফল হবে।

বাঁকুড়া

বিনীত—
গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"আধুনিক অর্থনীতি" প্রকাশের প্রায় এক বছরের মধ্যে এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় আমরা উল্লসিত এবং সেই সঙ্গে কৃতজ্ঞ সেই সব সহৃদয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের কাছে যাঁরা বইটিকে ছাত্রদের কাছে সুপরিচিত করে তুলেছেন। অনেকে আমার কাছে চিঠি লিখে বইটির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন; অনেকে মুখে বলেছেন। তাঁদের সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

দ্বিতীয় সংস্করণে বইটিতে অনেক নতুন আলোচনা দেওয়া হল। এর দ্বারা বইটি আরো উপযোগী ও উন্নত মানের হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাছাড়া এর পিছনে অনেকের সুপরামর্শও রয়েছে।

স্কুলডাঙ্গা
বাঁকুড়া

বিনীত—
গ্রন্থকার

তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা

যাঁদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে "আধুনিক অর্থনীতি" জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তৃতীয় ও চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ লাভ করে তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যাঁরা এই বইয়ের উন্নতি সাধনের জন্য আমার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন কিংবা মুখে বলেছেন তাঁদের কথামত এই দুই সংস্করণে কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন ঘটেছে। আশা করি এর ফলে বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে এবং এর 'আধুনিক' নামটি সার্থক হবে। যাঁরা পরিবর্তন ও পরিমার্জনার প্রস্তাব দিয়েছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্কুলডাঙ্গা
বাঁকুড়া

বিনীত—
গ্রন্থকার

The Revised Syllabuses for the Two-year Degree Courses in Economics (Pass)

CALCUTTA UNIVERSITY

1. The Problem of Economic Theory. A general view of the Price System :

The theory of market behaviour. Some preliminary considerations. The elementary theory of Demand, Supply and Market Price. The Elasticity of Demand and Supply. Price control and Rationing Minimum Price Legislation ; incidence of Commodity Taxes.

2. The Theory of Supply :

Forms of Business Organisation. The financing of the Modern Firm. The motivations of the Firm. The Theory of Costs in the short and long period.

3. The Equilibrium of a profit-maximising Firm :

The Theory of Perfect Competition. The Theory of Monopoly. Theories of Imperfect Competition (an elementary introduction to basic issues only).

4. The Theory of Distribution :

The demand for and supply of factors of production. Pricing of factors in competitive markets. Wages and collective bargaining. Interest and the return on capital. Criticisms and tests of the Theory of Distribution.

THE UNIVERSITY OF BURDWAN

1. Fundamentals of the Pricing Process. The basic concept of Value and Price—Demand—The Demand Schedule and the Demand curve—Individual Demand curves and the Market—Demand curve—Downward Slope of the Demand curve—Shift in the Demand curve, —The Supply curve—The Equilibrium price—the Price System.

2. The Theory of Consumer Demand :

The Utility Analysis—Utility : The concept and its nature—Cardinal measurement of Utility—Total and Marginal Utility—The Law of Diminishing Marginal Utility—Consumer's Equilibrium : One Commodity model—The Law of Demand—Consumer's Surplus.

3. The Theory of Consumer Demand :

The Indifference curve Analysis—Ordinal Utility—Indifferenced Curve (the Concept)—properties of the Indifference Curve—The Price Line—Consumer's Equilibrium—Effects of Changes in Prices—The Income and Substitution Effects—Negative Income Effect—The Inferior goods case.

4. Elasticity of Demand :

The Concept—Methods of Measurement—Factors determining Elasticity of Demand.

5. Theory of the Firm—Costs and Revenue :

Components of Total Cost—the Fixed and Variable Costs—Average and Marginal Costs—The Relationship between Average and Marginal Costs—The behaviour of Fixed Costs—the behaviour of Variable Costs—the behaviour of Total Costs.

The Total Revenue—Average Revenue—Marginal Revenue—The Relationship between AR and MR—Profit Maximisation.

6. Equilibrium of the Firm and Industry under different market Conditions :

Perfect Competition—Imperfect Competition—Monopoly—Equilibrium of the firm under Perfect Competition. The short-run and long-run Equilibrium—Equilibrium under Pure Monopoly. Discriminating Monopoly.

7. Theory of Distribution :

The Marginal Productivity Theory—The Concept of Marginal Product—Equilibrium with more than one factor—Critical evaluation of the Marginal Productivity Theory.

8. Theory of Rent :

Economic Rent—The Ricardian Theory of Rent—Modern Rent Theory—Quasi Rent—Rent and Costs of Production.

9. Theories of Interest and Profits. Interest : The Classical Theory—The Liquidity Preference Theory—Determination of the nterest Rate.

Profits : The Nature of Profits—

A Dynamic Surplus—Monopoly Profits.

10. Wages : The Demand for Labour—the Supply of Labour -peculiarities of the Labour Supply function—Wage determination nder different market conditions—Collective bargaining Wage fferentials.

THE NORTH BENGAL UNIVERSITY

1. Nature of Economics and Scope.

2. Law of Demand—Forces Underlying the Law of Demand—Total Utility and Marginal Utility—Law of Diminishing Marginal Utility—Marginal Utility and Price—Price equals Marginal Utility (Single commodity). Concept of Indifference Curve—Indifference Map—Properties of Indifference curve—Budget Line—Equilibrium under static conditions. Concept of Elasticity of Demand and Supply—Distinction between Elastic and Inelastic Demand—Price Elasticity, Income Elasticity—Determinants of Elasticity of Demand.

3. Demand and Supply conditions under static condition—Marshallian Time Analysis—Market Period, Short Period and Long Period Equilibrium.

4. (a) Definitions and Factors of Production, (b) Scale of Production, (c) Laws of Returns, Diminishing Returns, Increasing Returns and Constant Returns. (d) Location of Industries, (e) Combinations and Integration, (f) Prime Cost and Supplementary Costs, (g) Real Cost and Opportunity Costs, (h) Shape of Short-run and Long-run Cost Curves, (i) Relation between Average and Marginal Costs, (j) Relation between Average Revenue. Total Revenue and Marginal Revenue.

5. Market Structure.

(a) Perfect Competition—Equilibrium of the Firm—Short period and Long period. Equilibrium of an Industry—Short period and Long period.

(b) Monopoly—Price and output under Monopoly—Monopoly and Competition—Evils of Monopoly.

(c) Monopolistic Competition—Distinction between Perfect Competition and Monopolistic Competition—Meaning of Product—Differentiation Role of Selling Costs in Monopolistic Competition—Group Equilibrium.

6. Equilibrium under Joint Production—Concept of Joint Demand and Supply.

7. Demand for Factors—Marginal Productivity Theory of Distribution—Assumption and Limitations. Factor-pricing.

(i) Rent—Economic Rent, Ricardian Theory of Rent, Modern Theory of Rent—Quasi-Rent and Price.

(ii) Wages—Money Wage and Real Wage, Marginal Productivity, Theory of Wages, and Wage determination under collective bargaining, Wage differential.

(iii) Interest—Classical Theory of Interest, Loanable Fund Theory of Interest.

(iv) Profit—Gross Profit, Net Profit ; Elements of Profit, Risk and uncertainity, Theory of Rent.

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড (ব্যষ্টিগত আলোচনা)

দ্বিতীয় খণ্ড (সমষ্টিগত আলোচনা)

প্রথম খণ্ড

ব্যষ্টিগত আলোচনা

(Micro-analysis)

১ ॥ ভূমিকা ॥

অর্থনীতি তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

১.১. অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় :

অর্থনীতি নামক পাঠ্য বিষয়ের উদ্দেশ্য হল—মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের আলোচনা করা। একটি দেশে সব মানুষের বহু রকম অর্থনৈতিক কর্ম থাকে। আমরা এখানে মাত্র চার প্রকার কর্মের কথা বলতে পারি যথা : (ক) ভোগ, (খ) উৎপাদন, (গ) বিনিময় এবং (ঘ) বণ্টন। এদের যে-কোন একটি কর্ম অন্য কর্মগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। এই যোগসূত্রটি বোঝা চাই। অর্থনীতিতে যাকে আমরা ব্যষ্টিগত অর্থনীতি (Micro-economics) বলি তাতে এই চারটি কাজের তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়। যেমন, ভোগের আলোচনাকে বলা হয় ভোগ তত্ত্ব বা চাহিদা তত্ত্ব ; উৎপাদনের উপর তাত্ত্বিক আলোচনাকে বলা হয় উৎপাদন তত্ত্ব। এইভাবে আমরা এখানে চারটি তত্ত্ব পাই।

প্রথমে ভোগ সম্বন্ধে বলা যায়। সধারণ ভাষায় ভোগ বলতে খাওয়া বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে **ভোগ হল—মানুষের অভাব পরিতৃপ্তির জন্য কোন দ্রব্য বা সেবার ব্যবহার।** এই দ্রব্যগুলো আবার (ক) **প্রাকৃতিক দ্রব্য** বা (খ) **অর্থনৈতিক দ্রব্য** হতে পারে। প্রাকৃতিক দ্রব্য হল—(ক) প্রকৃতি সৃষ্ট, (খ) প্রচুর এবং (গ) সেইজন্য প্রাকৃতিক দ্রব্যের জন্য কোন দাম দিতে হয় না। এদের কথা অর্থনীতি খুব বেশি ভাবে না। কিন্তু অর্থনৈতিক দ্রব্য হল (ক) মানুষের দ্বারা উৎপাদিত বা রূপান্তরিত বা সংগৃহীত, (খ) অপ্রচুর এবং (গ) সেইজন্য অর্থনৈতিক দ্রব্য পেতে হলে দাম দিতে হয়। এদের নিয়েই যত সমস্যা। মানুষ অভাব পূরণের জন্য এই সব দ্রব্য ভোগ করে। দ্রব্যের এই অভাব পূরণ করার ক্ষমতাকে উপযোগিতা বলা হয়। অতএব আমরা বলতে পারি, ভোগ হল—দ্রব্য বা সেবা থেকে উপযোগিতা গ্রহণ করা। কিন্তু এইসব দ্রব্য বা সেবার দাম আছে। এদের পেতে গেলে দাম দিতে হয়। যার দাম দেবার ক্ষমতা আছে সেই পায়, অন্যেরা পায় না। তাহলে এখানে দুটো ব্যাপার থাকছে। একটা হল ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা, অপরটা হল ভোগ করার ক্ষমতা। এই দুটো শক্তি থেকেই চাহিদার সৃষ্টি হয়। অতএব **চাহিদা হল—কোন দ্রব্য বা সেবা ভোগ করার বা ব্যবহার করার ইচ্ছা ও ক্ষমতার মিলিত রূপ।** শুধুমাত্র ভোগ করার ইচ্ছা বা সামর্থ্য থাকলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় না। সার্থক চাহিদার মধ্যে দুটোই থাকবে। কাজেই ভোগ তত্ত্বকে আমরা চাহিদা তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারি।

ভোগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার। এটি ব্যষ্টিগত সমস্যা। কোন একজন ব্যক্তির বা একটি পরিবারের একটা নির্দিষ্ট আয় থাকে যার সাহায্যে সে বাজার থেকে নানা রকম দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে ও ভোগ করতে পারে।

তার উদ্দেশ্য হল—এমন সব দ্রব্য ও সেবা এমন পরিমাণে ক্রয় করা যাতে তার তৃপ্তি সর্বাধিক হয়। কীভাবে একজন ক্রেতা বা ভোগকারী এটা করে তাই নিয়ে ভোগ-তত্ত্বে বা চাহিদাতত্ত্বে আলোচনা করা হয়।

ক্রেতা যখনই কোন দ্রব্য বা সেবা ভোগ করতে চাইবে তখনই তাকে তার দাম দিতে হবে। ক্রেতার আয় থেকে দাম দেবার বা ক্রয় করার ক্ষমতা আসে। এখন প্রশ্ন—ক্রেতা কীভাবে এই আয় পেয়ে থাকে। বলা যেতে পারে—কোন ক্রেতা বা ভোগকারী দুভাবে আয় পেয়ে থাকে—(ক) কারো নিকট থেকে (যেমন, কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের নিকট থেকে) দান বা ভিক্ষা হিসেবে অথবা, (খ) নিজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে কোন-না-কোন কিছু উৎপাদন ও বিক্রয় করে। প্রথম ক্ষেত্রে একজনের উপার্জিত আয় অন্যের কাছে যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আয়প্রাপক উৎপাদন ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে ও তার বিনিময়ে আয় উপার্জন করে। এখানে উৎপাদন ও উপার্জনের প্রশ্ন জড়িত। প্রথম ক্ষেত্রেও যে দান করে সেটা তার উপার্জিত আয় হতে পারে; অতএব আয়ের উদ্ভব হয় উৎপাদন থেকে। ভোগের পরেই আমরা উৎপাদনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করি।

উৎপাদন কী—এই নিয়ে অনেক কথা বলেও সঠিক বোঝানো যায় না। আগেকার দিনের অর্থনীতিবিদরা বলতেন—কোন বস্তুগত দ্রব্য নির্মাণ করাই হল উৎপাদন। যার কাজ কোন বস্তুর জন্ম দেয় না, যার কাজের ফলকে চোখে দেখা যায় না বা হাত দিয়ে ধরা যায় না, তার কাজ উৎপাদনশীল শ্রম নয়। এই হিসেবে গায়কের গান, ডাক্তারের চিকিৎসা, এমন কি অর্থনীতিবিদের অর্থনীতি আলোচনাও অনর্থক ও অনুৎপাদনশীল শ্রম। এখন এ ধারণাটি বাতিল হয়ে গেছে। আবার উৎপাদন করা বলতে যারা কোন কিছু তৈরি করা বোঝায়, তারাও আংশিকভাবে ভুল, কারণ—গভীর অর্থে মানুষ কোন কিছু তৈরি করতে পারে না। প্রকৃতির কাছ থেকে নানারকম দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে তাদের উপর নিজের শ্রম, বুদ্ধি, হাতিয়ার প্রয়োগ করে অন্য একটি দ্রব্য তৈরি করার অর্থ হল এক দ্রব্যকে অন্য দ্রব্যে রূপান্তরিত করা। অতএব উৎপাদন হল বস্তুর বা সেবার রূপান্তর সাধন করা। কেন এই রূপান্তর সাধন—এমন প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—উপযোগ বৃদ্ধি করার জন্যই এটা করা। কাজেই উৎপাদন হল অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি। অতিরিক্ত উপযোগ সৃষ্টি করাই হল উৎপাদন। কিন্তু এতেও অসম্পূর্ণতা আছে। উৎপাদনের কোন সঠিক সংজ্ঞা বলা খুবই কঠিন। তার মধ্যে হিক্স-এর সংজ্ঞাটিই সবচেয়ে ভালো বলে মনে হয়। তাঁর মতে বিনিময়ের মাধ্যমে অপরের অভাব পূরণের জন্য সার্থক ক্রিয়াকে উৎপাদন বলা যেতে পারে। আমরাও এই সংজ্ঞাটিকে মেনে নেব। মা সন্তান পালন করেন,—এতে উপযোগ সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু এটা উৎপাদন নয়; কারণ মা ও সন্তানের মধ্যে অর্থের বা দ্রব্যের কোন বিনিময় হয় না। সেইরূপ আমরা বাড়ির বাগানে যেসব শাক-সবজির চাষ করি সেগুলো আমরা নিজেদের অভাব পূর্তির জন্য ভোগ করে থাকি, বাজারে নিয়ে গিয়ে অর্থের বা অন্য কোন

দ্রব্যের বিনিময়ে তাদের বিক্রয় করি না। কাজেই এটাও উৎপাদন নয়। অতএব উৎপাদন বলতে বোঝায় বিনিময় বা বিক্রয়ের জন্যই উৎপাদন। এইভাবে উৎপাদনের সঙ্গেই বিনিময় জড়িত থেকে যায়।

কোন একটি দেশের সব মানুষের ভোগ, উৎপাদন ও বিনিময় কেমন সুন্দর এক চক্রাকার সম্পর্কে আবদ্ধ তা না বললে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কোন মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে গেলে তার দরকার হবে অন্ন (খাদ্য), বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি। কিন্তু কোন মানুষই একা এদের সবগুলো তৈরি করতে পারে না। তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। মানুষ যত সভ্য হবে, যত তার অভাব বাড়বে, ততই বাড়বে এই পর-নির্ভরতা। যে মানুষ গুহাবাসী ও কাঁচা মাংসাশী তার পক্ষে অন্যের উপর নির্ভর না করলেও চলে। কিন্তু যে আধুনিক সভ্য সমাজে বাস করে, সে পিন থেকে ইনজিন পর্যন্ত সব কিছু নিজে তৈরি করে নেবে এটা ভাবাই যায় না। অতএব আধুনিক-কালে কোন একজন মানুষ প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করে, কিংবা উৎপাদন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং তার বিনিময়ে যে অর্থ পায় তাই দিয়ে অন্য সব প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে। কৃষক চাষ করে যে শস্য উৎপাদন করে, সেই শস্যের একটি অংশ সে নিজের বা নিজের পরিবারের অন্ন সংস্থানে ব্যয় করে এবং বাকি অংশটি বাজারে বিক্রয় করে যে অর্থ পায় তাই দিয়ে সে কাপড়, বই, ওষুধপত্র ইত্যাদি ক্রয় করে। আবার যে শ্রমিক কোন বড় কারখানায় কাজ করে, সে হয়তো একা কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করে না, কিন্তু সে অনেক শ্রমিকের সঙ্গে উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ করে এবং তার বিনিময়ে মজুরী পায়। অন্যভাবে বলা যায়—শ্রমিক তার শ্রম বিক্রয় করে এবং তার বিনিময়ে মজুরী পায়। সেই মজুরী নামক আয়ের বিনিময়ে সে অন্য সব দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে। এখানে শ্রমকেও একটি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বা পণ্য হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। এইভাবে দেখা যায়, একজন ব্যক্তি প্রথমে কোন দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদন করে কিংবা সংগ্রহ করে, সেই পণ্য বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করে এবং সেই অর্থের বিনিময়ে অন্য সব দ্রব্য ক্রয় করে। এইভাবে উৎপাদন ও ভোগ নামক দুটো অর্থনৈতিক কর্মের মধ্যে বিনিময় তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। বিনিময় একটি স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক কর্ম। বিনিময় ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে যে ব্যক্তিগত, স্থানগত ও সময়গত পার্থক্য থাকে সেই পার্থক্যকে দূরে করে। শুধু তাই নয়, বিনিময় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করে। মূল্য হল দুটি দ্রব্যের বিনিময়ের হার। যদি কাপড় ও চাল—এই দুটো দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় হয়, তাহলে এক ইউনিট কাপড় পেতে হলে যে পরিমাণ চাল দিতে হয় তাই হবে কাপড়ের মূল্য। অর্থাৎ কাপড়ের মূল্য $= \dfrac{\text{চালের পরিমাণ}}{\text{কাপড়ের পরিমাণ}}$। এখানে কাপড়ের মূল্য চালের হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। আবার, চালের মূল্যও তেমনি কাপড়ের হিসেবে প্রকাশিত হবে। সেখানে এক ইউনিট

চালের মূল্য হবে—সেই এক ইউনিট চাল পেতে হলে যে পরিমাণ কাপড় দিতে হবে তার সমান। চালের মূল্য = $\frac{\text{কাপড়ের পরিমাণ}}{\text{চালের পরিমাণ}}$। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, মূল্য শব্দটি আপেক্ষিক। মূল্য বলতে বোঝায়—কোন্ কোন্ দ্রব্যের পরিবর্তে কোন্ কোন্ দ্রব্য পেতে হলে কোন্ দ্রব্যের কতটা দিলে অপর দ্রব্যের কতটা পাওয়া যাবে। এটা হল দুটো দ্রব্যের মধ্যে বিনিময়ের হার।

মানুষ যখন সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম হিসেবে অর্থের আবিষ্কার করেনি, তখন দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় হত। কিন্তু এই দ্রব্য-বিনিময় প্রথার নানারকম অসুবিধা দেখা দেয়। মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অসুবিধা সহ্য করে না। এক্ষেত্রেও তাই হল। আবিষ্কার হল অর্থের। প্রথমেই ধাতব অর্থ বা কাগজী অর্থের আবিষ্কার হয়নি। পরে পরে এগুলোর আবিষ্কার হয়েছে। এখন 'অর্থ' হল সরকারের একটি 'প্রতিশ্রুতি' মাত্র। এই প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাস যে কাগজের উপর ছাপানো থাকে তাকেই লোকে অর্থ বলে ধরে নেয় এবং তাই দিয়ে কেনাবেচা করে। ভারতের অর্থের নাম রুপয়া। আমরা বাঙালীরা টাকা বলি। সে যা হোক—অর্থের বিনিময়ে যখন কোন দ্রব্য কেনা হয় তখন অর্থের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় হয়। এক্ষেত্রে দ্রব্যটির মূল্যকে বা অর্থ-মূল্যকে দাম বলা হয়। দাম হল কোন দ্রব্যের এক ইউনিট পাবার জন্য যে পরিমাণ অর্থ দিতে হয় তাই। দাম = $\frac{\text{দেয় অর্থের পরিমাণ}}{\text{দ্রব্যের পরিমাণ}}$।

তাহলে বিনিময়ের মাধ্যমে দুটো কাজ হয়। প্রথমত, ভোগ ও উপাদানের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সঙ্গতি বজায় রাখা হয়। দ্বিতীয়ত, যেসব দ্রব্য বা পণ্যের মধ্যে বিনিময় হয় তাদের বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। অর্থের হিসেবে প্রকাশিত এই হারকে দাম বলা হয়। কাজেই আমরা বলতে পারি—বিনিময়ের মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। যে-কোন দ্রব্য বা পণ্যের ক্ষেত্রে বিনিময় হয় প্রধানত ক্রেতার সঙ্গে বিক্রেতার। ক্রেতা আয় নিয়ে বাজারে যায়। বিক্রেতা পণ্য নিয়ে বাজারে আসে। দুজনেরই চাহিদা ও যোগান আছে। ক্রেতার আছে দ্রব্যের চাহিদা ও অর্থের যোগান; বিক্রেতার আছে দ্রব্যের যোগান এবং অর্থের চাহিদা। কিন্তু অর্থের নিজস্ব কোন চাহিদা নেই। অর্থ অন্য দ্রব্য বা সেবার প্রতিনিধি। কাজেই এখানে দুটো মূল শক্তি কাজ করে। একটা হল দ্রব্যের চাহিদা। অপরটা হল দ্রব্যের যোগান। এই চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে এমন একটি বিনিময় হার নির্ধারিত হয় যাতে ক্রেতার কাঙ্ক্ষিত ক্রয় ও বিক্রেতার কাঙ্ক্ষিত বিক্রয় সমান হয়। এটাকে ভারসাম্য বলা হয়। অতএব চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে পণ্যমূল্য নির্ধারিত হয়। পণ্যমূল্য যেহেতু সাধারণত অর্থের হিসেবে প্রকাশিত হয় (যাকে দাম বলা হয়) অতএব আমরা বিনিময়তত্ত্বকে দাম-নির্ধারণতত্ত্বও বলতে পারি। অর্থনীতিতে এই দাম-নির্ধারণতত্ত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। কোন মানুষের আয়, ব্যয়, জীবনযাত্রার মান, সামাজিক স্থান—সব কিছুই নির্ভর করে সেই ব্যক্তি যে দ্রব্যটির যোগান দেয়

তার দামের উপর। বিভিন্ন পণ্যের দাম বিভিন্ন। একটা মোটর গাড়ির যা দাম একটা সেফ্‌টিপিনের দাম তার চেয়ে অনেক কম। তেমনি যে মানুষ লোকের বাড়িতে রান্নাবান্না করে তার শ্রমের দাম, একজন ডাক্তারের শ্রমের দামের চেয়ে অনেক কম। এ থেকেই বোঝা যায়—একজন পাচক একজন ডাক্তারের চেয়ে কেন গরীব। সমাজে পাচকের যে স্থান ডাক্তারের স্থান তার অনেক উপরে। এটা কেন হয় বলা কঠিন। এটা হওয়া উচিত কিনা তা ঠিক করা আরো কঠিন। দাম-নির্ধারণতত্ত্ব এসব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। এই তত্ত্বে শুধু দেখা হয় কীভাবে একটি দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। সে দামটা অন্যের চেয়ে বেশী বা কম যাই হোক না কেন—তার ভিতরে যাওয়ার কোন চেষ্টা অর্থনীতিতে থাকে না।

আমরা এতক্ষণ মানুষের অর্থনৈতিক কাজের মধ্যে ভোগ, উৎপাদন, বিনিময় ও দাম-নির্ধারণ সম্বন্ধে কিছু আভাস দিলাম। এবার বণ্টন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। উৎপাদন ব্যাপারটা একটি যৌথক্রিয়ার ফল। জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন নামক চারটি উপাদান উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণ করে। উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে যায়। বিক্রয় হয়ে টাকা ফিরে আসে উৎপাদনের মালিকের কাছে। এটা হল উৎপাদনের অর্থমূল্য—উৎপাদনক্রিয়ার পরিণাম। এই অর্থটা এবার চারটি উপাদানের মালিকদের মধ্যে বণ্টিত বা বিভক্ত হয়ে যায়। জমির মালিক খাজনা পায়। শ্রমের মালিক পায় মজুরী, মূলধনের মালিক পায় সুদ এবং সংগঠক বা উদ্যোক্তা মুনাফা পেয়ে থাকে।

অতএব কোন দ্রব্যের **উৎপাদনের মোট অর্থমূল্য=জমির মালিকের পাওনা খাজনা শ্রমের মালিকের পাওনা মজুরী+মূলধনের মালিকের পাওনা সুদ+ সংগঠনের মালিকের পাওনা মুনাফা।**

এই খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা হল জমিদার, শ্রমিক, মূলধনের মালিক ও উদ্যোক্তার আয়। এই আয় থেকেই তারা তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কেনাকাটা করে। যে বেশি আয় পেয়ে থাকে সে ধনী হয়, যে কম আয় পায়, সে গরীব হয়ে যায়। ধনী-দরিদ্রের এই পার্থক্যটা উৎপাদন ও বণ্টন থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এটা কেন হয় সেটা বলা কঠিন। সে যা হোক, ক্রেতারা যে আয় দিয়ে কেনাকাটা করে, সেটা তাদের উৎপাদনের দাম কিংবা যৌথ উৎপাদন ক্ষেত্রে তাদের অবদানের দাম। কীভাবে মোট উৎপাদনের অর্থমূল্য চারটি উপাদানের মালিকদের মধ্যে বিভক্ত হয় তা আলোচনা করাই বণ্টনতত্ত্বের কাজ। বণ্টনতত্ত্বে দেখানো হয় কীভাবে বণ্টন করা হয় এবং বণ্টন কীভাবে ভোগ, উৎপাদন ও বিনিময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে। এই হল ব্যক্তিগত অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্যষ্টিগত অর্থনীতিতে একজন ব্যক্তির বা একটি প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়। ভোগ নিয়ে যে তত্ত্ব তার নাম ভোগতত্ত্ব। উৎপাদন নিয়ে যে তত্ত্ব তার নাম উৎপাদনতত্ত্ব, এইভাবে বিনিময় বা মূল্য-

নির্ধারণতত্ত্ব ও বণ্টনতত্ত্বও অর্থনীতির ব্যষ্টিগত আলোচনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। অতএব ব্যষ্টিগত অর্থনীতিতে থাকে—

(ক) ভোগতত্ত্ব বা চাহিদাতত্ত্ব (Theory of Consumption or Demand)
(খ) উৎপাদনতত্ত্ব (Theory of Production)
(গ) দাম-নির্ধারণতত্ত্ব (Theory of Price Determination) এবং
(ঘ) বণ্টনতত্ত্ব (Theory of Distribution)

এই চারটি তত্ত্বে মানুষের ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক কার্যাবলী যথা—ভোগ, উৎপাদন, বিনিময় ও মূল্য নির্ধারণ ও বণ্টনের তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়। তাত্ত্বিক আলোচনা সাধারণ আলোচনার মত সোজা পথে চলে না। এর একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি থাকে। এই পদ্ধতির মূল স্তম্ভ হল অনুধারণা (assumption) বা অনুমান এবং সেই অনুমানের ভিত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। এই সিদ্ধান্তগুলিই তত্ত্বের পরিণাম, কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত করা যায় এবং অর্থনীতিতে কী কী সিদ্ধান্ত করা হয়—তাই অর্থনৈতিক তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়।

১২. অর্থনীতির আলোচনা পদ্ধতি :

অর্থনীতি একটি শাস্ত্র বা বৈজ্ঞানিক বিষয়। এর আলোচনার ভাষা পুরোপুরি কথ্য বা লেখ্য ভাষা নয়। যে-কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের ভাষা হবে তর্কশাস্ত্রসম্মত ভাষা, যার সাহায্যে সংক্ষেপে ও সহজে অনেক কথা বলা যায়। এই ভাষার নাম অঙ্ক। কাজেই অর্থনীতিতে যে অঙ্কের ব্যাপক ব্যবহার থাকবে—সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই। অঙ্কের বহু শাখা যেমন জ্যামিতি, বীজগণিত, অবকলন ও সমাকলন গণিত ইত্যাদি। সাধারণ স্নাতক স্তরের আলোচনায় খুব বেশি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় না। সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় জ্যামিতির, বিশেষ করে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির। আমাদের এই পাঠ্য পুস্তকে জ্যামিতিক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে বেশি করে। জ্যামিতিক পদ্ধতিতে রেখাচিত্র ও রেখার সাহায্যে আলোচ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয়। আমরা এখানে রেখা ও রেখার ঢাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এই অংশটি ভালো করে পড়লে ছাত্রছাত্রীরা পরের রেখাচিত্রগুলি সহজে বুঝতে পারবে বলে আশা করি।

(ক) রেখাচিত্র ও রেখা :

সাধারণ রেখাচিত্রে দুটি অক্ষ থাকে যথা, OX-অক্ষ ও OY-অক্ষ। OX-অক্ষে X নামক একটি বিষয় বা চলমান (Variable) এবং OY-অক্ষে Y নামক একটি বিষয় বা চলমান পরিমাপ করা হয়। আমরা যদি ধরে নিই যে, Y নামক বিষয়টি X নামক বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহলে আমরা $Y=f(X)$ নামক একটি অপেক্ষক (Function) পাব। এই অপেক্ষকের মধ্যে X-এর বিভিন্ন মান বসিয়ে Y-এর বিভিন্ন মান পাব। যেমন, যদি $Y=3X$ হয়, তাহলে যখন $X=1, 2, 3, 4, 5$ ইত্যাদি হবে তখন $Y=3, 6, 9, 12, 15$ ইত্যাদি হবে।

আবার অপেক্ষক যদি $Y = 3X + 4$ হয় (অর্থাৎ Y-এর মান X-এর মানের তিনগুণের চেয়ে 4 বেশি)

তাহলে যখন $X = 1, 2, 3, 4, 5$ ইত্যাদি হবে

তখন $Y = 7, 10, 13, 16, 19$ ইত্যাদি হবে

অর্থাৎ, আমরা যদি Y ও X-এর সম্পর্কটিকে একটি সমীকরণের আকারে পাই, তাহলে সেই সমীকরণে X-এর বিভিন্ন মান বসিয়ে Y-এর বিভিন্ন মান পাব। X-এর একটি মান এবং সমীকরণ থেকে লব্ধ Y-এর একটি মান—এই দুটি মানকে আমরা রেখাচিত্রের মধ্যে একটি বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করে থাকি।

এইরকমভাবে X ও Y-এর বিভিন্ন সমন্বয় (Combination) থেকে আমরা রেখাচিত্রের মধ্যে একাধিক বিন্দু পাব। সেই বিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে একটি রেখা অঙ্কন করা যায়। সেই রেখার সাহায্যে X ও Y নামক দুটি বিষয়ের পরিমাণগত সম্পর্ক দেখানো যায়। অতএব—**রেখা হল X ও Y নামক যে-কোন দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের একটি জ্যামিতিক চিত্ররূপ।**

রেখা দুরকমের হয়, যথা—সরলরেখা ও বক্ররেখা। প্রথমে সরলরেখার কথা বলা যেতে পারে। যেখানে $Y = f(X)$ নামক অপেক্ষকটিতে X ও Y একটি নির্দিষ্ট পরিমাণগত সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, যাতে X-এর পরিবর্তনের ফলে Y-এর পরিবর্তনের হার সর্বদা সমান থাকে, তখন X ও Y-এর সম্পর্কটিকে একটি সরলরেখার দ্বারা প্রকাশ করা যায়। অন্যভাবে বলা যায়—যেখানে X-এর পরিবর্তনের ফলে Y-এর পরিবর্তনের হার সমান থাকবে তখন X ও Y একটি সরলরেখার উপর থাকবে।

অপরপক্ষে X-এর পরিবর্তনের ফলে Y-এর পরিবর্তনের হার যদি সব সময় একরূপ থাকে না, এখন এক রকম, তখন অন্যরকম হয় তাহলে X ও Y একটি সরলরেখার উপর থাকবে না; তারা একটি বক্ররেখার উপর থাকবে। তাহলে আমরা পাই

(১) যখন X ও Y-এর পরিবর্তন সমান হারে হয় তখন X ও Y-এর বিভিন্ন মান একটি সরলরেখার উপর থাকবে।

(২) যখন X ও Y-এর পরিবর্তন অসমান হারে হয় তখন X ও Y-এর বিভিন্ন মান একটি বক্ররেখার উপর থাকে।

সরলরেখা উর্ধ্বমুখী, নিম্নমুখী, কিংবা যে-কোন একটি অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে। আমরা এখানে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করতে পারি—

(১) যদি X বাড়লে Y বাড়ে, কিংবা X কমলে Y কমে, তাহলে X ও Y উর্ধ্বমুখী সরলরেখার উপর থাকবে। এখানে X ও Y-এর সম্পর্ক একমুখী হবে।

(২) যদি X বাড়লে Y কমে কিংবা X কমলে Y বাড়ে, তাহলে X ও Y নিম্নমুখী সরলরেখার উপর থাকবে। এখানে X ও Y-এর সম্পর্ক বিপরীতমুখী হবে।

(৩) যদি X বাড়লে বা কমলে Y একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে তাহলে X ও Y-এর সম্পর্ক OX অক্ষের সমান্তরাল একটি রেখার দ্বারা বোঝানো যাবে।

(৪) যদি X একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে কিন্তু Y বেড়ে যায় বা কমে যায়, তাহলে X ও Y-এর মানগুলি OY-অক্ষের সমান্তরাল একটি সরলরেখার উপর থাকবে।

সরলরেখার মত বক্র রেখাও ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী হতে পারে। X ও Y-এর একমুখী সম্পর্ক থেকে ঊর্ধ্বমুখী বক্ররেখা পাওয়া যায় এবং X ও Y-এর বিপরীত-মুখী সম্পর্ক থেকে নিম্নমুখী রেখা পাওয়া যায়। আবার একটি বক্ররেখা OX-অক্ষের দিকে উত্তল (Convex) বা অবতল (Concave) হতে পারে। এর দ্বারা কী বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমাদের ঢাল (Slope) সম্বন্ধে জানতে হবে।

(খ) ঢাল (Slope) কাকে বলে ?

ধরা যাক Y নামক বিষয়টি X নামক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তাহলে আমরা পাই Y=f(X)। এখানে Y হল নির্ভরশীল বিষয় (dependent variable) এবং X হল স্বাধীন বিষয় (independent variable)। তাহলে X-এর পরিবর্তন হলে Y-এর পরিবর্তন হবে। ধরা যাক X-এর মান ΔX পরিমাণে বৃদ্ধি পেল এবং তার ফলে Y-এর মান ΔY পরিমাণে বৃদ্ধি পেল।* তাহলে আমরা $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ নামক একটি অনুপাত পাব। এই অনুপাতের অর্থ কী? আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে,

যখন X বাড়ে ΔX পরিমাণে তখন Y বাড়ে ΔY পরিমাণে,

যখন X ,, 1 একক v ,, $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$

অতএব $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ = X-এর প্রতি একক বৃদ্ধির জন্য Y-এর বৃদ্ধি।

ধরা যাক X কমলে Y কমে। তাহলে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ হবে X-এর প্রতি একক হ্রাসের জন্য Y-এর হ্রাস। হ্রাস বা বৃদ্ধি যে-কোন একটিকে বোঝাবার জন্য আমরা পরিবর্তন (change) শব্দটির ব্যবহার করতে পারি।

তাহলে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ হবে X-এর প্রতি একক পরিবর্তনের জন্য Y-এর পরিবর্তন।

গণিতে একে বলা হয় Y-এর পরিবর্তনের হার এবং জ্যামিতিতে বলা হয় ঢাল (slope)। অতএব ঢাল হল স্বাধীন বিষয়ের এক একক পরিবর্তনের জন্য নির্ভর-

*Δ (ডেল্টা) হল একটি গ্রীক অক্ষর। কোন বিষয়ের পরিবর্তন বোঝাতে Δ ব্যবহৃত হয়। X-এর পরিবর্তন হল ΔX এবং Y-এর পরিবর্তন হল ΔY. পরিবর্তন বলতে হ্রাস (ঋণাত্মক পরিবর্তন) বা বৃদ্ধি (ধনাত্মক পরিবর্তন) বোঝায়।

শীল বিষয়ের পরিবর্তন, কিংবা স্বাধীন বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে নির্ভরশীল বিষয়ের পরিবর্তনের হার। যদি X ও Y যথাক্রমে স্বাধীন ও নির্ভরশীল বিষয় হয়ে থাকে তাহলে ঢাল $= \frac{\Delta Y}{\Delta X}$ হবে।

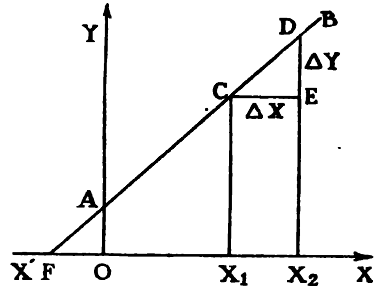
(গ) কীভাবে ঢাল পরিমাপ করা হয় ?

প্রথমে সরলরেখার ঢাল পরিমাপ করা হবে। ধরা যাক সরলরেখাটি হল ১.১ নং চিত্রে অঙ্কিত AB রেখার মত একটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা।

এখানে OX-অক্ষে X নামক স্বাধীন বিষয়টি এবং OY-অক্ষে Y নামক নির্ভরশীল বিষয়টি পরিমাপ করা হয়েছে। এখন আমরা AB রেখার ঢাল পরিমাপ করতে চাই।

তার জন্য AB রেখার উপর C ও D নামক দুটি বিন্দু নিলাম এবং CDE ত্রিভুজটি অঙ্কন করলাম।

এখন C থেকে D বিন্দুতে সরে গেলে X ও Y-এর মান বাড়বে।



১.১ রেখাচিত্র: সরলরেখার ঢাল

এখানে CE = X-এর বৃদ্ধি = ΔX এবং ED = Y-এর বৃদ্ধি = ΔY ;

অতএব AB রেখার ঢাল হবে $\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{DE}{CE}$.

দেখা যাচ্ছে, CDE ত্রিভুজটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ। CE হল এর ভূমি এবং DE হল এর লম্ব।

কাজেই $\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{DE}{CE}$ = CDE ত্রিভুজের $\frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}}$

ত্রিকোণমিতিতে $\frac{DE}{CE}$ হল $\angle DCE$-এর ট্যানজেণ্ট নামক একটি অনুপাত।

ধরা যাক, $\angle DCE$ হল X°. তাহলে আমরা পাই $\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{DE}{CE} = \tan X^\circ$. আবার AB রেখাটিকে যদি বাম দিকে বর্ধিত করা যায় তাহলে ঐ রেখাটি OX-অক্ষকে বাম দিকের সম্প্রসারিত অংশের F বিন্দুতে ছেদ করবে এবং সেখানে $\angle AFO$ নামক একটি কোণ তৈরি করবে। এখন $\angle AFO = \angle DCE$ (কারণ ওরা অনুরূপ কোণ)। কাজেই $\angle DCE = X^\circ$ হলে $\angle AFO = X^\circ$ হবে। তাহলে AB নামক সরলরেখার ঢাল হবে $\tan X^\circ$. অতএব কোন ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখাকে যদি বাম দিকে সম্প্রসারিত করা যায় তাহলে সেই রেখাটি OX-অক্ষের বামদিকের সম্প্রসারিত অংশে যে কোণ উৎপন্ন করবে সেই কোণের ট্যানজেণ্ট হবে সেই সরলরেখার ঢাল।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা উচিত। সরলরেখার ক্ষেত্রে X-এর সমান সমান পরিবর্তনের জন্য Y-এর পরিবর্তনও সমান হারে হয়ে থাকে। কাজেই সরল-রেখার উপর যে-কোন স্থানে যে-কোন দুটি বিন্দু নিলে ঢালের কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ সরলরেখার ঢাল সর্বত্র সমান বা স্থির থাকে।

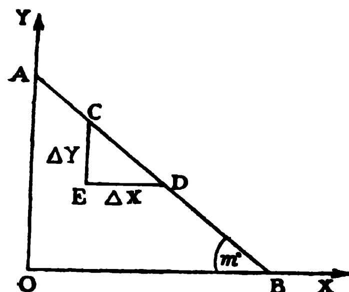
১.১ নং রেখাচিত্রে AB একটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা।

এখানে X বাড়লে (অর্থাৎ ΔX ধনাত্মক হলে) Y বাড়ে (ΔY ধনাত্মক হয়), কাজেই $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ ধনাত্মক হবে।

আবার X কমলে ΔX ঋণাত্মক হবে এবং তখন Y কমবে অর্থাৎ ΔY ঋণাত্মক হবে, কাজেই $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ ধনাত্মক হবে।

কাজেই ঊর্ধ্বমুখী রেখার ক্ষেত্রে ঢাল হবে ধনাত্মক। কিন্তু AB রেখাটি যদি ১.২ নং চিত্রে অঙ্কিত রেখার মত নিম্নমুখী সরলরেখা হয়, তাহলে X বাড়লে Y কমবে এবং X কমলে Y বাড়বে। এখানে ΔX এবং ΔY-এর পরিবর্তন বিপরীতমুখী হওয়ায় $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ ঋণাত্মক হবে। তাহলে আমরা পাই—নিম্নমুখী রেখার ঢাল ঋণাত্মক।

কিন্তু AB যেহেতু একটি সরলরেখা, অতএব এর ঢালের কোন পরিবর্তন হবে না। ১.২ নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে AB রেখাটি OX-অক্ষকে B বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং m° কোণের সৃষ্টি করেছে। কাজেই AB রেখার ঢাল হবে tan m°.



১.২ রেখাচিত্র :
নিম্নমুখী সরলরেখার ঢাল পরিমাপ

এখানে tan m° = OAB নামক ত্রিভুজের $\frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{OA}{OB}$.

এই রেখার উপর C ও D বিন্দু নিলে দেখা যাবে

ঢাল $= \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{CE}{ED} =$ tan CDE কোণ।

কিন্তু $\angle CDE = \angle ABO = m^\circ$.

অতএব ঢাল $= \frac{CE}{ED} = \tan m^\circ = \frac{OA}{OB}$.

(ঘ) বক্ররেখার ঢাল কীভাবে পরিমাপ করা যায় ?

বক্ররেখার ক্ষেত্রে X এবং Y-এর পরিবর্তন সমান হারে হয় না, কাজেই সেখানে ঢাল $= \frac{\Delta Y}{\Delta X}$ হবে না। ঢাল হল X-এর পরিবর্তনের জন্য Y-এর পরিবর্তনে হার। X-এর পরিবর্তন যদি খুব বেশি পরিমাণে হয়, তাহলে ΔX খুব বড়ো (lumpy) হয় এবং ΔY ও খুব বড়ো হয়। কিন্তু আমরা যখন বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করব তখন ΔX ও ΔY খুব বড়ো হয়ে গেলে Y-এর পরিবর্তনের গড় হার পাওয়া যাবে,

প্রকৃত হার পাওয়া যাবে না। যেমন, কোন ট্রেন যদি দু ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. পথ যায় তাহলে তার গতিবেগ হবে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ২৫ কি. মি.। কিন্তু একটি ঘণ্টার মধ্যে ৬০টি মিনিট থাকে, সেই মিনিটগুলির প্রত্যেকটিতে গাড়ির গতিবেগ কত ছিল তা কখনই প্রতি ঘণ্টার গড় গতি থেকে জানা যাবে না। গাড়ির প্রকৃত গতিবেগ নির্ধারণ করতে হলে আমাদের সময়কে অতি সূক্ষ্ম ভাগে বিভাজ্য ধরে নিয়ে তার অতিশয় ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য গাড়ি যে অতিরিক্ত ক্ষুদ্র দূরত্ব অতিক্রম করে তাকেই বোঝাতে হবে। অনুরূপভাবে বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করতে হলে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ পরিমাপ করলে হবে না। এক্ষেত্রে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ দিয়ে ঢাল মাপলে কী রকম ভুল হতে পারে সেটা ১.৩ নং রেখাচিত্রে দেখানো হল।

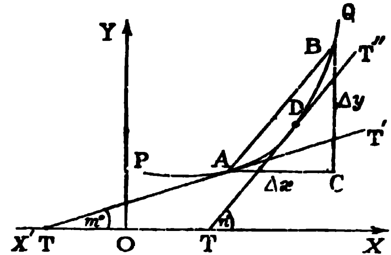
ধরা যাক, PQ একটি বক্ররেখা। এর উপর A ও B নামে দুটি বিন্দু নেওয়া হল। ABC সমকোণী ত্রিভুজটি অঙ্কিত হল।

এখানে A থেকে B বিন্দুতে সরে গেলে $\Delta X = AC$ এবং $\Delta Y = BC$ হয়।

অতএব $\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{BC}{AC}$ হয়।

কিন্তু $\frac{BC}{AC}$ হল BAC কোণের ট্যান্‌জেন্ট = AB সরলরেখার ঢাল।

কিন্তু $\frac{BC}{AC}$ কখনই ADB চাপের বা বক্ররেখার ঢাল নয়। ADB রেখাটি AB রেখার নীচে আছে। আমরা যদি ADB রেখার ঢাল বলতে AB রেখার ঢাল বলে থাকি তাহলে আমরা ঢালের যে পরিমাপ পাই সেটি প্রকৃত ঢালের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে। ব্যাপারটাতে ভুল থেকে যাবে। আবার PQ রেখাটি যদি OX-অক্ষের দিকে উত্তল না হয়ে অবতল হত, তাহলে AB রেখার ঢাল দ্বারা ADB বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করলে আমাদের পরিমাপ প্রকৃত ঢালের চেয়ে কম হত।



১.৩ রেখাচিত্র : বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ

এই ভুল এড়ানোর উপায় হল A এবং B বিন্দু দুটিকে খুব কাছাকাছি রাখা। তাহলে AB প্রায় একটি সরলরেখা হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে AB রেখার ঢালই হবে বক্ররেখার ঢালের আসন্ন প্রকৃত মান। A ও B বিন্দুকে কাছাকাছি রাখার জন্য আমরা A বিন্দুকে স্থির রেখে B বিন্দুকে A বিন্দুর দিকে নামিয়ে আনতে পারি। যতই এরকম করা হবে ততই ΔX কমবে। এইভাবে যখন ΔX খুবই ছোট হয়ে যাবে (প্রায় শূন্যের কাছাকাছি), তখন আমরা বলতে পারব ΔX শূন্যের দিকে যায় (ΔX tends to zero), অবশেষে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ এমন একটি মান পাবে যাকে আমরা

সীমা বা Limit বলতে পারি। একে $\frac{dy}{dx}$ লেখা হয়। তাহলে বক্ররেখার ঢাল হবে $\lim_{\Delta X \to O} \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{dy}{dx}$. জ্যামিতিকভাবে বলা যায় $\frac{dy}{dx}$ হল বক্ররেখার উপর নির্দিষ্ট বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল। ধরা যাক, PQ বক্ররেখার উপর A বিন্দুতে ঢাল পরিমাপ করতে হবে। তাহলে আমরা PQ রেখার উপর A বিন্দুতে TT′ নামক একটি স্পর্শক অঙ্কন করতে পারি। এই স্পর্শকটি একটি সরলরেখা এবং এটি OX-অক্ষের বাম দিকের বর্ধিত অংশে m° কোণ উৎপন্ন করে। তাহলে TT′ রেখার ঢাল tan m° হবে PQ বক্ররেখার A বিন্দুতে PQ রেখার ঢাল। অনুরূপভাবে আমরা যদি PQ রেখার উপর D বিন্দুতে ঢাল পরিমাপ করতে চাই তাহলে আমাদের PQ রেখার D বিন্দুতে TT″ নামক আর একটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হবে। সেই স্পর্শকের ঢালই হবে PQ রেখার D বিন্দুতে PQ রেখার ঢাল।

আমাদের ১.৩নং রেখাচিত্রে TT″ স্পর্শকটি OX-অক্ষের উপর n° কোণ উৎপন্ন করবে। TT″ স্পর্শকের ঢাল হবে tan n°. তাহলে আমরা পাই,

বক্ররেখার উপর কোন বিন্দুতে স্পর্শক অংকন করলে সেই স্পর্শকটি OX-অক্ষের উপর যে কোণ উৎপন্ন করবে সেই কোণের ট্যানজেন্ট হবে সেই বিন্দুতে সেই বক্ররেখার ঢাল।

এর থেকে আর একটি ব্যাপার বোঝা যায়। বক্ররেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে ঢাল বিভিন্ন হয়। বক্ররেখাটি যদি ঊর্ধ্বমুখী হয় তাহলে ঢাল ধনাত্মক হয় এবং বক্ররেখাটি যদি OX-অক্ষের দিকে উত্তল হয়, তাহলে সেই রেখার উপর বাম দিকের কোন বিন্দু থেকে ডান দিকের কোন বিন্দুতে ঢাল বৃদ্ধি পায়। বক্ররেখাটি যদি OX-অক্ষের দিকে অবতল হয়, তাহলে ঢাল ক্রমশ কমে। বক্ররেখাটি যদি নিম্নমুখী হয়, তাহলে ঢাল ঋণাত্মক হবে।

(ঙ) চাহিদা রেখার ঢাল :

চাহিদা-অপেক্ষককে কোন দ্রব্যের চাহিদাকে সেই দ্রব্যের দামের উপর নির্ভরশীল বলে ধরা হয়। D=চাহিদা, P=দাম ধরলে আমরা পাই D=f(P), এখানে D হল নির্ভরশীল চলমান এবং P হল স্বাধীন চলমান। অতএব চাহিদা রেখা অঙ্কন করার সময় অঙ্কের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী স্বাধীন চলমান P-কে অনুভূমিক অক্ষে এবং নির্ভরশীল চলমান D-কে উল্লম্ব অক্ষে পরিমাপ করা উচিত। কিন্তু অধ্যাপক মার্শাল চাহিদা রেখা অঙ্কন করার সময় এই রীতিটি অনুসরণ না করে উল্লম্ব অক্ষে দাম (P) এবং অনুভূমিক অক্ষে চাহিদা (D) পরিমাপ করেন। এতে ঢালের জ্যামিতিক পরিমাপ নির্ণয় করার সময় চাহিদা রেখা উল্লম্ব অক্ষে যে কোণ উৎপন্ন করে তার ট্যানজেন্ট পরিমাপ করতে হয়। কারণ চাহিদা রেখার ঢাল $= \frac{\Delta D}{\Delta P} = \frac{\text{অনুভূমিক দূরত্ব}}{\text{লম্ব দূরত্ব}}$ হবে।

আমাদের ১.৪ নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হয়েছে। এখানে AB হল একটি সরলরৈখিক চাহিদা রেখা। এর উপর C ও D নামক দুটি বিন্দু নেওয়া হল এবং CED ত্রিভুজটি অঙ্কন করা হল।

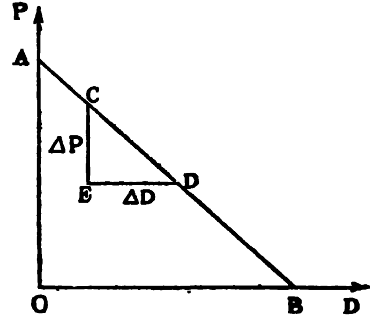
এখানে $\Delta D = ED$, এবং $\Delta P = CE$,

তাহলে AB চাহিদা রেখার ঢাল

$$= \frac{\Delta D}{\Delta P} = \frac{DE}{CE}.$$

কিন্তু $\frac{DE}{CD}$ হল CED সমকোণী ত্রিভুজের $\frac{\text{ভুমি}}{\text{লম্ব}}$

$$= \frac{1}{\frac{\text{লম্ব}}{\text{ভুমি}}} = \frac{1}{\frac{1}{\tan \angle CDE}}$$



১.৪ রেখাচিত্র : চাহিদা রেখার ঢাল পরিমাপ

অর্থাৎ CDE কোণের ট্যান্‌জেন্টের অন্যোন্যক হল AB চাহিদা রেখার ঢাল।

প্রশ্নাবলী

১। অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় কী ?

২। "মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের আলোচনা করাই অর্থনীতির প্রধান বিষয়"—উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

৩। ভোগ, উৎপাদন, বিনিময় ও বণ্টন কাকে বলে ? এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৪। মূল্য নির্ধারণের গুরুত্ব বিচার কর।

৫। ঢাল কাকে বলে ? কীভাবে সরলরেখা ও বক্ররেখার ঢাল পরিমাপ করা যায় ?

৬। (ক) "সরলরেখার ঢাল সর্বত্র সমান থাকে।" (খ) "বক্ররেখার ঢাল সর্বত্র সমান থাকে না"—উক্তি দুটির ব্যাখ্যা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) প্রাকৃতিক দ্রব্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কর।

(খ) উৎপাদন কাকে বলে সংক্ষেপে বোঝাও।

(গ) মূল্য কী ?

(ঘ) ভোগ ও উৎপাদনের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

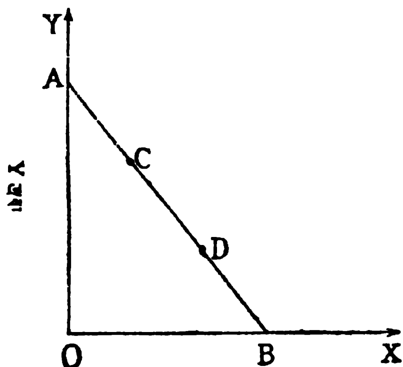
(ঙ) বণ্টনতত্ত্বে কোন্ সমস্যার সমাধান করা হয় ?

(চ) মজুরী, সুদ, খাজনা ও মুনাফা কাকে বলে ? কীভাবে এগুলি অর্জিত হয় ?

২ | মূল্য, দাম ও উপযোগ

২.১. মূল্য ও দাম :

(ক) মূল্য, দাম ও মূল্যের পরিবর্তন : অর্থনীতিতে মূল্য (Value) এবং দাম (Price) শব্দ দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। **যখন দুটি দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় হয়, তখন সেই বিনিময় হারকে মূল্য বলা হয়। কিন্তু যখন অর্থের সঙ্গে কোন একটি দ্রব্যের বিনিময় হয়, তখন সেই বিনিময় হারকে দাম বলা হয়।** ধরা যাক, X এবং Y নামক দুটি দ্রব্যের মধ্যে সরাসরিভাবে বিনিময় হচ্ছে। ধরা যাক ১০টি X-দ্রব্যের বিনিময়ে ৫টি Y-দ্রব্য পাওয়া যায়। তাহলে ১টি X-এর বিনিময়ে $\frac{৫}{১০}=\frac{১}{২}$টি Y-দ্রব্য পাওয়া যাবে। অন্যভাবে বলা যায়, ৫টি Y দিয়ে ১০টি X, অর্থাৎ ১টি Y দিয়ে দুটি X পাওয়া যাবে। এখানে ১/২ বা ২ হল মূল্য। মূল্য হল দুটি দ্রব্যের বস্তুগত পরিমাণের অনুপাত। X ও Y-এর ক্ষেত্রে এই অনুপাতকে X/Y কিংবা Y/X হিসাবে প্রকাশ করা যায়। এখন প্রশ্ন X/Y কোন্ দ্রব্যের এবং Y/X কোন্ দ্রব্যের মূল্য ?

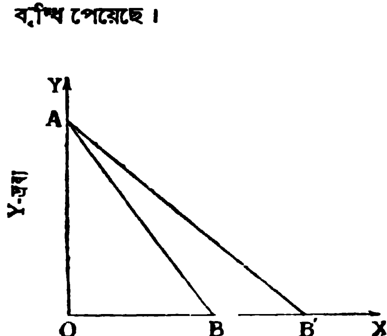


২.১ রেখাচিত্র : X-দ্রব্যের মূল্য

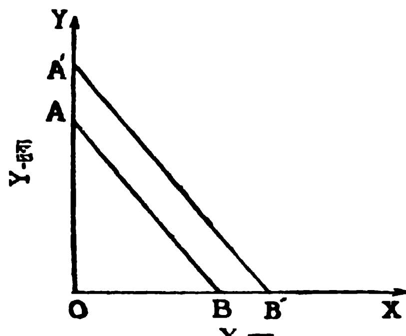
X/Y অনুপাতের লব X এবং হর Y। একে আমরা X-দ্রব্যের হিসাবে Y-দ্রব্যের মূল্য বলতে পারি, তাহলে সেটা হবে লব-দ্রব্যের হিসাবে হর-দ্রব্যের মূল্য। অনুরূপভাবে Y X হবে Y-দ্রব্যের হিসাবে X-এর মূল্য। রেখাচিত্রের সাহায্যে মূল্যের ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক, আমরা X ও Y নামক দুটি দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করছি। রেখাচিত্রের OX-অক্ষে X-দ্রব্য এবং OY-অক্ষে Y-দ্রব্য পরিমাপ করা হচ্ছে। ধরা যাক, OA পরিমাণ Y-দ্রব্যের সঙ্গে OB পরিমাণ X-দ্রব্যের বিনিময় হয়।

এই বিনিময় হার হল OA/OB অথবা OB/OA. এখানে OA/OB হল Y/X অর্থাৎ Y-দ্রব্যের হিসাবে X-দ্রব্যের মূল্য এবং OB/OA = X/Y অর্থাৎ X-দ্রব্যের হিসাবে Y-দ্রব্যের মূল্য। এখানে OA/OB = AB রেখার ঢাল। তাহলে আমরা বলতে পারি, AB নামক সরলরেখার ঢাল হল Y-দ্রব্যের হিসাবে X-দ্রব্যের মূল্য। AB রেখার উপর C কিংবা D কিংবা অন্য যে-কোন বিন্দুতে এই রেখার ঢাল সমান। কাজেই X-দ্রব্যের মূল্যও সর্বত্র সমান থাকবে।

এবার ধরা যাক OA পরিমাণ Y এর বিনিময়ে OB′ পরিমাণ X পাওয়া যায় (২.২ নং চিত্র)। তাহলে দেখা যাবে Y-এর পরিমাণ আগের সমান (OA) আছে কিন্তু সেই OA পরিমাণ Y পেতে এখন বেশি X (OB′ > OB) দিতে হচ্ছে। তাহলে X দ্রব্যের মূল্য কমে গেল বলা যায়। এখানে OA/OB′ হল Y-দ্রব্যের হিসাবে X-দ্রব্যের মূল্য। যেহেতু OA/OB অপেক্ষা OA/OB′ ছোট, কাজেই আমবা বলতে পারি যে AB′ রেখার ঢাল AB রেখার ঢালের চেয়ে কম। কাজেই X-দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পেয়েছে। বিপরীতক্রমে Y-দ্রব্যের মূল্য (X-দ্রব্যের হিসাবে) বৃদ্ধি পেয়েছে।



২.২ রেখাচিত্র : X-দ্রব্যের মূল্য হ্রাস



২.৩ রেখাচিত্র : X ও Y-দ্রব্যের সমানুপাতিক মূল্য হ্রাস

এবার ধরা যাক (২.৩ নং চিত্র) OA′ পরিমাণ Y-এর সঙ্গে OB′ পরিমাণ X-এর বিনিময় হয়। ধরা যাক A B′ রেখাটি AB রেখার সমান্তরাল। অতএব AB রেখার ঢাল ও A′B′ রেখার ঢাল পরস্পর সমান হবে। আগে X-এর মূল্য ছিল OA/OB, এখন হবে OA′/OB′ কিন্তু OA′/OB′ = OA/OB. অতএব X-এর মূল্যের (এবং Y-এর মূল্যের) কোন পরিবর্তন হবে না। অথবা বলা যায়, X এবং Y উভয়ের মূল্যই সমান হারে কমবে। কাজেই তাদের আনুপাতিক বা আপেক্ষিক মূল্য সমান থাকবে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, **মূল্য রেখার সমান্তরাল অপসরণ ঘটলে আপেক্ষিক মূল্যের কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু অসমান্তরাল অপসরণ ঘটলে আপেক্ষিক মূল্যের পরিবর্তন হয়।**

(খ) দাম ও দামের পরিবর্তন : অর্থ ও দ্রব্যের বিনিময় হারকে দাম বলা হয়। যদি ২টি কাপড় পেতে হলে ১০০ টাকার অর্থ দিতে হয়, তাহলে ১টি কাপড়ের জন্য ১০০ ÷ ২ = ৫০ টাকার অর্থ দিতে হবে। ধরা যাক M = অর্থ, X = X-একক X-দ্রব্য। তাহলে অর্থের হিসাবে X-এর দাম হবে M/X. ধরি Px = X-দ্রব্যের দাম, তাহলে পাই $Px = M/X$. অনুরূপভাবে $Py = M/Y$. তাহলে $Px/Py = \frac{M}{X} \div \frac{M}{Y}$

$= \frac{M}{X} \times \frac{Y}{M} = \frac{Y}{X}$ = Y-দ্রব্যের হিসাবে X-দ্রব্যের মূল্য। অতএব $Px/Py = Y$ দ্রব্যের হিসাবে X-দ্রব্যের মূল্য (Y/X)। অনুরূপভাবে $Py/Px = X/Y$ = X-দ্রব্যের হিসাবে Y-দ্রব্যের মূল্য। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, **দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত হল দ্রব্য দুটির বিনিময় হার বা মূল্য। এই অনুপাতকে আপেক্ষিক দাম (Relative Price) বা বস্তুগত দাম (Real Price) বলা হয়।**

আমরা দেখলাম $Px = M/X$ এবং $Py = M/Y$. ধরা যাক M স্থির, কিন্তু X বেড়েছে। তাহলে সমান পরিমাণ M দিয়ে আগের থেকে বেশী X পাওয়া যাচ্ছে। অতএব Px কমেছে বলা যায়। অনুরূপভাবে সমান পরিমাণ M দিয়ে বেশি পরিমাণ Y পাওয়া গেলে M/Y কমবে, অর্থাৎ Py কমবে। বিপরীতক্রমে, M যদি স্থির থাকে কিন্তু X কমে, তাহলে M/X বাড়বে, অর্থাৎ Px বাড়বে। অনুরূপভাবে M স্থির থেকে Y কমলে Py বাড়বে।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, Px ও Py কমলে বা বাড়লে আপেক্ষিক দামের কী পরিবর্তন হবে?

উত্তরে বলা যায় যে Px ও Py-এর পরিবর্তন হলে আপেক্ষিক দামের (Px/Py অথবা Py/Px) কীরূপ পরিবর্তন হবে সেটা Px এবং Py-এর পরিবর্তনের হারের উপর নির্ভর করবে। আমরা বলতে পারি—

(১) যদি Px ও Py সমান হারে বাড়ে বা কমে তাহলে Px/Py স্থির থাকবে ;

(২) যদি Px বেশি হারে এবং Py কম হারে বাড়ে তাহলে Px/Py বাড়বে এবং Py/Px কমবে ;

(৩) যদি Px কম হারে এবং Py বেশি হারে বাড়ে তাহলে Px/Py কমবে এবং Py/Px বাড়বে।

(গ) অর্থের মূল্য (Value of Money) ও তার পরিবর্তন : অর্থের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় হলে **এক একক অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণে কোন দ্রব্য পাওয়া যায় সেই দ্রব্যের পরিমাণই হল অর্থের মূল্য।** অতএব অর্থের মূল্য কোন দ্রব্যের হিসাবে প্রকাশিত হয়। ধরা যাক ১০০ টাকার অর্থের বিনিময়ে ২টি কাপড় পাওয়া যায়। তাহলে ১ টাকায় পাওয়া যাবে ২/১০০ = $\frac{1}{50}$ টি কাপড়। এটাই হল কাপড়ের হিসাবে অর্থের মূল্য। আমরা যদি P পরিমাণ অর্থ দিয়ে 1টি দ্রব্য পাই, তাহলে এক একক অর্থ দিয়ে পাব 1/P পরিমাণ দ্রব্য। অতএব অর্থের মূল্য = ১/দাম (দামের অন্যোন্যক)

আমরা পেয়েছি $P_x = M/X$.

$$\text{অতএব } 1/P_x = 1/\frac{M}{X} = \frac{X}{M} = \frac{\text{X-এর হিসাবে}}{\text{এক একক M-এর মূল্য}} \text{।}$$

$$\text{অনুরূপভাবে } 1/Py = \frac{Y}{M} = \text{Y-এর হিসাবে অর্থের মূল্য।}$$

এখন বাজারে যদি n-সংখ্যক দ্রব্য থাকে যাদের দাম যথাক্রমে $P_1, P_2, \cdots P_n$ এবং যার গড় হল $P=(P_1+P_2+\cdots+P_n)/n$, তাহলে P হবে দামস্তর (Price level) এবং $\frac{1}{P}$ হবে যে-কোন দ্রব্যের হিসাবে অর্থের মূল্য। একে অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা (Purchasing power of money) বলা হয়। চলতি কথায় একেই আমরা "টাকার দাম' বলে থাকি। অনেকেই বলে—টাকার দাম কমেছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, "টাকার দাম কমেছে" এই কথাটি অর্থহীন, কারণ দাম হল অর্থের হিসাবে দ্রব্যের বিনিময় হার। অর্থের সঙ্গে অর্থের বিনিময় হয় না। হলেও সেই বিনিময় হার সব সময় সমান থাকবে। দশ টাকার খুচরো চাইলে লোকে দশ টাকার বেশি বা কম দেয় না (ভুল করলে আলাদা কথা)। কাজেই ১০ টাকার বিনিময়ে ১০ টাকা, অর্থাৎ ১ টাকার বিনিময়ে ১ টাকাই পাওয়া যায়। আমরা বলতে পারি—টাকার দাম সকল সময় একই থাকে, কখনো বাড়তে বা কমতে পারে না। কিন্তু অর্থের মূল্যের পরিবর্তন হয়। কীভাবে হয় দেখা যাক।

অর্থের মূল্য = ১ / দামস্তর = $1/P$. এখানে $P=(P_1+P_2+P_3+P_n)/n$. ধরা যাক সকল দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ আগে দামগুলি ছিল $P_1, P_2, P_3 \cdots P_n$; এখন হয়েছে $2P_1, 2P_2, \ldots 2P_n$. এখন নতুন দামগুলির গড় হবে $(2P_1+2P_2+\ldots 2P_n)/n=2(P_1+P_2+\ldots+P_n)n=2P$. অতএব সকল দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ হলে দামস্তরও দ্বিগুণ হয়। আমরা বলতে পারি—**সকল দ্রব্যের দাম যতগুণ বৃদ্ধি পায়, দামস্তরও ততগুণ বৃদ্ধি পায়।**

কিন্তু দামস্তর P থেকে বেড়ে 2P হলে অর্থের মূল্য $1/P$ থেকে কমে $1/2P$ হবে। ($1/2P < 1/P$) অর্থাৎ **দামস্তর বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য বা ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। বিপরীতপক্ষে, দামস্তর হ্রাস পেলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ দামস্তর** ও অর্থের মূল্য পরস্পর বিপরীত মুখে পরিবর্তিত হয়।

এখন দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই অর্থের মূল্য কমছে। যারা বলে "টাকার দাম কমছে", তারা বলতে চায় যে "অর্থের মূল্য কমছে।"

(ঘ) মূল্য ও দামের পার্থক্য :

আমরা মূল্য ও দামের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি করতে পারি :

১। মূল্য প্রকাশিত হয় দ্রব্যের হিসাবে, কিন্তু দাম প্রকাশিত হয় অর্থের হিসাবে।

২। দুটি দ্রব্যের মধ্যে যে হারে বিনিময় হয় সেই বিনিময় হারকে মূল্য বলা হয়। একটি দ্রব্যের সঙ্গে অর্থের বিনিময় হলে সেই বিনিময় হারকে দাম বলা হয়।

৩। মূল্যের ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের মূল্য অন্য দ্রব্যের হিসাবে প্রকাশিত হবে; **কিন্তু দামের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দ্রব্যটির দাম অর্থের হিসাবে প্রকাশিত হবে। মূল্যের ক্ষেত্রে সম্পর্কটি দ্বিমুখী, কিন্তু দামের ক্ষেত্রে একমুখী।**

৪। কোন দ্রব্যের মূল্য ও দাম দুটোই হতে পারে, কিন্তু অর্থের ক্ষেত্রে শুধু মূল্য হয়। অর্থের দাম সব সময় একক।

৫। দ্রব্যের দাম বাড়লে অর্থের মূল্য কমে এবং দাম কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে। কিন্তু অর্থের দাম স্থির থাকে। অর্থাৎ অর্থের মূল্য = $\frac{১}{\text{দ্রব্যের দাম}}$। মূল্য ও দামের সম্পর্কটি হল অন্যোন্যক (Reciprocal) সম্পর্ক।

২.২. দাম কীভাবে নির্ধারিত হয় ? :

মানুষ যে সমস্ত দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে বা ব্যবহার করে সেগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায় যথা—(ক) প্রাকৃতিক দ্রব্য এবং (খ) অর্থনৈতিক দ্রব্য। প্রাকৃতিক দ্রব্যের বৈশিষ্ট্য হল—১। এগুলো মানুষের তৈরি নয়, ২। এগুলোর যোগান প্রচুর, কাজেই ৩। এদের জন্য কোন দাম দিতে হয় না। অপরপক্ষে, অর্থনৈতিক দ্রব্যগুলো ১। মানুষের তৈরি, ২। অপ্রচুর এবং কাজেই ৩। এদের পেতে গেলে দাম দিতে হয়। দাম কীভাবে নির্ধারিত হয় এই প্রশ্নটি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক দ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়।

অর্থনৈতিক দ্রব্যের দুটো বৈশিষ্ট্য হল ১। উপযোগ এবং ২। দুষ্প্রাপ্যতা। **উপযোগ হল দ্রব্যের অভাবপূরণ করার ক্ষমতা।** আমরা জল পান করি। জল আমাদের তৃষ্ণা দূর করে। এটা জলের ক্ষমতা। একেই উপযোগ বলা হয়। তেমনি ভাত আমাদের ক্ষুধা বা খাওয়ার অভাব পূরণ করে। সেইজন্য ভাতের উপযোগ আছে। উপযোগ দ্রব্যের মধ্যে থাকলেও ভোগকারী মানুষ নিজের মন, বুদ্ধি বা চেতনা দিয়ে সেই উপযোগকে গ্রহণ করে। উপযোগ হল বস্তুগত গুণ ও মনোগত উপলব্ধির মিলনে সৃষ্ট এক অপূর্ব ব্যাপার। মানুষ যখন কোন দ্রব্য ভোগ করতে চায়, তখন বুঝতে হবে সে তার উপযোগ গ্রহণ করতে চাইছে। দ্রব্যের উপযোগ আছে বলেই দ্রব্যের চাহিদা আছে। **চাহিদার মধ্যে উপযোগ অন্তর্নিহিত থাকে।** চাহিদাকে যদি নারকেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে উপযোগ হবে সেই নারকেলের শাঁস। চাহিদার নারকেলকে ভাঙলে বেরিয়ে আসবে উপযোগ শাঁস।

আগে অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন যে, দ্রব্যের দাম তার অন্তর্নিহিত উপযোগ দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে দ্রব্যের উপযোগ বেশি, তার দামও বেশি। যার উপযোগ কম, তার দাম কম। একটা বই-এর জন্য আমরা ১০০ টাকা খরচ করি, কিন্তু একটা কলমের জন্য হয়তো ১০ টাকা খরচ করি। এর কারণ, একটা বই-এর উপযোগ একটা কলমের উপযোগের চেয়ে ১০ গুণ বেশি। **দ্রব্যের দাম নির্ভর করে তার উপযোগের উপর।**

যে দ্রব্যের উপযোগ বেশি, তার দাম বেশি। যার উপযোগ কম, তার দাম কম। এতদূর পর্যন্ত বেশ এগোন যায়। ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথও যখন মূল্যতত্ত্ব নিয়ে ভাবছিলেন, তখন এতদূর অবধি বেশ ভালই বুঝতে পেরেছিলেন।

তারপরেই তাঁর চোখে পড়ল—জলের উপযোগ কত বেশি, কিন্তু, কী আশ্চর্য, জলের কোন দাম নেই। আরো বিস্ময়ের ব্যাপার—হীরার বিশেষ কোন উপযোগ নেই, অথচ তার দাম কত বেশি। তিনি ধাঁধায় পড়লেন। এই ধাঁধাটাকে ইংরেজিতে **Water-Diamond Paradox** বলা হয়। বাংলায় জল ও হীরার ধাঁধা বললেও বোঝা যায়।

এই ধাঁধা থেকে একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে যে, দ্রব্যের দামের সঙ্গে উপযোগের সম্পর্ক সবক্ষেত্রেই থাকবে এমন কথা বলা যায় না। যাঁরা বলেন—দ্রব্যের দাম উপযোগের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাঁরা বলেন—দ্রব্যের দাম চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয়। উপযোগ থেকেই চাহিদার উদ্ভব হয়। দ্রব্যের দাম উপযোগ দ্বারা নির্ধারিত হয় বললে বোঝায়, দ্রব্যের দাম চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু জল বা হীরার ক্ষেত্রে এটা খাটে না। অর্থাৎ দ্রব্যের দাম চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয় না।

তাহলে আর একটি উত্তর হল যে, দ্রব্যের দাম দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। যে দ্রব্য যত বেশি দুষ্প্রাপ্য (যেমন, হীরা) তার দাম তত বেশি; যে দ্রব্য যত প্রচুর (কম দুষ্প্রাপ্য যেমন, জল) তার দাম তত কম। কিন্তু দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা হল দ্রব্যের যোগানের দিক। কোন দ্রব্য দুষ্প্রাপ্য বলতে বোঝায় যে, সেই দ্রব্যটি সংগ্রহ করতে বা উৎপাদন করতে বেশি কষ্ট হয়, কিংবা বেশি ব্যয় হয়। অতএব, যে দ্রব্যটি সংগ্রহ করতে বেশি কষ্ট, বেশি ব্যয় হয়, তার দাম বেশি হবেই—এতে সন্দেহ নেই। কিংবা, যে দ্রব্য উৎপাদন করতে ব্যয় বেশি, তার দাম বেশি না হলে সেই দ্রব্যটি কেউ উৎপাদন করে বাজারে যোগান দেবে না। যেমন, একটি কাপড় তৈরি করতে যদি ১৫ টাকা খরচ হয়, তাহলে সেই কাপড়ের দাম ১৫ টাকার কম হলে কোন লোক কাপড় তৈরি করতে চাইবে না। কাপড়ের যোগানও হবে না। যোগান-দাম না পেলে কেউ যোগান দেয় না। কাপড়ের ক্ষেত্রে যোগান-দাম হল ১৫ টাকা। এখন যদি দুটো কাপড় তৈরি করা হয় তাহলে মোট খরচ কত হবে? সেটা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করবে। সব কিছু না জানলে বলা যাবে না। তবে আমরা ধরে নিতে পারি যে, দুটো কাপড়ের উৎপাদনের খরচ ৩২ টাকা। অর্থাৎ দুটো কাপড়ের যোগান-দাম ৩২ টাকা। একটার দাম ১৬ টাকা। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, উৎপাদন বাড়লে উৎপাদনের ব্যয়ও বেড়ে যায়।

তাহলে যোগান নির্ভর করে যোগান-দামের উপর। যোগান-দাম উৎপাদনের ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। অতএব, দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় যোগানের দ্বারা, কিংবা উৎপাদন ব্যয় দ্বারা। হীরার দাম বেশি, কারণ হীরা-উৎপাদন করার বা হীরা সংগ্রহ করার ব্যয় বেশি। যার উৎপাদন-ব্যয় বেশি তার দাম বেশি।

অর্থনীতিবিদ্ মার্শাল মনে করেন, দ্রব্যের দাম শুধুমাত্র উপযোগ কিংবা শুধুমাত্র দুষ্প্রাপ্যতা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। দাম নির্ধারিত হয় উপযোগ ও দুষ্প্রাপ্যতা—

এই উভয় শক্তির দ্বারা। ব্যাপারটা যেন কাঁচির দুটো ফলা দিয়ে কাগজ কাটা। এখানে যে-কোন একটা ফলা কাগজটা কাটছে বললে ভুল বলা হয়। কাগজটা কাটছে দুটো ফলাই। এক সঙ্গে দুটো ফলাই চলছে। তেমনি দাম কেবলমাত্র চাহিদার দ্বারা নির্ধারিত হয় বললে ভুল বলা হয়। দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগান এই দুটি শক্তির দ্বারা। যদি চাহিদা বেশি হয়, যোগান কম হয়, তাহলে দাম বেশি হবে। যদি চাহিদা কম ও যোগান বেশি হয়, তাহলে দাম কম হবে। এগুলো বোঝা যায়। সহজেই এরকম বলা যায়। কিন্তু চাহিদা বেশি ও যোগান বেশি হলে কী হবে? কিংবা চাহিদা কম ও যোগানও কম হলে কী হবে বলা সহজ নয়। আমরা এগুলো পরে আলোচনা করব।

২.৩. উপযোগ : মোট ও প্রান্তিক উপযোগ :

কোন দ্রব্য বা সেবার ব্যবহার বা ভোগ থেকে যে তৃপ্তি পাওয়া যায় তাকে **উপযোগ** বলা হয়। উপযোগ হল একটি মানসিক ব্যাপার। কোন মাপকাঠি দিয়ে উপযোগ মাপা যায় না। কিন্তু তা বললেও চলে না। আমরা উপযোগ অনুসারে দ্রব্যের দাম দিচ্ছি, অথচ উপযোগ মাপতে পারছি না - এটা কী করে হয়? অর্থনীতিবিদরা বলেন, আমরা যখন কোন দ্রব্যের জন্য খুব বেশি দাম দিই না, ঠিক যা দাম দেওয়া উচিত তাই দিই, তাহলে বুঝতে হবে—নিশ্চয়ই আমাদের মাথার মধ্যে, মনে কিংবা কোথাও না কোথাও উপযোগ পরিমাপ করা হচ্ছে। উপযোগ মাপ করার একটা মানযন্ত্র আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু আমরা কী দিয়ে উপযোগ মাপি? ধরা যাক, অর্থ দিয়ে। অর্থ হল উপযোগ মাপার একটা মাপকাঠি। যে দ্রব্য থেকে বেশি উপযোগ পাই, তার জন্য বেশি অর্থ দিই। যে দ্রব্য থেকে কম উপযোগ পাই তার জন্য কম অর্থ দিই। অর্থ হল উপযোগের পরিমাপক ও সূচক। কিন্তু অর্থকে উপযোগের মাপকাঠি করলে অর্থের উপযোগকে অপরিবর্তনশীল হতে হবে। যে মিটার দিয়ে আমরা কাপড় মাপি সেই কাপড়ের দৈর্ঘ্য বেশি হতে পারে, আবার কম হতে পারে। কিন্তু এক মিটার সব সময় সমান থাকবে। যে রড দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপা হবে তার দৈর্ঘ্যের কোন হেরফের হবে না। কোন অর্থ দিয়ে যদি অন্য দ্রব্যের উপযোগ পরিমাপ করা হয়, তাহলে অর্থের উপযোগের কোন হেরফের হবে না। আমরা ধরে নিই যে, অর্থের উপযোগ চিরস্থির।

কোন্ দ্রব্য থেকে কত উপযোগ পাওয়া যায় তা অর্থের হিসেবে পরিমাপ ও প্রকাশ করা যেতে পারে। এখন আমরা মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ—এই শব্দগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব। ধরে নিই, কোন লোক ১টা লেবু থেকে ১ টাকার উপযোগ পেল। আর একটা লেবু থেকে পেল ৭৫ পয়সার উপযোগ। তাহলে দুটো লেবু থেকে মোট উপযোগ হল ১ টাকা ৭৫ পয়সা। তেমনি প্রথম একটি কাপড়ের উপযোগ যদি ১৫ টা., দ্বিতীয় কাপড়ের ১২ টা., তৃতীয়ের ১০ টা. হয়, তাহলে মোট উপযোগ হবে (১৫ + ১২ + ১০ টাকা) = ৩৭ টাকা। অতএব কোন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয় করে ভোগ

করলে সেই দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে যে উপযোগ পাওয়া যায় তাদের যোগফল হল মোট উপযোগ। প্রান্তিক উপযোগ বোঝাবার জন্য আমরা আবার একটা উদাহরণ নিই। ধরি, একজন ক্রেতা পর পর কাপড় কিনছে ও ভোগ করছে এবং প্রত্যেকটা কাপড় থেকে সে যত উপযোগ পাচ্ছে তা নীচের তালিকায় দেওয়া হল—

কাপড়ের পরিমাণ	প্রান্তিক উপযোগ (টাকার অঙ্কে)	মোট উপযোগ
প্রথম	৫	৫
দ্বিতীয়	৪	৯
তৃতীয়	৩	১২
চতুর্থ	২	১৪
পঞ্চম	১	১৫
ষষ্ঠ	০	১৫
সপ্তম	−১	১৪
অষ্টম	−২	১২
নবম	−৩	৯
দশম	−৪	৫

এই তালিকাটি কাল্পনিক হলেও এর সাহায্যে প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে এবং প্রান্তিক উপযোগের সঙ্গে মোট উপযোগের কী সম্পর্ক তা আমরা সহজেই বুঝতে পারব। এবার তালিকার উপর চোখ রাখি।

দেখা যাচ্ছে—ক্রেতা প্রথম কাপড় থেকে ৫ টাকার উপযোগ পাচ্ছে। দ্বিতীয় কাপড় থেকে পাচ্ছে ৪ টাকার উপযোগ। তাহলে প্রথম দুটো কাপড় থেকে পাচ্ছে ৯ টাকার উপযোগ। এই ৯ টাকার উপযোগ হল প্রথম দুটি কাপড় থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ। এরূপভাবে প্রথম ১টি, ২টি, ৩টি, ৪টি ইত্যাদি কাপড় থেকে মোট কত উপযোগ পাওয়া যায় সেটা উপরের তালিকায় ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ইত্যাদি সারের ডান দিকে দেখান হয়েছে।

এবার প্রান্তিক উপযোগের কথা বলা যাক। প্রান্তিক উপযোগ বলতে বোঝায় মোট উপযোগের বৃদ্ধি বা হ্রাস। মোট উপযোগ বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ হবে ধনাত্মক; মোট উপযোগ কমলে হবে ঋণাত্মক। কিন্তু মোট উপযোগ বাড়ে বা কমে কেন? দ্রব্যের

ভোগ বাড়লেই মোট উপযোগ বাড়ে বা কমে। তাহলে আমরা বলতে পারি—**ক্রেতার ভোগের পরিমাণ অতিরিক্ত এক একক বৃদ্ধি পেলে তার মোট উপযোগ যে পরিমাণে বাড়ে বা কমে তাকেই প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়।** পূর্ব পৃষ্ঠার তালিকায় ক্রেতার ভোগ এক একক কাপড় থেকে বেড়ে দুই একক হলে তার মোট উপযোগ ৫ টাকা থেকে বেড়ে ৯ টাকা হয়। অতএব দ্বিতীয় একক কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ ৪ টাকা। তেমনি তৃতীয় কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ = প্রথম তিনটি কাপড়ের মোট উপযোগ − প্রথম দুটি কাপড়ের মোট উপযোগ = ১২ টাকা − ৯ টাকা = ৩ টাকা। এইভাবে বলা যায়—

n-তম দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ =

প্রথম *n*-সংখ্যক দ্রব্যের ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ − প্রথম $(n-1)$ সংখ্যক দ্রব্যের ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ।

আরো স্পষ্ট করার জন্য বলা যেতে পারে—দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগ দ্রব্যের ভোগের উপর নির্ভর করে। এই নির্ভরতাকে আমরা অপেক্ষক বা function বলি। যেমন, Y নামক কোন চলমান X-এর উপর নির্ভর করে। আমরা লিখি $Y=f(X)$. এখানে u = উপযোগ এবং q = দ্রব্যের ভোগের পরিমাণ লিখলে আমরা পাই—u নির্ভর করে q-এর উপর। অর্থাৎ $u=f(q)$. এটা হল মোট উপযোগ অপেক্ষক।

এই অপেক্ষক থেকে আমরা পাই—যদি q বাড়ে তাহলে u বাড়বে। ধরি q বাড়ে dq পরিমাণে (d = পরিবর্তন, অর্থাৎ হ্রাস বা বৃদ্ধি) তাহলে ধরি, u বাড়ে du পরিমাণে। তাহলে আমরা পাই—

q যখন dq একক বাড়ে, তখন u বাড়ে du পরিমাণে।

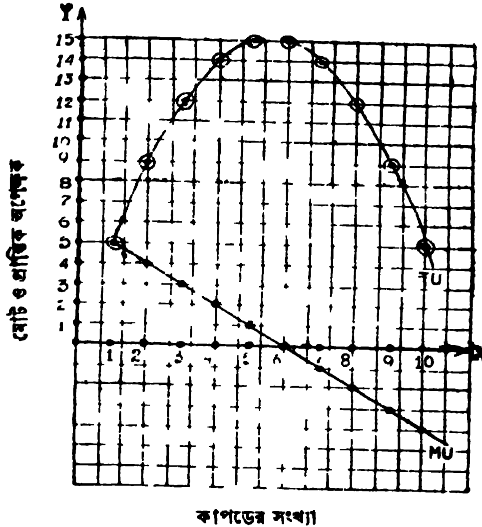
অতএব q " 1 " " " " " $\frac{du}{dq}$ "।

এই $\frac{du}{dq}$ হল প্রান্তিক উপযোগ। কিন্তু অংকে $\frac{du}{dq}$-কে বলা হয় q বৃদ্ধির উত্তরে u বৃদ্ধির হার, কিংবা, q-এর বৃদ্ধির উত্তরে u-এর পরিবর্তনের হার। অতএব **প্রান্তিক উপযোগ হল মোট উপযোগের পরিমাণের পরিবর্তনের হার।** ইংরেজীতে বলা যায় **Marginal utility is the rate of change of total utility.**

এবার প্রান্তিক উপযোগ ও মোট উপযোগের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। উপযোগ যেহেতু মূলত একটি উপলব্ধির বিষয়, অতএব আমাদের ভেবে দেখতে হবে মোট উপযোগ বাড়লে প্রান্তিক উপযোগ বাড়ে না কমে। আমরা যেহেতু একটির পর আর একটি—এমনি করে কোন দ্রব্য ভোগ করি—এক সঙ্গে কোন দ্রব্যের সবগুলো ভোগ করি না,—অতএব মোট উপযোগের আগে ক্রেতা প্রান্তিক উপযোগের

উপলব্ধি পায়—অর্থাৎ প্রান্তিক উপযোগ থেকে মোট উপযোগের পরিবর্তন ঘটে, উল্টোভাবে নয়। এই কথাটি মনে রেখেই আমরা আবার ২১ পৃষ্ঠার তালিকাটির দিকে তাকাব।

এই তালিকায় দেখা যাচ্ছে কাপড়ের ভোগ বা ব্যবহার যত বাড়ছে, কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ (২নং স্তম্ভে) ততই কমছে। এর কারণ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি। কোন মানুষ যতই কোন দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি করে ততই তার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। আমাদের তালিকায় প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেতে পেতে ৬নং কাপড়ে এসে



২.৪ রেখাচিত্র : মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ

শূন্য হয়ে গেছে। অর্থাৎ ষষ্ঠ কাপড়টি পরে ক্রেতা কোন অতিরিক্ত তৃপ্তি পাচ্ছে না। কিন্তু সপ্তম কাপড়ের ক্ষেত্রে তার তৃপ্তি তো হচ্ছেই না উপরন্তু অতৃপ্তি (অনুপযোগ) হচ্ছে। অতৃপ্তিকে ঋণাত্মক প্রান্তিক উপযোগ বলা হয়। ৬নং কাপড়ের পরে যত নীচের দিকে যাওয়া যাচ্ছে, ততই তার প্রান্তিক অনুপযোগ বাড়ছে। এবার মোট উপযোগ স্তম্ভের দিকে তাকালে দেখা যায় মোট উপযোগ প্রথমে বাড়ছে। ৬নং কাপড়ে মোট উপযোগ সর্বাধিক (১৫ টাকা) এবং তারপর কমছে। আবার প্রান্তিক উপযোগ কমলেই মোট উপযোগ কমে না, বরং বাড়তে থাকে। আমরা পাই (১) প্রান্তিক উপযোগ যতক্ষণ পর্যন্ত ধনাত্মক থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মোট উপযোগ বাড়ে (২) যেখানে মোট উপযোগ সর্বাধিক সেখানেই প্রান্তিক উপযোগ শূন্য এবং (৩) মোট উপযোগ যখন কমে প্রান্তিক উপযোগ তখন ঋণাত্মক হয়। প্রান্তিক ও মোট উপযোগের এই সম্পর্ক রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়। আমাদের ২.৪নং রেখাচিত্রে এটা দেখানো

হয়েছে। ২.৪নং রেখাচিত্রের উপবের অংশে মোট উপযোগ TU ও তার নীচে প্রান্তিক উপযোগ MU রেখা আঁকা হয়েছে। কাপড়ের পরিমাণ ১ থেকে বেড়ে ৬ হলে মোট উপযোগ ৫ থেকে বেড়ে ১৫ হয়। ১৫ই হল সর্বাধিক মোট উপযোগ। এর বাঁদিকে মোট উপযোগ রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী। কাপড়ের পরিমাণ ৬ থেকে বাড়লে মোট উপযোগ কমতে থাকে এবং মোট উপযোগ রেখাটি নিম্নমুখী হয়।

আবার, প্রান্তিক উপযোগ রেখার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় ৬নং কাপড়ের মোট উপযোগ যখন সর্বাধিক, তখন প্রান্তিক উপযোগ শূন্য। যে বিন্দুতে মোট উপযোগ রেখাটি শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছায়, সেই বিন্দুর নীচে প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি OX-অক্ষকে ছেদ করেছে। এরপর মোট উপযোগ রেখাটি যখন নিম্নমুখী হয়েছে, তার নীচে দেখা যাচ্ছে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে গেছে। অতএব আমরা পাই -

(ক) প্রান্তিক উপযোগ যতক্ষণ ধনাত্মক থাকে, ততক্ষণ মোট উপযোগ বাড়তে থাকে এবং মোট উপযোগ রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হয় ;

(খ) মোট উপযোগ যেখানে সর্বাধিক, অর্থাৎ মোট উপযোগ রেখা যেখানে শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছায়, সেখানে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয় এবং

(গ) মোট উপযোগ কমলে অর্থাৎ মোট উপযোগ রেখা নিম্নমুখী হলে প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়।

২.৪. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি :

অধ্যাপক মার্শাল সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি রচনা করেন। কোন বিষয়কে বিধি হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য কয়েকটি অনুধারণার আশ্রয় নিতে হয়। মার্শালও তাঁর ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিকে নিম্নলিখিত অনুধারণাগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন

ক. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির অনুধারণা :

(১) উপযোগ মূলতঃ মানসিক অনুভূতি হলেও উপযোগকে সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ করা যায় এবং বিভিন্ন 'পরিমাণ' উপযোগকে যোগ করা যায়। অর্থাৎ উপযোগ হল সংখ্যাগতভাবে পরিমাপযোগ্য ও যোগ করার উপযোগী বিষয় (Utility is cardinally measurable and it is additive) ;

(২) কোন দ্রব্যের উপযোগ কেবলমাত্র সেই দ্রব্যের পরিমাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে ; কোন একটি দ্রব্যের উপযোগ অন্য দ্রব্যের উপর নির্ভর করে না। অন্যভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ-অপেক্ষকগুলি পরস্পর নির্ভরশীল নয় (Utility functions are independent) ;

(৩) যে দ্রব্যের উপযোগের কথা বলা হচ্ছে সেই দ্রব্যটি সম্পূর্ণরূপে ও সূক্ষ্মরূপে বিভাজ্য (The Commodity under consideration is perfectly and finely divisible) ;

(৪) যে ব্যক্তি বা ভোগকারীর কথা আলোচনা করা হচ্ছে সেই ভোগকারী অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধির অধিকারী। কাজেই কোন দ্রব্যের ভোগ সামান্যতম পরিমাণে বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে ভোগকারীর উপযোগের কতটা পরিবর্তন হয়, সেই ক্রিয়াটি সে বুঝতে পারে এবং স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারে।

(৫) ভোগকারী হল বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। সে নিজের মঙ্গল বোঝে এবং সেই মঙ্গল সাধনের জন্য সর্বদা চেষ্টা করে।

(৬) শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে ভোগকারী হল স্বাভাবিক ও সুস্থবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। সে কোন দ্রব্য বেশি পরিমাণে ভোগ করলে তার উপযোগ বা তৃপ্তি বৃদ্ধি পায়। ভোগ কমলে তার উপযোগও কমে।

(৭) ভোগকারীর উপযোগ কেবলমাত্র ভোগকারীর নিজস্ব ভোগের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ একজন ভোগকারীর উপযোগ অন্য ভোগকারীর ভোগের উপর নির্ভর করে না।*

(৮) ভোগকারীর রুচি ও পছন্দ, দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ, উপযোগ গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যক্তিগত বিষয়ের কোন পরিবর্তন হয় না।

খ. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির বক্তব্য :

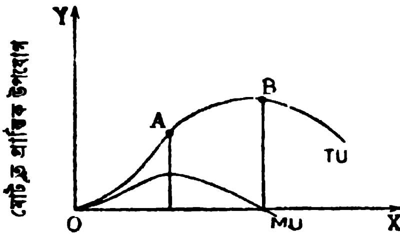
উপর্যুক্ত অনুধারণাগুলির ভিত্তিতে বলা যায় যে, দ্রব্যের ভোগ যতই বৃদ্ধি পায় ততই ভোগকারীর অতিরিক্ত উপযোগ বা প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে থাকে। অবশ্য প্রথম দিকে দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পেতে পারে; কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ পরিণামে (Eventually) ক্রমহ্রাসমান হয়। সেইজন্য এই বিধিকে **পরিণামে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি** বলা হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধিতে মোট উপযোগ কমে এমন কথা বলা হয় না। দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পেলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ পরিণামে হ্রাস পায়—একথাটাই বলা হয়—প্রান্তিক উপযোগ হল মোট উপযোগের বৃদ্ধি। অতএব, **কোন দ্রব্যের ভোগ বৃদ্ধি পেলে ভোগকারীর মোট উপযোগ যেভাবে ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় তাকেই ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি বলা হয়।**

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রদত্ত ২.৫ রেখাচিত্রে OX-অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ এবং OY-অক্ষে মোট উপযোগ TU

---

* মা ও সন্তানের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কাজ করে না। মায়ের তৃপ্তি সন্তানের ভোগের উপর নির্ভর করে। মা যদি কম খান, তবু সন্তান বেশি খেলে মায়ের উপযোগ বৃদ্ধি পায়। মায়ের যদি একখানা শাড়ি থাকে, অথচ মেয়ের পাঁচ-দশটা শাড়ি থাকে, তাহলে মায়ের তৃপ্তি বা আনন্দ বেশি হতে দেখা যায়। অবশ্য এরও ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

ও প্রান্তিক উপযোগ MU পরিমাপ করা হয়েছে। এই রেখাচিত্রে TU নামক রেখাটি মোট উপযোগ ও MU নামক রেখাটি প্রান্তিক উপযোগের পরিবর্তনের গতি সূচিত করে। রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, TU রেখাটি রেখাচিত্রের মূলবিন্দু (O) থেকে বেরিয়েছে এবং A বিন্দু পর্যন্ত OX-অক্ষের দিকে উত্তল (convex) ভাবে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। উত্তল অংশে মোট উপযোগ ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়, এর ফলে MU রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। A বিন্দুর পর B বিন্দু পর্যন্ত TU রেখাটি OX-অক্ষের দিকে অবতল (concave) হয়েছে। অবতল অংশে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। কাজেই এই অংশের নীচে অঙ্কিত MU রেখা নিম্নমুখী হয়েছে। অতএব A বিন্দু থেকেই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকরী হয়েছে। O বিন্দু থেকে A বিন্দু পর্যন্ত TU রেখাটি OX-অক্ষের দিকে উত্তল হয়েছে এবং A বিন্দুর পর অবতল হয়েছে। কাজেই A বিন্দুতে TU রেখার বক্রতার (curvature) দিক বদল হয়েছে। সেজন্য A বিন্দুকে "বাঁক বদলের বিন্দু" (Point of inflection) বলা হয়।



২.৫ রেখচিত্র : মোট ও প্রান্তিক উপযোগ রেখা

TU রেখাটি B বিন্দুতে সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয়েছে। এখানে মোট উপযোগ সর্বাধিক। B বিন্দুর ডান দিকে TU রেখাটি নিম্নমুখী হয়েছে। এখানে মোট উপযোগ হ্রাস পায়, কাজেই প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হয়। TU রেখার উপর A বিন্দু থেকে B বিন্দু পর্যন্ত প্রান্তিক উপযোগ ধনাত্মক থাকলেও ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে থাকে। এর ফলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু বৃদ্ধির পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে B বিন্দুতে অতিরিক্ত উপযোগ বা প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হয়। সেজন্য B বিন্দুর ঠিক নীচে MU রেখাটি OX-অক্ষকে ছেদ করে এবং তারপর ঋণাত্মক অংশে নেমে যায়। প্রান্তিক উপযোগ ঋণাত্মক হওয়ার অর্থ হল যে, ভোগকারী অতিরিক্ত এক একক পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করে কোন অতিরিক্ত তৃপ্তি বা উপযোগ তো পায়ই না, বরং তার অতৃপ্তি বা অনুপযোগ হতে থাকে। এই অতৃপ্তির জন্য তার আগের তৃপ্তি কিছুটা কমে যায়।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটিকে সাধারণ ভাষায় ব্যাখ্যা করলে বলা যায় যে-কোন ব্যক্তি যতই কোন একটি দ্রব্য ভোগ করতে থাকে ততই সেই দ্রব্যটি থেকে সে কম কম পরিমাণে তৃপ্তি পায়। সেই সঙ্গে দ্রব্যটি ভোগ করার ইচ্ছার তীব্রতাও ক্রমশঃ কমে আসতে থাকে, অবশেষে এমন একটি সময় আসে যখন সে সেই মুহূর্তে সেই দ্রব্যটি থেকে আর কোন বাড়তি তৃপ্তি বা উপযোগই পায় না। এই অবস্থায়

দ্রব্যটি ভোগ করার আর কোন ইচ্ছাই তাঁর মধ্যে থাকে না। এর পরেও যদি সে স্বেচ্ছায় বা অন্য কোন ব্যক্তির অনুরোধে বা অন্য কোন ভাবে সেই দ্রব্যটি আরো ভোগ করতে চায়, তাহলে তার তৃপ্তির বদলে অতৃপ্তি হয়। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই অবস্থায় দ্রব্যটির প্রতি তার আর কোন আকর্ষণ থাকে না। কোন একজন ক্ষুধার্ত ব্যক্তির খাদ্য ভোজনের দিকে নজর রাখলে এই বিষয়টি বোঝা যায়। এমনি সাধারণ অভিজ্ঞতাকেই অধ্যাপক মার্শাল বিধির আকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে এই বিধির কোন আত্মিক প্রমাণ নেই।

গ. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সীমাবদ্ধতা ঃ

অর্থনীতির অন্যান্য বিধির ন্যায় ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটিরও একাধিক সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়।

(১) **একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যেই এই বিধির কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ থাকে।** যখন কোন ব্যক্তি একটা খাওয়ার টেবিলে বসে কোন খাদ্যগ্রহণ করতে থাকে, তখন সেই সময়ের মধ্যেই অতিরিক্ত ডিশ খাবার থেকে সে কম পরিমাণে প্রান্তিক উপযোগ পায়। কিন্তু অন্যসময়ে সে আবার ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে এবং খাবারের প্রতি তার আকর্ষণ পূর্বের মতই তীব্র হতে পারে।

(২) **কোন একটি দ্রব্য ভোগের উপযোগ অন্য দ্রব্যের উপর নির্ভর করতে পারে।** সেক্ষেত্রে কোন একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা যায় না। চা, চিনি ও দুধ নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশিয়ে যে পানীয় চা প্রস্তুত হয়, তার প্রান্তিক উপযোগ বলতে চা, চিনি ও দুধের মিশ্রিত উপযোগ বোঝায়। এক্ষেত্রে চা কিংবা চিনি কিংবা শুধু মাত্র দুধের প্রান্তিক উপযোগ পৃথকভাবে শূন্য হতে পারে। অতএব পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি দ্রব্যের প্রতি এই বিধিকে প্রয়োগ করা যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।

(৩) **দুটি বিকল্প দ্রব্যের মধ্যে একটির ভোগ বৃদ্ধি পেলে অন্যটির প্রান্তিক উপযোগ প্রভাবিত হয়।** ভাত খেলে শুধু যে ভাতের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায় এমন নয়; ভাত খেলে রুটির প্রান্তিক উপযোগও হ্রাস পেতে পারে। অতএব কোন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ কেবলমাত্র সেই দ্রব্যের ভোগের উপর নির্ভর করে—ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির এই অনুধারণাটি ঠিক নয়।

(৪) **কোন ব্যক্তির তৃপ্তি বা উপযোগ অন্য ব্যক্তির ভোগের উপর নির্ভর করতে পারে।** অনেক সময় দেখা যায় যে, মা তাঁর খাবার সন্তানের মুখে তুলে দিচ্ছেন। এতে সন্তানের তৃপ্তি হয়। কিন্তু মায়ের খাবার কমলেও মায়ের তৃপ্তি কমে না, বরং বেড়ে যায়। ভোগ থেকে তৃপ্তি হয়—এই মৌল ধারণাটির অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। সাধুসন্ত ব্যক্তিরা ত্যাগের মধ্যেই বাসনার তৃপ্তি খুঁজে পান। এঁদের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হয় না।

(৫) এই বিধিতে ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটলেও বিস্তৃত সময়ের প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বলা যায় যে, মানুষের ভোগলালসার শেষ নেই। ধনদৌলত, ভোগসুখ, আর্থিক ক্ষমতা ইত্যাদির লালসা কি ক্রমশঃ হ্রাস পায়? আমাদের আচরণ এর বিপরীত ঘটনার সাক্ষ্য দেয়। **কাজেই এই বিধিটি মানুষের সাধারণ অর্থনৈতিক আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারে না।**

(৬) **ভোগকারীর কোন কু-অভ্যাস বা রুচিবিকৃতি দেখা দিলে এই বিধিটি কার্যকরী হয় না।** মাতালের কাছে মদের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পারে। অধিকাংশ মাদক দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই বিধি ভালোভাবে কাজ করে না। ভোগকারীর রুচিবিকৃতি ঘটলেও এই বিধির ব্যতিক্রম দেখা যায়। উদরাময়ের রোগী যত খায়, ততই খেতে চায়। কৃপণের অর্থলালসা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে থাকে। এমন কি বই পড়া, ছবি আঁকা, দেশভ্রমণ করা, সিনেমা দেখা ইত্যাদি বহু রকমের শখের ক্ষেত্রেও এই বিধির ব্যতিক্রম ঘটতে দেখা যায়। মিতাচারী ব্যক্তিরা বলেন—আহার, নিদ্রা ও আলস্যকেও নাকি যত বাড়ানো যায়, ততই বেড়ে যায়। এ রকম আরো অনেক ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির ব্যতিক্রম দেখা যায়।

(৭) এই বিধিতে ভোগকারীকে যেরকম সূক্ষ্মবুদ্ধির অধিকারী বলে ধরে নেওয়া হয়, অধিকাংশ ভোগকারীই সে রকম বুদ্ধিমান হয় না। কোন দ্রব্যের ভোগ বিন্দু পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে ভোগকারী ঠিক বুঝতে পারে না তার মোট উপযোগ কতখানি বৃদ্ধি পেল। সাধারণ ভোগকারীর কাছ থেকে এটা আশা করাও যায় না। কাজেই **এই বিধিটি অধিকাংশ সাধারণ ভোগকারীর প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে না।**

(৮) প্রান্তিক উপযোগের ধারণাটি ভোগ্যদ্রব্যগুলির বিভাজ্যতার উপর নির্ভরশীল। কোন ভোগ্যদ্রব্যকে যদি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায় এবং তার পরেও যদি সেই দ্রব্যটি ব্যবহারের উপযোগী থাকে তাহলে সেই দ্রব্যটিকে বিভাজ্য বলা হয়। কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের অধিকাংশ দ্রব্যই হল অবিভাজ্য (Indivisible)। তার মানে এই নয় যে, তাদেরকে ভাঙা যায় না, তার মানে হল এই যে, তাদেরকে ভাঙলে আর সেই দ্রব্য হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। কলম, ঘড়ি, ছাতা, জুতো, টুপি, জামা, ইলেকট্রিক ল্যাম্প, রেডিয়ো, টিভি, বাড়ি, গাড়ি—সবই তো অবিভাজ্য। অবিভাজ্য দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা সহজ নয়। কাজেই **অধিকাংশ ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রেই প্রান্তিক উপযোগের ধারণা প্রয়োগ করা যায় না।**

উপরে যে সীমাবদ্ধতাগুলির কথা বলা হল, সেগুলির অধিকাংশই হল এই বিধির অনুধারণা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতাগুলি এড়ানোর জন্য অনুধারণাগুলির আশ্রয় নেওয়া হয়।

২.৫ প্রান্তিক উপযোগ ও ক্রেতার ভারসাম্য :

ক্রেতা দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে ভোগ করার জন্য। আসলে দ্রব্য বা সেবার ভোগ থেকে ক্রেতার উপযোগ বা তৃপ্তি সৃষ্টি হয় বলেই সে দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করতে চায়। আমরা বলি ক্রেতা সর্বাধিক তৃপ্তি পেতে চায়। যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করলে ক্রেতার তৃপ্তি সর্বাধিক হয়, সে সেই পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করে। ক্রেতা এই পরিমাণের কোন পরিবর্তন করে না। একেই ক্রেতার ভারসাম্য বলা হয়। অতএব **কোন দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে ক্রেতা যখন সর্বাধিক তৃপ্তি পায় তখনই সে ভোগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য লাভ করে।** কোন একটি দ্রব্য বা সেবার ক্ষেত্রে ক্রেতা কীভাবে এই ভারসাম্য লাভ করে তা এখন আলোচনা করা যেতে পারে।

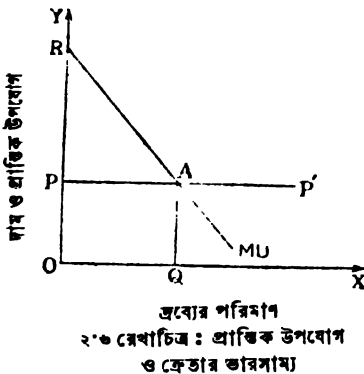
এখানে যে দ্রব্যের কথা বলা হচ্ছে সেটি নিশ্চয়ই একটি অর্থনৈতিক দ্রব্য—যার যোগান অপ্রচুর এবং যার দাম আছে। ক্রেতাকে এই দ্রব্য পেতে হলে দাম দিয়ে কিনতে হবে। দাম দেওয়া হয় অর্থে। অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগ নেই সত্য, কিন্তু অর্থ দিয়ে তো অন্য সব দ্রব্য সামগ্রী কেনা যায়। কাজেই অর্থের পরোক্ষ উপযোগ আছে। ক্রেতা যখন কোন দ্রব্য পাবার জন্য দাম দেয় তখন সে কিছুটা তৃপ্তি পায়, আবার কিছুটা তৃপ্তি তাকে ছেড়ে দিতে হয়। এখানে একটা যোগ-বিয়োগের ব্যাপার থাকে। দ্রব্য ক্রয় করে ভোগ করলে উপযোগ পাওয়া যায়। এটা যোগের দিক। আবার দ্রব্য ক্রয় করতে যে অর্থ দিতে হয়, এতে উপযোগ কমে। এটা বিয়োগের দিক। এখন ক্রেতা যদি দ্রব্য ভোগ করে বেশি উপযোগ পায় এবং তার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তার উপযোগ যদি কম হয় তাহলেই সে দ্রব্য ক্রয় করবে। না হলে ব্যাপারটিতে কোন লাভ থাকবে না, বরং ক্ষতিই থাকবে।

ক্রেতা যে উপযোগ পায় তা তক্ষণ পর্যন্ত প্রদত্ত অর্থের উপযোগের চেয়ে বেশি থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে দ্রব্য ক্রয় করতে থাকে। ক্রেতা যে বেশি উপযোগ পায়, তাকে আমরা শুধু উপযোগ না বলে নীট উপযোগ বলতে পারি। কোন দ্রব্যের কোন নির্দিষ্ট একক পরিমাণ ভোগ থেকে প্রাপ্ত নীট উপযোগ = সেই একক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ—দ্রব্যের দাম। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক। ধরে নিই কোন ক্রেতা ১টি কাপড় ব্যবহার করে ১৫ টাকার প্রান্তিক উপযোগ পায় ; কিন্তু সেই কাপড়ের দাম ১০ টাকা, তাহলে তার নীট উপযোগ হবে ১৫ — ১০ = ৫ টাকা। দ্বিতীয় কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ ধরি ১২ টাকা, তাহলে তার নীট উপযোগ হবে ১২ — ১০ = ২ টাকা। তৃতীয় কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ ধরি ১০ টাকা। তার নীট উপযোগ হবে ১০ - ১০ = ০। চতুর্থ কাপড়ের প্রান্তিক উপযোগ ৮ টাকা। এখানে ক্রেতার নীট উপযোগ হবে ৮ — ১০ = — ২ টাকা। নীট উপযোগ ঋণাত্মক হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য কোন বুদ্ধিমান ক্রেতা চতুর্থ কাপড় কিনবে না। কিন্তু কাপড়ের দাম যদি ৮ টাকা হয়, তাহলে সে কি কিনবে ? উত্তর হল—হ্যাঁ কিনবে। কারণ চতুর্থ কাপড় থেকে তার নীট উপযোগ শূন্য হলেও মোট নীট উপযোগ এখানেই সর্বাধিক হয়।

আমরা বলতে পারি যেখানে দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয় সেখানেই নীট উপযোগ সর্বাধিক হতে পারে। নীচের তালিকায় এটি দেখানো হল :

কাপড়	প্রান্তিক উপযোগ	দাম	প্রান্তিক নীট উপযোগ	মোট নীট উপযোগ
১	১৫	৮	৭	৭
২	১২	৮	৪	১১
৩	১০	৮	২	১৩
৪	৮	৮	০	১৩
৫	৬	৮	—২	১১
৬	৪	৮	--৪	৭

এখানে দেখা যাচ্ছে কাপড়ের দাম ৮ টাকা হলেই ক্রেতার নীট উপযোগ সর্বাধিক (১৩) হবে, যদি সে ৪টি কাপড় ক্রয় করে। কিন্তু চতুর্থ কাপড় থেকে তার কোন নীট উপযোগ আসছে না। আগেরগুলো থেকে আসছে। এই অবস্থাটি চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়। এরপর কিন্তু ক্রেতার নীট উপযোগ কমে যাবে। তাহলে আমরা বলতে পারি—ক্রেতা এমনভাবে দ্রব্য ক্রয় করবে যাতে তার নীট উপযোগ সর্বাধিক হয়। যেখানে নীট উপযোগ সর্বাধিক হবে সেখানেই সে ভারসাম্য লাভ করবে। এর প্রাথমিক বা প্রয়োজনীয় শর্ত হল :



২.৬ রেখাচিত্র : প্রান্তিক উপযোগ ও ক্রেতার ভারসাম্য

প্রান্তিক উপযোগ = দাম।

এই বিষয়টিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝানো যায়। ২.৬ রেখাচিত্রে ক্রেতার ভারসাম্য দেখানো হয়েছে। এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ এবং OY-অক্ষে দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপ করা হয়েছে। দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান। কাজেই প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি (রেখাচিত্রে যার নাম MU রেখা) নিম্নমুখী হবে। একজন ক্রেতা সমান দামে যত ইচ্ছা দ্রব্য ক্রয় করতে পারে। কাজেই দাম রেখা (রেখাচিত্রে PP' রেখা) পরিমাণ অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে।

এখানে দাম রেখা PP' প্রান্তিক উপযোগ রেখা MU-কে A বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখানে দাম = প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়েছে। অতএব A হবে ক্রেতার ভারসাম্যের বিন্দু। এই বিন্দুতে ক্রেতা OQ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করবে। তার সর্বাধিক

নীট উপযোগ হবে PRA নামক ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল। A বিন্দুর ডানদিকে দাম অপেক্ষা প্রান্তিক উপযোগ কম। ক্রেতার নীট উপযোগ কমে যাচ্ছে। অতএব A বিন্দুর ডানদিকে কোথাও তাকে সরিয়ে দিলে সে বাঁ দিকে সরে এসে A বিন্দুতে ফিরতে চাইবে। অনুরূপভাবে A বিন্দুর বাঁ দিকে দামের চেয়ে প্রান্তিক উপযোগ বেশি। কাজেই ক্রেতার নীট উপযোগ বাড়বে এবং তার লোভে ক্রেতা ডানদিকে সরে আসতে চাইবে। এইভাবে দেখানো যায় যে, A বিন্দুতেই ক্রেতা ভারসাম্য লাভ করবে এবং A বিন্দুতে (যেখানে দাম = প্রান্তিক উপযোগ) তার নীট উপযোগ সর্বাধিক হবে।

২.৬. (ক) ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus) :

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক অ্যালফ্রেড মার্শাল প্রথমে ভোগোদ্বৃত্তের আলোচনা করেন। তাঁর মতে কোন ক্রেতা যখন বাজার থেকে দ্রব্য ক্রয় করে তখন সে কিছুটা উপযোগ উদ্বৃত্ত পেয়ে যায়। এটাই হল ভোগোদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্ত উপযোগ অর্থের হিসাবে প্রকাশ করে বলা যায়, কোন দ্রব্যের জন্য ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত = সেই দ্রব্যের জন্য সে যে দাম বা অর্থ দিতে চায় — সে যে পরিমাণ অর্থ দেয়। উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। ধরে নিই কোন ক্রেতার একটি কাপড়ের খুব দরকার। কাপড় না হলে তার চলবে না এবং একটি কাপড় পাওয়ার জন্য সে ২০ টাকা দাম দিতে রাজি। এই ২০ টাকাটা হল সম্ভাব্য দাম (Potential Price)। এখন ধরে নিই, সে বাজারে গেল এবং ১৫ টাকায় ১টি কাপড় পেয়ে গেল। তাহলে ১৫ টাকাটা হল প্রকৃত দাম (Actual Price)। ক্রেতা এই ১৫ টাকায় কাপড়টি ক্রয় করে ৫ টাকার উদ্বৃত্ত উপযোগ পাবে। এটাই হল ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত। তাহলে আমরা বলতে পারি, **ভোগোদ্বৃত্ত = সম্ভাব্য দাম — প্রকৃত দাম।**

কোন ক্রেতা কোন দ্রব্যের জন্য যে দাম দিতে রাজি থাকে সেটা তার প্রান্তিক উপযোগের সমান। কিন্তু বাস্তবে ক্রেতা এর চেয়ে কম দামে দ্রব্য পেয়ে যায়। বাজার থাকার জন্যই এই সুবিধা পাওয়া যায়। কাজেই আমরা বলতে পারি, ভোগোদ্বৃত্ত হল বাজার থাকার সুবিধা। কোন একটি দ্রব্যের জন্য ক্রেতা অনেক বেশি দাম দিতে রাজি হয়, কিন্তু বাজার থাকার ফলেই সে তার চেয়ে অনেক কম দামে বাজার থেকে দ্রব্যটি ক্রয় করতে পারে।

কোন ক্রেতা একটি দ্রব্য এক একক কিনলে তার ভোগোদ্বৃত্ত হবে সেই এককের প্রান্তিক উপযোগ ও দামের পার্থক্য। দু একক কিনলে ভোগোদ্বৃত্ত হবে প্রথম এককের ভোগোদ্বৃত্ত + দ্বিতীয় এককের ভোগোদ্বৃত্ত। এইভাবে ক্রেতা যদি n একক দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে মোট ভোগোদ্বৃত্ত হবে প্রথম থেকে n-তম একক পর্যন্ত সব কয়টি এককের ভোগোদ্বৃত্তের যোগফল। একে আমরা মোট নীট উপযোগ বলি। দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ রেখাটি যদি ২.৬ নং রেখাচিত্রের MU হয় এবং দাম রেখাটি যদি PP′ হয় তাহলে ক্রেতা সর্বাধিক নীট উপযোগ পাবার জন্য OQ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়

করবে। এখানে মোট সম্ভাব্য দাম = ORAQ নামক ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল এবং মোট প্রকৃত দাম = OPAQ নামক আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল। তাহলে মোট ভোগোদ্বৃত্ত = মোট সম্ভাব্য দাম — মোট প্রকৃত দাম = ORAQ - OPAQ = PRA নামক ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল।

সেইজন্য বলা হয় মোট ভোগোদ্বৃত্ত হল প্রান্তিক উপযোগ রেখার নীচের ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল।

(খ) ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের তাৎপর্য ও ব্যবহার :

ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এর কয়েকটি ব্যবহারিক মূল্য আছে।

(১) ভোগোদ্বৃত্তের সাহায্যে ক্রেতার তৃপ্তি পরিমাপ করা যায়। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত হ্রাস পায়। অপরপক্ষে দাম হ্রাস পেলে ভোগোদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়। এর থেকে আমরা দাম বৃদ্ধির অকাম্যতা বুঝতে পারি।

(২) মার্শালীয় অর্থনীতিতে কোন দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য (value in use) এবং বিনিময় মূল্যের (value in exchange) মধ্যে পার্থক্য করা হয়। এই পার্থক্যকে আমরা ভোগোদ্বৃত্তের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারি। কোন দ্রব্যের ভোগ থেকে কোন ক্রেতা যে মোট উপযোগ পায় তাকে আমরা ব্যবহারিক মূল্যের সমান বলে মনে করতে পারি। অপরপক্ষে কোন দ্রব্যের জন্য একজন ক্রেতা যে দাম দেয় সেটা হল তার বিনিময় মূল্য। যেখানে ব্যবহারিক মূল্য বিনিময় মূল্যের চেয়ে বেশী হয়, সেখানেই ক্রেতা অতিরিক্ত তৃপ্তি পেয়ে থাকে।

(৩) সরকারী কর আরোপের ক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্ত ধারণার ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্রেতা যে দাম দিতে চায় তাকে বলা হয় সম্ভাব্য দাম এবং ক্রেতা বাস্তবে যে দাম দেয় তাকে বলা হয় প্রকৃত দাম। সম্ভাব্য দাম ও প্রকৃত দামের পার্থক্যই হল ভোগোদ্বৃত্ত। সরকারী কর বসানোর ফলে দ্রব্যের প্রকৃত দাম বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত কমে। কাজেই আমরা বলতে পারি করের পরিমাণ বা হার যদি ভোগোদ্বৃত্তের চেয়ে বেশি হয় তাহলে ক্রেতার পক্ষে দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব হবে না। সরকারের পক্ষে সে কর আদায় করাও যাবে না। কাজেই দ্রব্যের উপর আরোপিত করের পরিমাণ কখনই ভোগোদ্বৃত্তের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়, বরং ভোগোদ্বৃত্তের চেয়ে কম কর ধার্য করলে ক্রেতার কিছুটা ভোগোদ্বৃত্ত থেকে যাবে। এইভাবে দেখা যায় যে, ভোগোদ্বৃত্ত ধারণাটি করারোপের মূল নীতি হিসাবে কাজ করতে পারে। অধ্যাপক মার্শালের মতে এটাই হল ভোগোদ্বৃত্ত ধারণার উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক তাৎপর্য।

(৪) কোন একচেটিয়া কারবারী তার বিক্রীত দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দাম আদায় করতে পারে। একে দাম স্বতন্ত্রীকরণ বা পৃথকীকরণ (Price discrimination) বলা হয়। আবার একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্যের বিভিন্ন একক একজন ক্রেতার কাছে বিভিন্ন দামে বিক্রয় করতে পারে। একে দ্রব্যের এককগত দাম স্বতন্ত্রীকরণ বলা যেতে পারে। এইরূপ দাম স্বতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে ভোগোদ্বৃত্ত

ধারণাটি কাজে লাগতে পারে। ধরা যাক ক্রেতা একটি কাপড়ের প্রথম এককের জন্য ১৫ টাকা, দ্বিতীয় এককের জন্য ১৩ টাকা, তৃতীয় এককের জন্য ১০ টাকা দাম দিতে রাজি আছে। সেই কাপড়ের তিনখানির জন্য দিতে চায় মোট ৩৮ টাকা। এখন প্রতিটি কাপড়ের দাম ১০ টাকা হলে ক্রেতাকে দিতে হবে ৩০ টাকা। কাজেই আর ৮ টাকার ভোগোদ্বৃত্ত থাকবে। কিন্তু কাপড় বিক্রেতা যদি একচেটিয়া কারবারী হয় তাহলে সে প্রথম কাপড়টি ১৫ টাকায়, দ্বিতীয়টি ১৩ টাকার এবং তৃতীয়টি ১০ টাকায় বিক্রি করতে পারে। এটা হল দ্রব্যের একক-গত দাম স্বতন্ত্রীকরণের উদাহরণ। কিন্তু এই উদাহরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, একচেটিয়া কারবারী কখনই তিনটি কাপড়ের জন্য মোট ৩৮ টাকার বেশি দাম ধার্য করতে পারবে না। সে যদি তিনটি কাপড়ের জন্য ৩০ টাকার বেশি কিন্তু ৩৮ টাকার কম দাম নেয় তাহলে ক্রেতার কিছুটা ভোগোদ্বৃত্ত থাকবে। তিনটি কাপড়ের মোট দাম যদি ৩৮ টাকা হয় তাহলে ক্রেতার কোন ভোগোদ্বৃত্ত থাকবে না। অতএব আমরা বলতে পারি—কোন দ্রব্যের এককগত দাম স্বতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে দ্রব্যের মোট দাম ক্রেতার মোট সম্ভাব্য দামের সমান কিংবা তার চেয়ে কম হতে পারে, কখনই বেশি হতে পারবে না।

(৫) কোন দেশ বিদেশের বিক্রেতাদের কাছে থেকে এক বা একাধিক দ্রব্য (ও সেবা) ক্রয় করতে পারে। একে আমদানি বলা হয়। যে দ্রব্য স্বদেশে উৎপাদন করা যায় না, কিংবা উৎপাদন করলে সেই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও দাম খুব বেশী পড়ে যায় সাধারণত সেই দ্রব্যই বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। কারণ বিদেশ থেকে কম দামে দ্রব্যটি ক্রয় করা যায়। এর ফলে ক্রেতারা সেই আমদানিকৃত দ্রব্যের জন্য যে সম্ভাব্য দাম দিতে চায় প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে অনেক কম দামে দ্রব্যটি পেয়ে যায়। অতএব আমরা বলতে পারি—আমদানির মাধ্যমে কোন দেশের ক্রেতাদের ভোগোদ্বৃত্তের সৃষ্টি হয় এবং এই ভোগোদ্বৃত্তের সাহায্যে আমদানির লাভ (**gains from imports**) পরিমাপ করা যায়।

আমদানির মত রপ্তানিও থাকে। কোন দেশ এক বা একাধিক দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করতে পারে। একে রপ্তানি বলা হয়। যে দ্রব্য স্বদেশে বিক্রয় করলে দাম কম পাওয়া যায় সেই দ্রব্য বিদেশে বিক্রয় করলে হয়তো দাম বেশী পাওয়া যায়। এতে বিক্রেতার বা উৎপাদকের উদ্বৃত্ত (**Producer's surplus**) সৃষ্টি হয়। আমদানির দ্বারা ভোগকারীর উদ্বৃত্ত এবং রপ্তানির ফলে উৎপাদকের উদ্বৃত্ত—এই উভয় প্রকার উদ্বৃত্তের যোগফল দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্যের লাভ (**gains from foreign trade**) পরিমাপ করা যায়।

(৬) সরকার আমদানি দ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক এবং রপ্তানি দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক বসাতে পারেন। আমদানি শুল্কের ফলে আমদানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ভোগকারীদের উদ্বৃত্ত হ্রাস পায়। আবার আমদানি দ্রব্যের কিছুটা যদি স্বদেশে উৎপন্ন হয়ে থাকে তাহলে আমদানি শুল্কের ফলে স্বদেশী উৎপাদকরাও বেশী দামে সেই দ্রব্যটি বিক্রয় করতে পারে। এতে তাদের উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়। আমদানি

শুল্কের ফলে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত হ্রাস পায়। উৎপাদকের উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পায়। সেই সঙ্গে সরকারের রাজস্ব আদায় হয়। আমরা বলে থাকি ভোগকারীদের উদ্বৃত্ত উৎপাদক ও সরকারের মধ্যে পুনর্বণ্টিত হয়। এইভাবে ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের সাহায্যে আমরা আমদানি শুল্কের প্রভাব আলোচনা করতে পারি।

(গ) **মন্তব্য :** ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটিকে অনেক অর্থনীতিবিদ তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন।

প্রথমত, এই তত্ত্বে প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপযোগ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। মার্শাল সেইরকমই ধরে নিয়েছিলেন। এতে আরো অনেক অসুবিধে দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, একজন ক্রেতা কোন দ্রব্যের জন্য কী দাম দিতে রাজী থাকে সেটা নির্ণয় করা খুব কঠিন। এটা নির্ভর করবে (১) ব্যক্তির রুচি, পছন্দ ও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার উপর, (২) দ্রব্যের প্রকৃতির উপর এবং (৩) চারপাশের অবস্থার উপর। রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পে মৃত্যুঞ্জয় যখন সোনার ঘরে আটকে গিয়েছিল, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হয়ে বুঝতে পেরেছিল—রাশি রাশি সোনার চেয়ে একটি শুকনো রুটি ও এক পাত্র জলের দাম অনেক বেশি, তখন তাকে যদি বলা হত—তুমি চারটে রুটি ও এক পাত্র জলের জন্য কত দাম দিতে রাজি, তাহলে সে বোধ হয় সব সোনা দিয়েই তা পেতে চাইত। এখানে সম্ভাব্য দাম এত বেশি হয়ে যাবে যে, তা থেকে প্রকৃত দাম বিয়োগ করলে অনন্ত পরিমাণ ভোগোদ্বৃত্ত থেকে যাবে।

তৃতীয়ত, ভোগোদ্বৃত্ত অনুযায়ী কর চাপালে তার কোন সাধারণ হিসেব পাওয়া যাবে না। দুজন ক্রেতার ভোগোদ্বৃত্ত সমান হবেই এমন কথা বলা যায় না। তাহলে প্রত্যেক দ্রব্য ও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আলাদা আলাদা হারে কর ধার্য করতে হবে। এটা চালু করা প্রশাসনিক দিক দিয়ে সম্ভব নয়। তাছাড়া যেখানে দ্রব্যটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যেমন—চাল, আটা, জল, জীবনদায়ী ওষুধ সেখানে ভোগোদ্বৃত্ত হিসাব করে কর চাপালে ক্রেতাদের উপর এত বেশী কর চাপাতে হবে যে, কোন সরকারই সেটা করতে পারবেন না বা করা উচিত হবে না। এমনি অনেক ত্রুটি থাকার জন্যে ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির আলোচনাকে এখন আর তত গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

প্রশ্নাবলী

১। মূল্য ও দামের পার্থক্য কর।

২। মূল্য, দাম ও আপেক্ষিক দাম—এই ধারণাগুলির ব্যাখ্যা কর।

৩। দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে উপযোগ ও দুষ্প্রাপ্যতার ভূমিকা নির্ণয় কর।

৪। জল জীবনধারণের পক্ষে এমন প্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও জলের দাম নেই, অথচ হীরা আমাদের জীবনধারণের পক্ষে প্রায় অপ্রয়োজনীয় হওয়া সত্ত্বেও হীরার দাম এত বেশি কেন ?

৫। উপযোগ কাকে বলে? মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ—এই ধারণা দুটি ব্যাখ্যা কর। ওদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও।

৬। ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ ও রেখাচিত্রসহ এই বিধিটি ব্যাখ্যা কর। এই বিধিটির সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ কর।

৭। ক্রেতা কীভাবে দ্রব্য ক্রয় করে? উদাহরণ ও রেখাচিত্রসহ আলোচনা কর।

৮। ক্রেতার ভারসাম্য বলতে কী বোঝ? ক্রেতা কীভাবে ভারসাম্য লাভ করে দেখাও। এই ভারসাম্যের শর্ত কী?

৯। ভোগোদ্বৃত্ত বলতে কী বোঝায়? ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির আলোচনা কর।

১০। ভোগোদ্বৃত্ত কী? ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বের আলোচনা কর এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। এই তত্ত্বের ত্রুটিগুলি উল্লেখ কর।

১১। মার্শালের ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির পর্যালোচনা কর।

১২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(ক) মূল্য কী? (খ) দাম কী? (গ) প্রান্তিক উপযোগ কাকে বলে? (ঘ) মোট উপযোগ রেখার আকৃতি কেমন হয়? (ঙ) "জল ও হীরার ধাঁধা" বলতে কী বোঝায়? (চ) দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয় কেন?



৩ চাহিদা

৩.১. চাহিদার সংজ্ঞা :

সাধারণ ভাষায় যে অর্থে 'চাহিদা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়, অর্থনীতিতে সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। সাধারণ ভাষায় চাহিদা বলতে কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বোঝায়। অর্থনীতিতে শুধুমাত্র পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অভাব (want) বলা হয়, চাহিদা বলা হয় না। অর্থনীতিতে **চাহিদা বলতে কোন অর্থনৈতিক দ্রব্য ক্রয় করার ইচ্ছা ও ক্রয় করার ক্ষমতার মিলনকে বোঝায়।** এখানে যে দ্রব্যের চাহিদার কথা বলা হচ্ছে সেটি হল একটি অর্থনৈতিক দ্রব্য, যার যোগান প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে সে দ্রব্যকে বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। অর্থনৈতিক দ্রব্যের দাম থাকে। এই দাম দুরকমের হতে পারে—যথা প্রচলিত দাম বা **প্রকৃত দাম** (Actual price) এবং **প্রত্যাশিত দাম** (Expected price)। দ্রব্যের যে দাম বাজারে চালু রয়েছে তাকে বলা হয় প্রচলিত দাম বা প্রকৃত দাম ; কিন্তু ক্রেতা (ভোগের একক হিসাবে ব্যক্তি বা পরিবার) যে দাম হবে বলে প্রত্যাশা করে তাকে বলা হল প্রত্যাশিত দাম। প্রচলিত দামে ক্রেতা (ব্যক্তি বা পরিবার) যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে তাকে বলা হয় **প্রকৃত চাহিদা** (Actual demand) ; কিন্তু কোন দ্রব্যের দাম কীরকম হবে সেই সম্বন্ধে ক্রেতার যে প্রত্যাশা থাকে সেই প্রত্যাশিত দামে একজন ক্রেতা, অর্থাৎ একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবার যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করার পরিকল্পনা করে তাকে বলা হয় **পরিকল্পিত চাহিদা** (Planned demand)। **কোন দ্রব্যের কোন প্রত্যাশিত দামে যে পরিমাণ পরিকল্পিত চাহিদা সৃষ্টি হতে পারে তাকেই অর্থনীতিতে চাহিদা বলা হয়।**

চাহিদা বলতে আবার **ব্যক্তিগত চাহিদা** (Individual demand) অথবা **বাজার-চাহিদা** (Market demand) এই দুটির যে-কোন একটিকে বোঝাতে পারে। (কোন একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের কোন নির্দিষ্ট প্রত্যাশিত দামে একজন ব্যক্তি অথবা একটি পরিবার যে পরিমাণ পরিকল্পিত চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে তাকে বলা হয় ব্যক্তিগত চাহিদা বা পারিবারিক চাহিদা। অপরপক্ষে, কোন একটি দ্রব্যের কোন নির্দিষ্ট দামে বাজারের সকল ব্যক্তি অথবা সব পরিবার সেই দ্রব্যের জন্য যতখানি চাহিদা সৃষ্টি করতে পারে বলে অনুমান করা যায়, তাকে বলা হয় বাজার-চাহিদা বা সামগ্রিক চাহিদা বা মোট চাহিদা Total demand)। উল্লেখ করা যায় যে, বাজার-চাহিদা হল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক চাহিদার সমষ্টিগত পরিমাণ।

৩.২. কোন দ্রব্যের চাহিদা (ব্যক্তিগত চাহিদা ও বাজার-চাহিদা) কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

কোন দ্রব্যের চাহিদা বলতে যদি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক চাহিদা বোঝায়, তাহলে সেই চাহিদাকে আমরা নির্ভরশীল বিষয় বলতে পারি। নির্ভরশীল বিষয় অন্য

অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন, গরম কাপড়ের চাহিদা শীতের উপর নির্ভর করে। এখানে গরম কাপড়ের চাহিদা হল নির্ভরশীল বিষয়, চাহিদা শীত দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু গরম কাপড়ের চাহিদার উপর কখনই শীত নির্ভর করে না। কাজেই শীত হল স্বাধীন বিষয়। ব্যক্তিগত চাহিদাকে নির্ভরশীল বিষয় হিসাবে ধরে নিয়ে আমরা বলতে পারি যে, ব্যক্তিগত চাহিদা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

(১) **প্রথমত,** ব্যক্তির চাহিদা ব্যক্তির প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। পরিবারের চাহিদাও পরিবারে প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে। যেমন, কোন পরিবারের আয়তন বেড়ে গেলে খাদ্য, বস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কোন প্রতিষ্ঠান অধিক পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করলে কাঁচামাল, শ্রমিক ইত্যাদির জন্য প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বেড়ে যায়। এখানে প্রয়োজন হল স্বাধীন বিষয়, চাহিদা হল নির্ভরশীল বিষয়। চাহিদা প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে কিন্তু প্রয়োজন চাহিদার উপর নির্ভর করে না।

(২) **দ্বিতীয়ত,** ব্যক্তিগত চাহিদা ব্যক্তির রুচি ও পছন্দের উপর নির্ভর করে। রুচি ও পছন্দ ভেদে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচণ্ড পার্থক্য থাকে। কেউ চা পছন্দ করে, কফি খেতে পারে না। কেউ কফি খেতে পছন্দ করে, চা খায় না। কেউ চা ঠাণ্ডা খায়, কেউ গরম খায়। কেউ চা দুধ দিয়ে খেতে পছন্দ করে, কেউবা কালো চা (লেবুর রস দিয়ে) খেতে পছন্দ করে। শুধু চায়ের উপরেই যদি এত কথা বলা যায় তাহলে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, তরিতরকারী, পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করলে তো ব্যক্তিগত রুচি-বৈষম্য অসাধারণ জটিলতার সৃষ্টি করে। কিন্তু একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রুচি ও পছন্দ চাহিদাকে নির্ধারণ করে, চাহিদা রুচিকে নির্ধারণ করতে পারে না।

(৩) **তৃতীয়ত,** ব্যক্তিগত চাহিদা ব্যক্তির আয় বা ক্রয়ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যার ক্রয়ক্ষমতা বেশি সে পরিমাণেই বেশি পরিমাণে ক্রয় করতে পারে। যার আয় কম সে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ক্রয় করতে পারে না। অতএব আয় বৃদ্ধি পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং আয় হ্রাস পেলে চাহিদা হ্রাস পায় বলে অনুমান করা যায়। অবশ্য এই নিয়মেরও ব্যতিক্রম থাকতে পারে। ক্রেতার আয় খুব বেশি বেড়ে গেলে ক্রেতা শর্করা জাতীয় খাদ্যের চাহিদা কমিয়ে দেয়, প্রোটিন খাদ্যের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। আবার আয় কম হলে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। অতএব সকল দ্রব্যের চাহিদাই আয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে না। কোন কোন ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা কমে যেতে থাকে। এই দ্রব্যগুলোকে বলা হয় নিকৃষ্ট দ্রব্য।

(৪) **চতুর্থত,** দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা নির্ভর করে সেই দ্রব্যের নিজস্ব দামের (Own price) উপর। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, দাম বাড়লে চাহিদা কমে যায় এবং দাম কমলে চাহিদা বেড়ে যায়। এখানে দাম হল স্বাধীন বিষয় এবং চাহিদা হল নির্ভরশীল। অর্থাৎ ব্যক্তিগত চাহিদা দামের উপর নির্ভর করে কিন্তু দাম ব্যক্তিগত

চাহিদার উপর নির্ভর করে না। দাম নামক স্বাধীন বিষয়ের সঙ্গে চাহিদা নামক নির্ভরশীল বিষয়ের যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় সেটি যেমন পরীক্ষিত ঘটনা, তেমনি তাত্ত্বিক দিক থেকেও এর প্রমাণ দেওয়া যায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দাম কমলে চাহিদাও কমে যায় এবং দাম বাড়লে চাহিদাও বেড়ে যায়। এরকম দ্রব্যকে বলা হয় গিফেন দ্রব্য (Giffen Goods), আয়ারল্যান্ডের অধ্যাপক রবার্ট গিফেন (Robert Giffen) সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিলেন যে, আয়ারল্যান্ডে আলুর দাম বাড়লে লোকেরা মাংসের চাহিদা কমিয়ে আলুর চাহিদা বৃদ্ধি করে, আবার আলুর দাম কমলে লোকেরা আলুর চাহিদা কমিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য যথা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি বেশি ক্রয় করে। যে-কোন দেশে শর্করা জাতীয় প্রধান খাদ্যদ্রব্যগুলির ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটতে পারে। কাজেই গিফেনের সম্মানে এই দ্রব্যগুলিকে গিফেন দ্রব্য নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(৫) **পঞ্চমত,** কোন দ্রব্যের চাহিদা সেই দ্রব্যের নিজস্ব দাম ছাড়া অন্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের উপরেও নির্ভর করে। মাছের চাহিদা মাছের দামের উপর তো নির্ভর করেই, তাছাড়াও মাছের চাহিদা মাংসের দামের উপরেও নির্ভর করে। মাছের দাম যদি স্থির থাকে এবং মাংসের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে আগে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ মাংস কিনত এখন তার চেয়ে কম ক্রয় করবে এবং মাছের চাহিদা বৃদ্ধি করবে। আবার মাছের চাহিদা বাড়লে তেল, মশলাপাতির চাহিদাও বেড়ে যায়। এইভাবে একটা জিনিসেব দাম বাড়লে কত দিকে কত পরিবর্তনের ঢেউ ওঠে। সেজন্য বলা হয় যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা সংশ্লিষ্ট বহু প্রকার দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে।

(৬) **ষষ্ঠত,** ব্যক্তির চাহিদা দামের পরিবর্তন সম্বন্ধে ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে। দাম বাড়তে থাকলে ক্রেতা যদি ভাবে যে, ভবিষ্যতে দাম কমবে তাহলে সে কম কিনবে, আবার সে যদি ভাবে যে, ভবিষ্যতে দাম আরো বেড়ে যেতে পারে, তাহলে সে এখনই বেশি কিনতে চাইবে।

(৭) **সপ্তমত,** কোন একজন ব্যক্তি বা পরিবারের চাহিদা অন্য ব্যক্তি বা পরিবারের চাহিদার দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। একে বলা হয় প্রদর্শন প্রভাব (demonstration effect)।

১নং থেকে ৭২ পর্যন্ত বিষয়গুলো ব্যক্তিগত চাহিদাকে নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু কোন দ্রব্যের জন্য সামগ্রিক চাহিদা আবার (১) জনসংখ্যার গঠন, (২) অর্থনৈতিক উন্নয়ন, (৩) নতুন দ্রব্যের প্রচলন, (৪) আয়ের বন্টন, (৫) সুদের হার ইত্যাদি বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে প্রধানতঃ

(১) সেই দ্রব্যের নিজস্ব দাম (Own-price),

(২) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম (Prices of related goods),

(৩) ক্রেতার বা ক্রেতাদের আয় (Income of the consumer or the consumers)

(৪) ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দ (Taste and preferences of the consumers) এবং

(৫) অন্যান্য বহু বিষয়ের (Other factors) উপর।

অতএব কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং সেই পরিমাণ যে সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাদের মধ্যে একটি আঙ্কিক সম্পর্ক থাকে। এই আঙ্কিক সম্পর্কটিকে বলা হয় **সাধারণ চাহিদা-অপেক্ষক** (General Demand Function)

যদি D = কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ,
P = দ্রব্যের নিজস্ব দাম,
P′ = অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম,
Y = ক্রেতার বা ক্রেতাদের আয়,
W = অন্যান্য বিষয় ধরা হয়, তাহলে বলা যায় যে, D নির্ভর করে P, P′, Y ও W-এর উপর।

D হল P, P′, Y ও W-এর অপেক্ষক (Function)।

অর্থাৎ $D = f(P, P', Y, W)$

এটি সাধারণ চাহিদা-অপেক্ষক।

এখন আমরা যদি ধরে নিই যে, দ্রব্যের নিজস্ব দাম (P) ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয় (P′, Y, W) স্থির আছে তাহলে দ্রব্যের চাহিদা (D) কেবলমাত্র দ্রব্যের নিজস্ব দামের (P) উপর নির্ভর করবে। এই অনুধারণার ভিত্তিতে বলা যায় যে, D কেবলমাত্র P-এর উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ D হল কেবলমাত্র P-এর অপেক্ষক। একে বলা হয় **বিশেষ চাহিদা অপেক্ষক** (Particular Demand Function)। অতএব $D = f(P)$ হল বিশেষ চাহিদা-অপেক্ষক। এই অপেক্ষক থেকেই চাহিদা-সূত্র বা চাহিদার নিয়ম (Law of Demand) সম্বন্ধে বলা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা (D)-কে কেবলমাত্র সেই দ্রব্যের দামের (P) উপর নির্ভরশীল বলা হলে বোঝায় যে, অন্যান্য বিষয়গুলি স্থির আছে। এই স্থির বিষয়গুলিকে প্যারামিটার (Parameter) বলা হয়।

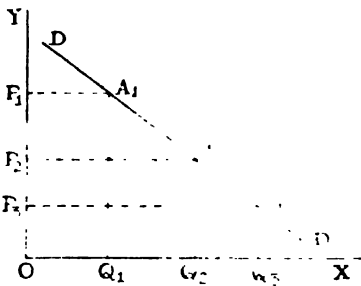
৩.৩. চাহিদা-সূত্র বা চাহিদার নিয়ম (Law of Demand) :

কোন দ্রব্যের জন্য যে পরিকল্পিত চাহিদার সৃষ্টি হয় সেই চাহিদার সঙ্গে দ্রব্যের নিজস্ব দামের যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্ককে চাহিদা-সূত্র বলা হয়। চাহিদার সূত্রে বলা হয় যে, ক্রেতাদের আয়, রুচি ও পছন্দ, সকলপ্রকার সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম ইত্যাদি বিষয়গুলি যদি স্থির থাকে, তাহলে কোন দ্রব্যের নিজস্ব দাম হ্রাস পেলে সেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা হ্রাস পায়। অতএব

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত বা স্থির থাকলে দামের সঙ্গে চাহিদার যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় তাকে চাহিদা-সূত্র বলা হয়।

এই চাহিদা-সূত্রকে একটি নিম্নমুখী [illegible] সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। রেখাচিত্রের OX-অক্ষে পরিকল্পিত [illegible] OY-অক্ষে সম্ভাব্য বা প্রত্যাশিত দাম পরিমাপ করা হয়। [illegible] দিক থেকে ডান দিকে চাহিদা এবং নীচ থেকে উপরে দাম [illegible]

ধরা যাক, দাম OP_1 [illegible] OP_2 হলে চাহিদা হয় [illegible] OP_3 হলে চাহিদা হয় [illegible] $OP_3 < OP_2 < OP_1$ [illegible] দাম কমছে, এবং $OQ_1 <$ [illegible] $Q_2 < OQ_1$ অর্থাৎ চাহিদা বাড়ছে। [illegible] চাহিদার এই বিপরীত সম্পর্ক DD নামক চাহিদা [illegible] দ্বারা চিত্রিত [illegible] A_1, A_2, A_3 [illegible] যথাক্রমে OP_1, OP_2 ও OP_3 [illegible] যথাক্রমে OQ_1, [illegible] সূচিত করে।



৩.১ রেখাচিত্র : চাহিদাসূত্রের জ্যামিতিক চিত্রায়ণ

৩.৪. চাহিদা রেখা কাকে বলে ?

চাহিদা-সূত্রের জ্যামিতিক চিত্রায়ণকে চাহিদা [illegible] চাহিদা-সূত্র থেকে কোন দ্রব্যের বিভিন্ন বাজার-দামে কত পরিমাণ সম্ভাব্য [illegible] হতে পারে তার হিসাব পাওয়া যায়। এর জন্য চাহিদা সূত্রটিকে দামের [illegible] হিসাবে এমন একটি সমীকরণরূপে প্রকাশ করা প্রয়োজন যাতে বাজার-দামের মান স্থাপন করে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা পাওয়া যায়।

ধরা যাক, চাহিদার সমীকরণটি হল $D = 10 - 2P$ নামক একটি সরলরৈখিক সমীকরণ (Linear equation)*

এখানে $P = 0$ টাকা হলে $D = 10 - 2 \times 0 = 10 - 0 = 10$ একক হয়,

$P = 1$ টাকা হলে $D = 10 - 2 \times 1 = 10 - 2 = 8$ একক হয়,

$P = 2$ টাকা হলে $D = 10 - 2 \times 2 = 10 - 4 = 6$ একক হয়,

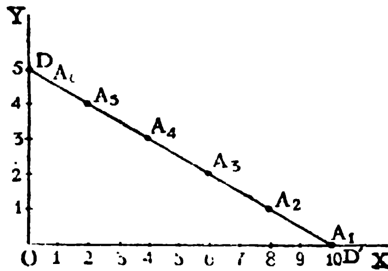
$P = 3$ টাকা হলে $D = 10 - 6 = 4$ একক হয়,

* যে সমীকরণের রেখাচিত্র একটি সরলরেখা হয় তাকে সরলরৈখিক সমীকরণ বলা হয়। $y = mx + c$, $ax + by = c$ প্রভৃতি হল সরলরৈখিক সমীকরণের দৃষ্টান্ত। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, সরলরৈখিক সমীকরণে x ও y-এর ঘাত (Power) একক হয়। যেখানে x ও y-এর ঘাত একের বেশি হয় সেখানে সমীকরণটি থেকে বক্ররেখা পাওয়া যায়।

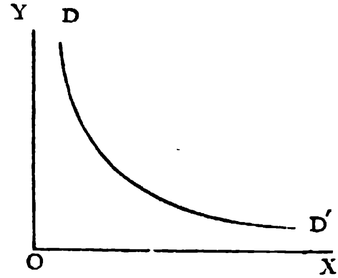
$P=4$ টাকা হলে $D=10-8=2$ একক হয়, এবং

$P=5$ টাকা হলে $D=10-10=0$ একক হয়।

তাহলে আমরা $P=0, D=10$), ($P=1, D=8$), ($P=2, D=6$), ($P=3, D=4$), ($P=4, D=2$) এবং ($P=5, D=0$) নামক দামের ও চাহিদার বিভিন্ন সমন্বয় পাই। এই সমন্বয়গুলিকে রেখাচিত্রে যথাক্রমে, A_1, A_2, A_3, A_4, A_5 ও A_6 বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এখন A_1, A_2, A_3 ইত্যাদি বিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে DD′ নামক একটি রেখা অঙ্কন করা যায়। এই রেখাটি হবে চাহিদা রেখা। প্রদত্ত রেখাচিত্রে OX-অক্ষে চাহিদা (D) এবং OY-অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে এবং A_1, A_2, A_3 ইত্যাদি বিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে DD′ নামক চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে।



৩.২ রেখাচিত্র : সরলরৈখিক চাহিদা রেখা



৩.৩ রেখাচিত্র : বক্ররৈখিক চাহিদা রেখা

এর থেকে বোঝা যায় যে, চাহিদার সমীকরণটি সরলরৈখিক না হয়ে বক্ররৈখিক (non-linear) হলে P-এর মান বসিয়ে D-এর মান পাওয়া যায়। সেখানে চাহিদা রেখা ৩.৩ রেখাচিত্রের DD′ রেখার ন্যায় বক্ররৈখিক হয়। কিন্তু চাহিদা রেখা বক্ররৈখিক বা সরলরৈখিক যা হোক না কেন, স্বাভাবিক অবস্থায় চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়, তার কারণ দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে।

৩.৫. চাহিদা-সূত্রের ব্যাখ্যা

চাহিদা-সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করতে হলে চাহিদা যে সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে—সেই সব বিষয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে দ্রব্যের চাহিদার কেমন পরিবর্তন দেখা দেয়—সেই বিষয়ে আলোচনা করতে হয়।

প্রথমে ক্রেতার আয়ের সঙ্গে দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্কের কথা বলা যেতে পারে। ক্রেতার আয় থেকেই দ্রব্য ক্রয় করার ক্ষমতা আসে। আয় যত বেশি হয়, ক্রয়-ক্ষমতাও তত বাড়ে। কাজেই আমরা বলতে পারি, ক্রেতার আয় বাড়লে বা কমলে দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদাও বাড়বে বা কমবে। আয় ও চাহিদা একমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ।

কিন্তু সব ক্রেতার পক্ষে, সব দ্রব্যের পক্ষে এরূপ হয় না। কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটনাও ঘটে। ক্রেতার আয় বাড়লে ক্রেতার রুচির পরিবর্তন হতে পারে। পূর্বে যে ক্রেতা গরীব ছিল, আয় বেড়ে যাওয়ার পর সে নিজেকে ধনী বলে মনে করতে পারে এবং পূর্বে যে সমস্ত দ্রব্য বেশি পরিমাণে কিনত এখন আয় বেড়ে যাওয়ার ফলে সে সেই দ্রব্য কম পরিমাণে কিনতে পারে। মোটা চাল, মোটা কাপড়, ছোট মাছ প্রভৃতি দ্রব্যের ক্ষেত্রে এমন হতে দেখা যায়। ক্রেতার আয় বাড়লে এই সব দ্রব্যের জন্য সেই ক্রেতার চাহিদা কমে যায়। এরকম দ্রব্যগুলোকে বলা হয় **নিকৃষ্ট দ্রব্য (inferior goods)**। নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় ও চাহিদা বিপরীতমুখে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু যে সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে তাদের **স্বাভাবিক দ্রব্য (normal goods)** বলা হয়।

আয়ের পর কোন দ্রব্যের চাহিদার সঙ্গে সেই দ্রব্যের দাম ছাড়াও অন্যান্য দ্রব্যের দামের সম্পর্কের কথা আলোচনা করা যেতে পারে। দেখা যায়, মাছের চাহিদা মাংসের দামের উপর নির্ভর করে। যদি মাছের দাম স্থির থাকে, কিন্তু মাংসের দাম বেড়ে যায়, তাহলে পূর্বে যারা মাংস কিনত, তারা এখন মাংসের পরিবর্তে মাছ কিনতে পারে। তাহলে মাছের দাম স্থির থাকলেও মাছের চাহিদা বেড়ে যেতে পারে।

মাছ ও মাংস হল প্রতিযোগী বা বিকল্প দ্রব্য। দুটি বা তিনটি তার চেয়ে বেশি সংখ্যক বিকল্প দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন একটির দাম বাড়লে বা কমলে অন্য সব বিকল্প দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে বা কমবে। অতএব আমরা বলতে পারি—কোন দ্রব্যের চাহিদা সেই দ্রব্যের দাম ছাড়াও অন্য সব বিকল্প দ্রব্যের দামের দ্বারা প্রভাবিত হয়। দুটি দ্রব্য X ও Y বিকল্প দ্রব্য বলে বিবেচিত হবে যদি X-কে Y-এর পরিবর্তে, কিংবা Y-কে X-এর পরিবর্তে ব্যবহার করা যায়। দুটি বিকল্প দ্রব্যের ক্ষেত্রে একটির ভোগ বাড়লে অন্যটির ভোগ কমে।

বিকল্প দ্রব্য ছাড়াও আছে পরিপূরক দ্রব্য; কালি ও কলম, মোটরগাড়ি ও পেট্রোল প্রভৃতি পরিপূরক দ্রব্যের উদাহরণ। দুটি দ্রব্য X ও Y-কে পরিপূরক দ্রব্য বলা যাবে যদি X ও Y দ্রব্যকে একসঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। এক্ষেত্রে একটির ব্যবহার অন্য দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি করে। যদি কলমের চাহিদা বাড়ে, তাহলে কালির চাহিদাও বাড়বে; তারজন্য কালির দামের কোন পরিবর্তন হওয়ার প্রয়োজন নেই।

কোন একটি দ্রব্যের চাহিদা অন্য সব দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে বললে অন্য বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্য উভয় প্রকার দ্রব্যকেই বোঝায়। কিন্তু গভীরভাবে দেখলে বোঝা যায়, পরিপূরক দ্রব্যগুলোও প্রতিযোগী বা বিকল্প দ্রব্য। ক্রেতার আয় সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ আয়ের সাহায্যে সে সব দ্রব্য কিনতে হয়। কোন একটি দ্রব্য বেশি পরিমাণে কিনলে অন্য আর সব দ্রব্যের টান পড়ে। কোন ছেলের কাছে যদি ১০ টাকা থাকে এবং সেই ১০ টাকা দিয়ে সে যদি একটি কলম কিনে নেয়, তাহলে

কালি কেনার পয়সা তার কাছে থাকবে না। আগে যখন কলমের দাম ছিল ৭ টাকা, তখন সে ১০ টাকার মধ্যে ৭ টাকার ১ টি কলম ও বাকি ৩ টাকায় ১ টা কালি কিনতে পারত। এখন কলমের দাম বেড়ে ১০ টাকা হয়ে গেলে সে শুধু কলম কিনতে পারবে, কালি কিনতে পারবে না। অতএব কলম ও কালি এমনিতে পরিপূরক দ্রব্য হওয়া সত্ত্বেও বিকল্প বা প্রতিযোগী দ্রব্য হয়ে গেল। সব পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এমন হতে পারে।

তাহলে বাজারে যদি n-সংখ্যক দ্রব্য ও $P_1, P_2, \cdots, P_n$ নামক তাদের n-সংখ্যক দাম থাকে, তাহলে কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের চাহিদা এই n-সংখ্যক দামের উপর নির্ভর করবে; ধরি, প্রথম দ্রব্যের চাহিদার (D_1) কথা বলা হচ্ছে। D_1 নির্ভর করে P_1-এর উপর। কিন্তু আমরা পেলাম

D_1 নির্ভর করে $P_1, P_2, \ldots, P_n$ নামক n-সংখ্যক দামের উপর। আমরা লিখতে পারি

$$D_1 = f(P_1, P_2, \cdots, P_n, Y, W)$$

এটা হল প্রথম বা ১নং দ্রব্যের চাহিদা-অপেক্ষক। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি সব দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এরকম হবে।

আমরা এতক্ষণ ক্রেতার আয় ও দ্রব্যের দাম এবং তাদের সঙ্গে দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্ক লক্ষ্য করেছি। এবার W সম্বন্ধে বলি। W হল সেইসব বিষয় যেগুলো আয় ও দামের মধ্যে পড়ে না। আয় ও দাম হল অর্থনৈতিক বিষয়। কিন্তু W তা নয়। W-এর মধ্যে পড়ে ক্রেতার রুচি ও পছন্দ, ভৌগোলিক পরিবেশ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি অনর্থনৈতিক বিষয়সমূহ।

তাহলে কোন একটি দ্রব্যের চাহিদা অনেক বিষয়ের উপর বিভিন্নভাবে নির্ভর করে। এই অবস্থায় চাহিদার পরিবর্তন যদি হয়, তাহলে আমরা কখনই বলতে পারব না সেই পরিবর্তন কেন হল। সেইজন্য অনুধারণার সাহায্যে ব্যাপারটাকে অনেক সহজ করে নেওয়া হয়। আমরা তাই বলি—দ্রব্যের দাম ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয়ের যদি কোন পরিবর্তন না হয়—তাহলে কোন দ্রব্যের চাহিদা সেই দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে; তাহলেই দাম কমলে চাহিদা বাড়বে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমবে। অন্যান্য অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে এই নিয়মটি খাটবে না। অতএব অন্যান্য বিষয়ের কোন পরিবর্তন হয়নি বা হচ্ছে না—এই অনুধারণাটির গুরুত্ব যথেষ্ট। এখন আমরা চাহিদা সূত্রটি বলতে পারি। **অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে কোন দ্রব্যের দাম ও তার চাহিদা বিপরীত সম্পর্কে আবদ্ধ হয়, যার ফলে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। এটাই হল চাহিদার নিয়ম বা চাহিদা-সূত্র।**

৩.৬. কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম হয়?

দাম হ্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা হ্রাস পায়। কিন্তু এই নিয়মের বিপরীত আচরণ দেখা দিলে অর্থাৎ দাম হ্রাস পেলে যদি চাহিদা

বৃদ্ধি পায়, অথবা দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদাও বৃদ্ধি পায় তাহলে চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম হয়। **যে সকল বিষয় স্থির থাকে বলে ধরে নিয়ে দাম ও চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক স্থাপন করা হয় সেই সকল বিষয়ের পরিবর্তন ঘটলেই চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম দেখা যায়।** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

(১) **শর্করা জাতীয় প্রধান খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে** চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটে। চাল, গম, জোয়ার, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি হল শর্করা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য। অধ্যাপক হিক্সের ভাষায় এগুলি হল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য কারণ ক্রেতারা তাদের আয়ের প্রধান অংশ প্রধান খাদ্যদ্রব্যের জন্য ব্যয় করে। কাজেই এসকল দ্রব্যের দাম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি ঘটে। ফলে তারা শর্করা জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা কমিয়ে তার পরিবর্তে প্রোটিন জাতীয় দ্রব্য ক্রয় করে। আয়ারল্যাণ্ডের অধ্যাপক রবার্ট গিফেন সর্বপ্রথম আলুর ক্ষেত্রে এই ঘটনা লক্ষ্য করেছিলেন। আয়ারল্যাণ্ডসহ যে-কোন দেশে শর্করাজাতীয় প্রধান খাদ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে এরূপ হতে পারে। সেজন্য এই দ্রব্যগুলিকে গিফেন দ্রব্য বলা হয়। গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম হয়।

(২) **নানাপ্রকার শৌখিন ও বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে** চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটে। মূল্যবান ধাতুপ্রস্তর, মণি, মাণিক্য, মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি দ্রব্যের নিজস্ব কোন উপযোগ নেই। লোকে ঐশ্বর্য প্রদর্শনের জন্য, সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য কিংবা সঞ্চিত আয় ধরে রাখার জন্য এইসকল দ্রব্য ব্যবহার করে। কাজেই এদের দাম কমলে চাহিদা কমে যায় এবং দাম বাড়লে চাহিদাও বেড়ে যায়।

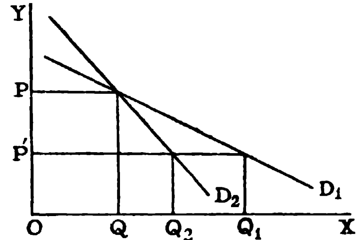
(৩) **শেয়ার বাজারে** চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যে কোম্পানীর শেয়ারের দাম বাড়ে ক্রেতারা সেই কোম্পানীকে লাভজনক কোম্পানী বলে ভেবে নেয় এবং তার শেয়ার ক্রয়ের জন্য ভিড় করে। এর ফলে শেয়ারের দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে। অন্য যে সব শেয়ারের দাম কমে, তাদের চাহিদাও কমে।

(৪) **দামের পরিবর্তন সম্বন্ধে ক্রেতাদের আশা-আশঙ্কার ফলে** চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম ঘটে। দাম কমলে ক্রেতারা যদি ভাবে যে, ভবিষ্যতে দাম আরো কমবে, তাহলে তারা চাহিদা কমিয়ে দেয়। আবার দাম বাড়তে থাকলে ক্রেতারা ভাবে ভবিষ্যতে দাম আরো বাড়বে। এই আশঙ্কার তাড়নায় তারা বেশি দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে। এইভাবে চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম হয়।

(৫) **ভেবলেন প্রভাবের জন্য** চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম হয়। অধ্যাপক ভেবলেন প্রথম লক্ষ্য করেন যে, দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রেতারা মনে করে যে, সেই দ্রব্যের গুণগতমানও বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই দাম বৃদ্ধি পেলে অধিক পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করে। আবার দাম হ্রাস পেলে ক্রেতারা ভেবে নেয় যে, দ্রব্যের মানও নেমে গেছে। অথচ এরকম ধারণা ভ্রান্ত ধারণা হতে পারে। **ক্রেতাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা থাকলে বা দাম লক্ষ্য করে দ্রব্যের গুণ বিচারের প্রবণতা থাকলে** চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম হয়।

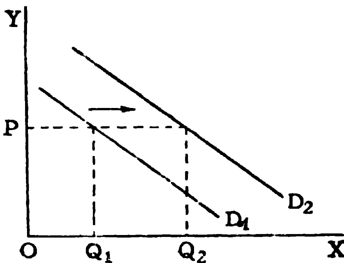
৩.৭. চাহিদার পরিবর্তন (Change of demand) বা চাহিদা-রেখার অপসরণ (Shift of the demand curve)

(ক) **চাহিদাতে পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন :** চাহিদা রেখার দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ—একটি হল চাহিদা রেখার ঢাল (Slope) এবং অপরটি হল চাহিদা রেখার অবস্থান (Position)। চাহিদা রেখার ঢাল দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কতটা পরিবর্তন ঘটে তাই বোঝায়। কিন্তু চাহিদা রেখার অবস্থান নির্দিষ্ট দামে বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদা সূচিত করে। চাহিদা রেখার অবস্থানের পরিবর্তনকে চাহিদার পরিবর্তন বলা হয়, কিন্তু একই চাহিদা রেখার উপর এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় চাহিদাতে পরিবর্তন (Change in demand)। চাহিদাতে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হয় না। এটি হল প্রধানতঃ চাহিদা রেখার ঢালের ব্যাপার। কোন চাহিদা রেখার ঢাল বেশি হতে পারে, আবার কোন চাহিদা রেখার ঢাল কম হতে পারে। বেশি ঢাল হলে চাহিদা রেখাটি হেলান হয়, এবং নির্দিষ্ট দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার বেশি পরিবর্তন হয়। চাহিদা রেখার ঢাল কম হলে রেখাটি কিছুটা খাড়া হয়। এখানে দামের নির্দিষ্ট পরিবর্তনের জন্য চাহিদার পরিবর্তন বেশি হয়। ৩.৪ রেখাচিত্রে D_1 ও D_2 নামক দুটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। D_1 রেখাটি হেলানো, D_2 রেখাটি অপেক্ষাকৃত খাড়া। এই রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে দাম OP হলে উভয় রেখাতেই চাহিদা হয় OQ. দাম PP′ পরিমাণে কমলে D_1 রেখায় চাহিদা বাড়ে QQ_1 পরিমাণে, D_2 রেখায় বাড়ে QQ_2 পরিমাণে। এখানে $QQ_1 > QQ_2$ প্রথম ক্ষেত্রে চাহিদাতে পরিবর্তন বেশি হয়।



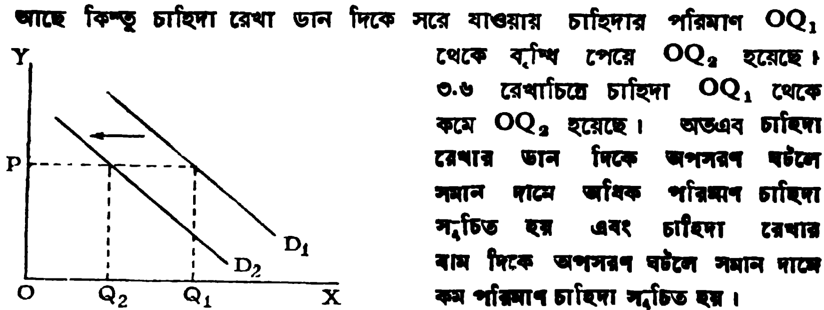
৩.৪ রেখাচিত্র : বিভিন্ন ঢালের চাহিদা রেখা

(খ) **চাহিদা রেখার অপসরণ :** চাহিদার পরিবর্তনও দু'রকমের হতে পারে। চাহিদা রেখা সমান্তরালভাবে ডানদিকে সরে যেতে পারে, অথবা বামদিকে সরে যেতে পারে। ৩.৫ রেখাচিত্রে চাহিদা রেখার ডান দিকে অপসরণ ঘটেছে। ৩.৬ রেখাচিত্রে ঘটেছে বামদিকে। ৩.৫ রেখাচিত্রে প্রথম চাহিদা রেখা ছিল D_1, পরে ঐ রেখাটি D_2 রেখার স্থানে বসেছে। ৩.৬ রেখাচিত্রে D_1 রেখাটি বাম দিকে সরে গিয়ে D_2 রেখার স্থানে বসেছে। ৩.৫ ও ৩.৬ রেখাচিত্রে OX-অক্ষে চাহিদা ও OY-অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। ৩.৫ রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে দাম OP স্তরে স্থির



৩.৫ রেখাচিত্র : চাহিদা রেখার ডান দিকে অপসরণ

আছে কিন্তু চাহিদা রেখা ডান দিকে সরে যাওয়ায় চাহিদার পরিমাণ OQ_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OQ_2 হয়েছে। ৩.৬ রেখাচিত্রে চাহিদা OQ_1 থেকে কমে OQ_2 হয়েছে। **অতএব চাহিদা রেখার ডান দিকে অপসরণ ঘটলে সমান দামে অধিক পরিমাণ চাহিদা সূচিত হয় এবং চাহিদা রেখার বাম দিকে অপসরণ ঘটলে সমান দামে কম পরিমাণ চাহিদা সূচিত হয়।**



৩.৬ রেখাচিত্র : চাহিদা রেখার বাম দিকে অপসরণ

(গ) চাহিদা রেখার অপসরণের কারণ : চাহিদা-সূত্রে দ্রব্যের দামের সঙ্গে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণকে সম্পর্ক যুক্ত করা হয়। কিন্তু এখানে ধরে নেওয়া হয় যে ক্রেতাদের আয়, রুচি ও পছন্দ, সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থির থাকে। এই স্থির বিষয়গুলি চাহিদা রেখার অবস্থান নির্ধারণ করে। স্থির বিষয়গুলি যদি স্থির না থাকে, যদি তাদের মান এক স্তর থেকে অন্য স্তরে সরে যায় তাহলে চাহিদা রেখার অপসরণ ঘটে। অর্থাৎ ক্রেতাদের আয়, রুচি ও পছন্দ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ঘটলে চাহিদা রেখার অপসরণ ঘটে।

৩.৮. চাহিদা সূত্রের কারণ (চাহিদা রেখা কেন বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয় অথবা কোন দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে কেন ?)

চাহিদা-সূত্রে বলা হয় যে, কোন দ্রব্যের নিজস্ব দাম হ্রাস পেলে এবং ক্রেতাদের আয়, রুচি ও পছন্দ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থির থাকলে সেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়; বিপরীতপক্ষে, কোন দ্রব্যের নিজস্ব-দাম বৃদ্ধি পেলে এবং অন্যান্য বিষয়গুলি স্থির থাকলে সেই দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। দ্রব্যের নিজস্ব দামের সঙ্গে তার চাহিদার যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকে সেই সম্পর্ক একটি নিম্নমুখী রেখার সাহায্যে প্রকাশিত হয়। এই রেখাটি হল চাহিদা রেখা। স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা হ্রাস পায় এবং দাম হ্রাস পেলে চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলেই স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা-রেখা রেখাচিত্রের বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয়।

আমারা জানি যে,

$$\text{চাহিদা-রেখার ঢাল} = \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তন}}{\text{দামের পরিবর্তন}} = \frac{\Delta D}{\Delta P}$$

এখন, দ্রব্যের দাম কমলে ΔP ঋণাত্মক হয়। দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, ফলে ΔD ধনাত্মক হয়। এর ফলে $\frac{\Delta D}{\Delta P}$ ঋণাত্মক হয়। বিপরীতপক্ষে, দাম বৃদ্ধি পেলে

ΔP ধনাত্মক হয় এবং তার ফলে চাহিদা হ্রাস পায় ও ΔD ঋণাত্মক হয়। এক্ষেত্রেও $\frac{\Delta D}{\Delta P}$ ঋণাত্মক হয়। অতএব কেবলমাত্র স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে (for normal goods only) চাহিদা রেখার ঢাল ঋণাত্মক হয়।

কারণ ঃ কোন দ্রব্যের দাম কমলে কেন তার চাহিদা বাড়ে—এই প্রশ্নটিকে একাধিক দিক থেকে দেখা যায়। অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Samuelson) দাম-হ্রাসের ফলে যে চাহিদা-বৃদ্ধি ঘটে তাকে দুভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত, তাঁর মতে **দাম কমলে ক্রেতার সংখ্যা বাড়ে।** আগে যারা দ্রব্যটির দাম বেশি থাকায় কিনতে পারত না, দ্রব্যটির দাম কমার ফলে তাদের অনেকেই সেই দ্রব্যটিকে তাদের ক্রয় ক্ষমতার নাগালের মধ্যে পায়। এইভাবে নতুন ক্রেতার আবির্ভাব ঘটায় দ্রব্যটির চাহিদা বেড়ে যায়। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে পূর্বে যারা দ্রব্যটি ক্রয় করত তাদের সংখ্যা এবং তাদের প্রত্যেকের চাহিদার পরিমাণ স্থির আছে। কিন্তু দাম কমার পরে কোন কোন ক্রেতা যদি দেশ ছেড়ে কিছু দিনের জন্য অন্যত্র চলে যায়, তাহলে একদিকে নতুন ক্রেতারা আসবে সত্য, কিন্তু অনেক পুরানো ক্রেতার সংখ্যা কমবে। ফলে যোগ-বিয়োগে ক্রেতাদের সংখ্যা বাড়বে, কি স্থির থাকবে, কি হ্রাস পাবে— বলা যাবে না। পুরানো ক্রেতাদের সংখ্যা স্থির আছে বলে ধরে নিলে আর কোন অসুবিধা থাকেনা। কিন্তু তার পরেও ধরতে হয় যে পুরানো ক্রেতারা দাম কমার আগে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করত, এখনও সেই পরিমাণে ক্রয় করে। পুরাতন ক্রেতাদের চাহিদার পরিমাণ পূর্বের পরিমাণে স্থির থাকলেও দাম-হ্রাসের ফলে নতুন ক্রেতাদের আগমনের ফলে দ্রব্যের চাহিদা-বৃদ্ধি পায়। এটি হল চাহিদা-বৃদ্ধির একটি কারণ।

দ্বিতীয়ত, কোন দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে পুরানো ক্রেতাদের চাহিদাও আগের চেয়ে বেশি হয়। এর ফলেও চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এটি হল চাহিদা-বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসন এইভাবে যে চাহিদা-বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তাকে বাজার-চাহিদা বৃদ্ধির কারণ বলা যেতে পারে। কিন্তু কোন দ্রব্যের দাম কমলে কেন পুরনো ক্রেতাদের চাহিদা-বৃদ্ধি পায় তার ব্যাখ্যা স্যামুয়েলসনের পূর্বোক্ত আলোচনায় নেই, অথচ এই কারণ নির্ণয় করাই হল চাহিদা-সূত্রের প্রমাণ দেওয়া। চাহিদা-সূত্রটিকে ব্যষ্টিগত অর্থনীতির তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করলে প্রমাণ করতে হবে —কোন দ্রব্যের দাম কমলে কেন একজন ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা-বৃদ্ধি পায়। অবশ্য দামহ্রাসের ফলে ব্যক্তিগত চাহিদা-বৃদ্ধি ঘটলেই বাজার-চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। সেদিক দিয়ে দুটি বিষয়ই একটি শেষ সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়।

কোন দ্রব্যের দাম কমলে কেন সেই দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা-বৃদ্ধি পায়—সেই প্রশ্নটির উত্তর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে দেওয়া হয়েছে। আমরা এখানে অধ্যাপক মার্শাল ও অধ্যাপক হিক্স প্রদত্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করতে পারি। অধ্যাপক মার্শাল

চাহিদা-সূত্রটিকে প্রমাণ করেছিলেন তাঁর ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধির সাহায্যে। অধ্যাপক হিক্স ব্যাখ্যা করেছিলেন পরিবর্ত-প্রভাব ও আয়-প্রভাবের সাহায্যে।

ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধির সাহায্যে চাহিদা-সূত্রের কারণ ব্যাখ্যা (মার্শাল-প্রদত্ত ব্যাখ্যা):

চাহিদা-সূত্র প্রমাণের জন্য অধ্যাপক মার্শাল নিম্নলিখিত অনুধারণা (Assumptions)-গুলির আশ্রয় নিয়েছিলেন:—

(১) বাজারে একটি মাত্র দ্রব্য আছে; অথবা একাধিক দ্রব্য থাকলেও একটি দ্রব্যের চাহিদার সঙ্গে অন্য কোন দ্রব্যের কোন সম্পর্ক নেই।

(২) দ্রব্যের উপযোগকে (মোট, গড় ও প্রান্তিক উপযোগকে) সংখ্যাগতভাবে পরিমাপ করা যায় এবং যোগ করা যায়।

(৩) উপযোগের মাপকাঠি (Measuring rod) হল অর্থ।

(৪) অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির থাকে।

(৫) ভোগকারী বা ক্রেতার রুচি ও পছন্দ স্বাভাবিক এবং আলোচ্য সময়ের মধ্যে তার কোন পরিবর্তন হয় না।

(৬) ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ থেকে সর্বাধিক তৃপ্তি পেতে চায়।

(৭) দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা বিদ্যমান আছে, যার ফলে একজন ক্রেতা নির্দিষ্ট দামে যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে পারে।

(৮) দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান; দ্রব্যের চাহিদা বা ভোগ বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে থাকে।

এই অনুধারণাগুলির সাহায্যে চাহিদা-সূত্রের প্রমাণ দেওয়া যায়। কোন ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়ের জন্য যে অর্থ প্রদান করে, সেই অর্থের মাধ্যমে সে কিছুটা উপযোগ পরিত্যাগ করে। অপরপক্ষে, দ্রব্য থেকে সে কিছুটা উপযোগ পায়। দ্রব্যের ভোগ থেকে উপযোগের আগম ঘটে; দ্রব্য ক্রয়ের জন্য অর্থ প্রদানের ফলে উপযোগ পরিত্যাগ করতে হয়। এইভাবে দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ থেকে অর্থের উপযোগ বাদ দিয়ে ক্রেতা যে নীট উপযোগ পায় সেই নীট উপযোগ সর্বাধিক করাই হল ক্রেতার উদ্দেশ্য। দ্রব্যের নির্দিষ্ট দাম ও দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ সমান হলেই ক্রেতার নীট উপযোগ সর্বাধিক হয়।* X-নামক কোন দ্রব্যের দামকে P_x দ্বারা এবং X-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ (Marginal Utility)-কে MU_x দ্বারা সূচিত করলে বলা যায় যে, ক্রেতার ভারসাম্যের জন্য

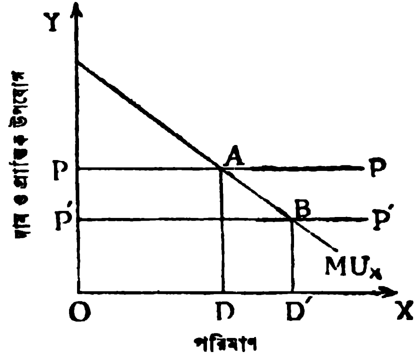
$P_x = MU_x$ হয়। এখন, কোন কারণে P_x হ্রাস পেয়ে P'_x হলে ভারসাম্যের জন্য MU_x হ্রাস পেয়ে MU'_x হয়। অতএব দাম হ্রাস পাওয়ার পরবর্তী ভারসাম্য অবস্থায়,

$$P'_x = MU'_x \text{ হয়।}$$

---

* দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ সমান হলে নীট উপযোগ সর্বাধিক হওয়ার প্রাথমিক শর্ত (First Order Condition) পালিত হয়। প্রাথমিক শর্ত ছাড়াও দ্বিতীয় স্তরের শর্ত (Second Order Condition) আছে। তার আলোচনা উচ্চতর গণিতের বিষয়।

এখানে $P'_x < P_x$ এবং $MU'_x < MU_x$ অর্থাৎ দাম কমালে প্রান্তিক উপযোগ কমে। কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমেছে বললে বোঝায় যে দ্রব্যের ভোগ বা চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। অনুরূপভাবে প্রমাণ করা যায় যে দাম বাড়লে চাহিদা কমে। এইভাবে চাহিদা-সূত্রটি প্রমাণ করা যায়।



৩·৭ রেখাচিত্র : চাহিদার নিয়মের মার্শাল প্রদত্ত প্রমাণ

চাহিদা-সূত্রের মার্শাল প্রদত্ত প্রমাণটিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রদত্ত ৩.৭ রেখাচিত্রে OX-অক্ষে চাহিদা এবং OY-অক্ষে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও দ্রব্যের দাম পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে MU_x নামক নিম্নমুখী রেখাটি X-নামক কোন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ রেখা। PP নামক রেখাটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট দাম সূচিত করে। দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হওয়ায় MU_x রেখাটি বামদিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয়েছে। একজন ক্রেতা নির্দিষ্ট দামে যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে পারে বলে PP রেখাটি OX-অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে। ৩.৭ রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে MU_x ও PP রেখা A বিন্দুতে ছেদ করেছে। A বিন্দুতে $P_x = MU_x$ নামক ভারসাম্যের শর্তটি পালিত হয়েছে। এর থেকে বলা যায় যে দাম OP হলে দ্রব্যের চাহিদা বা ক্রয়ের পরিমাণ হবে OD. চাহিদা OD হলেই দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগ সমান হয় এবং ক্রেতার নীট উপযোগ সর্বাধিক হয়। অতএব A বিন্দুটি হল ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু। এখন ধরা যাক X-দ্রব্যের দাম OP থেকে কমে গিয়ে OP' হল এবং PP রেখাটি সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে এসে P'P' রেখার স্থানে বসল। নতুন ভারসাম্য বিন্দু হল B বিন্দু। এখানে OP' দামে X-দ্রব্যের চাহিদা হয় OD'. দেখা যাচ্ছে যে $OP' < OP$ এবং $OD' > OD$. এর থেকে প্রমাণিত হয় যে দাম OP থেকে কমে OP' হলে চাহিদা OD থেকে বেড়ে OD' হয়।

মার্শাল-প্রদত্ত প্রমাণের ত্রুটি : মার্শালের প্রমাণ আপাত দৃষ্টিতে সহজ বলে মনে হলেও এর মধ্যে অনেক জটিল সমস্যার মুখ খোলা আছে। যে সব অনুধারণার ভিত্তির উপর মার্শালের প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই অনুধারণাগুলির অবাস্তবতা, অসঙ্গতি বা পরস্পর বিরোধিতাকে ঘিরেই সমালোচনার ঝড় উঠেছে। আমরা সংক্ষেপে মার্শালের প্রমাণের নিম্নলিখিত কয়েকটি ত্রুটির কথা বলতে পারি।

(১) মার্শালের তত্ত্বে উপযোগকে সংখ্যাগতভাবে পরিমাপযোগ্য বিষয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু অনেকে মনে করেন, উপযোগ সংখ্যাগতভাবে পরিমাপযোগ্য

বিষয় নয়। উপযোগকে অবস্থানগতভাবে তুলনা করা যায়। ভোগ বৃদ্ধি পেলে উপযোগ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ঠিক কী পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তা বলা যায় না। এর ফলে উপযোগের স্তর ভেদ করা যায়; উচ্চতর উপযোগ-স্তর, নিম্নতর উপযোগ-স্তর এরকম বলা যায়। কিন্তু দুটি স্তরের মধ্যে পার্থক্য কতখানি তার পরিমাণ নির্ণয় করা যায় না।

(২) উপযোগকে পরিমাপযোগ্য বিষয় বলে ধরে নিলে উপযোগ পরিমাপের মাপকাঠি বা কোন একক আবিষ্কার করতে হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এরূপ কোন একক নেই। অধ্যাপক আর্মস্ট্রং (Armstrong) মনে করেন যে উপযোগ আংশিক ভাবে মনোগত, আংশিকভাবে বস্তুগত বিষয়। কাজেই উপযোগ পরিমাপ করা এবং তার মাপকাঠি আবিষ্কার করা আদৌ সহজ কাজ নয়।

(৩) হিক্স, অ্যালেন, প্যারেটো প্রভৃতি অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে চাহিদা-সূত্র প্রমাণ করার জন্য উপযোগ পরিমাপের কোন প্রয়োজন নেই। অধ্যাপক মার্শাল চাহিদা-সূত্র প্রমাণ করতে গিয়ে তাঁর তত্ত্বকে অনাবশ্যক জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে ফেলে-ছিলেন।

(৪) অধ্যাপক মার্শাল অর্থকে উপযোগ-পরিমাপের মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করে-ছিলেন। কোন মাপকাঠির দ্বারা দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হলে মাপকাঠির দৈর্ঘ্যকে স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে স্থির থাকতে হয়। সেজন্য মার্শালও ধরে নিয়েছিলেন যে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থান-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করে না, সকল অবস্থাতেই স্থির থাকে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে অর্থের উপযোগ বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন হয়। একটা টাকার প্রান্তিক উপযোগ ধনীর নিকট যত, দরিদ্রদের নিকট তার চেয়ে বেশি হতে পারে। আবার কোন ব্যক্তি যদি কোন দ্রব্য ক্রয় করার জন্য খুব বেশি পরিমাণে অর্থ ব্যয় করে বসে যাতে তার অর্থের পরিমাণ কমে যায়, তাহলে তার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, কোন ব্যক্তি যদি কোন দ্রব্যের উপর কম পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে যাতে তার অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পায়। অতএব আমরা বলতে পারি যে মার্শাল এমন একটি মাপকাঠি ব্যবহার করেছিলেন যেটি তাঁর হাতের মধ্যেই কখনো বেড়ে ওঠে, কখনো ছোট হয়ে যায়। আবার কখনো বা বেঁকে যায় কিংবা ভেঙে খান খান হয়ে যায়।

(৫) মার্শালের তত্ত্বের মধ্যে পরস্পর বিরোধী অনুধারণার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। মার্শাল ধরেছিলেন যে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হলেও, অর্থের প্রান্তিক উপযোগ স্থির থাকে। কিন্তু মার্শাল হলেন একজন নয়া-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতির সমর্থক। নয়া-ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে—অর্থের নিজস্ব কোন উপযোগ নেই। অর্থ হল বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থের দ্বারা অন্যান্য সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করা যায় বলেই লোকে অর্থ পেতে চায়। অতএব অর্থের উপযোগ বলতে দ্রব্যের উপযোগকেই বোঝায় এবং অর্থের উপযোগ স্থির আছে বললে ধরে নেওয়া

হয় যে দ্রব্যের উপযোগও স্থির আছে। অতএব দ্রব্যের উপযোগ ক্রম-হ্রাসমান এবং অর্থের উপযোগ স্থির—এই দুটি অনুধারণা পরস্পর বিরোধী।

(৬) অধ্যাপক হিক্স্ মনে করেন যে দ্রব্যের চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা এক ($e=1$) হলে, দ্রব্য ক্রয়ের পর ক্রেতার অর্থ স্থির থাকে এবং অর্থের প্রান্তিক উপযোগও স্থির থাকে। কাজেই যে সকল দ্রব্যের $e=1$ হয়, সেই সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই মার্শালের চাহিদা সূত্রটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু একক স্থিতিস্থাপক চাহিদাসম্পন্ন দ্রব্যগুলি হল অত্যন্ত অগুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য (unimportant commodities) যেমন লবণ, সেফ্‌টিপিন, টুথ্‌পিক কিংবা ঐ রকম কোন দ্রব্য।* মার্শালের প্রমাণ গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না।

হিক্স্-প্রদত্ত প্রমাণ ঃ অধ্যাপক হিক্স্ চাহিদা-সূত্রের প্রমাণ দেওয়ার জন্য সরাসরি ভাবে প্রান্তিক উপযোগ তত্ত্বকে ব্যবহার করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নি। তিনি পরিবর্ত-প্রভাব ও আয়-প্রভাব নামক দুটি প্রভাবের কথা বলেছেন এবং এই দুটির সাহায্যে চাহিদা-সূত্রের প্রমাণ দিয়েছেন। অবশ্য অধ্যাপক হিক্স্ চাহিদা-সূত্র প্রমাণের জন্য আয়-প্রভাব অপেক্ষা পরিবর্ত প্রভাবের উপর সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন।

পরিবর্ত-প্রভাব ঃ কোন দ্রব্যের দাম কমলে পরিবর্ত-প্রভাবের সৃষ্টি হয় এবং পরিবর্ত-প্রভাবের ফলেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। হিক্সের মতে যে-কোন একটি দ্রব্যের দাম কমলে সেই দ্রব্যটি তার অন্য বিকল্প বা পরিবর্ত দ্রব্যের তুলনায় আপেক্ষিক ভাবে সস্তা হয়ে যায়। বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ক্রেতা তখন অন্য বিকল্প বা পরিবর্ত দ্রব্যের চাহিদা কমিয়ে দেয় এবং তার পরিবর্তে সেই সস্তা দ্রব্যটি এমনভাবে অধিক পরিমাণে ক্রয় করে যাতে তার তৃপ্তির স্তর অপরিবর্তিত থাকে। এইভাবে ক্রেতা তার তৃপ্তির স্তর স্থির রেখে একটি বিকল্প দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যটির চাহিদা যে পরিমাণে বৃদ্ধি করে তাকে বলা হয় পরিবর্ত-প্রভাব। কোন ক্রেতার নিকট X ও Y নামক দ্রব্য দুটি যদি বিকল্প দ্রব্য হয়, এবং Y-দ্রব্যের দাম যদি স্থির থাকে, অথচ X-দ্রব্যের দাম কমে যায়, তাহলে সে Y-এর চাহিদা কমিয়ে দেয় এবং তার পরিবর্তে X-এর চাহিদা বৃদ্ধি করে। Y-দ্রব্যের দাম স্থির থাকলে এবং X-দ্রব্যের দাম কমলে X-দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম (Relative price) বা $\frac{Px}{Py}$ হ্রাস পায়। কাজেই ক্রেতা বেশি পরিমাণে X-দ্রব্য ক্রয় করে তার তৃপ্তি সমান রাখে। এইভাবে দাম কমলে পরিবর্ত-প্রভাবের দ্বারা চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে। বিপরীতপক্ষে, কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে ক্রেতার চাহিদা হ্রাস পায়।

---

* হিক্সের মতে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য বলতে বোঝায় এমন দ্রব্য যার উপর ক্রেতা তার আয়ের একটি বড়ো অংশ ব্যয় করে থাকে। এই অর্থে চাল, ডাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য হল গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য। লবণ, সেফ্‌টিপিন্, টুথপিকের ব্যবহারিক গুরুত্ব বেশি হতে পারে। কিন্তু এই দ্রব্যগুলির উপর ক্রেতা তার আয়ের অতিক্ষুদ্র অংশই ব্যয় করে থাকে। কাজেই এগুলো হল অগুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য।

আয়-প্রভাব ঃ কোন ব্যক্তির আয় দুরকমের হতে পারে। যথা আর্থিক আয় (Money income) ও বাস্তব আয় (Real income)। আর্থিক আয় প্রকাশিত হয় অর্থের হিসাবে এবং বাস্তব আয় প্রকাশিত হয় দ্রব্য বা সেবা বা কোন বস্তুর হিসাবে। এর থেকে বোঝা যায় যে, ক্রেতার আর্থিক আয় স্থির থাকলেও কোন কারণে যদি কোন দ্রব্যের দাম কমে যায়, তাহলে সেই দ্রব্যের হিসাবে ক্রেতার বাস্তব আয় বৃদ্ধি পায়। চালের কুইণ্টাল ৪00 টাকা এবং কোন ব্যক্তির মাসিক আয় ২000 টাকা হলে চালের হিসাবে সেই ব্যক্তির ব্যাস্তব আয় হবে ৫ কুইণ্টাল চাল। এখন তার আয় যদি ২000 টাকাই থাকে, কিন্তু চালের দাম কোন কারণে কমে গিয়ে যদি ২৫0 টাকা কুইণ্টাল হয়, তাহলে তার বাস্তব আয় হবে ৮ কুইণ্টাল চাল। অতএব চালের দাম কমলে চালের হিসাবে ক্রেতার বাস্তব আয় বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে X-দ্রব্যের দাম কমলে X-দ্রব্যের হিসাবে ক্রেতার বাস্তব আয় বৃদ্ধি পায়।

ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে তার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেতা নিজেকে ধনী বলে মনে করতে পারে এবং তার ফলে সে সেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে নিজের তৃপ্তির মাত্রাকে উন্নততর স্তরে নিয়ে যেতে পারে। এর ফলে যে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে তাকে অধ্যাপক হিক্স্ দাম-হ্রাসজনিত আয় প্রভাব বলেছেন। এই আয়-প্রভাবের ফলে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। বিপরীত পক্ষে, দ্রব্যের দাম বাড়লে ক্রেতার বাস্তব আয় হ্রাস পায়। এবং সেই সঙ্গে দ্রব্যের চাহিদাও হ্রাস পায়।

ক্রেতার বাস্তব আয় বৃদ্ধি পেলে কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রেতার চাহিদা কমে যেতেও পারে। সাধারণতঃ নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাবের ফলে চাহিদা হ্রাস পায়। কিন্তু স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে, আয় কমলে চাহিদা কমে। কোন একটি দ্রব্য ক্রেতার নিকট স্বাভাবিক দ্রব্য কি নিকৃষ্ট দ্রব্য সেটি না জানলে দাম-হ্রাস জনিত আয়-প্রভাবের দ্বারা দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে কিনা বলা যায় না। কোন ক্রেতার নিকট নির্দিষ্ট দ্রব্যটি স্বাভাবিক দ্রব্য কি অস্বাভাবিক দ্রব্য সেই বিষয়টি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায় না। এর জন্য দরজায় দরজায় গিয়ে সমীক্ষা করে জানতে হয়। সেইজন্য অধ্যাপক হিক্স্ আয়-প্রভাবকে চাহিদা-সূত্রের নির্ভরযোগ্য কারণ হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছেন পরিবর্ত প্রভাবের উপরেই।

৩.৯. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ঃ

কোন দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা নির্ভর করে প্রধানতঃ সেই দ্রব্যের নিজস্ব-দাম, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, ক্রেতার আয়, রুচি ও পছন্দ ইত্যাদি অনেক বিষয়ের উপর। এই বিষয়গুলির মধ্যে কোন একটি বিষয়ের পরিবর্তন হলে এবং অন্যান্য বিষয়গুলি স্থির থাকলে চাহিদার পরিবর্তন হয়। যেমন দ্রব্যের দামের পরিবর্তন (হ্রাস বা বৃদ্ধি) হলে চাহিদার পরিবর্তন (বৃদ্ধি বা হ্রাস) হয়। ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন হলে চাহিদার পরিবর্তন হয় ; অন্যান্য দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন একটি দ্রব্যের

দামের পরিবর্তন হলেও চাহিদার পরিবর্তন হয়; অর্থাৎ কোন একটি বিষয়ের পরিবর্তন হলে তার উত্তরে চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। চাহিদা নামক বিষয়টি অন্য বিষয়ের পরিবর্তনের উত্তরে সাড়া দেয়। এইভাবে কোন একটি বিষয়ের সামান্য পরিবর্তনের উত্তরে চাহিদা যে হারে সাড়া দেয় তাকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। এখানে চাহিদার তিনপ্রকার স্থিতিস্থাপকতার কথা বলা যায়, যথা—

(১) দ্রব্যের নিজ-দামগত-স্থিতিস্থাপকতা, (Own price elasticity of demand)

(২) ক্রেতার আয়গত-স্থিতিস্থাপকতা (Income elasticity of demand)

(৩) পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা (Cross-price elasticity of demand)

দ্রব্যের নিজস্ব দাম (Own price of the commodity), অন্যান্য দ্রব্যের দাম (Cross-price) অথবা ক্রেতার বা ক্রেতাদের আয় (income of the consumers) ইত্যাদি বিষয়গুলির মধ্যে কোন্ বিষয়টির পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটছে তার উল্লেখ না থাকলে শুধুমাত্র চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নামক শব্দটির দ্বারা সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশিত হয় না। তবে সাধারণতঃ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলতে দামগত স্থিতিস্থাপকতাকেই বোঝায়।

৩.১০. (ক) দ্রব্যের নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতা :

ক্রেতাদের আয়, রুচি ও পছন্দ, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম ইত্যাদি বিষয়গুলি যদি স্থির থাকে এবং দ্রব্যের নিজস্ব দামের পরিবর্তন হয়, তাহলে চাহিদারও পরিবর্তন হয়। চাহিদা-সূত্র থেকে জানা যায় যে দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা হ্রাস পায় এবং দাম হ্রাস পেলে চাহিদার বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ ঘটে। এইরূপভাবে দামের এক শতাংশ পরিবর্তনের ফলে চাহিদার গড়ে যে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে বিকল্প ভাষায় চাহিদার সংকোচন প্রসারণশীলতা বা চাহিদার মূল্য সংবেদনশীলতাও বলা হয়।

চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা

$$= \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

যদি কোন দ্রব্যের দাম ২০% হ্রাস পায় এবং তার ফলে চাহিদা ৪০% বৃদ্ধি পায়, তাহলে আমরা পাই,

দামের ২০% হ্রাসের জন্য চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে ৪০%,

অতএব „ ১% „ „ „ „ „ $\frac{৪০\%}{২০\%} = ২$।

অর্থাৎ চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা হল ২

দামের হ্রাস ঘটলে দামের পরিবর্তন ঋণাত্মক (—) হয় এবং চাহিদার বৃদ্ধি হলে

চাহিদার পরিবর্তন ধণাত্মক (+) হয়। কাজেই, চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক (−) হয়।

আমরা প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে দামগত স্থিতিস্থাপকতার হিসাব করতে পারি। P দ্বারা কোন দ্রব্যের দাম, ΔP দ্বারা সেই দামের পরিবর্তন, D দ্বারা কোন দ্রব্যের চাহিদা, ΔD দ্বারা সেই চাহিদার পরিবর্তন প্রকাশ করলে আমরা পাই,

P-এর মধ্যে দামের পরিবর্তন হয় ΔP,

$\therefore$ 1 " " " " " $\frac{\Delta P}{P}$,

$\therefore$ 100" " " " " $\frac{\Delta P}{P} \times 100$

অতএব দামের শতকরা পরিবর্তন হল $\frac{\Delta P}{P} . 100$

অনুরূপভাবে চাহিদার শতকরা পরিবর্তন হল $\frac{\Delta D}{D} . 100.$

চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতাকে e_p দ্বারা সূচিত করলে আমরা পাই,

$$e_p = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}} = \frac{\frac{\Delta D}{D} . 100}{\frac{\Delta P}{P} . 100} = \frac{\Delta D}{D} . \frac{P}{\Delta P}$$

অর্থাৎ $e_p = \frac{P}{D} . \frac{\Delta D}{\Delta P} = \frac{\text{মূল দাম}}{\text{মূল চাহিদা}} \times \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তন}}{\text{দামের পরিবর্তন}}.$

(খ) দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান :

দামগত স্থিতিস্থাপকতা $(e_p) = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{দামের শতকরা পরিবর্তন}}$

অতএব, e_p-এর মান বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। এখানে নিম্নলিখিত সম্ভাব্য মানগুলির কথা বলা যায়

চাহিদার শতকরা পরিবর্তন > দামের শতকবা পরিবর্তন হতে পারে, এক্ষেত্রে $e_p > 1$ হয় ;

চাহিদার শতকরা পরিবর্তন = দামের শতকরা পরিবর্তন হতে পারে, এক্ষেত্রে $e_p = 1$ হয় ; এবং

চাহিদার শতকরা পরিবর্তন < দামের শতকরা পরিবর্তন হতে পারে, এক্ষেত্রে $e_p < 1$ হয়।

অন্যভাবে বলা যায় যে,—

(১) $e_p > 1$ হলে দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিবর্তনের হার অধিক হয়। এইরূপ চাহিদাকে **দামগত ভাবে স্থিতিস্থাপক চাহিদা (Price elastic demand)** বলা হয়।

(২) $e_p = 1$ হলে দাম যে হারে কমে (বা বাড়ে) চাহিদা ঠিক সেই হারে বাড়ে (বা কমে)। এইরূপ চাহিদাকে **দামগতভাবে একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা** (**Unitary price elastic demand**) বলা হয়।

(৩) $e_p < 1$ হলে দাম যে হারে কমে (বা বাড়ে) চাহিদা তার চেয়ে কম হারে বাড়ে (বা কমে)। এইরূপ চাহিদাকে **দামগতভাবে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা** (**Price inelastic demand**) বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে দামগত স্থিতিস্থাপকতার দুটি চূড়ান্ত মানের কথা বলা যায়। একটি হল সর্বাধিক মান (Maximum value) এবং অপরটি হল সর্বনিম্ন মান (Minimum value)। দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান সর্বাধিক পক্ষে অনন্ত (∞) এবং সর্বনিম্নপক্ষে শূন্য হতে পারে।

(৪) $e_p = \infty$ হলে বোঝায় যে দামের সামান্যতম (প্রায় শূন্য) পরিবর্তনের ফলেও চাহিদার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়।* এইরূপ চাহিদাকে **দামগতভাবে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা** (**Perfectly Price elastic demand**) বলা হয়।

(৫) $e_p = 0$ হলে বোঝায় যে দামের যে-কোন পরিবর্তনের জন্য চাহিদার শূন্য পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ চাহিদা দামের পরিবর্তনে আদৌ সাড়া দেয় না। দাম বাড়লে চাহিদা বিন্দুমাত্র কমে না ; আবার দাম কমলে চাহিদা বিন্দু মাত্রও বাড়ে না। এইরূপ চাহিদাকে বলা হয় **দামগতভাবে সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা** (**Perfectly price inelastic demand**)

সংক্ষেপে বলা যায় যে, দামগত স্থিতিস্থাপকতার মানের ভিত্তিতে চাহিদা স্থিতিস্থাপক ($e_p > 1$), একক স্থিতিস্থাপক ($e_p = 1$), অস্থিতিস্থাপক ($e_p < 1$), সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ও সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হতে পারে।

(গ) চাহিদা রেখা ও চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক :

চাহিদা রেখার ঢাল দেখে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। চাহিদা রেখা যত বেশি হেলানো (flatter) হয়, ততই চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয় এবং চাহিদা রেখা যত বেশি খাড়া (steeper) হয়, ততই চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা কম হয়। প্রদত্ত রেখাচিত্রে (৩.৮ নং রেখাচিত্র) D_1 ও D_2 নামক দুটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। এই রেখাচিত্রের OX-অক্ষে দ্রব্যের চাহিদা এবং OY-অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। এই রেখাচিত্রে অঙ্কিত চাহিদা রেখা দুটির মধ্যে D_1 কিছুটা হেলানো কিন্তু D_2 কিছুটা খাড়া

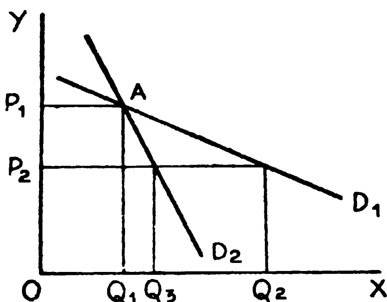
---

* এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে অনন্ত কোন সংখ্যা নয়। ∞ হল বৃহত্তম সংখ্যার মান সম্বন্ধে একটি ধারণা। কোন সংখ্যার মান অনন্তের সমান হতে পারে না। কাজেই $e_p = \infty$ লেখা ঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে

$$e_p = \frac{\frac{\Delta D}{D}.100}{\frac{\Delta P}{P}.100} = \frac{\frac{\Delta D}{D}}{\frac{\Delta P}{P}}$$

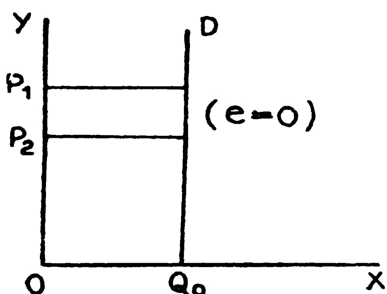
যদি দামের পরিবর্তন খুবই সামান্য হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি $\frac{\Delta P}{P} \to 0$ (tends to zero)। সেক্ষেত্রে $\frac{\Delta D}{D} > 0$ হলে $e_p \to \infty$ হয়। অর্থাৎ e_p অনন্তের দিকে যায়, কিন্তু অনন্তের সমান হয় না।

অবস্থায় আছে। D_1 ও D_2 রেখাদুটি পরস্পরকে A বিন্দুতে ছেদ করে। A বিন্দুতে দ্রব্যের দাম হল OP_1 এবং এই দামে উভয় রেখাতেই চাহিদার পরিমাণ হয় OQ_1। কোন কারণে দ্রব্যের দাম কমে OP_2 হলে চাহিদা বাড়বে। কিন্তু D_1 ও D_2 রেখার চাল পৃথক হওয়ায় অনুমান করা যায় যে উভয় রেখাতেই চাহিদা সমানভাবে বৃদ্ধি পাবেনা। রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে দ্রব্যের দাম P_1P_2 পরিমাণে কমলে D_1 রেখায় চাহিদা বাড়ে Q_1Q_2 পরিমাণে, কিন্তু D_2 রেখায় চাহিদা বাড়ে Q_1Q_3 পরিমাণে। এখানে $Q_1Q_3 < Q_1Q_2$, অর্থাৎ দামের সমান হ্রাসের জন্য D_1 রেখায় চাহিদা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং D_2 রেখায় চাহিদা কম পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর দ্বারা বোঝাযায় যে **হেলানো চাহিদা রেখায় চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয় এবং খাড়া চাহিদা রেখায় দামগত স্থিতিস্থাপকতা কম হয়।**

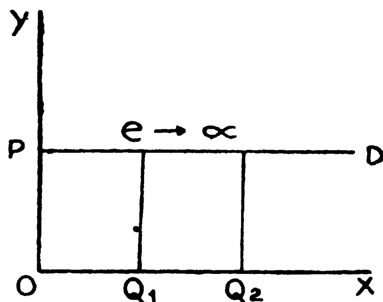


৩.৮ রেখাচিত্র : স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা

চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা যত কম হয় ততই চাহিদা রেখা পরিমাণ অক্ষের উপর খাড়াভাবে অবস্থান করে। খাড়া হওয়ার চূড়ান্ত অবস্থায় চাহিদা রেখাটি পরিমাণ-অক্ষের উপর সম্পূর্ণভাবে লম্ব হয় এবং সেই চাহিদা রেখায় দামগত স্থিতিস্থাপকতা শূন্য হয়। অর্থাৎ পরিমাণ অক্ষের উপর লম্ব চাহিদারেখা হল সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা। ৩.৯ নং রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে চাহিদা রেখাটি OX-অক্ষের উপরলম্ব হয়েছে। এখানে দ্রব্যের দাম OP_1 হলে চাহিদার পরিমাণ হয় OQ_0. দ্রব্যের দাম কমে OP_2 হলেও চাহিদার পরিমাণ হয় Q_0। এর থেকে বোঝা যায় যে পরিমাণ অক্ষের উপর লম্ব চাহিদা রেখায় দামের পরিবর্তন হলেও চাহিদার কোন পরিবর্তন হয় না ; অতএব **পরিমাণ-অক্ষের উপর লম্ব চাহিদা রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা সূচিত করে।**



৩.৯ রেখাচিত্র : সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা



৩.১০ : রেখাচিত্র সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা

চাহিদা রেখা যত হেলানো হয়, ততই চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি

পায়। হেলানো চাহিদা রেখার চূড়ান্ত অবস্থা হল পরিমাণ অক্ষের সমান্তরাল চাহিদা রেখা। এইরূপ চাহিদারেখার ক্ষেত্রে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা অনন্ত হয়। ৩.১০ নং রেখাচিত্রে PD নামক চাহিদা রেখাটি OX-অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে। এই চাহিদা রেখা থেকে বোঝা যায় যে দাম OP স্তরে স্থির থাকলেও চাহিদা OQ_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OQ_2 হয়। এখানে দামের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, অথচ চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাহিদা অত্যন্ত বেশি স্থিতিস্থাপক হওয়ার জন্যেই এমন হয়। **অতএব পরিমাণ অক্ষের সমান্তরাল চাহিদা রেখা হল সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা।**

একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা ঃ চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা একক হলে দামের পরিবর্তনের হার ও চাহিদার পরিবর্তনের হার পরস্পর সমান হয়। এক্ষেত্রে দাম কমলে চাহিদা এমনভাবে বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা এমনভাবে কমে যাতে ক্রেতার ব্যয় সমান থাকে। এই বিষয়টিকে অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়।

ধরা যাক, E = ক্রেতার ব্যয় (Expenditure)

P = দাম

D = চাহিদা।

তাহলে, $E = P\,D.$

এবং $\Delta E = P\Delta D + D.\Delta P$

ধরা যাক দাম হ্রাস পেয়েছে, কাজেই ΔP ঋণাত্মক হবে।

দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, কাজেই ΔD ধনাত্মক হবে।

অতএব $\Delta E = P\Delta D - D\Delta P$, ক্রেতার ব্যয় স্থির থাকলে ব্যয়ের পরিবর্তন $\Delta E = 0$ হয়।

অতএব, ক্রেতার ব্যয় স্থির থাকলে $P\Delta D - D\Delta P = 0$ হয়।

অর্থাৎ, $P\Delta D = D\Delta P.$ উভয় পক্ষকে $D\Delta P$ দ্বারা

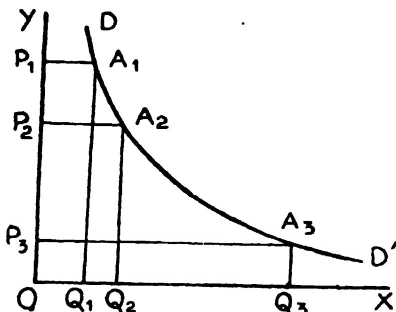
ভাগ করে পাই, $\dfrac{P\Delta D}{D.\Delta P} = 1.$ অতএব $e_p = 1.$

অন্যভাবে বলা যায়, $e_p = 1$ হলে $\Delta E = 0$ হয়। অর্থাৎ একক স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে ক্রেতার ব্যয় স্থির থাকে।

চাহিদা রেখার নীচে যে আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করা হয়, সেই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দ্বারা ক্রেতার ব্যয় $E = P.D$ সূচিত হয়। $e_p = 1$ হলে E স্থির থাকে। অতএব, **একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার নীচে যতগুলি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করা যাক না কেন তাদের ক্ষেত্রফল সমান হয়।**

দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। কাজেই চাহিদারেখা বামদিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয়। একক স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রেও চাহিদারেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে

নিম্নমুখী হয়। ৩.১১ নং রেখাচিত্রে DD′ নামক যে চাহিদা রেখাটি অঙ্কন করা হয়েছে সেটি হল একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা। এই রেখাচিত্রের OX-অক্ষে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং OY-অক্ষে দ্রব্যের দাম পরিমাপ করা হয়েছে।



৩.১১ রেখাচিত্র : একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা

এই রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে, দ্রব্যের দাম OP_1 হলে চাহিদা হয় OQ_1. অতএব ক্রেতার হয় ব্যয় $OP_1 \times OQ_1 = OP_1A_1Q_1$ নামক আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল। আবার, দ্রব্যের দাম OP_2 হলে চাহিদা হয় OQ_2 এবং ক্রেতার ব্যয় হয় $OP_2A_2Q_2$ যেহেতু অনুরূপভাবে, দাম OP_3 হলে চাহিদা হয় OQ_3 এবং ক্রেতার ব্যয় হয় $OP_3A_3Q_3$ অতএব DD′ নামক চাহিদা রেখাটি হল একক স্থিতিস্থাপক চাহিদারেখা, কাজেই $OP_1A_1Q_1 = OP_2A_2Q_2 = OP_3A_3Q_3$.

একক স্থিতিস্থাপক চাহিদারেখার কয়েকটি জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যায়। **একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখা (১) বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয়, (২) রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়, (৩) এই রেখা কোন অক্ষকে ছেদ করে না এবং (৪) এই রেখার নীচে অঙ্কিত আয়তক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রফল সমান হয়।** এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার জন্য একক স্থিতিস্থাপক চাহিদারেখাকে **আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত** (Rectangular hyperbola) বলা হয়। একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা-রেখার সমীকরণ হল P.D = K এখানে K হল একটি ধ্রুবক সংখ্যা। এখানে K-এর মান একক স্থিতিস্থাপক চাহিদারেখার অবস্থান (Position) নির্ধারণ করে। K-এর মান বৃদ্ধি পেলে চাহিদা রেখাটি উপরের দিকে সরে যায়। K হ্রাস পেলে চাহিদারেখাটি নীচের দিকে নেমে যায়।

৩.১১. আয়গত স্থিতিস্থাপকতা :

কোন দ্রব্যের নিজস্ব দাম, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দাম, ক্রেতার রুচি ও পছন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলি যদি স্থির থাকে এবং ক্রেতার আয়ের সামান্য পরিবর্তন হয়, তাহলে চাহিদার যে হারে পরিবর্তন হয় তাকে চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, আয়ের এক শতাংশ পরিবর্তনের ফলে কোন দ্রব্যের চাহিদার গড়ে যে হারে পরিবর্তন হয় তাকে বলা হয় আয়গত স্থিতিস্থাপকতা।

$$\text{আয়গত স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{আয়ের শতকরা পরিবর্তন}}$$

আয়কে Y দ্বারা সূচিত করলে বলা যায় আয়ের শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta Y}{Y}.100$

চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতাকে e_y দ্বারা সূচিত করলে আমরা পাই,

$$e_y = \frac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{আয়ের শতকরা পরিবর্তন}}$$

$$\text{অর্থাৎ } e_y = \frac{\frac{\Delta D}{D}.100}{\frac{\Delta Y}{Y}.100} = \frac{\Delta D}{D}\cdot\frac{Y}{\Delta Y} = \frac{Y}{D}\cdot\frac{\Delta D}{\Delta Y}$$

$$\text{অতএব, } e_y = \frac{\text{মূল আয়}}{\text{মূল চাহিদা}} \times \frac{\text{চাহিদারর পরিবর্তন}}{\text{আয়ের পরিবর্তন}}$$

আয়গত স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় যে আয় বাড়লে যদি চাহিদা বাড়ে, তাহলে চাহিদা ও আয়ের পরিবর্তন ধনাত্মক হয় এবং e_y ধনাত্মক হয়। অনুরূপ ভাবে আয় কমলে যদি চাহিদাও কমে, তাহলে চাহিদা ও আয়ের পরিবর্তন ঋণাত্মক হয় এবং দুটি ঋণাত্মক বিষয়ের অনুপাত হিসাবে e_y ধনাত্মক হয়। **অর্থাৎ আয় ও চাহিদা যদি একই দিকে পরিবর্তিত হয়, তাহলে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়।**

বিপরীতক্রমে, আয় ও চাহিদা যদি বিপরীত দিকে পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ আয় বাড়লে যদি চাহিদা কমে এবং আয় কমলে যদি চাহিদা বাড়ে, তাহলে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে ভোগ্যদ্রব্য যদি আয়ের দিক থেকে স্বাভাবিক দ্রব্য (Normal with respect to income) হয়, তাহলে $e_y > 0$ হয়। কিন্তু কোন দ্রব্য যদি আয়ের দিক থেকে নিকৃষ্ট (Inferior with respect to income) হয়, তাহলে আয়ের পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন বিপরীত দিকে হয় এবং $e_y < 0$ হয়।

আয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কোন পরিবর্তন না হলে (অর্থাৎ চাহিদার শূন্য পরিবর্তন হলে) আয়গত স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য হয়। তাহলে আয়গত স্থিতিস্থাপকতার (e_y) তিন প্রকার মান পাই—

(১) $e_y > 0$, (দ্রব্যটি আয়ের দিক থেকে স্বাভাবিক দ্রব্য)
(২) $e_y = 0$,
(৩) $e_y > 0$ (দ্রব্যটি আয়ের দিক থেকে নিকৃষ্ট দ্রব্য)

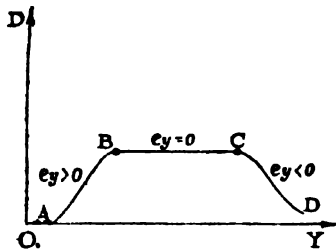
$e_y > 0$ হলে বোঝায় যে e_y এর মান শূন্যের চেয়ে বড়, কিন্তু সেই মান আবার একের চেয়ে বড় ($e_y > 1$), একের সমান ($e_y = 1$) অথবা একের চেয়ে ছোট ($e_y < 1$) হতে পারে।

$e_y > 1$ হলে চাহিদা আয়গতভাবে স্থিতিস্থাপক হয় (demand is income-elastic) ;

$e_y < 1$ হলে চাহিদা আয়গত ভাবে একক স্থিতিস্থাপক হয় (demand is unitary elastic with respect to income) এবং

$e_y < 1$ হলে চাহিদা আয়গতভাবে অস্থিতিস্থাপক হয় (demand is income inelastic)

প্রদত্ত ৩.১২ রেখাচিত্রের সাহায্যে ধনাত্মক, শূন্য ও ঋণাত্মক আয়গত স্থিতিস্থাপকতা দেখানো হয়েছে। এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আয় (Y) এবং উল্লম্ব অক্ষে চাহিদা (D) পরিমাপ করা হয়েছে। এই রেখাচিত্রে ABCD নামক একটি রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। এই রেখার AB অংশটি হল ঊর্ধ্বমুখী অংশ, এখানে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে, কাজেই $e_y > 0$ হয়। এই রেখার BC অংশে চাহিদা স্থির থাকে, কাজেই এই অংশে $e_y = 0$ হয়। এখানে CD অংশটি হল নিম্নমুখী অংশ, এই অংশে আয় বাড়লে চাহিদা কমে, কাজেই $e_y < 0$ হয়।



৩.১২ রেখাচিত্র : চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার চিত্ররূপ

দামগত ও আয়গত স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য : ১। দামের পরিবর্তনের উত্তরে চাহিদার পরিবর্তনশীলতার হারকে দাম-স্থিতিস্থাপকতা বলা হয় এবং আয়ের পরিবর্তনের উত্তরে চাহিদার পরিবর্তনশীলতার হারকে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

২। দামগত স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করার সময় আয় স্থির আছে বলে ধরা হয়। আয়গত স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করার সময় দাম স্থির বলে ধরা হয়।

৩। সাধারণত দাম কমলে বা বাড়লে চাহিদা বাড়ে বা কমে, কাজেই দামগত স্থিতিস্থাপকতা সাধারণতঃ ঋণাত্মক হয়ে থাকে। কিন্তু আয় বাড়লে বা কমলে সাধারণত চাহিদা বাড়ে বা কমে বলে সাধারণ ক্ষেত্রে আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়।

৩.১২ পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা (Cross Price elasticity of demand) :

কোন একটি দ্রব্যের চাহিদা সেই দ্রব্যের নিজস্ব দাম ছাড়াও অন্য দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে। যেমন, মাছের চাহিদা মাছের দাম ছাড়াও মাংসের দামের উপর নির্ভর করে। মাছের দাম যদি স্থির থাকে, কিন্তু মাংসের দাম বৃদ্ধি পায়, তাহলে মাংসের চাহিদা কমে যায় এবং মাছের চাহিদা কিছুটা বেড়ে যেতে পারে। যারা আগে মাংস কিনত, এখন তারা মাংস ছেড়ে কিংবা মাংসের চাহিদা কমিয়ে তার পরিবর্তে মাছের চাহিদা বৃদ্ধি করে। আবার মাছের চাহিদা বাড়লে সেই সঙ্গে মাছ রান্নার জন্য মশলা পাতি, তেল ইত্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যদিও মশলাপাতি বা তেলের দাম স্থির থাকে, তবু মাংসের দাম বৃদ্ধির ফলে মাছ ও মাছরান্নার জন্য বিশেষ ধরনের মশলা পাতির চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। অনুরূপভাবে মোটর-

গাড়ির দাম কমলে পেট্রোলের চাহিদা বাড়তে পারে। এইভাবে বোঝা যায় যে কোন একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলে অন্য কোন পরিপূরক দ্রব্য বা বিকল্পদ্রব্য বা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। **ক্রেতার আয়, রুচি ও পছন্দ স্থির থাকলেও কোন একটি দ্রব্যের দামের নির্দিষ্ট হারে পরিবর্তনের উত্তরে অন্য কোন দ্রব্যের চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তনের হারকে পারস্পরিক দামগত স্থিতিস্থাপকতা, কিংবা সংক্ষেপে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।**

X ও Y নামক যে-কোন দুটি সংশ্লিষ্ট দ্রব্যের দৃষ্টান্ত নিয়ে বলা যায় যে Y-দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলে এবং X-দ্রব্যের দাম ও অন্যান্য বিষয় স্থির থাকলেও X-দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন হতে পারে। এই অবস্থায় Y-দ্রব্যের দামের এক শতাংশ পরিবর্তনের উত্তরে X-দ্রব্যের চাহিদার যে হারে পরিবর্তন হয় তাকে X-দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বলা যায়। অতএব, **Y-দ্রব্যের দামের পরিপ্রেক্ষিতে X-দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা**

$$= \frac{\text{X-দ্রব্যের চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{Y-দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

ধরা যাক P_x = X-দ্রব্যের দাম,

$\Delta P_x = P_x$-এর পরিবর্তন,

P_y = Y-দ্রব্যের দাম,

$\Delta P_y = P_y$-এর পরিবর্তন,

D_x = X-দ্রব্যের চাহিদা,

$\Delta D_x = D_x$-এর পরিবর্তন,

D_y = Y-দ্রব্যের চাহিদা,

$\Delta D_y = D_y$-এর পরিবর্তন এবং,

e_c = চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা।

তাহলে X-দ্রব্যের ক্ষেত্রে $e_c = \frac{\text{X-দ্রব্যের চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{Y-দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তন}}$

X-দ্রব্যের চাহিদার শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta D_x}{D_x} . 100$ এবং

Y-দ্রব্যের দামের শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta P_y}{P_y} . 100$

কাজেই X-দ্রব্যের ক্ষেত্রে

$$e_c = \frac{\frac{\Delta D_x}{D_x} . 100}{\frac{\Delta P_y}{P_y} . 100} = \frac{\Delta D_x}{D_x} . \frac{P_y}{\Delta P_y} = \frac{P_y}{D_x} . \frac{\Delta D_x}{\Delta P_y}.$$

অর্থাৎ Y-দ্রব্যের দামের পরিপ্রেক্ষিতে X-দ্রব্যের ক্ষেত্রে

$$e_c = \frac{\text{Y-দ্রব্যের মূল দাম}}{\text{X-দ্রব্যের মূল চাহিদা}} \times \frac{\text{X-দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন}}{\text{Y-দ্রব্যের দামের পরিবর্তন}}$$

অনুরূপভাবে X-দ্রব্যের দামের পরিপ্রেক্ষিতে Y-দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা, অথবা

$$e_c = \frac{\frac{\Delta D_y}{D_y}.100}{\frac{\Delta P_x}{P_x}.100} = \frac{\Delta D_y}{D_y} \cdot \frac{P_x}{\Delta P_x} = \frac{P_x}{D_y} \cdot \frac{\Delta D_y}{\Delta P_x}.$$

অতএব, Y-দ্রব্যের ক্ষেত্রে $e_c = \frac{\text{X-দ্রব্যের মূলদাম}}{\text{Y-দ্রব্যের মূল চাহিদা}} \times \frac{\text{Y-দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন}}{\text{X-দ্রব্যের দামের পরিবর্তন}}$

৩·১৩ পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা কখন ধনাত্মক ও কখন ঋণাত্মক হয় ?

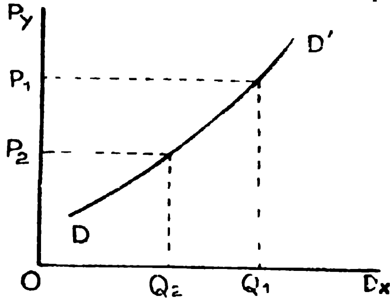
যে-কোন দুটি দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হবে কি ঋণাত্মক হবে সেই বিষয়টি দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। সংশ্লিষ্ট দ্রব্য দুটি পরস্পরের পরিবর্ত বা বিকল্প দ্রব্য হতে পারে। অথবা তারা পরস্পরের পরিপূরক হতে পারে। মাছ ও মাংস, চা ও কফি, ট্রেন ও বাস ইত্যাদি হল বিকল্প দ্রব্য এবং মাছ ও মাছ রান্নার মশলাপাতি, চা ও চিনি, বাস ও পেট্রোল ইত্যাদি হল পরিপূরক দ্রব্য। এই দুইপ্রকার দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য দুটি করা যায়।

(১) দুটি বিকল্প দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন একটি দ্রব্যের দাম কমে গেলে সেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। অতএব দুটি বিকল্প দ্রব্যের মধ্যে কোন একটির দাম কমলে (বা বাড়লে) অন্যটির চাহিদাও কমে যায় (বা বেড়ে যায়) এবং এইভাবে **দুটি বিকল্প দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়।**

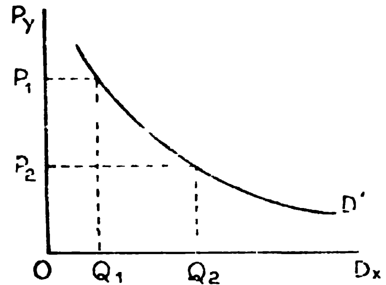
(২) দুটি পরিপূরক দ্রব্যের মধ্যে কোন একটি দ্রব্যের দাম কমলে সেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে পরিপূরক দ্রব্যটির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। আবার, কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে সেই দ্রব্যের চাহিদা কমে এবং সেই সঙ্গে পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদাও কমে। অতএব **দুটি পরিপূরক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়।**

কোন দ্রব্যের দামের সঙ্গে অন্য কোন দ্রব্যের চাহিদার সম্পর্ক কেমন হতে পারে সেই বিষয়টিকে আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যেও দেখাতে পারি। প্রদত্ত ৩·১৩ রেখাচিত্রের বামদিকে DD′ নামক একটি উর্ধ্বমুখী রেখা এবং ডান দিকে DD′ নামক একটি

নিম্নমুখী রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে X-দ্রব্যের চাহিদা (D_x) এবং উল্লম্ব অক্ষে Y-দ্রব্যের দাম (P_y) পরিমাপ করা হয়েছে।



(ক) বিকল্প দ্রব্য



(খ) পরিপূরক দ্রব্য

৩.১৩ রেখাচিত্র : বিকল্প ও পরিপূরক দ্রব্যের দামের পরিপ্রেক্ষিতে কোন দ্রব্যের চাহিদা রেখা

বামদিকের রেখাচিত্রে (ক চিত্রে) দেখা যাচ্ছে Y-দ্রব্যের দাম OP_1 থেকে কমে গিয়ে OP_2 হলে X-দ্রব্যের চাহিদা OQ_1 থেকে কমে OQ_2 হয়। এখানে X ও Y হল বিকল্প দ্রব্য। Y-দ্রব্যের দাম কমলে Y-দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং Y-দ্রব্য যেহেতু X-দ্রব্যের বিকল্প, কাজেই Y-দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে X-দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। Y-দ্রব্যের দাম কমলে X-দ্রব্যের চাহিদা কত কমে সেই বিষয়টি D নামক চাহিদা রেখার ঢাল দ্বারা সূচিত হয়। DD রেখাটি যতই ডানদিকে হেলানো হয়, ততই Y-দ্রব্যের দাম কমলে X-দ্রব্যের চাহিদা অধিক পরিমাণে কমে এবং X-দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে DD′ রেখাটি যতই খাড়া হয়, ততই X-দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা হ্রাস পায়। অতএব DD′ **রেখার ঢাল X-দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার মাত্রা প্রকাশ করে।**

ডানদিকের রেখাচিত্রে D′ হল একটি নিম্নমুখী চাহিদা রেখা। এই রেখা থেকে দেখা যায় যে, Y-দ্রব্যের দাম OP_1 থেকে কমে OP_2 হলে X-দ্রব্যের চাহিদা OQ_1 থেকে বেড়ে OQ_2 হয়। এখানে X ও Y-দ্রব্য হল পরিপূরক। Y-দ্রব্যের দাম কমলে Y-দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং Y ও X দ্রব্য পরিপূরক দ্রব্য হওয়ায় Y-দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে X-দ্রব্যেব চাহিদাও বৃদ্ধি । অতএব ডানদিকের রেখাচিত্রে **নিম্নমুখী চাহিদা রেখাটি দুটি পরিপূরক দ্রব্যের চাহিদার ধনাত্মক পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা সূচিত করে।** এই রেখাও যত খাড়া হয়, ততই পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পায়।

৩.১৪. পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার গুরুত্ব :

পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটির যথেষ্ট তাত্ত্বিক ও বাস্তব গুরুত্ব আছে।

(১) পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার সাহায্যে যে-কোন দুটি দ্রব্যের পারস্পরিক

সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। e_c ধনাত্মক হলে বোঝা যায় যে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্য দুটি হল বিকল্প দ্রব্য। e_c ঋণাত্মক হলে বোঝা যায় যে, সংশ্লিষ্ট দ্রব্য দুটি হল পরিপূরক দ্রব্য।

(২) দ্রব্যের উৎপাদক বা বিক্রেতার কাছে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। কোন ফার্ম যখন উৎপাদনের বাজারে প্রবেশ করে, তখন সেই ফার্ম তার দ্রব্যের পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা কী রকম হতে পারে তার আভাস পেতে চায়। e_c ধনাত্মক ও উচ্চমানসম্পন্ন হলে বোঝা যায় যে, ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের বহু সংখ্যক বিকল্প দ্রব্য আছে। অপরপক্ষে e_c নিম্নমানসম্পন্ন হলে ফার্মের পক্ষে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না।

(৩) অধ্যাপক ট্রিফিন e_c দ্বারা বাজারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য ফার্ম থাকে এবং তারা প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে। প্রায় সমজাতীয় দ্রব্য বলতে বোঝায়, যে দ্রব্যগুলি পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য। কাজেই তাদের e_c খুবই উচ্চমানসম্পন্ন হয়। ট্রিফিনের মতে প্রতিযোগিতার বাজারে $e_c \rightarrow \infty$। e_c-র মান যতই বৃদ্ধি পায় ততই প্রতিযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, একচেটিয়া বাজারে একটিমাত্র ফার্ম থাকে এবং সেই ফার্ম যে দ্রব্য উৎপাদন করে তার কোন ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য থাকে না। কাজেই একচেটিয়া বাজারে e_c প্রায় শূন্য হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, একচেটিয়া বাজারে $e_c \rightarrow 0$. এর থেকে আরো বলা যায় যে, e_c-র মান যতই হ্রাস পায়, ততই বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা হ্রাস পায় এবং e_c-র মান যতই বৃদ্ধি পায়, বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রাও ততই বৃদ্ধি পায়।

মন্তব্য: যে-কোন দুটি দ্রব্যের $e_c > 0$ হলে সেই দ্রব্য দুটি বিকল্প দ্রব্য হবে এবং $e_c < 0$ হলে দ্রব্য দুটি পরিপূরক দ্রব্য হবে—এমন কথা সব সময় বলা যায় না। কোন দ্রব্যের দাম কমলে পরিবর্ত-প্রভাবের দ্বারা তার বিকল্প দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু দাম হ্রাসের ফলে যে আয়-প্রভাবের সৃষ্টি হয়, তার ফলে বিকল্প দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিবর্ত-প্রভাবের দিকে থেকে যে দুটি দ্রব্য বিকল্প দ্রব্য হিসাবে গণ্য হয়, আয়-প্রভাবের দিক থেকে সেই দ্রব্য দুটিই আবার পরিপূরক দ্রব্যে পরিণত হয়। এটি রীতিমত অসঙ্গত ব্যাপার। কাজেই পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার ভিত্তিতে ভোগ্যদ্রব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা উচিত নয়। অধ্যাপক হিক্স আমাদের কাছে প্রথম এই বিষয়টি এমন সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

৩.১৫. দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও ক্রেতার ব্যয়ের সম্পর্ক :

যদি দ্রব্যের দাম $= P$ হয় এবং সেই দামে ক্রেতা যদি Q পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চায়, তাহলে ক্রেতার ব্যয় হবে $P.Q.$ যেমন, কোন দ্রব্যের দাম যদি ১০ টাকা হয় এবং সেই দামে ক্রেতা যদি ৫০ একক দ্রব্য ক্রয় করতে চায় তাহলে তার জন্য ক্রেতার ব্যয় হবে ১০ টাকা × ৫০ = ৫০০ টাকা। এখানে $P =$ ১০ টাকা। $Q =$ ৫০ এবং $PQ =$ ১০ টাকা × ৫০ = ৫০০ টাকা। এখন দ্রব্যের দাম (P) যদি কমে তাহলে চাহিদার নিয়ম অনুসারে চাহিদা (Q) বাড়বে। এখন প্রশ্ন, P যদি কমে এবং Q যদি বাড়ে তাহলে PQ কি

বাড়বে ? স্পষ্টতই PQ বাড়তে পারে, স্থির থাকতে পারে, আবার কমে যেতেও পারে। আসলে এটা নির্ভর করছে P কমলে (বা বাড়লে) Q কীভাবে বাড়ে (বা কমে) তার উপর। যদি P কমে এবং তার উত্তরে যদি Q বেশি হারে বাড়ে তাহলে PQ বাড়বে। P যে হারে কমে Q যদি ঠিক সেই হারে বাড়ে তাহলে PQ স্থির থাকবে এবং P যে হারে কমে Q যদি তার চেয়ে কম হারে বাড়ে তাহলে PQ কমবে। কিন্তু P একটি নির্দিষ্ট হারে কমলে চাহিদা কী হারে বাড়বে তা নির্ভর করছে চাহিদার (দামগত) স্থিতিস্থাপকতার উপর। আমরা বলতে পারি, দ্রব্যের দাম কমলে ক্রেতার ব্যয় (PQ) বাড়বে, কি স্থির থাকবে, কি কমবে—সেটা নির্ভর করছে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদার (দামগত) স্থিতিস্থাপকতা (e) তিন রকম হতে পারে। যথা—

১। $e>1$ (চাহিদা স্থিতিস্থাপক)
২। $e=1$ (চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক)
৩। $e<1$ (চাহিদা অস্থিতিস্থাপক)

প্রথম ক্ষেত্রে দাম যে হারে কমে, চাহিদা তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে, কাজেই ক্রেতার ব্যয় বাড়ে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দাম যে হারে কমে চাহিদা ঠিক সেই হারে বাড়ে, কাজেই ক্রেতার ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে। তৃতীয় ক্ষেত্রে দাম যে হারে কমে চাহিদা তার চেয়ে কম হারে বাড়ে, ফলে ক্রেতার ব্যয় কমে অর্থাৎ

১। যদি $e>1$ হয় তাহলে দাম কমলে ক্রেতার ব্যয় বাড়ে এবং দাম বাড়লে ক্রেতার ব্যয় কমে। দামের পরিবর্তন ও ক্রেতার ব্যয়ের পরিবর্তন বিপরীতমুখী হবে।

২। যদি $e=1$ হয় তাহলে দাম কমলে বা বাড়লে ক্রেতার ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হয় না।

৩। যদি $e<1$ হয় তাহলে দাম কমলে ক্রেতার ব্যয় কমে আবার দাম বাড়লে ক্রেতার ব্যয়ও বাড়ে ; অর্থাৎ দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের পরিবর্তন একমুখী হয়। উপরের তিনটি সম্পর্ক যথাক্রমে ১নং, ২নং ও ৩নং তালিকায় দেখানো হল।

১নং তালিকা : **স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের পরিবর্তন।**

$e>1$

দাম (P)	চাহিদা (Q)	ক্রেতার ব্যয় (PQ)
২০ টাকা	১০	২০০ টাকা
১০ „	২৫	২৫০ „
৫ „	৬০	৩০০ „

১নং তালিকায় উপর থেকে নীচে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, দ্রব্যের দাম যত কমছে,

তার চেয়ে চাহিদা বেশি বাড়ছে, ফলে ক্রেতার ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। নীচে থেকে উপরে গেলে তার বিপরীত হবে।

২নং তালিকা ঃ একক স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের পরিবর্তন।

$e = 1$

দাম (P)	চাহিদা (Q)	ক্রেতার ব্যয় (PQ)
২০ টাকা	১০	২০০ টাকা
১০ "	২০	২০০ "
৫ "	৪০	২০০ "

২নং তালিকায় উপর থেকে নীচে দাম যখন অর্ধেক হয় চাহিদাও তখন দ্বিগুণ হয়; ফলে ব্যয় সমান থাকে।

৩নং তালিকা ঃ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের পরিবর্তন।

$e < 1$

দাম (P)	চাহিদা (Q)	ক্রেতার ব্যয় (PQ)
২০ টাকা	১০	২০০ টাকা
১০ "	১৬	১৬০ "
৫ "	২৫	১২৫ "

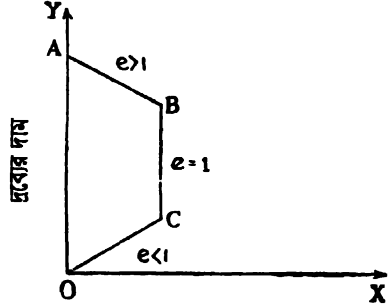
৩নং তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে, দাম যত দ্রুত কমে, চাহিদা তত দ্রুত বাড়ে না; ফলে ব্যয় কমে।

দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের এই পরিবর্তনকে ৩.১৪ নং রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল। এখানে QY-অক্ষে দাম ও OX-অক্ষে ক্রেতার ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। ABCO রেখাটির AB অংশে দাম কমে, ব্যয় বাড়ে, অতএব এখানে $e > 1$. BC অংশে ব্যয় স্থির; অতএব, এখানে $e = 1$, এবং CO অংশে দাম কমলে ব্যয় কমে। অতএব এই অংশে $e < 1$.

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং ক্রেতার ব্যয়ের সম্পর্ক অঙ্কের সাহায্যেও দেখানো যায়।

ক্রেতার ব্যয়কে E দ্বারা এবং ব্যয়ের পরিবর্তনকে ΔE দ্বারা প্রকাশ করা যায়। ব্যয় বাড়লে ΔE ধনাত্মক হয়, অর্থাৎ $\Delta E > O$ হয়। ব্যয় কমলে $\Delta E < O$ হয় এবং ব্যয় স্থির থাকলে $\Delta E = O$ হয়।

দ্রব্যের দামকে P দ্বারা এবং চাহিদার পরিমাণকে Q দ্বারা প্রকাশ করলে বলা যায় যে, ক্রেতার ব্যয় = দ্রব্যের দাম × পরিমাণ অর্থাৎ $E = P.Q.$



৩.১৪ রেখাচিত্র : দ্রব্যের দাম, ক্রেতার ব্যয় ও চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক

ধরা যাক, P কমল ΔP পরিমাণে এবং Q বাড়ল ΔQ পরিমাণে। P কমার জন্য ΔP ঋণাত্মক হবে; Q বৃদ্ধি পেলে ΔQ ধনাত্মক হবে। কাজেই ক্রেতার ব্যয়ের পরিবর্তন হবে

$$\Delta E = P.\Delta Q - Q.\Delta P$$

ক্রেতার ব্যয় বৃদ্ধি পেলে $\Delta E > O$ হয়।

অর্থাৎ $P\Delta Q - Q\Delta P > O$ হয়,

অতএব $P\Delta Q > Q\Delta P$. উভয়পক্ষকে $Q\Delta P$ দ্বারা ভাগ করে পাই,

$\frac{P\Delta Q}{Q\Delta P} > 1.$ এখানে $\frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$ হল দ্রব্যের চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা।

$$\text{অর্থাৎ } e = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$$

তাহলে আমরা পাই, ব্যয় বৃদ্ধি পেলে $e > 1$ হয়।

অন্যভাবে বলা যায় যে, দাম হ্রাস পেলে যদি ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহলে $e > 1$ হয়। ঘুরিয়ে বলা যায়, $e > 1$ হলে দাম হ্রাসের ফলে ক্রেতার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, $e > 1$ হলে দাম বৃদ্ধির ফলে ক্রেতার ব্যয় হ্রাস পায়।

ক্রেতার ব্যয় স্থির থাকলে $\Delta E = O$ হয়।

অর্থাৎ $P\Delta Q - Q.\Delta P \quad O$

অতএব $P\Delta Q = Q\Delta P.$

অথবা $\frac{P}{Q} \; \frac{\Delta Q}{\Delta P} = 1.$

অথবা $e = 1.$

অন্যভাবে, $e = 1$ হলে $\frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P} = 1.$

অতএব $P\Delta P = Q\Delta P.$

অর্থাৎ $P\Delta Q - Q\Delta P \quad O$

অর্থাৎ $\Delta E = O.$ অর্থাৎ ক্রেতার ব্যয় স্থির থাকে।

আবার, দাম হ্রাসের ফলে যদি ক্রেতার ব্যয় হ্রাস পায়

তাহলে $\Delta E < O$ হয়।

অর্থাৎ $P\Delta Q - Q\Delta P < O$,

$P\Delta Q < Q\Delta P$,

$\frac{P\Delta Q}{Q\Delta P} < 1$ হয়।

অনুরূপভাবে সহজেই প্রমাণ করা যায় যে, $e < 1$ হলে দাম বৃদ্ধির ফলে ক্রেতার ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়।

৩.১৬. স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পার্থক্য :

স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করি।

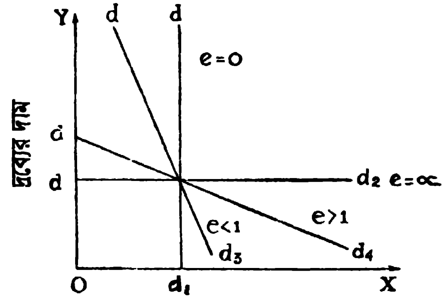
প্রথমত, সংজ্ঞাগত পার্থক্যের কথা বলা যায়। স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন যে হারে হয়, দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন তার চেয়ে বেশি হারে হয়। অপরপক্ষে, অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম যে হারে পরিবর্তিত হয়, দ্রব্যের চাহিদা তার চেয়ে কম হারে পরিবর্তিত হয়।

দ্বিতীয়ত, স্থিতিস্থাপকতা (e)-র মান দেখেও আমরা বলতে পারি চাহিদা স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক। যদি $e > 1$ হয়, তাহলে চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক। যদি $e < 1$ হয়, তাহলে চাহিদা হবে অস্থিতিস্থাপক। যদি $e = \infty$ (অনন্ত) হয় তাহলে চাহিদাকে পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়। এখানে দামের পরিবর্তন শূন্যের কাছাকাছি (প্রায় শূন্য) হলেও চাহিদার পরিবর্তন খুব বেশি হয়। আবার যদি $e = 0$ হয়, তাহলে চাহিদাকে পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বলা হয়। এখানে দামের পরিবর্তন যা হোক না কেন, চাহিদার পরিবর্তন শূন্য হয়, অর্থাৎ চাহিদার কোন পরিবর্তন হয় না।

তৃতীয়ত, চাহিদারেখার আকৃতি দেখেও আমরা বলতে পারি সেই চাহিদা স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক। চাহিদারেখা যত খাড়া হবে তার স্থিতিস্থাপকতাও তত কম হবে। অপরপক্ষে—চাহিদারেখা যত হেলানো হবে তার স্থিতিস্থাপকতাও তত বেশি হবে। চাহিদারেখাটি যদি পরিমাণ-অক্ষের উপর লম্ব হয়, তাহলে $e = 0$ হবে। চাহিদারেখাটি যদি চাহিদা-পরিমাপ অক্ষের সমান্তরাল হয়, তাহলে $e = \infty$ হবে। এই পার্থক্যটিকে আমরা রেখাচিত্রগত পার্থক্য বলতে পারি। পরপৃষ্ঠায় চারিটি চাহিদারেখা আঁকা হয়েছে।

এখানে প্রথম চাহিদারেখা dd_1 OX-অক্ষের উপর লম্ব। এখানে দাম কম বা বেশি যা হোক না কেন, চাহিদা সব সময় Od_1 থাকবে। কাজেই এখানে $e = 0$ হবে। এই রেখাচিত্রে dd_2 হল দ্বিতীয় চাহিদা রেখা। এটি OX-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল।

এখানে Od দামে চাহিদা খুব বেশি এবং দামের সামান্যতম পরিবর্তনের জন্যও চাহিদার খুব বেশি হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কাজেই এখানে $e = \infty$ এবং চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। তৃতীয় চাহিদারেখা dd_3 প্রথম চাহিদারেখার মত খাড়া নয় তাহলেও এটি বেশ খাড়া। কাজেই এখানে $e < 1$ এবং চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হবে। কিন্তু চতুর্থ চাহিদারেখা dd_4 দ্বিতীয় চাহিদারেখা dd_2-র মত হেলানো না হলেও অনেকটা হেলানো। কাজেই এখানে চাহিদা স্থিতিস্থাপক ($e > 1$) হবে। তাহলে আমরা পাই—**যে চাহিদারেখা যত খাড়া তার স্থিতিস্থাপকতা তত কম এবং যে চাহিদারেখা যত বেশি হেলানো তার স্থিতিস্থাপকতা তত বেশি।** অন্যভাবে বলা যায়—যে চাহিদারেখা পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদারেখার খুব কাছে থাকবে, তার স্থিতিস্থাপকতাও তত কম হবে এবং যে চাহিদারেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদারেখার কাছে থাকবে, তার স্থিতিস্থাপকতা তত বেশি হবে।



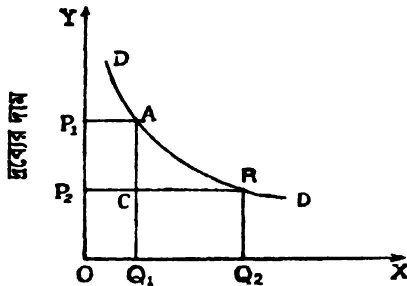
৩.১৫ রেখাচিত্র : চাহিদারেখার আকৃতি ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা

চতুর্থত, কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার ব্যয়ের কী পরিবর্তন হয় তা দেখেও আমরা বলতে পারি সেই দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক কি অস্থিতিস্থাপক। যদি দাম কমলে ক্রেতার ব্যয় বাড়ে এবং দাম বাড়লে ক্রেতার ব্যয় কমে তাহলে চাহিদা হবে স্থিতিস্থাপক। অপরপক্ষে—দাম কমলে যদি ব্যয় কমে এবং দাম বাড়লে যদি ব্যয় বাড়ে তাহলে বুঝতে হবে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

৩.১৭. চাহিদারেখার চাপ-স্থিতিস্থাপকতা (Arc elasticity) ও বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা (Point elasticity) :

(ক) চাপ-স্থিতিস্থাপকতা : কোন বক্ররেখার একটি নির্দিষ্ট অংশকে চাপ (arc) বলা হয়। চাহিদারেখা যদি একটি বক্ররেখা হয় তাহলে তার একটি অংশের উপর বা চাপের উপর চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতাকে **চাপ স্থিতিস্থাপকতা** বলা হয়। অপরপক্ষে, চাহিদারেখার উপর গৃহীত কোন একটি বিন্দুতে যদি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয় তাহলে তাকে বলা হয় **বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা।** বিন্দু স্থিতিস্থাপকতাকে একটি নির্দিষ্ট দামে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও বলা যেতে পারে। একটি চাপ দুটো বিন্দুর মধ্যে থাকে। এই বিন্দু দুটোর ব্যবধান যত বাড়বে চাপও তত বড় হবে। এমনকি একটা গোটা চাহিদারেখাও একটি

চাপ বলে গণ্য হতে পারে। আবার, চাপের প্রান্ত বিন্দু দুটোর মধ্যে একটি বিন্দু যদি স্থির থাকে এবং অন্য বিন্দুটি যদি তার দিকে এগিয়ে যায় তাহলে চাপও ছোট হবে। অবশেষে বিন্দু দুটি খুব কাছে এসে গেলে বা প্রায় মিলে গেলে চাপটি খুবই ছোট হয়ে যাবে। সেই চাপের যে স্থিতিস্থাপকতা হবে, তাকেই আমরা বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা বলতে পারি। অতএব **বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা হল চাপ স্থিতিস্থাপকতার একটি সীমান্তবর্তী রূপ।** কোন বক্ররৈখিক চাহিদারেখার কোন একটি নির্দিষ্ট চাপের উপর চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা কীভাবে পরিমাপ করা যায় তা পাশের রেখাচিত্রে দেখানো হল।



৩.১৬ রেখাচিত্র : চাহিদারেখার চাপ-স্থিতিস্থাপকতা

প্রদত্ত ৩·১৬ রেখাচিত্রে DD′ হল একটি বক্ররৈখিক চাহিদারেখা। এর উপর A ও B দুটি বিন্দু। এই দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী চাহিদা-রেখার চাপ হল AB। A বিন্দুতে দাম $= OP_1 = AQ_1$. এই দামে চাহিদা $= OQ_1$. B বিন্দুতে দাম $= OP_2 = BQ_2 = CQ_1$. এই দামে চাহিদা $= OQ_2$. এখানে দাম কমেছে এবং চাহিদা বেড়েছে।

এখানে দামের পরিবর্তন = দ্বিতীয় দাম − প্রথম দাম
$= OP_2 - OP_1 = -P_1P_2 = -AC.$

চাহিদার পরিবর্তন = দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চাহিদা − প্রথম ক্ষেত্রে চাহিদা
$= OQ_2 - OQ_1 = Q_1Q_2 = BC.$ সুতরাং আমরা লিখতে পারি

$\triangle P = -AC$ এবং $\triangle D = BC.$

অতএব $\dfrac{\triangle D}{\triangle P} = \dfrac{BC}{-AC} = -\dfrac{BC}{AC}$

আমরা জানি, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $= e = -\dfrac{P}{D} \cdot \dfrac{\triangle D}{\triangle P}$

$$= -\frac{\text{মূল দাম}}{\text{মূল চাহিদা}} \times \frac{\text{চাহিদার পরিবর্তন}}{\text{দামের পরিবর্তন}}$$

চাপ-গত স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে চাহিদা ও দামের পরিবর্তন সহজেই পাওয়া যায়। কিন্তু AB চাপের উপর অনেক বিন্দু—প্রত্যেকটি বিন্দুতে দাম ও চাহিদা পৃথক। কাজেই সমগ্র চাপের উপর মূল দাম ও মূল চাহিদা বোঝা যায় না।

অনেকে অবশ্য প্রথম দাম (P_1) ও দ্বিতীয় দাম (P_2)-এর গড়কে মূল দাম বলে

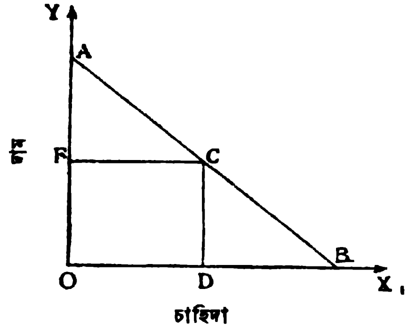
ধরে নেন। সেক্ষেত্রে মূল দাম $=\frac{P_2+P_2}{2}$. এভাবে মূল চাহিদা $=\frac{Q_1+Q_2}{2}$.

তাহলে কোন চাপের উপর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা $=\frac{P_2-P_1}{Q_2-Q_1}\times\frac{Q_2+Q_1}{P_2+P_1}$

$$=\frac{P_1-P_2}{P_1+P_2}\cdot\frac{Q_2+Q_1}{Q_2-Q_1}.$$

(খ) **চাহিদার বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা ও তার পরিমাপ : চাহিদারেখার উপর কোন বিন্দুতে কীভাবে দাম স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায় ?**

চাহিদারেখার কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটি নির্দিষ্ট দাম এবং সেই দামে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাহিদা বোঝায়। প্রদত্ত রেখাচিত্রে AB হল একটি সরলরৈখিক চাহিদারেখা। এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে চাহিদা এবং OY-অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। AB নামক চাহিদা রেখার উপর C একটি বিন্দু। C বিন্দুতে দাম $=OF=CD$ এবং চাহিদা $=OD$. এখন আমরা যদি C বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে পারি, তাহলে তাকে বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা বলা যাবে। অতএব **চাহিদারেখার উপর কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাকে বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।** চাহিদারেখার কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটি নির্দিষ্ট দাম থাকে ; কাজেই বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতাকে একটি নির্দিষ্ট দামে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও বলা যেতে পারে।



৩.১৭ রেখাচিত্র : সরলরৈখিক চাহিদা রেখার উপর কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

আমরা জানি—চাহিদার দাম-গত স্থিতিস্থাপকতা $=\frac{\text{চাহিদার পরিবর্তনের হার}}{\text{দামের পরিবর্তনের হার}}$

$$=\frac{\text{চাহিদার পরিবর্তন}}{\text{মূল চাহিদা}}\div\frac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{মূল দাম}}।$$

ধরা যাক, $P=$ মূল দাম, $\triangle P=$ দামের পরিবর্তন,
$Q=$ মূল চাহিদা, $\triangle Q$ চাহিদার পরিবর্তন,
$e=$ চাহিদার দাম-গত স্থিতিস্থাপকতা।

তাহলে $e=\frac{\triangle Q}{Q}\div\frac{\triangle P}{P}=\frac{\triangle Q}{Q}\times\frac{P}{\triangle P}=\frac{P}{Q}\cdot\frac{\triangle Q}{\triangle P}.$

আমাদের রেখাচিত্রে $P=$ মূল দাম $=OF=CD$ এবং $Q=$ মূল চাহিদা $=OD$. অতএব $\frac{P}{Q}=\frac{CD}{OD}$. অতএব চাহিদারেখার উপর কোন একটি

বিন্দুতে মূল দাম (P) ও মূল চাহিদা (Q) জানা যায়। কিন্তু দামের পরিবর্তন (ΔP) এবং চাহিদার পরিবর্তন (ΔQ) জানা যায় না। তবে চাহিদারেখার ঢাল থেকে আমরা $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। চাহিদারেখার ঢাল হল $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ এবং চাহিদারেখাটি যদি সরলরেখা হয়, তাহলে সেই রেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে ঢালের কোন পরিবর্তন হয় না। এখানে AB নামক সরল-রৈখিক চাহিদারেখার ঢাল সর্বত্র সমান। অতএব এই রেখার ক্ষেত্রে $\frac{\Delta Q}{\Delta P}=\frac{Q}{P}=\frac{OB}{OA}$ হয়। অর্থাৎ AB নামক সরলরৈখিক চাহিদারেখার উপর C বিন্দুতে $e=\frac{P}{Q}\cdot\frac{\Delta Q}{\Delta P}$

$$=\frac{CD}{OD}\times\frac{OB}{OA} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (১)$$

আবার ΔOAB ও ΔCDB-এর মধ্যে পাই,

$\angle AOB=\angle CDB$ (সমকোণ)

$\angle OAB=\angle DCB$ (অনুরূপ কোণ)

এবং $\angle OBA=\angle DBC$ (সাধারণ কোণ)

কাজেই ঐ ত্রিভুজ দুটি সদৃশ ত্রিভুজ (Similar triangles)।

সদৃশ ত্রিভুজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, দুটি সদৃশ ত্রিভুজের পারস্পরিক বাহুগুলির অনুপাত পরস্পর সমান হয়।

অর্থাৎ ΔOABর ভূমি ÷ লম্ব = ΔCDB-র ভূমি ÷ লম্ব হয়।

অতএব $\frac{OB}{OA}=\frac{DB}{DC}$ ... ... (২)

এখন উপরের (১) নম্বর শর্তে (২) নম্বর শর্ত বসিয়ে পাই,

$$e=\frac{CD}{OD}\times\frac{OB}{OA}=\frac{CD}{OD}\times\frac{DB}{DC}=\frac{DB}{OD} \quad \ldots \quad \ldots \quad (৩)$$

(উপরের CD এবং নীচের DC কেটে যাবে)

আবার, OFCD নামক আয়তক্ষেত্রের $OD=FC$ ... ... (৪)

কাজেই (৩) নং শর্তে $OD=FC$ বসিয়ে পাই, $e=\frac{DB}{FC}$ ... ... (৫)

আবার, ΔAFC ও ΔCDB সদৃশ, কারণ

$\angle AFC=\angle CDB$ (সমকোণ)

$\angle FAC=\angle DCB$ (অনুরূপ কোণ)

$\angle ACF=\angle CBD$ (অনুরূপ কোণ)

$$\frac{DB}{FC}=\frac{\Delta CDB \text{ ত্রিভুজের ভূমি}}{\Delta AFC \text{ ত্রিভুজের ভূমি}}=\frac{\Delta CDB \text{ ত্রিভুজের অতিভুজ}}{\Delta AFC \text{ ত্রিভুজের অতিভুজ}}$$

অর্থাৎ $\frac{DB}{FC}=\frac{BC}{AC}$ ... ... (৬)

অতএব, (৫) নং ও (৬) নং শর্ত থেকে পাই,

AB নামক সরলরেখার C বিন্দুতে $e=\frac{BC}{AC}$ ... ... (৭)

এখানে BC হল AB নামক চাহিদারেখার ডানদিকের খণ্ড এবং AC হল বামদিকের খণ্ড। AB রেখার C বিন্দুতে চাহিদার দাম-গত স্থিতিস্থাপকতা হল ডানদিকের খণ্ড ও বামদিকের খণ্ডের অনুপাত। অতএব, **কোন একটি সরলরৈখিক চাহিদারেখার উপর কোন একটি বিন্দু নিলে সেই বিন্দুটি চাহিদারেখাটিকে যে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করে, তাদের ডানদিকের খণ্ডকে বামদিকের খণ্ড দ্বারা ভাগ করলে যে অনুপাত পাওয়া যায় সেই অনুপাতই হল সেই চাহিদারেখার উপর সেই বিন্দুতে চাহিদার দাম-গত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাণ।**

চাহিদারেখাটি যদি AB হয় ৩·১৮ রেখাচিত্র) এবং C যদি তার উপর একটি বিন্দু হয় তাহলে C বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা (e) সম্বন্ধে আমরা নিম্নলিখিত সম্পর্ক-গুলি পাই ঃ

১। C বিন্দুতে $e=\frac{BC}{AC}$;

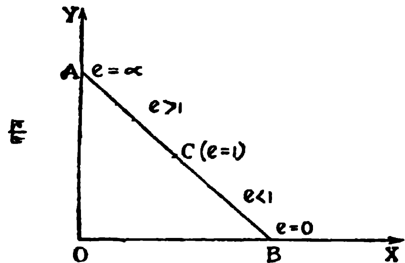
২। C যদি মধ্যবিন্দু হয়, তাহলে BC = AC হবে এবং e = 1 হবে ;

৩; C যদি মধ্যবিন্দুর বাম দিকে থাকে, তাহলে দক্ষিণ ভাগ বাম ভাগের চেয়ে বড় হবে এবং e > 1 হবে ;

৪। C যদি মধ্যবিন্দুর ডান দিকে থাকে, তাহলে দক্ষিণ ভাগ ছোট হবে এবং e < 1 হবে ;

৫। B বিন্দুতে e = 0 এবং

৬। A বিন্দুতে e = ∞ হবে।



৩.১৮ : রেখাচিত্র : চাহিদারেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মান

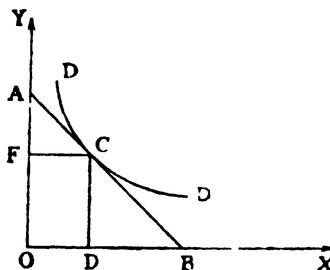
অর্থাৎ সরলরৈখিক চাহিদারেখার মধ্যবিন্দুতে e = 1, মধ্যবিন্দুর বাম দিকে e > 1 এবং ডান দিকে e < 1 হবে। মধ্যবিন্দুর বাম দিকে বা উপরের দিকে যত যাওয়া যাবে স্থিতিস্থাপকতা ততই বাড়বে। এভাবে গেলে চাহিদারেখার বাম দিকের প্রান্ত-বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা হবে অনন্ত। অনুরূপভাবে চাহিদারেখার উপর মধ্যবিন্দুর ডান দিকে বা নীচের দিকে যত যাওয়া যাবে, স্থিতিস্থাপকতাও তত কমবে এবং অবশেষে চাহিদা রেখার ডানদিকের প্রান্তবিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতাও শূন্য হবে। অতএব আমরা পাই—**চাহিদারেখার বিভিন্ন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হয়।**

(গ) বক্ররৈখিক চাহিদারেখার কোন বিন্দুতে কীভাবে দাম-স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয় ?

চাহিদারেখাটি যদি সরলরৈখিক না হয়ে বক্ররৈখিক হয়, তাহলে সেই চাহিদারেখার উপর কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে কীভাবে চাহিদার বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায়, তা পর-পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল।

পর-পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে DD একটি বক্ররৈখিক চাহিদারেখা। এর উপর C একটি বিন্দু। C বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে হবে।

স্থিতিস্থাপকতা $e = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P}$. এখানে P = মূলদাম = CD.



৩.১৯ রেখাচিত্র : বক্ররৈখিক চাহিদারেখার কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

Q = মূল চাহিদা = CD. অতএব $\frac{P}{Q} = \frac{CD}{OD}$. কিন্তু $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$-এর পরিমাপ করা এখানে সহজ নয়। অবশ্য $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ একটি অনুপাত।

আমরা যদি ধরে নিই যে, ΔP খুবেই কম, তাহলে ΔQ খুব কম হবে। অবশেষে ΔP যদি শূন্যের কাছাকাছি এসে যায় তাহলে $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ অনুপাতটি একটি মান পাবে যাকে আমরা সীমা (Limit) বলতে পারি। সেই সীমায় $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$-কে লেখা হবে $\frac{dQ}{dP}$ এবং জ্যামিতিকভাবে $\frac{dQ}{dP}$ হবে চাহিদারেখার উপর সেই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল। আমাদের রেখাচিত্রে AB হল সেই স্পর্শক।

এখানে $\frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{dQ}{dP} = \frac{OB}{OA} = \frac{BD}{CD}$ ($\because$ ΔOAB ও ΔCDB সদৃশ)

অতএব $e = \frac{P}{Q} \cdot \frac{\Delta Q}{\Delta P} = \frac{CD}{OD} \times \frac{BD}{CD} = \frac{BD}{OD}$

এখন C থেকে OY-অক্ষের উপর CF লম্ব অঙ্কন করলে পাওয়া যায় OD = CF.

অতএব $e = \frac{BD}{FC} = \frac{BC}{AC}$ [∴ △AFC ও △CDB সদৃশ]

অতএব চাহিদারেখা বক্ররেখা হলে এবং তার উপর কোন বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে হলে চাহিদারেখার উপর সেই নির্দিষ্ট বিন্দুতে একটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হয়। নির্দিষ্ট বিন্দুটি স্পর্শকটিকে দুটি ভাগে ভাগ করে। এদের দক্ষিণ ভাগটিকে বাম ভাগ দ্বারা ভাগ করলেই স্থিতিস্থাপকতা পাওয়া যায়।

৩.১৮. চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ :

সকল দ্রব্যের চাহিদাই দামের উপর নির্ভর করে, কিন্তু একইভাবে করে না। কোন দ্রব্যের চাহিদার সঙ্গে দামের সম্পর্ক বেশি থাকে, কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক কম থাকে। সব দাম যদি একটি নির্দিষ্ট হারে কমে, তাহলে সব দ্রব্যের চাহিদাই যে সমান হারে বাড়বে এমন বলা যায় না। কোন দ্রব্যের চাহিদা বেশি বাড়ে, কোন দ্রব্যের চাহিদা কম বাড়ে, আবার কোন দ্রব্যের চাহিদা একেবারেই বাড়ে না। এর থেকে বোঝা যায় যে, বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন প্রকার হয়, কারণ স্থিতিস্থাপকতা নামক বিষয়টি একাধিক অন্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১) **দ্রব্যের প্রকৃতি :** চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা দ্রব্যের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। প্রকৃতি অনুসারে ভোগ্যদ্রব্যসমূহকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, প্রয়োজনীয় বা **অত্যাবশ্যক দ্রব্য,** যেমন, চাল, ডাল, কাপড়, কেরোসিন, চিনি প্রভৃতি; **অভ্যাসজনিত প্রয়োজনীয় দ্রব্য,** যেমন, মদ, সিগারেট, পান ইত্যাদি মাদক জাতীয় দ্রব্য বা অন্য যে-কোন দ্রব্য দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং **বিলাস দ্রব্য বা শৌখিন দ্রব্য।** এদের মধ্যে প্রথম দু-প্রকার দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। বিলাস দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হয়। অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা যতটা কমে বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশি কমে।

(২) **দ্রব্যের স্থায়িত্ব :** স্থায়িত্ব অনুসারে ভোগ্যদ্রব্যসমূহকে স্থায়ী (durable), অর্ধ-স্থায়ী (semi-durable) ও অস্থায়ী (non-durable) এই তিনভাগে ভাগ করা যায়। বাড়ি, গাড়ি, টি.ভি., ফ্রিজ ইত্যাদি হল স্থায়ী দ্রব্য, কারণ দীর্ঘদিন ধরে এই দ্রব্যগুলি ভোগ করা যায়। জামা-কাপড়, জুতো, বাসন-পত্র, কলম ইত্যাদি হল অর্ধ-স্থায়ী দ্রব্য কিন্তু অধিকাংশ খাদ্য ও পানীয় হল অস্থায়ী দ্রব্য, কারণ এই দ্রব্যগুলিকে সম্পূর্ণরূপে একাধিকবার ব্যবহার করা যায় না। স্থায়ী দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। একবার কেনা হয়ে গেলে দাম কমলেও তাদের চাহিদা বিশেষ বাড়ে না। কিন্তু অস্থায়ী দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়।

(৩) **ব্যবহার বৈচিত্র্য :** যে দ্রব্য একাধিক ব্যবহারে লাগে (যেমন বিদ্যুৎ) তার

দাম কমলে একাধিক দিক থেকে তার চাহিদা বেড়ে যায়। এর ফলে মোট চাহিদা অনেক বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতাও বেশি হয়।

(৪) **ভোগবিরতির সম্ভাবনা :** দ্রব্যের ব্যবহার বা ভোগ স্থগিত রাখাকে ভোগবিরতি বলা হয়। যে সকল দ্রব্যের ভোগবিরতির সম্ভাবনা কম (যেমন ঔষধ-পত্র) তাদের দাম বাড়লেও চাহিদা বিশেষ হ্রাস পায় না বলে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। বিলাস দ্রব্যের ভোগবিরতি সম্ভব, কাজেই বিলাসদ্রব্যের চাহিদা বেশি স্থিতিস্থাপক হয়।

(৫) **বিকল্প দ্রব্যের সংখ্যা :** কোন দ্রব্যের পরিবর্তে যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করা যায় তাদেরকে বিকল্প দ্রব্য বলা হয়। কোন দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যের সংখ্যা যতই বেশি হয়, তার দাম বাড়লে ক্রেতারা সেই দ্রব্যের পরিবর্তে অন্যান্য দ্রব্য ভোগ করে। এর ফলে সেই দ্রব্যের চাহিদা বেশি পরিমাণে কমে যায় এবং চাহিদা বেশি স্থিতিস্থাপক হয়। যে দ্রব্যের কোন বিকল্প থাকে না (যেমন লবণ) তার চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়।

(৬) **দামের পরিবর্তনের পরিমাণ :** দামের পরিবর্তন খুবই সামান্য হলে চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। এর ফলে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। মোটর গাড়ির দাম ৯০ হাজার টাকা থেকে বেড়ে ৯০ হাজার ১০ টাকা হলে মোটর গাড়ির চাহিদা যে খুব কমে যাবে এমন বলা যায় না। কিন্তু দামের পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হলে চাহিদার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিছুটা বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্নাবলী

১। চাহিদা-সূত্রটি লিখ এবং ব্যাখ্যা কর।

২। কোন দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর কেমনভাবে নির্ভর করে বোঝাও।

৩। চাহিদা-সূত্র লিখ। এই সূত্রটি কীভাবে একটি চাহিদারেখার সাহায্যে দেখানো যায়—বোঝাও।

৪। চাহিদারেখা কাকে বলে? চাহিদারেখার অপসরণ ও তার কারণ ব্যাখ্যা কর।

৫। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে? স্থিতিস্থাপক ও অস্থিতিস্থাপক চাহিদার পার্থক্য কর।

৬। চাহিদারেখার বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা ও চাপ-স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দাও। তাদের পার্থক্য বোঝাও।

৭। চাহিদারেখার উপর কোন একটি বিন্দুতে কীভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায়—রেখাচিত্রসহ আলোচনা কর।

৮। "চাহিদারেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হয়।" উক্তিটি ব্যাখ্যা কর এবং রেখাচিত্র দিয়ে বোঝাও।

৯। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

১০। ঘড়ি, চা, সিগারেট, কাপড়, কেরোসিন, টি. ভি., প্রেশার কুকার, বই, সিনেমার টিকিট, জীবনদায়ী ওষুধের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হবে কি অস্থিতিস্থাপক হবে—লিখ এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে তোমার উত্তরের সমর্থনে সংক্ষিপ্ত যুক্তি দাও।

১১। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও ক্রেতার ব্যয়ের সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

১২। কোন দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে কেন?

১৩। মার্শাল কীভাবে চাহিদা-সূত্রটিকে প্রমাণ করেছিলেন? এই প্রমাণের ত্রুটিগুলি আলোচনা কর।

১৪। চাহিদা-সূত্রটি লিখ। এই সূত্রের ব্যতিক্রম বলতে কী বোঝায়? কীভাবে এই সূত্রের ব্যতিক্রম হয়? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হয় উল্লেখ কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। চাহিদা কী?

২। প্রত্যাশিত দাম ও পরিকল্পিত চাহিদা কাকে বলে? তাদের সম্পর্ক কেমন?

৩। চাহিদা-সূত্র কাকে বলে?

৪। চাহিদা-সূত্রের ব্যতিক্রম কী?

৫। চাহিদারেখার ঢাল ও অবস্থান কাকে বলে?

৬। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?

৭। চাহিদার বিন্দু-স্থিতিস্থাপকতা ও চাপ-স্থিতিস্থাপকতা কী?

৮। গিফেন দ্রব্য কাকে বলে?

৯। $e>1$, $e=1$, $e<1$—উদাহরণ দিয়ে এই তিনটি বোঝাও।

১০। ক্রেতার ব্যয়ের পরিবর্তন থেকে কীভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বোঝা যায়?

১১। দাম-গত স্থিতিস্থাপকতা ও আয়-গত স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দাও এবং পার্থক্য কর।

১২। পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দাও এবং এর গুরুত্ব নির্ণয় কর।

৪ চাহিদার বিকল্প ব্যাখ্যা : নিরপেক্ষতাতত্ত্ব

ভূমিকা : অধ্যাপক মার্শাল চাহিদার নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার সময় ধরে নিয়েছিলেন যে, উপযোগের পরিমাণ পরিমাপযোগ্য। কিন্তু অনেকেই মনে করেন—উপযোগের পরিমাণ পরিমাপ করা যায় না, তবে উপযোগের স্তর সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে দুটি উপযোগ বা তৃপ্তির স্তরের মধ্যে তুলনা করা যায়। যেমন, ২টো তালগাছ দেখেই এবং তাদের উচ্চতা না মেপেই আমরা বলে দিতে পারি কোন্ গাছটা বেশি উঁচু। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়—কত বেশি উঁচু, তাহলে না মেপে তা বলা যাবে না। তৃপ্তির ক্ষেত্রেও তেমনি। আমি ২টো কলা খেলে যে তৃপ্তি পাই, ৫টা খেলে তার চেয়ে বেশি তৃপ্তি পাই কিন্তু কত বেশি তৃপ্তি পাই সেটা বলা যায় না। অর্থাৎ আমরা তৃপ্তির স্তর সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি, তুলনা করতে পারি, বিভিন্ন স্তরকে ঊর্ধ্বক্রমে বা নিম্নক্রমে সাজাতে পারি, কিন্তু কখনই তৃপ্তির স্তর পরিমাপ করতে পারি না। তাছাড়া সুখের কথা এই যে, চাহিদার নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের তৃপ্তির পরিমাণ পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় না। শুধু তৃপ্তির স্তর সম্বন্ধে ধারণা করতে পারলেই আমরা চাহিদার নিয়মটি ব্যাখ্যা করতে ও প্রমাণ করতে পারি। তাহলে অনাবশ্যক অসুবিধা ও জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়ার দায় থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি। এই হল বিকল্প চাহিদা তত্ত্বের মূল কথা। প্যারেটো, স্লাস্কি, হিক্স্, অ্যালেন পণ্ডিতগণ এই তত্ত্বের প্রতিনিধি এবং যে মূল বিষয়টির উপর তাঁদের এই নতুন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তার নাম নিরপেক্ষতাতত্ত্ব। আমরা এখন এই নিরপেক্ষতাতত্ত্বের ভিতরে প্রবেশ করব। এখানে তৃপ্তি ও উপযোগ সমান অর্থে ব্যবহৃত হবে এবং তৃপ্তি বলতে তৃপ্তির স্তর বোঝাবে।

৪.১. নিরপেক্ষতা রেখা কাকে বলে* ? :

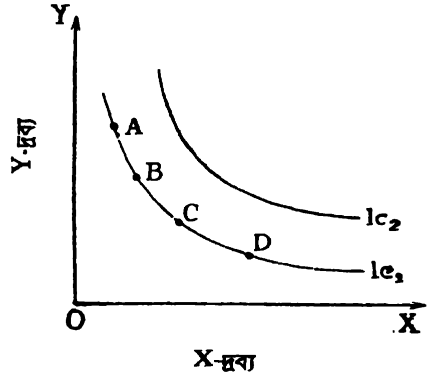
যদি ধরে নিই যে, বাজারে X ও Y নামক দুটিমাত্র দ্রব্য আছে এবং কোন দ্রব্য বেশি পরিমাণে ভোগ করলে ভোগকারীর তৃপ্তি বৃদ্ধি পায়, তাহালে X ও Y—এই দুটি দ্রব্যের কতগুলি মিশ্রণ বা সমন্বয়ের কথা বলা যায়, যাদের থেকে ভোগকারী সমান তৃপ্তি পেতে পারে। এখন এই সমন্বয়গুলির মধ্য দিয়ে যদি একটি রেখা অঙ্কন করা যায় তাহলে সেই রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুতে ভোগকারীর তৃপ্তির

* নিরপেক্ষতা রেখাকে অনেকে নিরপেক্ষ রেখা বলে থাকেন। তবে মনে রাখা দরকার যে, ইংরেজিতে রেখাটির নাম Indifferent curve নয়, ওর নাম Indifference curve. "নিরপেক্ষ রেখা" বললে Indifferent curve বোঝাতে পারে, সেই আশঙ্কায় এখানে নিরপেক্ষতা রেখা ব্যবহার করা হয়েছে।

স্তর সমান থাকবে। সেই রেখার উপর যে-কোন দুটি বা তার অধিক বিন্দুর কোনটিকেই ভোগকারী অন্য বিন্দুর চেয়ে বেশি বা কম তৃপ্তিদায়ক বলতে পারবে না। সেই সব বিন্দুর প্রতি সে নিরপেক্ষ থাকবে। কাজেই এই রেখাকে আমরা নিরপেক্ষতা রেখা বা সমতৃপ্তি রেখা বলতে পারি। অতএব **দুটি দ্রব্যের যে সব সমন্বয় থেকে ভোগকারী সমান তৃপ্তি পায় সেইসব সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত রেখাকে নিরপেক্ষতা রেখা বলা হয়।** উদাহরণের সাহায্যে এটি বোঝান যায়। ধরে নিই ভোগকারী 10X+2Y (১০টি X দ্রব্য ও ২টি Y দ্রব্য) থেকে যে তৃপ্তি পায় তার স্তর 10। এখন যদি X স্থির রেখে Y বাড়ানো হয় কিংবা Y স্থির রেখে X বাড়ানো হয়, তাহলে তার তৃপ্তির স্তর বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু 8X+4Y থেকে ভোগকারী কেমন তৃপ্তি পাবে? এখানে X কমেছে, কাজেই তৃপ্তি কমবে, আবার Y বেড়েছে, অতএব তৃপ্তি বাড়বে। X কমার জন্য তৃপ্তি যতটা কমে, Y বেড়ে যাওয়ার জন্য তৃপ্তি যদি ঠিক ততটা বাড়ে, তাহলে তৃপ্তির স্তর 10 থাকবে। ভোগকারীকে 10X+2Y এবং 8X+4Y দিলে সে ঐ দুটি সমন্বয়ের প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে।

অর্থাৎ 10X+2Y-তে যত তৃপ্তি, 8X+4Y-তে ততই তৃপ্তি পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে যদি 5X+7Y, 4X+9Y, 2X+11Y ইত্যাদি সমন্বয়গুলো থেকেও ভোগকারী সমান তৃপ্তি পায়, তা হলে সমান তৃপ্তিদায়ক অনেকগুলো সমন্বয় পাওয়া যাবে এবং তাদের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত রেখাটিই হবে একটি নিরপেক্ষতা রেখা। পাশের রেখাচিত্রে IC_1 হল একটি নিরপেক্ষতা রেখা। এই রেখাটিতে তৃপ্তির স্তর ধরে নিই 10। এই রেখাটির উপর A, B, C, D ইত্যাদি বিভিন্ন বিন্দুতে তৃপ্তির স্তর 10। ভোগকারী এই বিন্দুগুলির প্রতি নিরপেক্ষ থাকবে।



৪.১ রেখাচিত্র: নিরপেক্ষতা রেখা

আমরা যদি আর একটি নিরপেক্ষতা রেখা IC_2 আঁকি, যে রেখাটি সর্বাংশে IC_1 রেখার উপরে থাকে, তাহলে IC_2 রেখার তৃপ্তির স্তর 10 অপেক্ষা বেশি হবে। কত বেশি হবে? সেটা জানা যাবে না। তবে 10 অপেক্ষা বড় যে-কোন সংখ্যা দিয়ে সেটা প্রকাশ করা যাবে। এইভাবে আমরা বলতে পারি—

উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় তৃপ্তির স্তর উচ্চতর এবং নিম্নতর রেখায় তৃপ্তির স্তর নিম্নতর হবে। ভোগকারী নিম্নতর রেখা থেকে উচ্চতর রেখায় বেশি তৃপ্তি পাবে। আমরা যদি ভোগকারীকে তৃপ্তিলোভী বলে ধরে নিই, তাহলে সে বেশি তৃপ্তি পাবার আশায় উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় যেতে চাইবে।

৪.২. নিরপেক্ষতা রেখার বৈশিষ্ট্য ঃ

নিরপেক্ষতা রেখার তিনটি প্রধান জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য আছে—

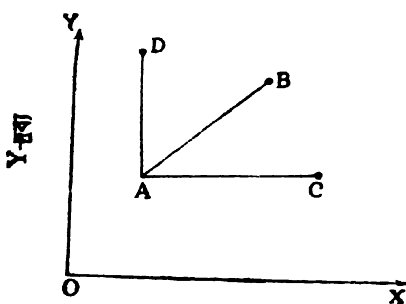
১। নিরপেক্ষতা রেখা রেখাচিত্রের বাঁ দিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয় ;

২। দুটি নিরপেক্ষতা রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না এবং

৩। একটি নিরপেক্ষতা রেখা রেখাচিত্রের মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হয়। আমরা এখন এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করতে পারি।

প্রথম বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা ঃ আমরা ধরেছি, দ্রব্যের ভোগ কমলে বা বাড়লে ভোগকারীর তৃপ্তিও কমে বা বাড়ে। অতএব একটি দ্রব্যের ভোগ যদি কমানো হয়, তাহলে তৃপ্তি কমবে এবং তৃপ্তি সমান রাখার জন্য অন্য দ্রব্যটির ভোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এর অর্থ হল—নিরপেক্ষতা রেখা নিম্নমুখী হবে। নিরপেক্ষতা রেখা যদি নিম্নমুখী না হয় তাহলে (ক) উর্ধ্বমুখী কিংবা (খ) X-অক্ষের সমান্তরাল কিংবা (গ) OY-অক্ষের সমান্তরাল হবে।

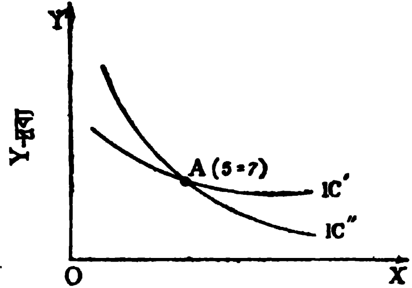
নিরপেক্ষতা রেখা যদি উর্ধ্বমুখী হয়, তাহলে ৪.২ নং রেখাচিত্রে A বিন্দুর মধ্য দিয়ে অঙ্কিত রেখা B বিন্দু দিয়ে যাবে। কিন্তু, B বিন্দুতে A বিন্দুর তুলনায় X-দ্রব্য ও Y-দ্রব্য উভয়েই বেশি আছে। অর্থাৎ B-এর তৃপ্তি কখনই A-এর তৃপ্তির স্তরের সমতুল্য নয়। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নিরপেক্ষতা রেখা উর্ধ্বমুখী হতে পারে না। নিরপেক্ষতা রেখা যদি OX-অক্ষের সমান্তরাল হয়, তাহলে A বিন্দু দিয়ে অঙ্কিত রেখা C বিন্দু দিয়ে যাবে। কিন্তু A বিন্দুর তুলনায় C বিন্দুতে বেশি X (কিন্তু সমান Y) আছে বলে C বিন্দুর তৃপ্তি কখনই A বিন্দুর তৃপ্তির সমান হতে পারে না। দেখা যাচ্ছে নিরপেক্ষতা রেখা OX-অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে না। অনুরূপ যুক্তিতে নিরপেক্ষতা রেখাও OY-অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে না। অতএব নিরপেক্ষতা রেখা অবশ্যই নিম্নমুখী হবে। অবশ্য X বা Y দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ যদি শূন্য হয়, তাহলেই নিরপেক্ষতা রেখা OX কিংবা OY-অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে।



৪.২ রেখাচিত্র :

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা ঃ দুটি নিরপেক্ষতা রেখা স্ববিরোধ না ঘটিয়ে পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না। দুটি নিরপেক্ষতা রেখা পরস্পরকে কোন একটি বিন্দুতে ছেদ করলে সেই ছেদবিন্দুতে দুটি ভিন্ন মাত্রার তৃপ্তি সমান হয় এবং ভোগকারী বা ক্রেতা দুটি দ্রব্যের একটি মাত্র সমন্বয় থেকে দুটি ভিন্ন মাত্রার

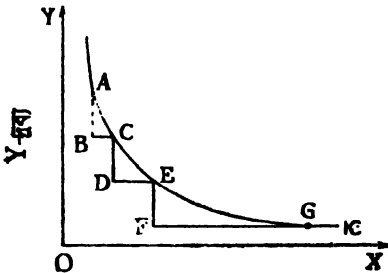
তৃপ্তি উপভোগ করে। কিন্তু এরকম ঘটনা কখনই ঘটতেপারে না। যেমন, ৪.৩ নং রেখাচিত্রে IC′ রেখা 5 একক তৃপ্তি প্রকাশ করে এবং IC″ রেখা 7 একক তৃপ্তি প্রকাশ করে। IC′ ও IC″ রেখা দুটি যদি A বিন্দুতে ছেদ করে, তাহলে A বিন্দুতে 5 = 7 হয়ে যাবে। এটা কখনই হতে পারে না। অতএব দুটি নিরপেক্ষতা রেখা কখনই পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না।



৪.৩ রেখাচিত্র :

তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা : নিরপেক্ষতা রেখা স্বাভাবিক অবস্থায় রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ভোগকারীর আচরণ স্বাভাবিক থাকে এবং দ্রব্য দুটিও স্বাভাবিক দ্রব্য হয়। স্বাভাবিক ভোগকারী বলতে সাধারণত হিসেবী ব্যক্তিকে বোঝায়; সে সব সময় তৃপ্তি পেতে চায় এবং সে যে দ্রব্যটি ছেড়ে দেয় তার প্রতি তার মমতা বেড়ে যায়। স্বাভাবিক দ্রব্য হল এমন দ্রব্য যাকে ভোগ করলে অতৃপ্তি হয় না। দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য, পচা ডিম, পচা ফল এসব দ্রব্য অপদ্রব্য (discommodity)। ভোগকারী অপদ্রব্য ছেড়ে দিতে চায়। ছেড়ে দিতে পারলে তার তৃপ্তি বেড়ে যায়। এই অবস্থায় নিরপেক্ষতা রেখা কীভাবে উত্তল হয় রেখাচিত্রের সাহায্যে তা বোঝান যায়।

৪.৪নং রেখাচিত্রে IC একটি নিরপেক্ষতা রেখা। ধরা যাক, ভোগকারী প্রত্যেক বার সমান সমান পরিমাণে Y-দ্রব্য ছেড়ে দেয় এবং তার বিনিময়ে X-দ্রব্য নেয় অর্থাৎ ভোগকারী Y-দ্রব্যের পরিবর্তে X-দ্রব্য ব্যবহার করে। এখানে X ও Y পরস্পরের বিকল্প দ্রব্য বলে ধরা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে পরিবর্তা ঘটছে। ধরলাম প্রথমে সে AB পরিমাণ Y-দ্রব্য ছেড়ে তার বিনিময়ে BC পরিমাণ X-দ্রব্য নেয়। Y ও X-দ্রব্যের পরিবর্তার হার (Rate of Substitution) হল $\frac{AB}{BC}$. ধরলাম দ্বিতীয় বারে সে CD পরিমাণ Y-দ্রব্য ছেড়ে দিল। এখানে CD = AB ধরা হয়েছে। এখন সে কিন্তু আগের চেয়ে বেশি X-দ্রব্য নেবে, কারণ সে স্বাভাবিক ভোগকারী। সে যত Y-দ্রব্য ছাড়ে ততই Y-দ্রব্যের প্রতি তার মমতা বাড়ে এবং সে যত X-দ্রব্য পায় ততই X-দ্রব্যের প্রতি তার মমতা কমে। এই অবস্থায় সে CD = AB পরিমাণ



৪.৪ রেখাচিত্র :

Y-দ্রব্যের পরিবর্তে এখন DE পরিমাণ X-দ্রব্য নেয়। এখানে DE > BC. সে যদি তৃতীয় বারে সমান পরিমাণ (EF = CD = AB) Y-দ্রব্য ছাড়ে তাহলে আরও বেশি পরিমাণে X-দ্রব্য চাইবে। সে এবার FG পরিমাণ X-দ্রব্য নেবে। এইভাবে সে যত Y-দ্রব্য ছেড়ে তার পরিবর্তে X-দ্রব্য নেবে ততই সমান সমান Y-দ্রব্যের পরিবর্তে বেশি এবং আরও বেশি পরিমাণ X-দ্রব্য নিতে চাইবে। পরিত্যক্ত দ্রব্যের প্রতি স্বাভাবিক ভোগকারীর মমতা বৃদ্ধি পায় এবং গৃহীত দ্রব্যের প্রতি তার মমতা হ্রাস পায় বলে এরকম হয় এবং এইজন্যই নিরপেক্ষতা রেখা রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়। রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে—ভোগকারী A বিন্দু থেকে সরে গিয়ে C বিন্দুতে, C বিন্দু থেকে E-তে, E থেকে G-তে সরে গিয়ে Y-দ্রব্যের পরিবর্তে ক্রমশ সে যতই X-দ্রব্য ব্যবহার করে ততই এই পরিবর্ততা জটিল ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কাজেই পরিবর্ততার হার,—যাকে আমরা প্রান্তিক পরিবর্ততার হার (Marginal Rate of Substitution বা MRS) বলতে পারি তা ক্রমশ কমে যায়। X ও Y নামক দ্রব্য দুটি সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের বিকল্প না হওয়ার জন্যই এরকম হয়।

৪.৪নং রেখাচিত্র থেকে দেখা যায় যে, ভোগকারী

A থেকে C-তে গেলে MRS হয় $\frac{AB}{BC}$.

C থেকে E-তে গেলে MRS হয় $\frac{CD}{DE}$.

এইভাবে A থেকে G পর্যন্ত গেলে MRS $\frac{AB}{BC}$ থেকে কমে গিয়ে $\frac{EF}{FG}$-তে নেমে যায়। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, $\frac{AB}{BC} > \frac{CD}{DE} > \frac{EF}{FG}$। অর্থাৎ $\frac{EF}{FG} < \frac{CD}{DE} < \frac{BA}{BC}$.

কারণ AB = CD = EF, কিন্তু FG > DE > BC.

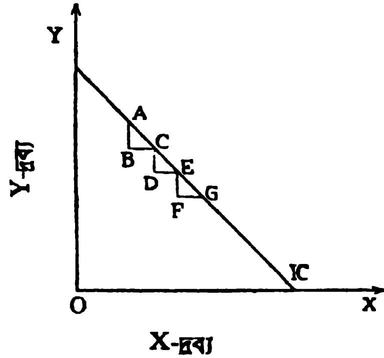
অর্থাৎ $\frac{AB}{BC}$, $\frac{BC}{DE}$ ইত্যাদি অনুপাতগুলির লব সমান কিন্তু হরগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে। কাজেই অনুপাতগুলো কমে যাবে। অতএব আমরা পাই, **উত্তল নিরপেক্ষতা রেখার বাম দিক থেকে ডান দিকে নেমে গেলে প্রান্তিক পরিবর্ততার হার ক্রমশ কমে যায়। একে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্ততার হার বলা হয়।**

৪.৩. নিরপেক্ষতা রেখা কখন সরলরেখা হয়?

দুটি দ্রব্যের মধ্যে পরিবর্ততার হার যদি সর্বদা সমান থাকে তাহলে নিরপেক্ষতা রেখা সরলরেখা হয়। এখানে পরিত্যক্ত দ্রব্যটির সমান সমান পরিমাণের বিনিময়ে ভোগকারী প্রত্যেকবার একই পরিমাণ গৃহীত দ্রব্যটি নেয়। অর্থাৎ যেখানে MRS স্থির সেখানেই নিরপেক্ষতা রেখা সরলরেখা হয়।

অন্যভাবে বলা যায় দুটি দ্রব্য যদি পরিপূর্ণ বিকল্প (Perfect substitutes)

দ্রব্য হয় তাহলেই MRS স্থির থাকে। একটি দ্রব্যের পরিবর্তে যতবার অন্য দ্রব্যটির পরিবর্ততা হোক না কেন, তাতে কোন অসুবিধে হয় না। উত্তল নিরপেক্ষতা রেখার ক্ষেত্রে ক্রমশ এই পরিবর্ততা জটিল হয়ে ওঠে। একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্যটির বেশি পরিমাণ নিতে হয়। কিন্তু দুটি দ্রব্য সাধারণভাবে বিকল্প না হয়ে একটি যদি অন্যটির অনুরূপ হয় তাহলে এই জটিলতা দেখা যায় না। সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা রেখা সরলরেখা হয়। এই রেখাচিত্রে IC একটি সরলরৈখিক নিরপেক্ষতা রেখা। ভোগকারী এখানে AB পরিমাণ Y-দ্রব্যের বিনিময়ে BC পরিমাণ X-দ্রব্য নেয়। অতএব Y ও X-এর প্রান্তিক পরিবর্ততার হার $(MRS)=\frac{AB}{BC}$. দ্বিতীয় বারে সে CD ছেড়ে DE নেয়, এখন AB=CD এবং BC=DE. আগে যে পরিমাণ Y দিয়ে যে পরিমাণ X নিত, এখনও সে সেই পরিমাণ Y-এর বিনিময়ে সেই সমান পরিমাণ X নিচ্ছে। অতএব $\frac{AB}{BC}=\frac{CD}{DE}$. অনুরূপভাবে $\frac{AB}{BC}=\frac{CD}{DE}=\frac{EF}{FG}$ ইত্যাদি, অর্থাৎ MRS সমান। অতএব আমরা পাই, দুটি দ্রব্য যদি পরিপূর্ণ বিকল্প দ্রব্য হয়, তাহলে নিরপেক্ষতা রেখা সরলরৈখিক হয়।

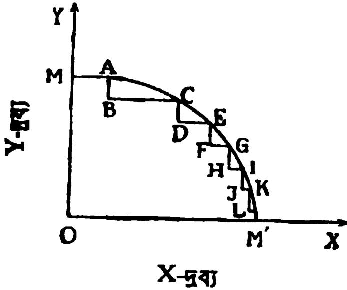


৪.৫ রেখাচিত্র : সরলরৈখিক নিরপেক্ষতা রেখা

৪.৪. নিরপেক্ষতা রেখা কখন অবতল হয় ? :

দুটি দ্রব্যের যে-কোন একটি দ্রব্য যদি অস্বাভাবিক বা অপদ্রব্য হয়, তাহলে নিরপেক্ষতা রেখা অবতল হয়। আবার, ক্রেতার আচরণ যদি অস্বাভাবিক হয় তাহলেও এরকম হতে পারে। X ও Y—এই দুটি দ্রব্যের মধ্যে Y-দ্রব্যটি যদি অপদ্রব্য হয় তাহলে ভোগকারী Y-দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়ে X-দ্রব্য সংগ্রহ করবে। এখানে সে যত বেশিবার Y-দ্রব্য ছেড়ে দেবে তত Y-দ্রব্যের প্রতি তার মমতা বাড়বে না। কাজেই সে তার বিনিময়ে বেশি X-দ্রব্য না পেয়ে যদি কম পায় তাহলেও বিনিময়ে রাজি হবে। সে যত Y ছেড়ে X নেবে তত সমান পরিমাণ Y-এর পরিবর্তে কম X পেলেও তার চলবে। প্রত্যেকবার সে কম X-দ্রব্য পেলেও বিনিময়ে রাজি হবে। অর্থাৎ X ও Y-দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্ততার হার বাড়বে এবং নিরপেক্ষতা রেখাটি মূলবিন্দুর দিকে উত্তল না হয়ে অবতল হবে। আবার—দ্রব্য দুটি যদি স্বাভাবিক হয়, কিন্তু ভোগকারী যদি অস্বাভাবিক হয়, তাহলে সমান Y দিয়ে সে কম X নিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে তার নিরপেক্ষতা রেখা মূলবিন্দুর দিকে অবতল হবে।

৪.৬নং রেখাচিত্রে MM′ একটি অবতল নিরপেক্ষতা রেখা। এখানে Y-দ্রব্যটি অপদ্রব্য। কাজেই ভোগকারী M বিন্দু থেকে M′ বিন্দুর দিকে আসে। প্রথমে সে AB পরিমাণ Y ছাড়ে। তারপর ছাড়ে CD, EF, GH ইত্যাদি। এখানে AB = CD = EF = GH। অর্থাৎ ভোগকারী প্রত্যেকবার সমান Y-দ্রব্য ছেড়ে দেয়। প্রথমে সে AB পরিমাণ Y-দ্রব্যের পরিবর্তে BC পরিমাণ X-দ্রব্য নেয়। এখানে $MRS = \frac{AB}{BC}$. দ্বিতীয়বারে CD ছেড়ে সে নেয় DE। এখানে MRS $= \frac{DC}{DE}$. তৃতীয়বারে $MRS = \frac{EF}{FG}$. দেখা যাচ্ছে DE < BC, FG < DE. অর্থাৎ প্রত্যেকবার সে কম X পায়। এখানে MRS ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। অতএব আমরা পাই, **দুটি দ্রব্যের পরিবর্ততার হার যদি ক্রমবর্ধমান হয় তাহলেই নিরপেক্ষতা রেখা অবতল হয়।**



৪.৬ রেখাচিত্র : অবতল নিরপেক্ষতা রেখা

নিরপেক্ষতা রেখা অবতল হলে কী হবে ?

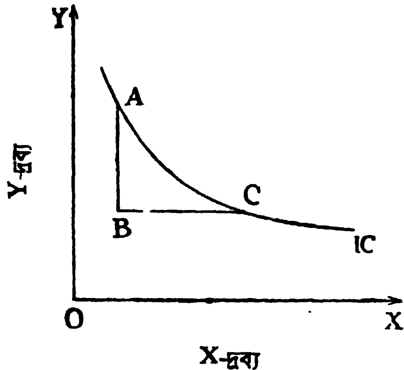
নিরপেক্ষতা রেখা অবতল হলে ভোগকারী দুটি দ্রব্য কাছে রাখে না। যে দ্রব্যটি অপদ্রব্য হবে সেটি ছেড়ে দিয়ে সে ভালো দ্রব্যটি কাছে রাখে। উপরের উদাহরণে Y-দ্রব্যটিকে অপদ্রব্য ধরা হয়েছে। তাহলে ভোগকারী সব Y ছেড়ে দিয়ে M′ বিন্দুতে চলে আসে এবং কেবলমাত্র X-দ্রব্য ভোগ করে। অপরপক্ষে যদি X-দ্রব্যটি অপদ্রব্য হয়, তাহলে সে M বিন্দুতে থাকে এবং কেবলমাত্র Y-দ্রব্য ভোগ করে। অর্থাৎ নিরপেক্ষতা রেখা অবতল হলে ভোগকারী একটি মাত্র দ্রব্য ভোগ করার প্রবণতা বা বাতিকে ভোগে। একে ইংরেজিতে Monomania বলা হয়। এখানে একটা কথা বললে ভাল হয় যে, ভোগকারী অপদ্রব্যটি ছেড়ে দিয়ে তার বিনিময়ে একটি ভাল দ্রব্য নিতে চায়। কিন্তু সমাজের সকলের কাছে যদি সেই অপদ্রব্যটি অপদ্রব্য হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে কেউই অপদ্রব্যটি নিতে চায় না। তবে সমাজ বড়ো বৈচিত্র্যময়। এখানে যে দ্রব্যটি একজনের কাছে অপদ্রব্য, অন্যের কাছে সেটি হয়তো আবার স্বাভাবিক দ্রব্যই।

৪.৫. নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল :

যে রেখাচিত্রের মধ্যে নিরপেক্ষতা রেখা অঙ্কন করা হয় সেই রেখাচিত্রের উল্লম্ব অক্ষে Y-দ্রব্য ও অনুভূমিক অক্ষে X-দ্রব্য পরিমাপ করা হয়। নিরপেক্ষতা রেখার উপর সব বিন্দুতে ভোগকারীর তৃপ্তির স্তর সমান থাকে। ভোগকারী যদি সেই নিরপেক্ষতা রেখার উপর বাম দিকের কোন বিন্দু থেকে ডান দিকের কোন বিন্দুতে সরে যায়,

তাহলে Y-দ্রব্যের ভোগ কিছুটা কমে এবং X-দ্রব্যের ভোগ কিছুটা বাড়ে। কিন্তু ভোগকারীর উপযোগের কোন পরিবর্তন হয় না। এর থেকে বোঝা যায় যে, ভোগকারী Y-দ্রব্যের ভোগ কমিয়ে তৃপ্তির যতটা হ্রাস ঘটায়, X-দ্রব্যের ভোগ বাড়িয়ে ঠিক সেই পরিমাণে তৃপ্তির বৃদ্ধি ঘটাতে সমর্থ হয়।

প্রদত্ত ৪.৭নং রেখাচিত্রে IC হল একটি নিরপেক্ষতা রেখা। এই রেখার উপর A ও C নামক দুটি বিন্দু নেওয়া হয়েছে। ধরা হয়েছে যে, ভোগকারী A বিন্দু থেকে C বিন্দুতে সরে আসে। এর ফলে সে AB পরিমাণে Y-দ্রব্য কমিয়ে BC পরিমাণে X-দ্রব্য নেয় এবং এইভাবে তার তৃপ্তি সমান রাখে। AB পরিমাণে Y-দ্রব্য ছাড়লে তার তৃপ্তি যে পরিমাণে হ্রাস পায়, BC পরিমাণে X-দ্রব্য ব্যবহার করায় তার তৃপ্তি ঠিক সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।



৪.৭ রেখাচিত্র : নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল

Y-দ্রব্যের ভোগ সামান্য পরিমাণে হ্রাস করলে ভোগকারীর মোট উপযোগ যে পরিমাণে হ্রাস পায়, তাকে Y-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ (MU_y) বলা হয়। কাজেই AB পরিমাণ Y-দ্রব্য ছাড়লে ভোগকারীর তৃপ্তি $AB.MU_y$ পরিমাণে হ্রাস পাবে।

অনুরূপভাবে ভোগকারী সামান্যতম পরিমাণে X-দ্রব্য ব্যবহার করলে তার তৃপ্তি MU_x পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কাজেই X-দ্রব্যের ব্যবহার BC পরিমাণে বৃদ্ধি করলে ভোগকারীর তৃপ্তি $BC.MU_x$ পারমাণে বৃদ্ধি পাবে।

Y-দ্রব্য হ্রাস করায় তৃপ্তি যতখানি হ্রাস পায়, X-দ্রব্য বৃদ্ধি করায় তৃপ্তি ততখানি বৃদ্ধি পায়। কাজেই

$$AB . MU_y = BC . MU_x.$$

অতএব $$\frac{AB}{BC} = \frac{MU_x}{MU_y}.$$

এখানে AB হল Y-দ্রব্যের পরিমাণের পরিবর্তন। একে আমরা ΔY বলতে পারি। অতএব $AB = \Delta Y$. কিন্তু ভো রী Y-দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস করেছে, কাজেই ΔY ঋণাত্মক হবে। কাজেই $AB = -\Delta Y$.

আবার, ভোগকারী X-দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করে। X-দ্রব্যের পরিমাণের পরিবর্তনকে ΔX বলা যায়। এখানে X-দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই ΔX ধনাত্মক হবে। অর্থাৎ $BC = +\Delta X$. তাহলে আমরা পাই,

$$\frac{AB}{BC} = \frac{-\Delta Y}{+\Delta X} = -\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MU_x}{MU_y}.$$

এখানে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ হল IC নামক নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল। নিরপেক্ষতা রেখা নিম্ন-মুখী হওয়ায় এর ঢাল ঋণাত্মক হয়। সেজন্য $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$-এর সামনে বিয়োগ চিহ্ন বসানো হয়েছে।

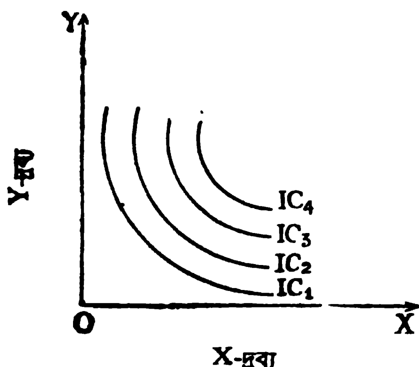
যাহোক, নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল হল

$$\frac{\Delta Y}{\Delta X}=\frac{MU_x}{MU_y}=\frac{\text{X-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{Y-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}।$$

এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে X-দ্রব্য এবং OY-অক্ষে Y-দ্রব্য পরিমাপ করা হয়েছে। সেজন্য নিরপেক্ষতা রেখার ঢালের অনুপাতের লব হয়েছে X-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ এবং হর হয়েছে Y-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ। অতএব

$$\text{নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল}=\frac{\text{অনুভূমিক অক্ষে পরিমিত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{উল্লম্ব অক্ষে পরিমিত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}।$$

৪.৬. নিরপেক্ষতা মানচিত্র : দুটি দ্রব্যের অসংখ্য সম্মিলনকে বা সমন্বয়কে যদি তাদের তৃপ্তির স্তর হিসেবে সাজানো যায় তাহলে রেখাচিত্রে অসংখ্য নিরপেক্ষতা রেখা অঙ্কন করা যায়। উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখাগুলি নিম্নতর রেখার চেয়ে বেশি তৃপ্তির স্তর সূচিত করে। তখন এইসব নিরপেক্ষতা রেখা দ্বারা গঠিত জ্যামিতিক চিত্রকে নিরপেক্ষতা মানচিত্র বলা হয়। ভূগোলে যেমন নির্দিষ্ট সময়ে সমান তাপসম্পন্ন স্থানগুলোকে ঘিরে সমতাপ রেখা অঙ্কন করা হয়, এখানেও তেমনি সমান তৃপ্তিদায়ক দ্রব্য সম্মিলন-গুলিকে নিয়ে সমতৃপ্তি রেখা অঙ্কন করা হয়। সেই রেখাগুলিকে নিয়ে গড়ে ওঠে ভোগকারীর নিরপেক্ষতা মানচিত্র। ৪.৮ নং রেখাচিত্রে IC_1, IC_2, IC_3, IC_4 ইত্যাদি নিপেক্ষতা রেখাগুলিকে নিয়ে ভোগকারীর নিরপেক্ষতা মানচিত্র গড়ে উঠেছে। এখানে IC_1 থেকে ভোগকারী যত উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় যাবে ততই তার তৃপ্তির স্তর বাড়বে।



৪.৮ রেখাচিত্র : নিরপেক্ষতা মানচিত্র

নিরপেক্ষতা মানচিত্রকে ভোগকারীর পছন্দের মানদণ্ড (Scale of Preference) বলা হয়। দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের প্রতি ভোগকারীর পছন্দের মাত্রা কেমন— এই মানচিত্র থেকে তা জানা যায়। অন্যভাবে আমরা বলতে পারি, **নিরপেক্ষতা মানচিত্র হল দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের প্রতি ভোগকারীর রুচি ও পছন্দের মাত্রার জ্যামিতিক চিত্ররূপ।**

৪.৭. ক্রেতার বাজেট রেখা ও তার ঢাল :

যদি X ও Y দুটি দ্রব্য হয় এবং যদি

P_x = X-দ্রব্যের দাম,

P_y = Y-দ্রব্যের দাম,

M = ক্রেতার আর্থিক আয় হয়, তাহলে—ক্রেতা তার আয়ের সাহায্যে $\frac{M}{P_x}$ পরিমাণ X-দ্রব্য ক্রয় করতে পারে। অনুরূপভাবে সে $\frac{M}{P_y}$ পরিমাণ Y-দ্রব্য ক্রয় করতে পারে। **এইভাবে ক্রেতা তার আয়ের সাহায্যে X ও Y-দ্রব্যের যে সব সমন্বয় ক্রয় করতে সমর্থ হয় তাদের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত রেখাকে ক্রেতার বাজেট রেখা বলা হয়।** একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে, ধরি M = 100 টাকা, P_x = 10 টাকা এবং P_y = 5 টাকা।

তাহলে ক্রেতা 100 টাকার সাহায্যে—

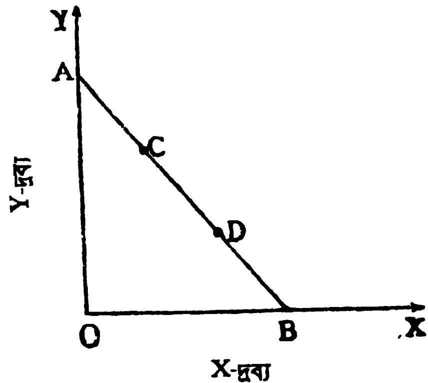
10টি X ও শূন্যটি Y,

9টি X ও 2টি Y,

8টি X ও 4টি Y,

7টি X ও 6টি Y,

6টি X ও 8টি Y, ইত্যাদি বহু সমন্বয় ক্রয় করতে পারবে। প্রত্যেকটি সমন্বয় থেকে রেখাচিত্রের এক একটি বিন্দু পাওয়া যাবে। এইভাবে যতগুলি সমন্বয় হবে, ততগুলি বিন্দু পাওয়া যাবে। ৪.৯ নং রেখাচিত্রে , B, C, D ইত্যাদি বিন্দুগুলো হল এরকম এক একটি সমন্বয় বা বিন্দু। এখন এই বিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে যে রেখা অঙ্কন করা যাবে তাকেই ক্রেতার বাজেট রেখা বলা হবে। আমাদের রেখাচিত্রে AB হল একটি বাজেট রেখা। লক্ষ্য করার বিষয়—AB রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুতে ক্রেতার ব্যয় সমান (100 টাকা কিংবা M টাকা), সেইজন্য একে ক্রেতার সমব্যয় রেখাও বলা যেতে পারে।



৪.৯ রেখাচিত্র : নিরপেক্ষতা মানচিত্র

এখানে ক্রেতা A বিন্দুতে OA পরিমাণ Y-দ্রব্য ক্রয় করে, কিন্তু কোন X-দ্রব্য ক্রয় করে না। অতএব $OA = \frac{M}{P_y}$. অনুরূপভাবে $OB = \frac{M}{P_x}$. তাহলে বাজেট রেখার ঢাল $= \frac{OA}{OB} = OA \div OB = \frac{M}{P_y} \div \frac{M}{P_x} = \frac{M}{P_y} \times \frac{P_x}{M} = \frac{P_x}{P_y}$. অর্থাৎ বাজেট রেখার ঢাল = OX-অক্ষে পরিমিত দ্রব্যের দাম ÷ OY-অক্ষে পরিমিত দ্রব্যের দাম। অন্যভাবে বলা যায়, **বাজেট রেখার ঢাল হল দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত।**

৪.৮. বাজেট রেখার সমীকরণ :

যদি X = X-দ্রব্যের পরিমাণ এবং Y = Y-দ্রব্যের পরিমাণ হয়, তাহলে P_x দামে X পরিমাণ X-দ্রব্য ক্রয় করতে ক্রেতার ব্যয় হবে $X.P_x$ এবং P_y দামে Y-দ্রব্য ক্রয়ের জন্য তার ব্যয় হবে $Y.P_y$. অতএব তার মোট ব্যয় হবে $X.P_x+Y.P_y$. ক্রেতার মোট ব্যয় মোট আয়ের সমান হবে। অতএব বাজেট রেখার সমীকরণ হল,

$$X.P_x+Y.P_y=M.$$

এখন ক্রেতা যদি কিছু অর্থ সঞ্চয় করে, তাহলে তার ব্যয় $X.P_x+Y.P_y$ তার আয়ের চেয়ে কম হবে। অর্থাৎ $X.P_x+Y.P_n<M$ হবে। আবার, ক্রেতা যদি ধার করে খরচ মেটায়, তাহলে $X.X_x+Y.P_y>M$ হবে। কিন্তু আমরা যদি ধরে নিই যে, ক্রেতা সঞ্চয় করে না, ধারও করে না, তাহলে $X.P_x+Y.P_y=M$ হবে। ক্রেতা যদি সঞ্চয় করে, তাহলে ক্রেতা বাজেট রেখার নীচে থাকবে। সে যদি সঞ্চয় বা ধার না করে তাহলে সে বাজেট রেখার উপরে থাকবে। ক্রেতার আয় সীমাবদ্ধ। তার ক্রয়ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সে কখনই বাজেট রেখার উপরের দিকের দ্রব্য-সমন্বয় ক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু কোন কারণে যদি তার আয় বেড়ে যায়, কিংবা দ্রব্যের দাম কমে যায়, তাহলে সেটা সম্ভব হতে পারে।

৪.৯. বাজেট রেখার পরিবর্তন :

বাজেট রেখার অবস্থান নির্ভর করে (১) ক্রেতার আয় ও (২) দ্রব্য দুটির দামের উপর। অতএব যদি ক্রেতার আয় বাড়ে বা কমে তাহলে বাজেট রেখার অবস্থানের পরিবর্তন হয়। আবার দ্রব্য দুটির মধ্যে যে-কোন একটি বা দুটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলেও বাজেট রেখার অবস্থানের পরিবর্তন হয়। আমরা এখানে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির কথা বলতে পারি।

(ক) যদি দুটি দ্রব্যের দাম স্থির থাকে এবং ক্রেতার আয় বাড়ে বা কমে, তাহলে বাজেট রেখা সমান্তরালভাবে যথাক্রমে উপরের দিকে কিংবা নীচের দিকে সরে যায়।

অর্থাৎ P_x ও P_y স্থির থাকলে $\frac{P_x}{P_y}$ = বাজেট রেখার ঢাল স্থির থাকে।

কিন্তু ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেতা পূর্বের তুলনায় বেশি পরিমাণে X ও Y-দ্রব্য ক্রয় করতে পারে। অতএব বাজেট রেখার ঢাল সমান থেকে বাজেট রেখাটি উপরের দিকে উঠে যায়। ঢাল সমান থাকায় উচ্চতর বাজেট রেখাটি নিম্নতর বাজেট রেখার সমান্তরাল হয়। ৪.১০ নং রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখানো হল।

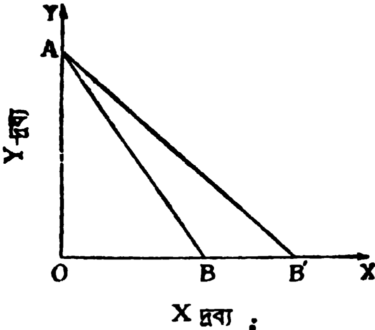
এখানে AB হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা। এর সমীকরণ হবে $X.P_x+Y.P_y=M$. এখন যদি আয় বৃদ্ধি পায়, তাহলে ক্রেতা OA′ পরিমাণ X-দ্রব্য অথবা OB′ পরিমাণ Y-দ্রব্য ক্রয় করতে পারবে। এখানে $OA'>OA$ এবং $OB'>OB$. কিন্তু

OAB ও OA′B′ ত্রিভুজ সদৃশ হওয়ায় $\frac{OA}{OB}=\frac{OA'}{OB'}$ হবে, অর্থাৎ AB ও A′B′ বাজেট রেখা দুটি পরস্পর সমান্তরাল হবে। এখানে A′B′ বাজেট রেখার সমীকরণ হবে $X.P+Y.P_y=M'(M'>M)$। অতএব আমরা পাই, **দুটি দ্রব্যের দাম যদি স্থির থাকে এবং ক্রেতার আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে বাজেট রেখা সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যায়। বিপরীতক্রমে, আয় যদি কমে যায় তাহলে বাজেট রেখা সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যায়।**

৪.১০ রেখাচিত্র : ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন ও বাজেট রেখার পরিবর্তন

(খ) যদি ক্রেতার আয় স্থির থাকে এবং একটি দ্রব্যের দাম কমে যায় (অন্য দ্রব্যটির দাম স্থির থাকে), তাহলে বাজেট রেখার অবস্থানের আংশিক পরিবর্তন হয়। যে দ্রব্যের দাম স্থির থাকে, বাজেট রেখাটি সেই অক্ষে স্থির থাকে, কিন্তু যে দ্রব্যের দাম কমে যায় সেই অক্ষের ডান দিকে সরে যায়। অপরপক্ষে দ্রব্যের দাম যদি বেড়ে যায়, তাহলে—বাজেট রেখাটি সেই অক্ষে বাম দিকে সরে যায়। ৪.১১ নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল।

এখানে AB হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা। এবার যদি ধরে নিই যে, X-দ্রব্যের দাম কমে গেল, তাহলে বাজেট রেখাটি OY-অক্ষে A-বিন্দুতে স্থির থেকে OX-অক্ষে ডান দিকে সরে যাবে। এখন বাজেট রেখাটি হবে AB′. আগে ক্রেতা তার আয় দিয়ে যে পরিমাণ X-দ্রব্য ক্রয় করতে পারত, এখন তার চেয়ে বেশি পরিমাণ X-দ্রব্য ক্রয় করতে পারবে। এর ফলেই বাজেট রেখাটি AB থেকে সরে গিয়ে AB′ হবে। আবার X-দ্রব্যের দাম যদি বেড়ে যায়, তাহলে ক্রেতা আগের ... কম X-দ্রব্য ক্রয় করতে পারবে। তখন বাজেট রেখাটি B বিন্দুর বাম দিকে সরে আসবে।



৪.১১ রেখাচিত্র : একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ও বাজেট রেখার পরিবর্তন

অনুরূপভাবে যদি ক্রেতার আয় ও X-দ্রব্যের দাম স্থির থাকে কিন্তু Y-দ্রব্যের দাম কমে যায়, তাহলে বাজেট রেখাটি OX-অক্ষের যেখানে ছিল সেখানেই স্থির থাকবে, কিন্তু OY-অক্ষের উপরের দিকে উঠে যাবে। Y-দ্রব্যের দাম বাড়লে নীচের দিকে নেমে যাবে।

(গ) যদি ক্রেতার আয় স্থির থাকে, কিন্তু P_x ও P_y সমান হারে কমে যায় তাহলে বাজেট রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যাবে এবং P_x ও P_y সমান হারে বেড়ে গেলে বাজেট রেখাটি সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যাবে। ক্রেতার আয় স্থির থাকলে এবং দাম কমে গেলে ক্রেতার আয়ের ক্রয়ক্ষমতা বেড়ে যায়, কাজেই বাজেট রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যায়।

যদি M স্থির থাকে এবং P_x ও P_y কমে যায় তাহলে $\frac{M}{P_x}$ ও $\frac{M}{P_y}$ উভয়েই সমান হারে বাড়বে এবং বাজেট রেখার ঢাল $=\frac{M}{P_y} \div \frac{M}{P_x} = \frac{P_x}{P_y}$ সমান থাকবে। অর্থাৎ বাজেট রেখা সমান্তরাল থাকবে। বিপরীতক্রমে, যদি M স্থির থাকে, কিন্তু P_x ও P_y সমান হারে বাড়ে, তাহলে বাজেট রেখাটি সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যাবে।

৪.১০. **ক্রেতার ভারসাম্য অর্জন :** (দুটি দ্রব্যের দাম, ক্রেতার আয়, রুচি ও পছন্দ দেওয়া থাকলে ক্রেতা কীভাবে ও কী পরিমাণে দ্রব্য দুটি ক্রয় করে তার আলোচনা)।

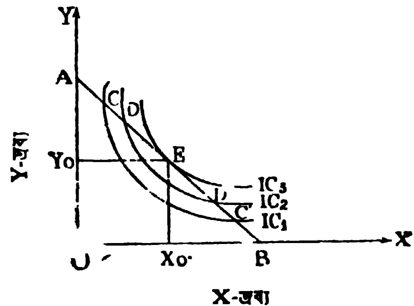
ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করে ভোগ করার জন্য। ভোগ থেকে তৃপ্তি আসে। ভোগ বাড়লে তৃপ্তি বাড়ে। কিন্তু ভোগ্য দ্রব্যগুলো ক্রয় করতে দাম দিতে হয়। ক্রেতার আয় সীমাবদ্ধ। সে যত ইচ্ছা দ্রব্য ক্রয় করতে পারে না। কোন দ্রব্য বেশি ক্রয় করলে অন্য দ্রব্য ক্রয় করার অর্থ কম পড়ে যায়। অর্থাৎ ক্রেতাকে একটি নির্দিষ্ট আয়ের মধ্যে থেকে এমনভাবে দ্রব্য ক্রয় করতে হয় যাতে তার অর্থে কুলিয়ে যায়, অথচ তৃপ্তিও সবচেয়ে বেশি হয়। **ক্রেতা যখন নির্দিষ্ট আয়ের সাহায্যে এমনভাবে দ্রব্য ক্রয় ও ভোগ করে যাতে সে সর্বাধিক তৃপ্তি পায় তখনই সে ভোগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য লাভ করে।** বাহ্যিক কোন চাপ না এলে সে স্বেচ্ছায় সেই অবস্থা থেকে বিচ্যুত হতে চায় না।

ক্রেতার ভারসাম্য নির্ধারণে ক্রেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে কোন্ দ্রব্যের কতখানি ক্রয় করবে। দ্রব্যের পরিমাণই এখানে বিচার্য বিষয়। কতগুলো অন্য বিষয় তার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে। এদের মধ্যে প্রধান হল (১) দ্রব্যের সংখ্যা, (২) দ্রব্যের দাম, (৩) ক্রেতার আয়, (৪) ক্রেতার রুচি ও পছন্দ এবং (৫) ক্রেতার তৃপ্তি লাভের ইচ্ছা। এই বিষয়গুলির মধ্যে দ্রব্যের সংখ্যা, দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার আয় বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। বাজারে অসংখ্য দ্রব্য থাকতে পারে। আবার অসংখ্য ক্রেতাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে একজন ক্রেতা দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। দাম কম বা বেশি যাই হোক না কেন, ক্রেতাকে সেই দাম ধরে নিয়ে ক্রয় করতে হয়। ক্রেতার আয়ও ক্রেতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। ক্রেতা কীভাবে এই আয় পায় সেটা অনেকগুলি বাহ্যিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে, যার উপর ক্রেতার কোন হাত থাকে না। দ্রব্যের সংখ্যা, দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার আয় হল বস্তুগত বা বাহ্যিক বিষয় (Objective factors)। ক্রেতার ভারসাম্য এই সব বস্তুগত বিষয় ছাড়াও কতগুলি ব্যক্তিগত বিষয়ের (Subjective factors) উপর নির্ভর করবে।

ক্রেতার নিজস্ব বা ব্যক্তিগত বিষয় হল তার রুচি ও পছন্দের মানদণ্ড (Scale of Preference) এবং সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা। ক্রেতার রুচি ও পছন্দ তার নিরপেক্ষতা মানচিত্রে প্রতিফলিত হয়। আমরা ধরে নেব যে—এই মানচিত্রটি দেওয়া আছে। তাছাড়া আমরা ধরব যে, (১) বাজারে X ও Y নামক দুটি মাত্র দ্রব্য আছে, (২) দ্রব্যের দাম P_x ও P_y দেওয়া আছে, (৩) ক্রেতার আয় দেওয়া আছে, (৪) ক্রেতার নিরপেক্ষতা মানচিত্র দেওয়া আছে এবং (৫) প্রদত্ত অবস্থায় ক্রেতা সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করতে চায়। এই অনুধারণাগুলির ভিত্তিতে ক্রেতার ভারসাম্য আলোচনা করা যেতে পারে।

ক্রেতার আয় এবং P_x ও P_y দেওয়া আছে বলে আমরা ক্রেতার বাজেট রেখা পাব। ধরলাম ৪.১২ নং রেখাচিত্রে AB হল তার বাজেট রেখা। ক্রেতা সব আয় খরচ করে। কাজেই সে বাজেট রেখার উপরে থাকবে। ক্রেতার নিরপেক্ষতা মানচিত্রও দেওয়া আছে। এখন তার বাজেট রেখাকে নিরপেক্ষতা মানচিত্রে স্থাপন করে বুঝতে পারব ক্রেতা কোন্ বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে এবং কী পরিমাণে X ও Y-দ্রব্য দুটি ক্রয় ও ভোগ করবে।

আমরা বলতে পারি, রেখাচিত্রে যেখানে ক্রেতার বাজেট রেখা সবচেয়ে উঁচু নিরপেক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করবে—সেই স্পর্শবিন্দুতে ক্রেতা সর্বাধিক তৃপ্তি পাবে এবং সেখানেই সে ভারসাম্য লাভ করবে। ৪.১২ নং রেখাচিত্রে এই বিন্দুটি হল E. কারণ E বিন্দুটি AB বাজেট রেখার উপর আছে এবং সেই সঙ্গে এটি সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা রেখা IC_3-কে স্পর্শ করছে। ক্রেতা যদি এই স্পর্শবিন্দুতে না থাকে, যদি সে কোন ছেদবিন্দুতে থাকে, তাহলে তার খরচ সমান হবে, কিন্তু তৃপ্তি যাবে কমে। যেমন, C বা C′ বিন্দুতে ক্রেতার খরচ সমান, কিন্তু তৃপ্তি হবে IC_3 রেখার তৃপ্তির চেয়ে কম। অতএব ক্রেতা C বিন্দুতে থাকবে না। যদি কোনক্রমে থাকেও, তাহলে সে C বিন্দুর ডান দিকে সরে যাবে। সে যদি এইভাবে D বিন্দুতে যায়, তাহলে তার খরচ বাড়বে না, কিন্তু C বিন্দুর তুলনায় D বিন্দুতে তৃপ্তি বাড়বে। কারণ C বিন্দু IC_1 রেখার উপর অবস্থিত। কিন্তু D বিন্দু IC_2 রেখার উপর অবস্থিত। তাহলে ক্রেতা ডানদিকে সরে গিয়ে বেশি তৃপ্তি লাভ করছে। এইভাবে সে E বিন্দুতে আসবে। E বিন্দুর ডানদিকে সরে গেলে সে যদি C′ বিন্দুতে কিংবা D′ বিন্দুতে চলে যায় তবে তার খরচ সমান থাকবে, কিন্তু তৃপ্তি কমে যাবে। অতএব সর্বাধিক তৃপ্তি



৪.১২ রেখাচিত্র : ক্রেতার ভারসাম্য অর্জন

লাভ করার জন্য সে আবার বামদিকে E বিন্দুতে সরে আসবে। এইভাবে সে E বিন্দুতেই ভারসাম্য লাভ করবে। E বিন্দুতে ক্রেতা OX_0 পরিমাণ X-দ্রব্য এবং OY_0 পরিমাণ Y-দ্রব্য ক্রয় করবে। এদুটিই হবে ক্রেতার ভারসাম্য-ক্রয়ের পরিমাণ।

৪-১১. **ক্রেতার ভারসাম্যের শর্ত :** ভারসাম্যের শর্ত দুটি। প্রথমত, বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা রেখা ভারসাম্য বিন্দুতে পরস্পরকে স্পর্শ করবে। দ্বিতীয়ত, নিরপেক্ষতা রেখাগুলি রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হবে। প্রথম শর্তটিকে প্রয়োজনীয় শর্ত বলা হয়। আর দুটি শর্তকে একসঙ্গে ধরে নিয়ে ভারসাম্যের যথেষ্ট শর্ত পালিত হয়। প্রথমে প্রথম বা প্রয়োজনীয় শর্তের কথা বলা যাক।

প্রথম শর্তানুযায়ী বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা রেখা পরস্পরকে স্পর্শ করবে। অর্থাৎ স্পর্শবিন্দুতে বাজেট রেখার ঢাল $\left(\frac{P_x}{P_y}\right)$ ও নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল $\left(\frac{MU_x}{MU_y}\right)$ সমান হবে। অতএব, ভারসাম্য বিন্দুতে $\frac{MU_x}{MU_y}=\frac{P_x}{P_y}$ হবে।

আমরা পাই ভারসাম্যের বিন্দুতে $\frac{MU_x}{MU_y}=\frac{P_x}{P_y}$

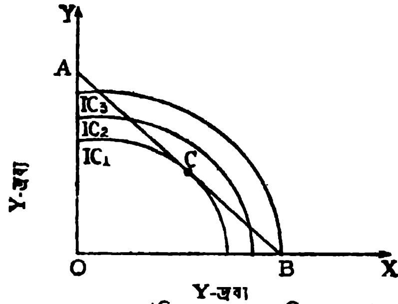
অর্থাৎ $\frac{MU_x}{P_x}=\frac{MU_y}{P_y}$.

অর্থাৎ $\frac{\text{X-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{X-দ্রব্যের দাম}}=\frac{\text{Y-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{Y-দ্রব্যের দাম}}$

এই শর্ত থেকে পাই ক্রেতা দুটি দ্রব্য থেকে সমান প্রান্তিক উপযোগ পাবে। সে এমনভাবে তার আয়কে দুটি দ্রব্যের মধ্যে বণ্টন করবে, যাতে সে উভয় দ্রব্য থেকে অর্থমূল্যে সমান প্রান্তিক উপযোগ পায়। যদি $\frac{MU_x}{P_x}>\frac{MU_y}{P_y}$ হয়, তাহলে ক্রেতা X-দ্রব্যের উপর ব্যয় বৃদ্ধি করবে এবং Y-দ্রব্যের উপর ব্যয় হ্রাস করবে। অর্থাৎ সে বেশি পরিমাণে X-দ্রব্য ক্রয় করবে এবং কম পরিমাণে Y-দ্রব্য ক্রয় করবে। ফলে MU_x কমবে এবং MU_y বাড়বে। এইভাবে $\frac{MU_x}{P_y}$ ও $\frac{MU_y}{P_y}$ সমান হবে।

ক্রেতা কীভাবে তার আয় দুটি দ্রব্যের উপর বণ্টন করবে তার উত্তর হল এই শর্তটি। এই শর্ত অনুসারে ক্রেতা এমনভাবে দুটি দ্রব্য ক্রয় করবে, যাতে সে দুটি দ্রব্য থেকেই সমান প্রান্তিক উপযোগ পায়। যেখানে বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা রেখা স্পর্শক হয়, সেখানে এই শর্ত পালিত হয়।

দ্বিতীয় শর্তেরও একটি অর্থনৈতিক অর্থ আছে। নিরপেক্ষতা রেখা যদি রেখাচিত্রের মূল বিন্দুর দিকে উত্তল না হয়ে অবতল হয়, তাহলে বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা রেখার স্পর্শবিন্দুতে ক্রেতার তৃপ্তি সর্বাধিক না হয়ে সর্বনিম্ন হবে। ৪·১৩ নং রেখাচিত্রে এটা দেখানো হল। এখানে IC_1, IC_2, IC_3 ইত্যাদি হল অবতল নিরপেক্ষতা রেখা, AB হল বাজেট রেখা। C বিন্দুতে এই রেখাটি IC_1 নিরপেক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করেছে। এখানে IC_1 হল নিম্নতম নিরপেক্ষতা রেখা। ক্রেতা যদি C বিন্দুর ডানদিকে কিংবা বামদিকে সরে যায়, তাহলে সে উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় যেতে পারবে। কাজেই C বিন্দুটি ভারসাম্য বিন্দু হবে না।



৪.১৩ রেখাচিত্র: অবতল নিরপেক্ষতা রেখা ও ক্রেতার ভারসাম্য

অতএব নিরপেক্ষতা রেখার আকৃতি যদি রেখাচিত্রের মূল বিন্দুর দিকে উত্তল না হয়ে অবতল হয়, তাহলে বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা রেখার স্পর্শবিন্দুতে ভারসাম্য হবে না। নিরপেক্ষতা রেখার উত্তলতা ভারসাম্যের একটি শর্ত।

আমরা জানি নিরপেক্ষতা রেখার উত্তলতার একটি বিশেষ অর্থ আছে। দুটি দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় বা পরিবর্ততা ঘটলে সেই পরিবর্ততার (প্রান্তিক) হার ক্রমহ্রাসমান হলেই নিরপেক্ষতা রেখা উত্তল হয়। ক্রেতার আচরণ ও দ্রব্য দুটি স্বাভাবিক হলেই প্রান্তিক পরিবর্ততার হার ক্রমহ্রাসমান হয়। অর্থাৎ এরূপ ক্ষেত্রেই ভারসাম্য ঘটবে। এটাই হল দ্বিতীয় শর্তের অর্থ।

৪.১২. (ক) সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি (The Law of equimarginal utility):

অধ্যাপক মার্শাল প্রথম সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির কথা আলোচনা করেছিলেন। এই বিধির বক্তব্য হল যে, একজন স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ক্রেতা প্রত্যেক দ্রব্য থেকে অর্থের হিসেবে সমান প্রান্তিক উপযোগ পাবে। বাজারে যদি n-সংখ্যক দ্রব্য থাকে—যাদের প্রান্তিক উপযোগকে MU_1, MU_2,…,MUn দ্বারা প্রকাশ করা যায়, এবং যদি P_1, P_2, P_n যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়,……n-তম দ্রব্যের দাম হয়, তাহলে সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি-অনুযায়ী

$$\frac{MU_1}{P_1}=\frac{MU_2}{P_2}=\frac{MU_3}{P_3}=\cdots=\frac{MU_n}{P_n}$$ হবে।

এটি হল n-সংখ্যক দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার ভারসাম্য অর্জনের প্রয়োজনীয় শর্ত। অবশ্য এটি যথেষ্ট শর্ত নয়। যথেষ্ট শর্ত পালিত হবে যদি (ক) সমপ্রান্তিক

উপযোগ বিধি কার্যকর হয় এবং (খ) প্রত্যেকটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হয়। দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই বিধিটি ব্যাখ্যা করা যায়। পরে দুই-এর বেশি সংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রে তার সম্প্রসারণ ঘটানো যায়।

অধ্যাপক মার্শালের মতে দ্রব্যের উপযোগ অর্থের প্রান্তিক উপযোগ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। অর্থের প্রান্তিক উপযোগ এখানে উপযোগের মাপকাঠি, কাজেই অপরিবর্তনশীল। ধরি $k =$ অর্থের প্রান্তিক উপযোগ = একটি ধ্রুবক। কোন দ্রব্যের দাম হিসেবে যদি P-পরিমাণ অর্থ দেওয়া হয়, তাহলে তার উপযোগ হবে $P.k.$ এখন দ্রব্য ক্রয়ের শর্ত হল যে, দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ (প্রাপ্ত) = দামের উপযোগ (পরিত্যক্ত উপযোগ) হবে। প্রথম দ্রব্যের ক্ষেত্রে $MU_1 = P_1 k.$

অর্থাৎ $\frac{MU_1}{P_1} = k =$ একটি ধ্রুবক ...(i)

দ্বিতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে $MU_2 = P_2 k.$

অতএব $\frac{MU_2}{P_2} = k$ ...(ii)

এখন (i) ও (ii) থেকে পাই $\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2}.$

(কারণ উভয়েই k নামক একটি ধ্রুবকের সমান)

অনুরূপভাবে n-সংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রে

$$\frac{MU_1}{P_1} = k, \frac{MU_2}{P_2} = k, \frac{MU_3}{P_3} = k, \quad \ldots\ldots \frac{MU_n}{P_n} = k.$$

অর্থাৎ $\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2} = \frac{MU_3}{P_3} = \ldots\ldots = \frac{MU_n}{P_n}$

দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি $\frac{MU_1}{P_1} > \frac{MU_2}{P_2}$ হয়, তাহলে ক্রেতা প্রথম দ্রব্যটি থেকে বেশি প্রান্তিক উপযোগ পাবে, দ্বিতীয়টি থেকে কম পাবে। কাজেই উপযোগ সর্বাধিক করার জন্য সে প্রথম দ্রব্যটি বেশি এবং দ্বিতীয় দ্রব্যটি কম ক্রয় করবে। তার ফলে MU_1 কমবে (কারণ প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান) এবং MU_2 বাড়বে। যতক্ষণ $\frac{MU_1}{P_1} > \frac{MU_2}{P_2}$ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ক্রেতা তার ব্যয়ের পুনর্বণ্টন করবে। অবশেষে $\frac{MU_1}{P_1} = \frac{MU_2}{P_2}$ হবে। অনুরূপভাবে n-সংখ্যক দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এরকম হবে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধিতে বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের মান সমান হবে সেটা বলা হয় না। এতে বলা হয় যে, বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও তাদের পারস্পরিক দামের অনুপাত সমান হবে। যেমন, $MU_1 = 10$ এবং $P_1 = 5$ হলে $\frac{MU_1}{P_1} = \frac{10}{5} = 2$ হবে। এখন $MU_2 = 20$ এবং

$P_2 = 10$ হলে $\frac{MU_2}{P_2} = \frac{20}{10} = 2$ হবে। এখানে MU_1 ও MU_2 সমান নয়, কিন্তু $\frac{MU_1}{P_1}$ ও $\frac{MU_1}{P_2}$ সমান। কাজেই আমরা বলি—দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ নয়, অর্থের হিসেবে প্রকাশিত দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগই সমান হবে।

যখন আমরা n-সংখ্যক দ্রব্যের কথা বলি, তখন প্রত্যেক দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগকে সেই দ্রব্যের দাম দিয়ে ভাগ করতে হয়, কিংবা দামের অন্যোন্যক (Reciprocal) দিয়ে (অর্থাৎ $\frac{1}{p}$ দিয়ে) গুণ করতে হয় এবং এই ভাগফল বা গুণফলটিই সব দ্রব্যের ক্ষেত্রে সমান হয়।

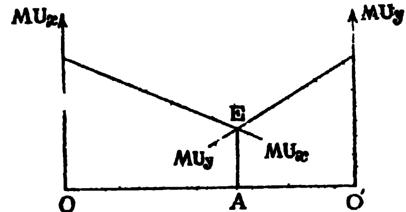
অধ্যাপক মার্শাল দ্রব্যের (প্রান্তিক) উপযোগ পরিমাপযোগ্য ধরে যে সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির আলোচনা করেছিলেন, নিরপেক্ষতা তত্ত্বেও সেই একই নীতিকে কার্যকর হতে দেখা যায়। তবে তার জন্য উপযোগ পরিমাপযোগ্য বলে ধরে নিতে হয় না। নিরপেক্ষতা তত্ত্বে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থায় নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল $\left(\frac{MU_x}{MU_y}\right)$ ও বাজেট রেখার ঢাল $\left(\frac{P_x}{P_y}\right)$ সমান হয়। কাজেই আমরা পাই,

$$\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}.$$

অর্থাৎ $\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}$. এটি হল দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে অধ্যাপক মার্শালের সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি।

৪.১২. (খ) সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির তাৎপর্য :

সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির সাহায্যে বোঝা যায়—একজন ভোগকারী ক্রেতা কীভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে তার আয় বণ্টন করে থাকে। এই বিধিতে বলা হয়—একজন ক্রেতা এমন পরিমাণে বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়ের উপর তার আয়কে বণ্টন করবে যাতে সে প্রত্যেক দ্রব্য থেকে অর্থের হিসেবে প্রকাশিত সমান তৃপ্তি পায়। যদি আমরা X ও Y নামক দুটি মাত্র দ্রব্যের কথা ধরি তাহলে ক্রেতা এমন পরিমাণে X-দ্রব্য ও Y-দ্রব্য ক্রয় করবে যাতে $\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}$ হয়। ৪·১৪ ক নং রেখাচিত্রে ক্রেতার আয়ের বণ্টন দেখানো হল।



৪.১৪ ক রেখাচিত্র : ক্রেতার আয়-বণ্টন

এই রেখাচিত্রে OO′ হল ক্রেতার আয়। MU_x ও MU_y নামাঙ্কিত রেখা দুটি হল যথাক্রমে X-দ্রব্যের ও Y-দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ রেখা। এখানে ধরা হয়েছে, $P_x = P_y = 1$. দেখা যাচ্ছে, E বিন্দুতে $MU_x = MU_y$ হয়েছে।

ক্রেতা OA পরিমাণ আয় দিয়ে X-দ্রব্য ক্রয় করবে এবং O′A পরিমাণ আয় দিয়ে Y-দ্রব্য ক্রয় করবে। ক্রেতা যখন তার আয় নিঃশেষে ব্যয় করবে, কেবলমাত্র তখনই সমপ্রান্তিক উপযোগের সাহায্যে ক্রেতার ব্যয় বণ্টন দেখানো যাবে। কিন্তু ক্রেতা যদি তার আয় কিছুটা সঞ্চয় করে তাহলে $MU_x = MU_y$ হলেও ক্রেতার মোট উপযোগ সর্বাধিক হবে না।

৪.১৩. ক্রেতার ভারসাম্যের পরিবর্তন :

ভূমিকা : ক্রেতার ভারসাম্য নির্ভর করে (ক) ক্রেতার পছন্দের মানচিত্র ও সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং (খ) ক্রেতার আয় ও দ্রব্যের দামের উপর। (ক) শ্রেণীভুক্ত বিষয়গুলি হল ক্রেতার ব্যক্তিগত (Subjective) বিষয় এবং (খ) শ্রেণীভুক্ত বিষয়গুলি হল বস্তুগত (Objective) বিষয়। ক্রেতার ভারসাম্য ব্যক্তিগত ও বস্তুগত—উভয়প্রকার বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। তাহলে যদি (১) ব্যক্তিগত বিষয়ের পরিবর্তন হয় এবং বস্তুগত বিষয়সমূহ (যথা, ক্রেতার আয় ও দ্রব্যের দাম) অপরিবর্তিত থাকে, কিংবা (২) ব্যক্তিগত বিষয় অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু বস্তুগত বিষয়ের পরিবর্তন হয়, তাহলে ক্রেতার ভারসাম্য অবস্থার (বা বিন্দুর) পরিবর্তন হবে। আমরা ধরে নেব যে—ক্রেতার ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ অপরিবর্তিত আছে। অর্থাৎ ক্রেতার নিরপেক্ষতা মানচিত্র দেওয়া আছে, তার কোন পরিবর্তন হয়নি এবং ক্রেতার সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষারও কোন পরিবর্তন হয়নি। সেক্ষেত্রে ক্রেতার ভারসাম্যের পরিবর্তন নির্ভর করবে—কেবলমাত্র বস্তুগত বিষয়ের পরিবর্তনের উপর। এখানে আমরা নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির কথা ভাবতে পারি।

(১) ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন (বৃদ্ধি বা হ্রাস) হয়েছে, কিন্তু দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত আছে ;

(২) ক্রেতার আয় অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হয়েছে। যদি দুটি দ্রব্য X ও Y হয় এবং X-দ্রব্যের দাম P_x ও Y দ্রব্যের দাম P_y হয়, তাহলে আমরা দামের পরিবর্তন বলতে বুঝি—

(ক) P_x-এর পরিবর্তন (হ্রাস বা বৃদ্ধি) এবং P_y স্থির।

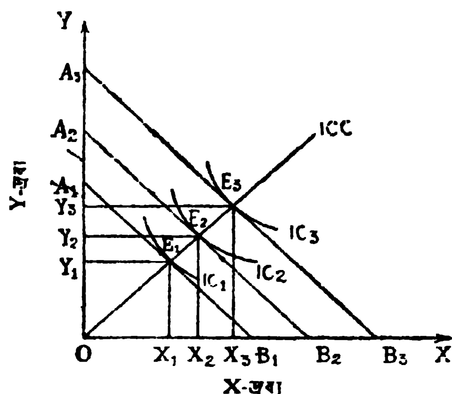
(খ) P_y-এর পরিবর্তন, P_x স্থির।

(গ) P_x ও P_y-এর অনুপাত $\left(\frac{P_x}{P_y}\right)$-এর পরিবর্তন। আমরা এখন প্রত্যেকটি পরিবর্তনের কথা পৃথকভাবে আলোচনা করব।

৪.১৪. আয়ের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার ভারসাম্যের পরিবর্তন : আয়-প্রভাব : আয়ভোগ রেখা ও আয়ভোগ রেখার আকৃতি :

(ক) আয়-প্রভাব : ক্রেতার রুচি ও পছন্দ, সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং

দ্রব্যের দাম যদি অপরিবর্তিত থাকে এবং এই অবস্থায় যদি ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন (বৃদ্ধি বা হ্রাস) হয় তাহলে দ্রব্য ক্রয়ের উপর যে পরিবর্তন বা প্রভাব দেখা দেয় তাকেই আয়-প্রভাব বলা হয়। আয় বাড়লে বা কমলে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতাও বাড়ে বা কমে, কাজেই দ্রব্যের চাহিদাও বেড়ে যায় বা কমে যায়। এক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধনাত্মক হয়। আবার অনেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হতেও পারে। আয় বাড়লে সেক্ষেত্রে চাহিদা কমে। এরকম দ্রব্যকে নিকৃষ্ট দ্রব্য (Inferior goods) বলা হয়। ছোট মাছ, মোটা চাল, মোটা কাপড়—এগুলি নিকৃষ্ট দ্রব্যের উদাহরণ। ক্রেতার আয় বাড়লে ক্রেতা কম ছোট মাছ ক্রয় করে ; বরং তার পরিবর্তে কাটা পোনা বা বড় মাছ ক্রয় করে। মোটা চাল কম ক্রয় করে, মোটা কাপড় কম পরে। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির ফলে ক্রেতার রুচিরও কিছুটা পরিবর্তন হয়। আগে সে যে দ্রব্যকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করত তাকেই এখন নিকৃষ্ট বলে মনে করে। অতএব নিকৃষ্টতা দ্রব্যের কোন আভ্যন্তর গুণ বা দোষ নয়, এটা ক্রেতার রুচির পরিবর্তন। রুচির পরিবর্তন হলে নিরপেক্ষতা মানচিত্রেরও পরিবর্তন হয়। ক্রেতা যে দ্রব্যকে বেশি পছন্দ করে, সেই দ্রব্যের দিকে নিরপেক্ষতা রেখাগুলি ঝুঁকে যেতে পারে। আমরা অবশ্য রুচির অপরিবর্তিতা ধরে নিয়েছি। কিন্তু সেই অনুধারণাটি ঠিক নয়। ব্যক্তির রুচি ক্রমশই পাল্টে যায়। অতএব আমরা রুচির অপরিবর্তনশীলতার অনুধারণাকে কিছুটা শিথিলভাবে নেব।



৪.১৫ রেখাচিত্র : আয়-প্রভাব ও আয়-ভোগ রেখা

এখন রেখাচিত্রের সাহায্যে আয়-প্রভাবের আলোচনা করা যেতে পারে।

এখানে X ও Y এই দুটো দ্রব্যের কথা ধরা হচ্ছে। এখানে A_1B_1 হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা। E_1 হল প্রথম ভারসাম্যের রেখা। ক্রেতা OX_1-পরিমাণ X-দ্রব্য ক্রয় করবে। এখন যদি X ও Y-দ্রব্যের দাম স্থির থাকে, কিন্তু ক্রেতার আয় বেড়ে যায়, তাহলে তার বাজেট রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যাবে। এইভাবে দ্বিতীয় বাজেট রেখা হবে A_2B_2 এবং E_2 হবে ক্রেতার দ্বিতীয় ভারসাম্যের বিন্দু। E_2 বিন্দুতে ক্রেতা OX_2 পরিমাণ X-দ্রব্য ক্রয় করবে। অতএব আয় বৃদ্ধির ফলে X-দ্রব্যের চাহিদা X_1X_2 পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এখানে X-দ্রব্যের উপর আয় (বৃদ্ধির) প্রভাব$=X_1X_2$. এখানে আয়-প্রভাবটি ধনাত্মক হয়েছে। কাজেই X-দ্রব্যকে এখানে স্বাভাবিক দ্রব্য (Normal goods) বলা যাবে। অনুরূপভাবে Y-দ্রব্যের উপর আয়-প্রভাব$=Y_1Y_2$ হবে, এটিও ধনাত্মক, অর্থাৎ Y-দ্রব্যও স্বাভাবিক দ্রব্য।

(খ) **আয়-ভোগ রেখা :** এইভাবে আয়ের ক্রমাগত বৃদ্ধি হতে থাকলে ক্রেতার বাজেট রেখা ক্রমাগতভাবে উপরের দিকে উঠে যাবে এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখাগুলিকে স্পর্শ করবে। সেই স্পর্শবিন্দুগুলিকে একটি রেখার সাহায্যে যোগ করলে আমরা যে রেখাটি পাব তার নাম **আয়-ভোগ রেখা** বা ICC (Income Consumption Curve)। ক্রেতার আয়ের পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের ভোগের ক্ষেত্রে কেমন পরিবর্তন হয় তা ICC থেকে জানা যায়। অতএব দ্রব্যের দাম স্থির থাকলে এবং ক্রেতার আয়ের ক্রমাগমত বৃদ্ধি (বা হ্রাস) হলে ক্রেতার বাজেট রেখার পরিবর্তন হয় এবং সেই সঙ্গে ভারসাম্যের বিন্দুও সরে যায়। **ভারসাম্য বিন্দুর এই সরার পথকে আয়-ভোগ রেখা বলা হয়।** এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আয়-ভোগ রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুই হল ক্রেতার ভারসাম্যের বিন্দু।

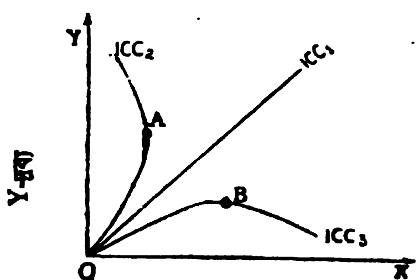
(গ) **আয়-ভোগ রেখার আকৃতি :**

আয়-ভোগ রেখার আকৃতি সম্বন্ধে তিনটি কথা বলা যায় :

(১) যদি দুটি দ্রব্যই স্বাভাবিক দ্রব্য হয়, তাহলে দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই আয়-প্রভাব ধনাত্মক হয় এবং আয়-ভোগ রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হয়। নীচের দ্বিতীয় রেখা-চিত্র ICC_1 হল এমনি একটি আয়-ভোগ রেখা। এখানে X-দ্রব্য ও Y-দ্রব্য উভয়ই স্বাভাবিক দ্রব্য, সেইজন্য ICC_1 রেখাটি সোজা উত্তর-পূর্ব দিকে অঙ্কিত হয়েছে।

(২) X ও Y—এই দুটি দ্রব্যের মধ্যে যদি X-দ্রব্যটি নিকৃষ্ট দ্রব্য ও Y-দ্রব্যটি স্বাভাবিক দ্রব্য হয়, তাহলে আয়-ভোগ রেখাটি Y-পরিমাপক অক্ষের দিকে বেঁকে যায়। ৪·১৬ নং রেখাচিত্রে ICC_2 হল এমন একটি আয়-ভোগ রেখা। দেখা যাচ্ছে, ICC_2 রেখাটি A বিন্দু পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী, A বিন্দুর পর ICC_2 OY-অক্ষের দিকে বেঁকে গেছে। OA অংশে উভয় দ্রব্যই স্বাভাবিক, কিন্তু A বিন্দুর পর Y-দ্রব্যটি স্বাভাবিক থাকলেও X-দ্রব্যটি নিকৃষ্ট দ্রব্যে পরিণত হয়েছে।

(৩) অনুরূপভাবে যদি Y-দ্রব্য নিকৃষ্ট দ্রব্য ও X-দ্রব্য স্বাভাবিক দ্রব্য হয়, তাহলে আয়-ভোগ রেখা X-পরিমাপক অক্ষের দিকে বেঁকে যাবে। ৪·১৬ নং রেখাচিত্রে ICC_3 হল এমন একটি আয়-ভোগ রেখা। এখানে B বিন্দু পর্যন্ত X ও Y-দ্রব্য উভয়েই স্বাভাবিক দ্রব্য, কিন্তু B বিন্দুর পর Y-দ্রব্যটি নিকৃষ্ট দ্রব্য, কিন্তু X-দ্রব্যটি যথারীতি স্বাভাবিক দ্রব্য আছে।



৪.১৬ রেখাচিত্র : আয়-ভোগ রেখার বিভিন্ন আকৃতি

যদি X ও Y উভয় দ্রব্যই নিকৃষ্ট হয় (যা বিরল ঘটনা) তাহলে আয়-ভোগ রেখা অঙ্কন করা যাবে না।

(ঘ) আয়-প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য :

আয়-প্রভাব সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা যায়। আয়-প্রভাবের জন্য ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু হয় উচ্চতর, না হয় নিম্নতর নিরপেক্ষতা রেখায় সরে যায়। আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেতা উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় যায়। আয় হ্রাস পেলে ক্রেতা নিম্নতর রেখায় যায়। এখন ক্রেতার আয় সম্বন্ধে যদি কিছু না বলা হয়, অথচ যদি দেখা যায় যে, ক্রেতা উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় চলে গেছে, তাহলে বুঝতে হবে—ক্রেতার আয়-প্রভাবের সৃষ্টি হয়েছে।

৪.১৫. দাম-প্রভাব : দাম-ভোগ রেখা :

যদি ক্রেতার আয় এবং দুটি দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন একটি দ্রব্যের দাম স্থির থাকে, কিন্তু অন্য দ্রব্যের দামের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে, তাহলে সেই দ্রব্যের চাহিদার উপর যে প্রভাব পড়ে তাকে দাম-প্রভাব বলা হয়। সাধারণত দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, আবার দাম বাড়লে চাহিদা কমে, কাজেই দাম প্রভাব সাধারণত ঋণাত্মক হয়।

অনেক দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদাও কমে। সে রকম দ্রব্যকে গিফেন-দ্রব্য (Giffen-goods) বলা হয়। রবার্ট গিফেন এই ব্যাপারটি প্রথম লক্ষ্য করেন বলে এদের গিফেন-দ্রব্য বলা হয়। গিফেন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব ধনাত্মক হয়।

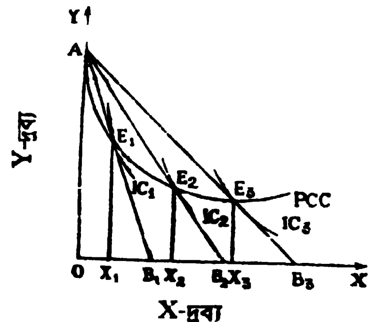
রেখাচিত্রের সাহায্যে দাম-প্রভাব দেখানো যায়।

৪.১৭. নং রেখাচিত্রে AB_1 হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা। E_1 তার প্রথম ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে ক্রেতা OX_1 পরিমাণ X-দ্রব্য ক্রয় করে।

এখন যদি X-দ্রব্যের দাম কমে যায়, কিন্তু Y-দ্রবের দাম ও ক্রেতার আয় স্থির থাকে, তাহলে ক্রেতার নতুন বাজেট রেখা হবে AB_2. এখন ক্রেতা IC_2 রেখার উপর E_2 বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে এবং OX_2 পরিমাণ X-দ্রব্য ক্রয় করবে। তাহলে দেখা গেল, X-দ্রব্যের দাম কমে যাওয়ায় X-দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদা X_1X_2 পরিমাণে বৃদ্ধি পেল।

এখানে X-দ্রব্যের চাহিদার উপর দাম-প্রভাব $= X_1X_2$।

X-দ্রব্যের দাম যদি আরো কমে যায়, তাহলে ক্রেতার বাজেট রেখাটি OX-অক্ষের আরো ডান দিকে সরে যাবে। এখন বাজেট রেখা হবে AB_3 এবং ক্রেতার ভারসাম্যের বিন্দু হবে E_3. এইভাবে দাম যত কমবে, ক্রেতার ভারসাম্যের বিন্দু ততই উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় সরে যাবে। **এইসব ভারসাম্য বিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে যে রেখা অঙ্কন করা যায়— তাকে দাম-ভোগ রেখা (Price Consumption Curve বা PCC) বলা হয়।** ৪.১৭ নং রেখাচিত্রে ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দু E_1, E_2, E_3-র



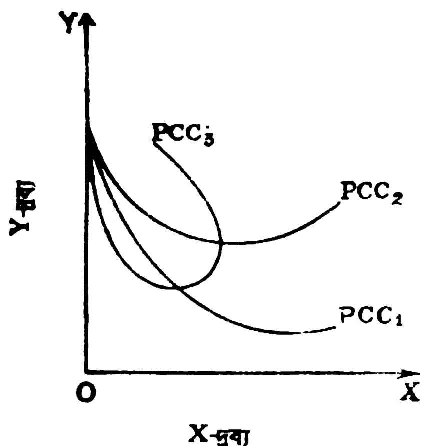
৪.১৭ রেখাচিত্র : দাম-প্রভাব ও দাম-ভোগরেখা

মধ্য দিয়ে PCC নামক যে রেখাটি অঙ্কন করা হয়েছে সেটি হল দাম-ভোগ রেখা। কোন একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে সেই দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদার বা ভোগের কেমন পরিবর্তন হয়, তা দাম-ভোগ রেখা থেকে জানা যায় বলেই এর নাম হয়েছে দাম-ভোগ রেখা।

৪.১৬. দাম-ভোগ রেখার আকৃতি :

দুটি দ্রব্যের মধ্যে যদি একটি দ্রব্যের দাম ক্রমাগত কমে যায় এবং অন্য দ্রব্যের দাম, ক্রেতার আয় ইত্যাদি বিষয় স্থির থাকে, তাহলে ক্রেতার বাজেট রেখা ক্রমাগতভাবে উচ্চতর নিরপেক্ষতায় স্পর্শক হয় এবং ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দুও উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় সরে যায়। এই ভারসাম্য বিন্দুগুলিকে একটি রেখার সাহায্যে যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় তার নাম দাম-ভোগ রেখা (Price Consumption Curve বা PCC)। যদি কোন দ্রব্যের দাম ক্রমাগতভাবে হ্রাস পায়, তাহলে সেই দ্রব্যের চাহিদা কীভাবে পরিবর্তিত হয়—তা দাম-ভোগ রেখা বা PCC থেকে জানা যায়।

কোন দ্রব্যরে দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে, সেইজন্য দাম-ভোগ রেখা সাধারণত বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয়। দ্রব্য দুটি যদি X-দ্রব্য ও Y-দ্রব্য হয়, রেখাচিত্রের OX-অক্ষে যদি X-দ্রব্য ও OY-অক্ষে Y-দ্রব্য পরিমাপ করা হয় এবং যদি Y-দ্রব্যর দাম স্থির থাকে ও X-দ্রব্যর দাম কমে যায়, তাহলে দাম ভোগ রেখাটি OX-অক্ষের দিকে নেমে আসবে। X-দ্রব্যের দাম কমলে ও Y-দ্রব্যের দাম স্থির থাকলে ক্রেতা Y-দ্রব্যের চাহিদা কমিয়ে X-দ্রব্যের চাহিদা বা ভোগ বৃদ্ধি করবে। এখানে Y-দ্রব্যের চাহিদা কমবে এবং X-দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে, অর্থাৎ—X ও Y দ্রব্য দুটি হবে পরিবর্ত দ্রব্য। X ও Y যদি পরিবর্ত দ্রব্য হয়, তাহলেই PCC বাম দিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হবে। ৪.১৮ নং রেখাচিত্রে একই চিত্রের মধ্যে তিনটি PCC আঁকা হয়েছে। এই তিনটি রেখার মধ্যে PCC_1 নামক রেখাটি বামদিক থেকে ডনে দিকে ক্রমাগত নেমে এসেছে। এই রেখাটি থেকে বোঝা যায়, X ও Y পরিবর্ত-দ্রব্য হলে এবং X-দ্রব্যের দাম কমলে PCC-র আকৃতি কেমন হয়।



৪.১৮ রেখাচিত্র : দাম-ভোগ রেখার বিভিন্ন আকৃতি

X ও Y-দ্রব্য দুটি পরিবর্ত-দ্রব্য না হয়ে যদি পরিপূরক দ্রব্য হয়, তাহলে X-দ্রব্যের দাম কমলে X-দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে এবং সেই সঙ্গে Y-দ্রব্যের চাহিদাও

বাড়বে। এর ফলে PCCটি বাম দিক থেকে ডান দিকে নেমে না গিয়ে উপরের দিকে উঠে যাবে। রেখাচিত্রে PCC_2 হল এই রকম একটি দাম-ভোগ রেখা। এক্ষেত্রে X-দ্রব্যের দাম কমলে X-দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং সেই সঙ্গে Y-দ্রব্যের চাহিদাও বাড়ে। আবার অনেক সময় X-দ্রব্যের দাম কমলে X-দ্রব্যের চাহিদা কমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে X-দ্রব্যটিকে গিফেন-দ্রব্য বলা হবে। X-দ্রব্যটি যদি গিফেন দ্রব্য হয়, তাহলে X-দ্রব্যের দাম কমলে X-দ্রব্যের চাহিদা কমবে এবং PCC OY-অক্ষের দিক বেঁকে যাবে। একে পশ্চাৎমুখী দাম-ভোগ রেখা বলা হয়। ৪.১৮ নং রেখাচিত্রে PCC_3 হল এরকম একটি পশ্চাৎমুখী দাম-ভোগ রেখা। এখানে X-দ্রব্যটি হল গিফেন-দ্রব্য। সেইজন্য X-দ্রব্যের দাম কমলে X-দ্রব্যর চাহিদা কমে যায়। তাহলে আমরা দাম-ভোগ রেখার আকৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করতে পারি ঃ

১। যদি X-দ্রব্য স্বাভাবিক দ্রব্য হয় এবং X ও Y-দ্রব্য দুটি পরিবর্ত-দ্রব্য হয়, তাহলে দাম-ভোগ রেখা ৪.১৮ নং রেখাচিত্রের PCC_1 রেখার মত বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হবে ;

২। যদি X-দ্রব্যটি স্বাভাবিক-দ্রব্য হয় এবং X ও Y-দ্রব্য দুটি পরিপূরক দ্রব্য হয়, তাহলে দাম-ভোগ রেখা ৪.১৮ নং রেখাচিত্রের PCC_2 রেখার মত ঊর্ধ্বমুখী হবে ;

৩। X-দ্রব্যটি যদি গিফেন-দ্রব্য হয়, তাহলে দাম-ভোগ রেখাটি ৪.১৮ নং রেখাচিত্রের PCC_3 রেখার মত পশ্চাৎমুখী হবে।

৪.১৭. পরিবর্ত-প্রভাব (Substitution) ঃ

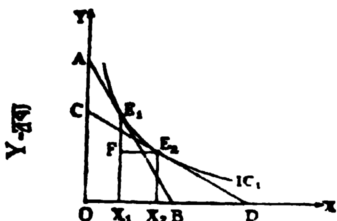
দুটি বিকল্প বা পরিবর্ত দ্রব্যের মধ্যে যদি একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হয়, তাহলে সেই দ্রব্যের হিসেবে ক্রেতার প্রকৃত আয়ের পরিবর্তন হয়। দ্রব্যের দাম কমলে ক্রেতার প্রকৃত আয় বাড়ে। অর্থাৎ দাম-প্রভাব থেকে আয়-প্রভাবের সৃষ্টি হয়। ক্রেতার উপর আয়কর চাপিয়ে যদি আয়ের ক্ষতিযোগ্য পরিবর্তন (Compensating Variation) করা হয়, তাহলে আয়-প্রভাব বিনষ্ট হয়, কিন্তু তখন সেই দ্রব্যটির আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তনের জন্য দ্রব্যের চাহিদারও পরিবর্তন হয়। যেমন— X দ্রব্যের দাম যদি কমে যায়, কিন্তু Y-দ্রব্যের দাম স্থির থাকে, তাহলে $\frac{P_x}{P_y}$ কমে যায়। Y দ্রব্যের তুলনায় X দ্রব্যটি সস্তা হয়ে যায়। তখন ক্রেতা যদি Y-দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে তার পরিবর্তে X-দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং এইভাবে তার তৃপ্তি সমান রাখে তবে তাকে পরিবর্ত প্রভাব বলা হয়। অতএব,

দুটি পরিবর্ত দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন একটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন ঘটলে এবং ক্রেতার আয় সমান থাকলে দ্রব্যের চাহিদার উপর যে প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাকে পরিবর্ত প্রভাব বলা হয়।

রেখাচিত্রের সাহায্যে এই পরিবর্ত প্রভাব দেখানো হল। আমাদের রেখাচিত্রে AB হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা। E_1 হল প্রথম ভারসাম্যের বিন্দু।

এখানে ক্রেতা OX_1 পরিমাণ X-দ্রব্য ও E_1X_1 পরিমাণ Y-দ্রব্য ক্রয় করে। ক্রেতা IC_1 রেখার উপর আছে। এখন X-দ্রব্যের দাম যদি কমে যায়, কিন্তু সেই

সঙ্গে ক্রেতার আয় কমিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সে পূর্বের নিরপেক্ষতা রেখাতেই থাকতে পারে (যাতে সে উচ্চতর কোন নিরপেক্ষতা রেখায় যেতে না পারে) তাহলে নতুন বাজেট রেখা হবে CD। নতুন ভারসাম্যের বিন্দু হবে E_2. E_2 বিন্দুতে ক্রেতা OX_2 পরিমাণ X-দ্রব্য ক্রয় করবে। অতএব X-দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম $\frac{P_x}{P_y}$ কমে গেলে ক্রেতা E_1F পরিমাণ Y-দ্রব্যের পরিবর্তে $FE_2 = X_1X_2$ পরিমাণ X-দ্রব্য বেশি ভোগ করবে। X-দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে এবং Y-দ্রব্যের চাহিদা কমবে। এখানে X-দ্রব্যের উপর পরিবর্ত প্রভাব হল X_1X_2.



৪.১৯ রেখাচিত্র : পরিবর্ত প্রভাব

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, (১) পরিবর্ত প্রভাব কেবলমাত্র পুরানো তৃপ্তির স্তরেই হয়ে থাকে। (২) দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, দাম বাড়লে চাহিদা কমে, কাজেই পরিবর্ত প্রভাব সব সময় ঋণাত্মক হয়।

আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের পার্থক্য :

কোন দ্রব্যের দাম কমলে (বা বাড়লে) আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের সৃষ্টি হয়। এই দুটি প্রভাবের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় :

(১) কোন দ্রব্যের দাম কমলে সেই দ্রব্যের হিসেবে ক্রেতার বাস্তব আয় বৃদ্ধি পায়। বাস্তব আয় বৃদ্ধির ফলে ক্রেতা সেই দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে ক্রয় করে। একে বলা হয় আয়-প্রভাবজনিত চাহিদা বৃদ্ধি। অপরপক্ষে দুটি বিকল্প দ্রব্যের মধ্যে একটির দাম কমলে এবং অপরটির দাম স্থির থাকলে ক্রেতা স্থির দামের দ্রব্যটির পরিবর্তে কম দামের দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে ক্রয় করে। এইভাবে কম দামের দ্রব্যটির যে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটে তাকে পরিবর্ত, প্রভাব বলা হয়।

(২) দ্রব্যের দাম কমার ফলে যে আয়-প্রভাবের সৃষ্টি হয়, সেই আয়-প্রভাবের দ্বারা ক্রেতা নিম্নতর নিরপেক্ষতা রেখা থেকে উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় উন্নীত হয়। অর্থাৎ দাম-হ্রাসজনিত আয়-প্রভাবের দ্বারা ক্রেতার তৃপ্তির স্তর বর্ধিত হয়। অপর পক্ষে দামবৃদ্ধি পেলে ক্রেতার বাস্তব আয় হ্রাস পায় এবং সে উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখা থেকে নিম্নতর রেখায় স্থানান্তরিত হয়। এর থেকে বলা যায় যে, আয়-প্রভাবের ফলে ক্রেতার তৃপ্তির স্তরের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু পরিবর্ত প্রভাবের ফলে ক্রেতার তৃপ্তির স্তরের কোন পরিবর্তন হয় না। পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে ক্রেতা একই নিরপেক্ষতার উপর থাকে ; সে একই নিরপেক্ষতা রেখার উপর অবস্থিত এক বিন্দু থেকে অন্য এক বিন্দুতে স্থানান্তরিত হয়।

(৩) পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির চাহিদা বাড়ে, অন্যটির

চাহিদা কমে। দুটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতা দুটি দ্রব্যের মধ্যে পরিবর্ততা (Substitution) ঘটায়। সেজন্য একে পরিবর্ত-প্রভাব বলা হয়। কিন্তু আয়-প্রভাবের ক্ষেত্রে পরিবর্ততার বদলে দুটি দ্রব্যের মধ্যে সাধারণতঃ পরিপূরকতাই ঘটে থাকে।

(৪) আয়-প্রভাবের ক্ষেত্রে আয়ের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু আপেক্ষিক দামকে পূর্বের স্তরে সমান রাখা হয়। পরিবর্ত-প্রভাবের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন ঘটে, কিন্তু বাস্তব আয় (বা তৃপ্তির স্তর) পূর্বের অবস্থায় স্থির থাকে।

(৫) পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে দুটি দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন একটির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অপরটির চাহিদা হ্রাস পায়। এর ফলে **পরিবর্ত-প্রভাব সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে সর্বদা ঋণাত্মক হয়।** কিন্তু স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধনাত্মক হয় এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হয়। অতএব আয়-প্রভাব বিভিন্ন দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। কিন্তু পরিবর্ত-প্রভাব সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে একই প্রকার হয়।

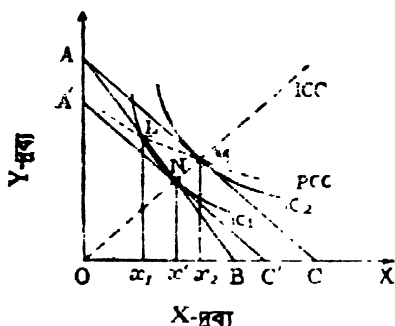
৪.১৮. ক) দাম-প্রভাব, আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের সম্পর্ক :
(দাম-প্রভাব = পরিবর্ত-প্রভাব ± আয়-প্রভাব)

যদি কোন দ্রব্যের দাম কমে যায়, তাহলে তার চাহিদা বাড়ে। একে দাম-প্রভাব বলা হয়। ক্রেতার আয়বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। একে আয়-প্রভাব বলা হয়। আবার দুটি বিকল্প দ্রব্যের মধ্যে যে-কোন একটি দ্রব্যের দাম অন্য দ্রব্যের তুলনায় কমে গেলে ক্রেতা অন্য দ্রব্যের পরিবর্তে সেই দ্রব্যটি অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে তার তৃপ্তি সমান রাখে। একে পরিবর্ত-প্রভাব বলে। এই তিনটি প্রভাবের মধ্যে একটি সুন্দর সম্পর্ক আছে। আমরা বলি—দাম-প্রভাব = পরিবর্ত-প্রভাব ± আয়-প্রভাব। আয়-প্রভাব ধনাত্মক ও ঋণাত্মক হতে পারে। সেইজন্য আয়-প্রভাবের পূর্বে ± চিহ্ন বসানো হয়েছে। এখন এই তিনটি প্রভাবের সম্পর্কটি বোঝান যেতে পারে।

কোন দ্রব্যের দাম কমলে যে দাম-প্রভাবের সৃষ্টি হয় তার পিছনে দুটি শক্তি কাজ করে। প্রথমত, যে দ্রব্যটির দাম কমে সেই দ্রব্যটি অন্য দ্রব্যটির তুলনায় সস্তা ও আকর্ষণীয় হয়ে যায়। ফলে ক্রেতা অন্য দ্রব্যের ভোগ কমিয়ে তার পরিবর্তে এই দ্রব্যটি ব্যবহার করে। এটা হল পরিবর্ত-প্রভাব। আমরা বলি দাম-প্রভাবের একটি অংশ হল পরিবর্ত-প্রভাব। হিকস্ বলেছেন—পরিবর্ত-প্রভাব যেন দাম-প্রভাবের একটি পা। দ্বিতীয়ত, কোন দ্রব্যের দাম কমলে সেই দ্রব্যের হিসেবে ক্রেতার প্রকৃত আয় বেড়ে যায়। যেমন, কোন লোকের আর্থিক আয় যদি ১০০ টাকা হয়, এবং চালের কিলোগ্রাম যদি ২ টাকা হয়, তাহলে চালের হিসেবে সেই ব্যক্তির প্রকৃত আয় হবে ৫০ কিলোগ্রাম চাল। এখন চালের দাম যদি কমে গিয়ে ১ টাকা কিলোগ্রাম হয়, তাহলে ক্রেতা ১০০ টাকা দিয়ে ১০০ কিলোগ্রাম চাল ক্রয় করতে পারে। অর্থাৎ চালের দাম কমে গেলে চালের হিসেবে ক্রেতার বাস্তব আয় বেড়ে যায়।

তাহলে—আমরা বলতে পারি, কোন দ্রব্যের দাম কমলে সেই দ্রব্যের হিসেবে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ আয়-প্রভাবের সৃষ্টি হয়। অতএব দাম-প্রভাবের মধ্যে আয়-প্রভাব অন্তর্ভুক্ত থাকে। হিকসের মতে, আয়-প্রভাব হল দাম-প্রভাবের দ্বিতীয় পা। দাম-প্রভাবও মানুষের মত দ্বিপদবিশিষ্ট। এইভাবে দেখানো যায়, দাম প্রভাব = পরিবর্ত-প্রভাব + আয়-প্রভাব। কোন দ্রব্যের দাম কমলে পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে সেই দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং সেই সঙ্গে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও চাহিদা বাড়ে। এখন আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটি আরো ভালোভাবে বোঝাতে পারি। নীচের রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল।

এই রেখাচিত্রে AB হল প্রথম বাজেট রেখা এবং L প্রথম ভারসাম্য বিন্দু। ক্রেতা IC_1 রেখার উপর আছে। এখানে X-দ্রব্যের চাহিদা OX_1। এবার ধরি X-দ্রব্যের দাম কমে গেল। নতুন বাজেট রেখা হল AC এবং ভারসাম্যের বিন্দু হল M. X-দ্রব্যের দাম কমে যাওয়ায় X-দ্রব্যের চাহিদা বাড়ল x_1x_2 পরিমাণে। এখানে দাম-প্রভাব = x_1x_2।



৪.২০ রেখাচিত্র: দাম-প্রভাব = পরিবর্ত-প্রভাব + আয়-প্রভাব

X-দ্রব্যের দাম কমার জন্য ক্রেতা IC_1 রেখা থেকে উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখা IC_2 তে যায়। এ থেকে বোঝা যায়, দাম প্রভাবের মধ্যে আয়-প্রভাব মিশে আছে, কারণ আয় বৃদ্ধির প্রভাবে ক্রেতা নিম্নতর নিরপেক্ষতা রেখা থেকে উচ্চতর রেখায় উঠে যায়। এখন দাম-প্রভাব থেকে আয়-প্রভাব বাদ দিতে হবে।

আয়-প্রভাব বাদ দেওয়ার জন্য ক্রেতার উপর আয়কর বসানো যায়। এতে তার বাজেট রেখা AC রেখার সমান্তরালে থেকে পিছনের দিকে হটে আসবে। ক্রেতা IC_1 রেখায় ফিরে না আসা পর্যন্ত আয়করের হার বাড়ানো হবে। অবশেষে বাজেট রেখা যখন A'C' হবে, তখন ক্রেতা IC_1 রেখার উপর N বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে। এখানে আয়-প্রভাব সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ক্রেতা x_1x' পরিমাণে বেশী X-দ্রব্য ক্রয় করবে। অতএব x_1x' হবে পরিবর্ত-প্রভাব।

এবার ক্রেতাকে পূর্বের আয় ফিরিয়ে দিলে তার বাজেট রেখা AC হবে এবং ক্রেতা M বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে। এটা হল আয়-প্রভাব। এখানে আয়-প্রভাব = $x'x_2$. এখন $x_1x_2 = x_1x' + x'x_2$.

অর্থাৎ দাম-প্রভাব = পরিবর্ত-প্রভাব + আয়-প্রভাব।

ক্রেতা L বিন্দু থেকে M বিন্দুতে যায় দাম-ভোগ রেখা PCC ধরে। কিন্তু এই যাত্রাপথকে আমরা ভেঙে দেখাতে পারি। প্রথমে সে L থেকে N বিন্দুতে যায় পরিবর্ত-প্রভাবের সুযোগে। পরে N থেকে M বিন্দুতে যায় আয়-ভোগ রেখা ICC ধরে। OX-অক্ষের দিকে তাকালে দেখা যায় X-দ্রব্যের চাহিদা x_1x_2 পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির মধ্যে x_1x' হল পরিবর্ত-প্রভাব এবং বাকি $x'x_2$ অংশটি হল আয়-প্রভাব।

(খ) নিকৃষ্ট দ্রব্য ও গিফেন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব :

দ্রব্যের দাম কমলে পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে সব সময় চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হয় এবং চাহিদা হ্রাস পায়। কাজেই নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাবের জন্য চাহিদা বাড়তে পারে, আবার পূর্বের সমানও থাকতে পারে, কিংবা কমে যেতে পারে। আমরা বলি দাম কমলে চাহিদা বাড়বে, যদি পরিবর্ত-প্রভাবের জন্য চাহিদার বৃদ্ধি ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের জন্য চাহিদার হ্রাসের চেয়ে বেশি হয়। উভয়ে সমান হলে দাম-প্রভাব শূন্য হবে। দাম কমলে চাহিদার বৃদ্ধি হবে না। আবার ঋণাত্মক আয়-প্রভাব যদি পরিবর্ত-প্রভাবের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে দাম কমলে চাহিদাও কমে যাবে। এটাই হল গিফেন বর্ণিত অবস্থা। অতএব আমরা বলতে পারি—**ঋণাত্মক আয়-প্রভাব পরিবর্ত-প্রভাবের চেয়ে পরিমাণে বেশি হলে গিফেন বর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি হয়।** নীচে রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখানো হল।

এই রেখাচিত্রে AB হল প্রথম বাজেট রেখা, L হল প্রথম ভারসাম্যের বিন্দু। X-দ্রব্যের চাহিদা হল Oa। ধরা যাক X-দ্রব্যের দাম হ্রাস পেল। বাজেট রেখা হল AC এবং A′C′ হল করারোপিত বাজেট রেখা। N হল পূর্ব তুষ্টি স্তরে নতুন ভারসাম্য বিন্দু। X-এর চাহিদা বেড়ে হল Ob। অতএব ab হল পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে X-এর চাহিদা বৃদ্ধি। এখন bN লম্বটিকে N′ বিন্দু পর্যন্ত এবং aL লম্বটিকে L′ বিন্দু পর্যন্ত বর্ধিত করা হল। ক্রেতাকে তার করারোপিত আয় ফিরে দিলে তার বাজেট রেখা হবে AC. এখন প্রশ্ন হল, ক্রেতা AC রেখার উপর কোন্ বিন্দুতে থাকবে? সেটা নির্ভর করছে X-দ্রব্যের প্রকৃতির উপর, অর্থাৎ X-এর চাহিদার আয়গত স্থিতি-স্থাপকতার উপর। আমরা বলতে পারি—

৪.২১ রেখাচিত্র : নিকৃষ্ট দ্রব্য ও গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব, আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাব

(১) যদি X-দ্রব্য স্বাভাবিক হয়, তাহলে সে N′ বিন্দুর ডানদিকে থাকবে; (২) X-দ্রব্য নিকৃষ্ট দ্রব্য হলে সে N′ বিন্দুর বাম দিকে থাকবে। ধরা যাক X-দ্রব্য

নিকৃষ্ট দ্রব্য। তাহলে তার ভারসাম্য বিন্দু AC রেখার উপর থাকবে এবং N′ বিন্দুর বাম দিকে থাকবে। ধরা যাক ক্রেতার ভারসাম্য বিন্দুটি হল M. তাহলে আয়-প্রভাব হল bc. এটি ঋণাত্মক আয়-প্রভাব। X-নিকৃষ্ট দ্রব্য হওয়ায় আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হবে।

অতএব X-দ্রব্যটি নিকৃষ্ট দ্রব্য হলে এবং X-এর দাম কমলে X-দ্রব্যের চাহিদা—(১) পরিবর্ত-প্রভাবের জন্য বাড়বে, কিন্তু (২) ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের জন্য কমবে। আমাদের রেখাচিত্রে পরিবর্ত প্রভাবের জন্য X-এর চাহিদা ab পরিমাণে বেড়েছে এবং ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের জন্য bc পরিমাণে কমেছে। উভয় প্রভাবের জন্য চাহিদা বেড়েছে $ab - bc = ac$ পরিমাণে। এখানে ঋণাত্মক আয়-প্রভাব পরিবর্ত-প্রভাবকে দমিত করে দিয়েছে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করতে পারেনি। আয়-প্রভাব কম শক্তি ধরে। দ্রব্যটির নিকৃষ্টতা আছে, কিন্তু সেটি এমন নয় যে, গিফেন-বর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, M বিন্দুটি L′ বিন্দুর সঙ্গে মিশে গেল, তাহলে পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে X-এর চাহিদা ab পরিমাণে বাড়বে এবং ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের ফলে X-এর চাহিদা ba পরিমাণে কমবে। পরিবর্ত-প্রভাব ও আয়-প্রভাব উভয়েই সমান সমান। সেখানে দাম-প্রভাব শূন্য হবে। X-এর দাম কমে যাওয়া সত্ত্বেও X-এর চাহিদা বাড়বে না (কমবেও না)।

কিন্তু ঋণাত্মক আয়-প্রভাবটি যদি পরিবর্ত-প্রভাবের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, তাহলে M বিন্দুটি L′ বিন্দুর বাম দিকে থাকবে। সেক্ষেত্রে c বিন্দুটি a বিন্দুর বাম দিকে থাকবে। ফলে X-দ্রব্যের দাম কমে গেলেও X-দ্রব্যের চাহিদা কমে যাবে এবং গিফেন বর্ণিত অবস্থার সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে X-দ্রব্যটিকে আমরা গিফেন-দ্রব্য বলতে পারব। অতএব যেখানে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হয় এবং পরিবর্ত-প্রভাবের চেয়ে শক্তিশালী হয় সেখানেই গিফেন-অবস্থার সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বলা যায়, **গিফেন-দ্রব্য হল একপ্রকার নিকৃষ্ট-দ্রব্য যেখানে ঋণাত্মক আয়-প্রভাব খুবই শক্তিশালী হয়। গিফেন-দ্রব্য ও নিকৃষ্ট-দ্রব্যের মধ্যে কোন মৌল পার্থক্য নেই।**

৪.১৯. নিকৃষ্ট-দ্রব্য ও গিফেন-দ্রব্যের পার্থক্য :

নিকৃষ্ট-দ্রব্য ও গিফেন-দ্রব্য উভয়েই অস্বাভাবিক দ্রব্য। তবু আমরা ওদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি।

(১) ক্রেতার আয়-বৃদ্ধি পেলে যে দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদা হ্রাস পায় তাকেই বলা হয় নিকৃষ্ট-দ্রব্য। কিন্তু যে দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে সেই দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদা হ্রাস পায় তাকে বলা হয় গিফেন-দ্রব্য। অতএব **নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার আয় ও দ্রব্যের চাহিদার মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু গিফেন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম ও ক্রেতার চাহিদা পরস্পর একমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ হয়।**

(২) নিকৃষ্ট-দ্রব্যের চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়। কারণ ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেলে চাহিদা কমে যায়। এবং বিপরীতক্রমে ক্রেতার আয় কমে

গেলে নিকৃষ্ট দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু গিফেন-দ্রব্যের চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়। কারণ স্বাভাবিক ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম কমলে (অর্থাৎ দামের পরিবর্তন ঋণাত্মক হলে) চাহিদা বৃদ্ধি পায় (চাহিদার পরিবর্তন ধনাত্মক হয়) কাজেই, চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হয়। কিন্তু গিফেন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তন—উভয়েই ধনাত্মক কিংবা ঋণাত্মক হয়, কাজেই গিফেন-দ্রব্যের দামগত স্থিতিস্থাপকতা ধনাত্মক হয়।

(৩) নিকৃষ্ট-দ্রব্যের দাম কমলে পরিবর্ত-প্রভাবের জন্য নিকৃষ্ট-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নিকৃষ্ট-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম কমে যাওয়ায় আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হয়। এই ঋণাত্মক আয়-প্রভাব পরিবর্ত প্রভাবকে আংশিকভাবে কিংবা সমানভাবে কিংবা তার চেয়েও বেশি পরিমাণে কমিয়ে দিতে পারে।

নিকৃষ্ট-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব = পরিবর্ত-প্রভাব — আয়-প্রভাব হয়। পরিবর্ত-প্রভাব ও আয়-প্রভাব পরস্পর সমান হলে দাম-প্রভাব শূন্য হবে। সেক্ষেত্রে নিকৃষ্ট-দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়বে না, আবার কমবেও না। কিন্তু আয়-প্রভাব যদি পরিবর্ত-প্রভাবের চেয়ে কম হয় তাহলে নিকৃষ্ট-দ্রব্যের দাম কমলে নিকৃষ্ট-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। অতএব নিকৃষ্ট-দ্রব্যের দাম কমলে নিকৃষ্ট-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে, আবার স্থির থাকতে পারে। কিন্তু যখন ঋণাত্মক আয়-প্রভাব পরিবর্ত প্রভাবের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখনই দাম কমলে চাহিদা কমে যায় এবং দ্রব্যটি গিফেন-দ্রব্যে পরিণত হয়। অতএব গিফেন-দ্রব্য হল এমন একপ্রকার নিকৃষ্ট-দ্রব্য যার ক্ষেত্রে দাম হ্রাসের ঋণাত্মক আয়-প্রভাব পরিবর্ত-প্রভাবের চেয়ে প্রবলতর হয়। অর্থাৎ গিফেন-দ্রব্য হল প্রবলতর নিকৃষ্ট দ্রব্য।

(৪) দাম কমলে চাহিদা বাড়ে -এটাই হল চাহিদার নিয়ম। গিফেন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু নিকৃষ্ট-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম কমলে চাহিদা বাড়তে পারে, স্থির থাকতে পারে, আবার কমে যেতেও পারে। অতএব নিকৃষ্ট-দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম হবেই এমন বলা যায় না।

৪.২০। কোন দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে কেন? (নিরপেক্ষতা তত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার নিয়মের ব্যাখ্যা):

আমরা দাম-প্রভাবকে পরিবর্ত-প্রভাব ও আয়-প্রভাবের যোগফল হিসেবে দেখাতে পারি। দাম-প্রভাব, আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের এই সম্পর্কের সাহায্যে আমরা চাহিদার নিয়মটিকেও প্রমাণ করতে পারি। চাহিদার নিয়মে বলা হয় কোন দ্রব্যের দাম কমলে সেই দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদা বাড়বে। কেন বাড়বে সে ব্যাপারে মার্শালের প্রমাণ আছে, আবার হিক্‌স, অ্যালেন প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের প্রমাণও আছে।

মার্শালের মতে দাম কমলে চাহিদা বাড়বে—তার কারণ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমহ্রাসমান এবং ক্রেতা এমনভাবে দ্রব্য ক্রয় করে যাতে দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগ

সমান হয়। এখন দাম কমলে প্রান্তিক উপযোগকেও কমতে হয়। দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ কমে যাওয়ার অর্থ হল দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি। অতএব প্রমাণিত হল যে, দ্রব্যের দাম কমলে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এটি হল মার্শালের প্রমাণ।

মার্শালের এই প্রমাণের প্রধান দ্রুটি হল যে, এখানে উপযোগকে পরিমাপ-যোগ্য বস্তু হিসেবে ধরা হচ্ছে। হিকস্, অ্যালেন প্রভৃতি অর্থনীতিবিদদের মতে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ না মেপেও আমরা নিরপেক্ষতা তত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার নিয়মটিকে প্রমাণ করতে পারি।

তাঁদের মতে কোন দ্রব্যের দাম কমলে যে দাম-প্রভাবের সৃষ্টি হয়, তার ভিতরে অন্য দুটি প্রভাব থাকে: এদের একটি হল আয়-প্রভাব ও অপরটি হল পরিবর্ত-প্রভাব।

নিরপেক্ষতা তত্ত্বে যেহেতু দুটি দ্রব্য ধরা হয়, কাজেই এখানে পরিবর্ত-প্রভাব থাকবে। একটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম হ্রাস পেলে ক্রেতা অন্য দ্রব্যটির পরিবর্তে সহজেই সেই দ্রব্যটি ব্যবহার করবে। দ্রব্য দুটি যেহেতু পরিবর্ত দ্রব্য কাজেই সে যেটি কম দামে পাবে সেটিই ক্রয় করবে। যে দ্রব্যের দাম কমবে, এইভাবে পরিবর্ত-প্রভাবের জন্য সেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এটি হল চাহিদা বৃদ্ধির একটি কারণ।

আর একটি কারণ হল—আয়-প্রভাব। কোন দ্রব্যের দাম কমে গেলে সেই দ্রব্যের হিসেবে ক্রেতার বাস্তব আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার বৃদ্ধি পাবে, ফলে সে সেই দ্রব্যটিই বেশি পরিমাণে ক্রয় করবে। দ্রব্যটি যদি স্বাভাবিক দ্রব্য হয়, তাহলেই এরকম হবে। দ্রব্যটি যদি নিকৃষ্ট-দ্রব্য হয়, তাহলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ক্রেতা কম পরিমাণে সেই দ্রব্যটি ক্রয় করবে। সেক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হবে। আবার গিফেন-দ্রব্যের ক্ষেত্রেও আয়-প্রভাব অত্যন্ত বেশি ঋণাত্মক হয়ে পড়বে। নিকৃষ্ট-দ্রব্যের ও গিফেন-দ্রব্যের কথা বাদ দিলে আমরা স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে সহজেই চাহিদার নিয়মটিকে এইভাবে পরিবর্ত-প্রভাবের ও আয়-প্রভাবের যোগফল হিসেবে দেখাতে পারব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে নিরপেক্ষতা তত্ত্বের সাহায্যেও চাহিদার নিয়মটিকে প্রমাণ করা যায়, কিন্তু তার জন্য "বাজারে একটিমাত্র দ্রব্য আছে" বলে ধরতে হয় না, অর্থের হিসেবে প্রান্তিক উপযোগকে মাপতে গিয়ে পরস্পর-বিরোধী অনুধারণার জালে জড়িয়ে পড়তেও হয় না।

৪.২৯ দাম ভোগ রেখা থেকে কীভাবে চাহিদা রেখা অংকন করা যায়?:

দামভোগ রেখা সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিম্নমুখী হয়। চাহিদা রেখাও নিম্নমুখী হয়। এটি হল দামভোগ রেখা ও চাহিদা রেখার মিলের দিক। কিন্তু উভয় রেখার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। দাম ভোগ রেখার ক্ষেত্রে রেখাচিত্রের দুটি অক্ষে দুটি দ্রব্য মাপা হয়, কিন্তু চাহিদা রেখার ক্ষেত্রে রেখাচিত্রে সচরাচর OY-অক্ষে

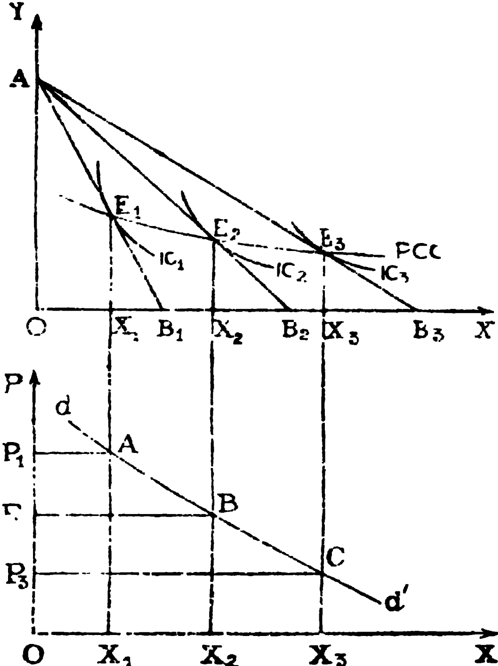
দাম ও OX-অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ মাপা হয়। এই পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দামভোগ রেখা থেকে আমরা চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারি। ৪.২২নং রেখাচিত্রের উপরের অংশে PCC হল দাম ভোগরেখা। এখানে AB_1 হল ক্রেতার প্রথম বাজেট রেখা। ক্রেতা E_1 বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করে এবং OX_1 পরিমাণ X-দ্রব্য ক্রয় করে।

অর্থাৎ দাম যখন AB_1 রেখার ঢাল $\left(\frac{OA}{OB_1}\right)$ তখন চাহিদা হবে OX_1.

এবার X-দ্রব্যের দাম কমে গেলে বাজেট রেখা হবে AB_2. ভারসাম্য বিন্দু হবে E_2 এবং X-দ্রব্যের চাহিদা হবে OX_2.

অর্থাৎ X দ্রব্যের দাম $\frac{OA}{OB_2}$ হলে চাহিদা হবে OX_2.

এইভাবে দাম যখন $\frac{OA}{OB_3}$ তখন চাহিদা হবে OX_3 ইত্যাদি। এখন ৪.২২ নং রেখাচিত্রে দাম যখন $OP_1 = \frac{OA}{OB_1}$, তখন চাহিদা OX_1. এর ক্ষেত্রে আমরা A বিন্দুটি পাই। আবার X-দ্রব্যের দাম যখন OP_2. $\frac{OA}{OB_2}\left(\frac{OA}{OB_2} < \frac{OA}{OB_1}\right.$ অর্থাৎ $OP_2 < OP_1$. অর্থাৎ দাম কমেছে) তখন চাহিদা $= OX_2$ আমরা B বিন্দুটি পাই। এইভাবে ৪.২২ নং রেখাচিত্রে PCC নামক রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্য নীচের রেখাচিত্রে আমরা এক একটি বিন্দু পাব। এই বিন্দুগুলি হল A, B, C, D ইত্যাদি। এদের যোগ করলে আমরা dd' চাহিদা রেখাটি পাব। এটি হল একজন ব্যক্তির চাহিদা রেখা। এর আকৃতি দামভোগ রেখার আকৃতির উপর নির্ভর করবে। যদি দামভোগ রেখা নিম্নমুখী হয় (অর্থাৎ যদি দাম কমলে চাহিদা বাড়ে) তাহলে চাহিদা রেখাও নিম্নমুখী হয়।



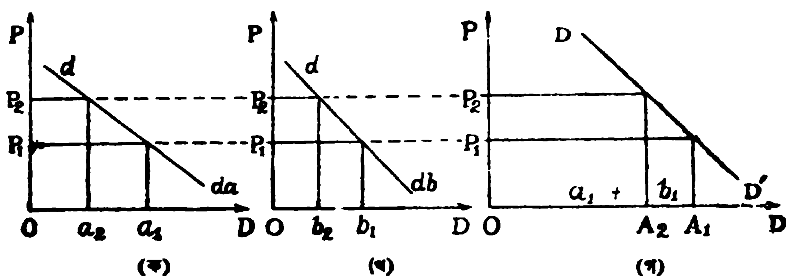
৪.২২ রেখাচিত্র : দামভোগ রেখা থেকে কীভাবে চাহিদারেখা অঙ্কন করা যায়

৪.২২ ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থেকে কীভাবে সামগ্রিক চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়?:

কোন নির্দিষ্ট দামে কোন একজন ক্রেতা কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রয় করতে ইচ্ছা

করে তাকে সেই দ্রব্যের ব্যক্তিগত চাহিদা বলা হয়। সেই দামে সব ব্যক্তি সেই দ্রব্যের যতখানি ক্রয় করতে চায় তাদের যোগফল হল সেই দামে বাজারের সামগ্রিক চাহিদা। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট দামে যেসব ব্যক্তিগত চাহিদার সৃষ্টি হয়, সেই ব্যক্তিগত চাহিদাগুলিকে যোগ করলে আমরা সামগ্রিক চাহিদা পাব। দাম যদি অন্য হয়, তাহলে ব্যক্তিগত চাহিদা এবং তাদের যোগফল হিসেবে সামগ্রিক চাহিদাও অন্য হবে। দাম যদি কমে তাহলে ব্যক্তিগত চাহিদা বাড়বে। সব ব্যক্তির ব্যক্তিগত চাহিদা বাড়লে বাজারের মোট চাহিদাও বাড়বে। এইভাবে সম্ভাব্য সব দামে ব্যক্তিগত চাহিদা থেকে আমরা ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা পাব এবং ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলি পাশাপাশি রেখে যোগ করলে আমরা সামগ্রিক চাহিদা রেখা পাব। একটি দেশে যতজন ভোগকারী বা ক্রেতা থাকবে ততগুলি ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থাকবে। এক্ষেত্রে সব চাহিদা রেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করতে হলে অঙ্কনের অসুবিধে হতে পারে। আমরা সেজন্য ধরে নিতে পারি যে, দেশে a ও b নামক দুজন মাত্র ক্রেতা আছে। a-ক্রেতার চাহিদা রেখা dd_a ও b-ক্রেতার চাহিদা রেখা dd_b. এই দুটি ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে কীভাবে বাজারের সামগ্রিক চাহিদা রেখা পাওয়া যায়, তা নীচের রেখাচিত্রে দেখানো হল।

এখানে (ক), (খ) রেখাচিত্রে a ও b ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। (গ) রেখাচিত্রে DD′ হল বাজারের মোট চাহিদা রেখা। দ্রব্যের দাম যদি OP_1 হয়, তাহলে সেই দামে a ক্রেতার চাহিদা হবে Oa_1 পরিমাণে এবং b ক্রেতার চাহিদা হবে Ob_1 পরিমাণে। অতএব OP_1 দামে বাজারের মোট চাহিদা



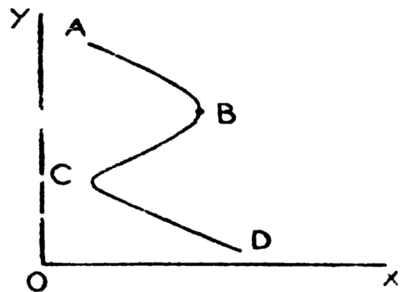
৪.২৩ রেখাচিত্র : ব্যক্তিগত চাহিদারেখা ও মোট চাহিদারেখা

হবে $Oa_1+Ob_1=a_1+b_1$. ধরলাম (গ) রেখাচিত্রে $OA_1=a_1+b_1$. এইভাবে দাম OP_2 হলে বাজারের মোট চাহিদা হবে OA_2. অন্যান্য দামেও বাজারের মোট চাহিদা একই পদ্ধতিতে জানা যাবে। দ্রব্যের বিভিন্ন দাম ও বিভিন্ন চাহিদার পরিমাণগুলি থেকে আমরা বাজারের মোট চাহিদা রেখা অঙ্কন করতে পারব। আমাদের রেখাচিত্রে এই চাহিদা রেখাটি হল DD′. আমরা জানি, প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয়, কাজেই মোট চাহিদা রেখাও নিম্নমুখী হবে।

৪.২৩. গিফেন-দ্রব্যের চাহিদারেখা :

গিফেন-দ্রব্যের দাম কমলে (বাড়লে) চাহিদা কমে (বাড়ে), কাজেই অনুমান করা যায় যে, গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখা স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা রেখার ন্যায় বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয় না। তাহলে কি গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়? অনেকের ধারণা যে, গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে সত্য নয়।

গিফেন-দ্রব্যের দাম কমলে পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ঋণাত্মক আয়-প্রভাবের ফলে গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। গিফেন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই আয়-প্রভাব পরিবর্ত-প্রভাবের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয় এবং এইভাবে গিফেন-দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদাও কমে যায়। এর ফলে গিফেন-দ্রব্যের দাম-ভোগ রেখা (PCC) পশ্চাৎমুখী হয়। কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, গিফেন-দ্রব্যের দাম-ভোগ-রেখা বা PCC প্রথম থেকেই পশ্চাৎমুখী হয় না। প্রথম দিকে PCC নিম্নমুখী হয় এবং তারপর পশ্চাৎমুখী হয়। PCC-র নিম্নমুখী অংশের জন্য গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখাও নিম্নমুখী হয়। PCC-র নিম্নমুখী অংশে দাম কমলে চাহিদা বাড়ে। কিন্তু PCC-র পশ্চাৎমুখী অংশে দাম কমলে চাহিদা কমে, কাজেই এই অংশের জন্য চাহিদা রেখা পশ্চাৎমুখী হয়। প্রথমদিকে গিফেন-দ্রব্যের দাম বেশ উচ্চস্তরে থাকে। সেই স্তর থেকে দাম যখন হ্রাস পায়, তখন পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে চাহিদা এত অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে, আয়-প্রভাব তার সমস্তটাকে নষ্ট করতে পারে না। দাম-হ্রাসের প্রথম দিকে পরিবর্ত-প্রভাব আয়-প্রভাব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হওয়ায় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দামের হ্রাস যদি খুব বেশি হয় তাহলে যে আয়-প্রভাবের সৃষ্টি হয়, তার পরিমাণ পরিবর্ত-প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠায় দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় এবং দ্রব্যটি যথার্থভাবে গিফেন-দ্রব্যে পরিণত হয়, এইভাবে গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখা প্রথমে বাম দিক থেকে ডান দিকে এবং তারপর ডান দিক থেকে বাম দিকে নিম্নমুখী হয়। কাজেই গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখা যে ঊর্ধ্বমুখী হয়—এমন বলা যায় না। অধ্যাপক স্টোনিয়ার ও অধ্যাপক হেগের মতে গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখা প্রথমে বাম দিক থেকে ডান দিকে, তারপর ডান দিক থেকে বাম দিকে নিম্নমুখী হয় এবং তারপরেও চাহিদা রেখাটি আবার বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয় অর্থাৎ গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখা দেখতে বাংলা '২' অঙ্কের মত হয়। প্রদত্ত ৪.২৪ নং রেখাচিত্রে গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা-রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। এই রেখাচিত্রের OX-অক্ষে



৪.২৪ রেখাচিত্র : গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখা

দ্রব্যের চাহিদা এবং OY-অক্ষে দ্রব্যের দাম পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে ABCD নামক রেখাটি হল গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখা। এই রেখাটির AB অংশ বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী। এই অংশে দাম কমলে পরিবর্ত-প্রভাব আয়-প্রভাব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয়। চাহিদা রেখার BC অংশটি ডান দিক থেকে বাম দিকে নিম্নমুখী হয়েছে। এই অংশে দাম কমলে আয়-প্রভাব পরিবর্ত-প্রভাবকে অতিক্রম করে, ফলে দাম কমলে চাহিদা কমে। CD অংশে দ্রব্যের দাম এত নীচে নেমে যায় যে, এখানে আয়-প্রভাবের আর বিশেষ কোন শক্তি থাকে না বলে পরিবর্ত-প্রভাব আবার প্রাধান্য লাভ করে এবং দাম কমলে চাহিদা বেড়ে যায়।

পরিশিষ্ট

৪.২৪. দাম-প্রভাব, আয় প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের চিহ্ন : (Signs of price-effect, income-effect and Substitution effect) :

চিহ্ন সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে বীজগণিত ও জ্যামিতির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বীজগণিতে ধনাত্মক পরিবর্তন বা বৃদ্ধি বোঝাতে + চিহ্ন এবং ঋণাত্মক পরিবর্তন বা হ্রাস বোঝাতে — চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু জ্যামিতিতে দিক হিসাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস সূচিত হয়। কোন একটি মূলবিন্দু (Point of Origin) থেকে ডান দিকের গতিকে ধনাত্মক পরিবর্তন এবং বাম দিকের গতিকে ঋণাত্মক পরিবর্তন হিসাবে সূচিত করা হয়ে থাকে। এর ফলে বীজগণিত ও জ্যামিতির মধ্যে বেশ বড়ো রকমের পার্থক্য দেখা দেয় এবং এই পার্থক্য অসতর্ক ব্যক্তিদের ভ্রান্তি ঘটায়। দাম-প্রভাব, আয়-প্রভাব, ও পরিবর্ত-প্রভাবের চিহ্ন নিয়ে এই বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা এত বেশি থাকে যে বলার নয়। এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশ্যেই এই পরিশিষ্ট সংযোজিত হল।

(১) দাম-প্রভাবের চিহ্ন :

দাম-প্রভাব হল কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে সেই দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন। X-নামক কোন একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনকে $\triangle P$ এবং চাহিদার পরিবর্তনকে $\triangle X$ দ্বারা সূচিত করলে দাম-প্রভাবকে $\frac{\triangle X}{\triangle P}$ বলা যায়। X-দ্রব্যটি যদি স্বাভাবিক-দ্রব্য হয়, তাহলে তার দাম কমলে চাহিদা বাড়বে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমবে। দাম কমলে $\triangle P$ হবে ঋণাত্মক। দাম কমার ফলে চাহিদা বাড়লে $\triangle X$ হবে ধনাত্মক। কাজেই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিষয়ের অনুপাত হিসাবে দাম-প্রভাব ঋণাত্মক হবে। বিপরীতক্রমে, স্বাভাবিক দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা কমে। দাম বাড়লে $\triangle P$ ধনাত্মক এবং চাহিদা কমলে $\triangle X$ ঋণাত্মক হবে। কাজেই দাম-প্রভাব আগের নিয়মমতো আবার ঋণাত্মক হবে। এর থেকে বলা যায় যে—স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব ঋণাত্মক হয়। এটি হল বীজগণিতের হিসাবে দাম-প্রভাবের সঠিক চিহ্ন।

স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব যে ঋণাত্মক হয়, সেই বিষয়টি কিন্তু আমাদের

সাধারণ ধারণার বিপরীত ধারণা। আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি যে স্বাভাবিক দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা যেহেতু বাড়ে এবং চাহিদার পরিমাণ রেখাচিত্রের বাম দিক থেকে ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়, কাজেই স্বাভাবিক-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব ধনাত্মক হয়। **সাধারণ ধারণামতে দামের যে কোন পরিবর্তনের জন্য চাহিদা বাড়লেই দাম-প্রভাব ধনাত্মক হয় এবং চাহিদা কমলে দাম-প্রভাব ঋণাত্মক হয়।** গিফেন দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা কমে, কাজেই গিফেন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম প্রভাব ঋণাত্মক হয়। জ্যামিতির হিসাবেই এমন কথা বলা যায়। বীজগণিতের হিসাবে— গিফেন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম বাড়লে চাহিদা বাড়ে, অর্থাৎ ΔP ধনাত্মক হলে ΔX ধনাত্মক হয়, কাজেই দাম-প্রভাব $\left(\frac{\Delta X}{\Delta P}\right)$ ধণাত্মক হয়। আবার গিফেন-দ্রব্যের দাম কমলে (ΔP ঋণাত্মক হলে) গিফেন-দ্রব্যের চাহিদাও কমে যায় (ΔX ঋণাত্মক হয়)। কাজেই গিফেন--দ্রব্যের দাম-প্রভাব $\frac{\Delta X}{\Delta P}$ ধনাত্মক হয়। এর থেকে বলা যায় যে—**গিফেন-দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব ধনাত্মক হয়।** বীজগণিতের হিসাবে গিফেন-দ্রব্যের দাম-প্রভাবের এই চিহ্নও সাধারণ ধারণার বিপরীত ধারণা। গিফেন দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদাও কমে যায় এবং চাহিদার পরিমাণ-সূচক বিন্দু ডান দিক থেকে বাম দিকে সরে আসে বলে জ্যামিতির হিসাবে গিফেন দ্রব্যের দাম-প্রভাব ঋণাত্মক হয়। দাম বাড়লে জ্যামিতিক হিসাব হিসাবে গিফেন-দ্রব্যের দাম-প্রভাব ধনাত্মক হয়।

বীজগণিতের হিসাবে দামের পরিবর্তন ও চাহিদার পরিবর্তনকে একসঙ্গে ধরে নিয়েই দামপ্রভাবের চিহ্ন নিধারণ করা হয়, কিন্তু জ্যামিতির হিসাবে শুধুমাত্র চাহিদার পরিবর্তন বিবেচনা করেই দাম-প্রভাবের চিহ্ন নির্ধারণ করা হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে বীজগণিতের পদ্ধতিকেই উন্নততর পদ্ধতি বলা যায়।

সংক্ষেপে বলা যায়, **বীজগণিতের বিচারে স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব ঋণাত্মক হয় এবং গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব ধনাত্মক হয়। কিন্তু জ্যামিতিক বিচারে—স্বাভাবিক দ্রব্যের দাম কমলে দাম-প্রভাব ধনাত্মক এবং দাম বাড়লে দাম-প্রভাব ঋণাত্মক হয়।**

(২) **আয়-প্রভাবের চিহ্ন :**

ক্রেতার বাস্তব আয়ের পরিবর্তনের ফলে কোন দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদার যে পরিবর্তন হয় তাকে আয়-প্রভাব বলা হয়। ক্রেতার বাস্তব আয় দুভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে (বা হ্রাস পেতে পারে)। প্রথমত, বাজারে সকল প্রকার দ্রব্য-সামগ্রীর দাম যদি স্থির থাকে, কিন্তু কোন সূত্র থেকে ক্রেতা যদি অধিক পরিমাণে আর্থিক আয় পেয়ে থাকে, তাহলে তার বাস্তব আয় বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, যদি ক্রেতার আর্থিক আয় স্থির থাকে, কিন্তু কোন দ্রব্যের দাম কমে যায়, তাহলে সেই দ্রব্যের হিসাবে ক্রেতার বাস্তব আয় বৃদ্ধি পায়। প্রথম ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে আয়-বৃদ্ধি ঘটে; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দাম-হ্রাসের মধ্য দিয়ে আয়-বৃদ্ধি ঘটে। যেভাবেই আয় বৃদ্ধি ঘটুক না কেন, সেই

আয় বৃদ্ধির ফলে ক্রেতার চাহিদায় পরিবর্তন হয়। **কিন্তু আয়-প্রভাবের চিহ্ন উভয় প্রকার আয়-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে যায়।** এই বিষয়টিকে একটু বিস্তৃত ভাবে বোঝানো যেতে পারে।

(ক) প্রত্যক্ষভাবে আয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব :

দ্রব্য-সামগ্রীর দাম স্থির থাকতেও ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। ক্রেতা লটারির পুরস্কার পেতে পারে, রাস্তায় যেতে যেতে কিছু টাকা কুড়িয়ে পেতে পারে, সরকারের কাছ থেকে কোন কাজের পুরস্কার হিসাবে টাকা পেতে পারে, অথবা তার কর্মস্থল থেকে বাড়তি ভাতা পেতে পারে। যেভাবেই হোক, ক্রেতার আর্থিক আয় বৃদ্ধি পেলে কোন দ্রব্যের জন্য ক্রেতার আগে যে চাহিদা ছিল, আয় বেড়ে যাওয়ার পর সেই চাহিদার পরিবর্তন হবে। এক্ষেত্রে আমরা দুরকম পরিবর্তনের কথা ভাবতে পারি। প্রথমত, আয়-বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। দ্বিতীয়ত, আয় বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পেতে পারে। ক্রেতার আয় বাড়লে কোন দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদা বাড়বে কি কমবে—সেই বিষয়টি সেই দ্রব্যটির প্রতি ক্রেতার রুচি ও পছন্দের অবস্থার উপর নির্ভর করে। সেই ক্রেতার নিকট সেই দ্রব্যটি যদি স্বাভাবিক দ্রব্য হয়, তাহলে ক্রেতার আয় বাড়লে সেই দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। কাজেই আয়-প্রভাব ধনাত্মক হবে। কিন্তু সেই ক্রেতার নিকট সেই দ্রব্যটি যদি নিকৃষ্ট মানের দ্রব্য হিসাবে বিবেচিত হয়, তাহলে ক্রেতার আয় বাড়লে সেই দ্রব্যের জন্য সেই ক্রেতার চাহিদা কমবে এবং আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হবে। X নামক কোন একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনকে ΔX দ্বারা এবং ক্রেতার আয়ের পরিবর্তনকে ΔM দ্বারা সূচিত করলে X-দ্রব্যের জন্য আয়-প্রভাবকে $\frac{\Delta X}{\Delta M}$ দ্বারা সূচিত করা যায়। আয় বাড়লে $\Delta M > 0$ হয় এবং আয় বৃদ্ধির ফলে যদি X-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহলে $\Delta X > 0$ হয়। এর ফলে আয়-প্রভাব বা $\frac{\Delta X}{\Delta M}$ ধনাত্মক হয়। X-দ্রব্যটি স্বাভাবিক-দ্রব্য হলেই ক্রেতার আয় বাড়লে X-দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায় এবং আয়-প্রভাব ধনাত্মক হয়। আবার, কোন কারণে ক্রেতার আয় হ্রাস পেলে স্বাভাবিক-দ্রব্যের জন্য ক্রেতার চাহিদাও হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে $\Delta M < 0$ হয় এবং $\Delta X < 0$ হয়, কাজেই আয়-প্রভাব বা $\frac{\Delta X}{\Delta M}$ দুটি ঋণাত্মক বিষয়ের অনুপাত হিসাবে ধনাত্মক হয়। **অতএব—স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ আয়-প্রভাব ধনাত্মক হয়।**

কিন্তু X-দ্রব্যটি আলোচ্য ক্রেতার নিকট নিকৃষ্ট-দ্রব্য হলে ক্রেতার আয় যত বাড়বে, ততই X-দ্রব্যের চাহিদা কমবে। এর ফলে $\Delta M > 0$ এবং $\Delta X < 0$ হবে এবং আয়-প্রভাব বা $\frac{\Delta X}{\Delta M}$ ঋণাত্মক হবে। আবার, X-দ্রব্যটি যদি নিকৃষ্ট-দ্রব্য হয় এবং ক্রেতার আয় হ্রাস পায়, তাহলে X-দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে। এক্ষেত্রে $\Delta M < 0$, কিন্তু

$\Delta X > 0$ হওয়ায় আয়-প্রভাব বা $\frac{\Delta X}{\Delta M}$ ঋণাত্মক হবে। **অতএব—নিকৃষ্ট-দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হয়।**

এখানে যে প্রত্যক্ষ আয়-প্রভাবের কথা বলা হল তাতে বীজগণিত ও জ্যামিতি—উভয়ের হিসাবেই স্বাভাবিক-দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধনাত্মক এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে আয়-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বীজগণিতের হিসাবে ও জ্যামিতির হিসাবে আয়-প্রভাবের কোন পার্থক্য হয় না।

(খ) পরোক্ষভাবে আয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব :

যদিও ক্রেতার আর্থিক আয় স্থির থাকে, তাহলেও কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার বাস্তব আয়ের পরিবর্তন হতে পারে। দ্রব্যের দাম হ্রাস পেলে ক্রেতার বাস্তব আয় বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রেতার বাস্তব আয় হ্রাস পায়। এইভাবে দামের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার আয়ের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকেই পরোক্ষভাবে আয়ের পরিবর্তন বলা যেতে পারে। এইরূপে আয়ের পরোক্ষ পরিবর্তনের ফলে যে আয়-প্রভাবের সৃষ্টি হয় সেই আয়-প্রভাবের চিহ্ন বীজগণিতের হিসাবে ও জ্যামিতির হিসাবে ভিন্ন হয়।

কোন দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন হয় এবং আয়ের পরিবর্তনের ফলে কোন দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন হয়। এখানে চাহিদার পরিবর্তন আয়ের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে এবং আয়ের পরিবর্তন দামের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। **একে দ্রব্যের দাম-পরিবর্তন-জনিত আয়-প্রভাব বলা হয়।** আমরা অবকলন গণিতের সাহায্যে এই পরোক্ষ আয়-প্রভাবকে প্রকাশ করতে পারি। X-নামক কোন একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হলে ক্রেতার আয় বা M-এর পরিবর্তন হয় এবং M-এর পরিবর্তন হলে X-দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন হয়। এখানে X হল M-এর অপেক্ষক এবং M হল দাম বা P-এর অপেক্ষক (Here X is a function of M where M is a function of P) একে অপেক্ষকের অপেক্ষক (function of a function) বলা যায়। কাজেই P-এর সামান্যতম পরিমাণে পরিবর্তনের ফলে M-এর পরিবর্তন হবে এবং M-এর সেই পরিবর্তনের ফলে X-দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন হবে। X-দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে যে আয়-প্রভাব ঘটবে তাকে $\frac{dX}{dM} \cdot \frac{dM}{dP}$ বলা যেতে পারে। দাম কমলে আয় বাড়বে। অর্থাৎ $dP < 0$ হলে $dM > 0$ হবে এবং $\frac{dM}{dP} < 0$ হবে। এখন X-দ্রব্যটি যদি স্বাভাবিক দ্রব্য হয়, তাহলে আয় বাড়লে চাহিদা বাড়বে; কাজেই $dM > 0$ হলে $dX > 0$ হবে এবং $\frac{dX}{dM} > 0$ হবে। তাহলে আমরা পাই, দাম কমলে আয় বাড়বে, আয় বাড়লে চাহিদা

বাড়বে। অতএব দাম কমলে $\frac{dM}{dP}>0$ এবং $\frac{dX}{dM}>0$ হবে। কাজেই $\frac{dX}{dM}\cdot\frac{dM}{dP}<0$ হবে। বিপরীতক্রমে X-দ্রব্যের দাম বাড়লে $dP>0$ হবে। দাম বাড়লে আয় কমবে এবং $dM<0$ হবে। কাজেই X-দ্রব্যের দাম বাড়লে $\frac{dM}{dP}<0$ হবে। এখন X-দ্রব্যটি স্বাভাবিক-দ্রব্য হলে ক্রেতার আয় কমলে X-দ্রব্যের চাহিদা কমবে। অর্থাৎ $dM<0$ হলে $dX<0$ হবে। এর ফলে $\frac{dX}{dM}>0$ হবে। এইভাবে X-দ্রব্যের দাম বাড়লে ক্রেতার আয় কমবে, ক্রেতার আয় কমলে চাহিদা কমবে এবং $\frac{dX}{dM}\cdot\frac{dM}{dP}<0$ হবে। অতএব আমরা বলতে পারি যে—কোন স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন জনিত আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হয়।

X-দ্রব্যটি যদি নিকৃষ্ট হয়, তাহলে তার দাম কমলে ক্রেতার আয় বাড়ে, এর ফলে $\frac{dM}{dP}$ ঋণাত্মক হয় এবং আয় বাড়লে X-দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়, অর্থাৎ $\frac{dX}{dM}$ ঋণাত্মক হয়। $\frac{dM}{dP}$ এবং $\frac{dX}{dM}$ উভয়েই ঋণাত্মক হওয়ায় তাদের গুণফল হিসাবে $\frac{dX}{dM}\cdot\frac{dM}{dP}$ ধনাত্মক হয়। এর থেকে বোঝা যায় যে নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন জনিত আয়-প্রভাব ধনাত্মক হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে—পরোক্ষ আয়-প্রভাব স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে ধনাত্মক হয়। এটা হল বীজগণিতের হিসাব অনুসারে দামের পরিবর্তনজনিত আয়-প্রভাবের চিহ্ন সম্বন্ধে আমাদের মত। বলা বাহুল্য যে এই মতটি জ্যামিতিক ধারণার বিপরীত ধারণা। জ্যামিতির হিসাবে দাম কমলে আয় বাড়ে, আয় বাড়লে স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। চাহিদার পরিমাণ সূচক বিন্দুটি বাম দিক থেকে ডানদিকে সরে যায়। কাজেই স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ধনাত্মক হয়। নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে এবং আয়-প্রভাব ঋণাত্মক হয়। অতএব জ্যামিতির হিসাবে—দামের হ্রাসজনিত আয়-প্রভাব স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ধনাত্মক এবং নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক হয়।

(৩) পরিবর্ত-প্রভাবের চিহ্ন :

পরিবর্ত-প্রভাবকে বিশুদ্ধ দাম-প্রভাব (Pure price effect) বলা হয়। কোন দ্রব্যের দাম কমলে ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পায়। দাম-হ্রাসের ফলে আয়-বৃদ্ধির এই প্রভাব নাশ করার জন্য ক্রেতার উপর আয়-কর আরোপ করা যেতে পারে। আয় করের সাহায্যে আয়-প্রভাবকে বাদ দেওয়ার পরও ক্রেতা লক্ষ্য করে যে সেই দ্রব্যটির আপেক্ষিক দাম সেই দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ক্রেতা অন্য বিকল্প দ্রব্যের চাহিদা কমিয়ে সেই কম দামের দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি করে। এইভাবে

কম দামের দ্রব্যটির চাহিদা যে পরিমাণে বৃদ্ধিপায় তাকে পরিবর্ত-প্রভাব বলা হয়। অতএব পরিবর্ত-প্রভাবের ক্ষেত্রে ক্রেতার আয়কে নির্দিষ্ট স্তরে স্থির রাখা হয় এবং ক্রেতাকে আপেক্ষিক দাম-হ্রাসের সুযোগ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ক্রেতা তার তৃপ্তি সর্বাধিক করার জন্য যে দ্রব্যের দাম হ্রাস পায়, তার চাহিদা সর্বদাই বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ দাম কমলে পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে যে-কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যটি স্বাভাবিক দ্রব্য বা গিফেন-দ্রব্য যে কোন দ্রব্যই হোক না কেন, দাম হ্রাসের ফলে তার চাহিদা বৃদ্ধি পায়। বিপরীতপক্ষে যে-কোন দ্রব্যের আপেক্ষিক দামেব বৃদ্ধি ঘটলে (এবং ক্রেতার আয়কে স্থির রাখা হলে) সেই দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়। এর থেকে আমরা বলতে পারি যে বীজগণিতের হিসাবে পরিবর্ত-প্রভাব সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই ঋণাত্মক হয়।

কোন দ্রব্যের দাম কমলে পরিবর্ত-প্রভাবের মাধ্যমে সেই দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদাব পরিমাণ সূচক বিন্দুটি রেখাচিত্রের মূলবিন্দু থেকে ডান দিকে সরে যায়। জ্যামিতির হিসাবে দাম-হ্রাসজনিত পরিবর্ত-প্রভাবকে ধনাত্মক বলা যায়। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে পরিবর্ত-প্রভাবের ফলে সেই দ্রব্যের চাহিদা এবং জ্যামিতির হিসাবে পরিবর্ত-প্রভাব ঋণাত্মক হয়।

প্রশ্নাবলী

১। নিরপেক্ষতা রেখা কাকে বলে? এই রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। "দুটি নিরপেক্ষতা রেখা পরস্পরকে ছেদ করে না এবং একটি নিরপেক্ষতা রেখা মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হয়।" আলোচনা কর। নিরপেক্ষতা রেখা কখন সরল রেখা হয়, কখন অবতল হয়?

৩। নিরপেক্ষতা রেখার আকৃতি আলোচনা কর। নিরপেক্ষতা রেখা ও নিরপেক্ষতা মানচিত্রের পার্থক্য কর।

৪। ক্রেতার ভারসাম্য কাকে বলে? কীভাবে এই ভারসাম্য অর্জিত হয়? এই ভারসাম্যের শর্তগুলি আলোচনা কর।

৫। নিরপেক্ষতা মানচিত্রের সাহায্যে ক্রেতার ভারসাম্য আলোচনা কর।

৬। দুটি দ্রব্য ও তাদের দাম এবং ক্রেতার আয় দেওয়া আছে, রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখাও ক্রেতা কীভাবে দ্রব্য ক্রয় করবে।

৭। নিরপেক্ষতা রেখা অবতল হলে ক্রেতা কীভাবে ভারসাম্য লাভ করবে, আলোচনা কর।

৮। সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি বলতে কী বোঝ? এই বিধিটি ব্যাখ্যা কর।

৯। দাম-প্রভাব, আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাব কাকে বলে, রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝাও।

১০। দেখাও যে, দাম-প্রভাব = পরিবর্ত-প্রভাব + আয়-প্রভাব।

১১। দাম-প্রভাব, পরিবর্ত-প্রভাব ও আয়-প্রভাবের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

১২। আয়-ভোগ রেখা কাকে বলে? এই রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

১৩। দাম-ভোগ রেখা কাকে বলে? দাম-ভোগ রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

১৪। নিকৃষ্ট-দ্রব্য ও গিফেন-দ্রব্য বলতে কী বোঝায়? নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে দাম-প্রভাব ও আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

১৫। দাম-ভোগ রেখা থেকে কীভাবে চাহিদারেখা অঙ্কন করা যায়?

১৬। নিরপেক্ষতা তত্ত্বের সাহায্যে চাহিদার নিয়মটিকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে দেখ।

১৭। ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা থেকে কীভাবে সামগ্রিক চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। নিরপেক্ষতা রেখা কাকে বলে?

২। নিরপেক্ষতা মানচিত্র কী? এটির দ্বারা কী বোঝায়?

৩। নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল বলতে কী বোঝায়?

৪। প্রান্তিক পরিবর্ততার হার কী?

৫। উন্নত নিরপেক্ষতা রেখার ক্ষেত্রে প্রান্তিক পরিবর্ততা হারের কী পরিবর্তন হয়?

৬। নিরপেক্ষতা রেখা কখন সরলরেখা হতে পারে?

৭। নিরপেক্ষতা রেখা কখন মূলবিন্দুর দিকে অবতল হয়?

৮। নিরপেক্ষতা রেখা অবতল হলে কী হয়?

৯। অপদ্রব্য ও স্বাভাবিক দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কী?

১০। বাজেট রেখা কাকে বলে?

১১। বাজেট রেখার ঢাল কী?

১২। বাজেট রেখার অবস্থানের কেমন পরিবর্তন হতে পারে?

১৩। বাজেট রেখা কখন সরলরেখা হয়? কখনই বা বক্ররেখা হয়?

১৪। ক্রেতার ভারসাম্য কী?

১৫। ক্রেতা কি বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা-রেখার ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করে? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

১৬। বস্তুগত বিষয় ও ব্যক্তিগত বিষয়ের পার্থক্য কর। যেসব বস্তুগত ও ব্যক্তিগত বিষয় একজন ক্রেতার ভারসাম্য নির্ধারণ করে তাদের গুরুত্ব কী?

১৭। দাম-প্রভাব, আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাব কী বোঝাও।

১৮। আয়-ভোগ রেখা কী? এই রেখা থেকে কী জানা যায়?

১৯। দাম-ভোগ রেখা কী? এই রেখা থেকে কী জানা যায়?

২০। নিকৃষ্ট দ্রব্য কী? নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব কেন ঋণাত্মক হয়?

২১। গিফেন-দ্রব্য কী? এর এরকম নাম হয়েছে কেন?

২২। নিকৃষ্ট-দ্রব্য ও গিফেন-দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কর।

২৩। ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা কী?

২৪। সামগ্রিক চাহিদা রেখা কী?

২৫। আড় দামগত স্থিতিস্থাপকতা কাকে বলে?

২৬। প্রতিযোগী ও পরিপূরক দ্রব্যের পার্থক্য কর। এই পার্থক্যের উপর মন্তব্য কর।

২৭। গিফেন-দ্রব্যের চাহিদা রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

৫ | উৎপাদন

৫.১. উৎপাদন ও উৎপাদনের উপাদান :

ভূমিকা : উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম। বাজারে বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য উৎপাদন করাই হল ফার্মের কাজ। দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য ফার্মকে নানা রকমের উপকরণ ও উপাদান ব্যবহার করতে হয়। উপকরণগুলি প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে পাওয়া যেতে পারে। আবার সেগুলি অন্য কোন ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্য হতে পারে। যেমন, লোহা উৎপাদন করতে হলে লোহার আকরিক ব্যবহার করতে হয়। লোহার আকরিক হল প্রাকৃতিক সম্পদ। উৎপাদনের কাজে এরকম আরো অনেক প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার করতে হয়। এদের আমরা জমি বলতে পারি। জমি হল একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, যা উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যার যোগান সীমাবদ্ধ। জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলেই জমির মালিককে খাজনা দিতে হয়। বিনা খাজনায় কোন ফার্ম জমি পেয়ে পারে না।

কোন ফার্ম দ্রব্য উৎপাদনের জন্য অন্য ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করে। কোন যন্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যন্ত্র উৎপাদনের জন্য যে লোহা ব্যবহার করে, সেই লোহা কোন লোহা উৎপাদনকারী ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্য। অন্যদিকে সেই লোহা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি লোহা উৎপাদনের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করে সেই যন্ত্র আসে যন্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি থেকে। এমনিভাবে বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে পারস্পরিক দ্রব্যের ব্যবহার চলে। আমরা বলতে পারি—কোন প্রতিষ্ঠান দ্রব্য উৎপাদনের জন্য জমি ছাড়াও কতগুলি উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ (Produced means of production) ব্যবহার করে। এই উপকরণগুলিকে মূলধন দ্রব্য বলা যেতে পারে। মূলধন হল উৎপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

জমি এবং মূলধন ছাড়াও উৎপাদনের কাজে শ্রম ব্যবহৃত হয়। শ্রম হল মানবিক শ্রম। উৎপাদনের কাজে মানুষ যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি প্রয়োগ করে তাকে শ্রম বলতে পারা যায়। শ্রম প্রাকৃতিক সম্পদ, কিংবা মানুষের সৃষ্ট এরকম স্পষ্ট করে বলা যায় না। শ্রম জমির মত অংশত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মূলধনের মত অংশত মানবিক সম্পদ। কাজেই শ্রম কাকে বলে, শ্রমের বৈশিষ্ট্য কী—এইসব সংজ্ঞাগত জটিলতার মধ্যে না গিয়ে আমরা সংক্ষেপে শ্রমকে একটি উৎপাদনের উপাদান হিসেবে ধরে নিতে পারি।

জমি, মূলধন ও শ্রম ছাড়াও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হয় পরিচালনা বা সংগঠন নামক আর একটি উপাদানের। সংগঠন হল একটি অবস্তুগত উপাদান। এর পরিমাণ খুব সহজে পরিমাপযোগ্য নয়। তবু সংগঠন ছাড়া উৎপাদন সম্ভব নয়। আমরা সংগঠন বলতে উৎপাদনের মালিকের পরিচালনা নামক বিশেষ সেবাকে ধরতে পারি।

অতএব জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন নামক চারটি উপাদানের সেবার যুগপৎ প্রয়োগে লব্ধ দ্রব্য বা সেবাকে উৎপাদন বলা যায়, যদি সেই দ্রব্য বা সেবা-উপাদন বিনিময়ের মাধ্যমে অন্যের ব্যবহারে লাগে।

৫.২ উৎপাদন সংগঠন :

সাংগঠনিক দিক দিয়ে দেখলে বহু প্রকার ফার্ম দেখা যায়। মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ফার্ম বেসরকারী, সরকারী ও যৌথ প্রতিষ্ঠান হতে পারে। আমরা অবশ্য এখানে কেবলমাত্র বেসরকারী ফার্মের কথাই ধরব।

(ক) একমালিকী কারবার : বেসরকারী ফার্মের মালিক যদি একজন হয় তাহলে তাকে একমালিকী কারবার বলা হয়। উৎপাদন তত্ত্বের আলোচনায় ফার্ম বলতে এইরূপ একমালিকী কারবারের কথাই বেশি আলোচনা করা হয়। একমালিকী প্রতিষ্ঠানের মালিক উৎপাদনের বিষয়ে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং উৎপাদনের সব রকম ঝুঁকি বহন করেন। এই মালিককে উদ্যোক্তা বলা যেতে পারে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন এই উদ্যোক্তা। কোন্ দ্রব্যের উৎপাদন করলে বাজার পাওয়া যাবে, লাভ বেশি হবে সেটি বুঝতে পারার ক্ষমতা সফল উদ্যোক্তার থাকে। উদ্যোক্তা বাজারের নাড়ি কোন্ তালে বইছে সেটা বুঝতে পারেন এবং সেইমত উৎপাদন করেন বলে তাঁকে উদ্ভাবক (Innovator) বলা যেতে পারে।

দ্রব্যের উৎপাদন করতে হলে জমি চাই, যার উপর কারখানা ঘর বানাতে হবে। কারখানার মধ্যে কিংবা বাইরে গুদাম ঘর, অফিসঘর থাকা চাই। উদ্যোক্তা জমি সংগ্রহ করেন, তার উপর বাড়ি তৈরি করেন কিংবা তৈরি বাড়ি খুঁজে নিয়ে সেখানে উৎপাদন শুরু করেন। এর জন্য খাজনা ও ভাড়া দিতে হয়। তারপর চাই যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি। উদ্যোক্তা এসব ক্রয়ের জন্য মূলধন ব্যয় করেন। এই মূলধন তিনি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নিতে পারেন। ব্যাঙ্ক ছাড়া অন্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও ঋণ নিতে পারেন কিংবা সমর্থ হলে নিজের বাড়ি থেকে দিতে পারেন। যেভাবেই হোক, মূলধন বিনিয়োগ করতে হয়। তারপর আছে কাঁচামাল সংগ্রহ করা, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা। উদ্যোক্তা সব রকম উপকরণ বা উপাদান সংগ্রহ করেন। তাদের উৎপাদনে নিয়োজিত করেন। আমরা বলি উৎপাদন পরিচালনা করেন। এইভাবে দ্রব্য উৎপাদন শেষ হয়, কিন্তু উদ্যোক্তার দায়িত্ব এখানেই শেষ হয় না।

উদ্যোক্তাকে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। এর জন্য লোক নিয়োগ করতে হয়। বিজ্ঞাপন দিতে হয়। পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হয়। সরকারের সঙ্গে আইন-কানুনের ব্যাপারে, কর-সংক্রান্ত ব্যাপারে যোগাযোগ করতে হয়।

দ্রব্য বিক্রয় হলে উদ্যোক্তা যে সব উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তাদের জন্য যে খরচ করেছিলেন বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে সেই সব খরচ-খরচা মিটিয়ে দেন। দেনার

সুদ দেন। চুক্তিগত খাজনা, ভাড়া, মজুরি, বোনাস ইত্যাদি দেন। এইসব দেওয়ার পর যদি তাঁর হাতে উদ্বৃত্ত কিছু থাকে সেটি মুনাফা হিসেবে নিজে পেয়ে থাকেন। অনেক সময় আবার বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে সব খরচ মেটানো যায় না। উদ্যোক্তার সব দেনা শোধ হয় না। উদ্যোক্তার ক্ষতি হয় এবং তিনি ছাড়া অন্য কেউ এই ক্ষতির ভাগ নেয় না। অতএব বোঝা যায়—একমালিকী কারবারে উদ্যোক্তার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

একমালিকী কারবারের সুবিধা : ১। এখানে মালিক একজন বলে উৎপাদনের ব্যাপারে যে-কোন রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কারো পরামর্শ নিতে হয় না। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয় এবং সময়ও কম লাগে। ২। একমালিকী কারবারে প্রশাসনিক জটিলতা কম থাকে। ৩। পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা দেখানোর অবকাশ থাকে। ৪। মালিক ব্যক্তিগতভাবে লাভ ভোগ করতে পারেন বলে তিনি অপচয় রোধ করে মিতব্যয়িতার নীতি অনুসরণ করেন। ৫। মালিক সব সময় কারবারের উন্নতি করতে চান। এর ফলে সবচেয়ে ভালো উৎপাদন পদ্ধতিতে উৎপাদন হয়। ৬। মালিক বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ পান।

একমালিকী কারবারের অসুবিধা : ১। এইরূপ কারবার কখনই বড়ো আকারের হতে পারে না। ২। বড়ো আকারের কারবার গড়ে তুলতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় তা কখনই একজন মালিকের পক্ষে দেওয়া কিংবা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ৩। সীমিত মূলধনের সাহায্যে ছোট আয়তনে কারবার গড়ে উঠলে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি বসানো যায় না, দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা যায় না। ফলে শ্রম-বিভাগের সুবিধে পাওয়া যায় না। এইভাবে বলা যায়, একমালিকী কারবার কখনই বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধে পেতে পারে না। ৪। ছোট কারবারের বাজার সীমিত হয়, ফলে বাজারের সুবিধেও পাওয়া যায় না। ৫। অনেক সময় মালিকের ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে কারবারের ক্ষতি হতে পারে। ৬। বাজারের চাহিদা যদি কমে যায়, মালিক বেশিদিন ক্ষতি সহ্য করে টি'কে থাকতে পারেন না। ৭। অনেক সময় অতি-মুনাফার লোভে **শ্রমিকদের শোষণ** করে থাকেন। ৮। হঠাৎ কোন কারণে মালিকের অসুস্থতাহেতু কারবারের কাজকর্মের মধ্যে বিশৃংখলা আসতে পারে। ফলে কারবারের সুনাম নষ্ট হতে পারে। ৯। একজনের পক্ষে সব কাজ সমানভাবে দেখা সম্ভব নাও হতে পারে। ফলে কর্মসমন্বয় (Co-ordination) গড়ে ওঠার পক্ষে অসুবিধের সৃষ্টি হতে পারে।

(খ) অংশীদারী কারবার : একমালিকী কারবার ছাড়াও ব্যবসায় সংগঠন কয়েকজন অংশীদারের দ্বারা গড়ে উঠতে পারে। একে অংশীদারী কারবার বলা হয়। এই কারবারে কয়েকজন ব্যক্তি মিলিতভাবে একটি কারবার গড়ে তোলেন এবং প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট অনুপাতে কারবারের মালিক হন। সকলেই মিলিতভাবে উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন এবং কারবার পরিচালনার জন্য সম্মিলিতভাবে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

অংশীদারী কারবারের অংশীদাররা সকলেই নির্দিষ্ট পরিমাণে মূলধন দেন এবং মূলধনের অনুপাতে সকলে মুনাফা ভোগ করে থাকেন।

সুবিধা: ১। একমালিকী কারবারের আয়তনের চেয়ে অংশীদারী কারবারের আয়তন বড় হয়। ২। মূলধনের পরিমাণ বেশি থাকে। ৩। উন্নতমানের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ অংশীদারী কারবার বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধে ভোগ করতে পারে। ৪। একমালিকী কারবারে একজন উদ্যোক্তার বুদ্ধি নিযুক্ত হয়, কিন্তু অংশীদারী কারবারে কয়েকজন উদ্যোক্তার বুদ্ধি একসঙ্গে মিলিত হয় বলে অংশীদারী কারবার আর্থিক দিক থেকে বেশি দক্ষতা দেখাতে পারে। ৫। অংশীদারী কারবারের স্থিরতা ও স্থায়িত্ব বেশি। একমালিকী কারবারের মালিকের অসুস্থতা বা মৃত্যু ঘটলে কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু অংশীদারী কারবারে একজন অংশীদারের মৃত্যু হলেও কারবার চলতে পারে।

অসুবিধা: ১। অংশীদারী কারবারের সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে হল যে, অংশীদারদের সম্ভাবের উপর এই কারবারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। যতদিন সম্ভাব থাকে ততদিন কারবার ভালই চলে। তারপর নানারকম আইনগত ও বাস্তব সমস্যার সৃষ্টি হয়। ২। একই কারণে অংশীদারী কারবারে পরিচালনার সমস্যা দেখা দেয়। অংশীদাররা সকলেই পরিচালক হলে নির্দেশ মানবার কেউ থাকে না, নীতির ক্ষেত্রেও মতপার্থক্যের ফলে কর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ৩। অংশীদারী কারবারে টাকা-পয়সার ব্যাপারে দুর্নীতি দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে। একজন মালিক অন্য অংশীদারের অর্থ আত্মসাৎ করার চেষ্টা করতে পাবেন। ৪। অংশীদারী কারবারও খুব একটা বড় হতে পারে না। বৃহদায়তন মাত্রায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হলে যে পরিমাণ মূলধনের দরকার তা যেমন একজন মালিকের পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি আবার কয়েকজন মালিকের পক্ষেও অনেক ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

(গ) যৌথমূলধনী কারবার: বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যৌথমূলধনী কারবার খুবই বড়ো হয়। বড়ো বলতে বোঝায় সব দিক দিয়ে বড়ো। এই কারবারে কোটি কোটি টাকার মূলধন খাটে। কারখানা ঘর, অফিস, গুদাম ঘর সবই বিশাল। বড়ো বড়ো যন্ত্রের সাহায্যে এক সঙ্গে বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন হয়। একসঙ্গে অনেক শ্রমিক কাজ করে। এসবই হল যৌথমূলধনী কারবারের বৈশিষ্ট্য।

যৌথমূলধনী কারবারের মূলধন সংগ্রহ: যৌথমূলধনী কারবারে অনেক বেশি মূলধনের প্রয়োজন হয়। এত বেশি মূলধন কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে এককভাবে যোগান দেওয়া সম্ভব হয় না। এমন কি কয়েকজন অংশীদার মিলেও এত টাকা একসঙ্গে জোটাতে পারেন না। সেইজন্য যৌথমূলধনী কারবারে বহুজনের কাছ থেকে মূলধন সংগ্রহ করা হয়। যেমন, ১০ টাকা করে প্রত্যেকটি শেয়ার যদি ১ লক্ষ লোকের মধ্যে ছাড়া হয়, তাহলে মোট ১০ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। একজন ব্যক্তির পক্ষে ১০ টাকা খুব বেশি টাকা নয়, কিন্তু একসঙ্গে ১০ লক্ষ টাকা নিঃসন্দেহে অনেক টাকা। যৌথমূলধনী কারবারে এইভাবে কম টাকার শেয়ার ছাড়া হয় এবং বহুলোক এই শেয়ারগুলি ক্রয় করেন। এর ফলে কোম্পানীর পক্ষে একসঙ্গে বেশি পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয়।

যাঁরা কোম্পানীর শেয়ার বা অংশপত্র ক্রয় করেন তাঁদের শেয়ার-হোল্ডার বলা হয়। শেয়ার-হোল্ডারগণ কোম্পানীর মালিক, যদিও সেই মালিকানা কোম্পানীর উপর একটি ক্ষুদ্র দাবিমাত্র। কোম্পানীর উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে যে আয় বা রেভেনিউ পাওয়া যায়—তা থেকে উৎপাদনের ব্যয় এবং অন্যান্য সব খরচ মিটিয়ে যে লাভ থাকে তাই শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে বিভক্ত হয়। একজন শেয়ার-হোল্ডার তাঁর শেয়ারের অনুপাতে লাভের অংশ বা ডিভিডেণ্ড পেয়ে থাকেন। শেয়ার-হোল্ডারগণ কোম্পানীর মালিক বলে তাঁদের আয়কে লাভ বা লভ্যাংশ বলা হয়।

অবশ্য শেয়ারের বিভিন্ন শ্রেণী আছে। আমরা দুই প্রকার শেয়ারের কথা বলতে পারি—যথা, অগ্রগণ্য শেয়ার (Preferential share) এবং সাধারণ শেয়ার (Ordinary share)। অগ্রগণ্য শেয়ারের মালিকেরা আগে লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন এবং তাঁদের শেয়ারের লভ্যাংশের হার আগে থেকে নির্দিষ্ট থাকে। কোম্পানীর লাভ হলে অগ্রগণ্য শেয়ার-হোল্ডারগণ লভ্যাংশ পেয়ে থাকেন।

অগ্রগণ্য শেয়ার-হোল্ডারদের লভ্যাংশ দিয়ে যদি উদ্বৃত্ত কিছু থাকে তা সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণের মধ্যে বিভক্ত হয়। সাধারণ শেয়ার-হোল্ডারগণ কোম্পানীর লাভ হলে লভ্যাংশ পান, ক্ষতি হলে ক্ষতি বহন করেন এবং তাঁরা শেয়ার-হোল্ডারদের সাধারণ সভায় যোগদান করেন, পরিচালক নির্বাচনে এবং কোম্পানীর অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

শেয়ার ছাড়াও যৌথমূলধনী কোম্পানী ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্রের মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহ করে। যাঁরা এই ঋণপত্র ক্রয় করেন তাঁরা কোম্পানীর মালিক নন, ঋণদাতা মাত্র। নির্দিষ্ট সময় অন্তে ডিবেঞ্চার হোল্ডাররা তাঁদের টাকা সুদসহ ফিরে পান। অনেক ক্ষেত্রে কোম্পানী আবার জনসাধারণের কাছ থেকেও আমানত গ্রহণ করে মূলধন সংগ্রহ করে। একে জন-আমানত (Public Deposit) বলা হয়। এই ব্যবস্থায় কোন কোম্পানী ২ বছর বা ৩ বছর বা অন্য কোন সময় মেয়াদের জন্য নির্দিষ্ট সুদে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়।

শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করে, কিংবা জন-আমানত গ্রহণ করে যৌথ মূলধনী কারবারে যে মূলধন সংগৃহীত হয়, তাকে বাহ্যিক সূত্র থেকে প্রাপ্ত মূলধন বলা হয়। বাহ্যিক সূত্র ছাড়াও যৌথমূলধনী কারবারগুলি অনেক সময় আভ্যন্তর সূত্র থেকেও মূলধন সংগ্রহ করে। এই আভ্যন্তর সূত্রের মধ্যে প্রধান হল—অবণ্টিত মুনাফা (Undistributed Profit)। প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট সময় অন্তে যে মোট মুনাফা হয় তার একটি অংশ শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন না করে প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় তহবিলে জমা করে রাখা হয়। প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনমত সেই সঞ্চয় ভেঙে মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

যৌথমূলধনী কারবারের গুণ :

১। প্রথমেই বলা যায় যে, যৌথমূলধনী কারবার আধুনিক যুগের বৃহদায়তন উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। বৃহৎ শিল্পের যুগে একমালিকী কারবার

অচল। মানুষের সংখ্যা বেড়েছে এবং প্রতিনিয়তই এত দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে যে, ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর তাগিদে বড়ো বড়ো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা ছাড়া এখন আর মানুষের উপায় নেই।

২। বড়ো প্রতিষ্ঠান চাই, সেই প্রতিষ্ঠানে বড়ো বড়ো সব যন্ত্রপাতি থাকবে। সেই যন্ত্রগুলির দাম অনেক। গোটা ব্যাপারটাই এত বিশাল হবে এবং তার জন্য এত বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে যে, কোন একজন মানুষের পক্ষে একক-ভাবে সেই মূলধন সংগ্রহ করা কখনই সম্ভব হবে না। যৌথমূলধনী কারবার শেয়ারের মাধ্যমে খুব বড়ো অঙ্কের মূলধন সংগ্রহ করতে পারে।

৩। কারবারের আয়তন বড়ো হলে, ক্রেতাদের কাছে তার সুনাম হয়।

৪। এর ফলে ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান থেকে যৌথমূলধনী কারবার প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে পারে।

৫। যৌথমূলধনী কারবার দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ভালো যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে। দক্ষ প্রশাসক ও শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে। অর্থাৎ যৌথমূলধনী কারবারের পক্ষে উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

৬। এর ফলে বৃহদায়তন উৎপাদনের যতগুলি ব্যয়-সংকোচের সুবিধে পাওয়া যায়—যৌথমূলধনী কারবার সেই সব সুবিধেগুলি ভোগ করতে পারে।

৭। যৌথমূলধনী কারবারের একটি পৃথক আইনগত অস্তিত্ব থাকে, অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মামলা করা যায় এবং এই প্রতিষ্ঠান অন্যের বিরুদ্ধেও মামলা করতে পারে। এইরূপ পৃথক আইনগত অস্তিত্ব থাকায় যৌথমূলধনী কারবারের স্থায়িত্ব খুব বেশী হয়। একজন বা একাধিক শেয়ার-হোল্ডারের মৃত্যু হলেও প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় না।

৮। যৌথমূলধনী কারবারে শেয়ার-হোল্ডারদের আর্থিক দায় সীমাবদ্ধ থাকে। কোম্পানি যদি উঠে যায় তাহলে যাঁর যত টাকার শেয়ার তিনি ঠিক সেই অনুপাতে পাওনাদারদের দাবি মেটাতে বাধ্য থাকেন। এর ফলে শেয়ার-হোল্ডারগণ সহজেই শেয়ার ক্রয়ে উৎসাহী হন।

৯। যৌথমূলধনী কারবার পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ছোট ছোট শেয়ার-হোল্ডারদের স্বার্থ উপেক্ষিত হয় না।

১০। যৌথমূলধনী কারবার গড়ে উঠলে তার সঙ্গে শেয়ার বাজার গড়ে ওঠে। শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রি করা যায়। আবার টাকা থাকলে শেয়ার কেনাও যায়। শেয়ার বাজার দেশের মূলধনের বড়ো বাজার। এই বাজার যত ভালোভাবে গড়ে ওঠে—দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি তত দৃঢ় হয় এবং লোকের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করার উৎসাহ ততই বৃদ্ধি পায়।

যৌথমূলধনী কারবারের দোষ :

যৌথমূলধনী কারবারের অনেক দোষ আছে, যদিও এর দোষের উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে, যৌথমূলধনী কারবার উঠে যাওয়া ভালো। যাতে আরো ভালো কারবার গড়ে তোলা যায়, তার জন্যই অর্থনীতিতে এর দোষের উল্লেখ করা হয়।

১। যৌথমূলধনী কারবারে একজন শেয়ার-হোল্ডার বা একজন মালিকের কোন গুরুত্ব থাকে না। প্রতিষ্ঠান এখানে বিশাল দৈত্যের আকার ধারণ করে। এই দৈত্যের যে শুধু আইনগত অস্তিত্বই থাকে তা নয়, এর একটা দানবিক অস্তিত্বও থাকে।

২ সরল উৎপাদন ব্যবস্থায় একজন উৎপাদক ভোগকারীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতে পারে। ভোগকারীদের প্রয়োজনমত দ্রব্যের যোগান দিতে পারে। এতে উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশি (অত্যুৎপাদন) বা কম (স্বল্পোৎপাদন) হয় না কিন্তু বৃহৎ যৌথপ্রতিষ্ঠান নিজস্ব নিয়মে—নিজের ধারণামত পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করে এবং মূলধন গঠনে শ্রমিক নিয়োগে অর্থ বিনিয়োগ করে। এর সঙ্গে ক্রেতাদের চাহিদার সঙ্গতি না থাকলে অত্যুৎপাদন (over-production), স্বল্পোৎপাদন (under-production)-এর সমস্যা দেখা দেয়। এখানে যদি ভারসাম্য দেখা দেয়—যদি প্রয়োজনমত দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়,—তাহলে বুঝতে হবে—সেটা দুর্ঘটনা মাত্র, যদিও সেটা খুবই সুখের দুর্ঘটনা (happy accident) মাত্র।

৩। যৌথমূলধনী কারবার ক্রেতাদের চাহিদা ধরে উৎপাদন না করে ক্রেতাদের চাহিদাকেই নিজেদের দ্রব্যের অনুকূলে আকর্ষণ করতে চয়ে। এতে ক্রেতাদের রুচি বিকৃতি ঘটতে পারে।

৪। যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের ঝোঁক থাকে অন্য প্রতিষ্ঠানকে গ্রাস করে প্রতিযোগিতাকে কমিয়ে একচেটিয়া কারবার গড়ে তোলার দিকে। একচেটিয়া কারবারে ক্রেতাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ উপেক্ষিত হয়।

প্রশ্নাবলী

১। উৎপাদন কাকে বলে? উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানগুলির ভূমিকা কী?

২। একমালিকী কারবারে মালিকের ভূমিকা সম্বন্ধে যা জান লিখ। একমালিকী কারবারের গুণাগুণ বিচার কর।

৩। অংশীদারী কারবার কাকে বলে? অংশীদারী কারবারের গুণাগুণ বিচার কর।

৪। একমালিকী কারবার ও অংশীদারী কারবারের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৫। যৌথমূলধনী কারবার কীভাবে গড়ে ওঠে এবং কীভাবে মূলধন সংগ্রহ করে লিখ।

৬। যৌথমূলধনী কারবারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। সীমাবদ্ধ দায় কাকে বলে?

২। ডিভিডেণ্ড কাকে বলে?

৩। অগ্রাধিকার শেয়ার ও সাধারণ শেয়ারের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। অবণ্টিত মুনাফা কী? এর ভূমিকা কী?

৫। শেয়ার ও ডিবেঞ্চারের পার্থক্য কী?

৬। যৌথমূলধনী কারবারের মূলধন সংগ্রহের আভ্যন্তর সূত্র কী?

৬ উৎপাদনের নিয়ম

৬.১. উৎপাদন অপেক্ষক কাকে বলে ?

কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে নানারকম উপাদানের প্রয়োজন হয়। এই উপাদানগুলিকে জমি (Land), শ্রম (Labour), মূলধন (Capital) এবং সংগঠন (Organisation বলা হয়। জমি হল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত সীমাবদ্ধ-যোগান-সম্পন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ। শ্রম হল উৎপাদনের কাজে প্রযুক্ত মানুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তি। মূলধন হল যন্ত্রপাতি, কারখানা ঘর, সাজসরঞ্জাম, অন্যান্য উপকরণ প্রভৃতি মানুষের দ্বারা উৎপন্ন উৎপাদনের উপকরণ। সংগঠন হল উৎপাদন পরিচালনা করা ও অন্যান্য দায়িত্ব গ্রহণ করা। জমি, শ্রম ও মূলধনকে বাস্তব পরিমাণে পরিমাপ করা যায়। সংগঠনকে সেরকমভাবে পরিমাপ করা যায় না। সেইজন্য কোন দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণকে কেবলমাত্র জমি, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। এই সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক (Production function) বলা হয়। অতএব আমরা পাই,

কোন দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য যে সব উপকরণ বা উপাদান ব্যবহার করতে হয়, সেই উপাদানের পরিমাণের সঙ্গে সেই দ্রব্যের পরিমাণের যে কারিগরী সম্পর্ক থাকে, তাকে উৎপাদন-অপেক্ষক বলা হয়।

যদি P = উৎপাদন

T = জমি,

L = শ্রম,

এবং K = মূলধন হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি P নির্ভর করে T, L ও K-এর নিয়োগের উপর। অঙ্কের ভাষায় বলা হয়—

$P = f(T, L, K)$। এটি হল উৎপাদন-অপেক্ষকের আঙ্কিক রূপ। এখানে উল্লেখ করা যায় যে—(১) উৎপাদনের সঙ্গে উপাদানের যে সম্পর্কের কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেটি একটি কারিগরী সম্পর্ক (Techaological relation) মাত্র। যাঁরা উৎপাদনের কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা করেছেন, তাঁরাই বলতে পারবেন—কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করতে হলে কোন্ কোন্ উপাদানের কী পরিমাণ লাগবে। সেইজন্য উৎপাদন-অপেক্ষকটিকে একটি কারিগরী সম্পর্ক বলা হয়।

(২) উৎপাদন-অপেক্ষকে যে সব উপাদানের কথা বলা হয়, তাদের সবগুলিই হল উপাদানের সেবা। জমি নামক উপাদানের সেবা হল উৎপাদনে ব্যবহৃত জমির পরিমাণ; শ্রমিকের নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম সেবার ব্যবহারই হল শ্রম নামক উপাদান এবং মূলধন সম্পদের ব্যবহার হল মূলধন নামক উপাদান।

৬.২. **উৎপাদনের পরিবর্তন :**

কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের উৎপাদন অপেক্ষকটি হল—

P = f (T, L, K)। এখানে P = উৎপাদন, T × জমি নামক প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহৃত সেবা, L = শ্রম-সম্পদের ব্যবহৃত সেবা, K = মূলধন সম্পদের সেবা। এখন এই উৎপাদন-অপেক্ষক থেকে পাই—P নির্ভর করে T, L, K-এর পরিমাণের উপর। আবার T, L ও K নামক উপাদানগুলির যদি গুণগত মানের উন্নতি হয়, কিংবা, তাদের ব্যবহার করার পদ্ধতির উন্নতি হয়, তাহলে সমান পরিমাণ T, L ও K দ্বারা বেশি পরিমাণে P পাওয়া যাবে। যদি দেশের উৎপাদন কৌশলের উন্নতি হয় তাহলে এমন হতে পারে। আমরা এখানে ধরে নেব যে, উৎপাদন কৌশলের কোন পরিবর্তন হয়নি। তাহলে উৎপাদনের পরিমাণ কেবলমাত্র উপাদানের নিয়োগের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে।

এই অবস্থায় আমরা বলতে পারি, যদি কোন একটি উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং অন্য উপাদানগুলির নিয়োগ স্থির থাকে, তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। উপরের উৎপাদন অপেক্ষক থেকে পাই,

(ক) যদি T বৃদ্ধি পায়, কিন্তু L ও K স্থির থাকে, তাহলে P বাড়বে, অথবা
(খ) যদি L বৃদ্ধি পায়, কিন্তু T ও K স্থির থাকে, তাহলে P বাড়বে, অথবা
(গ) যদি K বৃদ্ধি পায় কিন্তু T ও L স্থির থাকে, তাহলে P বাড়বে।

উপরের (ক), (খ) ও (গ) ক্ষেত্রে যে-কোন একটি উপাদান পরিবর্তনশীল এবং বাকি দুটি স্থির থাকছে। আবার যে-কোন দুটি উপাদানকে পরিবর্তনশীল এবং একটিকে স্থির ধরলে আমরা পাব—(ঘ) যদি T ও L বৃদ্ধি পায়, কিন্তু K স্থির থাকে, তাহলে P বাড়বে, (ঙ) যদি T ও K বৃদ্ধি পায়, কিন্তু L স্থির থাকে, তাহলে P বাড়বে, (চ) যদি L ও K বৃদ্ধি পায়, কিন্তু T স্থির থাকে, তাহলে P বাড়বে। এ ছাড়াও যদি (ছ) T, L ও K এক সঙ্গে বাড়ে, তাহলেও P বাড়বে। তাহলে P-এর বৃদ্ধি সাতভাবে হতে পারে।

উপাদানের পরিবর্তন বললে কেবলমাত্র বৃদ্ধিই বোঝায় না। পরিবর্তন বলতে বৃদ্ধি বা হ্রাস—যে-কোন একটিকে বোঝায়। এখন আমরা যদি উপাদানের নিয়োগের হ্রাস ধরি, তাহলে উৎপাদন কমবে এবং আমরা আরো সাতটি অবস্থা পাব, যেখানে P কেবলমাত্র কমবে।

উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে উৎপাদন বাড়বে। উপাদানের পরিমাণ হ্রাস করলে উৎপাদন কমবে। এটি হল একমুখী পরিবর্তন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে নিয়োগ বাড়লে উৎপাদন কমে যেতেও পারে। তাহলে মোট কত রকম অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তা নির্ণয় করা সহজ আলোচনার কাজ নয়। তাহলে আমরা বলতে পারি— উৎপাদনের পরিবর্তন নামক ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল ব্যাপার। অনুধাবণার

সাহায্যে সহজ করে না নিলে আমরা এই পরিবর্তন বুঝতে পারব না। সেইজন্য উৎপাদনের পরিবর্তন বোঝাতে আমরা ধরে নেব যে—

একটি মাত্র পরিবর্তনশীল উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন সম্ভব হয় এবং অন্য উপাদানগুলি স্থির থাকে।

৬.৩. মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের সংজ্ঞা।

(ক) মোট উৎপাদন :

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-অপেক্ষক হল $P = f(T, L, K)$। অর্থাৎ কোন দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ (P) নির্ভর করে জমি (T), শ্রম (L) ও মূলধন (K) নামক উপাদানসমূহের নিয়োগের পরিমাণের উপর। আলোচনার সুবিধের জন্য ধরলাম যে—শ্রম হল একমাত্র পরিবর্তনশীল (Variable) উপাদান, বাকি উপাদানগুলি যথা, T ও K হল স্থির (Fixed) উপাদান। তাহলে দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বা P কেবলমাত্র শ্রম বা L-এর উপর নির্ভর করবে। আমরা লিখতে পরি, $P = f(L)$; এটি হল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা কারবারের বিশেষ উৎপাদন-অপেক্ষক। এই উৎপাদন-অপেক্ষকে আমরা যদি L-এর মান বসাই, তা হলে P-এর মান পাব। এখন কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম-সেবার নিয়োগ থেকে প্রতিষ্ঠানটি **যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে তাকেই বলা হয় সেই প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন (Total Product বা T. P.).**

এই সংজ্ঞায় মোট উৎপাদনের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় : (১) মোট উৎপাদন উপাদানের নিয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় এবং (২) মোট উৎপাদন ব্যাপারটি একটি সম্ভাব্য ব্যাপার। এটি যে ঘটে গেছে এমন নয়, তবে ঘটতে পারে। আমরা বলতে পারি মোট উৎপাদন হল একটি Ex ante বিষয়।

(খ) গড় উৎপাদন :

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের গড় উৎপাদন পরিবর্তনশীল উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয়। যদি শ্রম একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান হয়, তাহলে **প্রতি একক শ্রমের নিয়োগ থেকে যে পরিমাণ সম্ভাব্য উৎপাদন পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় শ্রমের গড় উৎপাদন (Average Products or AP)।** যদি L-একক শ্রম নিয়োগ করে P-একক মোট উৎপাদন পাওয়ার আশা থাকে, তাহলে শ্রমের গড় উৎপাদন বা $AP = \frac{P}{L}$ হবে। অনুরূপভাবে যদি জমি বা T একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান হয় এবং T. একক জমির সেবা ব্যবহার করে P. একক উৎপাদন পাওয়া যায়, তাহলে জমির গড় উৎপাদন বা $AP_T = \frac{P}{T}$ হবে। অনুরূপভাবে, মূলধনের গড় উৎপাদন বা $AP_K = \frac{P}{K}$ হবে। তাহলে গড় উৎপাদন সম্বন্ধে আমরা দুটি মন্তব্য করতে পারি :

১। গড় উৎপাদনকে কোন পরিবর্তনশীল উপাদানের হিসেবে বিচার করা হয়।
২। গড় উৎপাদন একটি সম্ভাব্য বিষয়।

(গ) প্রান্তিক উৎপাদন ঃ

যদি ধরা হয় যে, কোন একটি মাত্র পরিবর্তনশীল উপাদানের সাহায্যে কোন দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হয়, তাহলে সেই পরিবর্তনশীল উপাদানটির নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। যেমন, আমরা যদি ধরে নিই যে, শ্রম (L) হল একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান, তাহলে শ্রমের নিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়বে। এখন অতিরিক্ত এক একক শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে, তাকেই বলা হয় শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Product বা MP)। আমরা যদি ধরে নিই যে, শ্রমের নিয়োগ ΔL পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপাদন ΔP পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহলে আমরা পাই,

শ্রমের নিয়োগ ΔL একক বাড়লে উৎপাদন বাড়ে ΔP একক

∴ " " 1 " " " " $\frac{\Delta P}{\Delta L}$ একক

তাহলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বা $MP_L = \frac{\Delta P}{\Delta L}$ হবে। শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করার সময় ধরে নেওয়া হয় যে, অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ ও উৎপাদনের কলাকৌশলগত অন্যান্য বিষয়সমূহ স্থির আছে। তাহলে আমরা পাই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ যদি স্থির থাকে এবং অন্যান্য কলাকৌশলগত বিষয়সমূহ যদি স্থির থাকে এবং সেই অবস্থায় শ্রমের নিয়োগ যদি অতিরিক্ত এক একক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাকেই বলা হয় শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন। অঙ্কের হিসেবে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বা $MP_L = \frac{\text{মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি}}{\text{শ্রমের নিয়োগের বৃদ্ধি}} = \frac{\Delta P}{\Delta L}$

একটি কাল্পনিক উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যায়। ধরা যাক, কোন প্রতিষ্ঠানে ১০ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১০০ একক উৎপাদন এবং ১৫ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১৪০ একক উৎপাদন পাওয়া যায়। এখানে দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি ৫ জন শ্রমিক বেশি নিয়োগ করে ৪০ একক বেশি উৎপাদন পাচ্ছে। তাহলে একজন শ্রমিক বেশি নিয়োগ করে সেই প্রতিষ্ঠানটি পাবে $= \frac{\text{৪০ একক}}{\text{৫}} =$ ৮ একক উৎপাদন। এখানে ৮ একক হল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন।

এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, $\frac{\Delta P}{\Delta L}$ হল একটি গড় মাত্র। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন কখনই গড় উৎপাদন নয়। তার জন্য আমরা বলি শ্রমের নিয়োগ ΔL পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও ΔL খুব বড়ো নয়, বরং ΔL খুবই ছোট, এত ছোট যে, প্রায় শূন্যের

কাছাকাছি। ΔL-কে শূন্যের কাছাকাছি ধরলে ΔPও খুব ছোট হবে এবং $\frac{\Delta P}{\Delta L}$ কে তখন আর গড় বলা যাবে না। তখন $\frac{\Delta P}{\Delta L}$ হবে একটি সীমান্তবর্তী পরিমাণ (limiting quantity)। এই সীমান্তবর্তী পরিমাণটিকে বলা হয় $\frac{dP}{dL} = \underset{\Delta L \to 0}{\text{Limit}} \frac{\Delta P}{\Delta L}$.

এখানে $\frac{dP}{dL}$ কোন অনুপাত নয়। শ্রমের নিয়োগ যদি অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহলে মোট উৎপাদন যতটুকু বৃদ্ধি পায় তাকে বলা হয় শ্রমের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির হার।

অতএব শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পায় সেই উৎপাদন বৃদ্ধির হারকেই শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয়।

এখানে কেবল শ্রমের নিয়োগের বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু শ্রমের নিয়োগের হ্রাসও হতে পারে। শ্রমের নিয়োগ হ্রাস পেলে মোট উৎপাদন কমবে। অর্থাৎ $\Delta L = -\Delta L$ হলে, $\Delta P = -\Delta P$ হবে, তখন $MP_L = \frac{-\Delta P}{-\Delta L} = \frac{\Delta P}{\Delta L}$ হবে। এইভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাসকে পরিবর্তন নাম দিলে আমরা পাই—

শ্রমের নিয়োগের পরিবর্তনের ফলে মোট উৎপাদন যে হারে পরিবর্তিত হয়—সেই পরিবর্তনের হারকেই শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয়।

অনুরূপভাবে, শ্রম (L) ও জমি (T) যদি স্থির থাকে এবং মূলধন (K) যদি পরিবর্তনশীল উপাদান হয়, তাহলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন বা $MP_K = \frac{dP}{dK}$ হবে। যদি শ্রম (L) ও মূলধন (K) স্থির ও জমি (T) পরিবর্তনশীল উপাদান হয়, তাহলে জমির প্রান্তিক উৎপাদন বা $MP_T = \frac{dP}{dT}$ হবে।*

প্রান্তিক উৎপাদনের সংজ্ঞা সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে—

(১) প্রান্তিক উৎপাদন সকল সময় একটি পরিবর্তনশীল উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে হিসেব করা হয়;

(২) প্রান্তিক উৎপাদনে যে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলা হয়, সেটি হল একটি সম্ভাব্য বিষয়;

(৩) প্রান্তিক উৎপাদনের সংজ্ঞা নির্ধারণের সময় অন্যান্য বিষয়ের অপরিবর্তিতা সম্বন্ধে অনুধারণা করে নিতে হয়।

---

* এখানে উল্লেখ করা যায় যে, অবকলন গণিতে $\frac{dP}{dL}$, $\frac{dP}{dK}$, $\frac{dP}{dT}$, বা লিখে $\frac{\partial P}{\partial L}$, $\frac{\partial P}{\partial K}$ ও $\frac{\partial P}{\partial T}$ লেখা হয়।

(ঘ) গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের পরিবর্তন :

ধরি শ্রম (L) হল একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান। তাহলে শ্রমের গড় উৎপাদন (Average Product of Labour or AP_L) হবে।

$$\frac{\text{মোট উৎপাদনের পরিমাণ}}{\text{মোট শ্রমের নিয়োগ}}$$

ধরি P = উৎপাদনের পরিমাণ,
L = শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ।

তাহলে $AP_L = \frac{P}{L}$. আমরা ধরে নিচ্ছি যে, L বাড়লে P বাড়ে। এই অবস্থায় AP_L-এর কী পরিবর্তন হবে তা আমরা জানতে চাই। যদি L বাড়ে ও P বাড়ে, তাহলে কি AP_L বাড়বে, না কি কমবে, না কি স্থির থাকবে? আসলে কী হবে, সেটা নির্ভর করছে L ও P-এর বৃদ্ধির আনুপাতিক হারের উপর। আমরা বলতে পারি—

১। যদি L বাড়ে ও P বাড়ে, কিন্তু L অপেক্ষা P বেশি হারে বাড়ে, তাহলে $\frac{P}{L}$ বাড়বে, অর্থাৎ AP_L বাড়বে; ২। যদি L ও P সমান হারে বাড়ে, তাহলে $\frac{P}{L}$ বা AP_L স্থির থাকবে এবং ৩। যদি L বাড়ে ও P বাড়ে, কিন্তু L অপেক্ষা P কম হারে বাড়ে, তাহলে $\frac{P}{L}$ বা AP_L কমবে। অতএব শ্রমের গড় উৎপাদন বাড়তে পারে, স্থির থাকতে পারে কিংবা কমতে পারে, আসলে কী হবে—সেটা নির্ভর করছে উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধির হারের উপর। এবার প্রান্তিক উৎপাদনের পরিবর্তন সম্বন্ধে বলা যাক।

$$\text{শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন} = \frac{\text{উৎপাদনের বৃদ্ধি}}{\text{শ্রমের নিয়োগের বৃদ্ধি}}।$$

ধরি ΔP = উৎপাদনের পরিমাণের বৃদ্ধি।
ΔL = শ্রমের নিয়োগের বৃদ্ধি।

তাহলে $MP_L = \frac{\Delta P}{\Delta L}$. এখন শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে বোঝায়, শ্রমের নিয়োগের ধনাত্মক পরিবর্তন হয়েছে, অর্থাৎ $\Delta L > 0$. অনুরূপভাবে P বাড়লে বোঝায়, $\Delta P > 0$. তাহলে আমরা পাই, $MP_L = \frac{\Delta P}{\Delta L}$ = দুটি ধনাত্মক সংখ্যার ভাগফল। এটিও অবশ্যই ধনাত্মক হবে। অর্থাৎ $MP_L > 0$. শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে যদি মোট উৎপাদন স্থির থাকে, তাহলে মোট উৎপাদনের কোন পরিবর্তনই হয় না। আমরা বলি—মোট উৎপাদনের শূন্য পরিবর্তন হয়েছে। অর্থাৎ $\Delta P = 0$. সেখানে

$\Delta L > 0$ হওয়া সত্ত্বেও $\Delta P = 0$ হয়েছে। কাজেই $MP_L = \frac{0}{\Delta L} = 0$ হবে। অর্থাৎ শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে যদি উৎপাদনের পরিমাণের কোন পরিবর্তন না হয়, তাহলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হয়েছে বোঝায়।

আবার, শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে যদি মোট উৎপাদন কমে যায়, তাহলে ΔP ঋণাত্মক হবে। অর্থাৎ $\Delta P < 0$ হবে। সেক্ষেত্রে $MP_L = \frac{\Delta P}{\Delta L} < 0$ হবে। অর্থাৎ শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে যদি মোট উৎপাদন কমে যায়, তাহলে বুঝতে হবে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হয়েছে। তাহলে আমরা পেলাম—প্রান্তিক উৎপাদন ধনাত্মক, শূন্য অথবা ঋণাত্মক হতে পারে।

এখানে আমরা তিনটি নিয়ম পাই :

১। মোট উৎপাদন যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন ধনাত্মক হবে; এবং অন্যভাবে বলা যায়,—প্রান্তিক উৎপাদন যদি ধনাত্মক হয়, তাহলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে;

২। মোট উৎপাদন যদি স্থির থাকে, তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হবে; অন্যভাবে, প্রান্তিক উৎপাদন যদি শূন্য হয়, তাহলে মোট উৎপাদন স্থির থাকবে;

৩। মোট উৎপাদন যদি হ্রাস পায়, তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হবে; অন্যভাবে, প্রান্তিক উৎপাদন যদি ঋণাত্মক হয়, তাহলে মোট উৎপাদন কমে যায়।

আমরা পেলাম MP_L ধনাত্মক, শূন্য অথবা ঋণাত্মক হতে পারে। এখন MP_L যদি ধনাত্মক হয় তাহলে MP_L-এর কেমন পরিবর্তন হতে পারে তা নির্ভর করবে মোট উৎপাদনের পরিবর্তনের হারের উপর। আমরা এখানে তিনটি সম্পর্ক পাই—

১। যদি শ্রমের নিয়োগ (ΔL) প্রত্যেক বার সমান পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, এবং তার জন্য মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি প্রত্যেকবার সমান পরিমাণে হয়, তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন স্থির থাকবে।

২। যদি শ্রমের নিয়োগ প্রত্যেক বার সমান পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং তার জন্য মোট উৎপাদন প্রত্যেকবার বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

৩। যদি শ্রমের নিয়োগ সমান পরিমাণে বাড়ে, কিন্তু মোট উৎপাদন কম পরিমাণে বাড়ে, তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন কমবে।

(ঙ) প্রান্তিক উৎপাদন থেকে কীভাবে মোট উৎপাদন জানা যায়?

প্রতি একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনকে যোগ করলে আমরা মোট উৎপাদনের হিসেব পাই। যেমন—প্রথম শ্রমিকের নিয়োগ থেকে যদি ১০ একক উৎপাদন পাই, দ্বিতীয় শ্রমিক থেকে যদি ৮ একক, তৃতীয় শ্রমিক থেকে ৬ একক উৎপাদন পাই, তাহলে—প্রথম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন = ১০ একক, দ্বিতীয় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন = ৮ একক এবং তৃতীয় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন = ৬ একক হবে। অতএব তিনজন শ্রমিক নিয়োগ করে মোট উৎপাদন পাওয়া যাবে ১০ + ৮ + ৬ = ২৪ একক।

এখানে ৩ জন শ্রমিকের মোট উৎপাদন = ১ম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন + ২য় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন + ৩য় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। যদি প্রতিষ্ঠানে n-সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, তাহলে n-সংখ্যক শ্রমিকের মোট উৎপাদন = ১ম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন + ২য় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন + ৩য় শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন + ... + n-তম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হবে।

যদি MP_i বলতে 'i'-তম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন বোঝায় এবং TP বলতে মোট উৎপাদন বোঝায়, তাহলে

$$TP = MP_1 + MP_2 + MP_3 + \cdots\cdots + MP_n$$

অর্থাৎ $TP = \sum_{i=1}^{n} MP_i$. অতএব বিভিন্ন একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনকে যোগ করলে আমরা মোট উৎপাদনের হিসাব পাই।

৬.৪. মোট উৎপাদন রেখা (Total Product Curve) ও তার আকৃতি :

কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন-অপেক্ষকটি হল

$$P = f(T, L, K)$$

অর্থাৎ মোট উৎপাদন (P) নির্ভর করে জমি (T), শ্রম (L) ও মূলধনের (K) নিয়োগের উপর। আমরা ধরে নিচ্ছি যে, জমি ও মূলধনের পরিমাণ স্থির আছে। ধরি $T = T_0$ এবং $K = K_0$, তাহলে উপরের উৎপাদন-অপেক্ষকটি হবে. $P = f(T_0, L, K_0)$. এখানে উৎপাদনের পরিমাণ P কেবলমাত্র শ্রমের পরিমাণ L-এর উপর নির্ভর করবে। এখন L-এর বিভিন্ন মান উৎপাদন-অপেক্ষকের সমীকরণে বসিয়ে আমরা P-এর বিভিন্ন মান পাব।

একটি দ্বি-অক্ষবিশিষ্ট রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে যদি L এবং উল্লম্ব অক্ষে যদি P পরিমাপ করা হয়, তাহলে L ও P-এর সম্মিলনগুলিকে যোগ করে আমরা যে রেখা পাব তাকে মোট উৎপাদন রেখা বলা হবে। এখন আমরা মোট উৎপাদন (Total Product বা TP) রেখার আকৃতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সম্পর্কগুলি পাই—

১। যদি L বাড়ে এবং P বাড়ে তাহলে TP রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে ;

২। যদি L বাড়ে এবং P স্থির থাকে তাহলে TP রেখা OL অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হবে, এবং

৩। যদি L বাড়ে এবং P কমে তাহলে TP রেখা নিম্নমুখী হবে।

আমরা ধরে নিই যে, L বাড়লে P বাড়ে অর্থাৎ TP রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। কিন্তু TP রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে বললেই সব বলা হয় না।

L বাড়লে P বাড়বে সত্য, কিন্তু L যে হারে বাড়বে, P কি ঠিক সেই হারে বাড়বে ? না কি তার চেয়ে বেশি হারে কিংবা কম হারে বাড়বে ? এই প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে পারলে আমরা ঊর্ধ্বমুখী TP রেখার আকৃতি জানতে পারব। L বাড়লে P বাড়ে, সেইজন্য TP রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে, কিন্তু এই ঊর্ধ্বমুখী TP রেখা

১। সরল রেখা হতে পারে,

২। শ্রম-অক্ষের (OX-অক্ষের) দিকে উত্তল (convex) হতে পারে, কিংবা

৩। শ্রম-অক্ষের দিকে অবতল (concave) হতে পারে।

আসলে TP রেখার আকৃতি কেমন হবে সেটা নির্ভর করছে উৎপাদন বৃদ্ধির হারের উপর। আমরা বলতে পারি,

(১) যদি মোট উৎপাদন বা P ও শ্রমের নিয়োগ (L) সমান হারে বাড়ে, তাহলে TP রেখা উর্ধ্বমুখী সরলরেখা হবে ;

(২) যদি P ক্রমাগত বেশি হারে বাড়ে, তাহলে TP রেখা OX-অক্ষের দিকে উত্তল হবে ;

(৩) যদি P ক্রমাগত কম হারে বাড়ে তাহলে TP রেখা OX-অক্ষের দিকে অবতল হবে ;

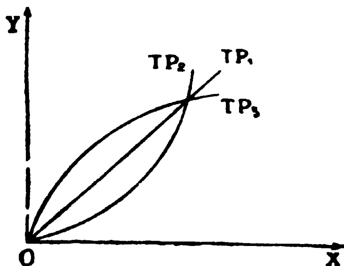
(৪) যদি প্রথমদিকে P বেশি হারে এবং পরের দিকে কম হারে বাড়ে, তাহলে TP রেখা প্রথম দিকে OX-অক্ষের দিকে উত্তল এবং পরের দিকে অবতল হবে। অর্থাৎ TP রেখাটি দেখতে অনেকটা প্রলম্বিত 'S' অক্ষরের মত হবে। এটিই হল TP রেখার আসল চেহারা।

৬.১ নং রেখাচিত্রে আমরা তিনটি TP রেখা অংকন করে উপরের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার আকৃতিগুলি বোঝাতে চেষ্টা করেছি। এই রেখাচিত্রের OX-অক্ষে শ্রমের নিয়োগ (L) এবং OY-অক্ষে মোট উৎপাদন P) পরিমাপ করা হয়েছে।

এই রেখাচিত্রে TP. হল একটি উর্ধ্বমুখী ও সরলরৈখিক মোট উৎপাদন রেখা। এখানে শ্রমের নিয়োগ যদি সমান হারে বাড়ে, তাহলে মোট উৎপাদনও সমান হারে বাড়ে. কাজেই মোট উৎপাদন রেখাটি সরলরৈখিক হয়েছে।

এখানে TP_2 রেখাটি OX-অক্ষের দিকে উত্তল হয়েছে। এখানে মোট উৎপাদন বাড়ছে এবং প্রত্যেকবার আগের চেয়ে বেশি হারে বাড়ছে। তেমনি TP_3 রেখাটি OX-অক্ষের দিকে অবতল হয়েছে। এখানে মোট উৎপাদন বাড়ছে. কিন্তু প্রত্যেক-বার কম হারে বাড়ছে।

আমরা মোট উৎপাদন রেখার এইরূপ পরিবর্তন থেকে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিবর্তন সম্বন্ধেও ধারণা করতে পারি। প্রান্তিক উৎপাদন হল মোট উৎপাদনের পরিবর্তনের হার। যেখানে মোট উৎপাদন ক্রমাগত বেশি হারে বাড়ে, সেখানে বুঝতে হবে প্রান্তিক উৎপাদনও ক্রমাগত বাড়বে। যেখানে মোট উৎপাদন সমান হারে বাড়ে, সেখানে প্রান্তিক উৎপাদনও সমান থাকবে এবং যেখানে মোট উৎপাদন কম হারে বাড়বে সেখানে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমাগত কমবে। অতএব, TP রেখা যদি সরলরৈখিক

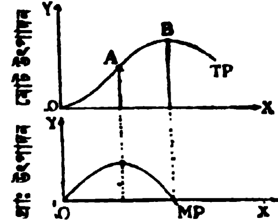


৬.১ রেখাচিত্র : মোট উৎপাদন রেখার বিভিন্ন আকৃতি

হয় (যেমন উপরের রেখাচিত্রে TP_1 রেখা), তাহলে MP রেখা OX-অক্ষের

সঙ্গে সমান্তরাল হবে। TP রেখা যদি TP_2 রেখার মত উত্তল হয়, তাহলে MP রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে এবং TP রেখা TP_3 রেখার মত অবতল হলে MP রেখা নিম্নমুখী হবে।

TP রেখা সাধারণত প্রথম দিকে উত্তল ও পরের দিকে অবতল হয়। কাজেই MP প্রথম দিকে বাড়বে এবং পরের দিকে কমবে। যে অংশে TP রেখা উত্তল, তার নীচে MP রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে। TP রেখার অবতল অংশের নীচে MP রেখা নিম্নমুখী হবে। TP রেখার উত্তল অংশের শেষ এবং অবতল অংশের আরম্ভের বিন্দুতে TP রেখাটি তার বাঁক বদল করবে। TP রেখাটি উত্তল থেকে অবতল হবে। ইংরেজিতে এই বিন্দুটিকে Point of inflection বলা হয়। আমরা বাংলায় একে **বাঁক বদলের বিন্দু** বলতে পারি। TP রেখার উত্তল অংশে MP বেড়ে যায়, TP রেখার অবতল অংশে MP কমে; তাহলে বাঁক বদলের বিন্দুতে MP অবশ্যই সর্বাধিক হবে। সেইজন্য আমরা বলতে পারি ঃ



৬.২ রেখাচিত্র : মোট ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখা

TP রেখার উপর বাঁক বদলের বিন্দুর নীচে MP সর্বাধিক, তার বামদিকে TP রেখার উত্তল অংশে MP রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে এবং তার ডান দিকে TP রেখার অবতল অংশের নীচে MP রেখা নিম্নমুখী হবে। ৬.২ নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হয়েছে। এখানে TP হল মোট উৎপাদন রেখা এবং তার নীচে MP হল প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। A বিন্দুটি হল TP রেখার বাঁক বদলের বিন্দু। A বিন্দুর বামদিকে OA অংশে TP রেখা উত্তল হয়েছে, কাজেই তার নীচে MP রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। A বিন্দুর ডান দিকে TP রেখা অবতল। কাজেই এর নীচে MP রেখা নিম্নমুখী হয়েছে। B বিন্দুতে TP সর্বাধিক, B বিন্দুর ডানদিকে TP রেখা নিম্নমুখী, বামদিকে ঊর্ধ্বমুখী। অতএব B বিন্দুতে MP শূন্য হয়েছে। সেইজন্য B বিন্দুর নীচে MP রেখা OX-অক্ষকে ছেদ করেছে।

৬.৫. যেখানে একটি মাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান থাকে সেখানে কীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ঃ (ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি) :

কোন দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য যে সব উপাদান ব্যবহৃত হয় সেই সব উপাদানের মধ্যে যদি একটি মাত্র উপাদান পরিবর্তনশীল হয় এবং বাকি উপাদানগুলি যদি স্থির থাকে, তাহলে উৎপাদন একটি বিশেষ নিয়মে পরিবর্তিত হয়। অর্থনীতিতে এই নিয়মটি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি নামে পরিচিত। এই বিধিটির বক্তব্য হল যে, **যেখানে একটি মাত্র উপাদান পরিবর্তনশীল এবং অন্যগুলি স্থির থাকে, সেখানে পরিবর্তনশীল উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু মোট উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমে আসবে। অর্থাৎ মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পাবে।**

অনেকে মনে করতে পারে, ক্রমহ্রাসমান শব্দটি মোট উৎপাদনের কমে আসাকে বোঝায়। তা নয়। মোট উৎপাদন তো বৃদ্ধি পায়। এখানে যেটা ক্রমহ্রাসমান হচ্ছে তার নাম উৎপাদন বৃদ্ধির হার। একে প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয়। কাজেই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটিকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বললেই ঠিক বলা হয়।

আবার উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম থেকেই প্রান্তিক উৎপাদন কমে না। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, প্রথমদিকে প্রান্তিক উৎপাদন বেড়ে যেতে থাকে, কিন্তু অন্য উপাদানগুলি স্থির থাকায় এই বৃদ্ধির হার শেষ পর্যন্ত কমে যায়। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন প্রথম দিকে বেড়ে পরিণামে ক্রমহ্রাসমান হয়। সেইজন্য শুদ্ধভাবে এই নিয়মটিকে **পরিণামে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি** (**The law of eventually diminishing marginal product**) বলা হয়।

প্রান্তিক উৎপাদন হল মোট উৎপাদনের বৃদ্ধি। প্রান্তিক উৎপাদন যতক্ষণ পর্যন্ত ধনাত্মক অর্থাৎ $MP > O$ হবে, ততক্ষণ মোট উৎপাদন বাড়বে। যেখানে $MP = O$ হবে, সেখানে মোট উৎপাদন আর বাড়বে না, তারপর MP ঋণাত্মক ($MP < O$) হলে মোট উৎপাদন কমবে। অতএব যেখানে মোট উৎপাদন সর্বাধিক, সেখানে $MP = O$ হবে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি থেকে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিবর্তনের প্রকৃতি যেমন বোঝা যায়, তেমনি গড় উৎপাদনের প্রকৃতিও বোঝা যায়। আমরা জানি শ্রম যদি একমাত্র পরিবর্তনশীল উৎপাদন হয় তাহলে শ্রমের গড় উৎপাদন $= \frac{P}{L}$ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে L যত বাড়ে, P তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে, কাজেই $\frac{P}{L}$ বা গড় উৎপাদন বাড়বে। তারপর L যে হারে বাড়বে, P তার চেয়ে কম হারে বাড়বে। কাজেই $\frac{P}{L}$ বা গড় উৎপাদন কমবে। কিন্তু মোট উৎপাদন যেহেতু কখনই শূন্য হবে না, অতএব $\frac{P}{L}$ কখনই শূন্য হবে না, অর্থাৎ গড় উৎপাদন কমবে সত্য, কিন্তু কখনই শূন্য হবে না।

এখন আমরা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করতে পারি—

১। যেখানে একটি উপাদান পরিবর্তনশীল এবং অন্যগুলি স্থির থাকে সেখানেই এই নিয়ম কার্যকর হয়;

২। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিতে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমানতা বোঝায়, সবক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমানতা বোঝায় না;

৩। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম থেকেই প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন কমবে—এমন বলা

যায় না ; প্রথম দিকে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন বাড়তে পারে, কিন্তু অবশেষে কমে যায় ;

৪। প্রান্তিক উৎপাদন কমলেও মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ; যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন ধনাত্মক থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ;

৫। যেখানে মোট উৎপাদন সর্বাধিক সেখানে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হয়, এবং

৬। প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হলেই মোট উৎপাদন কমতে থাকে।

ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কেন দেখা দেয়?—যে সব উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি উপাদান পরিবর্তনশীল, অন্য উপাদানগুলি স্থির থাকে সেখানেই প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে আসে। অন্য উপাদানগুলি স্থির থাকে বলেই এরূপ হয়। সাধারণত কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই বিধিটি বিশেষভাবে কার্যকর হয়। কারণ কৃষির জন্য জমি চাই। কোন কৃষকের যদি কম জমি থাকে তাহলে তাকে সেই জমিটুকুর মধ্যেই অধিক শ্রম ও মূলধন ইত্যাদি প্রয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। প্রথম প্রথম সে দেখবে তার ফসলের পরিমাণ ভালোই হচ্ছে। কিন্তু এরকম ব্যাপার চিরকাল ঘটতে পারে না। একটা সময় আসবে যখন সেই কৃষক দেখবে তার অতিরিক্ত উৎপাদন (প্রান্তিক উৎপাদন) কমে আসছে। অর্থাৎ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জমি যদি স্থির থাকে তাহলে এটা হবেই। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন একটি বা একাধিক উপাদান স্থির থাকলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি দেখা দেবেই। তা না হলে তো একটুকরো জমিতে ক্রমাগত শ্রম, মূলধন প্রয়োগ করে ক্রমাগত বেশি, আরো বেশি ফসল উৎপাদন করে সমস্ত পৃথিবীর খাদ্যাভাব মেটানো যেতো। কিন্তু এটা হয় না। সেইজন্য বলা হয় ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির পশ্চাতে মানুষের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা কাজ করছে।

৬ ৬. পরিবর্তনশীল অনুপাতের নিয়ম (Law of Variable Proportion) : উৎপাদনের ক্ষেত্রে যদি শ্রম ও মূলধন নামক দুটি উপাদান ব্যবহৃত হয়, তাহলে শ্রম ও মূলধনের অনুপাত দুরকমের হতে পারে। যদি শ্রম ও মূলধন সমান হারে পরিবর্তিত হয়, তাহলে শ্রম ও মূলধনের অনুপাত স্থির থাকে। অনেক দ্রব্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রম ও মূলধনকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ব্যবহার করতে হয়, নতুবা উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। আমরা সেই স্থির-উপাদান-অনুপাতের ঘটনাগুলি বাদ দিতে পারি। বাকি অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের অনুপাত পরিবর্তনশীল হয়। যদি মূলধনের পরিমাণ স্থির থাকে, কিন্তু শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে শ্রম / মূলধন $\left(\frac{L}{K}\right)$ অনুপাতটি ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থায় প্রান্তিক উৎপাদন প্রথমে বৃদ্ধি পেলেও পরিণামে হ্রাস পাবে। অন্যভাবে বলা যায়—পরিবর্তনশীল অনুপাতের ক্ষেত্রে এই অনুপাত যত বৃদ্ধি পাবে তার ফলে মোট উৎপাদন প্রথমে অধিক হারে এবং অবশেষে কম হারে বৃদ্ধি পাবে। এখানে মোট উৎপাদন বাড়লেও

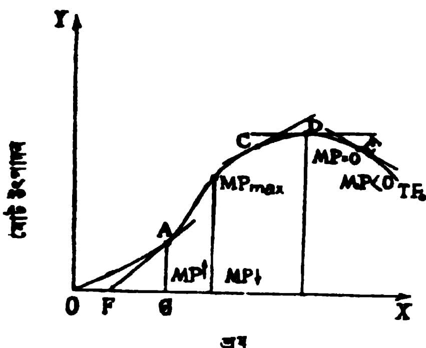
মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হারের পরিবর্তন হবে। যেভাবে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হারের পরিবর্তন হবে তাকে আমরা একটি নিয়মের আকারে বলতে পারি।

যেখানে উপাদানের অনুপাত পরিবর্তনশীল সেখানে অনুপাতের ক্রমাগত বৃদ্ধির জন্য মোট উৎপাদন প্রথমদিকে বেশি হারে বৃদ্ধি পেলেও পরিণামে কম হারে বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ শ্রম ও মূলধন নামক দুটি উপাদানের কথা ধরলে যদি মূলধনকে স্থির উপাদান ধরা হয় তাহলে শ্রম / মূলধন অনুপাত যত বাড়বে প্রান্তিক উৎপাদন প্রথম দিকে বাড়লেও পরিমাণে কমবে।

৬.৭. মোট উৎপাদন রেখা থেকে কীভাবে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন পরিমাপ করা যায় ?

(ক) মোট উৎপাদন রেখা থেকে প্রান্তিক উৎপাদনের জ্যামিতিক পরিমাপ।

মোট উৎপাদন রেখা থেকে কীভাবে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ ও পরিবর্তন সম্বন্ধে জানতে পারা যায় তা পাশের রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখান হল। এখানে ধরা হয়েছে শ্রম (L) হল একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান। রেখাচিত্রের OX-অক্ষে শ্রম ও OY-অক্ষে মোট উৎপাদন পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে TP হল মোট উৎপাদন রেখা। শ্রম যেহেতু একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান এবং অন্য উপাদানগুলি যেহেতু স্থির আছে, সেইজন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি কার্যকরী হবে, যার জন্য TP রেখাটি প্রলম্বিত 'S' অক্ষরের মত হয়েছে। TP রেখার উপর উত্তল অংশের শেষে এবং অবতল অংশের শুরুতে থাকবে বাঁক বদলের বিন্দু (Point of inflection)।



৬.৩ রেখাচিত্র : মোট উৎপাদন রেখা থেকে কীভাবে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাপ করা যায়

TP রেখার উপর A, C ও D ইত্যাদি কয়েকটি বিন্দু নিলাম। ধরি A বিন্দুতে আমরা প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করতে চাই।

আমরা জানি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বা $MP_L = \frac{\Delta P}{\Delta L} = \underset{\Delta L \to 0}{Lt} \frac{\Delta P}{\Delta L} = \frac{dP}{dL}$.

সঠিকভাবে বলতে গেলে—A বিন্দুতে MP_L হবে TP রেখার উপর A বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল (এর প্রমাণ এখানে দেওয়া হল না)। আমাদের রেখাচিত্রে AF হল TP রেখার উপর A বিন্দুতে অঙ্কিত একটি স্পর্শক। এই স্পর্শকের ঢাল $= \frac{AG}{FG} =$ AFG ত্রিভুজের $\frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \tan$ AFG $=$ A বিন্দুতে শ্রমের প্রান্তিক

উৎপাদন। অনুরূপভাবে TP রেখার উপর C বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢাল হল C বিন্দুতে MP_L. কিন্তু C বিন্দুর স্পর্শকের ঢাল A বিন্দুর স্পর্শকের ঢাল অপেক্ষা কম। কাজেই C বিন্দুতে MP_L A বিন্দুর MP_L-এর চেয়ে কম।

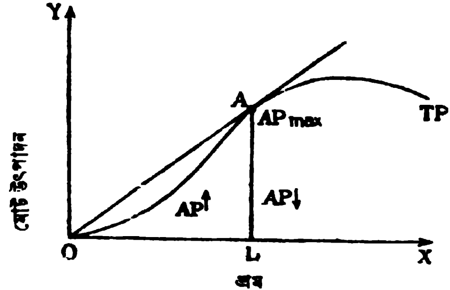
আবার D বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকটি OX-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে গেছে। এর ঢাল শূন্য। কাজেই D বিন্দুতে $MP_L = O$ হয়েছে। এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, TP রেখাটি যদি প্রলম্বিত S অক্ষরের মত হয়, তাহলে তার উত্তল অংশে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ বাড়বে, বাঁক বদলের বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বাধিক হবে এবং TP রেখার শীর্ষবিন্দুতে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হবে। তারপর TP রেখার নিম্নমুখী অংশে স্পর্শক টানলে তার ঢাল ঋণাত্মক হবে। কাজেই সেখানে প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হবে।

অতএব আমরা পাই—মোট উৎপাদন রেখার উপর কোন নির্দিষ্ট বিন্দুতে প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করতে হলে—মোট উৎপাদন রেখার উপর সেই বিন্দুতে একটি স্পর্শক অঙ্কন করতে হয় এবং সেই স্পর্শকের ঢালই হয় প্রান্তিক উৎপাদন। এই ঢাল বাড়লে বা কমলে প্রান্তিক উৎপাদনও যথাক্রমে বাড়ে বা কমে।

(খ) মোট উৎপাদন রেখা থেকে গড় উৎপাদনের পরিমাপ :

শ্রমের গড় উৎপাদন বা $AP_L = \frac{P}{L}$. TP রেখার উপর কোন বিন্দুতে কীভাবে AP_L পরিমাপ করা যায়, তা নীচের রেখাচিত্রে দেখানো হল।

এখানে TP রেখার উপর A একটি বিন্দু। A বিন্দু থেকে OX-অক্ষের উপর AL লম্ব আঁকা হল। এখানে মোট উৎপাদন (P) = AL এবং শ্রম (L) = OL। অতএব A বিন্দুতে শ্রমের গড় উৎপাদন $= \frac{P}{L}$ $= \frac{AL}{OL}$ = OA রেখার ঢাল। তাহলে আমরা পাই, মোট উৎপাদন রেখার উপর কোন বিন্দুতে গড় উৎপাদন পরিমাপ করতে হলে সেই বিন্দুটিকে রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর সঙ্গে একটি সরলরেখা এঁকে যোগ করা হয়। সেই সরলরেখার ঢাল হয় গড় উৎপাদন। এই রেখার ঢাল বাড়লে বা কমলে গড় উৎপাদনও বাড়ে বা কমে।

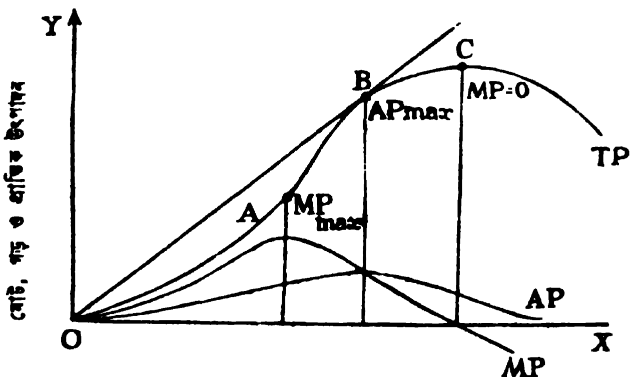


· ? রেখাচিত্র : মোট উৎপাদন রেখা থেকে কীভাবে গড় উৎপাদন পরিমাপ করা যায়

৬·৪ নং রেখাচিত্রে A বিন্দুর বামদিকে TP রেখার উত্তল-অংশে গড় উৎপাদন ক্রমবর্ধমান, কিন্তু A বিন্দুর ডানদিকে TP রেখার অবতল অংশে গড় উৎপাদন ক্রম-হ্রাসমান। অর্থাৎ A বিন্দুতে গড় উৎপাদন সর্বাধিক (Maximum)। অতএব

মোট উৎপাদন রেখার উপর কোন বিন্দুকে একটি সরলরেখার সাহায্যে মূল বিন্দুর সঙ্গে যোগ করলে যে রেখা পাওয়া যাবে সেই রেখাটি যেখানে মোট উৎপাদন রেখাকে স্পর্শ করবে সেই স্পর্শবিন্দুতে গড় উৎপাদন সর্বাধিক হবে। অর্থাৎ রেখাচিত্রের মূল বিন্দু থেকে A বিন্দু পর্যন্ত গড় উৎপাদন ক্রমশ বাড়বে, A বিন্দুতে সর্বাধিক হবে এবং A বিন্দুর ডান দিকে ক্রমশ কমবে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, A বিন্দুতে গড় উৎপাদন = OA রেখার ঢাল। আবার, OA রেখাটি যেহেতু TP রেখার উপর A বিন্দুতে একটি স্পর্শক, অতএব OA রেখার ঢাল হল প্রান্তিক উৎপাদন। এর থেকে আমরা পাই A বিন্দুতে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান। অন্যভাবে বলা যায়—যে বিন্দুতে গড় উৎপাদন সর্বাধিক সেখানে গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন পরস্পর সমান। আবার গড় উৎপাদন যেখানে সর্বাধিক তার বামদিকে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বাধিক। যেখানে মোট উৎপাদন রেখার উত্তলতা শেষ হয়ে অবতলতা আরম্ভ হচ্ছে সেখানে প্রান্তিক উৎপাদন সর্বাধিক এবং তার ডানদিকে গড় উৎপাদন সর্বাধিক।



৬.৫ রেখাচিত্র : মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখা

এখন আমরা একটিমাত্র রেখাচিত্রে মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করতে পারি। উপরের রেখাচিত্রে এটি দেখানো হয়েছে। এখানে TP হল মোট উৎপাদন রেখা। এর উপর A হল বাঁক বদলের বিন্দু। এর নীচে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) সর্বাধিক। চিত্রে B বিন্দুতে গড় উৎপাদন সর্বাধিক; কাজেই B বিন্দুর নীচে গড় উৎপাদন (AP) সর্বোচ্চ। TP রেখার উপর C বিন্দুতে মোট উৎপাদন সর্বাধিক, কাজেই প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য। সেজন্য C বিন্দুর নিচে MP রেখা OX-অক্ষকে ছেদ করেছে।

৬.৮. গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক ঃ

গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্কগুলি আমরা উদাহরণের সাহায্যে বোঝাতে পারি।

প্রথম সম্পর্ক ঃ যেখানে গড় উৎপাদন বাড়ে সেখান প্রান্তিক উৎপাদনও বাড়ে এবং গড় উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হারে বাড়ে।

নীচের ১নং তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে গড় উৎপাদন ২ থেকে বেড়ে ৩, ৩ থেকে ৪, ৪ থেকে ৫ এবং ৫ থেকে যখন ৬ হয়, তখন প্রান্তিক উৎপাদন ২ থেকে ৪, ৪ থেকে ৬, ৬ থেকে ৮ এবং ১০ হয়েছে। অর্থাৎ গড় উৎপাদন বেড়েছে, প্রান্তিক উৎপাদনও বেড়েছে, কিন্তু গড় উৎপাদনের চেয়ে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি বেড়েছে।

১নং তালিকা

L	AP	TP	MP
১	২	২	২
২	৩	৬	৪
৩	৪	১২	৬
৪	৫	২০	৮
৫	৬	৩০	১০

রেখাচিত্রের ভাষায়—গড় উৎপাদন রেখা যখন উর্ধমুখী হয়, প্রান্তিক উৎপাদন রেখাও তখন উর্ধমুখী হয় এবং গড় উৎপাদন রেখার উপরে থাকে।

দ্বিতীয় সম্পর্ক ঃ যদি গড় উৎপাদন ক্রমশ কমে তাহলে প্রান্তিক উৎপাদনও ক্রমশ কমে এবং বেশি হারে কমে। ২নং তালিকায় AP ও MP-র পরিবর্তন থেকে এটি বোঝা যায়।

২নং তালিকা

L	AP	TP	MP
১	৫	৫	৫
২	৪	৮	৩
৩	৩	৯	১
৪	২	৮	−১
৫	১	৫	−৩

রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায় গড় উৎপাদন রেখা যদি নিম্নমুখী হয়, তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন রেখাও নিম্নমুখী হবে এবং গড় উৎপাদন রেখার নীচে থাকবে।

তৃতীয় সম্পর্ক : **গড় উৎপাদন যদি স্থির থাকে, তাহলে প্রান্তিক উৎপাদনও স্থির থাকে এবং সেক্ষেত্রে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়।** রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায় গড় উৎপাদন রেখা যদি শ্রম-পরিমাপক অক্ষের সমান্তরাল হয়, তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন রেখাও অনুরূপভাবে সমান্তরাল হয় এবং গড় উৎপাদন রেখার সঙ্গে মিশে যায়।

৩নং তালিকা

L	AP	TP	MP
১	৫	৫	৫
২	৫	১০	৫
৩	৫	১৫	৫
৪	৫	২০	৫
৫	৫	২৫	৫

এখানে AP প্রত্যেকবার ৫ একক হওয়ায় MP ও প্রত্যেকবার ৫ একক হয়েছে।

চতুর্থ সম্পর্ক : **গড় উৎপাদন যেখানে সর্বাধিক সেখানে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হয়।** নীচে ৪নং তালিকার সাহায্যে এটি দেখানো হল।

৪নং তালিকা

L	TP	AP	MP
১	২	২	২
২	৮	৪	৬
৩	১৮	৬	১০
৪	২৪	৬	৬
৫	২৮	৫·৬	৪
৬	৩০	৫	২
৭	৩০	৪·৩	০
৮	২৪	৩	–৬

এখানে চতুর্থ শ্রমিক নিযুক্ত করলে তার গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ৬ একক হবে এবং গড় উৎপাদন ৬ একক হবে সর্বাধিক গড় উৎপাদন। তাহলে দেখা যাচ্ছে গড় উৎপাদন যখন ৬ একক, তখন প্রান্তিক উৎপাদনও ৬ একক। অর্থাৎ যেখানে AP সর্বাধিক, সেখানে **AP = MP.**

তাহলে আমরা পাই গড় উৎপাদন যদি বাড়ে বা কমে তাহলে প্রান্তিক উৎপাদনও বাড়বে বা কমবে এবং উভয় ক্ষেত্রেই প্রান্তিক উৎপাদনের পরিবর্তন গড় উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হবে। যখন গড় উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকবে তখন গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন সমান হবে।

প্রশ্নাবলী

১। উৎপাদন-অপেক্ষক কী? এই অপেক্ষক থেকে উৎপাদনের পরিবর্তন সম্বন্ধে কী ধারণা করা যায়?

২। মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের সংজ্ঞা লিখ। মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন কাকে বলে? মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৪। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কী? যেখানে একটিমাত্র উপাদান পরিবর্তনশীল, সেখানে মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন কীভাবে পরিবর্তিত হয় আলোচনা কর।

৫। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা কর। এই বিধিটি কেন কার্যকরী হয়?

৬। মোট উৎপাদন রেখা কাকে বলে? এর আকৃতি কীরূপ হতে পারে আলোচনা কর।

৭। গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন কাকে বলে? মোট উৎপাদন রেখা থেকে কীভাবে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদনের পরিবর্তন জানা যাবে?

৮। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন রেখার আকৃতি কেমন হয়? এই রেখার নীচে প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন রেখা কীভাবে অঙ্কন করা যায়?

৯। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রে মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখার আকৃতিগত সম্পর্ক আলোচনা কর।

১০। গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন কাকে বলে? ওদের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। উৎপাদন-অপেক্ষক কী?

২। মোট উৎপাদন, গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদনের সংজ্ঞা দাও।

৩। মোট উৎপাদন রেখা কাকে বলে?

৪। বাঁক বদলের বিন্দু কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য কী?

৫। মোট উৎপাদন রেখা কখন উত্তল ও কখন অবতল হয়?

৬। "মোট উৎপাদন রেখা প্রলম্বিত S অক্ষরের মত হয়"—কথাটি বোঝাও।

৭। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রে (ক) মোট উৎপাদন কমে (খ) প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন কমে—কোনটি ঠিক ও কেন ঠিক?

৮। "প্রান্তিক উৎপাদন হল মোট উৎপাদন রেখার ঢাল"—ব্যাখ্যা কর।

৯। মোট উৎপাদন রেখা থেকে কীভাবে গড় উৎপাদন পরিমাপ করবে?

১০। একটি রেখাচিত্রে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদন রেখা এঁকে ওদের সম্পর্ক দেখাও।

৭ ফার্মের আয় বা রেভিনিউ
(Revenue)

৭.১ ফার্মের মোট আয় ও তার পরিবর্তন :

কোন ফার্ম একটি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং সেই দ্রব্যটি বাজারে বিক্রয় করে। এইভাবে ফার্ম যে অর্থ পায় তাকেই ফার্মের আয় বা রেভেনিউ বলা হয়।

আমরা যদি ধরি R = রেভেনিউ বা আয়,

P = দ্রব্যের দাম,

এবং Q = দ্রব্যের পরিমাণ,

তাহলে বলতে পারি R = P.Q.

P বা দাম যদি ১০ টাকা এবং Q বা বিক্রয়ের পরিমাণ যদি ৫০ একক হয়, তাহলে মোট আয় বা R = ১০ টাকা × ৫০ = ৫০০ টাকা হবে। **অর্থাৎ বিক্রয়ের মোট পরিমাণকে প্রতি একক দ্রব্যের দাম দিয়ে গুণ করলে আমরা ফার্মের মোট আয়ের হিসেব পাই।**

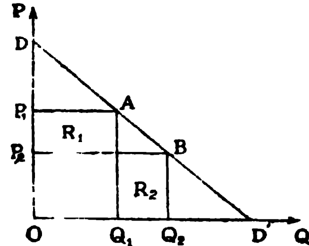
R = P. Q-এর থেকে বোঝা যাচ্ছে R নির্ভর করে (ক) দাম বা P-এর উপর এবং (খ) বিক্রয়ের পরিমাণ বা Q-এর উপর।

অতএব R বাড়বে যদি (১) P বাড়ে কিন্তু Q স্থির থাকে কিংবা, (২) Q বাড়ে কিন্তু P স্থির থাকে, কিংবা, (৩) P এবং Q উভয়েই বাড়ে। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য ধরে নেব যে দ্রব্যের দাম স্থির আছে। তাহলে রেভেনিউ বা R কেবলমাত্র বিক্রয়ের পরিমাণ বা Q-এর উপর নির্ভর করবে। Q বাড়লে R বাড়বে, Q কমলে R কমবে। আমরা লিখতে পারি R = f(Q)

ফার্ম যে দ্রব্য উৎপাদন করে তার একটি অংশ মজুত ভান্ডারে রেখে দেয় এবং বাকিটা বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যায়। ফার্মের মজুত ভান্ডারকে inventory বলা হয়। অবশ্য এই মজুত ভান্ডারের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্য ছাড়াও কাঁচামাল কিংবা মধ্যবর্তী দ্রব্য থাকতে পারে। আমরা বলতে পারি ফার্মের মোট উৎপাদন = মজুত + যোগান।

যদি ফার্মের কোন মজুত নেই বলে ধরে নিই, তাহলে উৎপাদন ও যোগান সমান হয়। উৎপাদন বাড়লে বা কমলে যোগান বা বিক্রয়ও বাড়বে বা কমবে। এখানে R = P. Q এবং P স্থির আছে বলে ধরা হচ্ছে: কাজেই Q যে হারে পরিবর্তিত হবে R সেই হারে পরিবর্তিত হবে। এখানে মোট আয় রেখাটি হবে একটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা।

যদি দাম স্থির না থাকে, তাহলে মোট আয় হবে $R = PQ$ এবং স্পষ্টত R নির্ভর করবে P ও Q উভয়ের উপর। এখানে মোট আয় রেখার আকৃতি নিরূপণ করার জন্য দাম (P) ও বিক্রয় (Q) উভয়ের পরিবর্তন জানতে হবে। এই পরিবর্তনটি নির্ভর করবে দ্রব্যের চাহিদা ও তার স্থিতিস্থাপকতার উপর। চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী P কমলে Q বাড়বে, P বাড়লে Q কমবে, কিন্তু $P.Q = R$ বাড়তে পারে, স্থির থাকতে পারে কিংবা কমে যেতে পারে।

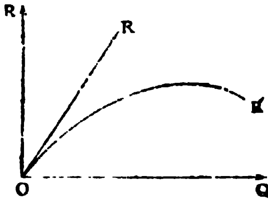


৭.১ রেখাচিত্র : দাম ও মোট আয়ের পরিবর্তন

রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝান যায়। ৭.১ নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল। এখানে DD' হল চাহিদা রেখা। দাম যদি OP_1 হয় তাহলে বিক্রয় হবে OQ_1 এবং মোট আয় হবে $OP_1 \times OQ_1 = OP_1AQ_1 = R_1$. আবার দাম যদি OP_2 এবং বিক্রয় যদি OQ_2 হয়, তাহলে মোট আয় হবে $R_2 = OP_2 \times OQ_2$। এখানে বিক্রয়ের পরিমাণ OQ_1 থেকে বেড়ে OQ_2 হল; মোট আয় R_1 থেকে পরিবর্তিত হয়ে R_2 হল। এখন দাম কমার জন্য এবং বিক্রয় বেড়ে যাওয়ার জন্য মোট আয় R_2 পূর্বের মোট আয় R_1 থেকে বাড়ল, কি কমল তা DD' রেখার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করবে। যদি দাম কমে ও বিক্রয় বাড়ে তাহলে $R_2 > R_1$ হবে, যদি স্থিতিস্থাপকতা $e > 1$ হয়,

$R_2 = R_1$ হবে যদি $e = 1$ হয়,

এবং $R_2 < R_1$ হবে যদি $e < 1$ হয়।



৭.২ রেখাচিত্র : স্থির ও ক্রমহ্রাসমান দামে মোট আয়রেখা

এত সব জটিলতা বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি ফার্মের মোট আয় বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে এবং বিক্রয় বাড়লে দাম যেহেতু কমবে অতএব মোট আয় বিক্রয়ের পরিমাণের সঙ্গে তাল রেখে সমান হারে বাড়বে না। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায় মোট আয় রেখা উর্ধমুখী সরলরেখা হবে না। যেখানে দাম কমবে সেখানে মোট আয় রেখাটি পরিমাণ-অক্ষের দিকে অবতল হবে। অ দের ৭.২ নং চিত্রে QR হল মোট আয় রেখা যেখানে দাম স্থির থাকে এবং OR' হল মোট আয় রেখা যেখানে দাম কমবে।

অর্থাৎ উপরের OR হল স্থির দামে মোট আয় রেখা। OR' হল ক্রমহ্রাসমান দামে মোট আয় রেখা।

৭.২. গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কাকে বলে ?

(ক) গড় আয় : কোন ফার্ম দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে বিক্রীত দ্রব্যের প্রতি এককের জন্য যে পরিমাণ আয় বা রেভেনিউ পেয়ে থাকে, তাকে গড় আয় বলা হয়। কোন ফার্ম যদি ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে মোট ১৭৫ টাকা পেয়ে থাকে, তাহলে প্রতি একক দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য সেই ফার্ম পায় ১৭৫ টাকা ÷ ১০ = ১৭·৫ টাকা।

ধরা যাক, কোন একজন বিক্রেতা প্রথমে একটি দ্রব্য বিক্রয় করে ১০ টাকা পেল। দ্বিতীয় বারে সেই দ্রব্যটি বিক্রয় করে ৮ টাকা এবং তৃতীয় বারে পেল ৩ টাকা। তাহলে তিনটি বা তিন একক দ্রব্য বিক্রয় করে সেই বিক্রেতা পেল ২১ টাকা। তাহলে প্রতি একক দ্রব্য বিক্রয় করে বিক্রেতা গড়ে ২১ টা· ÷ ৩ = ৭ টাকা পায়। এই ৭ টাকা হল তার গড় আয়।

এখানে লক্ষ্য করা যায় যে গড় আয় একটি আঙ্কিক গড় মাত্র। এটা কোন এককের প্রকৃত দাম নাও হতে পারে। ফার্মের মোট-আয়কে বিক্রয়ের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় আয়ের হিসেব পাওয়া যায়। আমরা বলতে পারি গড় আয়

$$= \frac{\text{মোট আয়}}{\text{বিক্রয়ের পরিমাণ}}$$

গড় আয়কে ইংরেজীতে **Average Revenue** বা **A. R.** বলা হয়। মোট আয়কে **Total Revenue** বা **T. R.** বা **R** বলা যেতে পারে :

যদি R = মোট আয়

Q = বিক্রয়ের পরিমাণ হয়,

তাহলে গড় আয় $(A\,R.) = \frac{R}{Q}$

আবার P = দাম হলে, মোট আয় $= P.\,Q$ হবে ;

অর্থাৎ $R = P.\,Q.$ অতএব গড় আয় $(AR) = \frac{PQ}{Q} = P.$ অর্থাৎ $AR = P.$

বা, গড় আয় = দাম।

অতএব, দ্রব্যের দাম ও বিক্রেতার গড় আয় একই ব্যাপার। দামকে ক্রেতার দিক থেকে দেখা হয় ; গড় আয়কে দেখা হয় বিক্রেতার দিক থেকে :

(খ) প্রান্তিক আয় : অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে ফার্ম যে আয় পেয়ে থাকে তাকে প্রান্তিক আয় বলা হয়। যেমন, কোন ফার্ম ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে যদি ১০০ টাকা পায় এবং ১৫ একক দ্রব্য উৎপাদন করে ১৪০ টাকা পায়, তাহলে বোঝা যাচ্ছে ফার্মটি অতিরিক্ত ৫ একক উৎপাদন করে ৪০ টাকা আয় বেশি পায়। তাহলে অতিরিক্ত ১ একক উৎপাদন ও বিক্রয় করে ফার্মটি পায় $\frac{\text{৪০ টাকা}}{\text{৫}}$ = ৮ টাকা। এখানে ফার্মের প্রান্তিক আয় হল ৮ টাকা। ফার্মটি যদি অতিরিক্ত ΔQ একক দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে অতিরিক্ত ΔR পরিমাণ আয় পেয়ে থাকে, তাহলে তার প্রান্তিক আয় হবে $\frac{\Delta R}{\Delta Q}$. অতএব ফার্মের প্রান্তিক আয় = $\frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিবর্তন}}$। আমরা যদি ধরে নিই যে, অতিরিক্ত বিক্রয়ের পরিমাণ ΔQ খুবই ছোট, তাহলে $\frac{\Delta R}{\Delta Q}$ ভগ্নাংশটি একটি নির্দিষ্ট সীমান্তিক পরিমাণে পরিণত হবে এবং তাকে $\frac{dR}{dQ}$ হিসাবে লেখা হবে। সঠিকভাবে প্রান্তিক আয় হবে $\frac{dR}{dQ}$. অর্থাৎ উৎপাদন বা বিক্রয়ের ক্ষুদ্রতম পরিবর্তন বা বৃদ্ধির জন্য মোট আয়ের

পরিবর্তন হল প্রান্তিক আয়। একেই মোট আয়ের পরিবর্তনের হার বলা হয়। **অতএব প্রান্তিক আয় হল ফার্মের মোট আয়ের পরিবর্তনের হার।**

অন্যভাবে আরো সহজ করে প্রান্তিক আয়ের সংজ্ঞা দেওয়া যায়। ধরি কোন ফার্ম ৯ একক দ্রব্য বিক্রয় করে মোট আয় পেয়ে থাকে ১০০ টাকা এবং ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করে পেয়ে থাকে ১১০ টাকা। অতএব দশম একক দ্রব্যের বিক্রয় থেকে তার প্রান্তিক আয় হল ১১০ টাকা—১০০ টাকা = ১০ একক বিক্রয়ের মোট আয় — ৯ একক বিক্রয়ের মোট আয়। তাহলে আমরা পাই n-তম এককের প্রান্তিক আয় = n একক দ্রব্য বিক্রয়ের মোট আয়—(n—1) একক দ্রব্য বিক্রয়ের মোট আয়। অর্থাৎ n-তম এককের প্রান্তিক আয় = $R_n - R_{n-1}$। এখানে R_n = n একক দ্রব্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত মোট আয় এবং R_{n-1} = n — 1 একক দ্রব্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত মোট আয়।

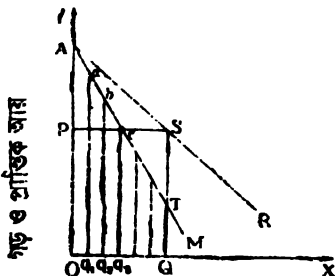
(গ) গড় ও প্রান্তিক আয় থেকে কীভাবে মোট আয় জানা যায় ?

মোট আয় থেকে যেমন গড় ও প্রান্তিক আয় জানা যায়, সেইরূপ গড় ও প্রান্তিক আয় থেকেও মোট আয় জানা যায়। নিয়মের আকারে বলা যায়—

(ক) গড় আয়কে বিক্রয়ের পরিমাণ দিয়ে গুণ করলে মোট আয় পাওয়া যায়, এবং

(খ) প্রতি একক দ্রব্যের বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক আয়কে যোগ করে মোট আয় পাওয়া যায়।

উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। ধরি, কোন ফার্ম ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করল এবং গড় আয় পেল ১৫ টা.। তাহলে ফার্মের মোট আয় হবে ১০ × ১৫ টা. = ১৫০ টা.। আবার ধরা যাক কোন ফার্ম প্রথম একক দ্রব্য বিক্রয় করে ১০ টাকা, দ্বিতীয় একক থেকে ৮ টাকা, তৃতীয় একক থেকে ৬ টাকা প্রান্তিক আয় পেল। এখানে মোট আয় হবে ১০ টা. + ৮ টা. + ৬ টা. = ২৪ টাকা। তাহলে আমরা পাই—**গড় আয়কে গুণ করলে এবং প্রান্তিক আয়কে যোগ করলে মোট আয় পাওয়া যায়।** রেখাচিত্রের সাহায্যেও এই ব্যাপারটি বোঝান যায়।



৭.৩ রেখাচিত্র : গড় ও প্রান্তিক আয়রেখা থেকে মোট আয়ের পরিমাপ

৭.৩ নং রেখাচিত্রে AR হল গড় আয় রেখা এবং AM হল প্রান্তিক আয় রেখা। ধরি উৎপাদন = OQ, তাহলে গড় আয় = QS। S বিন্দু থেকে OY-অক্ষের উপর SP লম্ব আঁকা হল। OPSQ একটি আয়তক্ষেত্র। এর বিপরীত বাহু সমান।

অতএব SQ = OP, অর্থাৎ গড় আয় = OP

ফার্মটি OQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে প্রতি একক উৎপাদনের জন্য গড়ে OP পরিমাণ আয় পেয়ে থাকে। তাহলে ফার্মের মোট আয় = OP × OQ = OPSQ। এটা হল গড় আয় রেখা ধরে ফার্মের মোট আয়ের পরিমাপ। এখন প্রান্তিক আয় রেখা ধরে মোট আয় পরিমাপ করা যেতে পারে।

ধরি Oq_1 হল প্রথম একক দ্রব্য। তারজন্য ফার্মের প্রান্তিক আয় হল $OAaq_1$

নামক সরু ট্রাপিজিয়ামটি। দ্বিতীয় একক বিক্রয় করে প্রান্তিক আয় হয় q_1abq_2 ট্রাপিজিয়ামটি, তৃতীয় একক থেকে প্রান্তিক আয় হল q_2bcq_3 ট্রাপিজিয়ামটি। অতএব প্রথম তিন একক দ্রব্য বিক্রয় করে ফার্মের মোট আয় হয় $OAcq_3$ নামক ট্রাপিজিয়ামটি। এইভাবে বলা যায় ফার্মটি যদি OQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে তাহলে তার মোট আয় হবে OATQ নামক ক্ষেত্রটি। বলা বাহুল্য এটিও একটি ট্রাপিজিয়াম। এখানে ফার্মের মোট আয় হবে OPSQ = OATQ.

৭.৩. ফার্মের গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক :

কোন ফার্ম দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে বিক্রীত দ্রব্যের প্রতি এককের জন্য গড়ে যে অর্থ পেয়ে থাকে তাকে বলা হয় গড় আয় এবং ফার্ম অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বিক্রয় করে যে অর্থ পায় তাকে বলা হয় প্রান্তিক আয়। এই গড় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। আমরা কয়েকটি সূত্রে এই সম্পর্কটিকে প্রকাশ করতে পারি এবং প্রত্যেকটি সূত্রকে বোঝানোর জন্য একটি করে উদাহরণ নিতে পারি। প্রত্যেকটি উদাহরণ কাল্পনিক। উদাহরণ দিয়ে কোন বিষয় বোঝানো যায়, কিন্তু প্রমাণ করা যায় না। গড় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্কের সূত্রগুলি প্রমাণ করতে হলে অঙ্কের প্রয়োজন। আমরা অঙ্ক এড়িয়ে কেবলমাত্র উদাহরণের সাহায্যে সম্পর্ক সূত্রগুলির আলোচনা করব।

প্রথমত, গড় আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রান্তিক আয়ও বৃদ্ধি পায় এবং অধিক হারে বৃদ্ধি পায়।

এখানে দুটো কথা বলা হচ্ছে। গড় আয় বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক আয় বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, গড় আয় যে হারে বাড়ে প্রান্তিক আয় তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়—**গড় আয় রেখা যদি ঊর্ধ্বমুখী হয় তাহলে প্রান্তিক আয় রেখাও ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার** উপরে থাকে। নীচের তালিকায় দেখা যাচ্ছে উৎপাদন ও গড় আয় ১, ২, ৩, ৪, ৫ এইভাবে যদি বাড়ে তাহলে প্রান্তিক আয় ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ইত্যাদি ভাবে বাড়ে।

উদাহরণ ১ :

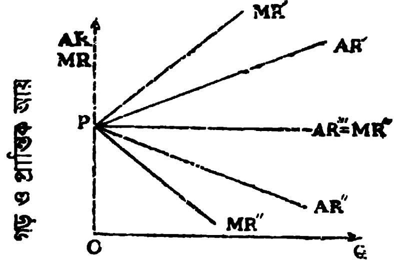
১ নং তালিকা : গড় ও প্রান্তিক আয়

উৎপাদন (Q)	গড় আয় (AR)	মোট আয় (TR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১	১	১
২	২	৪	৩
৩	৩	৯	৫
৪	৪	১৬	৭
৫	৫	২৫	৯

দ্বিতীয় একক উৎপাদন থেকে প্রান্তিক আয় গড় আয়ের চেয়ে বেশি হয়ে যায় এবং এইজন্যই প্রান্তিক আয় রেখা MR গড় আয় AR-এর উপরে থাকে।

৭·৪ নং রেখাচিত্রে গড় আয় রেখা যখন ঊর্ধ্বমুখী হয়ে AR′ রেখা হয়েছে, তখন প্রান্তিক আয় রেখাও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, এবং MR′ রেখা AR′ রেখার উপরে আছে।

দ্বিতীয়ত, গড় আয় যখন হ্রাস পায় তখন প্রান্তিক আয় অধিক হারে হ্রাস পায়। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়—গড় আয় রেখা যখন নিম্নমুখী হয় তখন প্রান্তিক আয় রেখাও নিম্নমুখী হয় এবং প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার নীচে থাকে।



৭.৪ রেখাচিত্র : গড় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক

উদাহরণ ২ :

২নং তালিকা : গড় ও প্রান্তিক আয়

উৎপাদন (O)	গড় আয় (AR)	মোট আয় (TR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	৫	৫	৫
২	৪	৮	৩
৩	৩	৯	১
৪	২	৮	—১
৫	১	৫	—৩

২নং তালিকায় দেখা যাচ্ছে গড় আয় যখন ৫, প্রান্তিক আয় তখন ৫। এরপর গড় আয় যখন কমছে প্রান্তিক আয় তখন কমছে এবং তার চেয়ে বেশি কমছে। গড় আয় যখন ২, তখন প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক হয়ে গেছে।

৭·৪ নং রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে—গড় আয় রেখা AR″ যখন নিম্নমুখী হয়েছে তখন প্রান্তিক আয় রেখা MR″ AR″ রেখার নীচে আছে।

তৃতীয়ত, গড় আয় যখন স্থির থাকে তখন প্রান্তিক আয় স্থির থাকে; শুধু তাই নয়, তখন গড় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয়ে যায়। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়, গড় আয় রেখা উৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হলে প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার সঙ্গে মিলে যায়। তখন একটিমাত্র সমান্তরাল সরলরেখাই গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার কাজ করে। ৭·৪নং রেখাচিত্রে AR‴ রেখা OQ-অক্ষের সমান্তরাল। এখানে MR‴ রেখাও AR‴ রেখার সঙ্গে মিশে গেছে।

উদাহরণ ৩ ঃ

৩নং তালিকা ঃ গড় ও প্রান্তিক আয়

উৎপাদন (Q)	গড় আয় (AR)	মোট আয় (TR)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১০	১০	১০
২	১০	২০	১০
৩	১০	৩০	১০
৪	১০	৪০	১০
৫	১০	৫০	১০

চতুর্থত, এবার আমরা গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার মধ্যে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জ্যামিতিক সম্পর্কের কথা বলব। জ্যামিতিকভাবে গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা সরলরেখা কিংবা বক্ররেখা হতে পারে। গড় আয়রেখা বক্ররেখা হলে (ক) উত্তল বা (খ) অবতল হতে পারে। এখানে কেবলমাত্র সরলরেখার কথা বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে নিয়মটি হল—

গড় আয় রেখা যদি সরলরৈখিক ও নিম্নমুখী হয় তাহলে প্রান্তিক আয় রেখাও সরলরৈখিক ও নিম্নমুখী হয়। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখা ও OY-অক্ষের সমদূরবর্তী হয়। পাশের রেখাচিত্রে AR হল একটি নিম্নমুখী ও সরলরৈখিক গড় আয় রেখা। এর উপর S একটি বিন্দু। S বিন্দু থেকে OY-অক্ষের উপর SP লম্ব অঙ্কন করা হল। এখানে AM হল প্রান্তিক আয় রেখা। AM রেখাটি SP লম্বকে K বিন্দুতে ছেদ করেছে। আমরা প্রমাণ করতে পারব যে, SK = KP। অর্থাৎ AM রেখা AR রেখা ও OY-অক্ষের সমদূরবর্তী হয়।

৭.৫ রেখাচিত্র ঃ গড় ও প্রান্তিক আয়রেখার সম্পর্ক

প্রমাণের জন্য S বিন্দু থেকে OX-অক্ষের উপর SQ লম্ব আঁকা হল। AM রেখা SQ লম্বকে T বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখানে $\triangle$APK ও $\triangle$KST নামক দুটি ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে। আমরা যদি প্রমাণ করতে পারি যে, এই ত্রিভুজ দুটি সর্বসম, তাহলে SK = KP প্রমাণ করা যাবে।

এখানে উৎপাদন = OQ. গড় আয় = QS. অতএব মোট আয় = OQ × SQ

=OPSQ. এটা হল গড় আয় রেখা ধরে মোট আয়ের পরিমাপ। আমরা প্রান্তিক আয় রেখা ধরেও মোট আয় পরিমাপ করতে পারি। প্রান্তিক আয় রেখা ধরে পরিমাপ করলে মোট আয় হবে OATQ নামক ট্রাপিজিয়ামটি। উভয়ক্ষেত্রে মোট আয় সমান। অর্থাৎ OATQ = OPSQ. এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, OATQ এবং OPSQ এই দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে OPKTQ নামক ক্ষেত্রটি রয়েছে। অর্থাৎ OATQ = APK + OPKTQ এবং OPSQ = KST + OPKTQ.

এখন উভয় পক্ষ থেকে OPKTQ অংশটি বাদ দিলে আমরা পাই △APK = △KST. অর্থাৎ APK ও KST ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান। আবার ঐ ত্রিভুজ দুটির

∠APK = ∠KST (সমকোণ)

∠AKP = ∠SKT (বিপরীত কোণ)

∠PAK = ∠KTS (একান্তর কোণ)

অতএব △APK ≡ △KST

অতএব PK = KS

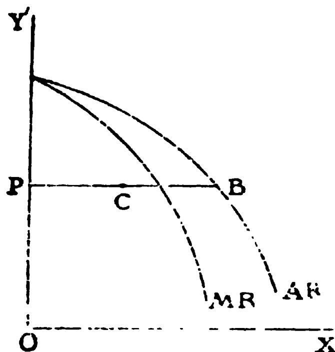
তাহলে প্রমাণিত হল যে, গড় আয় রেখা যখন নিম্নমুখী সরলরেখা হয় তখন প্রান্তিক আয় রেখা ও গড় আয় রেখা OY-অক্ষের সমদূরবর্তী হয়।

ফার্মের গড় আয়রেখা নিম্নমুখী সরলরেখা হলে প্রান্তিক আয় রেখাও নিম্নমুখী সরলরেখা হয় এবং প্রান্তিক আয়রেখা ফার্মের গড় আয় রেখা ও উল্লম্ব অক্ষের সমদূরবর্তী হয়। কিন্তু ফার্মের গড় আয়রেখা যে সর্বদাই নিম্নমুখী সরলরেখা হবে এমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। প্রকৃতপক্ষে ফার্মের গড় আয়রেখা নিম্নমুখী বক্ররেখাও হতে পারে।

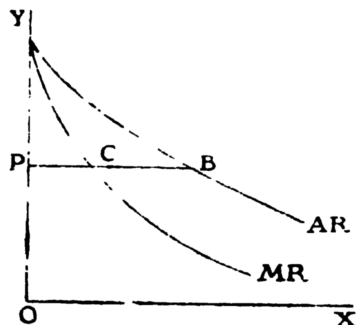
ফার্মের গড় আয়রেখা বা AR রেখা নিম্নমুখী বক্ররেখা হলে রেখাটি রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে অবতল হতে পারে কিংবা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হতে পারে। AR রেখা অবতল বা উত্তল হলে ফার্মের প্রান্তিক আয়রেখা বা MR রেখাও বক্রতা প্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায়। প্রথমত, AR রেখা নিম্নমুখী বক্ররেখা এবং রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে অবতল হলে MR রেখা ও মূলবিন্দুর দিকে অবতল হয় এবং MR রেখা AR রেখার সন্নিকটবর্তী হয়। মূল বিন্দুর দিকে অবতল AR-রেখার উপর অবস্থিত কোন বিন্দু থেকে উল্লম্ব অক্ষের উপর কোন লম্ব অঙ্কন করা হলে সেই লম্বের যে মধ্যবিন্দু হয়, MR রেখা সেই মধ্যবিন্দু থেকে AR রেখার দিকে সরে থাকে।

দ্বিতীয়ত, AR রেখা রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হলে MR রেখাও মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয় এবং MR রেখা উল্লম্ব অক্ষের সন্নিকটবর্তী হয়।

প্রদত্ত ৭·৬ রেখাচিত্রে AR রেখা মূলবিন্দুর দিকে অবতল। এবং ৭·৭ রেখাচিত্রে AR রেখা মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়েছে। AR রেখার উপর B নামক একটি বিন্দু



৭·৬ রেখাচিত্র : মূলবিন্দুর দিকে অবতল AR রেখা ও অবতল MR রেখা



৭·৭ রেখাচিত্র : মূলবিন্দুর দিকে উত্তল AR রেখা ও MR রেখা

নেওয়া হল। B বিন্দু থেকে OY অক্ষের উপর BP নামক একটি লম্ব অঙ্কন করলে সেই লম্বের মধ্যবিন্দু হবে C বিন্দু। প্রথম রেখাচিত্রে দেখা যায় যে MR রেখা C বিন্দুর ডান দিয়ে থাকে। দ্বিতীয় রেখাচিত্রে দেখা যায় যে MR রেখা C বিন্দুর বামদিকে থাকে।

৭.৯. ফার্মের গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক

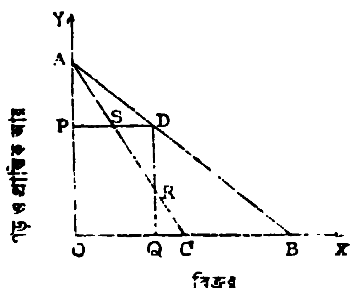
কোন ফার্ম যে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে তার চাহিদা তিন রকম হতে পারে যথা—(১) স্থিতিস্থাপক, (২) অস্থিতিস্থাপক ও (৩) একক স্থিতিস্থাপক। যদি স্থিতিস্থাপকতাকে e দ্বারা বোঝান যায় তাহলে আমরা বলতে পারি (১) $e > 1$, (২) $e < 1$ কিংবা (৩) $e = 1$ হতে পারে।

যদি $e > 1$ হয়, তাহলে দ্রব্যের দাম কমলে বিক্রয় বাড়বে এবং সেই সঙ্গে ফার্মের মোট আয়ও বাড়বে। দাম কমলে গড় আয় কমবে এবং গড় আয় কমলে প্রান্তিক আয় বেশি পরিমাণে কমবে। কিন্তু এখানে গড় ও প্রান্তিক আয়ের সঙ্গে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক কী হবে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে, মোট আয় যেহেতু বৃদ্ধি পাচ্ছে অতএব প্রান্তিক আয় ধনাত্মক হবে।

যদি $e < 1$ হয়, তাহলে দাম কমলে বিক্রয় বাড়বে, কিন্তু মোট আয় কমবে; ফলে প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক হবে। আবার দাম যেহেতু কমছে, অতএব গড় আয় কমবে।

আবার, যদি $e = 1$ হয়, তাহলে দাম কমলে বিক্রয় বাড়বে, কিন্তু মোট আয় অপরিবর্তিত থাকবে; কাজেই প্রান্তিক আয় শূন্য হবে। কিন্তু দাম কমার জন্য গড়

আয় কমবে। তাহলে আমরা পাই—দ্রব্যের দাম কমলে ফার্মের গড় আয় কমবে। গড় আয় কমলে প্রান্তিক আয়ও কমবে, কিন্তু প্রান্তিক আয় ধনাত্মক থাকবে, শূন্য হয়ে যাবে, কি ঋণাত্মক হবে তা নির্ভর করছে ফার্মের বিক্রীত দ্রব্যের চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার উপর। এখন বোঝা যাচ্ছে যে, ফার্মের গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। জ্যামিতিকভাবে এই সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করা যায়। ৭.৮ নং রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি ব্যাখ্যা করা হল।



৭.৮ রেখাচিত্র : গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক

আমাদের রেখাচিত্রে AB হল ফার্মের গড় আয় রেখা; AC হল প্রান্তিক আয় রেখা। এখানে AB রেখাটিকে সরল রেখা ধরা হয়েছে। কাজেই AC রেখাটিও সরল রেখা হবে এবং এটি গড় আয় রেখা ও OY-অক্ষের সমদূরবর্তী হবে।

আমরা জানি ফার্মের গড় আয় রেখা ও ক্রেতাদের চাহিদারেখা একই ব্যাপার। তাহলে ফার্মের গড় আয় রেখা AB হল ক্রেতাদের চাহিদা রেখা। D হল AB রেখার উপর একটি বিন্দু। D বিন্দু থেকে OY-অক্ষের উপর DP লম্ব এবং OX-অক্ষের উপর DQ লম্ব আঁকা হল। এখানে প্রান্তিক আয় AC রেখা DP-কে S বিন্দুতে এবং DQ-কে R বিন্দুতে ছেদ করেছে।

ধরি e = স্থিতিস্থাপকতা, D = চাহিদা, P = দাম, ΔD = চাহিদার পরিবর্তন, ΔP = দামের পরিবর্তন, AR = গড় আয়, MR = প্রান্তিক আয়।

আমরা জানি e = $\dfrac{\text{চাহিদার আনুপাতিক পরিবর্তন}}{\text{দামের আনুপাতিক পরিবর্তন}}$

$$\text{অর্থাৎ } e = \frac{\Delta D}{D} \div \frac{\Delta P}{P} = \frac{\Delta D}{D} \times \frac{P}{\Delta P} = \frac{P}{D} \cdot \frac{\Delta D}{\Delta P}.$$

আমাদের রেখাচিত্রে D বিন্দুতে দাম = P = OP = QD

চাহিদা = D = OQ. এবং AB রেখাটি সরল রেখা বলে

$$\frac{\Delta D}{\Delta P} = \frac{QB}{QD} = DB \text{ রেখার ঢাল} = AB \text{ রেখার ঢাল*}$$

$$\text{অতএব D বিন্দুতে } e = \frac{P}{D} \cdot \frac{\Delta D}{\Delta P} = \frac{QD}{OQ} \times \frac{QB}{QD} = \frac{QB}{OQ} = \frac{QB}{PD} \quad (\because OQ = PD)$$

কিন্তু APD ও DQB ত্রিভুজ দুটি সদৃশ ত্রিভুজ।

---

* জ্যামিতিকভাবে AB রেখার ঢাল হবে $\frac{OA}{OB}$, কিংবা $\frac{QD}{QB}$ কিন্তু OX-অক্ষে চাহিদা এবং OY-অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয় বলে চাহিদারেখার ঢাল হবে $\frac{QB}{QD}$

অতএব $\frac{QB}{PD} = \frac{DQ}{AP}$. অর্থাৎ গড় আয় রেখা (AB)র উপর D বিন্দুতে

$$e = \frac{DQ}{AP}.$$

আবার, গড় আয় রেখা AB সরল রৈখিক ও নিম্নমুখী হওয়ার এবং AC প্রান্তিক আয় রেখা হওয়ায়

$$PS = SD \text{ হবে।}$$

এখন $\triangle APS$ ও $\triangle SDR$ এই দুটি ত্রিভুজের $PS = SD$.

$$\angle APS = \angle SDR \text{ (সমকোণ)}$$

$$\angle ASP = \angle DSR \text{ (বিপরীত কোণ)}$$

অতএব $\triangle APS \equiv \triangle SDR$.

অতএব $AP = DR$.

এখন D বিন্দুতে $e = \frac{DQ}{AP} = \frac{DQ}{DR}$ $(\because \quad AP = DR)$

অর্থাৎ $e = \frac{DQ}{DQ - RQ}$. $(\because \quad DR = DQ - RQ)$

এখানে DQ = গড় আয় = AR.

এবং RQ = প্রান্তিক আয় = MR

অতএব আমরা পাই $e = \frac{AR}{AR - MR}$

অতএব $AR = e(AR - MR)$

$\therefore \quad AR = eAR - eMR.$

$\therefore \quad eMR = eAR - AR$

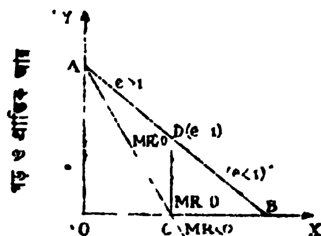
$\therefore \quad eMR = AR\ (e - I)$

$\therefore \quad MR = AR\left(\frac{e - I}{e}\right) = AR\left(I - \frac{I}{e}\right)$

এটিই হল গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি থেকে পাই, যদি (ক) $e = I$ হয়, তাহলে $MR = O$ হবে,

(খ) $e > 1$ হয়, তাহলে $MR > O$ হবে, এবং (গ) $e < 1$ হয়, তাহলে $MR < O$ হবে।

৭.৯নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল। ৭.৯নং রেখাচিত্রে AB হল গড় আয় রেখা, AC হল প্রান্তিক আয় রেখা। D হল AB রেখার মধ্যবিন্দু। এখানে e = 1. এর নীচে C বিন্দুতে প্রান্তিক আয় রেখা OX-অক্ষকে ছেদ করেছে। অর্থাৎ প্রান্তিক আয় শূন্য। D বিন্দুর বাম দিকে e > 1, কাজেই প্রান্তিক আয় ধনাত্মক। D বিন্দুর ডান দিকে e < 1 কাজেই প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক।



৭.৯ রেখাচিত্র : ফার্মের গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক

গড় আয় প্রান্তিক আয় এবং চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্কটিকে আমরা অঙ্কের সাহায্যে অত্যন্ত সহজভাবে প্রমাণ করতে পারি।

ধরা যাক P = দাম, $\triangle P = P$-এর পরিবর্তন,

Q = চাহিদা, $\triangle Q = Q$-এর পরিবর্তন,

e = চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা,

AR = গড় আয় এবং MR = প্রান্তিক আয়,

R = মোট আয় এবং $\triangle R = R$-এর পরিবর্তন।

তাহলে আমরা পাই, $e = -\frac{P}{Q} \cdot \frac{\triangle Q}{\triangle P}$.

অতএব $\frac{1}{e} = -\frac{Q}{P} \cdot \frac{\triangle P}{\triangle Q}$.

আবার, $R = P.Q.$ (মোট আয় হল দাম ও পরিমাণের গুণ ফল)

অতএব, $\triangle R = P\triangle Q + Q.\triangle P$

$\therefore \quad \frac{\triangle R}{\triangle Q} = P + Q.\frac{\triangle P}{\triangle Q}$ (উভয় পক্ষকে $\triangle Q$ দ্বারা ভাগ করে)

(আমরা জানি $AR = \frac{R}{Q} = \frac{P.Q}{Q} = P$ এবং $MR = \frac{\triangle R}{\triangle Q}$.)

অতএব, $MR = P + Q \cdot \frac{\triangle P}{\triangle Q}$.

$MR = P + \frac{Q}{P} \cdot \frac{\triangle P}{\triangle Q} \cdot P$ (ডান দিকের দ্বিতীয় পদকে P দ্বারা গুণ ও ভাগ করে)

$MR = P\left(1 + \frac{Q}{P} \cdot \frac{\triangle P}{\triangle Q}\right)$

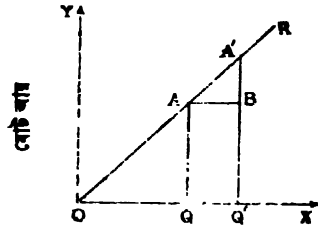
$\therefore \quad MR = AR\left[1 - \left(-\frac{Q}{P} \cdot \frac{\triangle P}{\triangle Q}\right)\right]$

$\therefore \quad MR = AR\left(1 - \frac{1}{e}\right)$. প্রমাণিত হল।

৭.৫. ফার্মের মোট আয় রেখা থেকে কীভাবে প্রান্তিক আয় ও গড় আয় নিরূপণ করা যায়।

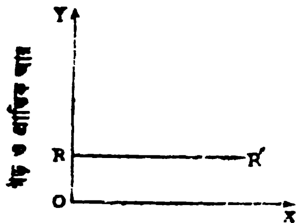
(ক). ফার্মের মোট আয়রেখা যদি উর্ধ্বমুখী সরলরেখা হয়, তাহলে উৎপাদন বা বিক্রি যে হারে বাড়ে মোট আয়ও সেই হারে বাড়ে। কাজেই গড় আয় ও প্রান্তিক আয় স্থির থাকে। এখানে গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা উৎপাদন অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়।

৭.১০নং রেখাচিত্রে OR হল মোট আয় রেখা। এর উপর A একটি বিন্দু। A বিন্দুতে উৎপাদন $= OQ$ এবং মোট আয় $= AQ$. অতএব গড় আয় $= \frac{AQ}{OQ} = OR$ রেখার ঢাল। আবার, OR রেখার উপর যদি আর একটি বিন্দু A' নিই, তাহলে উৎপাদন হয় OQ' এবং মোট আয় হয় A'Q'. কাজেই A' বিন্দুতে গড় আয় হয় $\frac{A'Q'}{OQ'} = OR$ রেখার ঢাল। এইভাবে দেখা যায়—মোট আয় রেখা যেখানে ঊর্দ্ধমুখী সরল রেখা হয় সেখানে গড় আয় সকল সময় সমান থাকে। কাজেই গড় আয়রেখাটি উৎপাদন পরিমাপক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়। ৭.১০ নং রেখাচিত্রে RR' রেখাটি হল এরূপ একটি গড় আয় রেখা।



৭.১০ রেখাচিত্র : মোট আয় রেখা থেকে গড় ও প্রান্তিক আয় নিরূপণ

আবার ৭.১০ নং চিত্র থেকে দেখা যায়, A বিন্দু থেকে A' বিন্দুতে গেলে উৎপাদনের পরিবর্তন বা বৃদ্ধি (ΔQ) হয়। $QQ' = AB$ এবং মোট আয়ের পরিবর্তন বা বৃদ্ধি (ΔR) হয় A'B. অতএব প্রান্তিক আয় $\left(\frac{\Delta R}{\Delta Q}\right) = \frac{A'B}{AB} = AA'$ রেখার ঢাল $= OR$ রেখার ঢাল $=$ গড় আয়। অতএব সরলরৈখিক ও ঊর্দ্ধমুখী মোট আয় রেখার ক্ষেত্রে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় উভয়েই সমান ও স্থির থাকে। ৭.১১ নং চিত্রের RR' রেখাটি একই সঙ্গে গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা।



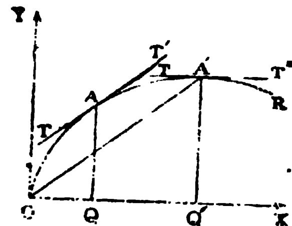
৭.১১ রেখাচিত্র : গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা

(খ) ফার্মের মোট আয় রেখা যদি বক্র রেখা হয় তাহলে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় নিরূপণ করার পদ্ধতি নিম্নরূপ।

৭.১২নং রেখাচিত্রে OR হল মোট আয় রেখা। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, মোট আয় রেখাটি পরিমাণ অক্ষের দিকে অবতল। এখন OR রেখার উপর A ও A' এই দুটি বিন্দু নেওয়া হল।

A বিন্দুতে গড় আয় $= \frac{AQ}{OQ} = OA$ রেখার ঢাল ;

A' বিন্দুতে গড় আয় $= \frac{A'Q'}{OQ'} = OA'$ রেখার ঢাল।



৭.১২ রেখাচিত্র : বক্ররৈখিক মোট আয় রেখা থেকে গড় ও প্রান্তিক আয় নিরূপণ

দেখা যাচ্ছে OA′ রেখার ঢাল OA রেখার ঢালের চেয়ে কম। কাজেই A বিন্দু থেকে A′ বিন্দুতে গড় আয় কম।

অতএব আমরা পাই, **মোট আয় রেখা যদি পরিমাণ অক্ষের দিকে অবতল হয় তাহলে তার উপর বামদিক থেকে ডানদিকে গেলে গড় আয় ক্রমশ কমে যায় এবং গড় আয় রেখা হয় নিম্নমুখী।**

OR রেখার উপর কোন বিন্দুতে প্রান্তিক আয় পরিমাপ করতে হলে OR রেখার উপর সেই বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানতে হয় এবং সেই স্পর্শকের ঢালই হয় প্রান্তিক আয়। অতএব OR রেখার উপর A বিন্দুতে প্রান্তিক আয় হয় TT′ স্পর্শকের ঢাল। সেইরূপভাবে A′ বিন্দুতে প্রান্তিক আয় হল TT″ রেখার ঢাল। আমরা দেখছি TT″ রেখার ঢাল TT′ রেখার ঢালের চেয়ে কম। অতএব **অবতল মোট আয় রেখার বামদিক থেকে ডানদিকে প্রান্তিক আয়ও ক্রমশ কমে আসে।** এর ফলে প্রান্তিক আয় রেখা নিম্নমুখী হয়। মোট আয় রেখা পরিমাণ অক্ষের দিকে অবতল হলে গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা কেমন হতে পারে তা ৭.৫ নং রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে।

৭.৫ নং রেখাচিত্রে AR হল ফার্মের গড় আয় রেখা ও AM হল প্রান্তিক আয় রেখা। AR রেখা ও AM রেখা উভয়েই এখানে নিম্নমুখী হয়েছে এবং AM রেখা AR রেখার নীচে আছে।

প্রশ্নাবলী

১। ফার্মের আয় কাকে বলে? মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

২। ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সংজ্ঞা দাও। মোট আয় রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

৩. গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কাকে বলে? গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৪। গড় আয়, প্রান্তিক আয় ও চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৫। মোট আয় রেখা থেকে কীভাবে গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন করা যায় আলোচনা কর এবং গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার আকৃতি কিরূপ হয় বোঝাও।

৬। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(১) মোট আয় কী? মোট আয় কীভাবে পরিবর্তিত হয়?

(২) গড় আয় কী? গড় আয় ও দাম পরস্পর সমান হয় কী? হলে কেন হয়?

(৩) প্রান্তিক আয় কী? মোট আয় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক দেখাও।

(৪) মোট আয় রেখা কখন ঊর্ধ্বমুখী সরল রেখা হয়?

(৫) প্রান্তিক আয় রেখা ও মোট আয় রেখার ঢালের মধ্যে কী সম্পর্ক আছে

(৬) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা থেকে প্রান্তিক আয় সম্পর্কে কী জানা যায়?

৮ | ফার্মের ব্যয়

ভূমিকা ঃ ফার্মের অনেক রকম ব্যয় হয়—যেমন (১) উৎপাদন ব্যয়, (২) পরিবহণ ব্যয়, (৩) সংরক্ষণ ব্যয়, (৪) বিজ্ঞাপন বা বিক্রয় ব্যয় এবং (৫) অন্যান্য ব্যয় যথা,—সরকারকে দেয় ফি, ফাইন্, ট্যাক্স ইত্যাদি। ফার্ম যে দ্রব্য উৎপাদন করে তার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় বলা হয়। দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য ফার্মকে কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ, শ্রমিক, লোকজন প্রভৃতি পরিবহণের জন্য পরিবহণের ব্যবস্থা করতে হয়। আবার উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্যও পরিবহণ লাগে। এই পরিবহণের জন্য ফার্মের যে ব্যয় হয় তাকে পরিবহণ ব্যয় বলা হয়। কাঁচামাল, মধ্যবর্তী দ্রব্য, শেষ দ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংরক্ষণ করার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে সংরক্ষণ ব্যয় বলা হয়। দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য, ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য খবরের কাগজে বা অন্য কোন মাধ্যমে দ্রব্যের বিজ্ঞাপন দিতে হয়। এরজন্য ফার্মের ব্যয়কে বিজ্ঞাপন ব্যয় বা বিক্রয় ব্যয় বলা যায়। আবার উৎপাদন শুরু করার জন্য সরকারের অনুমতি নিতে হয়। তার জন্য নির্দিষ্ট ফি দিতে হতে পারে। উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নানা রকম কর বা শুল্ক থাকতে পারে। ফার্মের মোট ব্যয়ের মধ্যে এই সব ব্যয়ের হিসেব ধরা হয়। তাহলে ফার্মের ব্যয়কে আমরা দুটো বড় ভাগে ফেলতে পারি (ক) উৎপাদনের ব্যয় ও (খ) অন্যান্য ব্যয়। আমরা এখানে কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয়ের আলোচনাই করব।

৮.১. উৎপান ব্যয় ঃ

(ক) আর্থিক ব্যয় ঃ উৎপাদন ব্যয়কে আর্থিক ও বাস্তব - এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। অর্থের হিসেবে প্রকাশিত ব্যয়কে আর্থিক ব্যয় বলা হয়। অপর-পক্ষে, দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশিত ব্যয়কে বাস্তব ব্যয় বলা হয়। কোন ফার্ম দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য যে সব উপকরণ ও উপাদান ব্যবহার করে তাদের দামকে যোগ করে মোট আর্থিক ব্যয়ের হিসেব পাওয়া যায়। দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য ফার্ম ব্যবহার করে —

১। কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য,
২। শ্রম নামক সেবা,
৩। যন্ত্র, বাড়ি, আসবাবপত্র প্রভৃতি বাস্তব মূলধনের সেবা এবং
৪। জমি নামক প্রাকৃতিক উপাদানের সেবা।

এর সঙ্গে উদ্যোক্তার নিজের পরিকল্পনা রচনা, বাজার সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান, উপাদান সংগ্রহ, ঝুঁকি গ্রহণ প্রভৃতি সেবাকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এখানে যে সব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার কথা বলা হল তাদের সবগুলিই অর্থনৈতিক ও অপ্রচুর

দ্রব্য বা সেবা, কোনটিই সীমাহীন ও মূল্যহীন নয়। কাজেই এইসব দ্রব্যসামগ্রী ও উপাদানসমূহের সেবার জন্য ফার্মকে অর্থ ব্যয় করতে হয়। যেমন—

১। কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর জন্য দাম দিতে হয়,

২। শ্রম, মূলধন ও জমি নামক উপাদানগুলির সেবাগ্রহণের জন্য যথাক্রমে মজুরী, সুদ ও খাজনা দিতে হয় এবং

৩। উদ্যোক্তা নিজের পরিশ্রমের জন্য, উৎপাদনের ঝুঁকি বহনের জন্য একটা নিম্নতম মুনাফা অবশ্যই আশা করেন। এই মুনাফা না পেলে তাঁর পক্ষে উৎপাদনের ঝুঁকি নেওয়ার কোন আগ্রহ থাকবে না, বরং তিনি বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে অন্য কোথাও চাকুরি করবেন। উদ্যোক্তা উৎপাদনের ঝুঁকি বহনের জন্য যে নিম্নতম মুনাফা নিজের কাছ থেকে আশা করেন তাকে স্বাভাবিক মুনাফা বলা হয়। এই স্বাভাবিক মুনাফাও ফার্মের মোট আর্থিক ব্যয়ের একটি অংশ। অতএব **কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ফার্মের মোট আর্থিক ব্যয় হল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচামাল ও উপকরণের দাম, শ্রমের বেতন, মজুরী, ভাতা ইত্যাদি পাওনা, মূলধনের জন্য সুদ, মূলধন দ্রব্যের অবচয়, জমির খাজনা, বাড়ির ভাড়া ইত্যাদি এবং উদ্যোক্তার স্বাভাবিক মুনাফা।**

ফার্ম যদি এই সব উপকরণ ও উপাদান অপর কোন ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে ক্রয় করে নেয় তাহলে তার ব্যয়ের হিসেব করার কোন অসুবিধে হয় না। কিন্তু ফার্মের নিজস্ব কোন উপাদান বা উপকরণ যদি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় তাহলে মোট ব্যয়ের হিসেব করার সময় অসুবিধে দেখা দেয়, কারণ সেক্ষেত্রে ফার্ম যে সব উপাদান বা উপকরণের যোগান দেয় তার জন্য তাকে কোন ব্যয় করতে হয় না। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ব্যয় ধরতে হয়। ফার্ম নিজের উপকরণ ও উপাদান যোগান দিলে তাদের প্রচলিত বাজার দাম ধরে নিয়ে সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসেব করতে হয়। এই ব্যয়কে আরোপিত ব্যয় বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফার্ম যদি জমির মালিক হয় তাহলে সেই জমির আরোপিত খাজনা ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়। ফার্মের নিজস্ব যন্ত্রপাতি যদি ব্যবহৃত হয় তাহলেও তাদের আরোপিত ব্যয় মোট ব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়। এবং এই আরোপিত ব্যয় হিসেব করার সময় সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটি খুব কাজে লাগে।

(খ) সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) ও স্থানান্তর ব্যয় (Transfer Cost) :

কোন ক্ষেত্রে যদি দুটি সুযোগ গ্রহণ করার সুবিধা থাকে, কিন্তু সেই দুটি সুযোগ যদি কখনই এক সঙ্গে গ্রহণ করা না যায়, যদি একটি সুযোগ গ্রহণ করলে অন্য সুযোগটি হারাতে হয়, তাহলে গৃহীত সুযোগটির ব্যয় পরিমাপ করা হয় পরিত্যক্ত সুযোগটির দ্বারা। যেমন, একটি কৃষিক্ষেত্রে যদি ধান চাষ করলে ১০ কুইণ্টাল ধান হয়, কিন্তু পাট চাষ করলে ৫ কুইণ্টাল পাট হয় তাহলে ১০ কুইণ্টাল ধানের উৎপাদন ব্যয় হল ৫ কুইণ্টাল পাট কিংবা, বিপরীতক্রমে, ৫ কুইণ্টাল পাট উৎপাদনের ব্যয় হল ১০ কুইণ্টাল ধান।

সুযোগ ব্যয়কে আমরা বিকল্প ব্যয় বলতে পারি। যে জমিতে ধান ও পাট উৎপাদন করা যায়, সেই জমির বিকল্প ব্যবহার আছে বলা হয়। দুটি বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে কোন একটি ব্যবহারের ব্যয় অন্য ব্যবহারের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

সুযোগ ব্যয় বা বিকল্প ব্যয়কে কখনো কখনো স্থানান্তর ব্যয়ও বলা হয়। যদি জমিতে ধান চাষ না করে পাট চাষ করা হয় তাহলে জমিকে ধান চাষ থেকে সরিয়ে পাট চাষে লাগানো হয়। এটা হল জমিকে ব্যবহারিকভাবে স্থানান্তরিত করা। এর জন্য যে ব্যয় হয় তাকে স্থানান্তর ব্যয় বলা হয়। শ্রমের ক্ষেত্রে স্থানান্তর ব্যয়ের অর্থ খুব স্পষ্ট। কোন শ্রমিক যদি কলকাতায় কাজ করে এবং তার জন্য দৈনিক ১৫ টাকা মজুরী পায়, তাকে কলকাতার বাইরে অন্য কোথাও সরাতে হলে কমপক্ষে ১৫ টাকা মজুরী দিতে হবে। কাজেই কলকাতার শ্রমিক যে মজুরী পায় সেই মজুরী হবে তাকে অন্যত্র সরানোর স্থানান্তর ব্যয়। অতএব **কোন উপাদানকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে কিংবা এক ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারে সরাতে হলে যে নিম্নতম ব্যয় হয় তাকেই স্থানান্তর ব্যয় বলা হয়।**

৮.২. **স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় :** স্বল্পকালে ফার্মের উৎপাদন ব্যয়কে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(ক) স্থির ব্যয় ও (খ) পরিবর্তনশীল ব্যয়। ফার্মের স্থির উপাদানের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল উপাদানের জন্য যে ব্যয় হয় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলা হয়।

(ক) স্থির ব্যয় : স্থির উপাদান বলতে বোঝায় সেই সব উপাদান যাদের পরিমাণ স্বল্পকালে বাড়ানো বা কমানো যায় না। যে কোন উপাদান স্থির উপাদান হয়ে পড়তে পারে। ব্যাপারটা নির্ভর করছে মূলত সময়ের উপর। সময় যত কম হবে, ফার্মের পক্ষে ততই উপাদানের পরিমাণ বাড়ানো বা কমানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। আবার সময় যত বেশি হবে ফার্ম ততই অধিক সংখ্যক উপাদানের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাতে পারে। অতএব স্বল্পকালে যে সব উপাদানের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় না তাদের স্থির উপাদান বলা হয় এবং স্বল্পকালে যে সব উপাদানের হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায় তাদের পরিবর্তনশীল উপাদান বলা হয়। ফার্মের স্থির উপাদানের মধ্যে পড়ে :

১। কারখানার জমি ;

২। বাড়ি, গুদামঘর, অফিসঘর, আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি, পরিবহণ সামগ্রী ইত্যাদি স্থায়ী মূলধন দ্রব্য ;

৩। দক্ষ শ্রমিক, প্রশাসক, ম্যানেজার ইত্যাদি শ্রেণীর কর্মচারী ;

৪। স্থায়ী শ্রমিক ;

৫। কারখানার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত কর্মচারী ;

৬। উদ্যোক্তা ইত্যাদি। এই সব স্থির উপাদানের জন্য ফার্মের যে ব্যয় হয় তাকে বলা হয় স্থির ব্যয়। অতএব ফার্মের স্থির ব্যয়ের মধ্যে থাকবে :

ক। জমির খাজনা, খ। বাড়ি-ঘরের ভাড়া, গ। মূলধন দ্রব্যাদির সুদ ও অবচয়, ঘ। অন্যান্য স্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি এবং ঙ। উদ্যোক্তার স্বাভাবিক মুনাফা।

স্থির ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য: ফার্মের স্থির ব্যয়কে চুক্তিবদ্ধ ব্যয় বলা হয়, কারণ ফার্মের মালিক স্থির উপাদানের মালিকদের সঙ্গে চুক্তি করে এইসব উপাদান সংগ্রহ করেন। মালিক এই চুক্তি মানতে বাধ্য। এইজন্য স্থির ব্যয়কে অপরিহার্য ব্যয় বলা হয়। এটি হল স্থির ব্যয়ের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত, ফার্মের স্থির ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। স্বল্পকালে ফার্ম যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাহলে তার জন্য তাকে অতিরিক্ত স্থির উপাদান ব্যবহার করতে হয় না। কাজেই স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়লে স্থির ব্যয় বাড়ে না। আবার ফার্ম যদি উৎপাদন কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলেও স্থির ব্যয় কমানো যায় না। অতএব স্থির ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না।

তৃতীয়ত, দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় স্থির থাকে না। দীর্ঘকালে ফার্ম তার আয়তনের পরিবর্তন করতে পারে। অন্যান্য স্থির উপাদানের পরিমাণেরও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। কাজেই দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় অনেকাংশে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য পেয়ে যায়।

(খ) পরিবর্তনশীল ব্যয়: যে সব উপাদানের পরিমাণ প্রয়োজন মত বাড়ানো বা কমানো যায় সেই সব উপাদানকে পরিবর্তনশীল উপাদান বলে এবং সেই সব পরিবর্তনশীল উপাদানের জন্য ফার্মের যে ব্যয় হয় তাকে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলা হয়। পরিবর্তনশীল উপাদানের মধ্যে পড়ে ১। কাঁচামাল, জ্বালানি ও অন্যান্য উপকরণ। যেমন, যে ফার্ম সুতো উৎপাদন করে তার কাঁচামাল হল তুলা। অন্যান্য উপকরণের মধ্যে পড়বে তুলা পরিষ্কার করার রাসায়নিক দ্রব্যাদি, সুতো রঙ করার জন্য রঙ ইত্যাদি। ২। সাধারণত যে সব শ্রমিক কেবলমাত্র দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করেন তাদের অস্থায়ী শ্রমিক বলা হয়। এঁরা যে দিন কাজ করেন সেদিনই মজুরী পান। যেদিন কাজ করেন না সেদিন মজুরী পান না। ফার্মের মালিক যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চান তাহলে বেশি সংখ্যায় এই সব অস্থায়ী বা ঠিকা শ্রমিক নিযুক্ত করেন। উৎপাদন কমানোর সিদ্ধ[illegible] গ্রহণ করলে ফার্মের মালিক কম শ্রমিক নিযুক্ত করেন। কাঁচামাল ও শ্রম ছাড়াও ফার্ম আরও অনেক পরিবর্তনশীল উপাদান নিয়োগ করেন, যেমন—৩। পরিবহণ ৪। উৎপন্ন দ্রব্য প্যাকিং করার জন্য কাগজের বাক্স বা অন্য কোন দ্রব্য ইত্যাদি। তাহলে ফার্মের পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পড়ে (১) কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের দাম, (২) অস্থায়ী বা ঠিকা শ্রমিকের মজুরী, (৩) চলতি মূলধনের জন্য ফার্ম যদি কোন স্বল্পকালীন ঋণ নেয় তাহলে সেই ঋণের সুদ, (৪) পরিবহণ ব্যয়, (৫) প্যাকিং খরচ, (৬) ডাক ব্যয় ইত্যাদি।

অবশ্য আমরা যদি উৎপাদন ব্যয় ছাড়া অন্য ব্যয় বাদ দিই তাহলে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে কাঁচামালের দাম, জ্বালানি-খরচ, অস্থায়ী শ্রমিকদের মজুরী এবং চলতি মূলধনের সুদ প্রভৃতি ধরা হয়।

ফার্মের স্থির ব্যয়কে Fixed Cost বা FC এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়কে Variable Cost বা VC বলা যায়।

ফার্মের মোট ব্যয়কে Total Cost বা TC বলা হয়।

মোট স্থির ব্যয় = Total Fixed Cost = TFC

মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় = Total Variable Cost = TVC

অতএব স্বল্পকালে ফার্মের মোট ব্যয় = মোট স্থির ব্যয় + মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় অর্থাৎ TC = TFC + TVC.

৮.৩. স্বল্পকালে ফার্মের মোট ব্যয় রেখা ও তার আকৃতি :

(ক) স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা কী?

স্বল্পকালে কোন একটি ফার্ম একটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফার্ম যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করে তাকে পরিকল্পিত উৎপাদন (Planned Output) বলা হয়। কোন একটি পরিমাণ পরিকল্পিত উৎপাদনের জন্য ফার্মের ব্যয়কে সম্ভাব্য বা প্রত্যাশিত ব্যয় (Expected cost) বলা হয়। এই ব্যয় হল নিম্নতম ব্যয়। এখন বিভিন্ন পরিমাণ পরিকল্পিত উৎপাদনের জন্য ফার্মের যে সব সম্ভাব্য ব্যয় হয় তাদের সম্পর্ককে ব্যয় অপেক্ষক (Cost function) বলা হয়। **কোন দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন ও তাদের জন্য ফার্মের নিম্নতম মোট ব্যয়কে সংযুক্ত করে যে রেখা পাওয়া যায় তাকে ফার্মের 'মোট ব্যয় রেখা' বলা হয়।** ফার্মের মোট ব্যয় রেখা হল ফার্মের ব্যয় অপেক্ষকের জ্যামিতিক রূপ।

স্বল্পকালে ফার্মের মোট উৎপাদন ব্যয়কে দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা—মোট স্থির ব্যয় (TFC) ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC). অতএব ফার্মের মোট ব্যয় অপেক্ষকের দুটি অংশ থাকবে। একটি অংশে থাকবে TFC এবং অপর অংশে থাকবে TVC. আমরা বলতে পারি ফার্মের মোট ব্যয় = TFC + TVC.

স্বল্পকালে TFC উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। উৎপাদনের পরিমাণ বেশি বা কম যাই হোক না কেন, TFC সব সময় সমান থাকে। অতএব TFCকে আমরা একটি ধ্রুবক বলতে পারি। ধরি TFC = F.

স্বল্পকালে TVC উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উৎপাদনের পরিমাণকে যদি Q বলা হয়, তাহলে আমরা পাই TVC নির্ভর করে Q-এর উপর। আমরা লিখতে পারি TVC = f(Q)

এখন আমরা ফার্মের স্বল্পকালীন ব্যয় অপেক্ষকটিকে লিখতে পারি। ধরি C = মোট ব্যয়। তাহলে—

$$C = TFC + TVC.$$

এখানে $TFC = F$ এবং $TVC = f(Q)$ ধরা হয়েছে।

অতএব $C = F + f(Q)$. এটিই হল ফার্মের মোট ব্যয় অপেক্ষক

এই অপেক্ষক থেকে আমরা ফার্মের পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিমাণ বা Q-এর মান থেকে C-এর মান পাব। Q ও C-এর বিভিন্ন মানগুলিকে নিয়ে যে রেখা অঙ্কন করা যাবে—তাকেই আমরা ফার্মের স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা বলতে পারব।

(খ) **স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখার আকৃতি :**

স্বল্পকালে ফার্মের মোট ব্যয় (TC) = মোট স্থির ব্যয় (TFC) + মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC). কাজেই মোট ব্যয় রেখার আকৃতি নির্ভর করে TFC রেখার আকৃতির উপর এবং TVC রেখার আকৃতির উপর।

স্বল্পকালে TFC উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। উৎপাদন (Q) কম বা বেশি যাই হোক না কেন, TFC স্থির থাকে। কাজেই TFC রেখাটি উৎপাদন-পরিমাপক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়।

স্বল্পকালে Q বাড়লে TVC বাড়ে ; Q কমলে TVC কমে। কাজেই TVC রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হয়। যদি Q = O হয়, তাহলে TVC = O হয়। কাজেই TVC রেখাটি রেখাচিত্রের মূল বিন্দু থেকে অঙ্কিত হয়।

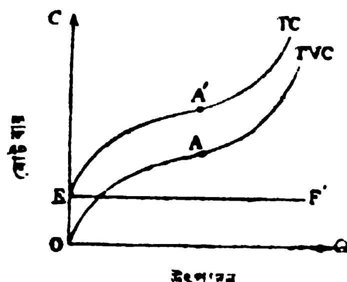
Q বাড়লে TVC বাড়ে। এখন Q যদি সমান হারে বাড়ে এবং TVC যদি সমান হারে বাড়ে, তাহলে TVC রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা হয় ; কিন্তু TVC যদি অসমান হারে বাড়ে তাহলে TVC রেখাটি বক্ররেখা হয়। আসলে Q যে হারে বাড়ে, TVC সেই হারে বাড়ে না। প্রথমদিকে Q যে হারে বাড়ে, TVC তার চেয়ে কম হারে বাড়ে, ফলে TVC রেখাটি উৎপাদন-অক্ষের দিকে ঝুঁকে নেমে আসে ও অবতল হয়। তারপর Q যত বাড়ে TVC ততই বেশি হারে বাড়তে থাকে, ফলে TVC রেখাটি উৎপাদন-অক্ষের দিকে উত্তল হয়। অতএব TVC রেখাটি রেখাচিত্রের মূলবিন্দু থেকে বের হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। কিন্তু প্রথমে কম হারে ওঠে, তার পরে বেশি হারে ওঠে। অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে TVC রেখা উৎপাদন-অক্ষের দিকে অবতল এবং তারপর উত্তল হয়। TVC রেখার অবতল অংশের শেষে এবং উত্তল অংশের আরম্ভে থাকে বাঁক-বদলের বিন্দু (Point of inflection).

TVC রেখার আকৃতি কেন এমন হয়

স্বল্পকালে কোন ফার্ম যখন উৎপাদন-বৃদ্ধি করে, তখন তার আয়তন বৃদ্ধি পায়। ফার্মটি বৃহদায়তন হয় এবং এর ফলে ফার্মটি বৃহদায়তন উৎপাদনের নানারকম ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা (economies of large-scale production) ভোগ করে। ফার্ম স্বল্পকালে যে সব সুবিধা ভোগ করে, তাদের ফলে ফার্মের উৎপাদন (Q) যে হারে বাড়ে, TVC তার চেয়ে কম হারে বাড়ে। এই জন্যে এই সুবিধাগুলিকে ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা বলা হয়। ফার্ম স্বল্পকালে যে সব ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(ক) শ্রমের সুবিধা, (খ) বাজারের সুবিধা, (গ) আর্থিক সুবিধা, (ঘ) কারিগরী সুবিধা, (ঙ) পরিচালনার সুবিধা ইত্যাদি।

এই সুবিধাগুলির ফলেই উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে TVC রেখা উৎপাদন অক্ষের দিকে অবতল হয়। কিন্তু সুবিধা চিরকাল থাকে না। সুবিধার লোভে ফার্মটি যদি বার বার তার উৎপাদন বৃদ্ধি করে, তাহলে কালক্রমে তার ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধাগুলি অসুবিধায় (**Diseconomies of large-scale production**) রূপান্তরিত হয়। এই অসুবিধাগুলির জন্যই উৎপাদন যত বাড়ে TVC তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে, ফলে TVC রেখাটি উত্তল হয়ে পড়ে। অতএব আমরা বলতে পারি যে—ফার্মটির TVC রেখার অবতল অংশে ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা কাজ করে, উত্তল অংশে কাজ করে ব্যয় বাহুল্যের অসুবিধাসমূহ। TVC রেখার উপর বাঁক বদলের বিন্দুতে ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা সবচেয়ে বেশি হয়।



৮.১ রেখাচিত্র : স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা

এখন আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে TVC, TFC ও TC রেখার আকৃতি আলোচনা করতে পারি। আমাদের রেখাচিত্রে EF হল মোট স্থির ব্যয় রেখা, TVC হল মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা এবং TC হল মোট ব্যয় রেখা।

রেখাচিত্রের EF রেখাটি উৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়েছে, কারণ TFC মোট উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এখানে TVC রেখাটি প্রথমে অবতল ও পরে উত্তল হয়েছে। রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে TVC রেখাটি A বিন্দু পর্যন্ত অবতল। A বিন্দুর পর TVC রেখাটি উত্তল হয়ে গেছে। উত্তল অংশে উৎপাদন যে হারে বাড়ে TVC তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা আর নেই; তার পরিবর্তে দেখা দেয় ব্যয় বাহুল্যের অসুবিধা।

এখন TVC রেখাকে যদি E বিন্দু পর্যন্ত উপরে তুলে দেওয়া হয় তাহলে আমরা মোট ব্যয় রেখা বা TC রেখা পাব। $TC = TFC + TVC$. অতএব $TC - TVC = TFC$. অর্থাৎ TC রেখা ও TVC রেখার ব্যবধান হল মোট স্থির ব্যয়। মোট স্থির ব্যয় যেহেতু সমান থাকে, সেইজন্য TC ও TVC রেখা দুটির মধ্যবর্তী ব্যবধান সর্বত্র সমান থাকবে। অন্যভাবে বলা যায় E বিন্দুকে যদি রেখাচিত্রের মূলবিন্দু ধরা হয় তাহলে TC রেখাটি হবে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা। আবার, O বিন্দুকে মূল বিন্দু হিসেবে দেখলে TC রেখাটি হবে মোট ব্যয় রেখা।

৮.৪. ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় ও গড় ব্যয় রেখার আকৃতি :

(ক) **গড় ব্যয় কাকে বলে ? স্বল্পকালে ফার্ম কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মোট যে নিম্নতম ব্যয় করে, তাকে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে উৎপন্ন দ্রব্যের একক পিছু যে নিম্নতম ব্যয় পাওয়া যায় তাকে ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় বলা হয়।** অর্থাৎ স্বল্পকালীন গড় ব্যয় = স্বল্পকালীন নিম্নতম মোট ব্যয় ÷ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ। যদি C = মোট ব্যয় এবং Q = মোট উৎপাদন হয়, তাহলে গড় ব্যয় $\frac{C}{Q}$ হবে।

স্বল্পকালে ফার্মের মোট ব্যয় = মোট স্থির ব্যয় + মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়। অতএব ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয়কেও দুভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ স্বল্পকালীন গড় ব্যয় = গড় স্থির ব্যয় + গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়। ইংরেজিতে লিখলে আমরা পাই—Total Cost = Total Fixed Cost + Total Variable Cost অর্থাৎ TC = TFC + TVC উভয় পক্ষকে উৎপাদনের পরিমাণ = Q দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{TC}{Q}=\frac{TFC}{Q}+\frac{TVC}{Q}$$

অর্থাৎ Average Cost = Average Fixed Cost + Average Variable Cost

অর্থাৎ AC = AFC + AVC. অর্থাৎ ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় = গড় স্থির ব্যয় + গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়

(খ) **ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি :**

স্বল্পকাল বলতে এমন একটি সময় সীমা বোঝায় যার মধ্যে ফার্ম তার সব উপাদানের পরিবর্তন করতে পারে না ; কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে এবং কতকগুলি উপাদান পরিবর্তনশীল হয়। স্থির উপাদানসমূহের জন্য ফার্মের ব্যয়কে স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল উপাদানসমূহের জন্য ফার্মের ব্যয়কে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলা হয়। অতএব স্বল্পকালে ফার্মের মোট ব্যয় = মোট স্থির ব্যয় + মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়।

ইংরেজিতে লিখতে হয়,

Total Cost = Total Fixed Cost + Total Variable Cost.

অর্থাৎ TC = TFC + TVC. এখন উভয় পক্ষকে উৎপাদনের পরিমাণ বা Q দ্বারা ভাগ করে পাই,

$$\frac{TC}{Q}=\frac{TFC}{Q}+\frac{TVC}{Q}$$

অর্থাৎ Average Cost = Average Fixed Cost + Average Variable Cost

অর্থাৎ AC = AFC + AVC. অতএব ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় = গড় স্থির ব্যয় + গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ; তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ফার্মের গড় ব্যয়

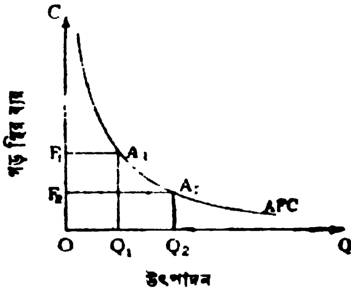
(AC) রেখার আকৃতি গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখার আকৃতি ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC) রেখার আকৃতির উপর নির্ভর করবে।

আমরা প্রথমে AFC রেখার আকৃতি আলোচনা করব। তারপর AVC রেখার আকৃতি আলোচনা করব। পরিশেষে AFC ও AVC রেখা দুটিকে জ্যামিতিকভাবে যোগ করে আমরা গড় ব্যয় রেখা বা AC রেখার আকৃতি পাব।

গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখার আকৃতি :

$$\text{গড় স্থির ব্যয় (AFC)} = \frac{\text{মোট স্থির ব্যয়}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}} = \frac{TFC}{Q}$$

স্বল্পকালে উৎপাদন (Q) যদি বাড়ে তাহলেও TFC বাড়ে না, বা কমে না। Q বাড়লেও TFC স্থির থাকে, অতএব, AFC ক্রমাগত কমে যায়। যদি মোট স্থির ব্যয় = ১০০ টাকা ধরা হয়, তাহলে উৎপাদন ১ একক হলে গড় স্থির ব্যয় হয় ১০০ টাকা, উৎপাদন ২ একক হলে গড় স্থির ব্যয় হবে ৫০ টাকা। এমনি করে উৎপাদন যত বাড়ে, গড় স্থির ব্যয় তত‌ই কমতে থাকে। উৎপাদন বেড়ে যদি ১,০০০ একক হয়, তাহলে গড় স্থির ব্যয় হয় ১০ পয়সা। কিন্তু গড় স্থির ব্যয় কখনই শূন্য হতে পারে না। গড় স্থির ব্যয়ের পরিবর্তনের এই প্রকৃতি দেখে আমরা বলতে পারি—গড় স্থির ব্যয় রেখা নিম্নমুখী হবে। পাশের রেখাচিত্রে AFC রেখাটি হল গড় স্থির ব্যয় রেখা।



৮.২ রেখাচিত্র : গড় স্থির ব্যয় রেখা

এখানে উৎপাদন যখন OQ_1, গড় স্থির ব্যয় তখন $Q_1A_1 = OF_1$. অতএব মোট স্থির ব্যয় $= OQ_1 \times OF_1 = OF_1A_1Q_1$. আবার উৎপাদন যদি OQ_2 হয়, তখন গড় স্থির ব্যয় $Q_2A_2 = OF_2$ এবং মোট স্থির ব্যয় $= OQ_2 \times OF_2 = OF_2A_2Q_2$. এই দুটি ক্ষেত্রফল সমান, কারণ উভয়েই মোট স্থির ব্যয় প্রকাশ করে। আমরা বলতে পারি—AFC রেখার নীচে যতগুলি আয়তক্ষেত্র আঁকা যাক না কেন, তাদের ক্ষেত্রফল সমান হয়। আবার AFC কখনও শূন্য হতে পারে না। অর্থাৎ AFC রেখা কখনই উৎপাদন-অক্ষকে ছেদ করবে না। কিন্তু উৎপাদন যত বাড়ে AFC তত‌ই কম হয়। রেখাচিত্রের ভাষায় AFC রেখা ক্রমশ উৎপাদন-অক্ষের নিকটবর্তী হয়। তাহলে আমরা AFC রেখার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করি :

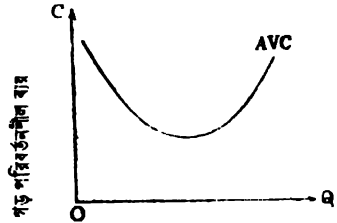
১। AFC রেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয় ; ২। AFC রেখা কখনই উৎপাদন-অক্ষকে ছেদ করে না ; ৩। AFC রেখা যত ডান দিকে যায়, তত‌ই উৎপাদন-অক্ষের নিকটবর্তী হয় এবং ৪। AFC রেখার নীচে যতগুলি আয়তক্ষেত্র আঁকা যাক না কেন তাদের সকলের ক্ষেত্রফল সমান হয়, কারণ ঐ

ক্ষেত্রফলগুলির প্রত্যেকটিই ফার্মের মোট স্থির ব্যয় সূচিত করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকার জন্য AFC রেখাকে আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত (Rectangular hyperbola) বলা হয়।

গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখার আকৃতি :

$$\text{গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় বা } AVC = \frac{\text{মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়}}{\text{উৎপাদন}} = \frac{TVC}{Q}$$

স্বল্পকালে ফার্মের উৎপাদন যখন বাড়ে, TVCও তখন বাড়ে, কাজেই AVC (ক) কমতে পারে, (খ) স্থির থাকতে পারে কিংবা (গ) বাড়তে পারে। আসলে কী হবে তা নির্ভর করছে—মোট উৎপাদন ও মোট ব্যয়ের পরিবর্তনের হারের উপর। যদি TVC এবং উৎপাদন একই হারে বাড়ে তাহলে AVC স্থির থাকে। কিন্তু TVC অপেক্ষা উৎপাদন যদি বেশি হারে বাড়ে, তাহলে AVC কমে এবং কম হারে বাড়লে AVC বাড়ে। বাস্তবে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে উৎপাদন যে হারে বাড়ে, TVC তার চেয়ে কম হারে বাড়ে, যার ফলে—AVC কমতে থাকে এবং AVC রেখা নিম্নমুখী হয়। যতক্ষণ ফার্ম উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা ভোগ করতে থাকে ততক্ষণ AVC কমতে থাকে। যখন ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় তখন AVC হয় সবচেয়ে কম। এরপর ফার্ম যত উৎপাদন বৃদ্ধি করতে থাকে, ততই সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধা দেখা দেয় এবং ব্যয় সংক্ষেপ না হয়ে ব্যয় বাহুল্য হয়। এর ফলে—উৎপাদন যে হারে বাড়ে, TVC তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে এবং AVCও বাড়তে থাকে যার জন্য AVC রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। তাহলে ফার্মের AVC রেখা প্রথমে নিম্নমুখী এবং পরে ঊর্ধ্বমুখী হয়। AVC রেখাটি দেখতে কিছুটা ইংরাজী U অক্ষরের মত হয়। ৮.৩ নং রেখাচিত্রের AVC হল গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা।

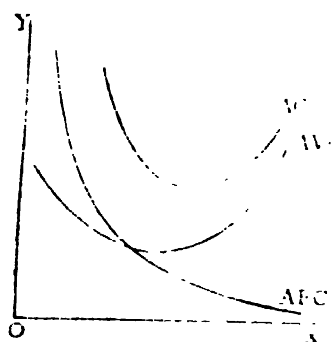


৮.৩ রেখাচিত্র : গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা

এখন ৮.২নং রেখাচিত্রের AFC রেখা ও ৮.৩নং রেখাচিত্রের AVC রেখাকে একটি রেখাচিত্রে স্থাপন করে যোগ করলে আমরা গড় (মোট) ব্যয় রেখা পাব। ৮.৪ নং রেখাচিত্রের AC রেখাটি হল AFC ও AVC রেখা দুটির যোগফল বা গড় ব্যয় রেখা।

গড় ব্যয় রেখাটি প্রথমে নিম্নমুখী হয়ে পরে ঊর্ধ্বমুখী হয়। এর আকৃতি কিছুটা ইংরেজি U অক্ষরের মত হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে ফার্মের AFC ও AVC

উভয়েই কমতে থাকে সেজন্য AC রেখা খুব দ্রুতগতিতে নীচের দিকে নামতে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথমদিকে AFC ও AVC উভয়েই AC রেখাকে নীচের দিকে নামিয়ে আনে। এইভাবে গড় ব্যয় রেখা তার নিম্নতম বিন্দুতে পৌঁছায়। এরপর উৎপাদন যত বাড়ে—AFC যদিও কমতে থাকে, কিন্তু AVC বাড়তে থাকে। এর ফলে AC রেখার উপর দুটি বিপরীত শক্তি কাজ করে। একদিকে AFC, AC রেখাকে নীচের দিকে নামিয়ে আনতে চায়, অন্যদিকে AVC তাকে উপরের দিকে টেনে তোলে। কিন্তু AFC-র নিম্নমুখী শক্তি কম হওয়ায় AC রেখা উপরের দিকে উঠে যায়। কিন্তু AFC ও AVC উভয়েই ঊর্ধ্বমুখী হলে AC রেখা যত দ্রুতগতিতে উপরের দিকে উঠত তত দ্রুতগতিতে ওঠে না। AC রেখার ঊর্ধ্বগতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে যায়। এইভাবে AC রেখা প্রথমে খুব দ্রুতগতিতে নিম্নমুখী হলেও পরে ধীরগতিতে উপরের দিকে উঠে যায়।



৮.৪ রেখাচিত্র : AFC ও AVC রেখার যোগফল হিসাবে AC রেখা

ফার্মের বৃহদায়তনের সুবিধা ও অসুবিধা এবং স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি :

ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার এইরূপ আকৃতির পিছনে বৃহৎমাত্রায় উৎপাদনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কাজ করে।

স্বল্পকালে ফার্মের আয়তন নির্দিষ্ট থাকে। ফার্ম এই আয়তনের কোন পরিবর্তন করতে পারে না। ফার্ম তার স্থায়ী ও বাস্তব মূলধনেরও কোন পরিবর্তন করতে পারে না। চুক্তিভিত্তিক যেসব দক্ষ শ্রমিক—যেমন, ম্যানেজার বা এক্সিকিউটিভ অফিসার ইত্যাদি নিযুক্ত করে তাঁদের ছাঁটাই করতে পারে না। অর্থাৎ ফার্মের একটি বড় অঙ্কের স্থির ব্যয় বা অপরিহার্য ব্যয় হতে থাকে। এই অবস্থায় ফার্মের উৎপাদন যত বাড়বে ফার্মের সুবিধাও তত বেশি হবে। অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি হতে থাকলে ফার্ম তার স্থির উপাদানসমূহের সদ্ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে মোট স্থির ব্যয়কে অনেক বেশি পরিমাণ উৎপাদনের উপর বণ্টন করা সম্ভব হবে এবং কাম্য গড় স্থির ব্যয় কমবে। স্বল্পকালে বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করলে স্থির উপাদানের সদ্ব্যবহার করে যে আর্থিক সুবিধা বা ব্যয় সংক্ষেপের সুযোগ ভোগ করা সম্ভব হয়—সেই সুবিধাগুলোকে আমরা **পরিচালনগত ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা** (Managerial economies) বলতে পারি।

কিন্তু এই সুবিধা অনেকদিন ধরে পাওয়া যায় না। উৎপাদন যদি খুব বেশি বেড়ে যায়, তাহলে ম্যানেজারদের পক্ষে সবকিছু ভালভাবে দেখাশুনা করা সম্ভব হয়

না। আমরা বলি—স্বল্পকালে উৎপাদন খুব বেশি বেড়ে গেলে স্থির উপাদানের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং তার ফলে উৎপাদনের উপর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হ্রাস পায় এবং গড় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যেতে থাকে। এটা হল প্রশাসনিক অসুবিধা।

স্বল্পকালে বৃহৎমাত্রায় উৎপাদন করলে প্রশাসনিক অসুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য আরও অনেক সুবিধা পাওয়া যায়, যাদের ফলে উৎপাদন যত বাড়ে—উৎপাদন ব্যয় তত বাড়ে না, তার চেয়ে কম বাড়ে, কাজেই গড় ব্যয় কমে যায়। এই সমস্ত সুবিধা-গুলির মধ্যে প্রথমেই **শ্রমসংক্রান্ত ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধার** (Labour economies) উল্লেখ করতে হয়। বৃহৎমাত্রায় দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে বেশিসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। বেশিসংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করলে উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে শ্রমবিভাগের প্রচলন করা যায়।

শ্রমবিভাগের ফলে কোন একটি দ্রব্যের উৎপাদনকে বহু অংশে বিভক্ত করা হয় এবং এক একটি অংশ উৎপাদনের দায়িত্ব দেওয়া হয় নির্দিষ্ট একজন শ্রমিক কিংবা নির্দিষ্ট একটি শ্রমিকদলের উপর। এই শ্রমবিভাগের ফলে একজন শ্রমিক নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে এবং প্রতিদিন একই কাজ করে বলে একদিকে (ক) সময়ের অপচয় রোধ হয়, অন্যদিকে (খ) শ্রমিকের দক্ষতা ও কর্মকুশলতার বৃদ্ধি ঘটে। কম সময়ের মধ্যে একজন শ্রমিক সমান মজুরীতে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে, ফলে উৎপাদনের একক পিছু ব্যয় বা গড় ব্যয় কম পড়ে। অর্থনীতিতে শ্রম-বিভাগের এই দুটি সুবিধার কথা প্রথম আলোচনা করেন অ্যাডাম স্মিথ। স্মিথের মতে শ্রমবিভাগের আর একটি সুবিধা হল যে, (গ) শ্রমবিভাগ নতুন যন্ত্রের আবিষ্কারকে সম্ভব করে তোলে। নতুন যন্ত্রের জন্য ফার্মের ব্যয় হয়ত বাড়ে, কিন্তু উৎপাদন অনেক বেশি পাওয়া যায়। অতএব শ্রমবিভাগের সুবিধা হল প্রধানত তিনটি। শ্রম-বিভাগের ফলে (১) সময়ের অপচয় কম হয়, (২) শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং (৩) শ্রমবিভাগের ফলে নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হয়।

কিন্তু শ্রমবিভাগের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে এর অসুবিধাগুলিও ভাবতে হবে। উৎপাদন খুব বেশি বেড়ে গেলে, শ্রমিকের সংখ্যাও খুব বেড়ে গেলে কারখানায় ঠেসাঠেসি ভিড় হতে পারে; কাজ করার জন্য যে স্বচ্ছন্দ পরিবেশ থাকা দরকার—সেই পরিবেশের অভাব হয়। তাছাড়া শ্রমবিভাগকে খুব দূরসীমায় অত্যন্ত সূক্ষ্ম পর্যায়ে নিয়ে গেলে উৎপাদন থেকে শ্রমিক কোন মানসিক তৃপ্তি পায় না, সে তখন নিতান্ত যন্ত্রের মত উৎপাদন করে যায়। এতে শ্রমিকের কর্মকুশলতা হ্রাস পায় এবং উৎপাদন যত বাড়ে মজুরী তার চেয়ে বেশি বেড়ে যায়।

বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করলে আর একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা পাওয়া যায়। এর নাম **কারিগরী বা যান্ত্রিক সুবিধা** (Technical economies)। বেশি পরিমাণে উৎপাদন করার জন্য ফার্ম উন্নত ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতে পারে। এইসব যন্ত্রের জন্য প্রথমে খরচ বেশি হলেও গড়হিসেবে উৎপাদনের খরচ কমই যায়। উন্নত যন্ত্র নির্দিষ্ট সময়ে অনেক বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে বলেই—উৎপাদনের গড় ব্যয় অনেক কম হয়।

বৃহদায়তন উৎপাদনের আর একটি সুবিধা হল **আর্থিক সুবিধা** (Financial economies)। ফার্ম দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য কাঁচামাল ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করে। বেশি মাত্রায় উৎপাদন করলে এইসব দ্রব কেনার সময় ফার্মটি পাইকারী দামের সুবিধা পেয়ে থাকে। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের সময়েও এরকম সুবিধা পাওয়া যায়। বেশি পরিমাণে দ্রব্য কেনাবেচা করলে এইরকম যেসব সুবিধা পাওয়া যায় সেগুলিকে আমরা বাজারের সুবিধাও বলতে পারি। সেক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধার মধ্যে পড়ে, ঋণের বাজারের বা অর্থের বাজারের সুবিধা। যে ফার্ম বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করে, তার আর্থিক সুনাম যত বেশি হবে, ছোট ফার্মের আর্থিক সুনাম কখনই তত বেশি হবে না। এই সুনামের জন্য ফার্মের মালিক সহজ শর্তে অনেক বেশি পরিমাণে আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পেতে পারবেন। তার ফলে উৎপাদনের প্রতি এককের জন্য গড় উৎপাদন ব্যয় কম হয়ে যায়।

কিন্তু এইসব সুবিধাগুলি ক্রমাগতভাবে পাওয়া যায় না। সুবিধা যত বাড়ে গড় ব্যয় তত কমে। যেখানে সুবিধা সবচেয়ে বেশি, সেখানে গড় ব্যয় সবচেয়ে কম। গড় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতে সুবিধা সবচেয়ে বেশি হয়। তারপর উৎপাদন যত বাড়ে গড় ব্যয় ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এতদিন ধরে বৃহদায়তনের যে সুবিধাগুলি পাওয়া যাচ্ছিল এবার সেগুলি অসুবিধায় পরিণত হয়। ব্যয় সংক্ষেপের সূত্রগুলি ব্যয়বাহুল্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে গড় ব্যয় রেখা প্রথমে নিম্নমুখী হয়ে পরে ঊর্ধ্বমুখী হয়।

৮.৫. মোট ব্যয়রেখা থেকে কীভাবে গড় ব্যয় রেখা আঁকা যায় :

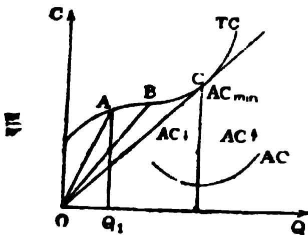
মোট ব্যয়রেখা থেকে কীভাবে গড় ব্যয়রেখা পাওয়া যায় এটি নীচের রেখাচিত্রে দেখানো হল। আমাদের ৮.৫নং রেখাচিত্রে TC হল ফার্মের স্বল্পকালীন মোট ব্যয়রেখা। TC রেখার উপর A একটি বিন্দু।

A বিন্দুতে মোট ব্যয় = AQ_1,

উৎপাদন = OQ_1

অতএব গড় ব্যয় = $\frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{উৎপাদন}} = \frac{AQ_1}{OQ_1}$ = OA রেখার ঢাল।

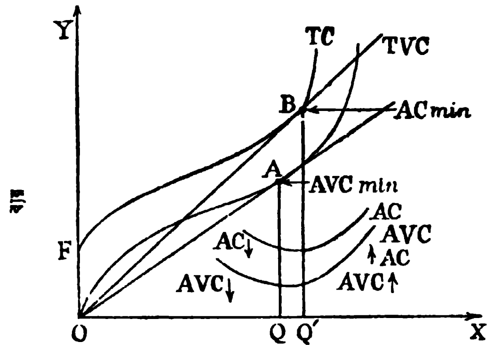
অতএব মোট ব্যয় রেখার কোন বিন্দুতে গড় ব্যয় জানতে হলে সেই বিন্দুকে রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর সঙ্গে একটি সরলরেখা দিয়ে যোগ করতে হবে এবং সেই রেখার ঢালই হবে গড় ব্যয়। যেমন, A বিন্দুতে গড় ব্যয় = OA রেখার ঢাল। তেমনি B বিন্দুতে গড় ব্যয় = OB রেখার ঢাল। এখন OA রেখার ঢাল অপেক্ষা OB রেখার ঢাল কম। কাজেই A বিন্দু অপেক্ষা B বিন্দুতে গড় ব্যয় কম। অন্যভাবে বলা যায় মোট ব্যয়রেখার উপর বামদিক থেকে ডানদিকে গড় ব্যয় কমে যায়। কিন্তু কতদূর পর্যন্ত কমবে? আমাদের রেখাচিত্রে A থেকে C বিন্দু পর্যন্ত গড় ব্যয় কমবে। C



৮.৫ রেখাচিত্র : মোট ব্যয়রেখা থেকে গড় ব্যয়রেখার আকৃতি নিরূপণ

বিন্দুর ডানদিকে কিন্তু গড় ব্যয় বাড়বে। C বিন্দুতে গড় ব্যয়=OC রেখার ঢাল। এখন OC রেখাটি TC রেখাকে C বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। তাহলে আমরা বলতে পারি মোট ব্যয়রেখার উপর কোন বিন্দুর সঙ্গে রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর সংযোজক সরলরেখা যখন মোট ব্যয়রেখাকে স্পর্শ করে—সেই স্পর্শবিন্দুতে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। আমাদের ৮.৫নং রেখাচিত্রে C বিন্দুতে গড় ব্যয় (AC) সর্বনিম্ন। C বিন্দুর বামদিকে গড় ব্যয় ক্রমশ কমে বলে গড় ব্যয়রেখা বা AC রেখা নিম্নমুখী হয়। C বিন্দুর ডানদিকে গড় ব্যয় বাড়ে, কাজেই AC রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। C বিন্দুর ঠিক নীচে AC রেখারও সর্বনিম্ন বিন্দু। এইভাবে TC রেখা থেকে AC রেখার আকৃতি জানা যায়। সেই আকৃতি ধরে AC রেখাটি অঙ্কন করাও যায়। আমাদের রেখাচিত্রে TC রেখার তলায় অঙ্কিত AC রেখাটি হল গড় ব্যয়রেখা।

এখন আমরা এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করে মোট ব্যয়রেখা (TC রেখা) ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা (TVC রেখা) থেকে গড় ব্যয়রেখা (AC রেখা) ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখা (AVC রেখা) অঙ্কন করব। ৮.৬নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হয়েছে।



৮.৬ রেখাচিত্র : TC ও TVC রেখা থেকে কীভাবে AC ও AVC রেখা অঙ্কন করা যায়

এই রেখাচিত্রের উপরের অংশে TC হল মোট ব্যয়রেখা এবং TVC হল মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখা। A বিন্দুতে AVC সর্বনিম্ন। B বিন্দুতে AC সর্বনিম্ন। অর্থাৎ উৎপাদন যখন OQ তখন AVC সর্বনিম্ন এবং উৎপাদন যখন OQ′, তখন AC সর্বনিম্ন। এখানে OQ′ পরিমাণ উৎপাদন OQ পরিমাণ অপেক্ষা বেশি। তাহলে বলা যায়—**AVC রেখার নিম্নতম বিন্দু AC রেখার নিম্নতম বিন্দুর নীচে এবং সামান্য বাম দিকে থাকে।**

A বিন্দুর বামদিকে AVC কমে এবং ডানদিকে বাড়ে, সেইজন্য A বিন্দুর বামদিকে AVC রেখা নিম্নমুখী এবং ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়। অনুরূপভাবে, B বিন্দুর বামদিকে AC রেখা নিম্নমুখী ও ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী হয়। আমাদের রেখাচিত্রে AC ও AVC রেখা দুটি প্রথমে নিম্নমুখী ও পরে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। এদের মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমশ কমে যায়। কারণ—AC ও AVC রেখার মধ্যবর্তী ব্যবধান হল

গড় স্থির ব্যয় বা AFC, উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে AFC কমে, কাজেই AC ও AVC রেখা দুটির মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমশ হ্রাস পায়। কিন্তু AFC কখনও শূন্য হয় না বলে AC ও AVC রেখা দুটি কখনও পরস্পরকে ছেদ করে না। AC ও AVC রেখা দুটির আকৃতির এই বৈশিষ্ট্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৮.৩ **ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ঃ** ফার্মের মোট ব্যয়ের পরিবর্তনকে প্রান্তিক ব্যয় বলা হয়। অর্থাৎ **আর এক একক দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য ফার্মের যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাই হল প্রান্তিক ব্যয় (Marginal cost or MC)।** যেমন, ১০ একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় যদি ১০০ টাকা হয় এবং ১৪ এককের জন্য ১৪০ টাকা হয়, তাহলে অতিরিক্ত ৪ এককের জন্য ফার্মের ব্যয় হচ্ছে ৪০ টাকা, অতএব অতিরিক্ত ১ এককের জন্য ফার্মের ব্যয় হবে $\frac{৪০ \text{ টাকা}}{৪ \text{ একক}} = ১০$ টাকা।

অন্যভাবে বলা যায়, যদি অতিরিক্ত ΔQ একক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত ΔC টাকা ব্যয় হয় তাহলে প্রান্তিক ব্যয় (MC) হবে।

$$\frac{\Delta C}{\Delta Q} = \frac{\text{মোট ব্যয়ের পরিবর্তন}}{\text{উৎপাদনের পরিবর্তন}}$$

স্বল্পকালে ফার্মের মোট উৎপাদন ব্যয় দুই প্রকার। যথা, মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়। যদি C = মোট ব্যয়, TFC = মোট স্থির ব্যয় এবং TVC = মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় ধরা হয়, তাহলে স্বল্পকালে C = TFC + TVC. এখন Δ দ্বারা পরিবর্তন বোঝালে, উভয় পক্ষে পরিবর্তন হল $\Delta C = \Delta TFC + \Delta TVC$

$$\text{অর্থাৎ} \quad \frac{\Delta C}{\Delta Q} = \frac{\Delta TFC}{\Delta Q} + \frac{\Delta TVC}{\Delta Q}$$

অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক স্থির ব্যয় + প্রান্তিক পরিবর্তনশীল অর্থাৎ MC = MFC + MVC হয়। কিন্তু ΔTFC = O কারণ, মোট স্থির ব্যয় স্থির থাকলে তার কোন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ শূন্য পরিবর্তন হয়। তাহলে স্বল্পকালে প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক পরিবর্তনশীল ব্যয় হয়। অর্থাৎ MC = MVC। এর থেকে আমরা পাই, **স্বল্পকালে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে স্থির ব্যয় থাকে না, কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় থাকে।**

প্রান্তিক ব্যয় যেহেতু মোট ব্যয়ের পরিবর্তন, সেইজন্য আমরা বলতে পারি—

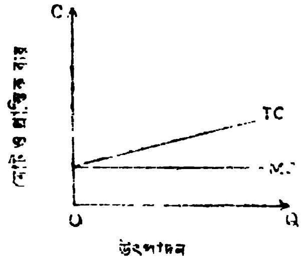
১। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে যদি মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তাহলে প্রান্তিক ব্যয় ধনাত্মক হয়। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায় যে মোট ব্যয় রেখা যদি উর্ধ্বমুখী হয়, তাহলে প্রান্তিক ব্যয় ধনাত্মক হয়।

২। মোট ব্যয় যদি স্থির থাকে, তাহলে প্রান্তিক ব্যয় শূন্য হয়। অর্থাৎ মোট ব্যয় রেখা যদি উৎপাদন অক্ষের সমান্তরাল হয়, তাহলে প্রান্তিক ব্যয় শূন্য হয় এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা উৎপাদন অক্ষের সঙ্গে মিশে যায়।

৩। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে যদি মোট ব্যয় হ্রাস পায়, তাহলে প্রান্তিক ব্যয় ঋণাত্মক হয়। অর্থাৎ মোট ব্যয়রেখা যদি নিম্নমুখী হয়, তাহলে প্রান্তিক ব্যয় ঋণাত্মক হয় এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখা নিম্নমুখী হয়।

৮.৭. স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখার আকৃতি

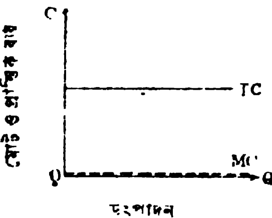
ফার্মের স্বল্পকালীন মোট ব্যয়রেখার আকৃতি দেখে আমরা প্রান্তিক ব্যয়রেখার আকৃতি অনুমান করতে পারি। আমরা জানি স্বল্পকালীন স্থির ব্যয় থাকায় ফার্মের মোট ব্যয়রেখা মূলবিন্দুর উপর থেকে শুরু হয়। এখন মোট ব্যয়রেখা যদি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা হয়, তাহলে বোঝা যায় মোট ব্যয় সমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রান্তিক ব্যয়রেখা উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা হবে। ৮.৭ নং চিত্রে TC হল মোট ব্যয়রেখা এবং MC হল প্রান্তিক ব্যয়রেখা।



৮.৭ রেখাচিত্র : সরলরৈখিক TC রেখা থেকে MC রেখা অঙ্কন

এখানে TC রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা হওয়ায়, MC রেখাটি OQ অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে।

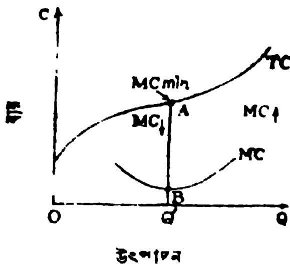
আবার TC রেখা যদি উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল হয় তাহলে MC=O হয়, এবং সেক্ষেত্রে উৎপাদন-অক্ষটিই MC রেখা হিসেবে গৃহীত হতে পারে। ৮.৮ নং রেখাচিত্রে TC রেখা উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল হওয়ায় MC রেখা OQ অক্ষের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। TC রেখা সমান্তরাল হলে বোঝায় উৎপাদন বাড়লেও মোট ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হচ্ছে না, অর্থাৎ শূন্য পরিবর্তন হচ্ছে, কাজেই প্রান্তিক ব্যয় শূন্য হবে।



৮.৮ রেখাচিত্র : TC রেখা উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল হলে MC রেখা কেমন হবে

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা সরলরৈখিক হয় না। TC রেখা প্রথমে উৎপাদন-অক্ষের দিকে অবতল হয়ে উপরের দিকে উঠে যায়, পরে উত্তল হয়। অবতল অংশের শেষে এবং উত্তল অংশের আরম্ভে থাকে বাঁক বদলের বিন্দু বা Point of inflection. আমরা জানি TC রেখার অবতল অংশে মোট ব্যয় কম হারে বাড়ে, অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় কমে। অর্থাৎ TC রেখার অবতল অংশের নীচে যদি MC রেখা অংকন করা যায়, তাহলে MC রেখা নিম্নমুখী হবে। TC রেখার উত্তল অংশে মোট ব্যয় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ MC বৃদ্ধি পায়। তাহলে TC রেখার

উত্তল অংশের নীচে যদি MC রেখা অঙ্কন করা হয়, তাহলে MC রেখাটি উর্ধ্বমুখী হবে। যেখানে অবতল অংশের শেষ ও উত্তল অংশের শুরু, সেখানে প্রান্তিক ব্যয় সবচেয়ে কম। অর্থাৎ **বাঁক বদলের বিন্দুর নীচে MC রেখার নিম্নতম বিন্দু থাকবে।** আমাদের ৮.৯নং রেখাচিত্রের TC হল মোট ব্যয় রেখা এবং MC হল প্রান্তিক ব্যয়রেখা। A হল বাঁক বদলের বিন্দু। A বিন্দুর নীচে MC রেখার নিম্নতম বিন্দু B রয়েছে। আবার, A বিন্দুর বাম দিকে TC রেখাটি অবতল হয়েছে, কাজেই তার নীচে MC রেখা নিম্নমুখী হয়েছে। A বিন্দুর ডানদিকে TC রেখা উত্তল, কাজেই তার নীচে MC রেখা উর্ধ্বমুখী হয়েছে। তাহলে MC রেখাও প্রথমে নিম্নমুখী এবং পরে উর্ধ্বমুখী হয়। অর্থাৎ **MC রেখাও গড় ব্যয়রেখার মত U-আকৃতি-বিশিষ্ট হয়।**



৮.৯ রেখাচিত্র : মোট ব্যয়রেখা থেকে কীভাবে প্রান্তিক ব্যয়রেখা অঙ্কন করা যায়

স্বল্পকালে প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে স্থির ব্যয় থাকে না। কাজেই **প্রান্তিক** ব্যয়রেখার আকৃতি ব্যাখ্যা করতে হলে আমাদের পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে হবে। আমরা জানি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে স্বল্পকালে ফার্ম কতকগুলি ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা পায়, যাদের ফলে উৎপাদন যে হারে বাড়ে, মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় তার চেয়ে কম হারে বাড়ে, কাজেই প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় কমে। কাজেই **উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধার জন্যই প্রান্তিক ব্যয়রেখা নিম্নমুখী হয়।** এই সুবিধা যত পাওয়া যাবে প্রান্তিক ব্যয়রেখাও তত নিম্নমুখী হবে। তারপর **উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকলে ব্যয়-বাহুল্যের অসুবিধা দেখা দেয় যার জন্য প্রান্তিক ব্যয়রেখা উর্ধ্বমুখী হয়।**

৮.৮. ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক :

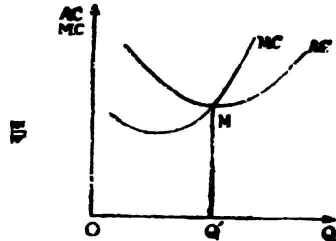
এখানে আমরা তিন প্রকার সম্পর্কের উল্লেখ করতে পারি—১। যখন গড় ব্যয় বা AC কমে, তখন প্রান্তিক ব্যয় বা MC কমে এবং বেশি হারে কমে। যার ফলে গড় ব্যয়রেখা বা AC রেখা যখন নিম্নমুখী হয়, তখন প্রান্তিক ব্যয়রেখা বা MC রেখাও নিম্নমুখী হয় এবং MC রেখা AC রেখার নীচে থাকে।

২। যখন AC বাড়ে, তখন MC বাড়ে এবং বেশি হারে বাড়ে। অর্থাৎ যখন AC রেখা উর্ধ্বমুখী হয়, তখন MC রেখাও উর্ধ্বমুখী হয় এবং MC রেখা AC রেখার উপরে থাকে।

৩। যখন AC সবচেয়ে কম হয়, তখন AC ও MC পরস্পর সমান হয়। অর্থাৎ

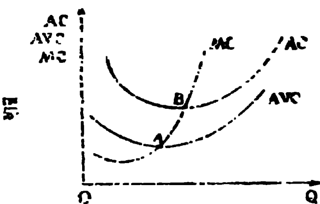
AC রেখার নিম্নতম বিন্দুতে MC রেখা AC রেখাকে ছেদ করে। ৮.১০ নং রেখাচিত্রের সাহায্যে এই সম্পর্কগুলি দেখানো হল। এখানে AC হল গড় ব্যয়রেখা এবং MC হল প্রান্তিক ব্যয়রেখা।

এই রেখাচিত্রে M হল AC রেখার নিম্নতম বিন্দু। M বিন্দুর বামদিকে AC রেখা নিম্নমুখী। অর্থাৎ গড় ব্যয় কমছে। কাজেই M বিন্দুর বামদিকে MC রেখাও নিম্নমুখী হয়েছে, অর্থাৎ MC কমছে। কিন্তু MC বেশি হারে কমে বলে M বিন্দুর বামদিকে MC রেখা AC রেখার নীচে থাকে। M বিন্দুর ডানদিকে AC রেখা ঊর্ধ্বমুখী। ফলে MC রেখাও ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। AC বাড়লে MC বেশি হারে বাড়ে বলে M বিন্দুর ডানদিকে MC রেখা AC রেখার উপরে থাকে। M বিন্দুতে MC রেখা ও AC রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। এখানে MC ও AC সমান। আমাদের রেখাচিত্রে উৎপাদন যখন OQ′ তখন গড় ব্যয় = MQ′ অর্থাৎ OQ′ পরিমাণ উৎপাদনের জন্য গড় ব্যয় সর্বনিম্ন। আবার M বিন্দুটি MC রেখার উপরেও আছে। কাজেই এখানে উৎপাদন যখন OQ′ তখন প্রান্তিক ব্যয়ও MQ′. অর্থাৎ উৎপাদন OQ′ হলে AC = MC = MQ′ হবে।



৮.১০ রেখাচিত্র : গড় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখার সম্পর্ক

MC রেখা AC রেখার নিম্নতম বিন্দু দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, MC রেখা AVC রেখার নিম্নতম বিন্দু দিয়েও যায়। অর্থাৎ MC রেখা AVC রেখা ও AC রেখাকে তাদের নিম্নতম বিন্দু ছেদ করে উপরের দিকে উঠে যায়। পাশের রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল। এখানে MC রেখা AVC রেখাকে তার নিম্নতম বিন্দু A-তে ছেদ করেছে এবং AC রেখাকে তার নিম্নতম বিন্দু Bতে ছেদ করেছে।



৮.১১ রেখাচিত্র : গড় ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক

৮.৯ গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের পার্থক্য :

গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যায়।

(১) গড় ব্যয় হল মোট ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাণের অনুপাত, প্রান্তিক ব্যয় হল অতিরিক্ত এক একক পরিমাণ উৎপাদনের অতিরিক্ত ব্যয়।

(২) কোন নির্দিষ্ট সময়ে ফার্ম যত একক দ্রব্য উৎপাদন করে তাদের গড় ব্যয় হল প্রত্যেক একক দ্রব্যের ব্যয়ের গড়পড়তা হিসাব। যেমন ফার্মের মোট উৎপাদন

১০ একক এবং উৎপাদন ব্যয় ১০০ টাকা হলে প্রতি এককের গড় ব্যয় হয় ১০ টাকা। এই ১০ টাকা হল প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি প্রতি এককের ব্যয়ের গড় হিসাব। কিন্তু প্রান্তিক ব্যয় হল শেষতম একক উৎপাদনের ব্যয়।

(৩) স্বল্পকালে গড় ব্যয়ের মধ্যে ফার্মের স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়—উভয় প্রকার ব্যয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে কিন্তু প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে স্থির ব্যয় থাকে না, কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় থাকে। দীর্ঘকালে গড়ব্যয়ের মধ্যেও স্থির ব্যয় থাকে না।

(৪) প্রান্তিক ব্যয় বলতে যদি মোট ব্যয়ের পরিবর্তন ধরা হয়, তাহলে মোট ব্যয় স্থির থাকলে প্রান্তিক ব্যয় শূন্য হতে পারে। এমনকি, উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যদি মোট ব্যয় হ্রাস পায়, তাহলে প্রান্তিক ব্যয় ঋণাত্মক হতে পারে। কিন্তু গড়ব্যয় কখনই শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে না।

(৫) রেখাচিত্রগত ভাবে বলা যায় যে, AC রেখার নিম্নতম বিন্দুতে MC রেখা AC রেখাকে ছেদ করে। সেই ছেদ বিন্দুর বাম দিকের অংশে AC রেখা নিম্নমুখী হলেও MC রেখা উর্ধমুখী হয়। এর থেকে বলা যায় যে, MC বৃদ্ধি পেলেও AC সাময়িকভাবে হ্রাস পেতে পারে।

৮.১০. ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার আকৃতি :

দীর্ঘকাল বলতে এমন একটি সময় সীমাকে বোঝায়, যার মধ্যে ফার্ম তার সব উপাদানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারে। স্বল্পকালে কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে, কারণ সেইসব উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে যে সময়ের প্রয়োজন হয় স্বল্পকালে সেই সময় পাওয়া যায় না। কিন্তু দীর্ঘকালে সময়ের সেই বাধা দূর হয়ে যায়। কাজেই দীর্ঘকালে ফার্ম সব উপাদানের পরিমাণ বাড়াতে বা কমাতে পারে। দীর্ঘকালে সব উপাদানই কমবেশি পরিবর্তনশীল উপাদান। স্বল্পকালে ফার্মের আয়তন স্থির থাকে। কারখানার বাড়ী, অফিস ঘর, স্থায়ী যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি বাস্তব মূলধন নিয়ে ফার্মের আয়তন গড়ে ওঠে। স্বল্পকালে এই আয়তনের কোন পরিবর্তন করা যায় না। এই অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে ফার্মকে কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি ক'রে তা করতে হয়। এইভাবে কতকগুলি উপাদানকে স্থির রেখে কয়েকটির পরিমাণ বাড়িয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল উপাদান অনুপাতের জন্য পরিণামে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি কার্যকরী হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে উৎপাদন যে হারে বাড়ে, ব্যয় তার চেয়ে কম হারে বাড়ে, অর্থাৎ গড় ব্যয় কমে এবং তারপর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন যে হারে বাড়ে তার চেয়ে মোট ব্যয় বেশি হারে বাড়ে অর্থাৎ গড় ব্যয় বাড়ে। এইভাবে ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখা প্রথমে নিম্নমুখী ও পরে উর্ধমুখী হয়। অন্যভাবে বলা যায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা স্বল্পকালে ফার্মের গড় ব্যয়রেখা ইংরেজি U অক্ষরের মত হয়।

দীর্ঘকালে ফার্ম তার আয়তনের পরিবর্তন করতে পারে। কিন্তু এই পরিবর্তনও

সব সময় সমানভাবে করা যায় না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কতকগুলি অবিভাজ্য উপাদান থাকে, যাদের পরিমাণের পরিবর্তন করা দীর্ঘকালেও সহজসাধ্য নয়। এই অবিভাজ্য উপাদানগুলির জন্য দীর্ঘকালেও গড় ব্যয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে কমতে পারে এবং পরে বাড়তে পারে। তার ফলে ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (Long Run Average Cost or LRAC) রেখা প্রথমে নিম্নমুখী ও পরে উর্ধমুখী হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার আকৃতি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার মত U আকারবিশিষ্ট হলেও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের হয়। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার U আকৃতি স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার মত এত তীব্র হয় না।

দীর্ঘকালে যেমন কোন একটি ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি পেতে পারে, তেমনি অন্যান্য ফার্মের আয়তনও বৃদ্ধি পেতে পারে। একই দ্রব্য প্রস্তুতকারী সকল ফার্ম নিয়ে গড়ে ওঠে একটি শিল্প। দীর্ঘকালে সমগ্র শিল্পের প্রসার ঘটে। এর ফলে শিল্পের অন্তর্ভুক্ত সব ফার্মই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কতগুলি ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা পেয়ে থাকে। এই সুবিধাগুলো শিল্পের বৃদ্ধির ফলে হয় বলে শিল্পের কাছে এই সুবিধাগুলো হল আভ্যন্তর ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা (Internal economies of scale), কিন্তু কোন একটি ফার্মের কাছে এই সুবিধাগুলো হল বাহ্যিক সুবিধা (External economies)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সমগ্র শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে কাঁচামাল, অন্যান্য উপকরণ প্রভৃতির চাহিদা বাড়ে, তাতে পাইকারী হারে দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা বা দাম হ্রাসের সুবিধা পাওয়া যায়। অর্থাৎ শিল্পের মধ্যে সব ফার্ম সস্তায় কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণ পেতে পারে।

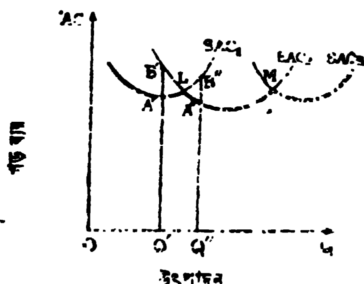
অনুরূপভাবে দীর্ঘদিন ধরে একস্থানে শিল্প, কলকারখানা গড়ে উঠলে শিল্প-শ্রমিকেরা সেখানে বসতি স্থাপন করে। ফলে কম মজুরীতে দক্ষ শ্রমিকের যোগান পাওয়া যায়। এইভাবে দীর্ঘকালে সব উপাদানের দাম কমতে থাকে। তাছাড়া পরিবহণ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতি হয়। দ্রব্যের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য গবেষণা করা হয়। নতুন উৎপাদন পদ্ধতি চালু করা যায়, যাতে গড় উৎপাদন কমে। এইসব বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধার জন্য কোন একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা নীচের দিকে নেমে যায়।

দীর্ঘকালে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে অনন্তকাল ধরে সুবিধা পাওয়া যায় না। একটা সময় আসে যখন বাহ্যিক সুবিধাগুলো বাহ্যিক অসুবিধায় পরিণত হয়। এর ফলে কোন একটি ফার্মের গড় ব্যয়রেখা উপরের দিকে উঠতে থাকে।

তাহলে আমরা পেলাম—দীর্ঘকালে কোন একটি ফার্মের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রথম দিকে নানারূপ বাহ্যিক ব্যয়সংক্ষেপের সুবিধা দেখা দেয়, ফলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় কমে, আবার উৎপাদন বৃদ্ধির একটা নির্দিষ্ট স্তরের পর ফার্মের কাছে কতকগুলি বাহ্যিক ব্যয়বাহুল্যের অসুবিধা দেখা দেয়, যাদের জন্য ফার্মের গড় ব্যয় বাড়ে এবং এইভাবে ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা U আকৃতিবিশিষ্ট হয়। এখন আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি ব্যাখ্যা করতে পারি।

কোন দীর্ঘকালকে কয়েকটি স্বল্পকালের সমষ্টি হিসেবে দেখা যায়। যেমন, এক বছরকে যদি দীর্ঘকাল বলি এবং এক মাসকে স্বল্পকাল বলি তাহলে একটি দীর্ঘকাল হবে বারোটি স্বল্পকালের সমষ্টি। আবার তিনমাসকে যদি স্বল্পকাল বলা হয়, তাহলে একটি দীর্ঘকালের মধ্যে চারটি স্বল্পকাল থাকবে।

তবে স্বল্পকাল বা দীর্ঘকালের এমন কোন পাঞ্জিকাগত সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তবু আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি একটি দীর্ঘকালের মধ্যে তিনটি স্বল্পকাল আছে। এক একটি স্বল্পকালে ফার্মের আয়তন স্থির থাকে; কাজেই এক একটি স্বল্পকালের জন্য এক একটি U আকৃতিবিশিষ্ট গড় ব্যয়রেখা থাকবে। এখানে SAC_1, SAC_2, ও SAC_3 হল যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্বল্পকালের গড় ব্যয়রেখা। এদের নিয়ে ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা গড়ে উঠবে। যে রেখা ধরে উৎপাদন করলে ফার্মের গড় ব্যয় কম হবে, ফার্ম সেই গড় ব্যয়রেখা ধরে বা সেই মাত্রায় উৎপাদন করবে। যেমন, ফার্ম যদি OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহলে প্রথম মাত্রায় (SAC_1 রেখা ধরে) উৎপাদনের [illegible] হবে A'Q'; কিন্তু দ্বিতীয় মাত্রায় [illegible] রেখা ধরে) উৎপাদন করলে [illegible] হবে B'Q. এখানে A'Q' কম ও B'Q' বেশি। অতএব ফার্ম OQ' পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য প্রথম মাত্রা [illegible] রেখা ধরে উৎপাদন করবে। [illegible] OQ'' পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করলে প্রথম মাত্রায় গড় ব্যয় হবে B''Q'', কিন্তু দ্বিতীয় মাত্রায় গড় ব্যয় হবে A''Q''. এখানে A''Q'' কম ও B''Q'' বেশি; অতএব OQ'' পরিমাণ

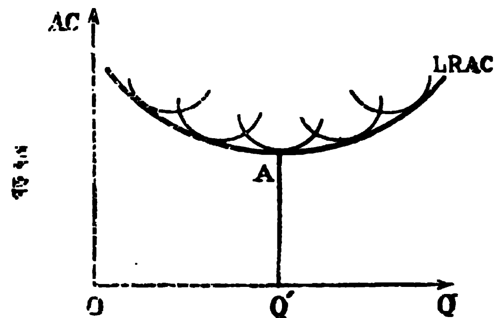


৮.১১ রেখাচিত্র : দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা

দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে ফার্ম দ্বিতীয় মাত্রাটি ধরে বা SAC_2 রেখা ধরে উৎপাদন করবে। তাহলে L বিন্দু পর্যন্ত প্রথম মাত্রায় উৎপাদন করলে ফার্মের গড় ব্যয় কম হবে। L বিন্দু থেকে M বিন্দু পর্যন্ত দ্বিতীয় মাত্রায় উৎপাদন করলে গড় ব্যয় কম হবে। M বিন্দুর পর ডানদিকে তৃতীয় মাত্রায় উৎপাদন করলে গড় ব্যয় কম হবে।

তাহলে ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার উপর দুটি কৌণিক বিন্দু যথা, L ও M থাকবে। বাকি রেখাটি হবে উপরের রেখাচিত্রে স্থূলাক্ষরে অঙ্কিত রেখার মত। এখানে দীর্ঘকালকে তিনটি স্বল্পকালের সমষ্টি বলে ধরা হয়েছে। সেইজন্য দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার উপর দুটি কৌণিক বিন্দুর সৃষ্টি হয়েছে। যদি চারটি স্বল্পকাল ধরা হত, তাহলে তিনটি কৌণিক বিন্দুর সৃষ্টি হত। পাঁচটি ধরলে চারটি কৌণিক বিন্দু, ছয়টি ধরলে পাঁচটি, সাতটি ধরলে ছয়টি—এমনি করে যদি ধরা হত যে, দীর্ঘকালের মধ্যে n সংখ্যক স্বল্পকাল আছে তাহলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখায় n-1টি কৌণিক বিন্দুর সৃষ্টি হত। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা যায় যে, যত বেশি,

কৌণিক বিন্দু থাকবে ততই বিন্দুগুলি ঘন হয়ে আসবে। অবশেষে n যদি খুব বেশি অর্থাৎ অসংখ্য হয়, তাহলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখাটি একটি মসৃণ রেখায় পরিণত হবে। এই রেখাটির প্রত্যেকটি বিন্দুতে একটি মাত্রা অর্থাৎ একটি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার বিন্দু থাকবে। এখানে অসংখ্য মাত্রা, কাজেই অসংখ্য SAC রেখা থাকবে এবং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা LRAC প্রত্যেকটি SAC রেখার সঙ্গে স্পর্শক হবে। এইরূপ রেখাকে এনভেলোপ বা বাহিঃস্পর্শক (envelope) বলা হয়। অতএব দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা হবে অসংখ্য স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার নিম্নস্থ বাহিঃস্পর্শক। আমাদের ৮·১৩ নং রেখাচিত্রে LRAC রেখাটি হল এইরূপ একটি দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা। এই রেখার উপর অঙ্কিত ছোট ছোট রেখাগুলি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখা।



৮·১৩ রেখাচিত্র : অবিচ্ছিন্ন মাত্রা পরিবর্তন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা

অতএব দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার আকৃতি স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার মত U আকৃতিবিশিষ্ট হবে, তবে এই U আকৃতি কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের হবে।

আমাদের ৮·১২নং রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে SAC_1 রেখা থেকে SAC_2 রেখা আরো নীচে আছে এবং SAC_3 রেখা SAC_2 রেখার তুলনায় উপরে আছে। দীর্ঘকালীন বাহ্যিক ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধার জন্য SAC_2 নীচের দিকে নেমেছে এবং দীর্ঘকালীন বাহ্যিক অসুবিধার জন্য SAC_3 উপরে উঠে গেছে। ৮·১৩নং রেখাচিত্রে LRAC রেখার উপর A হল নিম্নতম বিন্দু। অর্থাৎ ফার্ম যদি OQ′ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তাহলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় সবচেয়ে কম হবে। A বিন্দুর বামদিকে LRAC রেখা নিম্নমুখী এবং ডানদিকে ঊর্ধ্বমুখী। A বিন্দুর বামদিকে বাহ্যিক ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা (External economies) থাকায় স্বল্পকালীন রেখাগুলি নীচের দিকে নেমে আসে বলে A বিন্দুর বামদিকে LRAC রেখাটি নিম্নমুখী হয়। বিপরীতভাবে A বিন্দুর ডানদিকে বাহ্যিক ব্যয়বাহুল্যের অসুবিধা (External diseconomies) থাকায় স্বল্পকালীন রেখাগুলি উপরের দিকে উঠে যায় এবং LRAC রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হয়। এইভাবে LRAC রেখা U-আকৃতিবিশিষ্ট হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, বাহ্যিক সুবিধাগুলি ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখা-

গুলিকে নীচের দিকে নামিয়ে আনে এবং বাহ্যিক অসুবিধাগুলি ওদের উপরের দিকে তুলে দেয়। এখন সুবিধা ও অসুবিধা যদি একই সঙ্গে ঘটে এবং—

(ক) বাহ্যিক সুবিধাগুলি যদি অসুবিধাগুলির চেয়ে বেশি হয়, তাহলে স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখাগুলি যতটা নীচের দিকে নামবে তার চেয়ে কম উপরের দিকে উঠবে, ফলে LRAC নিম্নমুখী হবে।

(খ) বাহ্যিক সুবিধাগুলি যদি অসুবিধাগুলির সমান হয় তাহলে স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখাগুলি সুবিধার জন্য যতটা নীচের দিকে নামবে, সমান অসুবিধার জন্য ঠিক ততটা উপরের দিকে উঠে যাবে, ফলে LRAC রেখা হবে সমান্তরাল সরলরেখা এবং

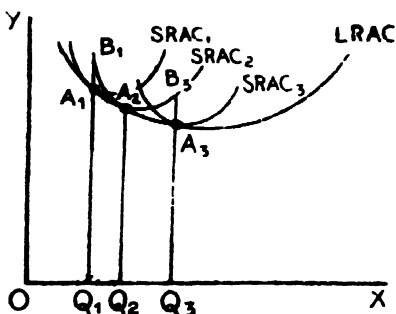
(গ) সুবিধাগুলির চেয়ে যদি অসুবিধাগুলি বেশি হয় তাহলে LRAC ঊর্ধ্বমুখী হবে।

৮.১১ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের সম্পর্ক :

ফার্ম যে কারখানায় উৎপাদন করে সেই কারখানার মাপ বা আয়তন (Plant-size) স্বল্পকালে স্থির থাকে। দীর্ঘকালে ফার্ম তার আয়তনের প্রয়োজন মত পরিবর্তন করতে পারে।

এর ফলে যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় অপেক্ষা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় কম হয়। প্রদত্ত ৮.১৪ রেখাচিত্রে এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে। এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে ফার্মের উৎপাদন এবং OY-অক্ষে গড় ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে LRAC নামক রেখাটি হল দীর্ঘকালীন গড়ব্যয় রেখা এবং $SRAC_1$, $SRAC_2$, $SRAC_3$ হল তিনটি পৃথক মাপের আয়তনের জন্য তিনটি স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা। স্বল্পকালে ফার্ম এই তিনটি রেখার মধ্যে যে-কোন একটি রেখা ধরে উৎপাদন করে।

ফার্ম স্বল্পকালে এক রেখা থেকে অন্যরেখায় সরে যেতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘকালে ফার্ম তার উৎপাদনের পরিমাণ অনুসারে তার কারখানার আয়তনের পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে তার গড় ব্যয় হ্রাস পায়। এইভাবে দীর্ঘকালে গড় ব্যয় স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের চেয়ে কম হয়। প্রদত্ত ৮.১৪ রেখাচিত্রের প্রসঙ্গ ধরে বলা যায় যে স্বল্পকালে ফার্মের আয়তন $SRAC_2$ রেখা দ্বারা সূচিত হলে এবং ফার্ম Q_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে চাইলে ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় হবে Q_1B_1. কিন্তু দীর্ঘকালীন মেয়াদে ফার্ম Q_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য $SRAC_1$ নামক ব্যয় রেখা ধরে উৎপাদন করতে পারবে।



৮.১৪ : রেখাচিত্র

$SRAC_1$ রেখায় Q_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ফার্মের গড় ব্যয় হবে $Q_1A_1 < Q_2B_2$. এখানে Q_1A_1-কে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় বলা যেতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে Q_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় (Q_1B_1) অপেক্ষা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (Q_1A_1) কম।

৮.১৪ রেখাচিত্র থেকে দেখা যায় যে Q_2 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় উভয়েই Q_2A_2 হয়। এখানে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের চেয়ে কম না হলেও বেশি নয়। এর থেকে বলা যায় যে **দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের সমান কিংবা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের চেয়ে কম হতে পারে ; কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় কখনই স্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের চেয়ে বেশি হতে পারে না।**

অনুরূপভাবে, Q_3 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা হবে $SRAC_2$ এবং স্বল্পকালীন গড় ব্যয় হবে Q_3B_3. কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে ফার্ম Q_3 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য এমন একটি কারখানা বসাবে যাতে তার গড় ব্যয় সবচেয়ে কম হয়। এইরূপ নতুন কারখানার জন্য ফার্মের নতুন গড় ব্যয় রেখা হবে $SRAC_3$ নামক রেখাটি। এই রেখায় Q_3 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য গড় ব্যয় হবে $Q_3A_3 < Q_3B_3$। এর থেকেও বোঝা যায় যে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় অপেক্ষা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় কম হয়। অতএব, যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য—

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় $<$ স্বল্পকালীন গড় ব্যয়।

৮.১২. দীর্ঘকালীন মাত্রা পরিবর্তনের প্রতিদানের নিয়ম (Laws of Returns to Scale) :

দীর্ঘকালে ফার্ম তার মাত্রার পরিবর্তন করতে পারে। **ফার্মের মাত্রার পরিবর্তন বলতে সব উপাদানের পরিমাণের পরিবর্তন বোঝায়।** যদি শ্রম (L) ও মূলধন (K) নামক দুটি মাত্র উপাদানের কথা ধরা হয়, তাহলে ফার্মের উৎপাদন অপেক্ষকটি হবে।

$$P = f(L, K)$$

দীর্ঘকালে ফার্ম যদি তার মাত্রা দ্বিগুণ করে, তাহলে বুঝতে হবে শ্রমিকের সংখ্যা L থেকে বেড়ে 2L হয়েছে এবং মূলধনের পরিমাণও K থেকে বেড়ে 2K হয়েছে। অতএব মাত্রার দ্বিগুণ বৃদ্ধি বলতে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ দ্বিগুণ করা বোঝায়। মাত্রার n-গুণ বৃদ্ধি হলে শ্রমের নিয়োগ হবে nL ও মূলধনের বিনিয়োগ হবে nK। অতএব **ফার্ম যতগুলি উপাদান নিয়োগ করে তাদের সকলের পরিমাণ একই সঙ্গে সমান হারে যতগুণ বৃদ্ধি পাবে ফার্মের মাত্রাও ততগুণ বৃদ্ধি পাবে।**

অনুরূপভাবে সকল উপাদানের পরিমাণ একই সঙ্গে একই হারে হ্রাস পেলে

ফার্মের মাত্রাও সেই হারে হ্রাস পাবে। এইভাবে দীর্ঘকালে ফার্ম তার সব উপাদানের পরিমাণ একসঙ্গে সমান হারে বাড়িয়ে বা কমিয়ে তার উৎপাদনের মাত্রার পরিবর্তন করতে পারে। এখন প্রশ্ন হল—এইরূপভাবে মাত্রার পরিবর্তন করে কী প্রতিদান পাওয়া যায়? প্রতিদান বলতে উৎপাদনের পরিবর্তন বোঝায়। এখানে আমরা সহজেই বলতে পারি—

ফার্মের মাত্রা বাড়লে উৎপাদন বাড়বে এবং মাত্রা কমলে উৎপাদন কমবে। অর্থাৎ ফার্মের মাত্রার পরিবর্তন ও সেই পরিবর্তন থেকে প্রাপ্ত প্রতিদান একই দিকে পরিবর্তিত হয়। মাত্রার হ্রাসবৃদ্ধি হলে প্রতিদানেরও হ্রাসবৃদ্ধি হবে। কিন্তু মাত্রার পরিবর্তন যে হারে হবে, প্রতিদানের পরিবর্তনও কি সেই হারে হবে? এখানে তিন প্রকার সম্ভাবনার কথা বলা যায়:

১। প্রথমত, ফার্মের মাত্রা যে হারে বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পায়, ফার্মের উৎপাদনও সেই হারে বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পেতে পারে। একে মাত্রা-পরিবর্তনের সমহার প্রতিদানের নিয়ম (Law of Constant Returns to Scale or CRS) বলা হয়। এক্ষেত্রে ফার্মের মাত্রা যদি দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনও দ্বিগুণ হয়। ফার্মের মাত্রা যদি তিনগুণ বাড়ে তাহলে উৎপাদনও তিনগুণ বাড়ে ইত্যাদি।

২। দ্বিতীয়ত, ফার্মের মাত্রা যে হারে বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পায়—উৎপাদন তার চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পেতে পারে। একে মাত্রা বৃদ্ধির ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Diminishing Returns to Scale or DRS) বলা হয়। এখানে মাত্রা দ্বিগুণ হলে, উৎপাদনের পরিমাণ দ্বিগুণের চেয়ে কম বাড়বে। মাত্রা যদি তিনগুণ হয়, তাহলে উৎপাদনের পরিমাণ তিনগুণের চেয়ে কম বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি।

৩। তৃতীয়ত, ফার্মের মাত্রা যে হারে বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পায়, উৎপাদন তার চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি (বা হ্রাস) পেতে পারে। একে মাত্রাবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম (Law of Increasing Returns to Scale or IRS) বলা হয়। এক্ষেত্রে ফার্মের মাত্রা যদি দ্বিগুণ হয়, উৎপাদন দ্বিগুণের চেয়ে বেশি বাড়ে। মাত্রা যদি তিনগুণ হয়, উৎপাদন তিনগুণের চেয়ে বেশি বাড়ে ইত্যাদি।

৮.১৩. ফার্মের মাত্রা পরিবর্তনের সমহার প্রতিদানের নিয়ম (The Law of Constant Returns to Scale):

দীর্ঘকালে ফার্মের মাত্রা যে হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তার উৎপাদনের পরিমাণও যদি সেই হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়, তাহলে আমরা বলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হয়েছে। ধরি ফার্ম শ্রম (L) ও মূলধন (K) নামক দুটি উপাদান ব্যবহার করে। তাহলে ফার্মের উৎপাদন অপেক্ষকটি হবে।

$$P = f(L, K)$$

এখন ধরি ফার্ম তার মাত্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছে। তাহলে বুঝতে হবে ফার্ম

এখন দ্বিগুণ সংখ্যক শ্রমিক ও দ্বিগুণ পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করেছে এবং সমহার প্রতিদানের নিয়ম অনুসারে ফার্মের মাত্রা দ্বিগুণ হলে উৎপাদনও দ্বিগুণ হবে। অর্থাৎ আগে শ্রম = L, মূলধন = K এবং উৎপাদন = P ছিল; এখন ফার্মের মাত্রা দ্বিগুণ হয়েছে, অর্থাৎ শ্রমের নিয়োগ ও মূলধনের বিনিয়োগ দ্বিগুণ হয়েছে। কাজেই এখন শ্রম = 2L, মূলধন = 2K এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হলে উৎপাদন = 2P হবে। অতএব আমরা পাই—সমহার প্রতিদানের নিয়মে

$$P = f(L, K),$$
$$2P = f(2L, 2K),$$
$$3P = f(3L, 3K),$$
$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$
$$nP = f(nL, nK) \text{ হবে।}$$

যদি জমি (T), শ্রম (L) ও মূলধন (K) এই তিনটি উৎপাদনের উপাদান থাকে তাহলে উৎপাদন অপেক্ষকটি হবে $P = f(T, L, K)$, এখানে ফার্মের মাত্রা বৃদ্ধি হলে তিনটি উপাদানের পরিমাণ একসঙ্গে একই হারে বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদনও সেই হারে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ

$$P = f(T, L, K),$$
$$2P = f(2T, 2L, 2K),$$
$$3P = f(3T, 3L, 3K) \text{ ইত্যাদি হবে।}$$

এখন আমরা যদি অনেক উপাদানের কথা ধরি তাহলে একই ব্যাপার ঘটবে। ধরি $f_1, f_2, f_3, \cdots f_k$ হল k সংখ্যক উপাদান বা factors তাহলে ফার্মের উৎপাদন অপেক্ষকটি হবে—

$$P = g(f_1, f_2, f_3, \cdots f_k)$$

এবং সমহার প্রতিদানের নিয়ম অনুসারে

$$nP = g(nf_1, nf_2, nf_3 \cdots nf_k).$$

অতএব সমহার প্রতিদানের নিয়ম অনুসারে ফার্মের সব উপাদানের পরিমাণ যে পরিমাণে বাড়ে বা কমে ফার্মের উৎপাদনও সেই পরিমাণে বাড়বে বা কমবে।

৮.১৪. সমহার প্রতিদানের নিয়ম ও ফার্মের ব্যয়:

(ক) সমহার প্রতিদানের নিয়ম ও ফার্মের মোট ব্যয়

ফার্মের মাত্রা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যদি সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হয়, তাহলে সব উপাদানের পরিমাণ যতগুণ বাড়ে, ফার্মের উৎপাদনও ততগুণ বাড়ে। এই সম্পর্ক থেকে আমরা ফার্মের উৎপাদন ও মোট ব্যয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারি। আমরা যদি ধরে নিই যে, ফার্ম শ্রম ও মূলধন নামক দুটি মাত্র উপাদান নিয়োগ করে এবং শ্রমের দাম অর্থাৎ মজুরীর হার ও মূলধনের সেবার দাম অর্থাৎ সুদের হার সমান

থাকে, তাহলে সমহার প্রতিদানের ক্ষেত্রে ফার্মের উৎপাদন ও মোট ব্যয় সমানহারে বৃদ্ধি পায়।

নীচের তালিকায় এটি দেখানো হল :

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
উৎপাদন	শ্রম	মজুরী	শ্রমের জন্য ব্যয়	মূলধন	সুদের হার	মূলধনের জন্য ব্যয়	ফার্মের মোট ব্যয় (৪ + ৭)
১ একক	১ জন	১০ টাকা	১০ টাকা	১ একক	৫ টাকা	৫ টাকা	১৫ টাকা
২ ”	২ ”	১০ ”	২০ ”	২ ”	৫ ”	১০ ”	৩০ ”
৩ ”	৩ ”	১০ ”	৩০ ”	৩ ”	৫ ”	১৫ ”	৪৫ ”
৪ ”	৪ ”	১০ ”	৪০ ”	৪ ”	৫ ”	২০ ”	৬০ ”
৫ ”	৫ ”	১০ ”	৫০ ”	৫ ”	৫ ”	২৫ ”	৭৫ ”
৬ ”	৬ ”	১০ ”	৬০ ”	৬ ”	৫ ”	৩০ ”	৯০ ”
৭ ”	৭ ”	১০ ”	৭০ ”	৭ ”	৫ ”	৩৫ ”	১০৫ ”
৮ ”	৮ ”	১০ ”	৮০ ”	৮ ”	৫ ”	৪০ ”	১২০ ”
৯ ”	৯ ”	১০ ”	৯০ ”	৯ ”	৫ ”	৪৫ ”	১৩৫ ”
১০ ”	১০ ”	১০ ”	১০০ ”	১০ ”	৫ ”	৫০ ”	১৫০ ”

এই তালিকায় দেখানো হয়েছে ফার্ম তার উৎপাদন ১ একক থেকে বাড়িয়ে ২ একক করেছে, ২ একক থেকে বাড়িয়ে ৩ একক, ৩ একক থেকে ৪ একক—এইভাবে ১০ একক পর্যন্ত বাড়িয়েছে। ফার্মের উৎপাদন যেমন যেমন বেড়েছে, শ্রমিকের সংখ্যাও সেই হারে বেড়েছে, এবং মজুরীর হার স্থির থাকায়, শ্রমের জন্য ব্যয়ও (৪নং স্তম্ভে) উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাল রেখে সমান হারে বেড়েছে।

অনুরূপভাবে ৫নং স্তম্ভ থেকে দেখা যাচ্ছে—উৎপাদন যে হারে বাড়ছে—মূলধনের বিনিয়োগও সেই হারে বাড়ছে এবং সুদের হার সমান থাকায়. ৭নং স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে যে, মূলধনের জন্য ফার্মের ব্যয়ও উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে সমান হারে বাড়ছে। এখন ৪নং স্তম্ভ ও ৭নং স্তম্ভের শ্রম ও মূলধনের জন্য ব্যয়কে যোগ করলে আমরা ফার্মের মোট ব্যয় পাই। ৮নং স্তম্ভে আছে মোট ব্যয়। এখানে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন যেমন যেমন বাড়ছে, মোট ব্যয়ও সেই সঙ্গে তাল রেখে সমান হারে বাড়ছে। তাহলে আমরা পাই—সমহার প্রতিদান নিয়মের ক্ষেত্রে উৎপাদন যে হারে বাড়ে ফার্মের মোট ব্যয়ও সেই হারে বাড়ে। বিপরীতক্রমে, ফার্মের উৎপাদন যদি কমে, তাহলে ফার্মের মোট ব্যয়ও সেই একহারে কমে। রেখাচিত্রের তাষায় বলা যায়, সমহার

প্রতিদানের নিয়মের ক্ষেত্রে ফার্মের মোট ব্যয়রেখা রেখাচিত্রের মূলবিন্দু থেকে বেরিয়ে ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা হয়।

(খ) সমহার প্রতিদানের নিয়ম ও ফার্মের গড় ও প্রান্তিক ব্যয়।

সমহার প্রতিদানের নিয়মের ক্ষেত্রে ফার্মের উৎপাদন যে হারে বাড়ে (বা কমে) ফার্মের মোট ব্যয়ও সেই হারে বাড়ে (বা কমে) কাজেই ফার্মের গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়। আমরা একটি তালিকার সাহায্যে এটা দেখাতে পারি।

১	২	৩	৪
উৎপাদন	মোট ব্যয়	গড় ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়
১ একক	১৫ টাকা	১৫টাকা	১৫ টাকা
২ ,,	৩০ ,,	১৫ ,,	১৫ ,,
৩ ,,	৪৫ ,,	১৫ ,,	১৫ ,,
৪ ,,	৬০ ,,	১৫ ,,	১৫ ,,
৫ ,,	৭৫ ,,	১৫ ,,	১৫ ,,

এখানে উৎপাদন যখন ১ একক তখন গড় ব্যয় ১৫ টাকা এবং প্রান্তিক ব্যয় ১৫ টাকা, উৎপাদন যখন ২ একক তখন মোট ব্যয় ৩০ টাকা। কাজেই গড় ব্যয় $= \frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{উৎপাদন}} = \frac{\text{৩০ টাকা}}{\text{২ একক}} =$ ১৫ টাকা প্রতি একক এবং প্রান্তিক ব্যয় (অর্থাৎ মোট ব্যয় বৃদ্ধি) = ১৫ টাকা। এই ভাবে দেখা যায় উৎপাদন যতই হোক না কেন, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় স্থির ও সমান থাকে। অতএব মাত্রাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হলে ফার্মের গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় স্থির থাকে, শুধু তাই নয়, উভয়ে পরস্পর সমান হয়ে যায়।

প্রশ্নাবলী

১। ফার্মের ব্যয় কাকে বলে? আর্থিক ব্যয়, বাস্তব ব্যয় এবং সুযোগ ব্যয়ের পার্থক্য কর।

২। স্থির ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয় কাকে বলে? উদাহরণসহ এদের পার্থক্য কর। এই বিভাজনটি একটি স্বল্পকালীন ব্যাপার—উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৩। ফার্মের স্বল্পকালীন মোট ব্যয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যয় থাকে? স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

৪। গড় ব্যয়, গড় স্থির ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সংজ্ঞা দাও এবং এদের পার্থক্য দেখাও।

৫। স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পার্থক্য কর এবং এই পার্থক্যের ভিত্তিতে ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

৬। স্বল্প ব্যয় কাকে বলে? ফার্মের স্বল্পকালীন মোট ব্যয় রেখা থেকে কীভাবে গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন করা যায়—রেখাচিত্রসহ আলোচনা কর।

৭। ব্যয় সংকোচনের সুবিধা বলতে কী বোঝ? দীর্ঘকালে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে কোন্ কোন্ ব্যয় সংকোচনের সুবিধা পাওয়া যায় আলোচনা কর।

৮। ব্যয় সংকোচনের সুবিধা কাকে বলে? এই সুবিধাগুলি কীভাবে ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতিকে প্রভাবিত করে?

৯। ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

১০। দীর্ঘকাল কাকে বলে? দীর্ঘকালীন ফার্মের গড় ব্যয় রেখার আকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১১। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচনের সুবিধা কাকে বলে? এদের পার্থক্য কর। দীর্ঘকালে কোন্ ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যায়? এই সুবিধাগুলি ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতিকে কীভাবে নির্ধারিত করে?

১২। প্রান্তিক ব্যয় কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যয় থাকে? মোট ব্যয়রেখা থেকে কীভাবে প্রান্তিক ব্যয় রেখা অঙ্কন করা যায় আলোচনা কর।

১৩। গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় কাকে বলে? উদাহরণসহ এদের পার্থক্য কর। মোট ব্যয় রেখা থেকে কীভাবে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা অঙ্কন করা যায়, রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝাও।

১৪। গড় ও প্রান্তিক ব্যয় কাকে বলে? ফার্মের গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় কর।

১৫। দীর্ঘকালীন ব্যয় পরিকল্পনার প্রতিমান বলতে কী বোঝ? চিত্রের সাহায্যে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরিকল্পনার বিষয়টির ব্যাখ্যা কর।

১৬। সুযোগ ব্যয়ের বিষয়টি কী? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। এই বিষয়ে আলোচনা কর।

১৭। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। ফার্মের আর্থিক ব্যয় ও বাস্তব ব্যয় কাকে বলে?
২। স্বল্পকালে গড় ব্যয় রেখার আকৃতি কী কী হতে পারে?
৩। প্রান্তিক ব্যয়ের ধারণা কি ভিন্ন হতে পারে? যুক্তিসহ বোঝাও।
৪। মোট ব্যয় রেখা কখন উৎপাদন-অক্ষের দিকে অবতল হয়, তখন উত্তল হয়?
৫। মোট ব্যয় রেখার উপর কোন বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয় সর্বনিম্ন হয়—ব্যাখ্যা কর।
৬। গড় স্থির ব্যয় রেখার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?
৭। প্রান্তিক ব্যয় রেখা কেন U আকৃতির হয় সংক্ষেপে বল।
৮। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচনের মধ্যে পার্থক্য কর।
৯। ব্যয়-অপেক্ষক কী? রেখাচিত্র দিয়ে বোঝাও।
১০। সুযোগ ব্যয়ের ধারণা বলতে কী বোঝ? উদাহরণ দিয়ে আলোচনা কর।



বাজারের কথা

৯.১ বাজার কাকে বলে ?

সাধারণ কথায় বাজার বলতে একটি স্থানকে বোঝায় যে স্থানে বহুসংখ্যক বিক্রেতা বহুপ্রকার দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য নিয়ে আসে এবং যেখানে অসংখ্য ক্রেতা সেইসব দ্রব্য ক্রয় করে। অর্থনীতিতে বাজারের ধারণা এই সাধারণ বাজার থেকে কিছুটা পৃথক। প্রথমত, এখানে বাজার বলতে বোঝায় একটি মাত্র দ্রব্যের বাজার; যেমন, চালের বাজার, গমের বাজার, কিংবা কাপড়ের বাজার ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, অর্থনীতিতে বাজার হল একটি দ্রব্যের জন্য সকল ক্রেতার চাহিদা ও সকল বিক্রেতার যোগানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন অথবা ক্রেতাদের ও বিক্রেতাদের মধ্যে বিনিময়। ক্রেতারা বাজারে দ্রব্য ক্রয় করার জন্য অর্থ নিয়ে আসে; বিক্রেতারা নিয়ে আসে দ্রব্য। ক্রেতাদের আছে অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যের চাহিদা এবং বিক্রেতাদের আছে দ্রব্যের যোগান ও অর্থের চাহিদা। বাজারে এই উভয় পক্ষের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তৃতীয়ত, বাজার যে সব সময় কোন একটি স্থানের মধ্যে বদ্ধ হবে এমন কোন কথা নেই। বাজার হল একটি পরিবেশ, যে পরিবেশের মধ্যে ক্রেতাদের ও বিক্রেতাদের মধ্যে মিলন ঘটে। অনেক সময় ক্রেতারা বিক্রেতাদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করে এবং এইভাবে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয়। একেও আমরা একটি বাজার বলতে পারি। অতএব অর্থনীতিতে বাজার বলতে বোঝায় একটি পরিবেশ, যে পরিবেশের মধ্যে কোন একটি দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় ঘটে অর্থাৎ যে পরিবেশে একটি দ্রব্যের ক্রেতাদের সঙ্গে সেই দ্রব্যের বিক্রেতাদের বিনিময় ঘটে।

৯.২ বাজারের কাজ :

বাজারের প্রধান কাজ হল দুটি : **প্রথমত, বাজার ক্রেতাদের ও বিক্রেতাদের মধ্যে মিলন ঘটায়।** ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করে ভোগ করতে চায়, বিক্রেতা দ্রব্য উৎপাদন করে বিক্রয় করতে চায়। ক্রেতা অর্থ দেয় এবং বিনিময়ে দ্রব্য পায়। বিক্রেতা দ্রব্য দেয় এবং বিনিময়ে অর্থ পায়। এই অর্থ দিয়ে বিক্রেতা আবার অন্য দ্রব্য ক্রয় করে। তখন বিক্রেতা ক্রেতায় পরিণত হয়। আবার ক্রেতা যে অর্থ নিয়ে বাজারে আসে সেই অর্থ তার আয়ের অংশ। সে সেই আয় পেয়েছে কোন না কোন দ্রব্য বা সেবার যোগান দিয়ে। অতএব এক বাজারের ক্রেতা অন্য কোন বাজারের বিক্রেতা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সকলেই ক্রেতা ও বিক্রেতা। এমনটা কেন হয় ? খুব সংক্ষেপে বলা যায়— কোন মানুষের জীবনধারণের জন্য বহু রকমের দ্রব্য ও সেবার প্রয়োজন। এই দ্রব্য ও সেবার সব কয়টি উৎপাদন করা কোন একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; সম্ভব

হলেও লাভজনক নয়। কাজেই সে একটি বা দুটি বা কয়েকটি মাত্র দ্রব্য বা সেবার যোগান দেয়। তা থেকে সে যে অর্থ পায় তাই দিয়ে অন্য সব দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে নেয়। মার্ক্সের মতে এটা হল **দ্রব্য→অর্থ→দ্রব্য চক্র**। কোন একজন ব্যক্তি দ্রব্য উৎপাদন করে বাজারে নিয়ে যায়, সেখানে সেই দ্রব্য বিক্রয় করে সে অর্থ পায়। সেই অর্থ নিয়ে সে আবার অন্য বাজারে যায়। এবার যায় ক্রেতা হিসেবে এবং সেই অর্থ দিয়ে অন্য দ্রব্য ক্রয় করে। অতএব **দ্রব্য→অর্থ→দ্রব্য চক্রের** বাম বাহুতে ব্যক্তি থাকে বিক্রেতা হিসেবে এবং এর দক্ষিণ বাহুতে ব্যক্তি থাকে ক্রেতা হিসেবে।

এই চক্রের বামদিকে বিক্রয় এবং দক্ষিণদিকে ক্রয়। তাহলে এই চক্রের শরীর হল বাজার। কারণ নিছক ক্রয় বা নিছক বিক্রয় বলে কিছু থাকে না: একজনের বিক্রয় হল অন্যজনের ক্রয় এবং একজনের ক্রয় হল অন্যজনের বিক্রয়। বাজারের কাজ হল ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে মিলন ঘটানো।

অন্যভাবে বলা যায়—**বাজার ভোগ ও উৎপাদনের ব্যবধান দূর করে**। একজন ব্যক্তি দ্রব্য উৎপাদন করে কিন্তু সেই ব্যক্তি সেই দ্রব্যের সবটা ভোগ করে না। আবার যে ভোগ করে সে সেই দ্রব্য উৎপাদন করে না। আমরা লেবু খাই, কিন্তু লেবু উৎপাদন করি না। জেলেরা যে মাছ উৎপাদন করে তার সবটা তারা ভোগ করে না। এখানে ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়। বাজার এই ব্যবধান দূর করে। জেলেরা মাছ উৎপাদন করে বাজারে নিয়ে যায়। ক্রেতারা বাজারে গিয়ে সেই মাছ ক্রয় করে আনে। বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মিলন ঘটে এবং ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবধান দূর হয়।

ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যবধান ছাড়াও সাময়িক ও স্থানগত ব্যবধান থাকতে পারে। যেমন, আখ উৎপাদন হয় বছরের একটি মরশুমে, কিন্তু চিনি সারা বছর ধরে ব্যবহৃত হয়। আলু বছরের একটি সময়ে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সারা বছর ধরে আলু খাওয়া হয়, এইভাবে ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে সময়গত ব্যবধান থাকতে পারে। বাজার সেই ব্যবধান দূর করে। ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে স্থানগত ব্যবধানও থাকতে পারে। আসামে চা হয়, কিন্তু সেই চা সারাদেশে ভোগ করা হয়। বাজারের মাধ্যমে ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে এই স্থানগত পার্থক্য দূর হয়।

বাজারের **দ্বিতীয় কাজ হল**—ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে **বিনিময়ের মাধ্যমে দ্রব্যের দাম বা বিনিময় হার নির্ধারিত করা**। ক্রেতারা যে দামে দ্রব্য ক্রয় করতে চাইবে, বিক্রেতারা সেই দামে যদি দ্রব্যটি বিক্রয় করতে রাজি হয়ে যায় তাহলে বিনিময় ক্রিয়াটি সংঘটিত হয়। ক্রেতাদের অর্থের সঙ্গে বিক্রেতাদের দ্রব্যের বিনিময় হলে বিনিময়ের হারও নির্ধারিত হয়ে যায়। যদি ক্রেতারা যে দাম দিতে চায় সেই দাম বিক্রেতাদের হিসেবে কম হয়, তাহলে বিনিময় হবে না। আবার বিক্রেতারা যে দাম চাইবে, তা যদি ক্রেতাদের কাছে খুব বেশি বলে মনে হয়, তা হলেও বিনিময় হবে না। বিনিময় না হলে দ্রব্যের দামও নির্ধারিত হতে পারে না। বাজার একদিকে ক্রেতার ও বিক্রেতার

মধ্যে বিনিময়কে সম্ভব করে, অপরদিকে বিনিময়ের দ্রব্যদুটির মধ্যে (বা অর্থ ও দ্রব্যের মধ্যে) বিনিময়ের হার নির্ধারিত করে।

১.৩ বাজারের শ্রেণীবিভাগ :

অর্থনীতিতে যে বাজারের কথা বলা হয়, সেই বাজার অনেকটা কাল্পনিক বা আদর্শ বাজার। আদর্শ বাজার হল বাস্তব বাজারের প্রতিচ্ছবি। আসল বাজারকে আলোচনার আয়নায় ফেলে দেখলে যেরকম দেখায়, অর্থনীতির বাজার সেইরকম বাজার। এখন আলোচনার সুবিধার জন্য বাজারের বিভিন্ন অবস্থার কথা ভাবা হয় এবং অবস্থা অনুযায়ী এক এক বাজারের এক এক রকম নাম দেওয়া হয়। বাজার বলতে যেহেতু ক্রয় ও বিক্রয়ের একটি পরিবেশ বোঝায়, কাজেই বাজারের শ্রেণীবিভাগের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হল ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা; কিংবা অন্যভাবে বললে মূল বিষয় হল চাহিদা ও যোগান সম্পর্কিত বিভিন্ন অবস্থা। ক্রয়ের দিকে আছে দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা ও তার দাম-গত স্থিতিস্থাপকতা এবং বিক্রয়ের দিকে আছে দ্রব্যের যোগান ও তার দাম-গত স্থিতিস্থাপকতা। আবার দ্রব্যের যোগান ও তার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে বিক্রেতাদের সংখ্যার উপর। তাহলে আমরা বলতে পারি—যোগানের দিক দিয়ে দেখলে বিক্রেতাদের সংখ্যার সাহায্যে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। বিক্রেতাদের সংখ্যা (ক) বহু (খ) এক অথবা (গ) একাধিক কিন্তু অসংখ্য না হয়ে সীমিত হতে পারে। তদনুযায়ী তিন ধরনের বাজারের উদ্ভব ঘটতে পারে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে বাজার তিন রকমের হতে পারে :

১। **পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার :** এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা খুব বেশি থাকে এবং বিক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্য . ক্রয় করার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়;

২। **একচেটিয়া বাজার :** এই বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে; এখানে প্রতিযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না;

৩। **অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার :** এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বহু নয়, আবার একজনও নয়! এখানে কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা থাকে এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে। এই বাজারে এক একজন বিক্রেতা খুবই ক্ষমতাশালী, বলতে গেলে প্রায় একচেটিয়া কারবারীর মত এবং এখানে সেরকম প্রায় একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকে বলে অনেকে এই বাজারকে একচেটিয়া প্রভাব-মিশ্রিত প্রতিযোগিতামূলক বাজার, বা, সংক্ষেপে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার বলে থাকেন। এই বাজারটি প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের এক মিশ্র-রূপ, কিংবা, একটি মধ্যবর্তী অবস্থা।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রতিযোগিতামূলক ও একচেটিয়া বাজার উভয়েই সীমান্তবর্তী অবস্থা। বিক্রেতার সংখ্যা সম্বন্ধে আমরা যে ধারণা করতে পারি সেই ধারণার দুটি প্রান্ত বা সীমা থাকবে—উর্ধ্বসীমায় বিক্রেতাদের সংখ্যা বহু হতে পারে

এবং একচেটিয়ার বিক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন হতে পারে। এই দুটি বাজারই অবাস্তব বা কাল্পনিক বাজার। আমরা বাস্তবে যেসব বাজার দেখি সেগুলো এই দুয়ের মাঝামাঝি পড়ে। এখানে বিক্রেতাদের সংখ্যা বহুও নয়, আবার একও নয়। এখানে দেখা যায় মাত্র কয়েকজন উৎপাদক বা বিক্রেতা কোন দ্রব্য উৎপাদন বা বিক্রয় করে থাকে। তাই এই বাস্তব বাজারকে আমরা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে পারি।

আবার অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উপবিভাগও করা যায়। এখানে বিক্রেতাদের সংখ্যা যদি দুই হয় তাহলে সেই বাজারকে ডুয়োপলি বলা হয়। তবে বিক্রেতাদের সংখ্যা যদি দুইয়ের বেশি কয়েকজন মাত্র হয় তাহলে সেই বাজারকে অলিগোপলি বলা হয়।

অতএব বাজারকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:

১। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (যেখানে বিক্রেতা অসংখ্য); ২। একচেটিয়া বাজার (যেখানে একজন মাত্র বিক্রেতা); এবং ৩। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (যেখানে মাত্র কয়েকজন বিক্রেতা থাকে)। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মধ্যে পড়ে (ক) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার (খ) ডুয়োপলি এবং (গ) অলিগোপলি (ঘ) অন্যান্য বাজার।

আমাদের পাঠ্যসূচীতে বাজারকে দুটি বড় ভাগে ভাগ করা হয়েছে—যথা, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার ও অপূর্ণাঙ্গ বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের মধ্যেই রাখা হয়েছে একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার, ডুয়োপলি ও অলিগোপলি।

প্রশ্নাবলী

১। বাজার কাকে বলে? বাজারের কাজ কী?

২। বাজার কাকে বলে? বাজার কয়প্রকার হতে পারে আলোচনা কর।

৩। বাজারের শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি কী? এই ভিত্তি অনুসারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ কর।

৪। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

(১) প্রত্যেক ক্রেতাই কি বিক্রেতা? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

(২) দ্রব্য-অর্থ-দ্রব্য চক্রটি বোঝাও।

(৩) "বাজার হল ভোগ ও উৎপাদনের মধ্যে সেতু"—কথাটি ব্যাখ্যা কর।

(৪) অর্থনীতির বাজারকে আদর্শ বাজার বলা হয় কেন?

১০ ফার্মের ভারসাম্য

ভূমিকা—ফার্মের কাজ হল দ্রব্য উৎপাদন করা ও বিক্রয় করা। এখানে দুটো বিষয় ফার্মের বিবেচনার মধ্যে আসে, প্রথম কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে এবং দ্বিতীয় কী দামে সেই দ্রব্যকে বিক্রয় করতে হবে। দ্রব্যের পরিমাণকে যদি Q এবং দ্রব্যের দামকে যদি P বলা হয়, তাহলে ফার্মের বিবেচ্য বিষয় হল দুটি—P এবং Q কোন ফার্ম দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারবে কি না, সেটা নির্ভর করে বাজারের অবস্থার উপর। বাজারে যদি সেই ফার্ম ছাড়া আরও অসংখ্য ফার্ম দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহলে একটি ফার্মের পক্ষে দ্রব্যের দামের উপর প্রভাব বিস্তার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে এবং সেক্ষেত্রে ফার্মের বিবেচ্য বিষয় হবে কেবলমাত্র দ্রব্যের পরিমাণ বা Q. অপরপক্ষে সেই ফার্মটি যদি বাজারে দ্রব্যের একমাত্র যোগানদার হয়, তাহলে ফার্মটি সহজেই দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারবে। সেক্ষেত্রে ফার্মের বিবেচ্য বিষয় হবে দাম ও পরিমাণ উভয়েই। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে—যে বাজারে ফার্মটি দ্রব্য বিক্রয় করে সেই বাজারে আরো বহু ফার্ম দ্রব্য বিক্রয় করে। তাহলে ফার্মের বিবেচ্য বিষয় হবে দ্রব্যের পরিমাণ। এখানে দ্রব্যের দাম হবে নির্ধারিত বিষয়। ফার্মের কাজ হবে নির্ধারিত দামে দ্রব্য বিক্রয় করা এবং সেই বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যের উৎপাদন করা। এক্ষেত্রে দ্রব্যের পরিমাণই হবে ফার্মের একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। ফার্ম কতটা দ্রব্য উৎপাদন করবে—সেটা নির্ভর করছে তার উদ্দেশ্যের উপর। ফার্মের উদ্দেশ্য বহু প্রকার হতে পারে: এই উদ্দেশ্যগুলোকে আমরা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও অনর্থনৈতিক উদ্দেশ্য এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে মুনাফা অর্জন করা। কিন্তু সব ফার্মই যে মুনাফার জন্য উৎপাদন করে এমন বলা যায় না। অনেক প্রতিষ্ঠান আছে বা থাকতে পারে যাদের উদ্দেশ্য হল মানুষের মঙ্গলসাধন করা। এই মঙ্গলসাধন নামক উদ্দেশ্যটিকে অনর্থনৈতিক উদ্দেশ্য বলা যেতে পারে। অবশ্য অধিকাংশ বেসরকারী ফার্মের উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন করা।

আমরাও এখানে ধরে নিতে পারি যে, সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করাই ফার্মের উদ্দেশ্য।

১০.১ (ক) ফার্মের ভারসাম্য কাকে বলে? যদি ধরে নেওয়া হয় যে, ফার্মের উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা, তাহলে ফার্ম সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করবে—যাতে তার পক্ষে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করলে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হয়, তাকেই বলা হয় ভারসাম্য

উৎপাদন। ফার্ম যখন উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যার ফলে তার পক্ষে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয় তাকেই ফার্মের ভারসাম্য বলা হয়। ফার্ম যদি এই ভারসাম্য অবস্থায় আসে তাহলে স্বেচ্ছায় সেই অবস্থা থেকে সে বিচ্যুত হতে চাইবে না। অবশ্য বাইরের কোন শক্তি যদি তাকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করে তাহলে সেই ফার্ম একটি ভারসাম্য অবস্থা পরিত্যাগ করে নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অন্য ভারসাম্য অবস্থায় স্থানান্তরিত হবে।

(খ) ফার্ম কীভাবে ভারসাম্য লাভ করে?

যেখানে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হয়, ফার্ম সেখানেই ভারসাম্য লাভ করে। মুনাফা হল ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বা মোট রেভেনিউ ও মোট উৎপাদন ব্যয়ের বিয়োগফল। উৎপাদন ব্যয় ছাড়াও ফার্মের পরিবহণ ব্যয়, বিক্রয় ব্যয় বা বিজ্ঞাপন ব্যয় ইত্যাদি অন্যান্য ব্যয় থাকতে পারে। আমরা যদি সেসব ব্যয়ের কথা না ধরি তাহলে ফার্মের মোট মুনাফা = আয় − ব্যয়।

যেখানে আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান সর্বাধিক, সেখানেই ফার্মের মুনাফাও সর্বাধিক হয়। অতএব ফার্ম সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে—যাতে তার আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান সর্বাধিক হয়। ফার্ম যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করে, তাহলে তার জন্য তার অতিরিক্ত আয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়ও হবে। অতিরিক্ত আয়কে প্রান্তিক আয় এবং অতিরিক্ত ব্যয়কে প্রান্তিক ব্যয় বলা হয়। ফার্মের মুনাফা কখন সর্বাধিক হবে সেটা নির্ভর করছে প্রান্তিক আয় ও ব্যয়ের উপর। যদি প্রান্তিক আয় (MR) প্রান্তিক ব্যয় (MC) অপেক্ষা বেশি থাকে তাহলে ফার্মের মুনাফা বাড়বে। কিন্তু অতিরিক্ত উৎপাদন করলে প্রান্তিক আয় কমে এবং প্রান্তিক ব্যয় বাড়ে, অবশেষে এমন একটি অবস্থা আসে যেখানে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়। সেখানে ফার্মের মুনাফার বৃদ্ধি বন্ধ হয়। তারপর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক আয় অপেক্ষা প্রান্তিক ব্যয় বেশি হয়ে যায়। যার ফলে ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা না হয়ে প্রান্তিক ক্ষতি হয়; অর্থাৎ ফার্মের মুনাফা কমতে আরম্ভ করে। তাহলে আমরা পাই—

(ক) যতক্ষণ $MR > MC$ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ফার্মের মুনাফা বৃদ্ধি পায়,

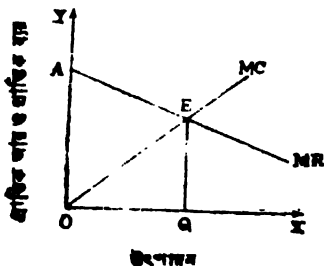
(খ) যেখানে $MR = MC$ সেখানে অতিরিক্ত মুনাফা শূন্য, এবং

(গ) যখন $MR < MC$ তখন মুনাফা হ্রাস পায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যেখানে মুনাফা সর্বাধিক হয় সেখানে $MR = MC$ হয়। পরের পৃষ্ঠার তালিকায় এটি দেখানো হল। এখানে ধরা হয়েছে যে, প্রান্তিক আয় ক্রমশ কমে এবং প্রান্তিক ব্যয় ক্রমশ বেড়ে যায়।

১	২	৩	৪	৫	৬
উৎপাদনের একক	প্রান্তিক আয় MR	মোট আয় R = ΣMR	প্রান্তিক ব্যয় MC	মোট ব্যয় C = ΣMC	মোট মুনাফা Profit = R − C
প্রথম	৫ টাকা	৫ টাকা	১ টাকা	১ টাকা	৪ টাকা
দ্বিতীয়	৪ "	৯ "	২ "	৩ "	৬ "
তৃতীয়	৩ "	১২ "	৩ "	৬ "	৬ "
চতুর্থ	২ "	১৪ "	৪ "	১০ "	৪ "
পঞ্চম	১ "	১৫ "	৫ "	১৫ "	০ "

এখানে প্রথম একক দ্রব্য বিক্রয় করে ৫ টাকা, দ্বিতীয় একক থেকে ৪ টাকা, তৃতীয় একক থেকে ৩ টাকা, চতুর্থ একক থেকে ২ টাকা এবং পঞ্চম একক থেকে ১ টাকা প্রান্তিক আয় পাওয়া যায় বলে ধরা হয়েছে। এগুলোকে পর পর যোগ করলে আমরা মোট আয় (R) পাই। ৩নং স্তম্ভে মোট আয় দেখানো হয়েছে। ৪নং স্তম্ভে প্রান্তিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রথম এককের ১ টাকা, দ্বিতীয় এককের ২ টাকা ইত্যাদি। তাদের পর পর যোগ করে আমরা মোট ব্যয় (C) জানতে পারি। ৫ নং স্তম্ভে মোট ব্যয় দেখানো হয়েছে।

এখন মোট আয় (R) থেকে মোট ব্যয় (C) বিয়োগ করলে মোট মুনাফা পাওয়া যায়। ৬নং স্তম্ভে মুনাফার হিসাব দেখানো হয়েছে। ৬নং স্তম্ভে দেখা যাবে মোট সর্বাধিক মুনাফা ৬ টাকা। তৃতীয় একক দ্রব্য বিক্রয় করলে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যায়। তারপর মুনাফা কমতে থাকে। কিন্তু তৃতীয় এককের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান ৩ টাকা)। এইভাবে দেখানো যায় যে, যেখানে মুনাফা সর্বাধিক হয় সেখানে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হবে। আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যেও এটা দেখাতে পারি। পাশের রেখাচিত্রের MR রেখাটি হল প্রান্তিক আয় রেখা এবং MC হল প্রান্তিক ব্যয় রেখা। MR ও MC রেখা দুটি পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে।



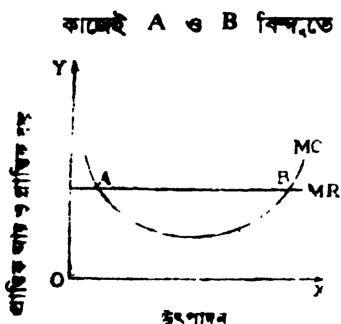
১০·১ রেখাচিত্র : ফার্মের ভারসাম্য

E বিন্দুতে MR = MC হয়েছে। এখানে ফার্ম OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে। এখানে মোট আয় = OAEQ এবং ব্যয় = OEQ.

অতএব মুনাফা = OAB নামক ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রটি। ফার্ম যদি OQ-এর চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহলে তার মুনাফা OAE ক্ষেত্রের চেয়ে কম হবে। আবার ফার্ম যদি OQ অপেক্ষা বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহলে তার প্রান্তিক ব্যয় তার প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশি হবে। কাজেই ফার্মের ক্ষতি হবে। অতএব ফার্মটি OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং E বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে।

(গ) ভারসাম্যের শর্ত : ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হবে এটি হল তার ভারসাম্যের একটি শর্ত। কিন্তু এটি প্রয়োজনীয় শর্ত (Necessary condition), যথেষ্ট শর্ত (Sufficient condition) নয়। অর্থাৎ মুনাফা সর্বাধিক হতে গেলে ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হবে, কিন্তু প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হলেই বলা যাবে না যে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হয়েছে। নীচের রেখাচিত্রে MC রেখা MR রেখাকে A ও B এই দুটি বিন্দুতে ছেদ করেছে।

কাজেই A ও B বিন্দুতে MR = MC হয়েছে। কিন্তু এই দুটি বিন্দুতেই ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে না। A বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে উপর দিক থেকে ছেদ করেছে। A বিন্দুর বামদিকে MC > MR. অতএব ফার্মের ক্ষতি হবে। A বিন্দুর ডান দিকে MC < MR অতএব ফার্মের লাভ হবে। তাহলে A বিন্দুর বাম দিকে ক্ষতির এবং ডানদিকে লাভের এলাকা। A বিন্দুতে লাভ নেই। ক্ষতি সব চেয়ে কম। কাজেই যেখানে MC রেখা MR রেখার উপরের দিক থেকে ছেদ করে সেখানে MR ও MC সমান হলেও ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে না এবং ফার্ম ভারসাম্য লাভ করবে না, কিন্তু যেখানে MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করে সেখানে MR ও MC সমান হয় এবং সেখানে ফার্মের মুনাফাও হয় সর্বাধিক। ফার্ম সেই ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করে। অতএব ভারসাম্যের শর্ত দুটি—প্রথমত, ফার্মের ভারসাম্যের জন্য MR = MC হবে এবং দ্বিতীয়ত, MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করবে। প্রথম শর্তটিকে বলা হয় ফার্মের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শর্ত নিয়ে গঠিত হয় ভারসাম্যের যথেষ্ট শর্ত। যদি প্রথম শর্তটি পালিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি পালিত না হয় তাহলে ফার্মের ভারসাম্য ঘটবে না। অর্থাৎ আমরা বলতে পারি না যে, ফার্মের MR ও MC সমান হলেই ফার্মের ভারসাম্য ঘটবে। বরং আমরা বলতে পারি ফার্মের ভারসাম্য ঘটলেই ফার্মের MR = MC হবে। ব্যাপারটা যেন মিষ্টি হলেই চিনি হবে এমন বলা যায় না, কারণ মধু মিষ্টি, কিন্তু মধু চিনি নয়। কাজেই চিনি মিষ্টি, কিন্তু মিষ্টি পদার্থ মাত্রই চিনি নয়।



১০.২ রেখাচিত্র : ফার্মের ভারসাম্য

১০.২.(ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ভারসাম্য :

যে-কোন ফার্মের উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। মুনাফা হ'ল ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট ব্যয়ের বিয়োগ ফল।

ফার্মের মোট মুনাফা = মোট আয় − মোট ব্যয়।

অর্থাৎ $\pi = R - C$

আমরা জানি $R = P.Q.$ অর্থাৎ ফার্মের মোট আয় হ'ল দ্রব্যের প্রতি এককের দাম এবং দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণের গুণফল। এর থেকে বলা যায় যে ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। একটি বিষয় হল দ্রব্যের দাম, অন্য বিষয়টি হ'ল দ্রব্যের পরিমাণ। কিন্তু কোন একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম কখনই দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম হল দাম-গ্রাহক, সে দাম-নির্ধারক নয় (**A perfectly competitive firm is a price-taker, but it is not a price-maker**). অন্যভাবে বলা যায় যে, প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের কাছে দ্রব্যের দাম (P) হল নির্ধারিত বিষয়। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের মোট আয় কেবলমাত্র উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে। অতএব আমরা পাই, **প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের R নির্ভর করে কেবলমাত্র Q-এর উপর।**

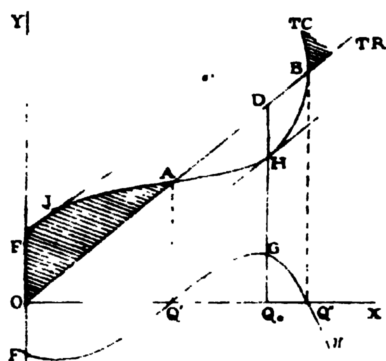
অর্থাৎ $R = R(Q)$. (R হল Q-এর অপেক্ষক) এবার C সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। C বলতে বোঝায় ফার্মের মোট ব্যয়। আলোচ্য সময়টিকে যদি স্বল্পকালীন সময় মেয়াদ বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে বলা যায় যে স্বল্পকালে ফার্মের মোট ব্যয়ের মধ্যে দুটি অংশ থাকে, যথা (ক) স্থির ব্যয় বা উৎপাদন নিরপেক্ষ ব্যয় এবং (খ) পরিবর্তনশীল ব্যয় বা উৎপাদন সাপেক্ষ ব্যয়। স্থির ব্যয়ের কথা ছেড়ে দিলে বলা যায় যে ফার্মের মোট ব্যয় উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অতএব আমরা পাই,

ফার্মের ব্যয় (C) উৎপাদনের পরিমাণের (Q) উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ C নির্ভর করে Q-এর উপর, অতএব $C = C(Q)$. (C হল Q-এর অপেক্ষক)

প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের মোট আয় ও মোট ব্যয় উভয়েই উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। মুনাফা যেহেতু মোট আয় ও মোট ব্যয়ের অন্তরফল, তাহলে বলা যায় যে—ফার্মের মোট মুনাফাও উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। π নির্ভর করে Q-এর উপর অতএব $\pi = \pi(Q)$. (π হল Q-এর অপেক্ষক).
অথবা $\pi(Q) = R(Q) - C(Q)$

প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের উদ্দেশ্য হল Q-এর পরিমাণ নির্ধারণ করা যাতে π সর্বাধিক হয়। এখানে Q হল অজ্ঞাত বিষয় (unknown)। Q-এর এমন একটি মান নির্ধারণ করতে হবে যাতে R ও C-এর ব্যবধান সর্বাধিক হয়। উচ্চতর গণিতের

সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করা যায়। তবে সবচেয়ে সহজ হ'ল জ্যামিতিক পদ্ধতির সাহায্যে এই প্রশ্নের সমাধান করা। নীচের রেখাচিত্রে এই সমাধান দেখানো হল।



১০.৩ পূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক ফার্মের ভারসাম্য

এই রেখাচিত্রের OX অক্ষে ফার্মের উৎপাদন এবং OY-অক্ষে ফার্মের আয় (R), ব্যয় (C) ও মুনাফা (π) পরিমাপ করা হয়েছে।

এখানে TR ও TC নামক রেখা দুটি হল যথাক্রমে ফার্মের মোট আয় রেখা ও মোট ব্যয়রেখা এবং π রেখাটি হল ফার্মের মুনাফারেখা। TC রেখাটি OY-অক্ষের উপর F বিন্দু থেকে অঙ্কিত হয়েছে। OF হ'ল ফার্মের স্থির ব্যয় বা উৎপাদন-নিরপেক্ষ ব্যয়। TR রেখাটি মূলবিন্দু দিয়ে অঙ্কিত হয়েছে। তার কারণ উৎপাদন বা বিক্রয়ের পরিমাণ শূন্য হলে ফার্মের মোট আয় শূন্য হয়। TR রেখার ঢাল দ্বারা দ্রব্যের দাম (P) সূচিত হয়। প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম যেহেতু দ্রব্যের দাম পরিবর্তন করতে পারে না, কাজেই প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের TR রেখার ঢাল সর্বত্র সমান থাকে। এর দ্বারা বোঝায় যে প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের TR রেখা ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা হয়।

রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে TR ও TC রেখা পরস্পরকে A ও B বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই দুটি বিন্দুতে ফার্মের TR = TC, কাজেই ফার্মের মুনাফা শূন্য (π = O)। ফার্ম যদি OQ' কিংবা OQ" পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহলে তার মুনাফা শূন্য হবে। সেজন্য Q' ও Q" বিন্দুতে π রেখা OX-অক্ষকে ছেদ করেছে। সহজেই বোঝা যায় যে ফার্ম A বিন্দু কিংবা B বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে না।

A বিন্দুর বামদিকে TC রেখা TR রেখার উপরে আছে। এর দ্বারা বোঝায় যে A বিন্দুর বামদিকে ফার্মের TC > TR। অতএব A বিন্দুর বামদিকে ফার্মের ক্ষতি হয়। ফার্ম এখানে ভারসাম্য লাভ করতে পারে না। অনুরূপভাবে B বিন্দুর ডানদিকে TC রেখা আবার TR রেখার উপরে উঠে গেছে। এখানে TC > TR এবং π < O, ফার্ম B বিন্দুর ডানদিকে উৎপাদন করতে পারে না।

এখন বুঝতে পারা যায় যে ফার্মটি A বিন্দুর ডানদিকে এবং B বিন্দুর বাম দিকের কোন বিন্দুতে সর্বাধিক মুনাফাসহ ভারসাম্য লাভ করতে পারবে, কারণ এখানে ফার্মের TR রেখা TC রেখার উপরে থাকায় ফার্মের মুনাফা ধনাত্মক হয়। A বিন্দুর বামদিকে ও B বিন্দুর ডানদিকে রয়েছে ফার্মের ক্ষতির এলাকা, (রেখাচিত্রে

ক্ষতির এলাকা দুটিকে শেড করে দেওয়া হয়েছে), কিন্তু A বিন্দুর ডানদিকে ও B বিন্দুর বামদিকে রয়েছে ফার্মের লাভের এলাকা। এই এলাকায় ঠিক কোন্ বিন্দুতে TR ও TC রেখার ব্যবধান উচ্চতম হয়, তা নির্ণয় করার জন্য TC রেখার গায়ে H বিন্দুতে একটি স্পর্শক অঙ্কন করা যায়। এই স্পর্শকটি TR রেখার সমান্তরাল হওয়ায় এখানে ফার্মের TR রেখার ঢাল ও TC রেখার ঢাল পরস্পর সমান হয়। TC রেখার ঢাল হল MC এবং TR রেখার ঢাল হল MR. অতএব এখানে ফার্মের MR ও MC পরস্পর সমান হয়। এর দ্বারা ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত পালিত হয়। ফার্মটি OQ_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করলেই তার MR = MC হবে। কাজেই OQ_0 হল ফার্মের ভারসাম্যস্তরের উৎপাদন।

রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে OQ_0 পরিমাণ উৎপাদনের জন্য ফার্মের π রেখা তার শীর্ষবিন্দুতে আছে। এখানে মুনাফার পরিমাণ হল $GQ_0 = DH$. $DH = GQ_0$ হ'ল ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা এবং G হ'ল π রেখার সর্বোচ্চ বিন্দু।

ভারসাম্যের শর্ত : MR = MC হ'ল ফার্মের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত। পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ভারসাম্যের জন্যও এই শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন।

আবার, পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ফার্মের প্রান্তিক আয় (MR) ও গড় আয় (AR) পরস্পর সমান হয়। অতএব, পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ভারসাম্যের জন্য MR = AR = MC নামক শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সংজ্ঞানুসারে গড় আয় ও দাম (P) পরস্পর সমান হয়। অতএব পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত হল P = MC.

রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়, যে বিন্দুতে ফার্মের TC রেখার ঢাল ফার্মের TR রেখার ঢালের সমান হয়, সেই বিন্দুতে ফার্ম ভারসাম্য লাভ করে। প্রদত্ত রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে TC রেখার উপর H ও J বিন্দুতে অঙ্কিত দুটি স্পর্শকই TR রেখার সমান্তরাল হয়েছে MR = MC নামক শর্তটি ঐ দুটি বিন্দুতেই পালিত হয়েছে। কিন্তু J বিন্দুতে সর্বাধিক মুনাফার পরিবর্তে সর্বাধিক ক্ষতি হয়। তাহলে বোঝা যায় যে—MR = MC হলে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হতে পারে, আবার ক্ষতিও সর্বাধিক হতে পারে। অতএব,

(১) MR = MC হলে ফার্মের ক্ষতি সর্বাধিক হতে পারে এবং ফার্ম ভারসাম্য লাভ করে না।

(২) MR = MC হলে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হতে পারে এবং ফার্ম ভারসাম্য লাভ করে।

এর থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে MR = MC হওয়াটা ফার্মের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট শর্ত নয়।

ভারসাম্যের শর্ত আবিষ্কার করার জন্য TR ও TC রেখার ঢালের সমতা ছাড়াও আর একটি বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন। যে বিন্দুতে TR ও TC রেখার ঢাল সমান হয় (অর্থাৎ যে বিন্দুতে MR MC হয়) তার ডানদিকের কোন বিন্দুতে TC ও TR রেখার ঢাল কেমন তা জানা প্রয়োজন। যদি দেখা যায় যে ডানদিকের বিন্দুতে TC রেখার ঢাল TR রেখার ঢালের চেয়ে কম হয়, তাহলে বুঝতে হবে আগের বিন্দুতে যেখানে MR = MC হয়েছে সেখানে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হয় না। অপরপক্ষে, ডানদিকের বিন্দুতে যদি TC রেখার ঢাল TR রেখার ঢাল অপেক্ষা অধিক হয়, তাহলে আগের বিন্দুতে মুনাফা সর্বাধিক হয় এবং ফার্মটি ভারসাম্য লাভ করে।

যে বিন্দুতে TR ও TC রেখার ঢাল সমান হয়, তার ডান দিকে সরে গেলে আমরা TR ও TC রেখার ঢালের পরিবর্তনের গতি প্রকৃতি জানতে পারি। TR ও TC রেখার ঢাল হ'ল যথাক্রমে MR ও MC রেখা। অতএব TR ও TC রেখার ঢালের পরিবর্তন দ্বারা যথাক্রমে MR ও MC রেখার ঢাল সূচিত হয়। TC রেখার ঢালের পরিবর্তন TR রেখার ঢালের পরিবর্তন অপেক্ষা অধিক হবে বললে বোঝায় যে MC রেখার ঢাল MR রেখার ঢাল অপেক্ষা অধিক হবে। কাজেই ফার্মের ভারসাম্যের জন্য।

(১) MR = MC হয়,

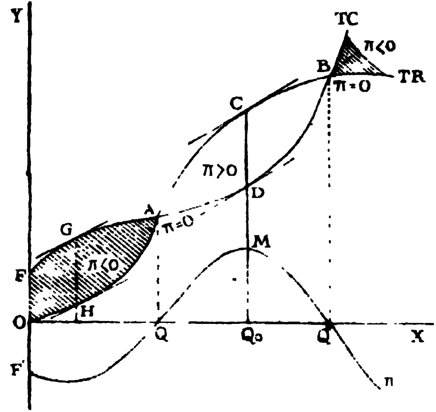
(২) MC রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল হয়।

রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়, যেখানে ফার্মের MC রেখা ফার্মের MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করে সেই ছেদ বিন্দুতে ঐ দুটি শর্ত পালিত হয় এবং ফার্ম ভারসাম্য লাভ করে।

১ (খ) অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের ভারসাম্য :

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের বা বিক্রেতার সংখ্যা সীমিত হয়। প্রত্যেকটি ফার্ম তার যোগানের বা উৎপাদনের পরিবর্তন দ্বারা দ্রব্যের দামকে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোন ফার্মকে দাম-গ্রাহক (Price taker) বলা যায় না। এখানে ফার্ম দাম-নির্ধারকের (Price maker) ভূমিকাও পালন করতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি ফার্ম দামকে প্রভাবিত করতে পারে না, কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ফার্ম দামকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ঘটনাটি ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় রেখার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোন একটি ফার্মের মোট আয় রেখা (TR রেখা) ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা হয় কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি ফার্মের TR রেখা সরলরেখা হয় না, পরিবর্তে উৎপাদন পরিমাপক অক্ষের দিকে অবতল (concave) হয়। প্রদত্তরেখাচিত্রে TR রেখাটি হ'ল অপূর্ণ প্রতিযোগিতা-

মূলক বাজারের কোন একটি ফার্মের মোট আয়রেখা। এই রেখাচিত্রের OX-অক্ষে ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ এবং OY-অক্ষে ফার্মের মোট আয় (TR), মোট ব্যয় (TC) এবং মুনাফা (π) পরিমাপ করা হয়েছে। এই রেখাচিত্রে অঙ্কিত TC রেখাটি হ'ল ফার্মের মোট ব্যয় রেখা, π রেখাটি হল মোট মুনাফা রেখা। TC রেখাটি OY অক্ষের F বিন্দু থেকে অঙ্কিত হয়েছে। এখানে OF হল ফার্মের স্থির ব্যয়।



১০.৪ অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ভারসাম্য

রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে TR ও TC রেখা পরস্পরকে A ও B বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই দুটি বিন্দুতে ফার্মের মুনাফা শূন্য (π = 0) হয়। কাজেই ফার্ম A এবং B বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করতে পারে না। A বিন্দুর ঠিক নীচে π রেখা OX অক্ষকে ছেদ করেছে। অনুরূপভাবে B বিন্দুরও নীচে π রেখা OX-অক্ষকে ছেদ করেছে। A বিন্দুর বাম দিকে এবং B বিন্দুর ডান দিকে TC রেখা TR রেখার উপরে আছে। এখানে TR<TC এবং π<0, অর্থাৎ ফার্মের ক্ষতি হয়। A বিন্দুর বাম দিকে ও B বিন্দুর ডান দিকে রয়েছে ফার্মের ক্ষতির এলাকা। রেখা চিত্রে এই দুটি অংশ শেড করে দেওয়া হয়েছে। এখানে ফার্মের ক্ষতি হয় বলে π রেখা OX অক্ষের তলার দিকের ঋণাত্মক অংশে অঙ্কিত হয়েছে।

ফার্মের ধনাত্মক মুনাফা হয় A বিন্দুর ডান দিকে এবং B বিন্দুর বাম দিকের অংশে। বোঝা যায় যে ফার্ম এই অংশে লাভ করবে। TR রেখার উপর C বিন্দুর এবং TC রেখার উপর D বিন্দুতে যে স্পর্শক দুটি অঙ্কন করা হয়েছে তারা সমান্তরাল হওয়ায় বোঝা যায় যে ফার্মটি OQ_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং তার দ্বারা তার মুনাফা সর্বাধিক করতে পারবে। এখানে সর্বাধিক মুনাফার পরিমাণ হল $CD = MQ_0$।

যেহেতু OQ_0 পরিমাণ উৎপাদনের জন্য TC রেখা ও TR রেখার উপর অঙ্কিত স্পর্শক দুটি সমান্তরাল হয়, কাজেই বলতে পারা যায় যে, OQ_0 পরিমাণ উৎপাদনের জন্য ফার্মের MC = MR হয় এবং ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত পালিত হয়।

কিন্তু রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে TC রেখার উপর G বিন্দুতে এবং TR রেখার উপর H বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক দুটিও সমান্তরাল হয়েছে। অর্থাৎ এখানেও

MR = MC নামক শর্তটি পালিত হয়েছে। কিন্তু এখানে π রেখার নিম্নতম বিন্দু রয়েছে। এর দ্বারা বোঝায় যে GH হল ফার্মের সর্বাধিক ক্ষতি। MR = MC হলেই ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক না হতেও পারে। এমনকি ফার্মের সর্বাধিক ক্ষতি হতে পারে সেই বিষয়টি এর দ্বারা প্রমাণিত হয়। MR = MC হ'ল ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত। এই রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে Q_0 বিন্দুর উপর π রেখার শীর্ষ বিন্দু M রয়েছে। M বিন্দুটি হল মুনাফা-পর্বতের শীর্ষবিন্দু (Peak-point of the profit-hill)। কাজেই সর্বাধিক মুনাফাসন্ধানী ফার্ম OQ_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন দ্বারা ভারসাম্য লাভ করবে।

প্রশ্নাবলী

১। ফার্মের ভারসাম্য বলতে কী বোঝ? কীভাবে এই ভারসাম্য দেখা দেয়? রেখাচিত্রসহ আলোচনা কর।

২। ফার্মের ভারসাম্য কাকে বলে? ভারসাম্যের কটি শর্ত আছে? রেখাচিত্রের সাহায্যে ফার্মের ভারসাম্য আলোচনা কর।

৩। (ক) ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হলে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হবে। (খ) ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হলে তার মুনাফা সর্বাধিক হবে।—এই দুটি উক্তির মধ্যে কোনটি সত্য? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৪। প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় কাকে বলে? প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমতার সাহায্যে ফার্ম কীভাবে ভারসাম্য লাভ করে উদাহরণ ও রেখাচিত্রসহ বোঝাও।

১১ | পূর্ণ-প্রতিযোগিতার বাজার

১১.১ পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও তার বৈশিষ্ট্য :

যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি সমজাতীয় দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করে, সেই বাজারকে পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়। এই বাজারের বৈশিষ্ট্য ও তাদের তাৎপর্য হল নিম্নরূপ :

১। **অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা :**

পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা এবং অসংখ্য বিক্রেতা থাকে। অনেক ক্রেতা সম্মিলিতভাবে মোট যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চায়, তাকে বলা হয় মোট চাহিদা। একজন ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা এই মোট চাহিদার একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। কাজেই, কোন একজন ক্রেতা যদি তার ব্যক্তিগত চাহিদার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটায়, তাহলে, তার ফলে সামগ্রিক চাহিদার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না। অনুরূপভাবে এই বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা থাকায় একজন বিক্রেতার ব্যক্তিগত যোগান মোট যোগানের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। একজন বিক্রেতা তার নিজস্ব যোগানের অনেক পরিবর্তন করেও মোট যোগানের উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। অর্থাৎ পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন ক্রেতা দ্রব্যের মোট চাহিদাকে এবং একজন বিক্রেতা দ্রব্যের মোট যোগানকে কোনমতেই প্রভাবিত করতে পারে না। এই বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে। যদি মোট চাহিদা, কিংবা মোট যোগানের কিংবা উভয়ের পরিবর্তন হয়, তাহলে দ্রব্যের দামও পরিবর্তিত হতে পারে ; কিন্তু একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা এই দামের নির্ধারণ ও পরিবর্তনের উপর কোন প্রভাব রাখতে পারে না। মোট চাহিদা ও যোগানের দ্বারা যে দাম নির্ধারিত হয়, সেই দামে একজন ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করে এবং একজন বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয় করে। এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বাজার নির্ধারিত দামকে সাময়িকভাবে স্থির বলে শিরোধার্য করে নেয় এবং সেই স্থির দামে যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে রাখে. আমরা বলি-পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন ক্রেতা বা একজন বিক্রেতা দাম-গ্রহীতা (Price taker), কিন্তু দাম-নির্ধারক (Price maker) নয়। দ্রব্যের দাম (P) ও দ্রব্যের পরিমাণ (Q) এই দুটি বিষয়ের মধ্যে এখানে ক্রেতা বা বিক্রেতার কাছে P নির্ধারিত বিষয় এবং Q হল বিবেচনার বিষয়। দ্রব্যের দাম এখানে নির্দিষ্ট থাকে। সেই নির্দিষ্ট দামে একজন ক্রেতা কী পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করবে তাই সে ঠিক করে। অনুরূপভাবে একজন বিক্রেতাও দ্রব্যের দামকে নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট বলে ধরে নিয়ে সেই দামে সে কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করবে তাই ঠিক করে। এখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই পরিমাণ নির্ধারক।

২। **সমজাতীয় দ্রব্য**ঃ পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল উৎপন্ন ও বিক্রীত দ্রব্যের বা পণ্যের সমজাতীয়তা। এই বাজারে সব বিক্রেতা যে দ্রব্য বিক্রয় করে, সেই দ্রব্য আভ্যন্তর ও বাহ্যিক উভয় দিক দিয়েই সমজাতীয়। অর্থাৎ এখানে একজন বিক্রেতার দ্রব্যের সঙ্গে অন্য সব বিক্রেতার দ্রব্যের কোন পার্থক্য থাকে না। কোন একজন বিক্রেতা যে দ্রব্য বিক্রয় করে, তার গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ বা বাইরের মোড়ক বা আবরণ বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্য অন্য বিক্রেতাদের দ্রব্যের গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ বা অন্য কোন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিলে যায় এবং এই মিলনটা দ্রব্যের আভ্যন্তর ও বাহ্যিক উভয়দিক সম্বন্ধেই খাটে।

শুধু তাই নয়, ক্রেতারাও বাজারের দ্রব্যটিকে সমজাতীয় বলে মনে করে। অর্থাৎ পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যটি সব ক্রেতাদের মনের কাছেও সমান বা সমজাতীয়। একে আমরা মানসিক সমজাতীয়তা (Psychological homogeneity) বলতে পারি। যদি ক নামক ক্রেতা খ নামক বিক্রেতার বন্ধু হয় তাহলে প্রত্যেকবার সে খ-এর নিকট থেকেই দ্রব্য ক্রয় করতে চাইবে, যদিও খ যে দ্রব্য বিক্রয় করছে, তা আর সব বিক্রেতাদের দ্রব্যের মতোই। এক্ষেত্রে দ্রব্যের বস্তুগত সমজাতীয়তা (Physical homogeneity) থাকলেও ক-এর নিকট খ-এর দ্রব্য অন্য সব বিক্রেতাদের দ্রব্যর চেয়ে উৎকৃষ্ট। খ যে দ্রব্য বিক্রয় করছে ক-এর নিকট সেই দ্রব্যের উপর বন্ধুত্বের মাখন মাখানো আছে বলে মনে হবে। বন্ধুত্ব নামক অনর্থনৈতিক বিষয়টি এখানে দ্রব্যের মানসিক সমজাতীয়তাকে নষ্ট করছে। আমরা ধরে নেব যে, পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয় হয় সেই দ্রব্যটি বস্তুগত দিক দিয়ে এবং মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণভাবে সমজাতীয়। অর্থাৎ পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সব ক্রেতা একই দ্রব্য ক্রয় করে এবং সব বিক্রেতা একই দ্রব্য বিক্রয় করে। চালের বাজারে সব চাল সমান। কাপড়ের বাজারে সব কাপড় একই কাপড়। এর ফলে যে-কোন একটি দ্রব্যের বাজারে সেই দ্রব্যের একটি মাত্র দাম চালু থাকবে, যে দামে সব ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করবে এবং সব বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয় করবে। যদি বাজারের চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন হয়, তাহলে দামের পরিবর্তন হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত-ভাবে কোন ক্রেতা কম দাম দিয়ে দ্রব্যটি ক্রয় করতে পারছে বা কোন বিক্রেতা বেশি দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করতে পারছে—এমন হবে না।

৩। পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারের নতুন নতুন ফার্ম যে-কোন সময় দ্রব্যের উৎপাদন আরম্ভ করতে পারে এবং এইভাবে শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। আবার অসুবিধা হলে কোন পুরাতন ফার্ম যে-কোন সময় উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে শিল্পের বাইরে চলে আসতে পারে। একে প্রস্থান (exit) বলা যায়। পূর্ণ-প্রতি-যোগিতামূলক বাজারে যে-কোন ফার্ম যে-কোন সময় শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, এবং যে-কোন সময় শিল্প থেকে চলে যেতে পারে,—ফার্মের এই প্রবেশ বা প্রস্থানের পথে কোন আইনগত বাধা থাকে না। রাষ্ট্র বা সরকার এই প্রবেশ বা প্রস্থানের পথে কোনরকম ভাবে কোন বাধা-নিষেধ আরোপ করেন না। এই বৈশিষ্ট্যকে

অবাধ প্রবেশাধিকার (free entry) বলা হয় ; এবং অবাধ প্রবেশাধিকার পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

অনেক সময় দেখা যায়—সরকার কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন একটি প্রতিষ্ঠানের অধিকার মেনে নিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানকে "পেটেন্ট রাইট" দেন। তখন অন্য কোন ফার্ম সেই নামের কোন সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারে না। এইভাবে একচেটিয়া কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করে উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করতে পারে না। আমরা বলতে পারি, এক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশের উপর আইনগত বাধা বা নিষেধ আছে। পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের প্রবেশ বা প্রস্থানের উপর এইরূপ কোন আইনগত বাধা থাকে না।

পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আইনগত বাধা না থাকায় যে-কোন ফার্ম যে কোন সময় শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে কিংবা শিল্পের বাইরে আসতে পারে। যদি শিল্পান্তর্ভুক্ত ফার্মগুলি (Inside firms) খুব বেশি মুনাফা লাভ করে, তাহলে বাইরের ফার্মগুলি (Outside firms) মুনাফার লোভে শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করে ; এবং কোন আইনগত বাধা বা সরকারের কোন আপত্তি না থাকায় তারা শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করে। এর ফলে শিল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সেই সঙ্গে শিল্পের মোট উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের মোট চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পেলে দাম কমে যায়। দাম কমে গেলে ফার্মগুলির মুনাফা কমে যায়। এইভাবে সব ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা দূর হয়ে যায়। তখন আর নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করে না। অনুরূপভাবে অবস্থা যদি এ.ন হয় যে, শিল্পান্তর্ভুক্ত ফার্মগুলির বেশ কিছুদিন ধরে ক্ষতি হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে এই অবস্থার পরিবর্তনের কোন লক্ষণ নেই, তাহলে কয়েকটি ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। রাষ্ট্র বা সরকার তখন যদি বলেন উৎপাদন বন্ধ করা চলবে না, কিংবা সরকার যদি লক আউট, ক্লোজার নিষিদ্ধ করে আইন পাস করেন তাহলে ক্ষতি স্বীকার করেও ফার্মগুলিকে উৎপাদন চালিয়ে যেতে হবে। পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এরূপ কোন আইন থাকে না। তার ফলে ক্ষতি হলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারে ; যদি একসঙ্গে অনেক ফার্ম এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে শিল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যা কমে যায়। দ্রব্যের মোট উৎপাদন ও যোগানও কমে যায় এবং দ্রব্যের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে এর ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং অবশেষে শিল্পান্তর্ভুক্ত ফার্মগুলির ক্ষতি দূর হয়।

অবাধ প্রবেশাধিকার থাকার ফলে পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন বিক্রেতার অস্বাভাবিক মুনাফা হয় না, আবার ক্ষতিও হয় না ; প্রত্যেকটি ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে।

তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নতুন ফার্মগুলি অবাধ প্রবেশাধিকারের

সুযোগ কেবলমাত্র দীর্ঘকালেই গ্রহণ করতে পারে। স্বল্পকালে নতুন ফার্মের প্রবেশের পথে কোন আইনগত বাধা না থাকলেও নানারূপে কারিগরী বাধা (Technical barriers) বা অর্থনৈতিক বাধা থাকে। উৎপাদন আরম্ভ করতে হলে ফার্মকে অনেকগুলি স্থির বা স্থায়ী উৎপাদন সংগ্রহ করতে হয় ও বসাতে হয়। এইসব উৎপাদনের যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক হতে পারে। আবার এই উপাদান-গুলির আয়তন যদি খুব বড়ো হয়, তাহলে সেগুলিকে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থাপন করতে অনেক দিন সময় লাগতে পারে। স্বল্পকালে সেই সময় পাওয়া যায় না। কাজেই স্বল্পকালে ইচ্ছা থাকলেও নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে শিল্পান্তর্ভুক্ত ফার্মগুলির পক্ষে স্বল্পকালে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। আবার স্বল্পকালে যদি ফার্মের ক্ষতি হয়, তাহলেও স্থির উপাদানগুলির জন্যই অনেক ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করতে পারে না। যদি উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়, তাহলে স্থির উপাদানগুলির মালিকদের পাওনা মিটিয়ে দিতে ফার্মের মালিকের আরো বেশি ক্ষতি হয়। কাজেই সে ক্ষতি সত্ত্বেও উৎপাদন চালু রাখতে বাধ্য হয়।

অতএব পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থায় কোন একটি ফার্ম স্বল্পকালে অবাধ প্রবেশ বা প্রস্থানের সুযোগ গ্রহণ করতে অসমর্থ হতে পারে। কেবলমাত্র দীর্ঘ-কালেই এই সুযোগ গ্রহণ করা যায়।

(৪) অন্যান্য বৈশিষ্ট্য : (ক) পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ক্রেতাদের পূর্ণ সচেতনতা থাকে ; (খ) উৎপাদনের উপাদানগুলি সম্পূর্ণ-ভাবে গতিশীল হয় এবং (গ) উৎপাদন-ব্যয় ব্যতীত অন্য কোন ব্যয় থাকে না বলে ধরে নেওয়া হয়। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যেরও তাৎপর্য আছে।

(ক) ক্রেতারা বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকায় কোন বিক্রেতাই বাজারের প্রচলিত দামের চেয়ে কম কিংবা বেশি দামে দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে না। কোন বিক্রেতা যদি বেশি দাম নিতে চায়, তাহলে সে-কোন ক্রেতা পাবে না। ফলে সে দাম কমাতে বাধ্য হবে। আবার কোন বিক্রেতা যদি কম দামে দ্রব্য বিক্রয় করে, তাহলে সব ক্রেতারা তার কাছেই ভিড় করবে। তখন সে বাধ্য হয়ে দাম বৃদ্ধি করবে। এইভাবে সমগ্র বাজারে এক সময়ে একটিমাত্র দাম চালু থাকবে এবং সেই দামে সকলে দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় চালিয়ে যাবে।

(খ) পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রত্যেকটি উপাদান যেমন, শ্রম, জমি, মূলধন, সংগঠন ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ গতিশীল (Perfectly mobile) বলে ধরে নেওয়া হয়। উপাদানের গতিশীলতা বলতে স্থানিক ও ব্যবহারিক উভয় প্রকার গতিশীলতার যে-কোনটিকে বোঝাতে পারে। কোন উপাদান যদি একস্থান থেকে অন্য স্থানে নিযুক্ত হয়, তাহলে তাকে স্থানগতভাবে গতিশীল বলতে পারা যায়। জমি ব্যতীত আর সব উপাদান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে পারে বলে এই সব উপাদানকে স্থানগতভাবে গতিশীল বলে ধরা যেতে পারে। জমির এইরূপ কোন স্থানগত গতিশীলতা নেই। এক স্থানের জমি অন্য স্থানে যেতে পারে না।

জমির ক্ষেত্রে স্থানিক গতিশীলতা না থাকলেও ব্যবহারিক গতিশীলতা থাকতে পারে। কোন একটি জমিকে যদি ধানচাষে না লাগিয়ে পাটচাষে লাগানো যায় তাহলে জমি ব্যবহারিক দিক দিয়ে ধানচাষ থেকে পাটচাষে সরে যায়। এক্ষেত্রে জমি ব্যবহারিক দিক দিয়ে গতিশীল।

উপাদানের এইরূপ গতিশীলতা থাকায় পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন-ব্যবস্থার সর্বত্র একসময়ে একটি মাত্র মজুরীর হার, খাজনা, সুদের হার ও মুনাফা চালু থাকে। অর্থাৎ উপাদানের পূর্ণ গতিশীলতার ফলে উপাদানের মজুরী সর্বত্র সমান হয়। কোথাও যদি কিছুদিনের জন্য শ্রমের মজুরীর হার বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেই স্থানে সব শ্রমিক গিয়ে ভিড় করে। তখন সেখানে শ্রমের যোগান তার চাহিদার থেকে বেশি হয়ে যায় এবং মজুরী কমে যায়। আবার কোথাও মজুরীর হার কম হলে সে স্থান থেকে অনেক শ্রমিক অন্য স্থানে চলে যায়। তখন সেখানে শ্রমের যোগান চাহিদার তুলনায় কম থাকে, ফলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পায়। এইভাবে অন্ততঃপক্ষে দীর্ঘকাল দেশের সকল স্থানে একটিমাত্র মজুরীর হার চালু থাকে। অন্যান্য উপাদানের গতিশীলতা থাকলেও তাদের পাওনা সর্বত্র সমান হয়। জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও সংগঠন বা উদ্যোগের মুনাফা ইত্যাদি উপাদানের পাওনাগুলিও সমান হয়। কিন্তু উপাদানগুলি যদি গতিশীল না হয়, তাহলে মজুরীর হার, সুদের হার ইত্যাদি দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হবে। প্রাকৃতিক বা মানবিক কারণে কোন উপাদান তার গতিশীলতা হারিয়ে ফেলতে পারে। ফলে শ্রমের মজুরী কোথাও বেশি. কোথাও কম হতে পারে। অন্যান্য উপাদান প্রসঙ্গেও এইরূপ বলা যেতে পারে।

(গ) পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলে বাজারে একটি ফার্ম কীভাবে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে, তা আলোচনার সময় ধরে নেওয়া হয় যে, ফার্মের উৎপাদন-ব্যয় ব্যতীত অন্য কোন ব্যয় থাকে না, ফলে পণ্যের দাম কেবলমাত্র উৎপাদনের ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। আলোচনাকে সহজ করার জন্যই এইরূপ ধরা হয়ে থাকে। এর বিশেষ কোন গুরুত্ব নেই, বরং বাস্তবে দেখা যায় উৎপাদন-ব্যয় ব্যতীত ফার্মের আরো অনেক রকমের ব্যয় আছে (যথা, পরিবহণ-ব্যয়, বিজ্ঞাপন-ব্যয়, সংরক্ষণ-ব্যয়, বীমার জন্য ব্যয় ইত্যাদি) এবং সেই ব্যয়গুলিও পণ্য-মূল্যকে প্রভাবিত করে। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য এইসব অন্যান্য ব্যয় বাদ দেওয়া

১৯.২. পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ব্যয় ও আয়ের স্বরূপ :

যে-কোন ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হল দ্রব্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয় করা। দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য ফার্মের মালিককে আবার নানারূপ উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। সেইজন্য ফার্মকে উপাদানের বাজারে যেতে হয় উপাদানের ক্রেতা হিসেবে। ফার্ম শ্রম, জমি ও মূলধনের বাজারে যায় এবং মজুরী,

খাজনা ও সুদের বিনিময়ে যথাক্রমে শ্রম, জমি ও মূলধন ক্রয় করে। এইভাবে শ্রম, জমি ও মূলধন সংগৃহীত হলে পর ফার্ম তাদের সার্থক উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করে এবং দ্রব্য উৎপাদন করে। দ্রব্য উৎপাদিত হওয়ার পর ফার্ম সেই উৎপন্ন দ্রব্য পণ্যের বাজারে বিক্রয় করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, একটি ফার্ম একই সঙ্গে দুটি বাজারের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। কোন একটি ফার্ম উপাদানের বাজারের ক্রেতা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে বিক্রেতা হিসেবে কাজ করে। ফার্ম উপাদানের বাজার থেকে যেসব উপাদান সংগ্রহ করে, তাদের পরিমাণ ও দাম ফার্মের ব্যয় নির্ধারণ করে এবং ফার্ম উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে যেসব দ্রব্য বিক্রয় করে, তাদের পরিমাণ ও দাম ফার্মের আয় নির্ধারণ করে। অন্যভাবে বলা যায়, উপাদানের বাজারের অবস্থা ফার্মের ব্যয়কে প্রভাবিত করে এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারের অবস্থা ফার্মের আয়কে প্রভাবিত করে।

এই দুটি বাজারে বিভিন্ন রকম অবস্থা থাকতে পারে, যেমন—

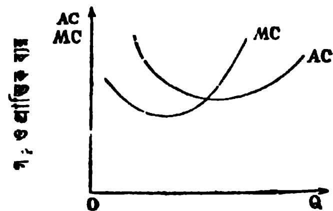
(১) উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ-প্রতিযোগিতা, কিংবা (২) উভয় বাজারে অপূর্ণ-প্রতিযোগিতা, কিংবা (৩) উপাদানের বাজারে-অপূর্ণ-প্রতিযোগিতা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ-প্রতিযোগিতা, কিংবা (৪) উপাদানের বাজারে পূর্ণ-প্রতিযোগিতা এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ-প্রতিযোগিতা এইসব বিভিন্ন অবস্থাগুলি ফার্মের আয় ও ব্যয়কে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করবে। তাদের সবগুলির আলোচনা করা সহজ নয়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরব যে, উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ-প্রতিযোগিতা আছে।

উপাদানের বাজারে পূর্ণ-প্রতিযোগিতা থাকলে কোন একটি ফার্ম উপাদানের দাম নির্ধারণ করতে পারবে না। উপাদানের দাম নির্দিষ্ট হবে উপাদানের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের দ্বারা। একটি ফার্ম কোন উপাদানের জন্য যে চাহিদার সৃষ্টি করবে, সেই চাহিদা হবে মোট চাহিদার একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। ফার্ম যদি তার নিজস্ব চাহিদা বৃদ্ধি করে তাহলে তার ফলে উপাদানের মোট চাহিদার কোন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হবে না এবং উপাদানের নির্দিষ্ট দামেরও কোন পরিবর্তন হবে না। অতএব পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক উপাদানের বাজারে কোন একটি ফার্ম উপাদানের দামকে প্রভাবিত করতে পারবে না। মোট চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত দামকে একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির ধরে নিয়ে যে-কোন পরিমাণ উপাদান ক্রয় করতে পারবে। উপাদানের পরিমাণ ও উপাদানের দাম—এই দুটি বিষয়ের মধ্যে উপাদানের ক্রয়ের পরিমাণই কেবলমাত্র একটি ফার্মের বিবেচনার বিষয় হিসেবে থাকবে। উৎপাদনের উপাদানগুলি হল জমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন এবং এদের প্রতি একক সেবার দাম যথাক্রমে খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা। পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক উপাদানের বাজারে কোন একটি ফার্ম খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা নির্ধারণ করতে পারবে না। নির্দিষ্ট মজুরীতে একটি ফার্ম কোন উপাদানের কী পরিমাণ ক্রয় করবে তাই হবে তার বিবেচ্য বিষয়।

তাহলে পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক উপাদানের বাজারে একটি ফার্ম নির্দিষ্ট মজুরীতে শ্রম, নির্দিষ্ট খাজনায় জমি এবং নির্দিষ্ট সুদের হারে মূলধনের যে-কোন পরিমাণ সংগ্রহ করতে পারবে। এমনকি সংগঠন নামক উপাদানের নিম্নতম যোগান-দাম যে স্বাভাবিক মুনাফা, তা-ও নির্দিষ্ট থাকবে। এই অবস্থায় ফার্মের উৎপাদন ব্যয় নির্ধারিত হবে কেবলমাত্র উপাদানের পরিমাণের দ্বারা।

ফার্ম যদি বেশি উপাদান নিয়োগ করে তাহলে তার ব্যয় বেশি হবে, যদি কম উপাদান নিয়োগ করে, তাহলে ফার্মের ব্যয়ও কম হবে। আবার, ফার্ম কী পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করবে তা-ও নির্ভর করে সে কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে চায় তার উপর এবং উৎপাদনের পরিমাণের সঙ্গে উপাদানের পরিমাণের কেমন কারিগরী সম্পর্ক আছে তার উপর। উৎপাদন ও উপাদানের মধ্যে যে কারিগরী সম্পর্ক থাকে, তাকে উৎপাদন-প্রকরণ বলা হয়। তাহলে আমরা পাই, পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক উপাদানের বাজারে ফার্মের ব্যয় নির্ধারিত হয় (ক) উপাদানের পরিমাণ দ্বারা। উপাদানের পরিমাণ নির্ধারিত হয় (ক) ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ এবং (খ) উৎপাদন-প্রকরণ নামক কারিগরী বিষয়ের দ্বারা। আমরা যদি উৎপাদন অপেক্ষককে প্রদত্ত বিষয় হিসাবে ধরে নিই, তাহলে ফার্মের ব্যয় নির্ধারিত হবে উৎপাদনের পরিমাণের উপর ফার্মের সিদ্ধান্তের দ্বারা!

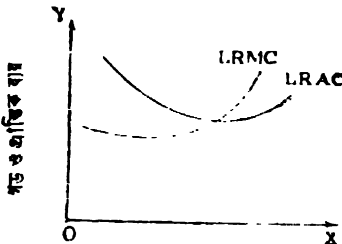
আমরা জানি ফার্মের ব্যয় উৎপাদনের সময়-সীমার উপরেও নির্ভর করে। সময়-সীমার মধ্যে দুটি "কাল" থাকতে পারে—যথা, (ক) স্বল্পকাল ও (খ) দীর্ঘকাল। স্বল্পকালে কতগুলি উৎপাদন স্থির থাকে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির পরিমাণ বৃদ্ধি করেই তা করতে হয়। এই অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু গড় ও প্রান্তিক ব্যয় প্রথম দিকে হ্রাস পায়, পরে বৃদ্ধি পায়। এইভাবে গড় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা U আকৃতিবিশিষ্ট হয়। ১১.১নং রেখাচিত্রে ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা হল যথাক্রমে AC ও MC রেখা দুটি।



১১.১ রেখাচিত্র : পূর্ণ-প্রতিযোগিতা-মূলক ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা

দীর্ঘকালে সব উপাদানগুলি পরিবর্তনশীল হলেও কার্যত এই পরিবর্তনশীলতার মধ্যেও সাময়িক সুবিধা ও অসুবিধা থাকতে পারে, যার ফলে দীর্ঘকালেও ফার্মের গড় ব্যয়-রেখা U আকৃতিবিশিষ্ট হয়, কিন্তু এই U আকৃতি এত তীব্র হয় না, কিছুটা চ্যাপ্টা ধরনের হয়।

১১·২নং রেখাচিত্রে LRMC হল ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়-রেখা।



১১·২ রেখাচিত্র: পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয়-রেখা

এখানে LRMC রেখা হল ফার্মের দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়-রেখা। এই রেখাটিও প্রথমে নিম্নমুখী ও পরে ঊর্ধ্বমুখী হয় এবং এটি LRAC রেখাকে তার নিম্নতম বিন্দুতে ছেদ করে। এই হল পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ব্যয়-চিত্র। এবার তার আয়-চিত্রটি লক্ষ্য করা যাক।

ফার্ম দ্রব্য উৎপাদন করে ও বিক্রয় করে। যে বাজারে ফার্ম দ্রব্য বিক্রয় করে, সেই বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তাহলে একটি ফার্মের কাছে দ্রব্যের দাম কখনই নির্ধারণ করবার মত বিষয় হবে না বরং এটি হবে নির্ধারিত বিষয়। দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হবে দ্রব্যের মোট যোগান ও মোট চাহিদার দ্বারা।

উৎপাদনের বাজারে ফার্ম দ্রব্যের যোগান দেয়। তার নিজস্ব যোগান এখানে মোট যোগানের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ হবে। ফার্ম যদি নিজস্ব যোগান বৃদ্ধি করে, তাহলেও মোট যোগানের বিশেষ কোন পরিবর্তন হবে না। একটি ফার্ম দ্রব্যের মোট যোগানকে প্রভাবিত করতে পারবে না। কাজেই দ্রব্যের দামকেও সে প্রভাবিত করতে পারবে না। মোট যোগান ও চাহিদার দ্বারা যে দাম নির্ধারিত হবে, ফার্ম সেই নির্ধারিত দাম গ্রহণ করে নিয়ে ঠিক করবে সেই দামে তার পক্ষে কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা লাভজনক হবে। এখানে ফার্ম দাম-গ্রাহক (Price taker) কিন্তু দাম নির্ধারক (Price maker) নয়, বরং সে তার উৎপাদনের পরিমাণ-নির্ধারক। অন্যভাবে বলা যায়, পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক একটি ফার্ম দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না, বরং মোট চাহিদা ও যোগানের দ্বারা যে দাম নির্ধারিত হয়, সেই দামে সে যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারবে। যেমন, বাজারে দ্রব্যটির দাম যদি ১০ টাকা হয়, তাহলে একটি ফার্ম এই ১০ টাকা দামে ১ একক, ২ একক, ২০০ একক বা যে-কোন একক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারে, তাতে দামের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। আমরা জানি দ্রব্যের প্রতি এককের যে দাম তাই হল বিক্রেতার গড় আয়। দাম যদি ১০ টাকা হয়, তাহলে ফার্মের গড় আয়ও ১০ টাকা হবে। দাম যতক্ষণ ১০ টাকায় স্থির থাকবে, প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় আয়-রেখা ততক্ষণ উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল হবে। দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে ফার্মের গড় আয়-রেখা সমান্তরালই থাকবে কিন্তু উপরের দিকে উঠে যাবে। দাম যদি কমে যায়, তাহলে ফার্মের গড় আয়-রেখাও সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যাবে। অর্থাৎ পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় আয় বিভিন্ন স্তরে স্থির থাকতে পারে। আবার গড় আয় যদি স্থির থাকে, তাহলে প্রান্তিক

আরও স্থির থাকে। নীচের তালিকায় একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে এটি দেখানো হয়েছে।

এখানে দ্রব্যের দাম বা ফার্মের গড় আয় = ১০ টাকা ধরা হয়েছে। ফলে ১, ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি এককের জন্য ফার্মের গড় আয় ১০ টাকায় স্থির আছে এবং প্রান্তিক আয়ও ১০ টাকায় স্থির হয়ে আছে: তাহলে আমরা পাই (ক) যদি গড় আয় স্থির থাকে, তাহলে প্রান্তিক আয়ও স্থির থাকবে এবং (খ) গড় আয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হবে।

উৎপাদন বা বিক্রয়	গড় আয় বা দাম	মোট আয়	প্রান্তিক আয়
১ একক	১০ টাকা	১০ টাকা	১০ টাকা
২ "	১০ "	২০ "	১০ "
৩ "	১০ "	৩০ "	১০ "
৪ "	১০ "	৪০ "	১০ "
৫ "	১০ "	৫০ "	১০ "

রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায় ফার্মের গড় আয়-রেখা যদি উৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়, তাহলে প্রান্তিক আয়-রেখাও উৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হবে। শুধু তাই নয়—সেক্ষেত্রে গড় আয়-রেখা ও প্রান্তিক আয়-রেখা পরস্পর মিলিত হয়ে থাকবে। অর্থাৎ উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল করে একটি রেখা অঙ্কন করলে সেই রেখাটিই ফার্মের গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) সূচিত করবে। যদি বাজারে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়, তাহলে ফার্মের AR = MR রেখা সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠবে এবং যদি বাজারে দ্রব্যের দাম কমে, তাহলে ফার্মের AR = MR রেখাও সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নামবে। কিন্তু বাজারে দ্রব্যের দাম কেন বাড়বে বা কমবে? তার নানা কারণ থাকতে পারে। দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়ার পিছনে থাকতে পারে—(ক) বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি অথবা (খ) যোগান-হ্রাস অথবা, (গ) চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাস উভয়ে অথবা (ঘ) অন্য কোন কারণ।

আমরা যদি অন্য সব কারণ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র চাহিদা-বৃদ্ধিকে ধরি, তাহলে বাজারে দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলেই দাম বৃদ্ধি পাবে, আবার সামগ্রিক চাহিদা যদি কোন কারণে হ্রাস পায়, তাহলে দামও কমবে। ১১.৩ নং রেখাচিত্রে চাহিদার পরিবর্তনের ফলে কীভাবে বাজারে দ্রব্যের দামের বৃদ্ধি বা হ্রাস হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের AR = MR রেখাও কীভাবে উঠছে বা নামছে তা দেখানো হয়েছে।

এখানে বামদিকের রেখাচিত্রে SS′ হল বাজারের মোট যোগান-রেখা। এটি

স্থির আছে। DD_1 হল প্রথম চাহিদা রেখা। দাম $=OP_1$. ডানদিকের রেখা-চিত্রে দেখা যাচ্ছে বাজারে দাম যখন OP_1 তখন ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখা

১১.৩. রেখাচিত্র : পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখা ও তার ওঠা-নামা

$AR_1=MR_1$ রেখা OP_1 স্তরে স্থির আছে। ফার্ম এই দামে যে-কোন পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দিতে পারে। কাজেই ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখা উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল হবে।

এখন কোন কারণে যদি বাজারের চাহিদা বেড়ে যায়, তাহলে চাহিদা-রেখাটি ডানদিকে সরে যাবে। ধরলাম চাহিদা-রেখা হল DD_2. তাহলে দামও বৃদ্ধি পেয়ে OP_2 হবে। ডানদিকের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে বাজারে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখাও কীভাবে সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যায়। আবার বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কোন কারাণ যদি কমে যায়, তাহলে চাহিদা-রেখা নীচের দিকে নেমে যাবে। ধরলাম, এখন চাহিদা-রেখাটি হল DD_3 তাহলে দাম হবে OP_3. ডানদিকের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে বাজারে দাম হ্রাস পেলে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখাও সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যায়। অতএব বামদিকের রেখাচিত্রে বাজারের চাহিদা, যোগান ও দ্রব্যের দামের বিভিন্ন অবস্থা দেখানো হয়েছে এবং ডানদিকের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে, বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের ফলে ফার্মের সামনেও নতুন নতুন অবস্থার উদ্ভব হচ্ছে। কখনো ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখা উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, কখনো আবার নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। দামের এই ওঠা-নামার ব্যাপারে একটি পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের কোন ভূমিকা নেই।

১১.৩. স্বাভাবিক মুনাফা ও তার ভূমিকা :

ফার্মের মালিক উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করেন, তাদের উৎপাদনকার্যে সার্থকভাবে নিয়োগ করেন, উৎপাদনকার্যকে পরিচালনা করেন এবং উৎপাদনক্রিয়ার শেষে প্রাপ্ত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্রব্যর বিক্রয় থেকে যে বিক্রয়লব্ধ আয় পাওয়া যায়, তা থেকে

ভাড়াটিয়া উপাদানসমূহের মালিকদের পাওনা মেটান, যেমন—শ্রমিকদের মজুরী দেন, জমির মালিককে খাজনা দেন এবং মূলধনের মালিককে সুদ দেন। এখানে জমি, শ্রম ও মূলধন বাইরে থেকে সংগৃহীত হয়েছিল বলে ধরা হয়। মালিক যদি নিজস্ব শ্রম, জমি ও মূলধন দেন, তাহলে তিনি বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে নিজের শ্রমের জন্য মজুরী, নিজের জমির জন্য খাজনা এবং নিজের মূলধনের জন্য সুদ পেয়ে থাকেন। এরপরও আরো কিছু পাওয়ার থাকে।

ফার্মের মালিক সংগঠন বা উদ্যোগ নামক যে সেবা দেন, উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন, তার জন্য তিনি পারিশ্রমিক পান। এই পারিশ্রমিককে স্বাভাবিক মুনাফা বলা হয়। ফার্মের মালিক সংগঠন বা উদ্যোগ নামক সেবা দেওয়ার জন্য কী পরিমাণ স্বাভাবিক মুনাফা পাবেন, সেটা নির্ভর করছে তাঁর বিকল্প আয়ের উপর। ফার্মের মালিক যদি নিজে ফার্ম না খুলে অন্য কোন ফার্মে বেতনভোগী ম্যানেজার বা অন্য কোন কর্মচারী হিসাবে কাজে করতেন, তাহলে তিনি যে পারিশ্রমিক পেতেন, নিজের ফার্ম থেকে মালিক কমপক্ষে সেই পরিমাণ মুনাফা পাবার আশা করেন। এই মুনাফা না পেলে তিনি উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করতে রাজী হবেন না। কাজেই স্বাভাবিক মুনাফা হল সেই নিম্নতম পারিশ্রমিক যা ফার্মের মালিক তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে পাবার আশা করেন এবং যা না পেলে তিনি উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করতে রাজী থাকেন না।

ফার্মের মালিক অন্যত্র বেতনভোগী কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত হলে যে পারিশ্রমিক পান, তাঁর স্বাভাবিক মুনাফা তাঁর সেই বিকল্প আয়ের সমান হয়।

স্বাভাবিক মুনাফার বৈশিষ্ট্য

স্বাভাবিক মুনাফার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, স্বাভাবিক মুনাফা মালিক নিজের কাছ থেকে পান। সেইজন্য একে অন্তর্নিহিত পাওনা (Implicit earning) বলা যায়। ফার্মের মালিক যেসব ভাড়াটিয়া উপাদান নিয়োগ করেন, তাদের পাওনা হল ব্যক্ত বা স্পষ্ট ব্যয়। কিন্তু স্বাভাবিক মুনাফা তেমন স্পষ্ট নয়।

দ্বিতীয়ত, স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ। তাহলে ফার্মের উৎপাদন-ব্যয়ের মধ্যে থাকে—শ্রমের জন্য মজুরী, চ[illegible] ও স্থায়ী মূলধনের সুদ, জমির জন্য খাজনা এবং মালিকের স্বাভাবিক মুনাফা। এখন মোট উৎপাদন ব্যয়কে যদি উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে যে গড় ব্যয় পাওয়া যায়, তার মধ্যে থাকে মজুরী, সুদ, খাজনা ও স্বাভাবিক মুনাফা।

তৃতীয়ত, স্বাভাবিক মুনাফা যেহেতু উৎপাদন-ব্যয়ের অংশ, অতএব স্বাভাবিক মুনাফা সাধারণত শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে না।

স্বাভাবিক মুনাফা ফার্মের মালিকের বিকল্প আয়ের সমান। ফার্মের মালিকের যদি কোন বিকল্প আয় না থাকে, তাহলেই স্বাভাবিক মুনাফা শূন্য হতে পারে।

কিন্তু স্বাভাবিক মুনাফা যদি মালিকের একমাত্র আয় হয় এবং মালিকের জীবনধারণের ব্যয় যদি শূন্য না হয়, তাহলে স্বাভাবিক মুনাফাও শূন্য হতে পারে না। দ্রব্যের দাম যদি গড় উৎপাদন-ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ফার্মের মালিক স্বাভাবিক মুনাফা ছাড়াও আরো অতিরিক্ত মুনাফা পেয়ে থাকেন। একে অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক মুনাফা বলা হয়। দ্রব্যের দাম যদি গড়-ব্যয়ের সমান হয়, তাহলে মালিকের কোন অতিরিক্ত মুনাফা থাকে না, কিন্তু স্বাভাবিক মুনাফা থাকে। আবার দাম যদি গড়-ব্যয়ের চেয়ে কম হয়, তাহলে ফার্মের ক্ষতি হয়। ক্ষতি হলে তো ফার্মের মালিককে যে-কোনভাবে পাওনাদারদের পাওনা মেটাতে হয়। সেই টাকাটা তাঁকে স্বাভাবিক মুনাফা নামক তাঁর একমাত্র আয় থেকেও দিতে হতে পারে।

১১.৪. পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ও তার বিভিন্ন অবস্থা .

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য আলোচনা করতে হলে প্রথমেই পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের আয় ও ব্যয়ের স্বরূপ জানতে হবে।

পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের আয়ের স্বরূপ :

পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক দ্রব্যের বাজারে অসংখ্য ফার্ম একটি সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে। এখানে সব ফার্ম নিয়ে গড়ে ওঠে একটি শিল্প (Industry)। প্রত্যেকটি ফার্ম যে পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দেয়, সেই যোগান এখানে শিল্পের মোট যোগানের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। কাজেই কোন একটি ফার্ম নিজের চেষ্টায় দ্রব্যের মোট যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে না। একটি ফার্ম দ্রব্যের যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে না বললে বোঝায় যে—একটি ফার্ম দ্রব্যের দামকেও প্রভাবিত করতে পারে না। দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় বাজারের মোট চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। একটি ফার্ম এই দামকে শিরোধার্য করে নেয়। আমরা বলি পূর্ণ-প্রতিযোগিতা-মূলক দ্রব্যের বাজারে একটি ফার্ম হল দাম-গ্রহীতা (Price taker)।

দ্রব্যের দাম হল ফার্মের গড় আয়। পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে না বললে বোঝায়—ফার্ম তার গড় আয়কেও প্রভাবিত করতে পারে না। পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় আয় নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে। ফার্ম বেশি দ্রব্য বিক্রয় করলেও তার গড় আয় যা থাকে, কম করলেও তা-ই থাকে।

রেখাচিত্রের ভাষায় বললে বলা যাবে— পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় আয়-রেখা উৎপাদন-পরিমাপক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়।

আমরা জানি যে, গড় আয় যখন স্থির থাকে, তখন ফার্মের প্রান্তিক আয়ও স্থির থাকে, এবং প্রান্তিক আয় গড়-আয়ের সমান হয়। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়, যখন গড়-আয় রেখা উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল হয়, তখন প্রান্তিক আয়-রেখা গড় আয়-রেখার সঙ্গে মিলে যায় ; অর্থাৎ - একটি রেখা দ্বারাই গড় ও প্রান্তিক আয় সূচিত হয়।

এখন বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন হলে দ্রব্যের দামেরও পরিবর্তন হবে এবং সেই সঙ্গে পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখারও অবস্থানের পরিবর্তন হবে।

যদি দাম বাড়ে, তাহলে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখা সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যায়। দাম কমলে সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যায়। এটি ১১.৩নং রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে।

১১.৩নং রেখাচিত্রে $AR = MR$ হল ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখা। দ্রব্যের দাম যখন OP_1, তখন ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখা হল $AR_1 = MR_1$ রেখা। দাম যদি বেড়ে OP_2 হয়, তাহলে ফার্মের $AR = MR$ রেখা উপরের দিকে উঠে যায় এবং $AR_2 = MR_2$ রেখা হয়, আবার, দাম যদি কমে গিয়ে OP_3 হয়, তাহলে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়-রেখা হয় $AR_3 = MR_3$.

পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ব্যয়ের স্বরূপ :

স্বল্পকালে ফার্মের ব্যয়কে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা—মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়। কাজেই ফার্মের গড় ব্যয়ও দুভাগে বিভক্ত হবে, যথা—গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়। ধরি, গড় স্থির ব্যয় = Average Fixed Cost বা AFC। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় = Average Variable Cost বা AVC এবং গড় ব্যয় = Average Cost বা AC. তাহলে আমরা পাই, $AC = AFC + AVC$.

ফার্মের পরিবর্তনশীল ব্যয় উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে বা কমে। ফার্ম যদি কোন উৎপাদন না করে, তাহলে তার কোন পরিবর্তনশীল ব্যয় হয় না। কিন্তু স্থির ব্যয় এমন নয়। স্থির ব্যয় হল ফার্মের চুক্তিভিত্তিক ব্যয় (Contractual Cost)।

স্বল্পকালে ফার্ম যে সব স্থির উপাদান নিয়োগ করে, তাদের জন্য ফার্মের যে ব্যয় হয়, তাকেই স্থির ব্যয় বলা হয়। ফার্মের স্থির ব্যয় ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। ফার্মের উৎপাদন শূন্য হলেও তাকে স্থির উপাদানগুলির ব্যয় মেটাতে হয়। স্থির ব্যয় ফার্মের মাথার উপরে খড়্গের মত ঝোলে। সেইজন্য ইংরেজীতে একে Overhead Cost বলা হয়।

স্বল্পকালে ফার্মের মোট ব্যয়ের মধ্যে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় থাকে বলে তার গড় ব্যয় বা AC-র মধ্যেও AFC ও AVC থাকে। ফার্মের AC থেকে AVC বিয়োগ করলে AFC পাওয়া যায়, কারণ $AC = AFC + AVC$।

অতএব $AC - AVC = AFC$. এখন স্বল্পকালে ফার্মের উৎপাদন যত বৃদ্ধি পায়, AFC তত কমে আসে, কাজেই AC ও AVC-র ব্যবধান ক্রমশ কমে আসে। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায় একই রেখাচিত্রে ফার্মের স্বল্পকালীন AC ও AVC রেখা আঁকলে তাদের মধ্যবর্তী ব্যবধান থাকবে ফার্মের AFC এবং AFC ক্রমহ্রাসমান হওয়ায়

ফার্মের AC ও AVC রেখা দুটির ব্যবধান ক্রমশ কমে আসবে। আমরা জানি, স্বল্পকালে ফার্মের AC ও AVC রেখা U আকৃতির হয়। তাহলে U আকৃতিবিশিষ্ট AC ও AVC রেখা দুটির মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমশ কমে আসে।

(গ) ভারসাম্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবস্থা ঃ

দ্রব্যের দাম, ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় ও ব্যয়ের সম্পর্ক ঃ

একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে না ; নির্ধারিত দামে যত ইচ্ছা দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারে। এখন এই দামকে যদি ফার্মের গড় ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে আমরা তিন রকম অবস্থার কথা ভাবতে পারি ঃ

(১) প্রথমত, দ্রব্যের দাম (P) গড় ব্যয় (AC) অপেক্ষা বেশি হতে পারে, অর্থাৎ $P > AC$ হতে পারে ;

(২) দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের দাম (P) গড় ব্যয়ের সমান হতে পারে, অর্থাৎ $P = AC$ হতে পারে ;

(৩) তৃতীয়ত, দ্রব্যের দাম (P) গড় ব্যয়ের চেয়ে কম হতে পারে, অর্থাৎ $P < AC$ হতে পারে।

আমরা জানি, ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা = ফার্মের মোট আয় − ফার্মের মোট ব্যয়। ধরি π = ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা,

R = মোট আয়,

C = মোট ব্যয়,

তাহলে আমরা পাই,

$$R - C = \pi$$

অতএব $R = C$ হলে $\pi = O$ হবে,

অর্থাৎ $AR = AC$ হলে $\pi = O$ হবে,

এবং $AR > AC$ হলে $\pi > O$ হবে,

এবং $AR < AC$ হলে $\pi < O$ হবে।

আবার, ফার্মের AR = দ্রব্যের দাম = P, তাহলে আমরা বলতে পারি ঃ

(১) $P > AC$ হলে ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা হবে,

(২) $P = AC$ হলে ফার্মের কোন অতিরিক্ত মুনাফা হবে না,

এবং (৩) $P < AC$ হলে, ফার্মের ক্ষতি হবে।

অতএব পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালে একটি ফার্ম তিনটি অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে ঃ (১) $P > AC$ হতে পারে, এখানে ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা হবে ; (২) $P = AC$ হতে পারে, এখানে ফার্মের কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা হবে, এবং (৩) $P < AC$ হতে পারে, এখানে ফার্মের ক্ষতি হবে। কিন্তু ক্ষতি হলেই কি ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে ? এর উত্তরে বলা যায় যে, P যদি

AC অপেক্ষা কম কিন্তু AVC অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে সে উৎপাদন চালু রাখবে, কারণ উৎপাদন চালু রাখলেই তার পক্ষে বিক্রয়লব্ধ আয় থেকে স্থির ব্যয়ের কিছুটা মেটানো সম্ভব হবে। অপরপক্ষে, দাম যদি AVC অপেক্ষাও কম হয়ে যায়, তাহলে ফার্ম নিঃসন্দেহে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। একটি উদাহরণ দিয়ে এটি বোঝানো যায়। ধরি, কোন ফার্ম ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করে, যার জন্যে তার ব্যয় হয় ৫০০ টাকা, তার মধ্যে ধরি, ৩০০ টাকা পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং ২০০ টাকা স্থির ব্যয়। এখানে AC=৫০ টাকা, AVC=৩০ টাকা ও AFC=২০ টাকা। ধরি, P=৪০ টাকা। ফার্মের মোট আয় ৪০০ টাকা। এখানে ফার্মের ক্ষতি হয় ১০০ টাকা। এই অবস্থায় ফার্মটি যদি উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, তাহলে তাকে স্থির ব্যয় মেটাতে হবে এবং তার জন্য তার ক্ষতি হবে ২০০ টাকা। অতএব ফার্ম ক্ষতি সত্ত্বেও উৎপাদন চালু রাখবে। অর্থাৎ যদি P>AVC কিন্তু P<AC হয়, তাহলে ফার্মের ক্ষতি হবে; কিন্তু ক্ষতি সত্ত্বেও সে উৎপাদন চালু রাখবে। এটি হল তৃতীয় অবস্থার অন্তর্গত প্রথম অবস্থা। একে ৩ (ক) অবস্থা বলা যায়।

কিন্তু দাম আরো কমে গিয়ে যদি ৩০ টাকা (P=AVC) হয়, তাহলে ফার্মটি উৎপাদন চালু রাখলেও তার যে ক্ষতি হবে, উৎপাদন বন্ধ করে দিলেও তার সেই একই পরিমাণ ক্ষতি হবে। এক্ষেত্রে ফার্মটি কী করবে বলা যাবে না। যদি ফার্মটি ভবিষ্যতে সুদিনের আশা রাখে, তাহলে হয়তো উৎপাদন চালিয়ে যাবে। অতএব P=AVC হলে ফার্ম চালু রাখতে পারে, আবার বন্ধ করে দিতেও পারে। এটি হল তৃতীয় অবস্থার অন্তর্গত দ্বিতীয় অবস্থা। একে ৩ (খ) অবস্থা বলা যায়।

দ্রব্যের দাম যদি AVC-র নীচে চলে যায়, যদি P<AVC হয়, তাহলে ফার্ম নিঃসন্দেহে উৎপাদন বন্ধ করে দে॰। যেমন—দ্রব্যের দাম যদি ২০ টাকা হয়, তাহলে ফার্মের মোট আয় হবে ২০০ টাকা। কিন্তু ব্যয় হবে ৫০০ টাকা। অতএব ফার্মের ক্ষতি হবে ৩০০ টাকা। ফার্মটি যদি উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, তাহলে তার ক্ষতি হবে ২০০ টাকা। অতএব আমরা ৩ (গ) অবস্থাটি পাই: যেখানে P<AVC, সেখানে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে।

দেখা যাচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পাঁচটি অবস্থার উদ্ভব হতে পারে•

(১) P>AC (ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা হবে);

(২) P=AC (ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা হবে);

(৩ক) P<AC কিন্তু P>AVC (ক্ষতি হলেও ফার্ম উৎপাদন চালু রাখবে);

(৩খ) P=AVC (উৎপাদন চালু রাখলে বা বন্ধ করে দিলে ফার্মের সমান ক্ষতি হবে);

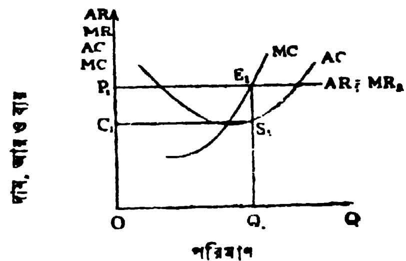
(৩গ) P<AVC (ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে)।

পরপৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের সাহায্যে এই অবস্থাগুলি দেখানো হল। এখানে প্রত্যেকটি রেখাচিত্রের OX-অক্ষে দ্রব্যের উৎপাদন বা পরিমাণ পরিমাপ করা হচ্ছে। OY-

অক্ষে পরিমাপ করা হচ্ছে ফার্মের আয় (গড় ও প্রান্তিক), ব্যয় (গড় ও প্রান্তিক) এবং দ্রব্যের দাম। প্রত্যেকটি রেখাচিত্রে AC হল গড় ব্যয় রেখা, MC প্রান্তিক ব্যয় রেখা, AR = MR হল গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা। ৩(ক), ৩(খ), ৩(গ) রেখাচিত্রে AVC হল গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা। স্বল্পকালে ফার্ম যত উৎপাদন বৃদ্ধি করে ততই তার গড় স্থির ব্যয় কমে, কাজেই AC ও AVC রেখার ব্যবধান (AFC) ক্রমশ কমে যায়। পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেখানে MC রেখা নীচের দিক থেকে MR রেখাকে ছেদ করেছে সেখানেই ফার্মের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা জানি, ভারসাম্যের শর্ত হল MR = MC এবং ভারসাম্য বিন্দুর ডান দিকে MC > MR. যেখানে MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করে সেখানে এই দুটি শর্তই পালিত হয়।

প্রথম অবস্থা : P > AC (ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা হয়)।

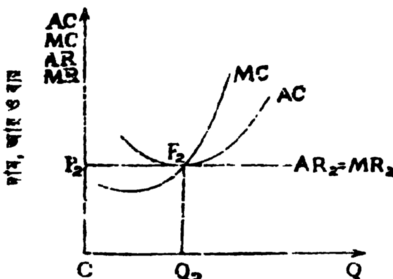
এখানে দাম $= OP_1 >$ গড় ব্যয় (AC)। ভারসাম্যের বিন্দু E_1. উৎপাদন $= OQ_1$. ফার্মের মোট আয় $= OP_1 \times OQ_1 = OP_1E_1Q_1$. গড় ব্যয় $= OC_1 = Q_1S_1$. মোট ব্যয় $= OC_1 \times OQ_1 = OC_1S_1Q_1$. অতএব ফার্মের মুনাফা = মোট আয়—মোট ব্যয় $= OP_1E_1Q_1 - OC_1S_1Q_1 = C_1P_1E_1Q_1$ এই ক্ষেত্রটিই হল ফার্মের সর্বাধিক অতিরিক্ত মুনাফা।



১১.৪ রেখাচিত্র : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

দ্বিতীয় অবস্থা : P = AC (ফার্মের কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা হয়)

এখানে ভারসাম্যের বিন্দু E_2. দাম $= OP_2$. উৎপাদন OQ_2. মোট আয় $= OP_2E_2Q_2$. E_2 বিন্দুটি AC রেখার নিম্নতম বিন্দু। কাজেই এখানে গড় ব্যয় $= Q_2E_2 = OP_2$. মোট ব্যয় $= OP_2E_2Q_2 =$ মোট আয়। অতএব ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা শূন্য। ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায়। এখানে E_2 বিন্দুতে ফার্মের আয় ও ব্যয় সমান বলে একে আয়-ব্যয় সমতার বিন্দু (Break-Even Point) বলা হয়।

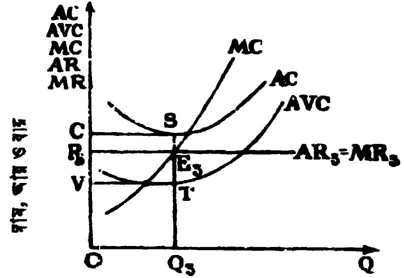


১১.৫ রেখাচিত্র : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

৩ (ক) তৃতীয় অবস্থায় অন্তর্গত প্রথম অবস্থা : P < AC (ফার্মের

ক্ষতি হয়) কিন্তু $P > AVC$ (ফার্ম ক্ষতি সত্ত্বেও উৎপাদন চালু রাখে)।

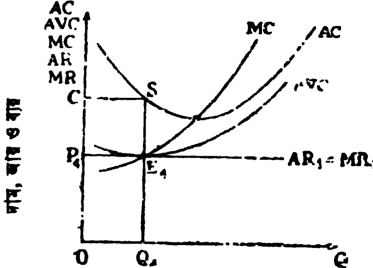
এখানে দাম $= OP_3$ গড় ব্যয়ের চেয়ে কম। ভারসাম্যের বিন্দু E_3. উৎপাদন $= OQ_3$. মোট আয় $= OP_3E_3Q_3$. গড় ব্যয় $= OC = Q_3S$. মোট ব্যয় $OCSQ_3$. তার মধ্যে $OVTQ_3$ হল মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং VCST হল মোট স্থির ব্যয়।



১১.৮ রেখাচিত্র : পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

এখানে ফার্মের ক্ষতি = মোট ব্যয় — মোট আয় $= OCSQ_3 - OP_3E_3Q_3 = P_3CSE_3$. ফার্ম যদি উৎপাদন বন্ধ করে দেয় তাহলে তার ক্ষতি হবে $VCST > P_3SCE_3$. অতএব ফার্মের পক্ষে উৎপাদন চালু রাখাই কম ক্ষতিকারক।

৩ (খ) তৃতীয় অবস্থার অন্তর্গত দ্বিতীয় অবস্থা $P > AC$, কিন্তু $P = AVC$. (এখানে উৎপাদন চালু রাখলে ফার্মের যে ক্ষতি হয় উৎপাদন বন্ধ করে দিলেও সমান পরিমাণ ক্ষতি হয়) এখানে দাম $= OP_4$. ভারসাম্যের বিন্দু E_4. (ধরে নেওয়া হচ্ছে যে ফার্ম উৎপাদন করবে) উৎপাদন $= OQ_4$. মোট আয় $= OP_4E_4Q_4$. এখানে গড় ব্যয় $= OC$. মোট ব্যয় $OCSQ_4$ তার মধ্যে P_4E_4SC হল স্থির ব্যয় এবং বাকি $OP_4E_4Q_4$ হল পরিবর্তনশীল ব্যয়। ফার্মের ক্ষতি = মোট ব্যয়—মোট আয় $= OCSQ_4 - OP_4E_4Q_4 = P_4CSE_4 =$ মোট স্থির ব্যয়। উৎপাদন বন্ধ করে দিলেও ফার্মের ক্ষতি সমান থাকবে।



১১.৭. রেখাচিত্রে : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

এখানে E_4 বিন্দুটি AVC রেখার নিম্নতম বিন্দু। $AR = MR$ রেখা AVC রেখাকে এই নিম্নতম বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। অতএব দাম = নিম্নতম গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়। এটাই হল দামের নিম্নতম সীমা। দাম যদি এর চেয়ে কম হয় তাহলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। সেইজন্য E_4 বিন্দুটিকে উৎপাদন বন্ধের বিন্দু (Shut down point) বলা হয়।

৩ (গ) তৃতীয় অবস্থার অন্তর্গত তৃতীয় অবস্থা $P\angle AVC = \angle AC$ (ফার্ম এখানে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে)।

এখানে দাম $= OP_5$. এই দাম ফার্মের নিম্নতম গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষাও কম। কাজেই ফার্মের পক্ষে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়াই ভালো হবে। এখানে ফার্মের ভারসাম্য ঘটবে না এবং উৎপাদনও হবে না।

১১.৮ রেখাচিত্র: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

১১.৫. ফার্মের আয়-ব্যয়ের সমতার বিন্দু এবং উৎপাদন বন্ধের বিন্দু (Break even point and shut down point of a firm) :

(১) আয়-ব্যয়ের সমতার বিন্দু : একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে না। এখানে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের মোট চাহিদা ও বিক্রেতাদের মোট যোগানের দ্বারা। পূর্ণ প্রতিযোগিতা-মূলক ফার্ম এই দামকে শিরোধার্য করে নেয় এবং সেই দামে যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে। কাজেই তার গড় ও প্রান্তিক আয়রেখা উৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়।

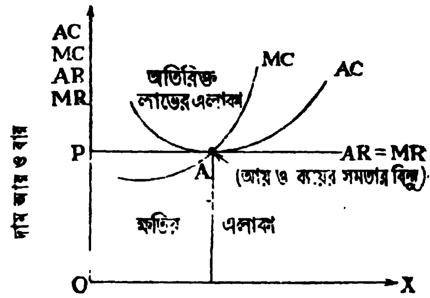
বাজারে দ্রব্যের দাম বেশি হতে পারে, আবার কমও হতে পারে। দাম কী হবে সেটা চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করছে। কোন একটি ফার্ম এই দামকে তার গড় উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে দেখবে যে, স্বল্পকালে দ্রব্যের দাম (ক) ফার্মের গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হতে পারে ($P > AC$) কিংবা (খ) দাম গড় ব্যয়ের সমান সমান হতে পারে ($P = AC$) অথবা (গ) দাম গড় ব্যয়ের চেয়ে কম হতে পারে ($P < AC$)।

(ক) দাম যদি গড় ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয় তাহলে ফার্ম অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক মুনাফা পাবে। (খ) দাম গড় ব্যয়ের সমান হলে ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাবে। (গ) দাম যদি গড় ব্যয়ের কম হয় তাহলে ফার্মের ক্ষতি হবে। এখানে $P = AC$ অবস্থাটি হল প্রথম ও তৃতীয় অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থা। প্রথম অবস্থায় দাম বেশি হওয়ায় ফার্মের পক্ষে অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হবে। একে আমরা একটি আলোকোজ্জ্বল অবস্থা বলতে পারি। আবার, তৃতীয় অবস্থায় ফার্মের ক্ষতি হচ্ছে। এটি হল অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা। কাজেই $P = AC$ হল এমন একটি অবস্থা যার উপরে আছে লাভের আলো, যার নীচে আছে ক্ষতির অন্ধকার। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, $P = AC$ অবস্থাটিতে ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা নেই, আবার ক্ষতিও নেই। আগে অতিরিক্ত মুনাফার আলো ছিল, এরপর হয়তো ক্ষতির অন্ধকার ছড়িয়ে

পড়বে। কাজেই এটি দিন শেষের ও রাত্রির আরম্ভের মধ্যবর্তী গোধূলি লগ্নের মতো একটি মধ্যবর্তী অদ্ভুত অবস্থা। ফার্মের গড়ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতে যেখানে উৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা গড় ব্যয় রেখাকে স্পর্শ করে—সেখানেই এই অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হয়। আমাদের ১১.৯নং রেখাচিত্রে এই অবস্থাটি দেখানো হয়েছে।

এই রেখাচিত্রে AC হল গড় ব্যয় রেখা, AR = MR হল ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা, MC হল প্রান্তিক ব্যয়রেখা। এখানে A বিন্দুতে AR = MR রেখা AC রেখাকে তার নিম্নতম বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। এখানে A বিন্দুতে দাম = গড় ব্যয় = OP.

A বিন্দু গড় ব্যয় AC রেখার নিম্নতম বিন্দু। এর উপরে অতিরিক্ত লাভের এলাকা। এর নীচে আছে ক্ষতির এলাকা, যেখানে দাম গড়ব্যয়ের চেয়ে কম। কাজেই A বিন্দুটিকে আমরা না-লাভ-না-লোকসানের বিন্দু বলতে পারি। ইংরেজিতে একে বলা হয় **Break-Even point.** একটি অবস্থার শেষ হয়ে অন্য একটি অবস্থার শুরু যে বিন্দুতে হয় তাকেই Break-Even Point বলা যায়।



১১.৯ রেখাচিত্র : আয়-ব্যয়ের সমতার বিন্দু

আবার এখানে A বিন্দুতে ফার্মের MC রেখা তার AR = MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। কাজেই A একটি ভারসাম্যের বিন্দুও হবে। এই বিন্দুতে দাম = OP এবং গড় ব্যয় = দাম = OP.

কাজেই মোট ব্যয় = মোট আয়। ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা শূন্য। ফার্মটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায়। এখন এই A বিন্দুতে ফার্মের মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান বলে A বিন্দুটিকে আয় ব্যয়ের সমতার বিন্দুও বলা হয়। অতএব আয়-ব্যয়ের সমতার বিন্দুতে দ্রব্যের দাম P = ফার্মের গড় উৎপাদন ব্যয়। আবার গড় ব্যয় = প্রান্তিক ব্যয়। কারণ A বিন্দু হল MC ও AC রেখার ছেদবিন্দু। আবার প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয় (ভারসাম্যের প্রাথমিক শর্ত)

এবং প্রান্তিক আয় = গড় আয় পূর্ণ প্রতিযোগিতার জন্য)

অতএব A বিন্দুতে P = AC = MC = MR = AR হবে।

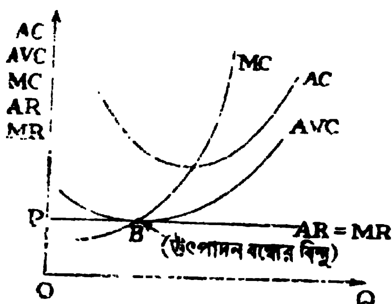
(২) উৎপাদন বন্ধের বিন্দু :

স্বল্পকালে দ্রব্যের দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় ব্যয়ের চেয়ে কম হলে ফার্মের ক্ষতি হয়। কিন্তু ক্ষতি হলেও ফার্মের পক্ষে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া

যন্ত্রপাতির ক্ষয়ও হতে পারে। দাম যদি গড়ব্যয়ের চেয়ে কম হয়, তাহলে ফার্মের মালিক প্রথমেই তাঁর স্বল্পকালীন গড়ব্যয়কে দুভাগে ভাগ করবেন যথা, গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়। ফার্মের মালিককে স্থির ব্যয় মেটাতেই হবে। কাজেই তিনি দেখবেন দাম গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা বেশি কিনা।

দাম যদি গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় বা AVC অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে ফার্মের মালিক ক্ষতি সত্ত্বেও উৎপাদন চালু রাখবেন। কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ মোট আয় থেকে স্থির উপাদানের মালিকদের পাওনার কিছুটা মেটানো সম্ভব হয় এবং তাঁর ক্ষতি কম হয়। কিন্তু এই অবস্থায় তিনি যদি উৎপাদন বন্ধ করে দেন, তাহলে তাঁর ক্ষতি বেশি হয়। দাম যতক্ষণ পর্যন্ত AVC অপেক্ষা বেশি থাকবে ততক্ষণ এইরকম হয়। দাম কমতে কমতে যদি নিম্নতম AVC-র সঙ্গে সমান হয়ে যায় তাহলে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন চালু রাখা বা বন্ধ করে দেওয়ার কোন পার্থক্য থাকে না। এখানে উৎপাদন বন্ধ করে দিলেও যে ক্ষতি হয়, উৎপাদন চালু রাখলে সেই একই পরিমাণ ক্ষতি হয়। কাজেই ফার্মের মালিক উৎপাদন গুটিয়ে দেবেন কিনা বলা যায় না।

যদি ভবিষ্যতে ভালো হবার আশা থাকে তাহলে হয়তো তিনি উৎপাদন চালু রাখতে পারেন। আমরা একেই সবচেয়ে সম্ভাব্যতাময় ঘটনা হিসেবে ধরে নিতে পারি। এক্ষেত্রে দাম = নিম্নতম AVC এবং ফার্মের ভারসাম্যবিন্দু AVC রেখার নিম্নতম বিন্দুতে থাকে। যেখানে ফার্মের AR = MR রেখা তার AVC রেখাকে স্পর্শ করে সেই বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দাম যদি নিম্নতম AVC অপেক্ষা কম হয় তাহলে ফার্ম নিঃসন্দেহে উৎপাদন বন্ধ করে দেবে। কারণ সেখানে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়াই ফার্মের পক্ষে কম ক্ষতিকারক হবে। সেইজন্য দামও AVC-র সমতার বিন্দুটিকে উৎপাদন বন্ধের বিন্দু (Shut-down point) বলা হয়। ১১.১০নং রেখাচিত্রে B হল উৎপাদন বন্ধের বিন্দু, কারণ B বিন্দুটি ফার্মের গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা (AVC)-র নিম্নতম বিন্দু। এখানে দাম = OP = নিম্নতম AVC.



১১.১০ রেখাচিত্র: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের উৎপাদন বন্ধের বিন্দু

১১.৬. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য :

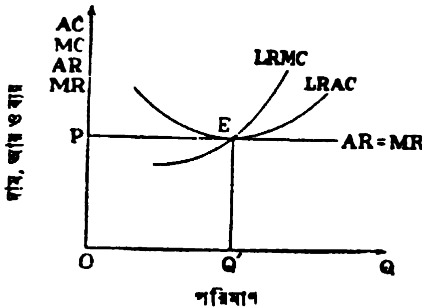
দীর্ঘকাল বলতে এমন একটি বিস্তৃততর সময়সীমাকে বোঝায় যার মধ্যে ফার্ম তার উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সকল রকম পরিবর্তন সাধন করতে পারে। স্বল্পকালে সময় কম

থাকায় ফার্মের পক্ষে উৎপাদনের মাত্রার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। কাজেই স্বল্পকালে কতকগুলি উপাদান স্থির থাকে, এর ফলে ইচ্ছা থাকলেও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের মধ্যে নতুন ফার্ম স্বল্পকালে প্রবেশ করতে পারে না। এর ফলে শিল্পান্তর্ভুক্ত ফার্মগুলির পক্ষে স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। দীর্ঘকালে এই বাধা অপসারিত হয়। দ্রব্যের দাম যদি ফার্মের গড় উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে ফার্ম স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা পাবে। দীর্ঘকালে এই অবস্থা চলতে পারে না। কারণ তখন শিল্পান্তর্ভুক্ত ফার্মগুলি যদি অস্বাভাবিক মুনাফা পায় তাহলে মুনাফার লোভে ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করবে। স্বল্পকাল হলে তারা প্রবেশ করতে পারত না, কিন্তু দীর্ঘকালে পারবে। এর ফলে কয়েকটি ঘটনা ঘটবে। প্রথমত, নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করলে ফার্মের সংখ্যা বাড়বে। দ্বিতীয়ত, এর ফলে শিল্পের আয়তন বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয়ত, শিল্পের মোট উৎপাদন ও যোগান বাড়বে। চতুর্থত, দ্রব্যের মোট চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে যোগান বাড়লে দাম কমবে। এইভাবে দাম গড় ব্যয়ের সমান হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত দাম গড়ব্যয়ের বেশি থাকবে ততক্ষণ এরূপ ঘটবে। অবশেষে দাম ও গড়ব্যয় সমান হলে কোন ফার্মই অতিরিক্ত মুনাফা পাবে না। সকলে কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাবে। তখন আর কোন নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইবে না। শিল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে।

অপরপক্ষে দাম যদি গড়ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তাহলে ফার্মের ক্ষতি হবে। স্বল্পকালে ফার্ম অনেক সময় ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন চালু রাখতে বাধ্য হবে। কারণ স্বল্পকালে ফার্মের মোট ব্যয়ের মধ্যে স্থির ব্যয় নামক যে ব্যয় থাকে ফার্মকে সেই ব্যয় মেটাতেই হয়। কাজেই ফার্ম দেখবে দ্রব্য বিক্রয় করে যে আয় পাওয়া যাচ্ছে তা থেকে স্থির ব্যয়ের কিছুটা পূরণ করা যাচ্ছে কিনা। যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রব্যের দাম ফার্মের স্বল্পকালীন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা বেশি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন চালু রাখবে। দীর্ঘকালে অবস্থাটা অন্যরূপ হবে। দীর্ঘকালে ফার্মের সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল ব্যয়। কাজেই এখানে ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করে উৎপাদন চালু রাখবে না। দ্রব্যের দাম যদি গড়ব্যয় অপেক্ষা কম হয় তাহলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে এবং শিল্প ছেড়ে চলে যাবে। এর ফলে (ক) শিল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যা কমবে, (খ) শিল্পের আয়তন ছোট হবে, (গ) শিল্পের উৎপাদন ও যোগান কমবে এবং (ঘ) দ্রব্যের চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে যোগান কমলে দাম বাড়বে। এইভাবে দাম গড়ব্যয়ের সমান হবে এবং তখন আর কোন ফার্ম শিল্প থেকে প্রস্থান করবে না। শিল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যায় ভারসাম্য দেখা দেবে। প্রত্যেকটি ফার্ম কেবলমাত্র নিম্নতম গড়ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করবে এবং কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে ভারসাম্য লাভ করবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে দীর্ঘকালে কোন ফার্ম

অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করতে পারে না। আবার কোন ফার্ম ক্ষতি স্বীকার করেও উৎপাদন চালু রাখে না। এখানে দ্রব্যের দাম ফার্মের গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়রেখা উৎপাদন-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয় কিন্তু ফার্মের দীর্ঘকালীন গড়ব্যয় রেখা কিছুটা U-অক্ষরের মত প্রথমে নিম্নমুখী ও পরে ঊর্ধ্বমুখী হয়। ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা তার U-আকৃতিবিশিষ্ট গড়ব্যয় রেখাকে তার নিম্নতম বিন্দুতে স্পর্শ করে। ফলে দ্রব্যের দাম ফার্মের নিম্নতম গড় ব্যয়ের সমান হয়। ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত হল যে, (১) ভারসাম্যের বিন্দুতে ফার্মের প্রান্তিক আয় (MR) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হবে এবং (২) ভারসাম্যের বিন্দুতে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা তার প্রান্তিক আয় (MR) রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করবে। নীচের রেখাচিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দেখানো হল। এই রেখাচিত্রে LRAC ও LRMC হল ফার্মের যথাক্রমে দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। AR = MR হল ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা। এখানে LRMC রেখাটি AR = MR রেখাকে নীচের দিক থেকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হল ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের বিন্দু।



১১.১১ রেখাচিত্র: পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

এখানে দ্রব্যের দাম = OP.
উৎপাদন = OQ'.

ফার্মের মোট আয় = OP × OQ' = OPEQ'. গড়ব্যয় = Q'E = OP. অতএব ফার্মের মোট ব্যয় = OP × OQ' = OPEQ' = মোট আয়। অতএব ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা শূন্য। ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায়। এখানে E বিন্দুটি ফার্মের গড়ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতে অবস্থিত। কাজেই দাম নিম্নতম গড় ব্যয়ের সমান হবে।

দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্ত: যে-কোন সময় যে-কোন বাজারে ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত হল—(১) **ভারসাম্যের বিন্দুতে MR = MC হবে এবং (২) MC রেখা ফার্মের MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করবে।** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও এই শর্ত দুটি অবশ্যই পালিত হবে। তার সঙ্গে অতিরিক্ত শর্ত থাকছে যে, (৩) **দ্রব্যের দাম ফার্মের নিম্নতম গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হবে।** অর্থাৎ P = AC হবে। আবার, আমরা জানি ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখা তার গড়ব্যয় রেখাকে নিম্নতম বিন্দুতে ছেদ করে। অর্থাৎ যেখানে ফার্মের গড়ব্যয় সর্বনিম্ন, সেখানে গড়ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান। কাজেই

চতুর্থ শর্ত হল যে, (৪) **দ্রব্যের দাম ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের সঙ্গে সমান হবে।** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ক্ষেত্রে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয়। অর্থাৎ MR = AR হয়। তাহলে আমরা পাই (৫) **ফার্মের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়েই ফার্মের গড় আয়ের সঙ্গে সমান হবে।** অর্থাৎ MC = MR = AR. তাহলে আমরা পাই

MC = MR ভারসাম্যের সাধারণ শর্ত ;
MR = AR পূর্ণ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য ;
AR = P সংজ্ঞানুসারে ;
P = AC দীর্ঘকালীন শর্ত ;

অর্থাৎ দীর্ঘকালে P = AC = MC = MR = AR হবে। এবং (৬) **ফার্মটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাবে ও তার গড় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতে উৎপাদন করবে।** এর অর্থ হল যে, ফার্ম তার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করবে এবং সবচেয়ে কম ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করবে। উৎপাদন ক্ষেত্রে যে সব দীর্ঘকালীন সুযোগ-সুবিধে পাওয়ার কথা ফার্ম সেই সব সুযোগ-সুবিধেগুলি পরিপূর্ণভাবে ভোগ করবে।

১১.৭ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের ভারসাম্য :

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের মধ্যে অসংখ্য ফার্ম একই দ্রব্য উৎপাদন করে। এখানে উৎপন্ন দ্রব্যটি সমজাতীয় বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ফার্মগুলি কি সমরূপ হয় ?

এক্ষেত্রে আমরা দু'রকম অবস্থার কথা ভাবতে পারি। ফার্মগুলি ১। সমান, ২। অসমান হতে পারে। ফার্মগুলি সমান বললে বোঝায় প্রত্যেকটি ফার্মের আয়তন সমান, মালিকের দক্ষতা সমান, অন্যান্য ব্যয় ও বিনিয়োগ সমান এবং প্রত্যেকটি ফার্ম সমান দামে যে-কোন পরিমাণ উপাদান ক্রয় করতে পারে। যখন কোন একটি ফার্মের কাছে কোন একটি উপাদানের যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় তখনই ফার্ম নির্দিষ্ট দামে যে-কোন পরিমাণ উপাদান ক্রয় করতে পারে। আবার কোন উপাদানের যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে উপাদানের বাজারের অবস্থার উপর। উপাদানের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে এরকম হতে পারে।

এরজন্য আরো কতগুলি শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন। (১) যে-কোন একটি উপাদানের মালিক উপাদানের বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন থাকবে ; (২) যে-কোন একটি উপাদানের সব এককগুলি সমান যোগ্যতাসম্পন্ন হবে ; (৩) প্রত্যেকটি উপাদান সম্পূর্ণভাবে গতিশীল হবে ; (৪) কোন উপাদানের যোগানের ক্ষেত্রে কোন অপ্রতিযোগী দল বা একক থাকবে না এবং (৫) প্রত্যেকটি উপাদান সম্পূর্ণভাবে বিভাজ্য হবে। উপাদানের বাজারে যদি এই শর্তগুলি পালিত হয় তবেই প্রত্যেকটি

ফার্ম সমান হবে এবং তখন প্রত্যেকটি ফার্মের ব্যয়ের কাঠামো সমান হবে। কোন ফার্ম ব্যয়ের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ সুবিধে বা অসুবিধে ভোগ করবে না।

অপরপক্ষে প্রতিযোগিতাম্লক বাজার যদি সঠিকভাবে প্রতিযোগিতাম্লক না হয় তাহলে প্রতিযোগিতাম্লক শিল্পের ফার্মগ্নলি অসমান হতে পারে। এক্ষেত্রে অর্থনীতিবিদগণ শুদ্ধ প্রতিযোগিতা (Pure Competition)-ম্লক বাজারের অস্তিত্ব কল্পনা করেন। এর্প বাজারে উপাদানগ্নলি গতিশীল থাকে না, বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে সকলে সচেতন থাকে না এবং একটি উপাদানের বিভিন্ন একক সমযোগ্যতাসম্পন্নও না হতে পারে। তাছাড়া কোন উপাদান যেমন উদ্যোক্তা স্বয়ং অবিভাজ্য হতে পারে। আবার কোন উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন অপ্রতিযোগী দল থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সকল ফার্ম সমানভাবে ও সমান দামে উপাদান ক্রয় করতে পারবে না।

অর্থাৎ উপাদানের বাজারের অবস্থার অপ্রতিযোগিতাম্লক চরিত্রের জন্য ফার্মের সমর্পতা নষ্ট হতে পারে। এর ফলে বিভিন্ন ফার্মের ব্যয়-কাঠামো বিভিন্ন রকম হতে পারে। এর উপর আছে উদ্যোক্তার দক্ষতার পার্থক্য (Difference of entrepreneurial ability)। কোন উদ্যোক্তা বেশি দক্ষ, বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে বেশি জ্ঞানসম্পন্ন হতে পারেন। এর্প উদ্যোক্তা কম ব্যয়ে বেশি দ্রব্য উৎপাদন করতে পারবেন। বাজারে দ্রব্যের দাম সমান হলেও সেই দামেই অধিকতর দক্ষ উদ্যোক্তা অতিরিক্ত ম্নাফা লাভ করতে সমর্থ হবেন। আবার কোন উদ্যোক্তা যদি কম দক্ষতা বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হন তাহলে তাঁর গড় উৎপাদন ব্যয় অন্য ফার্মের চেয়ে বেশি হবে। অন্য ফার্ম যখন লাভ করছে—তখন তিনি ক্ষতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন এমনও হতে পারে।

শিল্পের মধ্যেকার ফার্মগ্নলি যদি সমান হয় তাহলে দীর্ঘকালে প্রত্যেকটি ফার্মের গড়ব্যয় সমান হবে এবং দ্রব্যের দাম সেই গড়ব্যয়ের সমান হবে। সেক্ষেত্রে কোন ফার্মই অতিরিক্ত ম্নাফা পাবে না। আবার কারো ক্ষতিও হবে না। প্রত্যেকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক ম্নাফা পাবে। যেহেতু কোন ফার্মই অতিরিক্ত ম্নাফা পাবে না, কাজেই শিল্পের মধ্যে কোন নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে চাইবে না। কোন ফার্মের ক্ষতিও হবে না, কাজেই কোন ফার্ম শিল্প ছেড়ে চলেও যাবে না। অর্থাৎ দীর্ঘকালে শিল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যায় কোন রকম পরিবর্তনের ঝোঁক থাকবে না। ফার্মের সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে—প্র্ণ প্রতিযোগিতাম্লক শিল্পে যদি সব ফার্ম সমান হয় তাহলেই দীর্ঘকালে—

১। প্রত্যেকটি ফার্ম তার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দ্বতে উৎপাদন করবে;

২। সব ফার্মের গড়ব্যয় সমান হবে;

৩। দ্রব্যের দাম সেই গড়ব্যয়ের সমান হবে;

৪। কোন ফার্মই অতিরিক্ত মুনাফা বা ক্ষতি ভোগ করবে না, প্রত্যেকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাবে ;

৫। ফার্মের গড়ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হবে ;

৬। শিল্পের মধ্যে সব ফার্ম ভারসাম্য অবস্থায় থাকবে ; এবং

৭। শিল্পের মধ্যে কোন নতুন ফার্ম প্রবেশ করবে না, আবার কোন ফার্ম শিল্প ছেড়ে চলে যাবে না। অর্থাৎ শিল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যায় ভারসাম্য দেখা দেবে।

যখন উপরের সব শর্তগুলি পালিত হবে তখন আমরা বলব যে সমগ্র শিল্পের মধ্যে ভারসাম্য দেখা দিয়েছে। একে অর্থনীতিতে পূর্ণ ভারসাম্য বা **Full Equilibrium** বলা হয়।

১১.৮. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম ও শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখা ও তার আকৃতি :

(ক) ফার্মের যোগান রেখা কাকে বলে ? : আমরা জানি, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থায় অসংখ্য ফার্ম একই দ্রব্য উৎপাদন করে ও বাজারে সেই দ্রব্যের যোগান দেয়। এখানে কোন একটি ফার্ম দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে না। দাম এখানে নির্ধারিত বিষয়। দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যের জন্য মোট চাহিদা ও মোট যোগানের দ্বারা। কোন একটি ফার্ম বাজারে দ্রব্যের দাম কী হতে পারে সে সম্বন্ধে অনুমান করতে পারে। দাম বেশি হতে পারে বলে ফার্ম আশা করতে পারে, কিংবা দাম কম হতে পারে বলে আশঙ্কা করতে-পারে। এই দামকে আমরা সম্ভাব্য দাম বা প্রত্যাশিত দাম (Expected price) বলতে পারি। কোন ফার্ম প্রত্যাশিত দামে কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে ও বাজারে যোগান দেবে—সে সম্বন্ধে পরিকল্পনা করে ও সিদ্ধান্ত নেয়। ফার্মের এই যোগানকে পরিকল্পিত যোগান (Planned supply) বলা যেতে পারে।

এখানে দুটি বিষয় জড়িত (ক) **একটি হল প্রত্যাশিত দাম** এবং অপরটি হল (খ) **পরিকল্পিত যোগান।** এখন ফার্ম দ্রব্যের বিভিন্ন প্রত্যাশিত দামে যেসব পরিমাণ যোগান দিতে রাজি থাকে সেই পরিকল্পিত যোগানের পরিমাণগুলিকে প্রত্যাশিত দামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে ফার্মের যোগান অপেক্ষক (Supply function) পাওয়া যায়। যদি S = যোগান এবং P = দাম ধরা হয় তাহলে এই অপেক্ষকটি হবে—

$S = f(P)$। দাম ছাড়াও ফার্মের যোগান অন্যান্য বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করতে পারে। সেই বিষয়গুলি স্থির আছে বলে এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে!

এখন এই যোগান অপেক্ষকটিকে আমরা যদি রেখাচিত্রের রূপ দিই তাহলেই ফার্মের যোগান রেখা পাব। অতএব **ফার্মের যোগান রেখা হল—কোন দ্রব্যের বিভিন্ন দামে একটি ফার্ম যেসব বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দিতে রাজি থাকে**

সেইসব দাম ও যোগানের বিভিন্ন সম্মিলনের ভিতর দিয়ে অঙ্কিত রেখা। এই রেখাচিত্রের একটি অক্ষে প্রত্যাশিত দাম (P) এবং অপর অক্ষে পরিকল্পিত যোগান (S) পরিমাপ করা হয়।

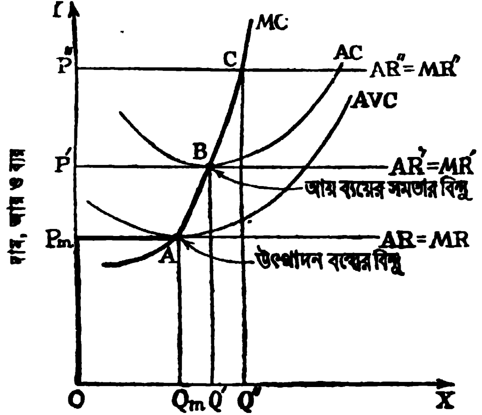
(খ) **শিল্পের যোগান রেখা কাকে বলে?** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে অনেক ফার্ম থাকে। প্রত্যেকটি ফার্মের একটি করে যোগান রেখা থাকে। এই যোগান রেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে জ্যামিতিকভাবে যোগ করলে আমরা শিল্পের যোগান রেখা পাই। একে দ্রব্যের মোট যোগান রেখা বলতে পারি। অতএব **কোন দ্রব্যের বিভিন্ন দামে সমগ্র শিল্প থেকে সেই দ্রব্যের যেসব মোট পরিকল্পিত যোগানের পরিমাণ পাওয়া যায় সেই দাম ও যোগানের বিভিন্ন সম্মিলনের সংযোগকারী রেখাই হল শিল্পের যোগান রেখা।** অন্যভাবে বলা যায়—শিল্পের যোগান রেখা হল পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক সব ফার্মের যোগান রেখার জ্যামিতিক যোগফল।

(গ) **ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখার আকৃতি:** কোন নির্দিষ্ট দামে একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম কী পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দেবে তা নির্ভর করছে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের উপর। স্বল্পকালে ফার্মের গড় ব্যয় = গড় স্থির ব্যয় (AFC) + গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC)। দ্রব্যের দাম যদি AVC অপেক্ষা কম হয়, তাহলে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়াই ভালো।

দাম (P) যদি AVC-র সমান হয় তাহলে স্বল্পকালে ফার্ম উৎপাদন করতে পারে। এই দামে দ্রব্য বিক্রয় করে ফার্ম কেবলমাত্র তার পরিবর্তনশীল ব্যয় মেটাতে পারবে। স্থির ব্যয়টি ক্ষতির খাতায় লিখিত হবে। ফার্ম যদি কোন উৎপাদন না করে তাহলেও তাকে স্থির ব্যয় দিতে হয়। এটি চুক্তিবন্ধ ব্যয়। কাজেই যেখানে P = AVC সেখানে ফার্ম উৎপাদন করা বা না করার মধ্যে নিরপেক্ষ থাকতে পারে, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই তার ক্ষতি সমান যদি P < AVC হয়, তাহলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। P = AVC হল নিম্নতম দাম, যে দামে ফার্ম কোন উৎপাদন করতে পারে। আবার, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়রেখা (AR = MR রেখা) উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল হয় কিন্তু AVC রেখা U-আকৃতি-বিশিষ্ট হয়। তার জন্য AR = MR রেখা AVC রেখাকে তার নিম্নতম বিন্দুতে স্পর্শ করে। যেখানে P = AVC সেখানে AVC নিম্নতম। P < AVC হলে ফার্ম উৎপাদন করে না। P = নিম্নতম AVC হলেই ফার্মের পক্ষে উৎপাদন করার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই **AVC রেখার নিম্নতম বিন্দুই হল ফার্মের যোগান রেখার আরম্ভের বিন্দু।** আমরা জানি এই বিন্দুটিকে উৎপাদন বন্ধের বিন্দু (**Shut-down point**) বলা হয়। বাস্তবত এটিই ফার্মের যোগান রেখার আরম্ভের বিন্দুও হতে পারে (যদি নীচের দিক থেকে শুরু করা যায়)। আমাদের পরের পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে এই বিন্দুটি হল A.

এখানে AC ও AVC হল যথাক্রমে ফার্মের স্বল্প কালীন গড় ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা। MC হল প্রান্তিক ব্যয়রেখা। AR = MR হল গড় ও প্রান্তিক আয়রেখা।

এখানে OP_m হল দ্রব্যের নিম্নতম দাম এবং এই দামে ফার্মের নিম্নতম যোগান হল OQ_m. দাম যদি বেড়ে OP′ হয়, তাহলে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু হবে B এবং এই দামে ফার্ম OQ′ পরিমাণে দ্রব্যের যোগান দেবে। এই দামে AR = MR রেখা AC রেখাকে তার নিম্নতম বিন্দুতে স্পর্শ করে। এখানে দ্রব্যের দাম = ফার্মের গড় ব্যয়। কাজেই উৎপাদন করে ফার্মের কোন অতিরিক্ত লাভ বা ক্ষতি কিছুই হবে না। এই অবস্থাটিকে আয় ও ব্যয়ের সমতার অবস্থা বলা হয়। যে বিন্দুতে ফার্মের আয় ও ব্যয় সমান হয় তাকে আয়-ব্যয়ের সমতার বিন্দু (Break-even point) বলা হয়। আমাদের রেখাচিত্রে B হল এরকম একটি বিন্দু।



১১.১২ রেখাচিত্র : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখা

দাম যদি OP_m অপেক্ষা বেশি কিন্তু OP′ অপেক্ষা কম হয়, তাহলে ফার্মের ক্ষতি হবে। কিন্তু ক্ষতি সত্ত্বেও ফার্ম উৎপাদন চালু রাখবে। তার কারণ স্বল্পকালে ফার্মের স্থির ব্যয় খড়্গের মত মাথার উপর ঝুলছে। ফার্ম যদি উৎপাদন বন্ধ করে, তাহলেও তাকে স্থির ব্যয় মেটাতে হবে। এই অবস্থায় ফার্ম উৎপাদন চালু রাখলেই তার ক্ষতি কম হবে, কারণ তখন সে মোট আয় থেকে পরিবর্তনশীল ব্যয় মিটিয়েও স্থির ব্যয়ের কিছুটা মেটাতে পারবে।

দাম যদি OP অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা হবে এবং তখন সে উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধি করে যাবে, যেমন, দাম যদি OP″ হয়, তাহলে ফার্ম C বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে এবং OQ″ পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দেবে।

এইভাবে দ্রব্যের বিভিন্ন দামে ফার্ম যেসব বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করবে সেই বিন্দুগুলি যোগ করলেই ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখা পাওয়া যাবে। আমাদের রেখাচিত্রে এই বিন্দুগুলি হল A, B, C ইত্যাদি। এই বিন্দুগুলি ফার্মের যোগান রেখার উপর অবস্থিত।

আমাদের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, A, B, C বিন্দুগুলি ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখার ঊর্ধ্বমুখী অংশে অবস্থিত। অতএব আমরা বলতে পারি যে, **ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখার ঊর্ধ্বমুখী অংশটিই হল ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখা।** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম (P) সব সময় তার প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমান হয়। অর্থাৎ $P = MC$ হবে। কারণ—

$P = AR$ (সংজ্ঞানুসারে),

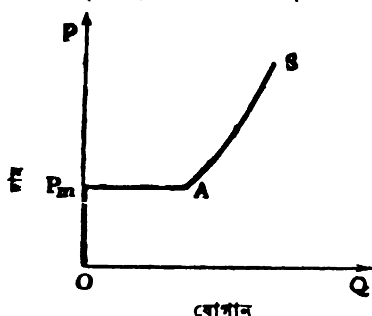
$AR = MR$ (পূর্ণ প্রতিযোগিতার জন্য)

$MR = MC$ (ভারসাম্যের শর্ত),

অতএব, $P = MC$, অর্থাৎ রেখাচিত্রের OY-অক্ষে MC পরিমাপ করার অর্থই হল P পরিমাপ করা। যোগান রেখার ক্ষেত্রে OY-অক্ষে P এবং OX-অক্ষে যোগান (Q) পরিমাপ করা হয়। MC রেখার ক্ষেত্রে OY-অক্ষে MC (=P) এবং OX-অক্ষে পরিমাণ (Q) পরিমাপ করা হয়, কিন্তু দুটি রেখাই সমান।

তবে এখানে একটি শর্ত আছে। সেই শর্তটি হল যে, স্বল্পকালে দাম AVC অপেক্ষা কম হবে না। অর্থাৎ $P > AVC$ হলেই ফার্মের পক্ষে দ্রব্যের যোগান দেওয়া সম্ভব হবে। **রেখাচিত্রের ভাষায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখা তার AVC রেখার নিম্নতম বিন্দু থেকে আরম্ভ হবে এবং তার পর MC রেখা ধরে উপরের দিকে উঠে যাবে।** যেখানে $P = AVC$ সেখানে ফার্মের যোগান রেখাটি উৎপাদন অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হবে। যদি $P < AVC$ হয় তাহলে ফার্মের যোগান শূন্য হবে এবং ফার্মের যোগান রেখাটি OY-অক্ষের সঙ্গে মিলে যাবে।

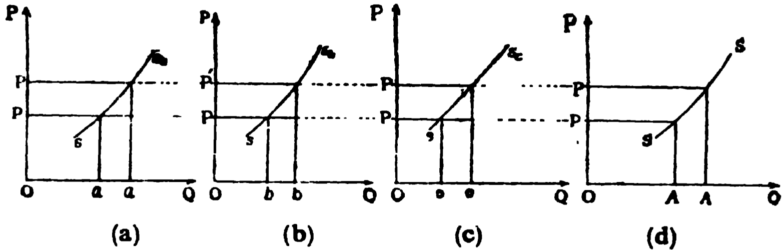
তাহলে দেখা যাচ্ছে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের যোগান রেখাটি প্রথমে উল্লম্ব, পরে অনুভূমিক এবং তারপরে ঊর্ধ্বমুখী হবে। আমাদের ১১·১৩নং রেখাচিত্রে স্থূলাক্ষরে অঙ্কিত রেখাটিই হল পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখা। বলা বাহুল্য এই রেখাটি একটানা (continuous) নয়, এর মাঝে দুটো কৌণিক বিন্দু আছে। তবে আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা এর ভাঙাচোরা অংশটিকে বাদ দিয়ে একটানা অংশটিকে যোগান রেখা বলে ধরে নিতে পারি। তাহলে ফার্মের যোগান রেখা হবে AS রেখার মত একটানা ও ঊর্ধ্বমুখী।



১১.১৩ রেখাচিত্র : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখা

(খ) **শিল্পের যোগান রেখা :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে যতগুলি ফার্ম আছে তাদের প্রত্যেকের যোগান রেখাই ঊর্ধ্বমুখী হবে। এখন সেই যোগান রেখা-

গুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে আমরা শিল্পের মোট যোগান রেখা পাব। অঙ্কনের সুবিধের জন্য আমরা ধরে নিতে পারি যে, শিল্পের মধ্যে তিনটি মাত্র ফার্ম আছে, তাহলে শিল্পের যোগান রেখা হবে নীচের 3(d) রেখাচিত্রে অঙ্কিত SS রেখার মত। এখানে SS_a, SS_b, SS_c হল যথাক্রমে a, b, c নামক ফার্মের যোগান রেখা। OP দামে a ফার্মের যোগান Oa, b ফার্মের যোগান Ob এবং c ফার্মের যোগান Oc.



১১.১৪ রেখাচিত্র : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখা

অতএব OP দামে শিল্পের মোট যোগান = Oa + Ob + Oc = OA.
অনুরূপভাবে OP′ দামে শিল্পের মোট যোগান OA′ = Oa′ + Ob″ + Oc′.
তাহলে SS হল শিল্পের যোগান রেখা।

১১.৯ (ক) যোগানের নিয়ম :

কোন দ্রব্যের যোগান নির্ভর করে—(১) সেই দ্রব্যের দাম, (২) উপকরণের দাম, (৩) উৎপাদন পদ্ধতি, (৪) সময়-সীমা, (৫) উৎপাদকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অনিচ্ছা এবং (৬) দেশের সামরিক, রাজনৈতিক অবস্থা, পরিবেশ ইত্যাদি বিষয়ের উপর। এই বিষয়গুলির মধ্যে দ্রব্যের দাম ব্যতীত অন্য বিষয়গুলি যদি স্থির আছে বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে কোন দ্রব্যের পরিকল্পিত যোগান (Planned Supply) সেই দ্রব্যের প্রত্যাশিত দামের উপর নির্ভর করবে। সাধারণত দেখা যায় যে, দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগানও কমতে থাকে। **অন্যান্য অবস্থার কোন পরিবর্তন না হলে কোন দ্রব্যের প্রত্যাশিত দামের সঙ্গে সেই দ্রব্য পরিকল্পিত যোগানের যে একমুখী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়—অর্থনীতিতে তাকে যোগানের নিয়ম বলা হয়।** ধরা যাক S = দ্রব্যের পরিকল্পিত যোগান এবং P = দ্রব্যের প্রত্যাশিত দাম, তাঁহলে যোগান ও দামের সম্পর্কটিকে S = f(P) রূপেও প্রকাশ করা হয়। যদি P বাড়ে, তাহলে ΔP ধনাত্মক হবে, এবং P কমলে ΔP ঋণাত্মক হবে। P বাড়লে যদি S বাড়ে, তাহলে ΔP এবং ΔS উভয়েই ধনাত্মক হবে, কাজেই $\frac{\Delta S}{\Delta P}$ ধনাত্মক হবে। আবার P কমলে ΔP ও ΔS উভয়েই ঋণাত্মক

হবে, কাজেই $\frac{\Delta S}{\Delta P}$ ধনাত্মক হবে। অতএব $\frac{\Delta S}{\Delta P} > O$ হল যোগানের নিয়মের মূল কথা।

(খ) যোগানের নিয়মের প্রমাণ : (দাম বাড়লে যোগান বাড়ে কেন ?)

কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে (১) একজন উৎপাদক বা বিক্রেতার যোগান বৃদ্ধি পায়, এবং (২) সকল বিক্রেতার যোগান বা সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পায়। প্রথম যোগান বৃদ্ধির কারণ হল (১) মুনাফা বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয় যোগান বৃদ্ধির কারণ হল প্রত্যেক উৎপাদকের যোগান বৃদ্ধি এবং উৎপাদকের সংখ্যা বৃদ্ধি। দাম বৃদ্ধি পেলে একজন বিক্রেতার মুনাফা বৃদ্ধি পায় এবং আরো বেশি মুনাফা লাভের জন্য সে যোগান বৃদ্ধি করে। আবার একটি ফার্মের মুনাফা বৃদ্ধি পেলে বহু ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করে ফলে মোট যোগান বেড়ে যায়।

দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে নির্দিষ্ট দামে একজন বিক্রেতা বা একটি ফার্ম কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং যোগান দেবে তা বাজারে P = AR = MR হয় এবং ভারসাম্যের জন্য MR = MC হয়, কাজেই P = MC হয়। এই কারণে দাম যত বৃদ্ধি পায়, ততই MC বৃদ্ধি পায়। আবার, MC রেখাটি যেখানে ঊর্ধ্বমুখী, সেখানেই ফার্মের ভারসাম্য হয়। MC রেখা ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে MC বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ MC বৃদ্ধি পেলে বুঝতে হবে যে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাহলে আমরা পেলাম,

দাম বাড়লে MC বাড়ে······(১)
MC বাড়লে উৎপাদন বাড়ে······(২)
অতএব, দাম বাড়লে উৎপাদন বাড়ে······(৩)

এখন আমরা যদি ধরে নিই যে, ফার্মের উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তার সবটাই বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া হয়, কোন অংশই মজুত করে রাখা হয় না, তাহলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে যোগান বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে প্রমাণ করা যায় যে—দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান বৃদ্ধি পায়। দাম বৃদ্ধি পেলে বেশি পরিমাণে যোগান দিলেই ফার্মের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। কাজেই দাম বাড়লে যোগান বাড়ে, তার মূল কারণ মুনাফা বৃদ্ধি।

এখানে আমরা একজন উৎপাদকের বা একটি ফার্মের দিক থেকে যোগানের নিয়মটি প্রমাণ করলাম। কিন্তু এই প্রমাণের সময় ধরে নেওয়া হয় যে ফার্মের সংখ্যার, উৎপাদন পদ্ধতির, উপাদানের দামের এবং ইত্যাদি প্রকার অন্যান্য বিষয়ের কোন পরিবর্তন হয় না। বলা বাহুল্য যে, অন্যান্য বিষয়গুলির কোন প্রতিকুল পরিবর্তন হলেই যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম হবে।

কোন নির্দিষ্ট দামে একটি ফার্ম যে পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দেয় দ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে মুনাফা লাভের আশায় সেই ফার্ম তার চেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য

উৎপাদন করে এবং যোগান দেয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে বহু ফার্ম থাকে। তাদের প্রত্যেকের যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় সমগ্র শিল্পের মোট যোগানও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে দাম বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পায়। স্বল্পকালে দাম বৃদ্ধি পেলে শিল্পান্তর্ভুক্ত ফার্মগুলির মুনাফা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করে না। কারণ শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে হলে বা উৎপাদন শুরু করতে হলে যে সব উপাদান নিয়োগ করতে হয়, তাদের সবগুলির বৃদ্ধি ঘটানোর মত সময় স্বল্পকালে থাকে না। কাজেই প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে স্বল্প-কালে ফার্মের সংখ্যার বৃদ্ধি হয় না। বেশি দামে সকলেই বেশি পরিমাণে যোগান দেয় বলে সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পায়।

দীর্ঘকালে শিল্পের মধ্যে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে। ফলে শিল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যোগান বৃদ্ধি পেলে দাম কমে আসে; দাম কমে গিয়ে নিম্নতম গড় ব্যয়ের সমান হয়। সব ফার্ম যদি সমদক্ষ হয় তাহলে কারোও পক্ষে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয় না। ফার্মগুলির মধ্যে দক্ষতার পার্থক্য থাকলে—বেশি দক্ষ ফার্মগুলি মুনাফা পেতে পারে।

আবার দীর্ঘকালে সব ফার্মই বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করতে চায়। উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে উপাদান (যেমন, শ্রম, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল)-গুলির চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। চাহিদা বৃদ্ধি পেলে উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাবে। প্রত্যেকটি ফার্মের ব্যয় রেখাগুলি উপরের দিকে সরে যাবে। একে বলা হয় ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের অবস্থা। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পটি ক্রমবর্ধমান ব্যয়াধীন হলেই শিল্পের যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। ঊর্ধ্বমুখী যোগান রেখার ক্ষেত্রে দাম বাড়লেই যোগান বাড়ে এবং যোগানের নিয়মটি কাজ করে। অবশ্য এখানে ধরে নিতে হয় যে, শিল্পটি ক্রমবর্ধমান ব্যয় অবস্থায় রয়েছে।

(গ) **যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম:** দাম বাড়লে যোগান বাড়ে, দাম কমলে যোগান কমে—এটাই হল যোগানের নিয়ম। কিন্তু এর বিপরীত হলে, অর্থাৎ দাম বাড়লে যদি যোগান কমে যায়, কিংবা, দাম কমলে যোগান বেড়ে যায় কিংবা দামের পরিবর্তন হলে যোগানের কোন পরিবর্তন না হয় তাহলে যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। যোগান যে কেবলমাত্র দামের ওপর নির্ভর করে তা নয়, আরো অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেই বিষয়গুলি স্থির আছে বলে ধরে নিয়েই দামের সঙ্গে যোগানের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। অন্যান্য বিষয়গুলির পরিবর্তন হলেই যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। তাছাড়া নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়।

(১) দ্রব্যের দামের পরিবর্তন সম্বন্ধে উৎপাদকদের প্রতিকূল প্রত্যাশা থাকলে যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন—দাম কমলে উৎপাদকেরা মনে

করতে পারে যে, ভবিষ্যতে দাম আরো বেশি কমে যাবে, কাজেই তারা কম দামে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করতে পারে। আবার যখন দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়, তখন উৎপাদকেরা যদি ভাবে যে ভবিষ্যতে দাম আরো বেশি বাড়বে, তাহলে তারা যোগান স্থির রাখতে পারে, কিংবা কমিয়ে দিতে পারে। এক্ষেত্রে যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম হবে।

(২) যোগানের নিয়মটি সকল দ্রব্য বা সেবার প্রতি প্রযোজ্য হয় না। আমরা যদি শ্রম নামক উপাদান সেবার কথা চিন্তা করি তাহলে দেখা যায় শ্রম-সেবার দাম বা মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান এক সময়ে কমে যেতে পারে। মজুরী বৃদ্ধি পেলে যদি শ্রমের যোগান হ্রাস পায়, তাহলে শ্রমের ক্ষেত্রে যোগানের নিয়মটির ব্যতিক্রম হয়।

(৩) আবার অনেক দ্রব্য থাকতে পারে যেগুলিকে পুনরায় উৎপাদন করা যায় না। এদের যোগান স্থির। কাজেই যেসব দ্রব্য পুনরুৎপাদনশীল নয়, যাদের যোগান স্থির, দাম বাড়িয়ে তাদের যোগান বৃদ্ধি করা যায় না। এদের ক্ষেত্রে যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম হয়। বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা কোন বিখ্যাত ছবি, সাহিত্যিকের শিল্পকর্ম ইত্যাদি হল এই শ্রেণীর দ্রব্যের উদাহরণ।

(৪) কোন শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগান রেখা যদি নিম্নমুখী হয়, তাহলে সেই শিল্পের বিক্রীত দ্রব্যের দাম কমলেও তার যোগান বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন বৃদ্ধি করলে যদি গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা নীচের দিকে সরে যায় তাহলেই নিম্নমুখী যোগান রেখার উদ্ভব হয় এবং সেক্ষেত্রে যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারে। অবশ্য এটি হল শিল্পের সামগ্রিক যোগানের ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রম। একটি মাত্র ফার্মের ক্ষেত্রে যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম এভাবে হতে পারে না।

(ঘ) যোগানের দামগত স্থিতিস্থাপকতা ঃ

কোন দ্রব্যের যোগান সেই দ্রব্যের দাম ও অন্যান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এখন ধরে নিই যে, অন্যান্য বিষয়গুলি স্থির আছে। তাহলে কোন দ্রব্যের যোগান কেবলমাত্র সেই দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করবে। যোগানের নিয়ম থেকে জানা যায়, দাম বাড়লে যোগান বাড়ে এবং দাম কমলে যোগান কমে। অর্থাৎ দাম যদি একটি নির্দিষ্ট হারে বাড়ে তাহলে যোগানও অন্য একটি নির্দিষ্ট হারে বাড়বে। দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগানেরও পরিবর্তন দেখা দেবে। এখন দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগানের এই পরিবর্তনশীলতাকে যোগানের দামগত স্থিতিস্থাপকতা বলা হয়।

$$\text{অতএব যোগানের দামগত স্থিতিস্থাপকতা} = \frac{\text{যোগানের পরিবর্তনের হার}}{\text{দামের পরিবর্তনের হার}}\text{।}$$

পরিবর্তনের হার বলতে শতকরা পরিবর্তনের হার বোঝাতে পারে।

ধরা যাক $S =$ যোগান।

$P =$ দাম।

ΔS = যোগানের পরিবর্তন

ΔP = দামের পরিবর্তন।

e_s = যোগানের দামগত স্থিতিস্থাপকতা।

এখন দামের শতকরা পরিবর্তনের হার $= \frac{\Delta P}{P} \times 100$ এবং

যোগানের শতকরা পরিবর্তনের হার $= \frac{\Delta S}{S} \times 100.$

$$\text{অতএব} \quad e_s = \frac{\Delta S \times 100}{S} \div \frac{\Delta P \times 100}{P}$$

$$= \frac{\Delta S \,.\, 100}{S} \times \frac{P}{\Delta P \,.\, 100} = \frac{P}{S} \cdot \frac{\Delta S}{\Delta P}$$

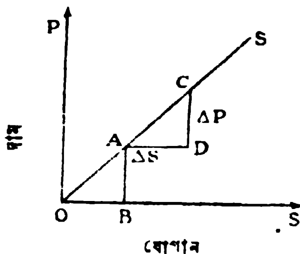
$$= \frac{\text{মূল দাম}}{\text{মূল যোগান}} \times \frac{\text{যোগানের পরিবর্তন}}{\text{দামের পরিবর্তন}}$$

এখন দাম ও যোগানের পরিবর্তনের হার যদি সমান হয় তাহলে $e_s = 1$ হবে। একে একক স্থিতিস্থাপক যোগান বলা হয়। আবার যোগানের শতকরা পরিবর্তন যদি দামের শতকরা পরিবর্তন থেকে বেশি বা কম হয় তাহলে e_s যথাক্রমে 1 অপেক্ষা বেশি বা কম হবে। যদি $e_s > 1$ হয় তাহলে যোগান হবে স্থিতিস্থাপক যোগান। আবার যদি $e_s < 1$ হয় তাহলে যোগান হবে অস্থিতিস্থাপক। যেমন, কোন দ্রব্যের দাম যদি 20% বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে দ্রব্যের যোগানও যদি 20% বৃদ্ধি পায়, তাহলে $e_s = \frac{20\%}{20\%} = 1$ হবে। আবার দাম যদি 20% বাড়ে এবং তার জন্য যোগান যদি 40% বাড়ে তাহলে $e_s = \frac{40\%}{20\%} = 2 > 1$ হবে। অনুরূপভাবে দাম যদি 20% বাড়ে এবং যোগান যদি 10% বাড়ে তাহলে $e_s = \frac{10\%}{20\%} = \frac{1}{2} < 1$ হবে।

(ঙ) **যোগানের স্থিতিস্থাপকতার জ্যামিতিক পরিমাপ :** কোন যোগান রেখার একটি নির্দিষ্ট চাপের উপর যদি স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা হয় তাহলে আমরা পাব যোগানের চাপভুক্ত স্থিতিস্থাপকতা (Arc Elasticity of Supply)। আবার যোগান রেখার কোন একটি বিন্দুতে একটি নির্দিষ্ট দামে যদি স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায় তাহলে আমরা পাব যোগানের বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা। আমরা এখানে বিন্দু স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ সম্বন্ধে আলোচনা করব।

আলোচনার সুবিধার জন্য যোগান রেখাকে সরলরেখা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ধরে নিই যে, দাম শূন্য হলে দ্রব্যের যোগানও শূন্য হয়। তাহলে যোগান

রেখাটি রেখাচিত্রের মূলবিন্দু দিয়ে যাবে। ধরি OS হল যোগান রেখা। এর উপর A একটি বিন্দু। A বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করতে হবে।



১১.১৫ রেখাচিত্র : যোগানের দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

A বিন্দুতে দাম $P = AB$ এবং

যোগান $S = OB$

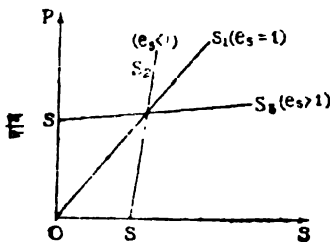
অতএব $\frac{P}{S} = \frac{AB}{OB}$. এখন দাম ও যোগানের পরিবর্তন বোঝাতে আমরা OS রেখার উপর A বিন্দুর কাছে C নামক আর একটি বিন্দু নিলাম।

A থেকে C বিন্দুতে গেলে দামের পরিবর্তন $\Delta P = CD$ হবে, এবং যোগানের পরিবর্তন $\Delta S = AD$ হবে। কাজেই $\frac{\Delta S}{\Delta P} = \frac{AD}{CD}$.

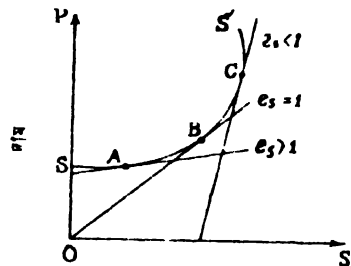
কিন্তু OAB ও ACD ত্রিভুজ দুটি সদৃশ হওয়ায় $\frac{AD}{CD} = \frac{OB}{AB}$ হবে।

তাহলে $e_s = \frac{P}{S} \cdot \frac{\Delta S}{\Delta P} = \frac{AB}{OB} \times \frac{OB}{AB} = 1.$

কাজেই OS যোগান রেখার A বিন্দুতে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা একের সমান হবে। এখানে যোগান রেখাটি রেখাচিত্রের মূলবিন্দু থেকে বেরিয়ে এসেছে। কাজেই এই রেখার উপর $e_s = 1$ হবে। অপরপক্ষে যোগান রেখাটি যদি ১১.১৫নং চিত্রের



১১.১৬ রেখাচিত্র : যোগান রেখার বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা



১১.১৭ রেখাচিত্র : বক্ররৈখিক যোগান রেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ

SS_2 রেখার মত OX-অক্ষ থেকে বের হয়, তাহলে $e_s < 1$ হবে। আবার যোগান রেখাটি যদি ১১.১৫নং চিত্রের SS_3 রেখার মত OY-অক্ষ থেকে বের হয়, তাহলে $e_s > 1$ হবে।

যোগান রেখা যদি সরলরেখা না হয়ে ১১.১৬ রেখাচিত্রের SS′ রেখার মত বক্ররেখা হয়, তাহলে তার উপরে কোন বিন্দুতে e_s পরিমাপ ধরতে হলে সেই বিন্দুতে যোগান

রেখার উপর একটি স্পর্শক টানতে হবে। সেই স্পর্শকটি যদি OX-অক্ষ থেকে বের হয়, তাহলে $e_s < 1$ হবে এবং যদি OY-অক্ষ থেকে বের হয়, তাহলে $e_s > 1$ হবে।

(চ) যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে:

কোন দ্রব্যের যোগান সহজে বেশি পরিমাণে বাড়ানো বা কমানো গেলে সেই যোগানকে স্থিতিস্থাপক যোগান বলা হয়। বিপরীতপক্ষে যে দ্রব্যের যোগানকে সহজে বেশি পরিমাণে বাড়ানো বা কমানো যায় না তার যোগানকে বলা হয় অস্থিতিস্থাপক যোগান। কোন দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হবে, কি অস্থিতিস্থাপক হবে সেটা কতকগুলো বিষয়ের উপরে নির্ভর করে। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(১) প্রথমত, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা উৎপাদনগত সময়সীমার উপর নির্ভর করে। সময়-মেয়াদ যদি কম হয় তাহলে যোগানের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটানো সহজ হয় না। যোগান বৃদ্ধি করতে হলে নতুন যন্ত্র বসাতে হয়, কারখানা ঘর বাড়াতে হয়, বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করতে হয়। এ সব সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। স্বল্পমেয়াদে এসব করা যায় না। কাজেই স্বল্পকালে দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক হতে পারে। কিন্তু সময়-মেয়াদ দীর্ঘ হলে ফার্মের পক্ষে আয়তনের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। কাজেই দীর্ঘকালে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি পেতে পারে। অতি দীর্ঘকালে যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়। অতি স্বল্পকালে যোগান পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়।

(২) যোগানের স্থিতিস্থাপকতা দ্রব্যের প্রকৃতির উপরেও নির্ভর করে। শাক-সবজি, মাছ-মাংস প্রভৃতি দ্রব্য পচনশীল। এদের সংরক্ষণ করা সহজ নয়। কাজেই এদের যোগান একবার বাজারে এসে গেলে সে যোগানকে কমানো যায় না. যে-কোন দামে বিক্রি করে দিতে হয়। অপরপক্ষে অত্যল্পকালের মধ্যে এদের যোগান বৃদ্ধি করাও সম্ভব নয়। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, পচনশীল দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়। কিন্তু যে সব দ্রব্য সংরক্ষণযোগ্য দাম কমে গেলে সেসব দ্রব্যের যোগান কমিয়ে দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্য মজুত ভাণ্ডারে রেখে দেওয়া যায়। আবার দাম বৃদ্ধি পেলে মজুত ভাণ্ডার কমিয়ে যোগান বৃদ্ধি করা যায়। অতএব আমরা বলতে পারি যে, সংরক্ষণযোগ্য দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থা[illegible] হয়।

(৩) যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ফার্মের আয়তনের ও উৎপাদন পদ্ধতির উপরও নির্ভর করে। যে ফার্মের আয়তন বড়, তার পক্ষে স্বল্পকালে যোগান বাড়ানো সম্ভব। ছোট ফার্মের পক্ষে তা সম্ভব নয়। আবার যে ফার্ম উন্নত ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করে সে ফার্ম স্বল্পকালে যোগান বৃদ্ধি করতে পারে। তার দ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। ছোট ফার্মের দ্রব্যের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়।

(৪) উপাদান বা উপকরণের সহজলভ্যতা থেকেও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার পরিবর্তন হয়। কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপাদান

ব্যবহার করতে হয়। এই উপাদানগুলির মধ্যে এক বা একাধিক উপাদানের যোগানে যদি ঘাটতি দেখা দেয়, কিংবা সাময়িকভাবে সেই উপাদান না পাওয়া যায়, তাহলে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করা সহজ হয় না। এক্ষেত্রে যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়। আবার সকল প্রকার উপাদানের যোগান যদি অবাধ ও সহজলভ্য হয় তাহলে দ্রব্যের যোগানও বেশি স্থিতিস্থাপক হয়।

১১.১০ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কীভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক দ্রব্যের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। ক্রেতারা সকলে দ্রব্যটির জন্য চাহিদা সৃষ্টি করে। বিক্রেতারা যোগান দেয়। সব ক্রেতাদের চাহিদাকে মোট চাহিদা বলা হয়। সব বিক্রেতাদের যোগানকে নিয়ে গড়ে ওঠে মোট যোগান। মোট চাহিদা ও মোট যোগান দুরকম হতে পারে—যথা—প্রকৃত চাহিদা বা যোগান এবং পরিকল্পিত চাহিদা বা যোগান। প্রকৃত চাহিদা হল যে চাহিদা হয়ে গেছে বা ঘটে গেছে। এটি একটি অতীত বিষয় (Ex post matter). কিন্তু পরিকল্পিত চাহিদা হল—যে চাহিদা হতে পারে। এটি একটি সম্ভাব্য বিষয় (Ex ante matter). ক্রেতারা যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করেছে—তাকে প্রকৃত চাহিদা বলা হয়। আবার ক্রেতারা যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করবে বলে পরিকল্পনা করেছে, তাকে বলা হয় **পরিকল্পিত চাহিদা** (Planned demand). অনুরূপভাবে বিক্রেতারা যে পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দেবার পরিকল্পনা করেছে তাকে বলা যাবে **পরিকল্পিত যোগান** (Planned supply). আমরা বলি চাহিদা ও যোগান উভয়েই দামের উপর নির্ভর করে। এখানে দাম শব্দটিও দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে—যেমন, **প্রকৃত দাম** (Actual price) এবং **সম্ভাব্য দাম** বা **প্রত্যাশিত** বা **কাঙ্ক্ষিত দাম** (Expected price)। ক্রেতা বা বিক্রেতা কেউ এককভাবে দাম ঠিক করতে পারে না। কাজেই দামের ক্ষেত্রে পরিকল্পিত দাম হবে না। কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা দাম সম্বন্ধে পরিকল্পনা করতে পারে না। এককভাবে সে কোন দাম আশা করতে পারে, কিংবা আকাঙ্ক্ষা করতে পারে। সেইজন্য দামকে এখানে পরিকল্পিত দাম না বলে কাঙ্ক্ষিত বা সম্ভাব্য দাম বলা হয়েছে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন দ্রব্যের জন্য কোন একজন ক্রেতার চাহিদা মোট চাহিদার একটি ক্ষুদ্রতম অংশমাত্র। এই বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ; একজন ক্রেতা সেই ভিড়ে হারিয়ে যায়। তাকে আলাদা করে দেখা যায় না ; কাজেই সেই ক্রেতা দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারবে না। সে দ্রব্যের দাম সম্বন্ধে নানারূপ আশা-আশঙ্কা করতে পারে মাত্র। সে হয়তো দ্রব্যের দাম কম হবে বলে আশা করতে পারে। আবার দ্রব্যের দাম বেশি হবে বলে সে আশঙ্কা করতেও পারে। যদি সে আশা করে যে, দ্রব্যের দাম কম হবে তাহলে দ্রব্যের জন্য তার চাহিদা বেশি হতে পারে। বিপরীতভাবে, সে যদি আশঙ্কা করে যে, দ্রব্যের দাম বেশি হবে, তাহলে সে চাহিদা কমিয়ে দিতে পারে। আমরা বলি **কোন একজন ক্রেতার পরিকল্পিত চাহিদা দ্রব্যের সম্ভাব্য দামের উপর নির্ভর করে।**

অর্থাৎ $d = f(p)$ এখানে d = ব্যক্তিগত চাহিদা এবং p = সম্ভাব্য দাম।

এখন বাজারে যদি n সংখ্যক ক্রেতা থাকে তাহলে এইরূপ n সংখ্যক চাহিদা অপেক্ষক পাওয়া যাবে। এবং বাজারের মোট চাহিদা হবে $\sum_{i=1}^{n} di = D$. এখানে $D = D(P)$ হবে। অর্থাৎ মোট চাহিদাও দ্রব্যের উপর নির্ভর করবে। তাহলে আমরা পাই $D = D(P) \cdots$(১).

কোন দ্রব্যের দামের সঙ্গে কোন একজন ব্যক্তিগত ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। দাম বাড়লে বা কমলে চাহিদা কমে বা বাড়ে। এইজন্য ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয়। বাজারের মোট চাহিদা রেখা যেহেতু ব্যক্তিগত চাহিদা রেখার যোগফল, অতএব মোট চাহিদা রেখাও নিম্নমুখী হবে। সম্ভাব্য দাম কম বা বেশি হলে পরিকল্পিত চাহিদা যথাক্রমে বাড়বে বা কমবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন ক্রেতা যেমন দাম গ্রহীতা, একজন বিক্রেতাও তেমনি। একজন বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে চায় তা বাজারের অসংখ্য বিক্রেতার মোট যোগানের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র। কাজেই সে দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। সে আশা করে যে, সে বেশি দাম পাবে। কিংবা সে আশঙ্কা করে যে, দাম পড়ে যাবে। অর্থাৎ, **একজন বিক্রেতার কাছে দাম হল সম্ভাব্য দাম। সম্ভাব্য দাম যদি বেশি হয় তাহলে সে বেশি পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দেওয়ার পরিকল্পনা করে।** অর্থাৎ একজন বিক্রেতার যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। আমরা যদি S দ্বারা একজন বিক্রেতার পরিকল্পিত যোগান বোঝাই, তাহলে j নামক বিক্রেতার যোগান s_j নির্ভর করবে দ্রব্যের সম্ভাব্য দাম P-এর উপর। এখানে যোগান অপেক্ষকটি হবে $s_i = g(P)$। বাজারে যদি m সংখ্যক বিক্রেতা থাকে তাহলে মোট যোগান হবে $\sum_{j=1}^{m} s_j = S$. এখানে মোট যোগান S-ও দামের উপর নির্ভর করবে। তাহলে আমরা পাই $S = S(P) \cdots$(২)

P বাড়লে S বাড়বে, P কমলে S কমবে। অতএব মোট যোগান রেখাটি হবে ঊর্ধ্বমুখী।

তাহলে আমরা পাই পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে

$D = D(P) \cdots$ (১)

এবং $S = S(P) \cdots$(২)

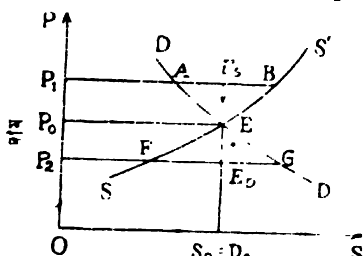
এখন বিভিন্ন দামে D বিভিন্ন হবে এবং S-ও বিভিন্ন হবে। কিন্তু আমরা যদি উপরের দুটি সমীকরণকে একসঙ্গে সমাধান করি, তাহলে আমরা এমন একটি দাম (P_0) পাব যে দামে চাহিদা ও যোগান সমান হবে। এই দামটি হবে আমাদের নির্ণেয় দাম— যে দামে ক্রেতারা যে পরিমাণ ক্রয় করতে চাইবে সেই পরিমাণ ক্রয় করতে পারবে এবং তারা সন্তুষ্ট হবে। আমরা বলি ক্রয়ের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবে রূপায়িত হবে।

আবার এই দামে বিক্রেতারাও সন্তুষ্ট হবে, কারণ এই দামে তারা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে চাইবে ক্রেতারাও সেই একই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চাইবে। **ক্রেতাদের চাহিদা ও বিক্রেতাদের যোগানের মধ্যে এইভাবে সঙ্গতি দেখা দেবে :**

দাম যদি P_0 না হয়, যদি P_0 অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে বিক্রেতারা বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে চাইবে এবং ক্রেতারা কম পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চাইবে, এর ফলে বাজারে অবিক্রীত মাল থেকে যাবে। আমরা বলি বাজার পরিষ্কার হবে না। তখন বিক্রেতারা দাম কমবে। দাম যদি P_0 অপেক্ষা কম হয়ে যায়, তাহলে চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি হবে, এতে অসন্তুষ্ট ক্রেতারা দ্রব্যের জন্য বেশি দাম দিতে রাজি থাকবে এবং দাম বাড়বে। এইভাবে দাম ওঠানামা করবে এবং একসময় P_0 স্তরে এসে পেঁছাবে। তখন চাহিদা ও যোগান সমান হবে। দাম স্থির হবে। বাজারেও ভারসাম্য দেখা দেবে।

অতএব **পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হবে ক্রেতাদের মোট চাহিদা ও বিক্রেতাদের মোট যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে।** রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায় যেখানে নিম্নমুখী চাহিদা রেখা ঊর্ধ্বমুখী যোগান রেখাকে ছেদ করবে, সেই ছেদ বিন্দুতে পরিকল্পিত চাহিদা ও যোগান সমান হবে। সেইখানেই ভারসাম্য দাম স্থির হবে। আমাদের নীচের রেখাচিত্রে (১১.১৭নং রেখাচিত্র) OY-অক্ষে দাম (P) এবং OX-অক্ষে চাহিদা ও যোগান পরিমাপ করা হচ্ছে। এখানে DD হল বাজারের মোট চাহিদা রেখা এবং SS′ হল মোট যোগান রেখা। এরা E বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করেছে। এখানে দাম $= OP_0$. এই দামে চাহিদা $= OD_0 =$ যোগান $= OL_0$ অতএব OP_0 হবে ভারসাম্য দাম।

এখন বাজারে দাম যদি OP_0 না হয়ে OP_1 হয়, ($OP_1 > OP_0$) তাহলে সেই দাম দ্রব্যের চাহিদা হবে P_1A, কিন্তু যোগান হবে P_1B, $P_1B > P_1A$. অর্থাৎ OP_1 দামে AB পরিমাণ অতিরিক্ত যোগান (Excess supply = Es) থাকবে। দাম কমবে। দাম যদি কমে OP_2 হয়ে যায়, তাহলে ঐ দামে চাহিদা হবে P_2G এবং যোগান হবে P_2F. এখানে $P_2G > P_2F$. অর্থাৎ বাজারে অতিরিক্ত চাহিদা (Excess demand = Ed) থাকবে। দাম বাড়বে। E বিন্দুর উপরে ও নীচে দামের উপর যথাক্রমে নিম্নমুখী ও ঊর্ধমুখী চাপ দেখা দেবে। তীর চিহ্ন দিয়ে এগুলি দেখানো হয়েছে। যা হোক, E বিন্দুর উপরে যদি দাম থাকে তাহলে দাম কমবে অর্থাৎ E বিন্দুর দিকে আসবে। আবার দাম যদি E বিন্দুর নীচে থাকে তাহলে দামে বাড়বে। এইভাবে দাম ওঠানামা করতে করতে যখন E বিন্দুতে এতে OP_0 হবে তখনই দাম স্থিরতা লাভ করবে।



চাহিদা ও যোগান

১১.১৮ রেখাচিত্র : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ

১১.১১. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সময়ের গুরুত্ব :

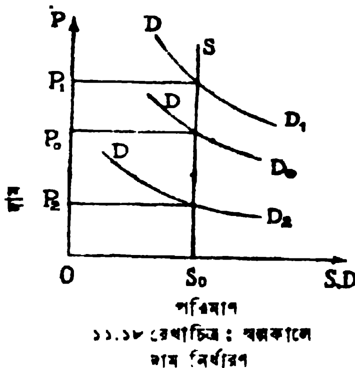
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যের মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে। চাহিদা ও যোগান নামক দুটি বৃহৎ ও বিপরীতমুখী শক্তি এখানে একই সঙ্গে কাজ করে। যখন এই দুটি বিপরীত শক্তি একটি বিন্দুতে নিজেদের মধ্যে সঙ্গতি খুঁজে পায় সেখানেই ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয় এবং দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। অতএব দ্রব্যের দাম নির্ধারণে দুটি বৃহৎ শক্তি কাজ করে। এদের একটি হল দ্রব্যের উপযোগিতা যা থেকে চাহিদার সৃষ্টি হয়। আর একদিকে কাজ করে দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা, যা যোগানের পশ্চাতে কাজ করে যায়। আগেকার দিনের লোকেরা মনে করতেন, দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় কেবলমাত্র দ্রব্যের উপযোগিতা, অর্থাৎ দ্রব্যের চাহিদার দ্বারা।

পরবর্তী পর্যায়ে কোন কোন ব্যক্তি বললেন—না, দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় মূলত দ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা বা যোগানের দ্বারা। পরবর্তীকালে মহামতি মার্শাল বললেন—কাঁচির একটি ফলায় কাটে না, দুটি ফলায় কাটে : অর্থাৎ দ্রব্যের দাম কেবলমাত্র উপযোগিতা কিংবা কেবলমাত্র দুষ্প্রাপ্যতা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। দাম নির্ধারিত হয় এই দুই শক্তির মিলনে। অর্থাৎ দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা ও দ্রব্যের যোগান উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্ভবত সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে সব সময় চাহিদা ও যোগানের গুরুত্ব সমান থাকে না। কখনো চাহিদা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং যোগানের দ্বারা দাম বেশি প্রভাবিত হয় : আবার কখনো বা যোগান নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে। কখন চাহিদা সক্রিয় এবং যোগান নিষ্ক্রিয় হবে, কিংবা যোগান সক্রিয় ও চাহিদা নিষ্ক্রিয় হবে তা নির্ভর করছে সময়ের উপর। সময়কে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি :

(১) অত্যন্ত স্বল্পকাল (Short period), (২) স্বাভাবিক কাল (Normal period) এবং (৩) দীর্ঘকাল (Long period)। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, কাল বা সময় বলতে পঞ্জিকাগত কাল (Calendar time) অথবা কার্যকরী কাল (Operational time) বোঝাতে পারে। প্রথম বিভাগে কাল পরিমাপ করা হয় সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বৎসর এইভাবে। কিন্তু কোন সময়কে যদি কোন কাজের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করা হয় তাহলে সময় হবে কার্যকরী কাল। যেমন, আমি যদি বলি পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আসছি, তাহলে এখানে সময় হল পঞ্জিকাগত সময়। আবার যদি বলি—একটু অপেক্ষা করুন, একগ্লাস জল খেয়ে আসি—তাহলে আমি নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোন পঞ্জিকাগত সময় বলছি না। আমার একগ্লাস জল খেতে যে সময় লাগবে তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলছি। এখানে জল খাওয়া নামক একটি কাজ দিয়ে সময় পরিমাপ করা হচ্ছে : কাজেই এখানে সময় হবে কার্যকরী সময়। অর্থনীতিতে স্বল্পকাল, দীর্ঘকাল বলতে যে বিভিন্ন সময়-সীমা বোঝানো হয়, সেগুলি হল সব কার্যকরী সময়। এদের কোন পঞ্জিকাগত পরিমাপ নেই। অর্থাৎ কত মাসে স্বল্পকাল, কিংবা কত বছরে দীর্ঘকাল হবে—তা বলা যায় না।

১। অত্যন্ত স্বল্পকাল বলতে খুবই কম সময় বোঝায়, যে সময়ের মধ্যে উৎপাদক বা বিক্রেতা তার উৎপাদনের কোন পরিবর্তন বা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পাবে না। এখানে যোগান স্থির। কাজেই যোগান রেখাটি পরিমাণ-অক্ষের উপর লম্ব হয়ে যায়। দাম যদি কমে তাহলেও যোগান কমে না, স্থির থাকে। আবার দাম যদি বাড়ে তাহলেও যোগান বাড়ে না, স্থির থাকে।

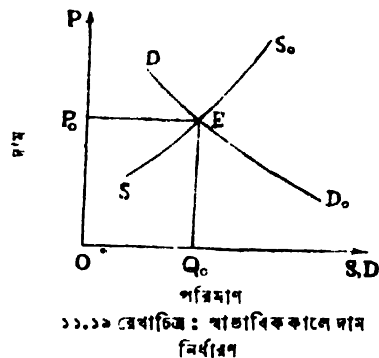
সাধারণত কাঁচা শাক-সবজির ক্ষেত্রে স্বল্পকালে বিক্রেতা যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে আনে তার যোগান এই রকম স্থির হতে পারে। দাম কমলেও বিক্রেতা যোগান ফিরিয়ে নিতে পারে না। আবার দাম বাড়লে যে তাড়াতাড়ি করে তৎক্ষণাৎ জমিতে সবজি চাষ করে যোগান বাড়িয়ে ফেলবে তারও উপায় থাকে না। যে সব দ্রব্য সংরক্ষণ করা যায় না, এবং যেগুলি অত্যন্ত পচনশীল, বিক্রয় করে না ফেলতে পারলে যেগুলি নষ্ট হয়ে যায় অত্যন্ত স্বল্পকালে তাদের যোগান স্থির থাকে। আমাদের ১১'১৮ নং রেখাচিত্রে SS_0 হল এই রকম একটি অত্যন্ত স্বল্প-কালীন যোগান রেখা। এটি পরিমাণ-অক্ষের উপর লম্ব হয়ে আছে।



১১.১৮ রেখাচিত্র : স্বল্পকালে দাম নির্ধারণ

এক্ষেত্রে যোগান নিষ্ক্রিয়, কাজেই দাম স্থির করার ব্যাপারে চাহিদাই মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করবে। চাহিদা যদি বেশি হয় তাহলে দাম বেশি হবে। চাহিদা যদি কম থাকে তাহলে দাম কম হবে। রেখাচিত্রে চাহিদা রেখাটি DD_0 হলে দাম হবে OP_0. আবার চাহিদা যদি বেড়ে যায় তাহলে চাহিদা রেখাটি DD_1 হবে। সেখানে দাম হবে OP_1. $OP_1 > OP_0$. অর্থাৎ চাহিদা বেড়ে যাওয়ার জন্য দ্রব্যের দাম বাড়ল। বিপরীতক্রমে চাহিদা যদি কম থাকত তাহলে দাম কমত।

২। স্বাভাবিক কাল অত্যল্প কালের চেয়ে বেশি সময়। এই সময় উৎপাদক বা বিক্রেতা দ্রব্যের যোগানের কিছুটা হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারে। উৎপাদক এই সময় স্থির উপাদানের পরিবর্তন করতে পারে না। কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদানের হ্রাস-বৃদ্ধি করে তার যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। অর্থাৎ স্বাভাবিক



১১.১৯ রেখাচিত্র : স্বাভাবিক কালে দাম নির্ধারণ

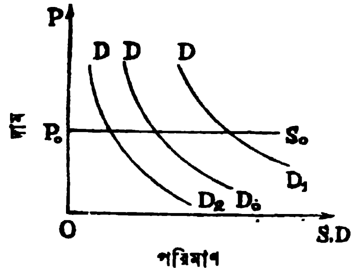
কাল হল আমাদের পরিচিত স্বল্পকাল। এখানে ফার্মের যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। দাম বাড়লে যোগান বাড়ে। দাম কমলে যোগান কমে।

কিন্তু দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যোগানের সম্পূর্ণ পরিবর্তন নয়, কেবলমাত্র আংশিক পরিবর্তন সম্ভব হয়। আমাদের ১১.১৯নং রেখাচিত্রে SS_0 হল স্বাভাবিক কালের মোট যোগান রেখা এবং DD_0 হল মোট চাহিদা রেখা।

এখানে DD_0 ও SS_0 রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। কাজেই E বিন্দুতে ভারসাম্য হবে এবং OP_0 হবে ভারসাম্য দাম। এই দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। দীর্ঘকালে সময় প্রয়োজন মত পাওয়া যায়, কাজেই উৎপাদক তার উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবরকম পরিবর্তন সাধন করতে পারে এবং চাহিদা মত দ্রব্যের যোগান দিতে পারে।

এখানে যোগান রেখাটি পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় অর্থাৎ পরিমাণ-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়। আমাদের ১১.২০নং রেখাচিত্রে P_0S_0 হল দীর্ঘকালীন যোগান রেখা। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালে প্রত্যেকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায় এবং দ্রব্যের দাম = নিম্নতম গড় ব্যয় হয়। যদি ধরা হয় যে, প্রত্যেকটি ফার্ম দক্ষতা ও অন্যান্য বিষয়ে সমরূপ তাহলে প্রত্যেকের নিম্নতম গড় ব্যয় সমান হয়। এখানে উপাদানের মূল্যও সমান হয়। কাজেই উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে সব কটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হয় এবং এর ফলেই যোগান রেখা উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল হয়।



১১.২০ রেখাচিত্র : দীর্ঘকালে দাম নির্ধারণ

দীর্ঘকালে দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে চাহিদা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। দাম নির্ধারিত হয় নিম্নতম গড় উৎপাদন ব্যয় দ্বারা। রেখাচিত্রে এই দাম হল OP_0. চাহিদা রেখাটি যদি DD_0, কিংবা DD_1 কিংবা DD_2 হয় তাহলে দামের কোন পরিবর্তন হবে না। চাহিদা বাড়লে সাময়িকভাবে দাম বাড়বে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নতুন ফার্ম এসে উৎপাদন করে ক্রেতাদের চাহিদা পূরণ করবে ; তখন দাম আপনা থেকে কমে আসবে। আবার কোন কারণে দাম কমে গেলে সাময়িকভাবে দাম সামান্য কমতে পারে, বিক্রেতারা তাদের উপাদানের ও আয়তনের যথাযোগ্য পরিবর্তন সাধন করে যোগান নিয়ন্ত্রিত করবে। কাজেই দাম আবার উঠে যাবে। এইভাবে দীর্ঘকালে একটি মাত্র দাম নির্ধারিত হবে।

১১.১২ দামের পরিবর্তন ঃ

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যের মোট

চাহিদা ও মোট যোগানের দ্বারা। তাহলে দামের পরিবর্তন (হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি) হবে যদি—

১। চাহিদার পরিবর্তন হয় এবং যোগান স্থির থাকে, কিংবা, যদি—

২। যোগানের পরিবর্তন হয় কিন্তু চাহিদা স্থির থাকে কিংবা, যদি -

৩। চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন হয়। আবার, চাহিদা ও যোগানের প্রত্যেকের পরিবর্তন বলতে (ক) হ্রাস বা (খ) বৃদ্ধি বোঝায়। তাহলে আমরা পাই—

১। (ক) যোগান স্থির, চাহিদার বৃদ্ধি, অথবা (খ) যোগান স্থির, চাহিদার হ্রাস, কিংবা

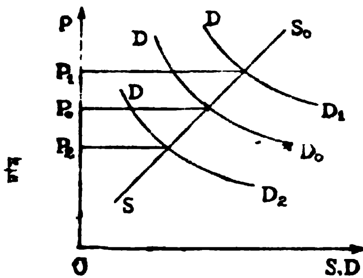
২। (ক) চাহিদা স্থির, যোগানের বৃদ্ধি অথবা (খ) চাহিদা স্থির, যোগানের হ্রাস কিংবা,

৩। (ক) চাহিদার হ্রাস, যোগানের বৃদ্ধি (খ) চাহিদার বৃদ্ধি, যোগানের হ্রাস। (গ) চাহিদার বৃদ্ধি ও যোগানের বৃদ্ধি (ঘ) চাহিদার হ্রাস ও যোগানের হ্রাস।

যেখানে চাহিদা ও যোগান উভয়ের পরিবর্তন হয় সেখানে সেই পরিবর্তন সমান বা অসমান হারে হতে পারে। তাহলে চাহিদা ও যোগানের নানারকমের পরিবর্তন হতে পারে এবং এদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে দামের কোন-না-কোন পরিবর্তন হতে পারে। এখন রেখাচিত্রের সাহায্যে আমরা সংক্ষেপে এই পরিবর্তনগুলি দেখাতে পারি। এখানে প্রত্যেকটি রেখাচিত্রে DD_0 ও SS_0 হল যথাক্রমে প্রাথমিক চাহিদা ও যোগান রেখা। OP হল প্রাথমিক দাম।

প্রথম অবস্থা : অপরিবর্তিত যোগানের ক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তনের ফল।

এখানে দেখা যাচ্ছে, যদি যোগান অপরিবর্তিত থাকে এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহলে চাহিদা রেখাটি ডান দিকে ও উপরে সরে যাবে। ধরি চাহিদা রেখাটি হয় DD_1. এখানে দাম OP_0 থেকে বেড়ে OP_1 হবে। আবার চাহিদা যদি কমে যায় তাহলে চাহিদা রেখাটি হবে DD_2 এবং দাম কমে OP_2 হবে, অতএব যোগান যদি স্থির থাকে কিন্তু চাহিদা যদি বাড়ে তাহলে দাম বাড়বে এবং চাহিদা যদি কমে তাহলে দাম কমবে।

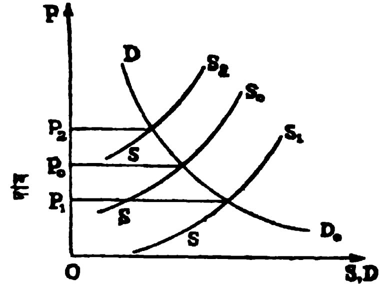


১১.২১ রেখাচিত্র : যোগান অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দাম কীভাবে চাহিদার দ্বারা পরিবর্তিত হয়

দ্বিতীয় অবস্থা : অপরিবর্তিত চাহিদার ক্ষেত্রে যোগানের পরিবর্তনের ফল।

যদি চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে এবং যোগান বাড়ে তাহলে যোগান রেখাটি ডান দিকে সরে যাবে। ধরি নতুন যোগান রেখাটি হল SS_1. এখানে দাম OP_0 থেকে কমে OP_1 হবে। আবার যোগান যদি কমে তাহলে যোগান রেখা হবে SS_2 এবং

সেক্ষেত্রে দাম বেড়ে হবে OP_2. অতএব চাহিদা যদি স্থির থাকে, তাহলে যোগান বাড়লে দাম কমবে এবং যোগান কমলে দাম বাড়বে।

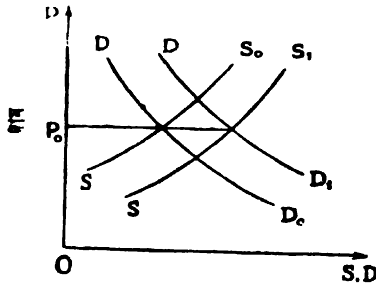


চাহিদা ও যোগান
১১.২২ রেখাচিত্র : স্থির চাহিদার ক্ষেত্রে যোগানের পরিবর্তনের ফল

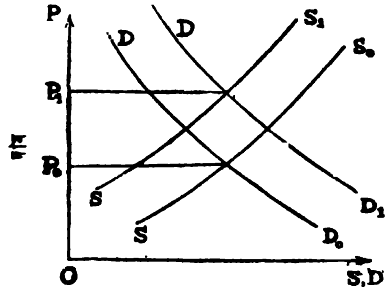
তৃতীয় অবস্থা : চাহিদা ও যোগানের একসঙ্গে পরিবর্তনের ফল।

চাহিদা ও যোগানের একসঙ্গে পরিবর্তন হলে চার রকম অবস্থার সৃষ্টি হবে। আমরা ধরে নেব চাহিদা ও যোগান উভয়েই সমান হারে বাড়ছে বা কমছে। তাহলে ধরি—

(ক) চাহিদা বাড়ছে ও যোগানও বাড়ছে, এখানে চাহিদা রেখা ও যোগান রেখা উভয়েই সমানভাবে ডানদিকে সরে যাবে। চাহিদা রেখাটি হবে DD_1 এবং যোগান রেখাটি হবে SS_1. এখানে



চাহিদা ও যোগান
১১.২৩ রেখাচিত্র : চাহিদা ও যোগানের একই দিকে সমান হারে পরিবর্তনের ফলে দাম অপরিবর্তিত থাকে।



চাহিদা ও যোগান
১১.২৪ রেখাচিত্র : চাহিদার বৃদ্ধি ও যোগানের হ্রাস ঘটলে দাম কীভাবে বৃদ্ধি পায়

দাম অপরিবর্তিত থাকবে। অনুরূপভাবে (খ) চাহিদা ও যোগান যদি সমান হারে কমে তাহলেও দাম স্থির থাকবে। এখানে DD_1 ও SS_1কে প্রথম চাহিদা ও যোগান রেখা এবং DD_0 ও SS_0কে দ্বিতীয় চাহিদা ও যোগান রেখা ধরলে দেখা যাবে দাম OP_0 স্তরে স্থির আছে।

(গ) চাহিদা বাড়ছে, যোগান সমান হারে কমছে।

এখানে DD_0 রেখা ডান দিকে সরে DD_1 হবে, SS_0 রেখা বামদিকে সরে SS_1 হবে। দাম OP_0 থেকে বেড়ে OP_1 হবে। দাম বেশ বাড়বে।

(ঘ) চাহিদা কমছে, যোগান বাড়ছে।

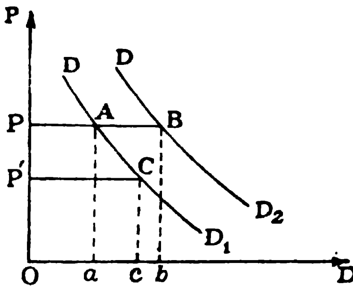
তৃতীয় ক্ষেত্রে রেখাচিত্রে যদি DD_1কে প্রাথমিক চাহিদা রেখা এবং SS_1কে প্রাথমিক যোগান রেখা ধরি তাহলে প্রাথমিক দাম হবে OP_1. এখানে চাহিদা কমার জন্য DD_1 রেখা বামদিকে সরে DD_0 হবে এবং যোগান বৃদ্ধি পাওয়ায় যোগান রেখা ডান দিকে সরে SS_0 হবে। এখানে দাম কমে OP_0 হবে।

তাহলে আমরা পাই,

যদি চাহিদা ও যোগান সমান হারে বাড়ে বা কমে তাহলে দাম স্থির থাকবে। কিন্তু যদি চাহিদা বাড়ে এবং যোগান কমে তাহলে দাম বাড়বে এবং যদি চাহিদা কমে ও যোগান বাড়ে তাহলে দাম কমবে।

১১.১৩ চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন :

(ক) **চাহিদার পরিবর্তন ও তার ব্যাখ্যা :** সমগ্র চাহিদা রেখাটি যখন ডানদিকে কিংবা বাম দিকে সরে যায়, তখন আমরা বলতে পারি যে, চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে। অতএব **চাহিদার পরিবর্তন হল চাহিদা রেখার অপসরণ**। চাহিদা রেখা যদি ডান দিকে সরে যায় তাহলে যে-কোন দামে আগের চেয়ে চাহিদা বেশি হবে। বাম দিকে সরে গেলে তার বিপরীত হবে। সেজন্য একে নির্দিষ্ট দামে চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাস বোঝায়। নির্দিষ্ট দামে চাহিদার বৃদ্ধিকে কম দামে চাহিদার বৃদ্ধির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়। আমরা পাশের রেখাচিত্রের সাহায্যে এই পার্থক্যটি বোঝাতে পারি। ধরা যাক চাহিদা রেখাটি DD_1 থেকে ডানদিকে সরে গিয়ে DD_2 হল। আগে OP দামে চাহিদা হত Oa, এখন হবে Ob. দাম OP স্তরে স্থির আছে, তাহলেও চাহিদার বৃদ্ধি হল। এটা হল স্থির দামে চাহিদার বৃদ্ধি। কিন্তু ধরা যাক, চাহিদা রেখাটি DD_1 স্তরে স্থির রয়েছে, কিন্তু কোন কারণে দ্রব্যের দাম কমে OP' হল। এর ফলে DD_1 রেখার A বিন্দু থেকে চাহিদা সরে গেল C বিন্দুতে এবং চাহিদা বেড়ে হল Oc. এখানে দাম কমে যাওয়ার জন্যই চাহিদার বৃদ্ধি হল। এটা হল কম দামে চাহিদার বৃদ্ধি।



১১.২৪ রেখাচিত্র : চাহিদার পরিবর্তন

অতএব A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে গেলে চাহিদার যে বৃদ্ধি ঘটে সেটা হল স্থির দামে চাহিদার বৃদ্ধি। কিন্তু A থেকে C বিন্দুতে গেলে একই চাহিদা রেখার উপর বামদিকের বিন্দু থেকে ডান দিকের বিন্দুতে যাওয়া হয়। এখানে চাহিদা রেখাটি স্থির থাকে। A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে সরে যাওয়াকে **চাহিদার পরিবর্তন** এবং A বিন্দু থেকে C বিন্দুতে সরে যাওয়াকে নির্দিষ্ট চাহিদাতে পরিবর্তন বলা হয়।

(খ) **চাহিদার পরিবর্তনের কারণ :** বিভিন্ন কারণে চাহিদার বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

(১) জনসংখ্যার পরিবর্তন, (২) আয়ের পরিবর্তন, (৩) অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব, (৪) আয় বণ্টনের প্রভাব, (৫) রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন, (৬) বিজ্ঞাপনের প্রভাব, (৭) নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন, (৮) প্রদর্শন প্রভাব (Demonstration Effect)।

জনসংখ্যার বৃদ্ধি হলে ভোগ্যদ্রব্যের প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়। ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করার জন্য মূলধনদ্রব্য চাই। কাজেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কাজেই কোন একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্থির দামে চাহিদা রেখাটি ডান দিকে ও উপরের দিকে সরে গেছে। অনুরূপভাবে, জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পেলে, কিংবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেলে যে-কোন দ্রব্যের চাহিদা রেখা ডানদিকে সরে যায়। বিপরীতক্রমে, জনসংখ্যা হ্রাস পেলে, আয় কমে গেলে, অর্থনৈতিক অনুন্নয়ন ঘটলে বা দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেলে ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনদ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেতে পারে।

দেশের মোট আয় দেশের মানুষের মধ্যে বণ্টিত হয়। সমাজে সাধারণত ধনী ও দরিদ্র—এই দুই শ্রেণীর মানুষ থাকতে পারে। আবার ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত, রিক্ত, সর্বহারা বহু শ্রেণীর কথাও বলা যেতে পারে। আলোচনার স্বার্থে ধরা যেতে পারে যে, সমাজে কেবলমাত্র মজুরী প্রাপক শ্রমিকশ্রেণী এবং মুনাফা, খাজনা, সুদ ইত্যাদি আয় প্রাপক পুঁজিপতি শ্রেণীর মানুষ বাস করেন। সমাজের মোট আয় এঁদের মধ্যে ভ[illegible] হয়ে যায়। তাঁরা তা থেকে ভোগব্যয় করেন। এখন আয় বণ্টনের কোন পরিবর্তন হলে মোট ভোগব্যয়েরও পরিবর্তন হবে। সাধারণত দেখা যায় যে, শ্রমিকদের ভোগ করার ইচ্ছা বেশি থাকে, ধনীদের যেমন থাকে সঞ্চয় করার ইচ্ছা। এই অবস্থায় আয়ের পুনর্বণ্টনের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের আপেক্ষিক আয় যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে দেশের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে। কাজেই চাহিদা রেখা উপরের দিকে উঠবে। এর বিপরীত হলে চাহিদা হ্রাস পাবে এবং চাহিদা রেখা নীচের দিকে নামবে।

ক্রেতাদের রুচির পরিবর্তন হলে কোন দ্রব্যে[illegible]হিদা বৃদ্ধি পেতে পারে। যেমন, যারা আগে আমিষ আহার করত, তারা কোন কারণে নিরামিষাশী হয়ে গেলে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির চাহিদা কমবে। সুতী বস্ত্রের বদলে লোকে যদি কৃত্রিম তন্তুজ কাপড়-জামা ব্যবহার করে তাহলে সুতী বস্ত্রের চাহিদা কমবে এবং কৃত্রিম তন্তুজ বস্ত্রের চাহিদা বাড়বে। অতএব ক্রেতাদের রুচির পরিবর্তন হলে সকল দ্রব্যের চাহিদাই বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় না, কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে অপর কয়েকটি দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়।

বিক্রেতারা তাদের দ্রব্য বিক্রয় করার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়। এতে ক্রেতাদের চাহিদা

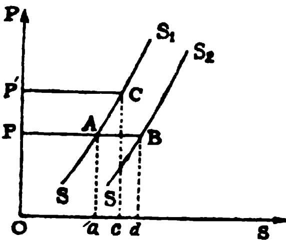
এক দ্রব্য থেকে অন্য দ্রব্যে সরে যেতে পারে। যাদের বিজ্ঞাপন সার্থক হবে তাদের দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে, কিন্তু তাদের দ্রব্যের বিকল্প দ্রব্যসমূহের চাহিদা কমবে। নতুন দ্রব্যের উদ্ভাবন হলেও ক্রেতারা পুরাতন দ্রব্যের পরিবর্তে নতুন দ্রব্য ক্রয় করতে পারে। এতে নতুন দ্রব্যের চাহিদা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনি পুরাতন দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়।

অধ্যাপক ডুয়েসেন বেরীর মতে ভোগকারীদের চাহিদা অপরের ভোগস্তর দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রতিবেশীরা যেন তাদের ভোগের ব্যাপারটা অন্যান্যদের নিকট প্রদর্শন করে এবং অন্যদের ভোগকে প্রভাবিত করে। এর নাম প্রদর্শন প্রভাব। এই প্রভাবের ফলে স্থির দামে চাহিদার বৃদ্ধি ঘটতে পারে।

(গ) **যোগানের পরিবর্তন :**

স্থির দামে যদি যোগানের হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়, তাহলে তাকে যোগানের পরিবর্তন বলা হয়। যোগান বৃদ্ধি পেলে যোগান রেখাটি ডানদিকে এবং উপরের দিকে সরে যায়; যোগান হ্রাস পেলে যোগান রেখাটি বামদিকে এবং উপরের দিকে সরে যায়। যোগানের এই পরিবর্তনকে উচ্চতর দামে যোগান বৃদ্ধি থেকে পৃথক করে দেখতে হয়। উচ্চতর দামে যোগান বৃদ্ধি পায়। যে-কোন একটি যোগান রেখার বামদিকের কোন বিন্দু থেকে ডানদিকের কোন বিন্দুতে সরে গেলে এরূপ ঘটে। এখানে যোগান রেখাটি স্থির থাকে। কিন্তু যোগানের পরিবর্তনের ফলে গোটা যোগান রেখাটি সরে যায়।

পাশের রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল।



১১.২৬ রেখাচিত্র : যোগানের পরিবর্তন

এই রেখাচিত্রে SS_1 হল প্রথম যোগান রেখা এবং SS_2 হল দ্বিতীয় যোগান রেখা। SS_2 রেখাটি SS_1 রেখার ডানদিকে আছে। এটা হল যোগানের বৃদ্ধি। দাম যদি OP হয়, তাহলে SS_1 রেখায় যোগান হবে Oa (A বিন্দুতে) এবং SS_2 রেখায় OP দামে যোগান হবে Od এখানে Od > Oa. অর্থাৎ স্থির দামে যোগানের বৃদ্ধি ঘটেছে। কিন্তু যোগান রেখাটি যদি SS_1 স্তরে স্থির থাকে, তাহলে দাম বেড়ে OP' হলে যোগান বেড়ে হবে Oc. এটা হল স্থির যোগান রেখার উপর দাম বৃদ্ধির প্রভাব। এখানে A বিন্দু থেকে C বিন্দুতে গেলে যোগান Oa থেকে বেড়ে Oc হয়। যোগান হ্রাস পেলে যোগান রেখা বামদিকে সরে যাবে।

(ঘ) **যোগানের পরিবর্তনের কারণ :**

স্থির দামে যোগানের পরিবর্তন হতে পারে নানা কারণে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (১) সময়-মেয়াদের হ্রাস বা বৃদ্ধি, (২) উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন,

(৩) উপাদানের দামের পরিবর্তন, (৪) শিল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যার পরিবর্তন, (৫) উৎপাদনের উপর সরকারী করের প্রভাব ইত্যাদি।

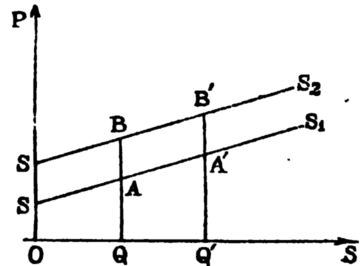
(১) সময়-মেয়াদ যত দীর্ঘ হবে, ততই ফার্মের পক্ষে কারখানার আয়তনের যথাযোগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। ফলে ফার্ম বেশি পরিমাণে দ্রব্যের যোগান দিতে পারবে। সময়-মেয়াদ হ্রাস পেলে যোগানের বৃদ্ধি ঘটানো যাবে না। অবশ্য এই বিষয়টি যোগান রেখার ঢাল নির্ধারণে যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যোগান রেখার অপসরণে তত গুরুত্বপূর্ণ হয়।

(২) ফার্মের উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি হলে ফার্মের পক্ষে স্থির দামে বেশি পরিমাণে দ্রব্য যোগান দেওয়া সম্ভব হবে। কাজেই তার যোগান রেখা ডানদিকে সরে যাবে। কারণ উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটার অর্থই হল যে, ফার্মটি পূর্বের ব্যয়ে বেশি দ্রব্য উৎপাদন করতে পারছে, কিংবা সমান পরিমাণ দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় কম হবে। এর দ্বারা বোঝায় যে, ফার্মের যোগান রেখা ডান দিকে এবং উপরের দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

(৩) উপাদানের সেবার দাম কমে গেলে সমান পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার ব্যয় কমে যাবে, অর্থাৎ সমান ব্যয়ে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এর অর্থ হল যে, ফার্মের যোগান রেখা ডানদিকে ও উপরের দিকে সরে যাবে। বিপরীতক্রমে, উপাদানের সেবার দাম বৃদ্ধি পেলে যোগান রেখা বামদিকে সরে যাবে।

(৪) শিল্পের মধ্যে নতুন ফার্ম প্রবেশ করলে স্থির দামে শিল্পের সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পাবে, ফলে যোগান রেখা ডান দিকে সরে যাবে। আবার পুরাতন ফার্মগুলি বন্ধ হয়ে গেলে যোগান রেখা বামদিকে সরবে।

(৫) কোন দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর সরকার কর আরোপ করেন। একে বিক্রয় কর বলা হয়। বিক্রয় কর আরোপিত হলে দ্রব্যের যোগান-দাম করের সমান পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং যোগান রেখাটি করের সমান পরিমাণ দূরত্বে বাম দিকে ও উপরের দিকে সরে যায়। পাশের রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখানো হল। এই রেখাচিত্রে SS_1 হল মূল যোগান রেখা।



১১.২৭ রেখাচিত্র : কর ও যোগান

ধরা যাক, যোগান = OQ. তাহলে যোগান-দাম হবে AQ. যোগান = OQ′ হলে যোগান-দাম হবে A′Q′. ধরা যাক, এই দ্রব্যের উপর AB পরিমাণে বিক্রয় কর আরোপিত হল। তাহলে কর-আরোপিত যোগান রেখাটি হবে SS_2. এই যোগান

রেখাটি SS রেখার বামদিকে এবং উপরে থাকবে। এখন, দ্রব্যের যোগান = OQ হলে যোগান-দাম হবে BQ = AQ + AB = পূর্বের দাম + করের পরিমাণ। অনুরূপভাবে, যোগান যদি OQ′ হয়, তাহলে যোগান-দাম হবে B′Q′ = A′Q′ + A′B′ = পূর্বের যোগান-দাম + কর। এখানে SS_1 এবং SS_1 সমান্তরাল হয়েছে। অতএব AB = A′B′ হবে।

১১.১৪ দামের উপর করের প্রভাব :

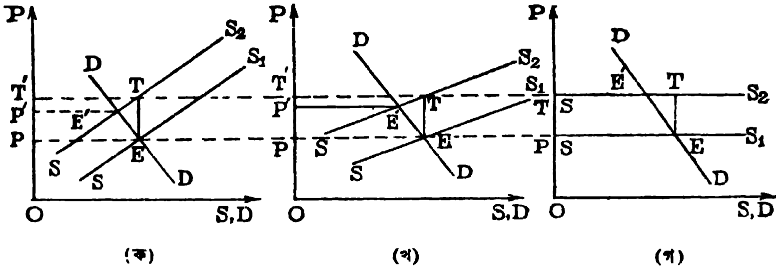
সরকার কোন দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর কর আরোপ করেন। এই করের পরিমাণ যদি স্থির ও নির্দিষ্ট হয়, তাহলে দ্রব্যের ভারসাম্য-দামের উপর প্রভাব পড়বে। সাধারণ ধারণা থেকে বলা যায় যে, করের প্রভাবে দ্রব্যের ভারসাম্য-দাম বৃদ্ধি পাবে। তবে **দাম কতখানি বাড়বে তা নির্ভর করবে (১) আরোপিত করের পরিমাণ, (২) যোগানের স্থিতিস্থাপকতা এবং (৩) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।** সাধারণ ধারণা থেকে আমরা বলতে পারি (১) করের পরিমাণ যত বেশি বা কম হবে ভারসাম্য-দামের বৃদ্ধিও তত বেশি বা কম হবে। (২) যোগান যত কম বা বেশি স্থিতিস্থাপক হবে, ভারসাম্য-দামের বৃদ্ধির মধ্যে করের প্রভাব ততই কম বা বেশি হবে এবং (৩) ক্রেতাদের চাহিদা যত অস্থিতিস্থাপক হবে, ততই দাম বৃদ্ধির মধ্যে বেশি পরিমাণে করের ভাগ থাকবে। এই বিষয়গুলি রেখাচিত্রের সাহায্যেই ভালোভাবে আলোচনা করা যায়। প্রথমে আমরা যোগানের বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে দামের উপর করের প্রভাব দেখিয়েছি ১১.২৮ নং রেখাচিত্রের অন্তর্ভুক্ত (ক), (খ) ও (গ) চিত্রে। পরে ঐ রেখাচিত্রের অন্তর্ভুক্ত (ঘ), (ঙ) ও (চ) চিত্রে চাহিদার বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা নিয়ে এই প্রভাব দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে চাহিদা ও যোগান এবং উল্লম্ব অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে SS_1 হল করারোপের পূর্বের যোগান রেখা এবং SS_2 হল করারোপের পরের যোগান রেখা। DD হল প্রত্যেক ক্ষেত্রের চাহিদা রেখা। আমরা ধরে নিয়েছি যে, **করারোপের ফলে কেবলমাত্র যোগান রেখাই বামদিকে করের পরিমাণে সরে যায়, কিন্তু চাহিদা রেখার কোন পরিবর্তন হয় না।**

(ক) যোগানের বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য দামের উপর করের প্রভাব :—

(ক), (খ) ও (গ) চিত্রে DD রেখা ও SS_1 রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। সুতরাং করারোপের পূর্বের ভারসাম্য-দাম হবে OP. করারোপের পর যোগান রেখা করের পরিমাণ = ET দূরত্বে বাম দিকে সমান্তরালভাবে সরে গেছে। করারোপের পর ভারসাম্য-দাম হয়েছে OP′. দেখা যাচ্ছে, OP′ > OP. অতএব করারোপের ফলে দ্রব্যের ভারসাম্য-দাম বৃদ্ধি পায়।

(ক) চিত্রে SS_1 রেখাটি (খ) চিত্রের SS_1 রেখার থেকে বেশি খাড়াভাবে আছে। অতএব (ক) চিত্রে SS_1 রেখা হল অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা এবং (খ) চিত্রের SS_1 হল স্থিতিস্থাপক যোগান রেখা। দেখা যাচ্ছে (ক) অবস্থার চেয়ে (খ) অবস্থায় ভারসাম্য-দাম বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা বলি (১) **যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত**

বেশি হবে করের প্রভাবে ভারসাম্য-দাম তত বেশি বাড়বে। কিন্তু (ক) চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ET = PT′ পরিমাণ করের মধ্যে ক্রেতাদের উপর চাপছে PP′ (< PT′) পরিমাণ কর এবং বিক্রেতাদের উপর চাপছে করের বাকি পরিমাণ। অর্থাৎ P′T হল বিক্রেতাদের উপর করের বোঝা। আবার দেখা যাচ্ছে যে, (ক) চিত্রে ক্রেতাদের উপর করের অংশ (PP′) (খ) চিত্রের PP′ অংশের চেয়ে কম। অপরপক্ষে



১১.২৮ রেখাচিত্র : বিভিন্ন প্রকার যোগান রেখার ক্ষেত্রে দামের উপর করের প্রভাব

(ক) চিত্রের P′T′ (খ) চিত্রের P′T′ অপেক্ষা বেশি। তাহলে আমরা পাই (২) **করের ভার ক্রেতা ও বিক্রেতার উপর বিভক্ত হয়। (৩) যোগান যত অস্থিতিস্থাপক হবে, ততই ক্রেতাদের উপর করের বেশি অংশ পড়বে এবং বিক্রেতাদের উপর কম অংশ পড়বে, অপরপক্ষে, যোগানের স্থিতিস্থাপকতা যত বৃদ্ধি পাবে ততই বিক্রেতাদের অংশ কমবে এবং ক্রেতাদের অংশ বাড়বে।**

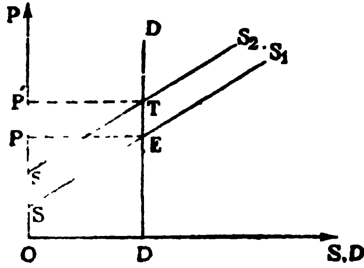
(গ) চিত্রে যোগান রেখা SS_1 হল পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। এখানে করারোপের ফলে SS_2 রেখাটি SS_1 রেখার সমান্তরাল থেকে ET পরিমাণ দূরত্বে SS_1 রেখার উপরের দিকে সরে গেছে। এখানে ভারসাম্য-দাম সমগ্র করের পরিমাণ দ্বারা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং করের ভার কেবলমাত্র ক্রেতাদের উপরেই পড়েছে। অতএব আমরা পাই, (৪) **যেখানে যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক, সেখানে দ্রব্যের ভারসাম্য দাম করের সমগ্র পরিমাণ দ্বারা বৃদ্ধি পায় এবং এর ভার কেবলমাত্র ক্রেতাদের উপরে পড়ে।**

(খ) চাহিদার বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে ভারসাম্য দামের উপর করের প্রভাব :—

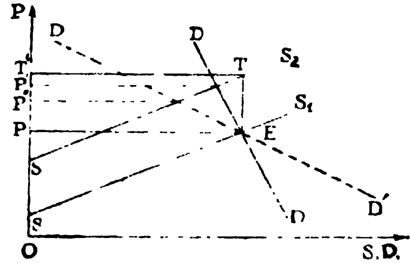
(ঘ) চিত্রে চাহিদা রেখা DD হল পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। এখানে করের আগে দাম ছিল OP, করের পরিমাণ = ET. ভারসাম্য-দাম বৃদ্ধি পেল PP′ = ET পরিমাণে। অতএব আমরা পাই (৫) **যেখানে চাহিদা পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হবে সেখানে ভারসাম্য-দাম করের সমগ্র পরিমাণ দ্বারা বৃদ্ধি পাবে এবং ক্রেতাদের উপর সম্পূর্ণভাবে এই করের ভার পড়বে।**

(ঙ) চিত্রে প্রথমে DD নামক একটি চাহিদা রেখার কথা ধরা যেতে পারে। এখানে করের পরিমাণ ET = PT′. কিন্তু ভারসাম্য-দাম বেড়েছে PP′ পরিমাণে।

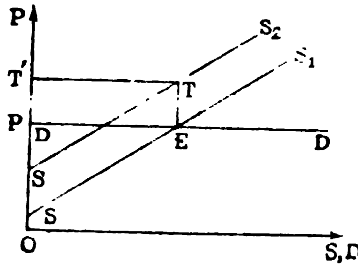
অতএব দাম করের পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। PT পরিমাণ করের মধ্যে ক্রেতারা দেয় PP' পরিমাণ এবং বিক্রেতারা বহন করে P'T' পরিমাণ। এখানেও করের ভার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে বিভক্ত হবে। এবার ঐ চিত্রে ভাঙা লাইনে আঁকা DD' নামক চাহিদা রেখাটির কথা ধরা যেতে পারে। DD' রেখাটি



(ঘ)



(ঙ)



(চ)

১১.২৮ রেখাচিত্র : বিভিন্ন প্রকার চাহিদা রেখার ক্ষেত্রে দামের উপর করের প্রভাব

DD রেখার চেয়ে হেলানো। অর্থাৎ DD রেখার থেকে DD' রেখার স্থিতিস্থাপকতা বেশি। এখানে করের পরিমাণ সমান থাকা সত্ত্বেও ভারসাম্য দাম কম বেড়েছে। শুধু তাই নয়, এখানে PT' পরিমাণ করের মধ্যে ক্রেতারা দেয় PP এবং বিক্রেতারা দেয় P T'. অতএব আমরা পাই (৬) **ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হবে, করারোপের ফলে ভারসাম্য-দাম-বৃদ্ধির পরিমাণ তত কম হবে এবং করের ভার ক্রেতাদের উপর কম পড়বে, কিন্তু বিক্রেতাদের উপর বেশি পড়বে।**

(চ) চিত্রে চাহিদা রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। এখানে করারোপের ফলে ভারসাম্য-দামের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। করের ভার বিক্রেতাদের বহন করতে হবে। অতএব আমরা পাই —

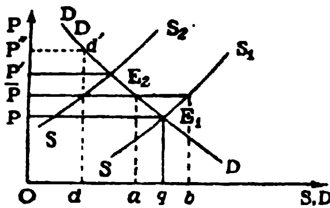
(৭) **ক্রেতাদের চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হলে করারোপের ফলে ভারসাম্য-দামের কোন পরিবর্তন হবে না এবং বিক্রেতারাই করের ভার বহন করবে।**

১১.১৫. দাম নিয়ন্ত্রণ : সরকার কর্তৃক কোন দ্রব্যের ঊর্ধ্বতম কিংবা নিম্নতম দাম নির্ধারণ করে দেওয়াকেই দাম নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। সরকার যে দাম নির্ধারণ করে দেন, সেই নিয়ন্ত্রিত দামে ক্রয়-বিক্রয় করাই বাধ্যতাম‍ূলক হয়ে দাঁড়ায়। কোন ক্রেতা তার চেয়ে বেশি দাম দিলে বা কোন বিক্রেতা তার চেয়ে বেশি দাম নিলে বেআইনী বাজার বা কালো বাজার (Black Market) গড়ে ওঠে। আবার সরকার কোন দ্রব্যের নিম্নতম দাম বেঁধে দিলে কেউ তার চেয়ে বেশি দাম দিতে বা নিতে পারে না। সেরকম করলে বেআইনী কাজ করা হয়। কৃষিজাত বা শিল্পজাত, কিংবা ভোগ্যদ্রব্য বা ম‍ূলধনদ্রব্য যে-কোন এক বা একাধিক দ্রব্যের উপর দাম নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে এবং ক্রেতা বা বিক্রেতা যে-কোন একজনের স্বার্থে দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চাল‍ু করা হয়। তবে আমরা বলতে পারি— **সাধারণত ক্রেতাদের স্বার্থে ঊর্ধ্বতম দাম এবং বিক্রেতাদের স্বার্থে নিম্নতম দাম নির্ধারণ করা হয়।**

ঊর্ধ্বতম দাম নির্ধারণ : কোন দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। চাহিদা ও যোগান নামক শক্তি দ‍ুটিকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিলে তারা এমন দাম নির্ধারণ করে দেয় যাতে বাজারে চাহিদা ও যোগান সমান হয়। কোন অতিরিক্ত চাহিদা বা যোগান থাকে না। এই দামই হল ভারসাম্য-দাম। কিন্তু কোন কারণে যদি (১) কোন দ্রব্যের যোগান খ‍ুব কমে যায় এবং চাহিদা স্থির থাকে কিংবা বেড়ে যায় তাহলে সেই দ্রব্যের দাম খ‍ুব বেশি বেড়ে যাবে এবং ক্রেতাদের অস‍ুবিধে হবে। চাল, গম, চিনি, কেরোসিন, কয়লা, ভোজ্য তেল, ডাল, কাপড়, কাগজ, কালি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে যোগানের ঘাটতি দেখা গেলে খোলা বাজারে (যে বাজারে চাহিদা ও যোগানের উপর কোন বাধা বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না) ঐ দ্রব্যগ‍ুলির দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যেতে থাকে। এতে ক্রেতাদের প্রচণ্ড অস‍ুবিধে হয়। কিন্তু কোন দ্রব্যের যোগানের ঘাটতি হয় কেন ? সেটা দ‍ুটো কারণে হতে পারে, যথা (ক) উৎপাদকদের ও ব্যবসায়ীদের ইচ্ছার বাইরে বা নিয়ন্ত্রণবিহীন কোন কারণে, অথবা (খ) উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের ইচ্ছাকৃতভাবে বা কৃত্রিমভাবে। প্রথমটি হল স্বাভাবিক ঘাটতি, দ্বিতীয়টি হল কৃত্রিম ঘাটতি; কিন্তু যেভাবেই ঘাটতি হোক না কেন, সেই ঘাটতির ফলে ক্রেতাদের অস‍ুবিধে হয়। এই অবস্থায় সরকার ভোগ্যদ্রব্য ক্রেতাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ঐ সব দ্রব্যের দামের ঊর্ধ্বসীমা (ceiling) নির্ধারণ করে দেন। বলা বাহ‍ুল্য, এই দাম নতুন ভারসাম্য দামের চেয়ে বেশি রাখা হলে ক্রেতাদের কোন স‍ুবিধেই হবে না এবং নির্ধারিত দামের চেয়ে কম দামে দ্রব্যটি পাওয়া যাবে বলে দাম নিয়ন্ত্রণ করার ম‍ূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হবে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, **ঊর্ধ্বতম দাম প‍ূর্বের ভারসাম্য-দামের চেয়ে বেশি হলেও নতুন ভারসাম্য-দামের চেয়ে কম হবে।** পরপ‍ৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে দামের ঊর্ধ্বতম সীমা নির্ধারণের ব্যাপারটি দেখানো হল।

এখানে উল্লম্ব অক্ষে দাম এবং অন‍ুভূমিক অক্ষে চাহিদা ও যোগান পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে ধরা হয়েছে যে, দ্রব্যের যোগানে ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, চাহিদা

অপরিবর্তিত আছে। DD হল চাহিদা রেখা এবং SS_1 হল প্রথম যোগান রেখা। প্রথম ভারসাম্য-দাম OP. পরে যোগানে ঘাটতি ঘটায় যোগান রেখাটি বামদিকে সরে গেল। SS_2 হল নতুন যোগান রেখা। এখন খোলাবাজারে দাম হবে OP′. ধরা যাক, সরকার ঘোষণা করলেন যে, দাম OP অপেক্ষা বেশি হতে পারবে না। তাহলে OP হবে উর্ধ্বতম নিয়ন্ত্রিত দাম, এই দামে যোগান হবে Ob এবং চাহিদা হবে Oa. অর্থাৎ ab পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হবে। এখন প্রশ্ন, ব্যবসায়ীরা কি OP দামে Ob পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দেবে? দিলে কীভাবে দেবে?



১১.২৯ রেখাচিত্র : উর্ধ্বতম দাম নিয়ন্ত্রণ

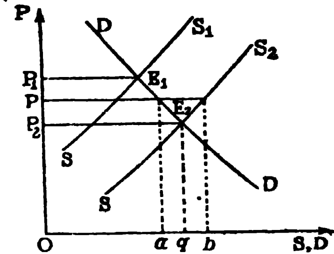
উত্তরে বলা যায় যে, ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের "আগে এলে আগে পাবে" নীতির ভিত্তিতে এই পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে। কিন্তু এতে অতিরিক্ত চাহিদার সমস্যা থাকবে। দামের উপর উর্ধ্বমুখী চাপও থাকবে। যে ক্রেতারা দ্রব্য পাবে না, তারা OP″ পরিমাণ দামে দ্রব্য ক্রয় করতে চাইবে। এখানে OP″ হল কালোবাজারের সর্বাধিক দাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে—**উর্ধ্বতম দাম নিয়ন্ত্রণের ফলে কালোবাজারের উদ্ভব হতে পারে**। সরকারের পক্ষে কালোবাজার নিয়ন্ত্রণ করার সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

এই সব সমস্যার সমাধানের জন্য অতিরিক্ত চাহিদা দূর করা উচিত। ক্রেতাদের চাহিদাকে যদি নামিয়ে আনা যায় তাহলে উর্ধ্বতম দাম-নিয়ন্ত্রণ-নীতি সফল হতে পারে। চাহিদা কমানোর একটি উপায় হল, ভোগবরাদ্দ বা রেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা। ভোগবরাদ্দ ব্যবস্থায় সরকার পরিবারগুলির সদস্যসংখ্যা, তাদের বয়স, আয় ইত্যাদি বিবেচনা করে পরিবার পিছু ভোগবরাদ্দ বেঁধে দিতে পারেন এবং রেশন কার্ড বা কুপনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত দামে ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে দ্রব্য ক্রয় করার নিয়ম চালু করতে পারেন। তাই বলা হয়, **ভোগবরাদ্দ ব্যবস্থা ব্যতীত দাম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সফল হয় না**। কিন্তু ভোগবরাদ্দ ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধে হল যে, এতে জনসাধারণের ভোগস্তর ও তৃপ্তি কমে যায়। যাদের ক্রয়ক্ষমতা থাকে তারাও দ্রব্য ভোগ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। কাজেই সরকার অপ্রিয় হতে পারেন। ভোগবরাদ্দ ব্যবস্থার দুর্নীতিও থাকে।

(খ) নিম্নতম দাম নির্ধারণ :

কোন দ্রব্যের যোগান বেড়ে গেলে, কিংবা চাহিদা কমে গেলে কিংবা উভয় কারণে কোন দ্রব্যের দাম খুব কমে যেতে পারে। দ্রব্যের দাম গড় উৎপাদন ব্যয়ের নীচে নেমে গেলে উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাঁচা পাট, তুলো, ধান বা চাল, আখ প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে। আবার কোনো শিল্পজাত দ্রব্যের

ক্ষেত্রেও হতে পারে। যে বছর অনুকূল মরশুম থাকে সে বছর কৃষিজাত দ্রব্যের যোগান খুব বেড়ে যায়। দাম পড়ে যায়। চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সব ক্ষেত্রে সরকার দ্রব্যের নিম্নতম দাম বেঁধে দিতে পারেন। সেই নিম্নতম দাম কখনই নতুন ভারসাম্য-দামের চেয়ে কম হবে না, কারণ তাতে দাম নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। নীচে রেখাচিত্রের সাহায্যে নিম্নতম দাম নিয়ন্ত্রণ দেখানো হল। এখানে ধরা হয়েছে যে, যোগান বৃদ্ধির জন্য নতুন ভারসাম্য দাম আগের চেয়ে কমে গেছে এবং নিম্নতম দাম বেঁধে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এই রেখাচিত্রে উল্লম্ব অক্ষে দাম এবং অনুভূমিক অক্ষে চাহিদা ও যোগান পরিমাপ করা হয়েছে। SS_1 হল প্রথম যোগান রেখা। DD হল চাহিদা রেখা। প্রথম ভারসাম্য-দাম হল OP_1.



১১.৩০ রেখাচিত্র : নিম্নতম দাম নির্ধারণ

এখন ধরা হল যোগান রেখা ডান দিকে সরে গিয়ে SS_2 হল। নতুন ভারসাম্য দাম $OP_2 < OP_1$. এই দামে চাহিদা ও যোগান $= Oq$. এখন ধরা হল যে, সরকার নিম্নতম দাম OP স্তরে স্থির করলেন। এখানে $OP > OP_2$. এই দামে যোগান হবে Ob এবং চাহিদা হবে Oa. কাজেই বাজারে ab পরিমাণে অতিরিক্ত যোগান থাকবে।

প্রশ্নাবলী

১। বাজার কাকে বলে? বাজারের কাজ কী?

২। "বাজার ভোগ ও উৎপাদনের ব্যবধান দূর করে এবং দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে"। উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

৩। বাজার কাকে বলে? অর্থনীতিতে বাজারের কীরূপ শ্রেণীবিভাগ করা হয় আলোচনা কর।

৪। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে কী বোঝ? এই বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা কর।

৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৬। "পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একজন ক্রেতা বা একজন বিক্রেতা দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে না, নির্ধারিত দামকে গ্রহণ করে মাত্র"। — উক্তিটির আলোচনা কর এবং এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

৭। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় এবং ব্যয়ের স্বরূপ নির্ণয় কর।

৮। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা কেমন হয়—যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৯। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে কী কী অবস্থার উদ্ভব হতে পারে রেখাচিত্রসহ আলোচনা কর।

১০। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের শর্তগুলির আলোচনা কর।

১১। স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পার্থক্য কর। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি কার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের সার্থকতা ব্যাখ্যা কর।

১২। স্বাভাবিক মুনাফা কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য কী? কখন পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্মের স্বাভাবিক মুনাফা হয়, কখন হয় না? না হলে কি কার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেয়? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

১৩। স্থির ব্যয় কাকে বলে? তুমি কি মনে কর যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্ম স্বল্পকালে স্থির ব্যয় তুলতে না পারলে উৎপাদন বন্ধ করে দেয়? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

১৪। আয়-ব্যয়-সমতার বিন্দু ও উৎপাদন বন্ধের বিন্দু বলতে কী বোঝ? এদের পার্থক্য কর। একটি রেখচিত্র এঁকে এই বিন্দুগুলি স্থাপন কর। এবং এদের শর্তগুলি লেখ।

১৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ও তার শর্তাবলী সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১৬। অবাধ প্রবেশাধিকার বলতে কী বোঝ? অবাধ প্রবেশাধিকার কীভাবে পূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক কার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে আলোচনা কর।

১৭। দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্মের কোন অতিরিক্ত মুনাফা হয় কি? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

১৮। শিল্পের ভারসাম্য কাকে বলে? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের ভারসাম্য কীভাবে ঘটে? এর শর্তগুলির আলোচনা কর।

১৯। পূর্ণ ভারসাম্য কাকে বলে? কীভাবে পূর্ণ ভারসাম্য ঘটে? এর শর্তগুলি আলোচনা কর।

২০। কার্মের যোগান রেখা কাকে বলে? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

২১। কার্ম ও শিল্পের যোগান রেখা বলতে কী বোঝ? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক কার্ম ও শিল্পের স্বল্পকালীন যোগান রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

২২। যোগানের নিয়ম বলতে কী বোঝ? এই নিয়মটি ব্যাখ্যা কর।

২৩। যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম কীভাবে হয় এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হয়।

২৪। কোন দ্রব্যের দাম বাড়লে তার যোগান বাড়ে কেন?

২৫। যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা দাও। যোগান রেখার কোন বিন্দুতে কীভাবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করা যায় রেখাচিত্রসহ বোঝাও।

২৬। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

২৭। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন দ্রব্যের দাম কীভাবে নির্ধারিত হয় আলোচনা কর।

২৮। "পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে।" আলোচনা কর।

২৯। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩০। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দামের পরিবর্তন কীভাবে হয়? রেখাচিত্রসহ আলোচনা কর।

৩১। চাহিদার পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? কেন এরূপ পরিবর্তন হয়?

৩২। যোগানের পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়? কেন এরূপ পরিবর্তন হয়?

৩৩। বিক্রয় কর আরোপিত হলে দ্রব্যের দামের উপর কী প্রভাব পড়ে?

১২ | অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার

১২.১. ভূমিকা—আমরা জানি বিক্রেতাদের সংখ্যা যখন অসংখ্য থাকে এবং সেই অসংখ্য বিক্রেতাদের মধ্যে যখন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে, মূলত তখনই বাজারের চরিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রভাব পড়ে। কিন্তু বিক্রেতাদের সংখ্যা যখন সীমিত হয়, তখন প্রতিযোগিতাও সীমিত হয়ে পড়ে। এরূপ সীমিত প্রতিযোগিতার বাজারকেই অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়। এইভাবে বিক্রেতাদের সংখ্যা যত কমবে, প্রতিযোগিতাও তত অপূর্ণাঙ্গ হবে। এমনি করে বিক্রেতাদের সংখ্যা যখন একে এসে দাঁড়াবে তখন প্রতিযোগিতার অপূর্ণাঙ্গতাও বোধ হয় পূর্ণাঙ্গতা পাবে। সেই বাজারকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজার বলতে পারব। এই বাজারের আর এক নাম একচেটিয়া বাজার।

একচেটিয়া বাজারে একজন বিক্রেতা বা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান অসংখ্য ক্রেতার নিকট তার উৎপন্ন দ্রব্যটি বিক্রয় করে। এই বিক্রেতার অন্য কোন প্রতিযোগী থাকে না। গোটা বাজারের উপর দখল একজনের। সে যে দামে দ্রব্য বিক্রয় করবে, ক্রেতারা মোটামুটি সেই দামেই দ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য। সে যে পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দিতে চায় ক্রেতাদের সেইটুকুতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বিক্রেতা যদি খুব বেশি দাম চেয়ে বসে, যদি বেশি দামে কম পরিমাণ বিক্রয় করতে চায় তাহলে ক্রেতাদের মানসিক ক্ষোভ বা অতৃপ্তি থাকতে পারে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে করার কিছু থাকে না। কেন কিছু করার থাকে না তার অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, একচেটিয়া কারবারী যে দ্রব্য বিক্রয় করে সেটি যদি খুবই প্রয়োজনীয় দ্রব্য হয় এবং সেই দ্রব্যের যদি কোন বিকল্প দ্রব্য না থাকে তাহলে ক্রেতাদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গতি থাকে না। দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানটি যদি সরকারী আনুকূল্য পায়, সরকারের কাছ থেকে আইনগত বিশেষ অধিকার (পেটেণ্ট রাইট) পায়, তাহলে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে পারবে না, তাহলে সেই হবে একচ্ছত্র। ক্রেতাদের অর্থনৈতিক প্রভাবের চেয়ে তার প্রভাব অনেক বেশি। এই বাজারকে বিক্রেতার বাজার (Seller's Market) বলা যেতে পারে। তৃতীয়ত, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানটি অনেক সময় একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে রাষ্ট্রীয় শক্তি কাজ করে। কোন ক্রেতাই রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তাকে হঠাৎ বদলে দিতে পারে না।

১২.২. কীভাবে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়?

নানাভাবে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হতে পারে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক কারণসমূহ পরের পৃষ্ঠায় দেখানো হলো।

প্রথমেই বলা যায় — পূর্ণ প্রতিযোগিতার মধ্যেই একচেটিয়ার বীজ থাকতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক সব ফার্ম যদি সমান আর্থিক অবস্থায় না থাকে, যদি কোন ফার্ম অন্য ফার্মের তুলনায় বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাহলে তার আয়তন অন্য ফার্মগুলির চেয়ে বেশ বড় হয়ে যেতে পারে। আয়তন বড় হলেই সে ফার্ম বৃহদায়তনের ব্যয়সংক্ষেপ নামক সুবিধাগুলি পাবে। তার গড় ব্যয় অন্য ফার্মের তুলনায় কম হবে। তখন সেই ফার্ম কম দামে ক্রেতাদের কাছে দ্রব্য বিক্রয় করবে। অন্য ফার্মগুলি তা পারবে না। এইভাবে ক্রেতাদের চাহিদার একটি বড় অংশ সেই ফার্ম দখল করে বসবে। সব ক্রেতাই যদি তার কাছে চলে আসে, তাতেও আশ্চর্যের কিছু নেই এবং তার আয়তন যেহেতু বড়, উৎপাদন যেহেতু খুবই বেশি, তাহলে সেই ফার্ম সব ক্রেতাদের চাহিদা মত দ্রব্যের যোগান দিতে পারবে না এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে একদিন দেখা যাবে সেই ফার্মটি টিকে আছে, অন্য ফার্মগুলি হয় মরে গেছে, না হয় ধুঁকছে। এর পরিণামস্বরূপ একদিন একটি ফার্ম শিল্পের আকার ধারণ করবে এবং একচেটিয়া কারবারে পরিণত হবে।

কার্ল মার্কস্ তাঁর অর্থনৈতিক তত্ত্বে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই ব্যাপারটির উপর যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় উৎপাদকরা মুনাফার জন্য উৎপাদন করে। যন্ত্র ব্যবহার করে শ্রমিকদের দিয়ে খুব বেশি দ্রব্য উৎপাদন করায়, কিন্তু শ্রমিকদের কম দেয়। ফলে শ্রমিকরা শোষিত হয়, উৎপাদকের মোট মুনাফা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যন্ত্র, শ্রমিক ও কাঁচামালের ব্যবহার বৃদ্ধি হওয়ায় তাদের উপর মোট বিনিয়োগ যে হারে বাড়ে, মোট মুনাফা সেই হারে বাড়ে না। অর্থাৎ মুনাফার হার কমে যায়। যত বেশি বিনিয়োগ করা হয়, ততই মুনাফার হার কমতে থাকে। তাতে উৎপাদকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এই অবস্থাকে সামাল দেবার জন্য তারা আরো যন্ত্রের ব্যবহার করে এবং যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য আরো বেশি বিনিয়োগ করে। এইভাবে চতুর্দিকে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। এই প্রতিযোগিতায় ছোট ছোট উৎপাদকরা পেরে ওঠে না। তারা পথ ছেড়ে দাঁড়ায়। বড় বড় পুঁজিপতিরা ছোট পুঁজিপতিদের গিলে ফেলে। ব্যাপারটা অনেকটা মাৎস্যন্যায়ের মত। বড় বড় মাছ ছোট মাছদের গিলে ফেলে রাঘব বোয়াল হয়ে যায়। অতএব আর্থিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতাই হল একচেটিয়া কারবারের জন্মভূমি।

দ্বিতীয়ত, অনেক সময় আইনের সাহায্যেও সরকার একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারেন। সরকার কোন বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ একটি দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের অধিকার দান করেন এবং অন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে সেই দ্রব্য সেই পদ্ধতিতে উৎপাদন করতে নিষেধ করেন। এটা হল অবাধ প্রবেশের পথে বাধা। যদি এই বাধা থাকে, তাহলে একচেটিয়া কারবার গড়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, কোন দেশের সরকার নিজে কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদনের দায়িত্ব নিতে পারেন। সেখানে অন্য কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থাকে না। টেলিফোন,

ডাক, তার, রেল পরিবহণ, বিমান পরিবহণ, জলসেচ, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রভৃতি দ্রব্য ও সেবার ক্ষেত্রে সরকারী একচেটিয়া কারবার থাকতে পারে। সরকার দেশের স্বার্থে এইসব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। তাছাড়া কোন দেশের প্রতিরক্ষার সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ, যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত জাহাজ, বিমান ইত্যাদি দ্রব্য সরকার নিজেই উৎপাদন করে নিতে পারেন। এদের বলা হয় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া কারবার (State Monopolies)। অবশ্য দেশের প্রতিরক্ষা দ্রব্যের সঙ্গে অন্য দ্রব্যের পার্থক্য আছে। প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সাধারণের মধ্যে বিক্রয়যোগ্য নাও হতে পারে। তবে একদেশের সরকার অন্য দেশে সেই সব সামগ্রী বিক্রয় করতে পারেন। যাহোক এই ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবার থাকতে পারে এবং দেশের শিল্প-সম্পর্কিত নীতিতে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় আইন বা বিধি রচনা করা হয়।

চতুর্থত, নতুন আবিষ্কার ঘটলেও একচেটিয়া কারবার গড়ে উঠতে পারে। আবিষ্কার বৈজ্ঞানিক ব্যাপার। কোন একটি প্রতিষ্ঠান বা কোন একজন প্রতিভাধর বৈজ্ঞানিক নতুন দ্রব্যের অথবা নতুন উৎপাদন পদ্ধতির আবিষ্কার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে সেই আবিষ্কৃত দ্রব্যটি বা যন্ত্রটি বা উৎপাদন-কৌশলটি কেবলমাত্র তাঁর অধিকারে থাকবে বলে ধনতান্ত্রিক দেশে স্বীকার করে নেওয়া হয়। তিনি তখন নিজে বা কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রব্যটি উৎপাদন ও বাজারে বিক্রয় করতে পারেন। এর জন্য তিনি সরকারের কাছে বিশেষ অনুমতি চেয়ে আবেদন করতে পারেন, সরকার তাঁকে বিশেষ ট্রেডমার্ক ও বিশেষ একচেটিয়া অধিকার বা পেটেন্ট রাইট দিতে পারেন। সেক্ষেত্রেও একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়।

পঞ্চমত, নতুন ফার্ম যদি নতুন যন্ত্র, নতুন উৎপাদন কৌশলের সাহায্যে নতুন দ্রব্য নিয়ে বাজারে উপস্থিত হয়, তাহলে সেই ফার্ম অন্য পুরাতন ফার্মগুলির চেয়ে ব্যয়-গত দিক দিয়ে বেশি সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে। তখন সেই ফার্ম অন্য ফার্মদের কোণঠাসা করে দিতে পারে কিংবা সম্ভব হলে প্রতিযোগিতা থেকে সরিয়ে দিতে পারে। এইভাবে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়।

ষষ্ঠত, ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন হলেও একচেটিয়া কারবার গড়ে ওঠে। একটি অঞ্চলের বা একটি বাজারের সব ক্রেতাই যদি একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য ক্রয় করতে বেশি আগ্রহী হয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানটির সুবিধে হয়। তার সুনাম তখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সব ক্রেতাই তার দ্রব্য ক্রয় করতে চায়। এর ফলে একচেটিয়া কারবার গড়ে ওঠে।

সপ্তমত, অনেক সময় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করে পারস্পরিক স্বার্থে জোটবদ্ধ হতে পারে। তখন যদি সব প্রতিষ্ঠান মিলে গিয়ে একটি নতুন নামের প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়, তাহলে আমরা তাকেই একচেটিয়া কারবার বলতে পারব।

১২.৩. একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্য :

(ক) সংজ্ঞা : কোন দ্রব্যের একচেটিয়া কারবার বলতে এমন একটি বাজারকে বোঝায়, যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা কিংবা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান অসংখ্য ক্রেতাদের নিকট একটি দ্রব্য বিক্রয় করে — যে দ্রব্যের কোন ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য থাকে না এবং যে দ্রব্যের অন্য কোন প্রতিযোগী বিক্রেতাও থাকে না।

(খ) বৈশিষ্ট্য : একচেটিয়া কারবারের সংজ্ঞা থেকেই এর বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বের করা যায়।

প্রথমত, একচেটিয়া কারবারে একজন মাত্র বিক্রেতা বা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান থাকে—যে সারা বাজারে দ্রব্যের যোগান দেয়। এখানে একচেটিয়া কারবারীর ব্যক্তিগত যোগানই হল বাজারের মোট যোগান।

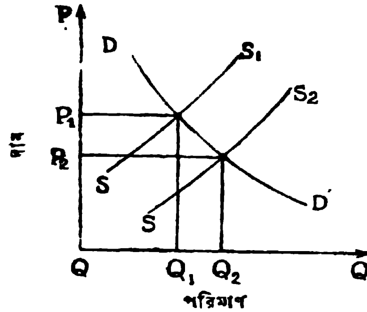
দ্বিতীয়ত, একচেটিয়া কারবারে ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারেই ফার্ম ও শিল্প — এই দুটি পৃথক ধারণা চলতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে ফার্মই শিল্পের আকার ধারণ করে।

তৃতীয়ত, একচেটিয়া কারবারে অসংখ্য ক্রেতা থাকে। ফলে একজন ক্রেতা নিজস্ব ক্রয়ের দ্বারা বাজারে দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। এখানে একজন ক্রেতা দাম-গ্রহীতা বা price taker মাত্র।

চতুর্থত, একচেটিয়া কারবারী উপাদানের বাজারে উপাদানের একমাত্র ক্রেতা না হতেও পারে। অর্থাৎ দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া কারবার থাকলেই যে উপাদানের বাজারেও একচেটিয়া কারবার থাকবে এমন কোন কথা নেই। এমন হতে পারে যে, দ্রব্যের বাজারে যে একচেটিয়া কারবারী, শ্রমের বাজারে অসংখ্য ক্রেতাদের মধ্যে সে একজন মাত্র ক্রেতা। যারা অন্যান্য দ্রব্য তৈরি করে তারাও শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করবে এবং তারা শ্রম ক্রয় করতে চাইবে। এক্ষেত্রে কোন একটি দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া কারবার থাকলেও উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকতে পারে। তাহলে একচেটিয়া কারবারী উপাদানের দামকে প্রভাবিত করতে পারবে না, সে হবে উপাদানের দাম-গ্রহীতা।

পঞ্চমত, একচেটিয়া কারবারী যে দ্রব্যের যোগান দেয় তার কোন ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য থাকে না ; ফলে ক্রেতাদের পক্ষে অন্য দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না। একচেটিয়া কারবারী যদি তার দ্রব্যের জন্য খুব বেশি দাম চেয়ে বসে তাহলে ক্রেতারা বাধ্য হয়ে সেই দামে দ্রব্য ক্রয় করে। এতে তাদের মোট ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। এরূপ অবস্থায় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদা কমবে সত্য, কিন্তু চাহিদা খুব কমবে না। অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হতে পারে।

ষষ্ঠত, একচেটিয়া কারবারী বাজারে দ্রব্যের একমাত্র যোগানদার বলে তার নিজস্ব যোগানই হল বাজারের মোট যোগান। একচেটিয়া কারবারী যদি নিজের যোগান বৃদ্ধি করে তাহলে বাজারের মোট যোগান বাড়বে। এর ফলে দাম কমবে। যদি ক্রেতাদের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকে একমাত্র তাহলেই এরূপ হবে। রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখানো হল। আমরা যদি ধরে নিই যে, ক্রেতাদের চাহিদা স্থির আছে, তাহলে রেখাচিত্রের চাহিদা রেখা DD' এক জায়গায় স্থির থাকবে। এই অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর যোগান যদি SS_1 নামক যোগান রেখার দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহলে ভারসাম্য দাম হবে OP_1. এখন একচেটিয়া কারবারী যদি নির্দিষ্ট দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্যের যোগান দেয়, তাহলে তার যোগান রেখাটি ডানদিকে সরে গিয়ে SS_2 হবে এবং তখন ভারসাম্য দাম হবে OP_2. এখানে $OP_2 < OP_1$. অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারী যদি যোগান বৃদ্ধি করে, তাহলে দ্রব্যর দাম কমবে এবং বিপরীতক্রমে, যদি সে যোগান হ্রাস করে, তাহলে দাম বৃদ্ধি পাবে। ক্রেতাদের চাহিদারেখা নিম্নমুখী হওয়ার জন্যই এরূপ হয়। ক্রেতাদের চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হওয়ার অর্থ হল যে, ক্রেতারা কম দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চায়। দাম যখন OP_1, আগের রেখাচিত্রে চাহিদা তখন OQ_1. দাম কমে OP_2 হলে চাহিদা বেড়ে হয় OQ_2.



১২.১ রেখাচিত্র : একচেটিয়া কারবারী কীভাবে দামকে প্রভাবিত করতে পারে

সপ্তমত, একচেটিয়া কারবারীর গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা নিম্নমুখী হয়। এর কারণ কম দামে ক্রেতারা বেশি পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে। অর্থাৎ—বিক্রেতা যদি বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে চায় তাহলে ক্রেতারা কম দাম না হলে সেই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করে উঠতে পারে না।

দ্রব্যের দাম হল বিক্রেতার গড় আয়। এখন দ্রব্যের দাম কমে যাওয়ার অর্থই হল বিক্রেতার গড় আয় কমে যাওয়া।

আমরা জানি বিক্রেতার গড় আয় রেখা যখন নিম্নমুখী হয়, তখন তার প্রান্তিক আয় রেখাও নিম্নমুখী হয় এবং শুধু তাই নয়—গড় আয় যত কমে প্রান্তিক আয় তার চেয়ে বেশি কমে, ফলে—প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার নীচে থাকে।

অষ্টমত, একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে বলেই সে দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে। যোগানের উপর তার যে প্রভাব সেটাই দামের উপর সঞ্চারিত হয়। আমরা বলতে পারি, একচেটিয়া কারবারী পরিমাণ নির্ধারক (Quantity maker) এবং সেই সঙ্গে দাম নির্ধারক (Price maker)।

দ্রব্যের দাম (P) এবং দ্রব্যের পরিমাণ (Q)—এই দুটি প্রধান বিষয়ের উপরেই একচেটিয়া কারবারীর প্রভাব থাকে। সে P এবং Q উভয়কেই নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু সে একই সঙ্গে উভয়কে নির্ধারণ করতে পারে না। সে যদি দাম নির্ধারণ করে তাহলে পরিমাণ নির্ধারিত হবে ক্রেতাদের চাহিদার দ্বারা। সেই দামে ক্রেতারা যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে চাইবে তাই হবে পরিমাণ। অপরপক্ষে—বিক্রেতা যদি পরিমাণ নির্ধারণ করে, তাহলে দাম নির্ধারিত হবে ক্রেতাদের চাহিদার দ্বারা। কী-দামে ক্রেতারা সেই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করবে—তার উপরেই দাম নির্ভর করবে। অতএব একচেটিয়া কারবারী দুটো কোর্টে একসঙ্গে খেলতে পারে না। একটা কোর্টে ক্রেতাদের চাহিদা খেলে। অর্থাৎ ক্রেতাদের চাহিদা ও তার স্থিতিস্থাপকতার একটি ভূমিকা আছে, যে ভূমিকাকে একচেটিয়া কারবারী কোনমতেই অস্বীকার করতে পারে না।

নবমত, একচেটিয়া কারবারী অন্যসব বাজারের বিক্রেতাদের মতো সর্বাধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে চালিত হতে পারে। এখানে মুনাফা বলতে নীট আয় বা আয় ও ব্যয়ের বিয়োগফলকে বোঝায়। বিক্রেতাদের ব্যয়ের মধ্যে যদি কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয়ের কথাই ধরি, তাহলে সেই ব্যয়ের মধ্যে দ্রব্যের উৎপাদক হিসেবে তার নিজের স্বাভাবিক মুনাফাও থাকবে। এখানে উৎপাদন ব্যয় ছাড়া অন্য কোন ব্যয় নেই বলে একটি অবাস্তব অনুধারণা করা যায়।

দশমত, একচেটিয়া কারবারী তার দ্রব্যকে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট কিংবা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দামে বিক্রয় করতে পারে। অর্থনীতিতে একে দাম স্বতন্ত্রীকরণ (Price discrimination) বলা হয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট শর্ত পালিত হলেই দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব ও লাভজনক হতে পারে। আবার বিশেষ অবস্থায় দাম স্বতন্ত্রীকরণ কাম্য বা অকাম্য হতে পারে। এখন আমরা আলোচনার সুবিধের জন্য ধরে নিতে পারি যে, একচেটিয়া কারবারী এরূপ দাম স্বতন্ত্রীকরণের কোন কৌশল গ্রহণ করে না।

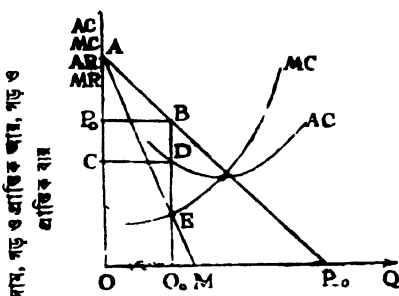
১২.৪. একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ও তার শর্ত :

একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের একমাত্র বিক্রেতা। তার ব্যক্তিগত যোগানই হল বাজারের মোট যোগান। কাজেই একচেটিয়া কারবারী তার যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি করে বাজারের মোট যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাতে পারে এবং এইভাবে যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যের দামের উপরেও তার কর্তৃত্ব প্রসারিত করতে পারে। তাহলে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম (P) এবং দ্রব্যের পরিমাণ (Q) উভয়কেই নির্ধারণ করতে পারে. কিন্তু একসঙ্গে পারে না। সে যদি দাম ঠিক করে, তাহলে সেই দামে কী পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় হবে সেটা নির্ভর করবে ক্রেতাদের চাহিদার উপর। অপরপক্ষে সে যদি দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারণ করে, তাহলে কী দামে ক্রেতারা সেই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করবে সেটা নির্ভর করবে ক্রেতাদের চাহিদা ও তার স্থিতিস্থাপকতার উপর। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ক্রেতাদের চাহিদার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে—যে ভূমিকাকে একচেটিয়া

কারবারী কোন মতেই অস্বীকার করতে পারে না। P এবং Q এই দুটি বিষয়ের মধ্যে একচেটিয়া কারবারী কোনটিকে ঠিক করবে সেটি বড়ো কথা নয়, এখানে বড়ো কথা হল সে যাকে খুশি বেছে নিতে পারে—কিন্তু সে যদি একটিকে বেছে নেয়, তাহলে অপরটিকে ছেড়ে দিতে হবে ক্রেতাদের হাতে। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা এখানে ধরে নিতে পারি যে, সে দ্রব্যের দামকে বেছে নিল। তাহলে সে দাম স্থির করবে। ধরে নিই নীচের রেখাচিত্রে ক্রেতাদের চাহিদা রেখা হল AR_0.

ক্রেতাদের চাহিদা রেখাই হল একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় রেখা। অতএব AR_0 রেখাটিকে আমরা একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় রেখাও বলতে পারি। এখানে গড় আয় রেখাটিকে একটি নিম্নমুখী সরলরেখা হিসেবে অঙ্কন করা হয়েছে। তাহলে একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক আয় রেখাও আমরা অঙ্কন করতে পারব। এখানে OAR_0-কে যদি একটি ত্রিভুজ বলি, তাহলে এই ত্রিভুজের A বিন্দু থেকে অঙ্কিত মধ্যমা AM হবে একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক আয় রেখা।

দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী সর্বাধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হবে। সর্বাধিক মুনাফার শর্ত দুটি অন্য বাজারের বিক্রেতার মতোই হবে। অর্থাৎ প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয় এবং ভারসাম্য বিন্দুর ডানদিকে প্রান্তিক ব্যয় প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশি হবে। যেখানে বিক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করবে—সেখানেই এই শর্ত দুটি পালিত হবে।



১০.২ রেখাচিত্র : একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য

আমাদের রেখাচিত্রে MC হল একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ব্যয় রেখা। AC হল গড় ব্যয় রেখা। MC রেখা AC রেখার নিম্নতম বিন্দুতে AC রেখাকে ছেদ করেছে।

একচেটিয়া কারবারী এমনভাবে দাম স্থির করবে যাতে তার প্রান্তিক আয় তার প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। আমাদের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে—সে যদি OP_0 দাম স্থির করে, তাহলে সেই দামে ক্রেতারা OQ_0 পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করতে পারবে। এখানে তার গড় আয় হবে Q_0B এবং প্রান্তিক আয় হবে Q_0E. এখানে Q_0E = প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয়: তাহলে একচেটিয়া কারবারী OP_0 দাম স্থির করবে এবং সেই দামে OQ_0 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করবে। এতে তার মোট আয় হবে $OP_0 \times OQ_0 = OP_0BQ_0$. তার গড় ব্যয় $= Q_0D = OC$. অতএব তার মোট ব্যয় হবে $OC \times OQ_0 = OCDQ_0$. তার মোট মুনাফা = মোট আয়—

মোট ব্যয় $= OP_0BQ_0 - OCDQ_0 = CP_0BD$. এটিই তার সর্বাধিক মুনাফা। এখানে MC রেখা AM রেখাকে E বিন্দুতে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। কাজেই E হবে একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের বিন্দু।

শর্ত ঃ দেখা যাচ্ছে এই ভারসাম্য লাভের জন্য একচেটিয়া কারবারীকে তার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে হচ্ছে। এটি হল ভারসাম্যের প্রাথমিক শর্ত। আবার E বিন্দুর ডান দিকে $MC > MR$. একচেটিয়া কারবারী যদি OP_0 অপেক্ষা কম দাম ধার্য করে, তাহলে তার প্রান্তিক আয় তার প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে কম হবে। ফলে তার ক্ষতি হবে। কাজেই সে দাম বৃদ্ধি করবে। আবার সে যদি OP_0 অপেক্ষা বেশি দাম ধার্য করে তাহলে তার বিক্রয় কমে যাবে। উৎপাদনও কমবে। অর্থাৎ আয় কমবে এবং ব্যয় কমবে। কিন্তু এখানে $MR > MC$ হওয়ায় তার ব্যয় যত কমবে তার আয় তার চেয়ে বেশি কমবে। কাজেই তার মুনাফা কমবে। দাম বৃদ্ধি করলে যদি তার মুনাফা কমে, তাহলে সে দাম হ্রাস করবে। এতে তার মুনাফা বাড়বে। এইভাবে যেখানে $MR = MC$ এবং মুনাফা সর্বাধিক হবে সেখানেই সে দাম নির্ধারণ করবে এবং ভারসাম্য লাভ করবে।

আবার, OP_0 দামে একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় তার গড় ব্যয়ের চেয়ে বেশি হবে, ফলে তার অতিরিক্ত মুনাফা হবে। কিন্তু তার গড় ব্যয় যদি দামের সমান হয়, তাহলে তার অতিরিক্ত মুনাফা হবে না। যতক্ষণ $P > AC$ থাকবে, ততক্ষণ তার অতিরিক্ত মুনাফা হবে। $P = AC$ হলে অতিরিক্ত মুনাফা শূন্য হবে। আবার $P < AC$ হলে তার ক্ষতি হবে। কিন্তু $P = AC$ এবং $P < AC$ এই দুটি অবস্থাই ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে। সচরাচর এরকম হয় না। তবে একচেটিয়া কারবারী যদি তার ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে না পারে, যদি তার গড় ব্যয় খুব বেশি হয় তাহলেই এরকম হতে পারে।

১২.৫. একচেটিয়া কারবারীর দাম নির্ধারণ ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?

একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের বাজারে একমাত্র যোগানদার বা বিক্রেতা। তার নিজস্ব যোগানই হল বাজারের মোট যোগান। কাজেই সে যদি যোগান বৃদ্ধি বা হ্রাস করে তাহলে বাজারের যোগানও বাড়বে বা কমবে। এখন ক্রেতাদের চাহিদা যদি স্থির স্তরে থাকে তাহলে একচেটিয়া কারবারীর যোগান বাড়লে মোট যোগান বাড়বে এবং দ্রব্যের দাম কমবে। বিপরীতক্রমে একচেটিয়া কারবারীর যোগান কমলে দাম বাড়বে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, একচেটিয়া কারবারী প্রত্যক্ষভাবে বাজারের যোগানকে এবং যোগানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারে।

যে-কোন বিক্রেতার কাছে দুটি বিবেচ্য বিষয় থাকে—যথা, দ্রব্যের দাম (P) এবং দ্রব্যের পরিমাণ (Q). একচেটিয়া কারবারী দুটি বিষয়কেই প্রভাবিত করতে পারে।

এর থেকে মনে হতে পারে যে, একচেটিয়া কারবারী খুশিমত বেশি বা কম দাম ঠিক করতে পারে এবং সেই দামে খুশিমত কম বা বেশি দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে। আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্য যদি সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা হয়, তাহলে সে খুশিমত দাম নির্ধারণ করতে বা খুশিমত পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে না। একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা ও তার দাম-গত স্থিতিস্থাপকতা বিক্রেতার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করবে। ক্রেতাদের চাহিদা ও তার স্থিতিস্থাপকতাকে একটি প্রদত্ত বা নির্দিষ্ট বিষয় বলে ধরে নেওয়া যায়। একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্য হল এই নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে থেকে তার মুনাফা সর্বাধিক করা।

আমরা জানি কোন দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা দামের উপর বিপরীতভাবে নির্ভর করে। একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এটা হবে। দাম কমলে চাহিদা বাড়বে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমবে। এখন একচেটিয়া কারবারী যদি দাম বৃদ্ধি করে, তাহলে তার দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা কমবে। ফলে তার বিক্রয়ের পরিমাণও কমবে। কিন্তু এতে কি তার লাভ কমবে? এটি সহজে বলা যায় না। কারণ বিক্রেতার লাভ = বিক্রয়লব্ধ আয় – উৎপাদন ব্যয়। কিংবা, অন্যভাবে বলা যায়—

মুনাফা = আয় — ব্যয়। বিক্রয় কমলে উৎপাদন কমবে এবং সেই সঙ্গে ব্যয়ও কমবে, কিন্তু দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রেতাদের ব্যয় অর্থাৎ বিক্রেতার আয়ের কীরূপ পরিবর্তন হবে সেটা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করবে। চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় ($e > 1$), তাহলে দাম কমলে চাহিদা খুব বেশি বৃদ্ধি পাবে, ফলে বিক্রেতার আয় বাড়বে। চাহিদা যদি একক স্থিতিস্থাপক হয় ($e = 1$), তাহলে দাম বৃদ্ধির ফলে বিক্রেতার আয়ের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। আবার অস্থিতিস্থাপক ($e < 1$) চাহিদার ক্ষেত্রে দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা কমবে, কিন্তু খুবই সামান্য কমবে, যার ফলে বিক্রেতার আয় কার্যত বৃদ্ধি পাবে। একটি উদাহরণ নিয়ে বোঝানো যায়। ধরি—একচেটিয়া কারবারী ১০ টাকা দামে ১০ একক দ্রব্য বিক্রয় করে। তার আয় ১০০ টাকা। এখন ধরি—সে দ্রব্যের দামকে হঠাৎ দ্বিগুণ বাড়িয়ে ২০ টাকা করে দিল। দাম বেড়েছে। এবার বিক্রি কমবে। ধরি—চাহিদা কমে ৫ একক হল। তাহলে বিক্রেতার আয় হবে ১০০ টাকা। এখানে দাম দ্বিগুণ হয়েছে, চাহিদাও অর্ধেক হয়েছে, ফলে বিক্রেতার আয় স্থির আছে। আবার ক্রেতাদের চাহিদা হ্রাস পেয়ে যদি ৭ একক হয়, তাহলে বিক্রেতার আয় বেড়ে ১৪০ টাকা হবে। কিন্তু চাহিদা যদি খুব বেশি কমে যায়, যদি ৩ একক হয়ে যায়, তাহলে বিক্রেতার আয় কমে ৬০ টাকা হবে। তাহলে আমরা পাই দ্রব্যের দাম (P) বৃদ্ধি পেলে বিক্রেতার আয় (R) স্থির থাকতে পারে বাড়তে পারে, আবার কমতেও পারে। এখানে নিয়ম হল—

(১) যদি $e < 1$ হয় তাহলে P বাড়লে R বাড়বে;

(২) যদি $e = 1$ হয়, তাহলে P বাড়লে R স্থির থাকবে;

এবং (৩) যদি $e > 1$ হয়, তাহলে P বাড়লে R কমবে।

এখন একচেটিয়া কারবারী দাম বৃদ্ধি করবে, কি হ্রাস করবে, কি স্থির রাখবে সেটা নিম্নলিখিতভাবে বোঝানো যায়।

আমরা জানি মুনাফা $= R - C$. এখানে $R =$ আয়, $C =$ ব্যয়। এখন চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (e) বিভিন্ন হলে একচেটিয়া কারবারী কীভাবে ভারসাম্য লাভ করবে তা নীচে বুঝানো হল।

প্রথমত, ধরি $e < 1$, তাহলে একচেটিয়া কারবারী দাম বাড়িয়ে মুনাফা বেশি করতে চাইবে। দাম বেশি হলে তার বিক্রয়ের পরিমাণ কমবে। ফলে উৎপাদন কমবে, উৎপাদন কমলে উৎপাদন ব্যয় C কমবে। কিন্তু $e < 1$ হওয়ায় দাম বাড়লে R বাড়বে। তাহলে বিক্রেতার দুদিক দিয়ে লাভ বাড়বে। প্রথমত R বাড়বে, দ্বিতীয়ত C কমবে। তাহলে একচেটিয়া কারবারী আবার দাম বৃদ্ধি করবে। আবার R বাড়বে এবং C কমবে, আবার মুনাফা বাড়বে। এইভাবে বিক্রেতা খুবই কম দ্রব্য উৎপাদন করে সেটি অত্যন্ত চড়া দামে বিক্রয় করবে। কিন্তু তাতেও তত্ত্বগতভাবে দাম বৃদ্ধির কোন শেষ থাকবে না। অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারী এখানে দাম স্থির করতে পারবে না ; প্রতি মুহূর্তেই সে দাম বাড়িয়ে চলবে।

দ্বিতীয়ত, যদি $e = 1$ হয়, এবং দাম বাড়ে, তাহলে R স্থির থাকবে, কিন্তু C কমবে। ফলে $R - C$ বাড়বে। এখানেও একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে দাম নির্ধারণের ব্যাপারে কোন ভারসাম্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

তৃতীয়ত, যদি $e > 1$ হয়, তাহলে এবং একমাত্র তাহলেই একচেটিয়া কারবারী দাম স্থির করতে পারবে। এক্ষেত্রে সে যদি দাম বৃদ্ধি করে, তাহলে R কমবে এবং C কমবে। তার মুনাফায় কী পরিবর্তন হবে তা বলা যাবে না, এই অবস্থায় তার কাজ হবে $R - C$ এই ব্যবধানটিকে সর্বাধিক করা।

যেখানে $MR = MC$ হবে এবং যেখানে MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করবে সেখানেই তার ভারসাম্য লাভ ঘটবে। কাজেই একচেটিয়া কারবারী স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রেই তার ভারসাম্য দাম (যে দামে মুনাফা সর্বাধিক হয়) ধার্য করতে পারে।

একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় (AR), প্রান্তিক আয় (MR) এবং চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা (e)-র সম্পর্ক দিয়েও এটি বোঝানো যায়। আমরা জানি, এই সম্পর্কটি হল

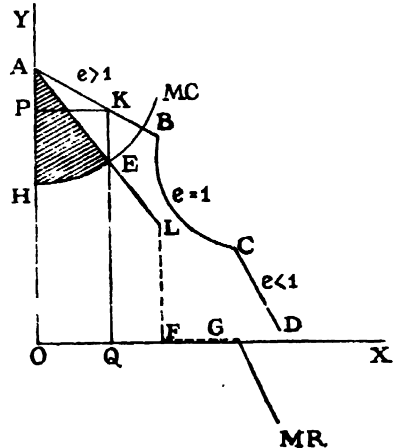
$$MR = AR\left(\frac{e-1}{e}\right)$$

যদি $e < 1$ হয়, তাহলে $MR < O$ (ঋণাত্মক) হবে। যদি $e = 1$ হয়, তাহলে $MR = O$ হবে এবং যদি $e > 1$ হয়, তাহলে $MR > O$ (ধনাত্মক) হবে। এখন একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ব্যয় (MC) যদি ধনাত্মক ($MC > O$) হয় ; তাহলে মুনাফা সর্বাধিক হতে হলে MR-কেও ধনাত্মক হতে হবে। কিন্তু $e < 1$ হলে $MR < O$ হবে। কাজেই MR ও MC সমান হবে না। একচেটিয়া কারবারীর

ভারসাম্যও হবে না। যদি $e<1$ হয়, এবং তার ফলে $MR<O$ হয়, তাহলে একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ব্যয়কেও ঋণাত্মক হতে হবে। কিন্তু ঋণাত্মক প্রান্তিক ব্যয় অবাস্তব কথা। কাজেই এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী দাম নির্ধারণ করতে পারবে না।

আবার যদি $e=1$ হয়, তাহলে $MR=O$ হবে এবং একচেটিয়া কারবারীর $MC>O$ হলে এখানেও MC ও MR সমান হবে না। বিক্রেতা ভারসাম্য লাভ করতেও পারবে না। যদি $MC=O$ হয়, তাহলেই $MC=MR$ হতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারী এত বেশী দাম ধার্য করবে যে, সেটা অনুমান করাও যায় না। আবার $MC=O$ এটাও একটি বিরল ঘটনা। অতএব যেখানে $e=1$, সেখানেও ভারসাম্য দাম স্থির করা একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাহলে একটি সম্ভাবনাই থাকল, সেটি হল যে $e>1$. যেখানে $e>1$, সেখানে $MR>O$ হবে এবং ধনাত্মক প্রান্তিক ব্যয় প্রভাবিত একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে সেখানেই একটি দাম স্থির করা সম্ভব হবে যাতে তার মুনাফা সর্বাধিক হয়।

আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যেও এই বিষয়টি বোঝাতে পারি। প্রদত্ত রেখাচিত্রে OX-অক্ষে ফার্মের উৎপাদন বা বিক্রয়ের পরিমাণ এবং OY-অক্ষে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয়, প্রান্তিক ব্যয় ও দ্রব্যের দাম পরিমাপ করা হয়েছে। এই রেখাচিত্রে ABCD নামক একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। এই চাহিদা রেখার AB অংশে $e>1$, BC অংশে $e=1$ এবং CD অংশে $e<1$. AB অংশের নীচে AL রেখাটি ফার্মের MR রেখা সূচিত করে. BC অংশে $e=1$ হওয়ায় এই অংশের $MR=O$ এবং MR রেখাটি OX-অক্ষের সঙ্গে মিশে থাকে। CD অংশে $e<1$, এই অংশের $MR<O$ কাজেই GM নামক রেখাটি ঋণাত্মক MR সূচিত করে। এখানে MC হল ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় রেখা। যেহেতু $MC>O$, কাজেই ফার্ম CD অংশে (যেখানে $e<1$) কিংবা BC অংশে (যেখানে $e=1$) দাম ধার্য করবে না। AB অংশে $e>1$ হওয়ায় $MR>O$ এবং $MC>O$ হওয়ায় একচেটিয়া ফার্ম AB অংশের উপর কোন বিন্দুতে দাম ধার্য করবে। প্রদত্ত রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ফার্মের MC রেখা তার MR রেখা AL-কে নীচের দিক থেকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে।



১২.৩. রেখাচিত্র : চাহিদার বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতা ও একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য

E বিন্দুতে ফার্ম ভারসাম্য লাভ করবে। ভারসাম্য অবস্থায় ফার্মের উৎপাদন হবে OQ. দ্রব্যের দাম হবে OP. ফার্মের মোট আয় হবে MR রেখা ও OQ পরিমাণ উৎপাদন দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র = OAEQ. ফার্মের মোট ব্যয় হবে OQ পরিমাণ উৎপাদন ও MC রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র = OHEQ. কাজেই ফার্মের মোট মুনাফা হবে OAEQ − OHEQ = HAE নামক ছায়াময় ক্ষেত্রটি। এখানে HAE হল ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা। অতএব একচেটিয়া ফার্ম তার গড় আয় রেখার স্থিতিস্থাপক অংশে (AB অংশে) K বিন্দুতে দাম ধার্য করে।

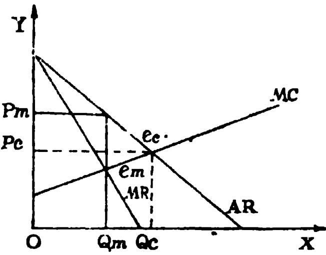
১২.৬. একচেটিয়া বাজার ও প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন ও দামের তুলনা :

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার এবং একচেটিয়া বাজারের মধ্যে কয়েকটি মিল আছে এবং কয়েকটি গরমিল বা পার্থক্য আছে। প্রথমে মিলের বিষয়গুলি এবং পরে পার্থক্যের বিষয়গুলি বলা যেতে পারে।

মিল : (১) উভয় বাজারে বিক্রেতার উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা ; (২) উভয় বাজারে ক্রেতার সংখ্যা খুব বেশি ; (৩) উভয় বাজারের বিক্রেতারা উপাদানের বাজার থেকে নির্দিষ্ট দামে উপাদানসমূহের সেবা ক্রয় করে ; (৪) গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা উভয় ক্ষেত্রেই U-আকৃতিবিশিষ্ট হয় ; (৫) MC = MR হল ভারসাম্যের প্রাথমিক শর্ত। এই শর্তটি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয়।

পার্থক্য : (১) একচেটিয়া বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে থাকে অসংখ্য বিক্রেতা। (২) একচেটিয়া বাজারের বিক্রেতা দ্রব্যের যোগান ও দামকে প্রভাবিত করতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একজন বিক্রেতা দ্রব্যের সামগ্রিক যোগান বা দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। (৩) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একজন উৎপাদক কেবলমাত্র উৎপাদনের পরিমাণের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দামের উপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা তার নেই। কিন্তু একচেটিয়া কারবারী উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপন্ন দ্রব্যের দাম—উভয় বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য একই সঙ্গে সে উৎপাদনের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ করতে পারে না। (৪) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের গড় আয় রেখা উৎপাদন পরিমাপক অক্ষের সমান্তরাল হয় এবং প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার উপর সমপাতিত হয়। কিন্তু একচেটিয়া ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা বাম দিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়। এখানে MR রেখা AR রেখার নীচে থাকে। (৫) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে P = MC হয়, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে P > MC হয়। অতএব আমরা বলতে পারি একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার অপেক্ষা বেশি থাকে। (৬) একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের

যোগান প্রতিযোগিতার বাজার অপেক্ষা কম হয়। রেখাচিত্রের সাহায্যে দাম ও উৎপাদনের পার্থক্যগত বিষয়টি দেখানো হল।



১২.৪ রেখাচিত্র : একচেটিয়া ও পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম

এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে উৎপাদন এবং OY-অক্ষে দ্রব্যের দাম, গড় আয়, প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে AR ও MR রেখা দুটি হল যথাক্রমে গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা, MC হল প্রান্তিক ব্যয় রেখা। দাম = গড় আয় = AR. পূর্ণ প্রতিযোগিতায় P = MC হয়েছে e_c বিন্দুতে। e_c হল পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু। এখানে OP_c হল পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যের দাম এবং OQ_c হল উৎপাদনের পরিমাণ। অপরপক্ষে e_m হল একচেটিয়া ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু। কারণ এই বিন্দুতে MC রেখা নীচের দিক থেকে MR রেখাকে ছেদ করেছে। এখানে $AR = OP_m > MR$ হল দ্রব্যের দাম এবং OQ_m হল উৎপাদনের পরিমাণ। দেখা যাচ্ছে $OP_m > OP_c$ এবং $OQ_m < OQ_c$

অতএব একচেটিয়া বাজারে ক্রেতারা কম পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করতে পায় এবং তার জন্য বেশি দাম দিতে বাধ্য হয়। (৭) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। একচেটিয়া বাজারে অবাধপ্রবেশের পথে বাধা বা অন্তরায় (Restriction) থাকে। সেইজন্য একচেটিয়া ব্যবসায়কে অন্তরায়মূলক বাণিজ্য-পদ্ধতি (Restrictive Trade Practice) বলা হয়। (৮) পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে পূর্ণপ্রবেশের ফলে P = AC হয় এবং কোন ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা পায় না বা ক্ষতিও হয় না। প্রত্যেকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায়। একচেটিয়া বাজারে প্রবেশাধিকার থাকে না বলে দীর্ঘকালে অতিরিক্ত লাভ বা ক্ষতি হতে পারে। (৯) পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম স্বতন্ত্রীকরণ থাকে না, একচেটিয়া বাজারে থাকে। (১০) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের যোগান রেখা থাকে, একচেটিয়া কারবারীর নির্দিষ্ট একটি যোগান রেখা থাকে না।

১২.৭. কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারকে সমর্থন করা যায় ?

(একচেটিয়া কারবারের পক্ষে যুক্তি)

১। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে অসংখ্য ফার্ম একটি সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে। এর ফলে বহু ফার্ম গজিয়ে ওঠে। প্রত্যেকটি ফার্মকে উৎপাদন করার জন্য নিম্নতম পরিমাণে কিছু অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন প্রকার স্থির উপাদান নিয়োগ করতে হয়। প্রত্যেকটি ফার্মকে পৃথকভাবে কারখানা গড়তে হয়, আলো, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, পরিবহণ, মজুত প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হয়। এতে ইট,

সিমেন্ট, লোহা, বিদ্যুৎ, শ্রম ও সর্বোপরি বহু মূলধন লাগে। অপরপক্ষে একচেটিয়া কারবারে একটি মাত্র ফার্ম থাকায় এই সব উপকরণের ব্যবহার কম হয়। অতএব আমরা বলতে পারি, একচেটিয়া বাজার ব্যাঙের ছাতার মত বহু ফার্মের বৃদ্ধি বন্ধ করে এবং সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতার সুবিধে ভোগ করে। এই দিক দিয়ে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার অপেক্ষা একচেটিয়া বাজারকেই কাম্য বলে মনে হয়।

২। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মগুলির আয়তন খুব ছোট হয়। তারা ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধে ভোগ করতে পারে না। একচেটিয়া কারবারের ফার্মের আয়তন বড় হয়। ফলে তারপক্ষে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হয়।

৩। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে বহু ফার্ম একই দ্রব্যের যোগান দেয়। তার জন্য প্রত্যেকটি ফার্মকে পৃথক যোগান বা সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। এটা অপ্রয়োজনীয়। যেমন, কোন অঞ্চলে যদি একাধিক প্রতিষ্ঠান বিদ্যুতের যোগান দেয় এবং তার জন্য প্রত্যেকে আলাদা করে তার, খুঁটি ইত্যাদি ব্যবহার করে তাহলে একই জায়গায় বহু রকমের তার ও খুঁটি ইত্যাদি বসাবার দরকার হবে। কিন্তু একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান বিদ্যুতের যোগান দিলে তার, খুঁটি ইত্যাদির বহুত্ব (Multiplicity) বন্ধ করা যায়। এতে দ্রব্য সরবরাহের ব্যয় কমে। সমাজের উপকার হয়।

(৪) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম বাজারের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ক্রেতারা কী পরিমাণে তার দ্রব্য ক্রয় করবে সে ব্যাপারে সেই ফার্মের কোন পূর্ব ধারণা থাকে না। অথচ একচেটিয়া কারবারী অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারে তার দ্রব্যের চাহিদা কতটা হতে পারে। কাজেই সে সহজে উৎপাদনের পরিমাণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু একচেটিয়া বাজারে অনিশ্চয়তা থাকলেও কম থাকে।

(৫) অনিশ্চয়তা যেখানে বেশি সেখানে অত্যুৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে কিংবা উৎপাদনের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে দেখা যায় যে, অনেক ফার্ম চাহিদার তুলনায় বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করে বসে। এর ফলে অবিক্রীত দ্রব্য নষ্ট হয়ে যায়। অনিশ্চয়তার জন্যই এই অপচয়। একচেটিয়া কারবারে অনিশ্চয়তা কম বলে অপচয়ও কম হয়।

(৬) দেশের সামরিক দ্রব্যের যোগান পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে না রেখে সরকারী একচেটিয়া ব্যবস্থায় রাখাই সামরিক স্বার্থে কাম্য বলে বিবেচিত হয়।

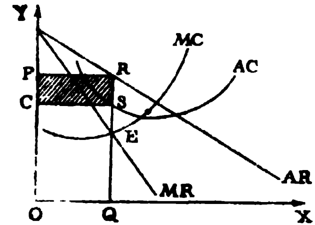
(খ) একচেটিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তি :

(১) একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের যোগান কম হয় কিন্তু দাম বেশি হয়। ফলে ক্রেতাদের অসুবিধে হয়। (২) একচেটিয়া বাজারে ফার্মের অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা থেকে যায়। এতে নিম্নতম ব্যয়ে উৎপাদন হয় না। (৩) একচেটিয়া বাজারে যেহেতু

অন্য বিক্রেতা থাকে না, কাজেই ক্রেতারা একজনের কাছ থেকেই দ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এতে ক্রয়ের স্বাধীনতা ও বৈচিত্র্য থাকে না। (৪) একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে এবং দ্রব্যের কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে। এর ফলে দাম বেড়ে যায়। ক্রেতারাও বেশি দাম দিতে বাধ্য হয়। (৫) একচেটিয়া বাজারে অন্তরায়মূলক ব্যবসা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে না ফলে উৎপাদনের ব্যাপারে একচেটিয়া কারবারী দক্ষতা দেখাবার তাগিদ অনুভব করে না। (৬) একচেটিয়া বাজারে সম্পদ ও আয়-বণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি করে। কাজেই একে সামাজিক ন্যায়-নীতির (Social justice) পরিপন্থী বলা যেতে পারে। (৭) একচেটিয়া বাজারে উপাদানের মালিকেরা ন্যায্য পারিশ্রমিক বা তাদের উপাদানের দাম পায় না। শ্রমিকেরা তাদের উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে কম মজুরী পায় এবং শোষিত হয়; কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমিকের মজুরী তার প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন ক্ষমতার সমান হয়।

১২.৮. একচেটিয়া ফার্মের ভারসাম্যের কয়েকটি অবস্থা : (একচেটিয়া ফার্মের কি ক্ষতি হয়?)

(ক) **স্বল্পকালীন অবস্থা :** স্বল্পকালে একচেটিয়া ফার্মের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মুনাফার উদ্ভব হয়। এটাই স্বাভাবিক ঘটনা। দ্রব্যের দাম গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলেই অস্বাভাবিক মুনাফার উদ্ভব ঘটে। নীচের রেখাচিত্রে এই অবস্থাটি দেখানো হল। এখানে একচেটিয়া ফার্মের MC রেখা তার MR রেখাকে নীচের দিক থেকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হল ভারসাম্যের বিন্দু।



১২.৬ রেখাচিত্র : একচেটিয়া কারবারীর স্বল্পকালীন ভারসাম্য

এখানে উৎপাদন = OQ.

দাম = OP

ফার্মের মোট আয় = OP × OQ = OPRQ

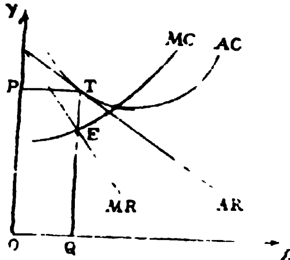
গড় ব্যয় = OC

মোট ব্যয় = OC × OQ = OCSQ

অতএব মোট মুনাফা = OPRQ − OCSQ = CPRS. এটাই হল সর্বাধিক অস্বাভাবিক মুনাফা। রেখাচিত্রে এই অংশটি শেড করে দেওয়া হয়েছে।

বাজারে যখন চাহিদার অবস্থা খুব ভালো থাকে এবং একচেটিয়া কারবারীর ব্যয় মুনাফালাভের অনুকূল থাকে তখনই P > AC হয় এবং ফার্মের পক্ষে অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু চাহিদা যদি কমে যায়, কিংবা ব্যয় বেশি হয়ে যায়, তাহলে একচেটিয়া ফার্মের AR ও MR রেখা নীচে নেমে যাবে কিংবা AC ও MC রেখা উপরের দিকে উঠে যাবে। সেক্ষেত্রে P এবং AC সমান হতে পারে

কিংবা P অপেক্ষা AC বেশি হয়ে যেতে পারে। P=AC হলে AC রেখাটি AR রেখার সঙ্গে স্পর্শক হয়ে যাবে এবং একচেটিয়া ফার্মটি কোন অস্বাভাবিক মুনাফা পাবে না। নীচের রেখাচিত্রে এটি দেখানো হয়েছে। এই রেখাচিত্রে MC=MR হয়েছে E বিন্দুতে। E হল ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে দাম=OP. কিন্তু T বিন্দুতে AC রেখা AR রেখাকে স্পর্শ করায় গড় ব্যয়=OP হয়েছে। অর্থাৎ P=AC হয়েছে। এখানে ফার্মের উৎপাদন হবে OQ.



১২.৬ রেখাচিত্র : একচেটিয়া কার্বের ভারসাম্য : স্বাভাবিক মুনাফা

মোট আয়=OP × OQ=OPTQ.
মোট ব্যয়=OP × OQ=OPTQ.
অর্থাৎ মোট আয়=মোট ব্যয়।

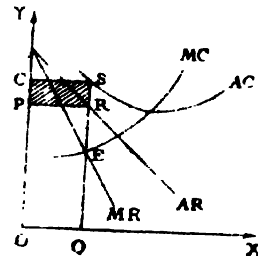
অতএব ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা হবে না। ফার্মটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পাবে।

স্বল্পকালে একচেটিয়া ফার্মের ক্ষতির সম্ভাবনাও থাকতে পারে। একচেটিয়া ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা কম থাকলে কিংবা একচেটিয়া ফার্মের ব্যয় খুব বেশি বেড়ে গেলে দ্রব্যের দাম অপেক্ষা গড় ব্যয় বেশি হয়ে যেতে পারে। সাধারণত একচেটিয়া ফার্ম যে সব উপাদান ক্রয় করে তাদের দাম বৃদ্ধি পেলে ফার্মের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে। ফার্মের AC ও MC রেখা উপরের দিকে উঠে যাবে। সেক্ষেত্রে ফার্মের ক্ষতি হবে। নীচের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে ফার্মের AC রেখা AR রেখার উপরে আছে। কাজেই AC > P অথবা P < AC হয়েছে। এখানে MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। কাজেই E হবে ভারসাম্যের বিন্দু।

এখানে উৎপাদন=OQ.
দাম=OP.
গড় ব্যয়=OC > OP.
কাজেই মোট আয়=OPRQ
মোট ব্যয়=OCSQ > OPRQ

ফার্মের ক্ষতির পরিমাণ হবে PCSR

এই ক্ষতির পরিমাণ যদি একচেটিয়া ফার্মের স্থির ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়াই মঙ্গল হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষতি স্থির ব্যয়ের চেয়ে কম হবে ততক্ষণ সে ক্ষতি সত্ত্বেও উৎপাদন চালু রাখতে পারে।

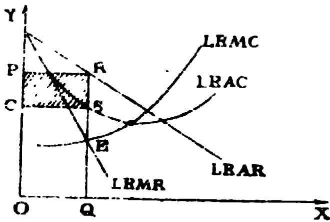


১২.৭ রেখাচিত্র : একচেটিয়া কার্বের ভারসাম্য : ক্ষতি

অতএব একচেটিয়া ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে সব সময় যে অস্বাভাবিক মুনাফা হবেই এমন বলা যায় না। কোন কোন বিশেষ অবস্থায় তার ক্ষতি হতেও পারে এবং ক্ষতি সত্ত্বেও সে উৎপাদন চালু রাখতে পারে। এই অবস্থাগুলি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের অবস্থার অনুরূপ।

(খ) **দীর্ঘকালীন অবস্থা :** একচেটিয়া বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে না। কাজেই নতুন ফার্ম যে শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করবে এবং একচেটিয়া কারবারীর অস্বাভাবিক মুনাফাকে কমিয়ে দেবে সে সম্ভাবনা নেই। সেইজন্য আমরা বলতে পারি—একচেটিয়া ফার্ম দীর্ঘকালেও অস্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে। দ্রব্যের দাম দীর্ঘকালেও গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি থাকলেই ফার্মের পক্ষে অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হবে। নীচের রেখাচিত্রের সাহায্যে এই অবস্থাটি দেখানো হয়েছে।

এই রেখাচিত্রে LRAC ও LRMC হল যথাক্রমে দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। LRAR এবং LRMR হল যথাক্রমে দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা। LRMC রেখা LRMR রেখাকে নীচের দিক থেকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হল ফার্মের ভারসাম্যের বিন্দু।

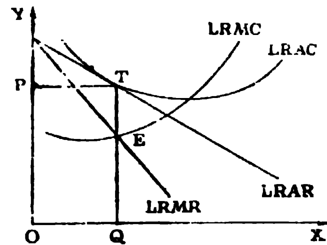


১২.৮ রেখাচিত্র : একচেটিয়া ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

এখানে উৎপাদন = OQ.
দাম = OP.
গড় ব্যয় = OC.
মোট আয় = OPRQ.
মোট ব্যয় = OCSQ.

অতএব মোট অস্বাভাবিক মুনাফা হল = CPRS নামক ছায়াময় ক্ষেত্রটি।

অবশ্য দীর্ঘকালে একচেটিয়া ফার্মের দ্রব্যের বাজার নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী দ্রব্যের আবিষ্কারের ফলে আংশিকভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিংবা ফার্মের উৎপাদন ব্যয় খুব বেড়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে P = AC হয়ে যেতে পারে এবং ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করতে পারে। পাশের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে LRAC রেখা LRAR রেখাকে T বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। এখানে E ভারসাম্যের বিন্দু এবং



১২.৯ রেখাচিত্র : একচেটিয়া ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

দাম = OP.
গড় ব্যয় = OP.
মোট আয় = OPTQ = মোট ব্যয়।

কাজেই ফার্মটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায়।

দীর্ঘকালে একচেটিয়া ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা হতে পারে ; আবার ফার্মটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে। কিন্তু ফার্মের ক্ষতি হবে কি ? স্বল্প-কালে একচেটিয়া ফার্মের ক্ষতি হতে পারে এবং ক্ষতি সত্ত্বেও ফার্মটি উৎপাদন চালু রাখতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে কোন ফার্মই ক্ষতি সহ্য করে উৎপাদন চালু রাখতে চাইবে না বলে ধরে নেওয়া হয়। এখানেও সে কথা প্রযোজ্য। অর্থাৎ দীর্ঘকালে ক্ষতি হলে একচেটিয়া ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে।

১২.৯. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া বাজারের সাধারণ তুলনা।

(ক) পার্থক্যের দিক :—

(১) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একই দ্রব্যের অসংখ্য বিক্রেতা থাকে। একচেটিয়া বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা বা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান থাকে।

(২) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্ম ও শিল্প দুটি পৃথক ধারণা। যে-কোন একটি প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম এবং সকল প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক রূপকে শিল্প বলা হয়। একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প পৃথক থাকে না। ফার্মই শিল্প গঠন করে। ফার্ম ও শিল্প পরস্পর মিলে যায়।

(৩) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম দ্রব্যের সামগ্রিক যোগান ও দ্রব্যের দামকে একক-প্রচেষ্টায় প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে ফার্মের যোগানই হল বাজারের সামগ্রিক যোগান। একচেটিয়া কারবারী যোগান বৃদ্ধি করলে বাজারের সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পাবে। যোগান বাড়লে (এবং চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে) দাম কমবে। অতএব একচেটিয়া কারবারী যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে এবং যোগানের মাধ্যমে দ্রব্যের দামকেও প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যের দাম ও যোগান উভয়কে একই সঙ্গে নির্ধারণ করতে পারে না। যে ক্ষেত্রে সে যোগান বা পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারে ; সেক্ষেত্রে দাম নির্ধারিত হবে ক্রেতাদের চাহিদার দ্বারা। আবার সে দাম নির্ধারণ করতে পারে। তাতে কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে তা ক্রেতাদের চাহিদার উপর নির্ভর করবে।

(৪) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় আয় রেখা উৎপাদন-পরিমাপক অক্ষের সমান্তরাল হয়। কারণ বাজারে যে দাম নির্ধারিত হয়, সেই নির্ধারিত দামে সে যে-কোন পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতার গড় আয় রেখা বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয়। কারণ সে যত বেশি পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করতে চায় ততই দ্রব্যের দাম (অর্থাৎ তার গড় আয়) কমে যায়।

(৫) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের প্রান্তিক আয় রেখাও উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল এবং গড় আয় রেখার সঙ্গে মিলিত হয়। একচেটিয়া বাজারে ফার্মের প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার নীচে থাকে এবং নিম্নমুখী হয়।

(৬) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম যে দ্রব্য বিক্রয় করে তার মত দ্রব্য অন্য সকল ফার্ম বিক্রয় করে। অর্থাৎ এখানে দ্রব্যের সমজাতীয়তা থাকে। কিংবা প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সকল বিক্রেতার দ্রব্য পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ বিকল্প বা সম্পূর্ণ বিকল্প দ্রব্য। একচেটিয়া কারবারে ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্যের অস্তিত্ব নেই বলে ধরা হয়।

(৭) পূর্ণ প্রতিযোগিতার কোন ফার্ম বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে পণ্যের পৃথকীকরণ করতে পারে না। অনেকে মনে করেন—পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন ফার্ম দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য গবেষণা করবে না। অপরপক্ষে একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা তার মুনাফা বৃদ্ধির জন্য পণ্যের পৃথকীকরণ করতে পারে, বিজ্ঞাপন দিতে পারে, গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য অর্থব্যয় করতে পারে। অর্থাৎ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের কাছে একমাত্র বিচার্য বিষয় হল দ্রব্যের পরিমাণ। অথচ একচেটিয়া কারবারীর বিচার্য বিষয় একাধিক যেমন, দ্রব্যের পরিমাণ, দাম, বিক্রয় ব্যয় নির্ধারণ, গবেষণা ইত্যাদি।

(৮) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে। একচেটিয়া কারবারে তা থাকে না। তবে দীর্ঘকালে একচেটিয়া কারবারীর প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিতে পারে। কিংবা তার দ্রব্যের কোন বিকল্প দ্রব্য আবিষ্কৃত হতে পারে।

(৯) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম স্বল্পকালে অতিরিক্ত মুনাফা পেতে পারে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে আবার ক্ষতির সম্মুখীনও হতে পারে। $P < AC$ কিন্তু $P > AVC$ হলে ক্ষতি সত্ত্বেও ফার্ম উৎপাদন চালু রাখে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে স্বল্পকালে অতিরিক্ত মুনাফাই হবে। দাম যেহেতু বিক্রেতার করায়ত্ত, কাজেই দামকে সে গড় ব্যয়ের নীচে নামতে দেয় বলে মনে হয় না। অতএব একচেটিয়া কারবারের স্বল্পকালে ক্ষতির কোন আশঙ্কা থাকতে পারে না বলেই মনে হয়।

(১০) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে দ্রব্যের দাম (P) প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমান হয়। অর্থাৎ $P = MC$ হয়। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে $P > MC$ হয়। উৎপাদনের দিক থেকে দেখলেও বলা যায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন, একচেটিয়া কারবারের তুলনায় বেশি হয়। ক্রেতাদের দিক থেকে বলা যায় —পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ক্রেতারা অপেক্ষাকৃত কম দামে অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করতে পারে।

(১১) দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন ফার্ম অতিরিক্ত মুনাফা পায় না, সব ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায়। অবাধ প্রবেশাধিকার দীর্ঘকালে কার্যে রূপায়িত হয় বলে এমনটা হয়। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে অবাধ প্রবেশ থাকে না। সেইজন্য একচেটিয়া কারবারী দীর্ঘকালেও অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে। অবশ্য একচেটিয়া কারবারী দীর্ঘকালে কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফাও পেতে পারে।

(১২) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম দীর্ঘকালে তার AC রেখার নিম্নতম বিন্দুতে উৎপাদন করে। P = AC = MC হয়, এবং ফার্ম তার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। কোন অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে দীর্ঘকালে P > AC কিংবা P = AC হতে পারে। একচেটিয়া ফার্ম তার AC রেখার নিম্নতম বিন্দুতে, কিংবা তার বাম দিকে, কিংবা তার ডানে থাকতে পারে। AC রেখার নিম্নতম বিন্দুর বাম দিকে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা থেকে যাবে।

(১৩) পূর্ণ প্রতিযোগিতায় একটি ফার্মের MC রেখা ফার্মের স্বল্পকালীন যোগান রেখা হয়। একচেটিয়া কারবারে তা হয় না।

(খ) **মিলের দিক :**

(১) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এবং একচেটিয়া বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা থাকে। কোন একজন বিক্রেতা বাজার দামকে একক প্রচেষ্টায় প্রভাবিত করতে পারে না।

(২) অর্থনীতির সাধারণ আলোচনায় ধরে নেওয়া হয় যে, ফার্মের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখার আকৃতি উভয় বাজারে একই রকমের হয়। AC ও MC রেখা উভয়েই 'U' আকৃতি পেয়ে থাকে।

(৩) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম এবং একচেটিয়া কারবারী উভয়েই সর্বাধিক মুনাফা লাভ করতে চায়।

(৪) উভয় ক্ষেত্রেই সর্বাধিক মুনাফার শর্ত হল MR = MC. MC রেখা যেখানে নীচের দিক থেকে MR রেখাকে ছেদ করে সেখানে ফার্ম ভারসাম্য লাভ করে।

(৫) উভয় বাজারেই একজন বিক্রেতা যখন উৎপাদন-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তখন সে ধরে নেয় যে, অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন করে না।

১২·১০ দাম স্বতন্ত্রীকরণ (Price discrimination)

(ক) দাম স্বতন্ত্রীকরণ কাকে বলে ?

কোন একটি দ্রব্যকে বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করার কৌশলকে দাম স্বতন্ত্রীকরণ বলা যেতে পারে। একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি নির্দিষ্ট স্থানে কোন একটি দ্রব্যকে যদি বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে বিক্রয় করা হয় তাহলে আমরা তাকে ব্যক্তিগত দাম স্বতন্ত্রীকরণ বলতে পারি। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ডাক্তার ধনী রোগীদের নিকট বেশী ফি নিচ্ছেন, আবার গরীব রোগীদের নিকট কম ফি নিচ্ছেন। ডাক্তারের ফি হল তাঁর চিকিৎসা নামক সেবার দাম এবং তিনি চিকিৎসা নামক সেবার বিক্রেতা। এখানে তিনি সেই সেবাটিকে বিভিন্ন ক্রেতার (রোগীদের) কাছে বিভিন্ন দামে বিক্রয় করছেন। এটি হল ব্যক্তিগত দাম স্বতন্ত্রীকরণের

উদাহরণ। আবার একটি দ্রব্য বিভিন্ন বাজারে কিংবা একই বাজারের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দামে বিক্রীত হতে পারে। যেমন, কোন বিক্রেতা ভারতে একদামে এবং নেপালে অন্য দামে তার দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে। এটি হল আঞ্চলিক বা স্থানগত দাম স্বতন্ত্রীকরণ। আবার কোন বিক্রেতা একই ক্রেতার নিকট দ্রব্যের বিভিন্ন একক বিভিন্ন দামে বিক্রয় করতে পারে। যেমন, কোন-ক্রেতা যদি ১টি কাপড় নেয়, তাহলে বিক্রেতা ৫০ টাকা দাম চাইতে পারে। কিন্তু ক্রেতা যদি ১০টি কাপড় নেয় তাহলে সে তখন প্রত্যেকটি কাপড় ৪০ টাকায় বিক্রয় করতে পারে। একে দ্রব্যের এককগত দাম স্বতন্ত্রীকরণ বলা হয়।

(খ) দাম স্বতন্ত্রীকরণ কখন সম্ভব হয় ?

দাম স্বতন্ত্রীকরণ সব সময় সম্ভব নয়। এর জন্য কয়েকটি শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন। এই শর্তগুলিকে দাম স্বতন্ত্রীকরণের সম্ভাবনার শর্ত (Conditions of Possibility of Price Discrimination) বলা হয়। এই শর্তগুলিকে আমরা তিনটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি, যথা—

(১) দ্রব্যের বাজার সম্পর্কিত শর্ত,

(২) দ্রব্যের প্রকৃতি সম্পর্কিত শর্ত, এবং

(৩) ক্রেতার আচরণ সম্পর্কিত শর্ত।

(১) **বাজার সম্পর্কিত শর্ত :** (ক) যে-কোন বাজারেই দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়। যেমন, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়। কেবলমাত্র একচেটিয়া বাজারেই এটি সম্ভব হয়।

(খ) দ্বিতীয়ত, যদি একাধিক বাজারে বা অঞ্চলে দাম স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়, তাহলে প্রত্যেকটি বাজারের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমানা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

(গ) তৃতীয়ত, একটি বাজার থেকে বে-আইনীভাবে অন্য বাজারে দ্রব্যটির চোরাই চালান হওয়া চলবে না। তা যদি হয়, তাহলে বিক্রেতার পক্ষে বিভিন্ন বাজারে দাম স্বতন্ত্রীকরণ করা সম্ভব হবে না।

(ঘ) চতুর্থত, একাধিক বাজারে যদি দাম স্বতন্ত্রীকরণ করা হয়, তাহলে বিভিন্ন বাজারের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হবে। নতুবা দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হবে না।

(২) **দ্রব্যের প্রকৃতিগত সম্পর্ক :** যে দ্রব্যটির দাম স্বতন্ত্রীকরণ করা হবে, সেই দ্রব্যটি পুনর্বিক্রয়যোগ্য হবে না। দ্রব্যটি যদি পুনর্বিক্রয়যোগ্য হয়, তাহলে একজন ক্রেতা কম দামে বিক্রেতার নিকট থেকে দ্রব্যটি ক্রয় করে সেই দামেই দ্রব্যটি অন্য ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করে দিতে পারে। ফলে বিক্রেতার পক্ষে দাম স্বতন্ত্রীকরণ করা সম্ভব হবে না। কিন্তু সব দ্রব্য পুনর্বিক্রয়যোগ্য নয়। সাধারণত সেবার ক্ষেত্রে পুনর্বিক্রয়যোগ্যতা থাকে না। যেমন, কোন সেলুনে যদি সস্তায় কোন ব্যক্তির চুল

কাট নয়, তাহলে সেই ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে সেই হেয়ার কাট পুনরায় বিক্রয় করতে পারবে না। হেয়ার কাট একটি সেবা। এটি পুনর্বিক্রয়যোগ্য নয়। সেরূপ, ডাক্তারের চিকিৎসাও পুনর্বিক্রয়যোগ্য নয়। রেলের পরিবহণও নয়। কাজেই এই সব সেবার ক্ষেত্রে দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হবে।

(৩) **ক্রেতার আচরণগত সম্পর্ক :** ক্রেতার আচরণ যদি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাভাবিক হয়, তাহলে দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হয় না। অনেক সময় ক্রেতার আচরণ অস্বাভাবিক হতে পারে। যেমন, বাজারে দ্রব্যের দাম সম্বন্ধে ক্রেতার কোন ধারণা না থাকতে পারে। একে ক্রেতার অজ্ঞতা বলা যায়। আবার অনেক সময় ক্রেতার ভ্রান্ত ধারণা বা মোহ থাকতে পারে যে, বেশি দামের দ্রব্য ক্রয় করলে ভালো দ্রব্য পাওয়া যায়। এমনটা নাও হতে পারে যেখানে দামের সঙ্গে দ্রব্যের গুণ বাড়ে, সেখানে ক্রেতার এই ভাবনার যুক্তি থাকে। অন্যত্র এই ধারণাটি একটি ভ্রান্তিমাত্র। ক্রেতার আচরণে এই ভ্রান্তি বা মোহ থাকলে দ্রব্যের দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হবে। আবার ক্রেতা যদি খুব ধনী হয়, তাহলে সে দামের পার্থক্যকে গ্রাহ্য করে না। এই রকম অগ্রাহ্য করার অভ্যাস থাকলে দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হবে। তাহলে আমরা পাই, ক্রেতার আচরণে (ক) অজ্ঞতা, (খ) ভ্রান্তি এবং (গ) অগ্রাহ্য করার অভ্যাস থাকলেই দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হতে পারে।

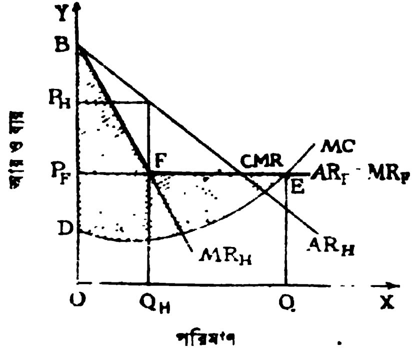
(গ) দাম স্বতন্ত্রীকরণ কীভাবে লাভজনক হয় ?

দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হলেই যে লাভজনক হবে এমন কোন কথা নেই। দাম স্বতন্ত্রীকরণ লাভজনক হওয়ার ক্ষেত্রেও কতগুলি শর্ত আছে। এদের লাভজনকতার শর্ত (Conditions of Profitability) বলা হয়।

দাম স্বতন্ত্রীকরণ লাভজনক হওয়ার অর্থ হল যে, দাম স্বতন্ত্রীকরণ করে একচেটিয়া কারবারী সর্বাধিক মুনাফা লাভ করতে পারে। যেখানে এবং যখন দাম স্বতন্ত্রীকরণ করে সে সর্বাধিক মুনাফা পায়, তখনই দাম স্বতন্ত্রীকরণ লাভজনক হবে।

দাম স্বতন্ত্রীকরণ কীভাবে লাভজনক হতে পারে তা বোঝাবার জন্য আমরা একটি মডেলের কথা ধরতে পারি। ধরলাম, কোন বিক্রেতা একই সঙ্গে দুটি বাজারে তার দ্রব্য বিক্রয় করে। এই দুটি বাজারের প্রথমটি হল ধরা যাক, স্বদেশের বাজার (Home market) যেখানে সে একমাত্র বিক্রেতা এবং দ্বিতীয় বাজারটি হল বৈদেশিক বাজার (Foreign market), যে বাজারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য বিক্রেতা এসে একই দ্রব্য বিক্রয় করে। এক্ষেত্রে স্বদেশের বাজারটি হল একচেটিয়া বাজার এবং বৈদেশিক বাজারটি হল পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। স্বদেশের বাজারে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ($e < 1$) এবং বৈদেশিক বাজারে দ্রব্যের চাহিদা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক ($e = \infty$), অর্থাৎ স্বদেশের বাজারে বিক্রেতার গড় আয় রেখা নিম্নমুখী হবে এবং বৈদেশিক বাজারে গড় আয় রেখা হবে পরিমাণ অক্ষের সমান্তরাল।

আমাদের রেখাচিত্রে AR_H হল স্বদেশের বাজারের নিম্নমুখী গড় আয় রেখা। এবং AR_F হল বৈদেশিক বাজারের গড় আয় রেখা। AR_H রেখাটি নিম্নমুখী ও সরলরেখা করে আঁকা হয়েছে। অতএব স্বদেশের বাজারের প্রান্তিক আয় রেখা (MR_H) AR_H রেখার মতই নিম্নমুখী সরলরেখা হবে এবং MR_H ঠিক AR_H রেখা ও OY-অক্ষের সমান দূরে থাকবে। বিদেশের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকায় সেখানের গড় আয় রেখা AR_F পরিমাণ অক্ষের সমান্তরাল হবে এবং প্রান্তিক আয় রেখাও (MR_F) তার সঙ্গে মিশে যাবে। এখানে $AR_F = MR_F$ হল বৈদেশিক বাজারের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা।



১২.১০ রেখাচিত্র : দাম স্বতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য

এই দুটি বাজারের MR রেখা থেকে আমরা সম্মিলিত MR (Combined Marginal Revenue বা CMR) রেখা অঙ্কন করতে পারি। আমাদের রেখাচিত্রে এই রেখাটি হল CMR নামক রেখা। এটি B বিন্দু থেকে MR_H ধরে F বিন্দু পর্যন্ত আসবে, তারপর MR_F ধরে ডান দিকে সোজা বেরিয়ে যাবে। রেখাচিত্রে CMR রেখাকে একটু মোটা করে আঁকা হয়েছে।

ধরলাম MC হল বিক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় রেখা। এটি ঊর্ধ্বমুখী। তার অর্থ, একচেটিয়া কারবারী যত বেশি দ্রব্য উৎপাদন করবে ততই তার প্রান্তিক ব্যয় বাড়বে। একচেটিয়া কারবারী স্বদেশে দ্রব্য উৎপাদন করে এবং সেই উৎপন্ন দ্রব্যকে দুটি বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যায়। এখানে ধরা হয়েছে যে, এর জন্য কোন পরিবহণ ব্যয় লাগে না। কাজেই দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয় হল প্রান্তিক পরিবর্তনশীল উৎপাদন ব্যয়। একচেটিয়া কারবারী যেহেতু একটি স্থানে দ্রব্য উৎপাদন করে, যেহেতু দুইটি বাজারে উৎপাদন করে না, অতএব আয়ের ন্যায় তার ব্যয়ও দুভাগে বিভক্ত হবে না, এখানে একটি মাত্র MC রেখা থাকবে।

দাম স্বতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। এর শর্ত দুটি : (১) প্রান্তিক ব্যয় = প্রান্তিক আয় (MC = MR) এবং (২) প্রান্তিক ব্যয় রেখা প্রান্তিক আয় রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করবে। এখানে প্রান্তিক আয় দুটি MR_H এবং MR_F. অতএব এখানে শর্ত হল বিক্রেতার

$$MC = MR_H = MR_F \text{ হবে।}$$

MR_H ও MR_F থেকেই CMR আসে। অতএব শর্তটিকে আমরা লিখতে পারি

$$MC = MR_H = MR_F = CMR.$$

রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে, E বিন্দুতে বিক্রেতার MC রেখা CMR রেখাকে নীচ দিক থেকে ছেদ করেছে। অতএব E হবে ভারসাম্যের বিন্দু। এই বিন্দুতে বিক্রেতা OQ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করবে। এখানে $CMR = EQ =$ প্রান্তিক ব্যয় $= MR_F$. আবার F বিন্দুতে $MR_H = FQ_H = EQ = MC = CMR$, অতএব $MR_H = MR_F = MC$. কাজেই বিক্রেতা OQ পরিমাণ মোট উৎপাদনকে দুভাগে ভাগ করবে। OQ_H পরিমাণ দ্রব্য স্বদেশের বাজারে বিক্রয় করবে এবং বাকি $OQ - OQ_H = Q_HQ$ পরিমাণ দ্রব্য বিদেশের বাজারে বিক্রয় করবে।

আবার $MR_F = AR_F$ কারণ বিদেশের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে বলে ধরা হয়েছে। অতএব $MR_F = AR_F = QE = OP_F$ বিদেশের বাজারে OP_F দামে একচেটিয়া কারবারী Q_HQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করবে। সে OQ_H পরিমাণ দ্রব্য স্বদেশের বাজারে বিক্রয় করবে। উৎপাদন OQ_H হলে গড় আয় হবে OP_H. অতএব স্বদেশের বাজারে দ্রব্যের দাম হবে OP_H.

দেখা যাচ্ছে, $OP_H > OP_F$ এবং $OQ_H < Q_HQ$. অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারী স্বদেশের বাজারে বেশী দামে কম পরিমাণ দ্রব্য এবং বিদেশের বাজারে কম দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করবে এবং এইভাবে সে তার মুনাফা সর্বাধিক করবে। রেখাচিত্রে তার সর্বাধিক মুনাফার অংশটি শেড করে দেখানো হয়েছে।

স্বদেশের বাজারে $e<1$. কাজেই এখানে দাম বেশি রাখলে বিক্রয় কমবে এবং ব্যয় কমবে, কিন্তু মোট আয় বাড়বে। আবার বিদেশের বাজারে $e = \infty$ হওয়ায় এখানে দাম নির্দিষ্ট থাকবে, কাজেই বিক্রেতা সেই দামে যত বেশি বিক্রয় করবে ততই তার মোট আয় ও মুনাফা বাড়বে। এইভাবে বিক্রেতা অস্থিতিস্থাপক চাহিদার বাজারে বেশি দামে কম দ্রব্য এবং স্থিতিস্থাপক চাহিদার বাজারে কম দামে বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে তার মুনাফা সর্বাধিক করবে।

(ঘ) দাম স্বতন্ত্রীকরণ কি কাম্য ?

কোন কাজের কাম্যতা পরীক্ষা করা এবং সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুবই কঠিন। কোন কাজ সমাজের সকলকে সমানভাবে প্রভাবিত করে না। কারো ভাল করে, কারো ক্ষতি করে। যার ভাল হয় সে বলে কাজটি ভাল। যার ক্ষতি হয় সে বলে কাজটি করা উচিত হয়নি। এই অবস্থায় তৃতীয় একজন কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে বলা সম্ভব হয় না কাজটি আসলে ভাল কি খারাপ। দাম স্বতন্ত্রীকরণ সম্বন্ধেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। দাম স্বতন্ত্রীকরণের ক্ষেত্রে যে বা যারা কম দামে দ্রব্যটি পায় তারা নিশ্চয়ই একে কাম্য বলবে। আবার যাদের নিকট থেকে বেশি দাম আদায় করা হয় তারা কখনই বলবে না যে, দাম স্বতন্ত্রীকরণ কাম্য।

এ কথা মনে রেখে আমরা দাম স্বতন্ত্রীকরণের কাম্যতা বিচার করতে পারি। এই বিচার ক্রেতাদের দিক থেকে এবং বিক্রেতার দিক থেকে এবং সমাজের দিক থেকে করা যায়। ক্রেতাদের দিক থেকে দেখলে বলা যায়, যে একচেটিয়া কারবারী দাম

স্বতন্ত্রীকরণ করে এবং যে করে না তাদের মোট উৎপাদনের পার্থক্য থাকে। আমরা বলতে পারি, যে একচেটিয়া কারবারী দাম স্বতন্ত্রীকরণ করে তার উৎপাদন অন্য যে বিক্রেতা করে না তার উৎপাদনের চেয়ে বেশি হয়। কাজেই ক্রেতারা প্রথম ক্ষেত্রে বেশি পরিমাণে দ্রব্য ভোগ করতে পারে। এতে তাদের তৃপ্তি বাড়ে। আবার, বেশি দ্রব্য উৎপন্ন হলে কর্মনিয়োগও বৃদ্ধি পায়। এটাও দাম স্বতন্ত্রীকরণের কাম্যতার একটি ধনাত্মক দিক।

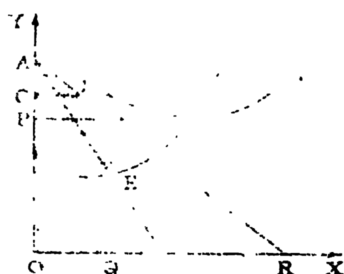
বিক্রেতার দিক থেকে দেখলে বলা যায়, দাম স্বতন্ত্রীকরণ করলে বিক্রেতার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পায়। বিক্রেতার উৎপাদন ব্যয় যদি স্থির থাকে তাহলে আয় বৃদ্ধির ফলে বিক্রেতার মুনাফা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দাম স্বতন্ত্রীকরণের ফলে বিক্রেতার মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তাতে তার উৎপাদন ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ব্যয় যদি কম হারে বাড়ে, আয় বেশি বাড়ে, তাহলে বিক্রেতার মুনাফা বৃদ্ধি পাবে।

কোন দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় বেশি হলে এবং তার খোলাবাজারের দাম কম হলে বিক্রেতার ক্ষতি হয়। বিক্রেতা উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এক্ষেত্রে দাম স্বতন্ত্রীকরণ করে বেশি দামে বিক্রয়ের লাভ থেকে কম দামে বিক্রয়ের ক্ষতি পূরণ করা যায়। এইভাবে বিক্রেতার পক্ষে উৎপাদন চালু রাখা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয়, এর দ্বারা বিক্রেতা মুনাফা লাভ করতে পারে। এটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল।



(ক)

১১.১১ রেখাচিত্র: (ক) সম্পূর্ণ বা পূর্ণ দাম-স্বতন্ত্রীকরণ



(খ)

১১.১১ রেখাচিত্র: (খ) বিক্রেতার দিক থেকে দাম স্বতন্ত্রীকরণের কাম্যতা

এখানে দুটি রেখাচিত্র অংকন করা হয়েছে। (ক) চিত্রে OX-অক্ষে পরিমাণ এবং OY-অক্ষে দাম এবং (খ) চিত্রে OX-অক্ষে পরিমাণ এবং OY-অক্ষ থেকে আয় ও ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে।

(ক) চিত্রে AR হল দ্রব্যের চাহিদা রেখা। (খ) চিত্রেও তাই। (খ) চিত্রে AM হল প্রান্তিক আয় রেখা, AC ও MC হল যথাক্রমে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা।

(খ) চিত্র থেকে দেখতে পাই যে, একচেটিয়া কারবারীর MC রেখা MR রেখাকে নীচের দিক থেকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হবে ভারসাম্যের বিন্দু। উৎপাদন ও বিক্রয় হবে OQ, দ্রব্যের দাম হবে OP. গড় ব্যয় হবে OC. OC > OP. গড় ব্যয় দাম অপেক্ষা বেশি হবে। কাজেই ফার্মের ক্ষতি হবে PCST পরিমাণে। একচেটিয়া কারবারী ক্ষতি হলে উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারে। যদি তার স্থির ব্যয় এই ক্ষতির চেয়ে কম হয় তাহলে সে উৎপাদন বন্ধ করে দেবেই।

কিন্তু একচেটিয়া কারবারী যদি দাম স্বতন্ত্রীকরণ করে তাহলে কী হবে? তাহলে তার ক্ষতি না হয়ে লাভ হতেও পারে।

ধরা যাক একচেটিয়া কারবারী নিখুঁত বা পূর্ণ দাম স্বতন্ত্রীকরণ (Perfect Price Discrimination) কৌশলের আশ্রয় নেয়। এই কৌশলে প্রত্যেক একক দ্রব্যের জন্য পৃথক দাম নেওয়া হয় এবং যে-কোন এককের দাম ক্রেতা সর্বাধিক যে দাম দিতে চায় তার সমান হয়। (ক) চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে। এখানে q_1-এর দাম p_1q_1; q_2-র দাম p_2q_2; q_3-র দাম p_3q_3 ইত্যাদি।

(ক) চিত্রে দেখা যাচ্ছে Oq_1 একক দ্রব্যের মোট দাম OAp_1q_1 নামক ট্রাপিজিয়ামটি। Oq_2 এককের মোট দাম OAp_2q_2 নামক ট্রাপিজিয়ামটি। ক্রেতারা যত বেশি ক্রয় করবে ততই তাদের প্রতি এককের জন্য কম দাম দিতে হবে। ধরা যাক, বিক্রেতা OQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করল, তাতে তার মোট আয় হবে OATQ নামক ট্রাপিজিয়ামটি। কিন্তু বিক্রেতা যদি দাম স্বতন্ত্রীকরণ না করত তাহলে প্রতি এককের দাম হত OP এবং মোট আয় হত OPTQ. অতএব একচেটিয়া কারবারী দাম স্বতন্ত্রীকরণের দ্বারা অতিরিক্ত PAT পরিমাণ মোট আয় পাচ্ছে।

(খ) চিত্রে দেখা যাচ্ছে একচেটিয়া কারবারী যদি এইভাবে OQ পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করে তাহলে তার মোট আয় হবে OATQ, কিন্তু তার ব্যয় হবে OCSQ. দেখা যাচ্ছে, নিখুঁতভাবে দাম স্বতন্ত্রীকরণ করে তার মুনাফা হবে ($\triangle$ACL $-$ $\triangle$LST) পরিমাণে। যতক্ষণ পর্যন্ত $\triangle$ACL > $\triangle$LST থাকবে, ততক্ষণ নিখুঁত দাম স্বতন্ত্রীকরণ লাভজনক হবে। অতএব বিক্রেতার দিক থেকে দাম স্বতন্ত্রীকরণ কাম্য।

সমগ্র সমাজের দিক থেকেও দাম স্বতন্ত্রীকরণের কাম্যতা বিচার করা যায়। যে সমাজে আয় বণ্টনের বৈষম্য থাকে সেখানে খোলাবাজারের দামে দরিদ্র ক্রেতারা অনেক নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতে পারে না। সরকার তাদের কাছে কম দামে এবং ধনীদের কাছে বেশি দামে সেই সব দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। আবার একটি দ্রব্য পরিবার ও প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে লাগলে তার দুরকম দাম থাকতে পারে। যেমন, বাড়িতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম কারখানায় ব্যবহৃত বিদ্যুতের চেয়ে কম হয়। কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কিংবা হাসপাতালে সরকার বিনাপয়সায় কিংবা খুব কম দামে শিক্ষা ও চিকিৎসার সেবা বিক্রয় করতে পারেন, অথচ ধনীদের কাছ থেকে এর জন্য বেশি দাম আদায় করতে পারেন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, অতিরিক্ত ভাড়া আদায়ের জন্য সরকার কোন

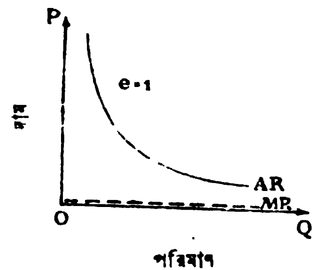
অতিরিক্ত সুবিধা দিতে পারেন। রেল ছাড়াও অন্যান্য বহু রকম সরকারী বা বেসরকারী সেবার ক্ষেত্রে দাম স্বতন্ত্রীকরণ করা হয় এবং সেগুলি যথার্থ প্রয়োজনেই করা হয়।

১২.১১. বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার (Pure Monopoly) :

বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার বলতে এমন একটি বাজারকে বোঝায়, যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা বা যোগানদার থাকে, যার দ্রব্যের কোন বিকল্প দ্রব্য থাকে না এবং ক্রেতাদের চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক হয়। বলা বাহুল্য এই বাজারটি একটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা মাত্র।

এই বাজারে ক্রেতাদের চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক। এখানে দাম কমলে ক্রেতাদের চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে, কিন্তু চাহিদার এই হ্রাস-বৃদ্ধি এমনভাবে হয় যে, ক্রেতাদের ব্যয় সমান থাকে। যেমন—দাম যদি ১০ টাকা হয় তখন ক্রেতারা যদি ১০ একক দ্রব্য ক্রয় করে তাহলে তাদের মোট ব্যয় হবে ১০০ টাকা। এখন দাম যদি ২০ টাকা হয় তাহলে ক্রেতারা ৫ একক দ্রব্য ক্রয় করবে, যার ফলে তাদের ব্যয় ১০০ টাকায় স্থির থাকবে। অর্থাৎ $PQ = K$ (একটি ধ্রুবক) হবে। এখানে $P =$ দাম, $Q =$ চাহিদা বা ক্রয় = বিক্রেতার বিক্রয়। তাহলে আমরা পাই, বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতার মোট আয় $PQ = K$. অর্থাৎ তার গড় আয় = দাম = $P = \frac{K}{Q}$. অর্থাৎ Q বাড়লে $\frac{K}{Q}$ এমনভাবে কমবে যাতে PQ স্থির থাকে। $P = \frac{K}{Q}$ কে যদি রেখাচিত্রে অঙ্কন করা যায় তাহলে যে রেখাটি পাওয়া যায় সেই রেখাটিই হবে বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবারে বিক্রেতার গড় আয় রেখা।

এখানে গড় আয় রেখা বা AR রেখা হবে একটি আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত (Rectangular Hyperbola)। এই রেখাটি নিম্নমুখী হবে, ক্রমশ OQ-অক্ষের নিকটবর্তী হবে, কিন্তু কখনই OQ-অক্ষকে ছেদ করবে না এবং এই রেখার নীচে যতগুলি আয়তক্ষেত্র আঁকা যাবে তাদের ক্ষেত্রফল সমান হবে। এখানে ক্রেতাদের দামগত স্থিতিস্থাপকতা $(e) = 1$.



১২.১৩ রেখাচিত্র : বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবারীর গড় ও প্রান্তিক আয়রেখা

বিক্রেতার গড় আয় (AR), প্রান্তিক আয় (MR) এবং চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (e)-র মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক থেকে আমরা পাই,

$$MR = AR\left(\frac{e-1}{e}\right)$$

বিশুদ্ধ ... ক্ষেত্রে $e = 1$, কাজেই $MR = O$ হবে। রেখাচিত্রের ভাষায় MR রেখাটি OQ-... সঙ্গে মিশে যাবে। আমাদের উপরের রেখাচিত্রে ভাঙা দাগে অঙ্কিত রেখাটি ... একচেটিয়া কারবারীর MR রেখা। এখন প্রশ্ন বিশুদ্ধ একচেটিয়া ... দ্রব্যের দাম স্থির করবে ?

... একচেটিয়া কারবারী দাম নির্ধারণ করার সময় ক্রেতাদের চাহিদা ... দাম স্থির করে। এর কারণ ক্রেতাদের ... যাকে সাধারণ একচেটিয়া কারবারী ... যদি দাম বৃদ্ধি ঘোষণা করে তাহলে ... একচেটিয়া কারবারীর মোট বিক্রয়লব্ধ ... পারে। ... একচেটিয়া কারবারী ... না।

... চাহিদা ... (R) ... ব্যয় ... করে। কারণ ... বিক্রেতার আয় স্থির থাকলে ... $R = C$. ... P ... অর্থাৎ ... যদি ... Q শূন্য। এখানে $P = \frac{R}{Q}$, কাজেই $Q = O$ হলে $P = \frac{R}{O} = \infty$ হবে। ...

বিশুদ্ধ একচেটিয়া ... বিক্রেতা প্রায় শূন্য পরিমাণ দ্রব্য ... সামান্যতম দ্রব্য ... একচেটিয়া দামে বিক্রয় করবে। ... কারবারী ... অন্যদিকে দাম বৃদ্ধি ... সীমা থাকবে না ... একক ... কাজেই তারা ... প্রতিবাদ করবে না।

১১·১২ অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজার বা ... বাজার (Monopolistically Comptitive Market) :

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ... রবিনসন ... চেম্বারলিন ... পৃথিবীতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা কিংবা একচেটিয়া ... না। বাস্তবে যা দেখা যায় তা হল প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া ... মিশ্রণ। মিঃ চেম্বারলিনের ভাষায় এই বাজারকে একচেটিয়া ... বলা যেতে পারে। মিসেস রবিনসন, একে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ... আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা মিঃ চেম্বারলিনের একচেটিয়া ... Monopolistic

Competition) এবং মিসেস্ রবিনসনের অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা (Imperfect Competition)-কে সমার্থক বলে ধরব।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার বলতে এমন একটি বাজার বোঝায় যে বাজারে কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অসংখ্য ক্রেতাদের নিকট একটি সমজাতীয় বা পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে।

বৈশিষ্ট্য :—

প্রথমত, এই বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা একচেটিয়া বাজারের মত একজন নয়, আবার প্রতিযোগিতার মত অসংখ্য নয়। এখানে বিক্রেতার সংখ্যা মাত্র কয়েকজন। বিক্রেতার সংখ্যা কয়েকজন হওয়ায় এই বাজারকে একচেটিয়া ও প্রতিযোগিতার মিশ্ররূপ বলে ধরা হয়। অর্থাৎ এই বাজারে একচেটিয়া উপাদান ও প্রতিযোগিতার উপাদান—এই দুটি উপাদান মিশে থাকে। এ দুটি উপাদান যে সমান সমানভাবে থাকবে তার কোন মানে নেই। এখানে একচেটিয়া উপাদান ও প্রতিযোগিতার উপাদানের বিভিন্ন মিশ্রণের কথা ধরা যেতে পারে। বিক্রেতার সংখ্যা যত বাড়বে উপাদান ততই বাড়বে।

দ্বিতীয়ত, এই বাজারে যেহেতু কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা থাকে, সেজন্য প্রত্যেক বিক্রেতা বাজারের একটি বড়ো অংশ দখল করে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়—এইরূপ বাজারের একজন বিক্রেতা তার দ্রব্যের যোগান বাড়িয়ে বা কমিয়ে বাজারের মোট যোগানকে প্রভাবিত করতে পারে। এই ব্যাপারটি একচেটিয়া বাজারের মত এবং এজন্যই একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারকে একচেটিয়া প্রভাবিত বাজার বলা হয়। কোন একজন বিক্রেতার গড় আয় রেখার আকৃতিতে এই বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। একচেটিয়া বাজারের বিক্রেতার গড় আয় রেখা নিম্নমুখী হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে হয় উৎপাদন-অক্ষের সমান্তরাল। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে গড় আয় রেখা এই দুই প্রকার গড় আয় রেখার মাঝে থাকবে এবং নিম্নমুখী হবে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে যতই প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে ততই গড় আয় রেখা সমান্তরাল গড় আয় রেখার দিকে সরে যাবে, অপরপক্ষে প্রতিযোগিতার মাত্রা যত কমবে ততই গড় আয় রেখা একচেটিয়া কারবারের গড় আয় রেখার দিকে ঝুঁকবে। এখানে প্রান্তিক আয় রেখাও নিম্নমুখী হবে এবং গড় আয় রেখার নীচে থাকবে।

তৃতীয়ত, একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যটি সমজাতীয় বা ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য হতে পারে, আবার পৃথকীকৃত হতে পারে। পৃথক দ্রব্য ও পৃথকীকৃত দ্রব্য একই ব্যাপার নয়। পৃথকীকৃত দ্রব্য বলতে বোঝায়, যে দ্রব্য মূলত পৃথক নয়, কিন্তু তাকে পৃথক বলে প্রচার করা হয়। দুটি দ্রব্যের গুণ সমান, আভ্যন্তর গঠন সমান, তথাপি তাদের নাম, রঙ, মোড়ক আলাদা হতে পারে। এখানে নাম, রঙ, মোড়ক বা বহিরঙ্গের কোন পরিবর্তন দ্বারা মূলত সমজাতীয় দ্রব্যকে পৃথক করা

যেতে পারে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা তার দ্রব্যের জন্য এমনভাবে বিজ্ঞাপন দেয় যাতে তার দ্রব্যটিকে অন্য বিক্রেতার দ্রব্যের চেয়ে উন্নত মানের বলে মনে হতে পারে। টুথপেস্ট, সাবান, সিগারেট, বিস্কুট, চকোলেট প্রভৃতি কত দ্রব্যের ক্ষেত্রে এমন বিজ্ঞাপন সিনেমা ও টিভির পর্দায়, রাস্তার ধারে, খবরের কাগজে আমরা রোজ দেখি তার হিসেব নেই। অর্থাৎ এই দ্রব্যগুলির বাজার একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার। প্রত্যেক বিক্রেতাই এখানে ক্রেতাদের চাহিদাকে নিজের দ্রব্যের দিকে আকর্ষণ করার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়।

চতুর্থত, পৃথকীকৃত দ্রব্যের ক্ষেত্রে একজন উৎপাদকের উৎপাদন ব্যয় ছাড়াও বিজ্ঞাপন ব্যয় বা বিক্রয় ব্যয় (Selling cost) থাকবে এবং এই বিক্রয় ব্যয় দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করবে। এখানে দাম উৎপাদন ব্যয় ও বিজ্ঞাপন ব্যয় দ্বারা প্রভাবিত হবে।

পঞ্চমত, বিজ্ঞাপন দিলে বিক্রেতার যে কেবল ব্যয় বাড়ে তাই নয়, সেই সঙ্গে দ্রব্যের চাহিদাও বাড়ে। যত বেশি সফল বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে, ততই বিক্রেতার গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা উপরের দিকে উঠে যাবে। অন্য বাজারে বিক্রেতার গড় আয় রেখা একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকবে।

ষষ্ঠত, একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যের পৃথকীকরণ থাকলে একই দ্রব্য প্রস্তুতকারী বিভিন্ন ফার্মের সমষ্টি হিসেবে শিল্পের যে ধারণা করা হয় সেই ধারণাটি অচল হয়ে পড়বে। প্রত্যেকটি ফার্ম এখানে পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করবে। কাজেই তাদের একটি শিল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না, এইজন্য মিঃ চেম্বারলিন দল বা গ্রুপ শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। আমরা অবশ্য ধরে নিতে পারি যে, প্রত্যেকটি ফার্ম সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে। তাহলে আলোচনার জটিলতা কমে যাবে এবং শিল্পের ধারণাটি প্রযোজ্য হবে।

সপ্তমত, এই বাজারে নতুন ফার্ম যে-কোন সময় প্রবেশ করতে পারে। তবে দ্রব্যের পৃথকীকরণ থাকলে একটি ফার্ম নিজের দ্রব্যের নাম, ট্রেডমার্ক প্রভৃতি রেজিস্ট্রি করে সরকারকে ফি দিয়ে ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক নিয়ম মেনেই প্রবেশ করতে পারবে।

১২.১৩. একচেটিয়া বা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ঃ

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা বা উৎপাদক থাকে। এখানে একজন বিক্রেতাকেই আমরা একটি ফার্ম বলতে পারি। বাজারে এরকম ফার্ম বেশ কয়েকটি থাকতে পারে। তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকবে।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরব যে—

১। প্রত্যেকটি ফার্ম সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে ; অতএব

২ কোন ফার্ম তার দ্রব্যের জন্য বিজ্ঞাপন দেয় না, বিজ্ঞাপন ব্যয়ও শূন্য,

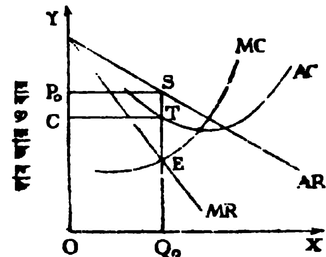
৩। উৎপাদন ব্যয় ব্যতীত ফার্মের অন্য কোন ব্যয় নেই, এবং

৪। ফার্মের উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক মুনাফা বা নীট আয় অর্জন করা।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা থাকায় একজন বিক্রেতার গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা নিম্নমুখী হবে। অর্থাৎ ফার্ম যতই তার যোগান বৃদ্ধি করবে বাজারের মোট যোগান ততই বৃদ্ধি পাবে এবং চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে দাম বা গড় আয় কমবে। গড় আয় কমলে প্রান্তিক আয় কমবে এবং প্রান্তিক আয় রেখা গড় আয় রেখার নীচে থাকবে। আবার ধরলাম যে, অন্য বাজারের ফার্মের মত একচেটিয়া বা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারের একটি ফার্মের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা U-আকৃতিবিশিষ্ট হয়।

এখন এই বাজারের যে-কোন একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো যায়।

ফার্মের উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। যেখানে ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা তার প্রান্তিক আয় (MR) রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করে সেই ছেদ বিন্দুতে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হয়। আমাদের পাশের রেখাচিত্রে এই ভারসাম্য অবস্থাটি দেখানো হল।



১২.১৪ রেখাচিত্র : একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য

এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে উৎপাদন এবং OY অক্ষে গড় ব্যয় (AC), প্রান্তিক ব্যয় (MC), গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় (MR) পরিমাপ করা হচ্ছে। এখানে AC ও MC হল যথাক্রমে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা এবং AR ও MR হল যথাক্রমে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা। এখানে MC রেখা E বিন্দুতে MR রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করছে। E হল ভারসাম্যের বিন্দু। E বিন্দুতে

উৎপাদন $= OQ_0$

দাম $= OP_0$.

অতএব মোট আয় $= OP_0 \times OQ_0 = OP_0SQ_0$.

এখানে গড় ব্যয় $OC < OP_0$. অর্থাৎ গড় ব্যয় দামের চেয়ে কম। তাহলে ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা হবে।

এখানে ফার্মের মোট ব্যয় $= OC \times OQ_0 = OCTQ$

অতএব ফার্মের মোট মুনাফা $= OP_0SQ_0 - OCTQ = CP_0ST$. এটিই হল ফার্মের স্বল্পকালীন সর্বাধিক মুনাফা।

তাহলে দেখা যাচ্ছে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে কোন ফার্ম স্বল্পকালে অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করতে পারে। দ্রব্যের দাম যতক্ষণ পর্যন্ত গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ফার্মের অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হবে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু স্বল্পকালে তার পক্ষে প্রবেশ করা সম্ভব হবে না। কাজেই [illegible] বা শিল্পের অন্তর্ভুক্ত ফার্মগুলি অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করতে পারবে।

কিন্তু কোন ফার্ম যদি কম দক্ষতা[illegible] হয়, তাহলে তার গড় ও প্রান্তিক ব্যয় বেশি হবে এবং তার মুনাফা কমবে। [illegible] ক্ষতির সম্মুখীন হতেও পারে। যদি দ্রব্যের গড় ব্যয় দামের [illegible] বেশি হয় তাহলেই ফার্মের ক্ষতি হবে। আবার কোন ফার্ম কেবল স্বাভাবিক মুনাফা [illegible] পারেও পারে। বিভিন্ন দক্ষতা-সম্পন্ন ফার্ম এখানে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন [illegible] যাদের ক্ষতি হচ্ছে তারা যদি [illegible] কার তাহলে ক্রেতারা [illegible] কম [illegible]।

[illegible] একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে [illegible] একটি ফার্মের ভারসাম্য [illegible]

১. $MP = MC$.

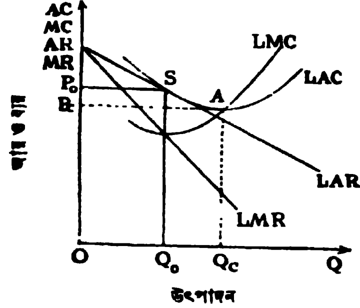
২. MC রেখা নীচের দিক থেকে MR রেখাকে ছেদ করবে।

৩. এখানে $P = AR > MR$ হবে।

১২.১৮. **একচেটিয়া বা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য :**

একচেটিয়া বা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালে অনেক ফার্ম [illegible] পাবে। এর ফলে বিক্রেতাদের সংখ্যা যেমন একদিকে বাড়বে, অন্যদিকে [illegible] বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতাও বৃদ্ধি পাবে। কোন ফার্ম যদি বেশি মুনাফা পায় তাহলে নতুন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করবে এবং ক্রেতারা দেখবে [illegible] বিক্রেতা এসেছে যার কাছ থেকে কম দামে দ্রব্যটি পাওয়া যেতে পারে। ফলে [illegible] ক্রেতাই সেই দ্রব্যের দিকে ঝুঁকে পড়বে। তখন পুরোনো বিক্রেতা বাধ্য হয়ে তার দ্রব্যের দাম কমিয়ে ফেলবে। [illegible] তার মুনাফা কমবে। এইভাবে [illegible] মুনাফা শূন্য হয়ে যাবে। যতক্ষণ না এরকম হচ্ছে ততক্ষণ নতুন বিক্রেতা বাজারে প্রবেশ করবে। অবশ্য দ্রব্যগুলি যদি পৃথকীকৃত হয় এবং পণ্যের বিজ্ঞাপন থাকে তাহলে একজন বিক্রেতা দীর্ঘকালেও তার সুনাম বজায় রাখতে পারবে। নতুন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করলেও ক্রেতারা এতদিন ধরে যার দ্রব্য ক্রয় করত তার দ্রব্যই ক্রয় করে যাবে। নতুন বিজ্ঞাপনের মোহে যদি তারা না যায় তাহলে নতুন ফার্মের প্রবেশের ফলে পুরোনো ফার্মের চাহিদা হারানোর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু যদি বিজ্ঞাপন নেই বলে ধরে নিই তাহলে যত নতুন ফার্ম আসবে ততই পুরোনো ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা কমবে এবং দাম কমবে। অবশেষে এমন হতে পারে যে, ফার্ম দ্রব্য বিক্রয় করে কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয় মেটাতে পারছে, কোন উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত

মুনাফা পাচ্ছে না। যেখানে দ্রব্যের দাম ফার্মের গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়ে যাবে সেখানেই এরূপ হবে। এ অবস্থাটি পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের সঙ্গে প্রায় সমতুল্য। পাশের ১২·১৫ নং রেখাচিত্রে এই অবস্থাটি দেখানো হল।



১২.১৫ রেখাচিত্র : একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

এখানে LAR ও LMR হল যথাক্রমে ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা। LAC ও LMC হল যথাক্রমে দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। LMC রেখাটি LMR রেখাকে নীচের দিক থেকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হল ফার্মের ভারসাম্যের বিন্দু।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দীর্ঘকালে ফার্মের সংখ্যা বেশি হওয়ায় প্রতিযোগিতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। তার জন্য LAR ও LMR রেখার খাড়াভাব কমে আসে। স্বল্পকালে AR ও MR রেখা যেমন নিম্নমুখী থাকে, দীর্ঘকালে LAR ও LMR রেখা তার চেয়ে কম নিম্নমুখী থাকে। আবার দীর্ঘকালে ফার্মের গড় ব্যয় রেখাও একটু চ্যাপ্টা ধরনের হয়।

এখানে ফার্মের দীর্ঘকালীন উৎপাদন $=OQ_0$. দ্রব্যের দাম $=OP_0$. অতএব মোট আয় $=OP_0SQ_0$. এখানে গড় ব্যয় $=Q_0S=$ দাম। অতএব ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা শূন্য। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, LAR রেখাটি ফার্মের LAC রেখাকে S বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। কাজেই দাম = গড় ব্যয় হয়েছে।

পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারেও দীর্ঘকালে ফার্মের AR রেখা তার AC রেখাকে স্পর্শ করে এবং স্পর্শবিন্দুতে দাম = গড় ব্যয়, বা $P=AC$ হয়। কিন্তু এখানে সামান্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্ণপ্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ফার্মের AR রেখা ও MR রেখা উৎপাদন অক্ষের সমান্তরাল হয়, কাজেই $AR=MR$ রেখাটি AC রেখার নিম্নতম বিন্দুতে স্পর্শ করে। এখানে $P=AC=MC$ হয়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতাব বাজারে LAR রেখা নিম্নমুখী হওয়ায় এই রেখাটি ফার্মের দীর্ঘকালীন U রেখাকে তার নিম্নতম বিন্দুর বাম দিকে স্পর্শ করে, যার ফলে $P=AC$ হয় কিন্তু এই AC নিম্নতম AC নয়। যার জন্য এখানে $P=AC>MC$ হয়।

আমাদের রেখাচিত্রে A বিন্দুটি হল পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে উৎপাদন $=OQ_c$ এবং দাম OP_c. তাহলে দেখা যাচ্ছে একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের উৎপাদন (OQ_0) তার গড় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুর বাম দিকে হবে এবং পূর্ণপ্রতিযোগিতার তুলনায় উৎপাদন কম হবে।

গড় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতে উৎপাদন করার অর্থ হল উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করা। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের Q_0Q_1 পরিমাণে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা (excess capacity) থেকে যাবে এবং দ্রব্যের দাম নিম্নতম গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হবে।

১২.১৫ পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের দীর্ঘকালীন অবস্থার তুলনা :

অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে একচেটিয়া উপাদান থাকে, আবার প্রতিযোগিতার উপাদানও থাকে। কিন্তু দুটি উপাদান সমানভাবে থাকে না। স্বল্পকালে এর মধ্যে একচেটিয়া উপাদান বেশি থাকতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে এই বাজারটি প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মতই হয়ে পড়ে। সেইজন্য বলা হয় যে, একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার একচেটিয়া বাজারের চেয়ে বেশি প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মত। Monopolistic competition is more like competition than monopoly.) স্বল্পকালে এই কথাটি যত সত্য, দীর্ঘকালে তার চেয়ে বেশি সত্য।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অনেক ফার্ম থাকে, ফলে কোন ফার্মই দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে না। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অসংখ্য নয়, কিন্তু আবার একজনও নয়। কাজেই এখানে একজন বিক্রেতা দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করতে পারবে না এমন বলা যাবে না, আবার বিক্রেতা দ্রব্যের দাম নিজের চেষ্টায় খুব বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিতে পারবে—সেরকম মনে করারও যুক্তি নেই।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে একটি ফার্ম অতিরিক্ত মুনাফা পেতে পারে, স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে, আবার ক্ষতির মুখেও পড়তে পারে। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারেও এরকম হতে পারে।

দীর্ঘকালে কোন পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ফার্ম অতিরিক্ত মুনাফা পেতে পারে না। প্রত্যেকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পায়। দ্রব্যের দাম ফার্মের সর্বনিম্ন গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। অপূর্ণাঙ্গ বাজারেও দীর্ঘকালে ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে। অতিরিক্ত মুনাফা প্রতিযোগিতার ঝড়ে উড়িয়ে দেয়।

অতএব বিক্রেতা বা ফার্মের দিক থেকে দেখলে বলা যায় একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার মূলত প্রতিযোগিতার বাজারের মতই।

কিন্তু ক্রেতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে পূর্ণ প্রতিযোগিতাকেই ভাল বাজার বলে মনে হবে। পূর্ণপ্রতিযোগিতায় দ্রব্যের দাম ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় দ্রব্যের দাম প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়। দীর্ঘকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন বেশি হয় এবং ফার্ম তার নিম্নতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন

করে। উৎপাদন ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার করে। ফলে সমাজের ক্রেতাদের নিকট দ্রব্যের যোগান বেশি হয়। তাদের দ্রব্য ভোগের সুযোগ-বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দ্রব্যের দীর্ঘকালীন দামও ফার্মের সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ের সমান হয়। এটাই হল সর্বনিম্ন দাম। তাহলে পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ফার্মগুলি উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করে, সর্বাপেক্ষা বেশি দ্রব্য উৎপাদন করে এবং কম দামে সেই দ্রব্য বিক্রয় করে। এর ফলে ক্রেতারা সবচেয়ে কম দামে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করতে পারে। কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় দ্রব্যের দামও বেশি হয়, যোগানও কম হয়। ফার্মগুলির অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা জমে থাকে। অথচ ফার্মগুলিরও লাভ হয় না। অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় না হয় বিক্রেতাদের লাভ, না হয় ক্রেতাদের লাভ, কাজেই সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বলা যায়—পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারই হল সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বাজার।

১২.১৬ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে প্রতিযোগিতার স্বরূপ:—দাম প্রতিযোগিতা (Price Competition) এবং দাম ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রতিযোগিতা (Non-Price Competition):

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে একাধিক বিক্রেতা বা ফার্মের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকে। এই প্রতিযোগিতা দুদিক দিয়ে হতে পারে, যথা, দামের দিক দিয়ে অথবা দ্রব্যের দিক দিয়ে। আবার দাম ও দ্রব্য উভয় বিষয়েও প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে।

দ্রব্যের দাম নিয়ে বিক্রেতাদের দাম সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা (Price Competition) থাকে, এক্ষেত্রে দ্রব্যের গুণ ও পরিমাণে কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় না। অপর পক্ষে বিক্রেতাদের মধ্যে দ্রব্যের দাম নয়, গুণ বা পরিমাণগত দিকে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। একে দ্রব্য-সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা (Output Competition) বলা হয়।

একজন বিক্রেতা তার উৎপন্ন দ্রব্যের গুণ ও পরিমাণ সমান রেখে পূর্বের চেয়ে কম দামে তার দ্রব্য বিক্রয় করতে পারে। সব দ্রব্যের মধ্যে বাহ্যিক পার্থক্য থাকলেও আভ্যন্তর দিক থেকে বা গুণের দিক থেকে বিচার করলে বলা হয়—একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতার বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা কিংবা অন্য দামগত-স্থিতিস্থাপকতা (Cross elasticity of demand) খুব বেশি হয়। অর্থাৎ দ্রব্যগুলি সব বিকল্প দ্রব্য। ফলে কোন একটি ফার্ম যদি তার দ্রব্যের দাম কমিয়ে দেয়, তাহলে তার প্রতিযোগী ফার্মের চাহিদাও হ্রাস পাবে। তখন অন্য ফার্মগুলি দাম কমাতে বাধ্য হবে। এইভাবে দাম কমানোর প্রতিযোগিতা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে। অনেক সময় এই প্রতিযোগিতা গলাকাটা পর্যায়ে চলে যায়। তখন একটি বড়ো ফার্ম অন্য ফার্মগুলিকে বাজার থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য এবং নিজেদের একচেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করার জন্য দ্রব্যের দামকে উৎপাদন ব্যয়ের নীচে নামিয়ে দেয়। সেই দামে

দ্রব্য বিক্রয় করতে গিয়ে ছোট ফার্মগুলি সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে এবং কারবার ছেড়ে পালিয়ে বাঁচে। তখন বড়ো ফার্মগুলি একচেটিয়া ক্ষমতা দখল করে।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দাম ছাড়া দ্রব্যের ব্যাপারেও প্রতিযোগিতা থাকতে পারে। কোন ফার্ম তার দ্রব্যের প্রতি ক্রেতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য নানারূপ কৌশলে চতুর বিজ্ঞাপন প্রচার করে এবং এর জন্য সিনেমা, টি. ভি., রেডিও, সংবাদপত্র ইত্যাদি মাধ্যমগুলিকে ব্যবহার করে। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য হল—বিজ্ঞাপিত দ্রব্যের বিশেষত্ব সম্বন্ধে ক্রেতাদের সচেতন করা এবং এইভাবে বিক্রি বাড়ানো। বিজ্ঞাপন হল দাম ছাড়া অন্য বিষয়ে প্রতিযোগিতা (Non-Price Competition)।

বিজ্ঞাপন দিলে ফার্মের বিক্রি বাড়ে, গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা উপরের দিকে সরে যায়। সেই সঙ্গে ফার্মের ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এটা হল বিক্রয় ব্যয়। বিজ্ঞাপনের ফলে ফার্মের আয় ও ব্যয় উভয়েই বৃদ্ধি পায় বলে কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করলে এবং তার জন্য কী পরিমাণ বিজ্ঞাপন দিলে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে সেটা ফার্মের ভারসাম্য লাভের সমস্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

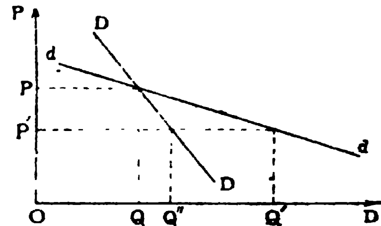
দাম ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রতিযোগিতা অন্যভাবেও হতে পারে। কোন ফার্ম তার দ্রব্যের দাম সমান রেখে দ্রব্যের সঙ্গে বিনামূল্যে কোন উপহার দিতে পারে। গুঁড়ো সাবানের সঙ্গে প্লাস্টিক বালতি বা জার, দাড়ি কাটার সাবানের সঙ্গে ব্লেড, পানীয়-খাদ্যের (Food-drink) বোতলে স্টিলের চামচ—ইত্যাদি যে সব বিষয় আমরা দেখে থাকি সেগুলো হল দাম ব্যতীত অন্য প্রতিযোগিতার উদাহরণ।

১২.১৭ একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দাম প্রতিযোগিতা ও ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা রেখা :

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে বহু ফার্ম এমন সব দ্রব্য বিক্রয় করে যেগুলি ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য। কাজেই কোন একটি ফার্ম তার দ্রব্যের দাম কমালে তার দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অন্য ফার্মগুলির চাহিদা কমে যায়। মিঃ চেম্বারলিন একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারের ফার্মগুলিকে একটি দল (Group)-ভুক্ত মনে করেন। এই দলের মধ্যে অসংখ্য ফার্ম থাকতে পারে, আবার সীমিত সংখ্যক ফার্মও থাকতে পারে। অসংখ্য ফার্ম থাকলে দলটি বড় দলে পরিণত হয়। আবার দলে কম সংখ্যক ফার্ম থাকলে দলটি ছোট হবে। বড় দলের ক্ষেত্রে একটি ফার্ম দাম কমালে অন্য ফার্মের বিক্রয় কমে যায়। কিন্তু এটা বহু ফার্মের মধ্যে ভাগ হয়ে যায় বলে কোন একটি ফার্ম এটা বুঝতে পারে না। ফলে একটি ফার্ম দাম কমিয়ে বিক্রি বাড়িয়ে তোলার চেষ্টা করলে অন্য ফার্মের কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু দল ছোট হলে এবং একটি ফার্ম দাম কমিয়ে বিক্রি বাড়ালে অন্য ফার্মগুলির বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। তখন তারাও দাম কমাতে পারে। এর ফলে আগে যে ফার্ম দাম কমিয়েছিল তার বিক্রি কিছুটা কমে যাবে। অন্যভাবে বলা যায়—দল বড় হলে একটি ফার্ম তার

দ্রব্যের দাম কমিয়ে তার বিক্রয় যে পরিমাণে বাড়াতে পারে—ছোট দলের ক্ষেত্রে একটি ফার্ম দাম কমালে দাম প্রতিযোগিতার ফলে ফার্মের বিক্রয় কম বৃদ্ধি পায়। রেখাচিত্রের সাহায্যে এটা দেখানো হল। এখানে dd ও DD নামক দুটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। dd রেখাটি DD রেখার চেয়ে বেশি হেলানো। ধরা যাক, দাম = OP. তখন চাহিদা = OQ. ধরা যাক দাম কমে OP′ হল। এতে dd রেখার দিক থেকে দেখলে চাহিদা বাড়বে QQ′ পরিমাণে এবং DD রেখার চাহিদা বাড়বে QQ″ পরিমাণে। এখানে QQ″ < QQ′.

কোন একটি ফার্ম দ্রব্যের দাম কমালে তার দ্রব্যের চাহিদা dd রেখা ধরে বাড়বে। যদি দলটি বড় হয় এবং যদি দলের মধ্যে দাম প্রতিযোগিতা না থাকে তাহলে এরূপ হয়। অপরপক্ষে, দলটি ছোট হলে এবং দলের মধ্যে দাম প্রতিযোগিতা থাকলে কোন একটি ফার্ম দাম কমিয়ে বিক্রি বাড়ানোর চেষ্টা করলে তার দ্রব্যের চাহিদা বাড়বে DD রেখা ধরে। মিঃ চেম্বারলিনের মতে দাম প্রতিযোগিতার ফলে ফার্মের বিক্রয় প্রকৃতপক্ষে DD রেখা ধরে বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু ফার্মটি মনে করবে যে, তার বিক্রয় dd রেখা ধরে বাড়বে। অতএব আমরা বলতে পারি DD রেখা হল প্রকৃত বিক্রয় রেখা (Actual sales curve), কিন্তু dd হল পূর্বানুমিত বিক্রয় রেখা (Anticipated sales curve)।



১২.১৬ রেখাচিত্র : একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দাম-প্রতিযোগিতা ও একটি ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা রেখা

dd রেখার ঢাল ও অবস্থান সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। এর ঢাল নির্ভর করে দলে ফার্মের সংখ্যার উপর। ফার্মের সংখ্যা যত বেশী হবে ততই dd রেখার ঢাল বেশি হবে এবং রেখাটি হেলানো হবে। অপরপক্ষে দলে ফার্মের সংখ্যা কম থাকলে দাম প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে এবং dd রেখাটি খাড়া হবে। আবার একটি ফার্ম যদি দাম কমায় এবং অন্য দ্রব্যের দামও কমে যায় তাহলে dd রেখাটি সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যাবে। অতএব dd রেখার অবস্থান নির্ভর করছে অন্য ফার্ম দাম কমাচ্ছে কিনা তার উপর।

দ্বিতীয়ত, দলের মধ্যে নতুন ফার্মের অবাধ প্রবেশ ঘটলে একটি ফার্মের dd রেখা সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যাবে। কারণ নতুন ফার্মের প্রবেশ ঘটলে দ্রব্যের দাম কমে যাবে। পূর্বের সমান পরিমাণ দ্রব্য এখন আগের চেয়ে কম দামে বিক্রয় হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, নতুন ফার্মের প্রবেশ ঘটলে dd রেখা যেমন নীচের দিকে নেমে যায় তেমনি DD রেখাও বাম দিকে সরে আসে।

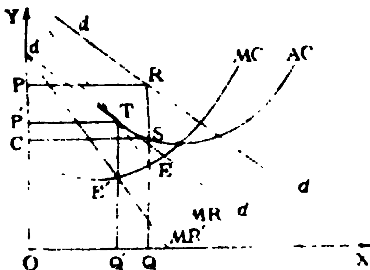
১২.১৮. একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের বড় দল ও ছোট দলভুক্ত ভারসাম্য :

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দলের মধ্যে অসংখ্য ফার্ম থাকতে পারে, আবার সীমিত সংখ্যক ফার্মও থাকতে পারে। অসংখ্য ফার্ম থাকলে দলটি বড় হবে। বড় দলে একটি ফার্ম দাম কমালে তার দ্রব্যের বিক্রয় বাড়বে; অন্য বহু ফার্মের বিক্রয় সেই পরিমাণে কমবে। কিন্তু দলে বহু ফার্ম থাকায় গড়ে প্রত্যেকের বিক্রয় খুব কম পরিমাণেই কমবে। কাজেই অন্য ফার্মগুলি দাম কমাবে না বলে ধরে নেওয়া যায়। কোন একটি ফার্ম দাম কমিয়ে তার বিক্রি বাড়িয়ে বেশি মুনাফা পাবে। এই মুনাফার লোভে নতুন ফার্ম প্রবেশ করবে। অতএব আমরা একটি অবস্থা পেলাম যেখানে (ক) অবাধ প্রবেশ থাকবে, কিন্তু কোন দাম প্রতিযোগিতা থাকবে না।

আবার দলটি যদি ছোট হয়, অবাধ প্রবেশের পথে যদি কোন বাধা থাকে তাহলে একটি ফার্ম দাম কমিয়ে তার বিক্রি বাড়াতে পারবে। এর ফলে অন্য ফার্মগুলির বিক্রি সেই পরিমাণে কমবে কিন্তু ফার্মের সংখ্যা নিতান্ত কম হওয়ায় প্রত্যেকের বিক্রি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে। তখন অন্য ফার্মগুলিও দ্রব্যের দাম কমাবে। এইভাবে বিভিন্ন ফার্মের মধ্যে দাম-প্রতিযোগিতা দেখা দেবে। অতএব আমরা আর একটি অবস্থার কথা বলতে পারি যেখানে (খ) দাম প্রতিযোগিতা থাকবে কিন্তু অবাধ প্রবেশ থাকবে না।

আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে এই দুটি অবস্থায় ফার্মের ভারসাম্য দেখাতে পারি। নীচে (ক) চিত্রে প্রথম অবস্থাটি এবং (খ) চিত্রে দ্বিতীয় অবস্থাটি দেখানো হল।

(ক) চিত্রের ব্যাখ্যা (বড় দলের অন্তর্ভুক্ত একটি ফার্মের ভারসাম্য : দাম প্রতিযোগিতা নেই, অবাধ প্রবেশ আছে) :



১২.১৭ রেখাচিত্র : (ক) একচেটিয়া প্রতিযোগিতার এবং অবাধ প্রবেশ যুক্ত বাজারে দাম প্রতিযোগিতা-বিহীন অবস্থায় একটি ফার্মের ভারসাম্য

এই রেখাচিত্রে AC ও MC হল যথাক্রমে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। dd হল চাহিদা রেখা বা ফার্মের গড় আয় (AR) রেখা। MR হল ফার্মের প্রান্তিক আয় রেখা।

E হল ভারসাম্যের বিন্দু। উৎপাদন = OQ দাম = OP. গড় ব্যয় = OC < দাম। অতএব ফার্মের CPRS পরিমাণ মুনাফা হবে। এটা হল স্বল্পমেয়াদী কালের ভারসাম্য।

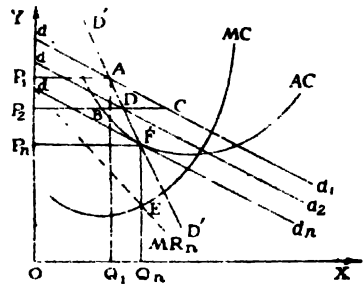
এই মুনাফার লোভে নতুন ফার্ম প্রবেশ করবে। তার ফলে dd রেখা সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে আসবে; সেই সঙ্গে MR রেখাও নামবে। দাম কমবে।

মুনাফা কমবে। দীর্ঘকালে dd রেখাটি AC রেখাকে T বিন্দুতে স্পর্শ করবে যখন, তখন P = AC হবে, অতিরিক্ত মুনাফা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হবে এবং নতুন ফার্মের প্রবেশ ঘটবে না। এইভাবে চাহিদা রেখাটি হবে dd′, MR রেখা হবে MR′, ভারসাম্যের বিন্দু হবে E′. উৎপাদন = OQ′ হবে। দাম = OP′ = গড় ব্যয়। অতএব অতিরিক্ত মুনাফা শূন্য হবে।

(খ) চিত্রের ব্যাখ্যা (দাম প্রতিযোগিতা যুক্ত অবাধ প্রবেশবিহীন একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ছোট দলভুক্ত একটি ফার্মের ভারসাম্য):

এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে উৎপাদন এবং OY-অক্ষে আয় ও ব্যয় এবং দাম পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে AC ও MC হল যথাক্রমে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। dd_1, $dd_2 \cdots dd_n$ হল ফার্মের বিক্রয় রেখা বা ফার্মের দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা রেখা। dd_1, $dd_2, \cdots dd_n$ রেখাগুলির সঞ্চারপথ হল DD′ রেখা। এই রেখাটিকে আমরা ফার্মের প্রকৃত বিক্রয় রেখা বলতে পারি।

এখানে ধরা হয়েছে যে, অবাধ প্রবেশ নেই। দলের মধ্যে ফার্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে না। কাজেই দলটি ছোট হবে। ছোট দলে অবাধ প্রবেশ থাকে না, কিন্তু দাম প্রতিযোগিতা থাকে। একটি ফার্ম বিক্রি বাড়ানোর জন্য তার দ্রব্যের দাম কমাতে পারে। কিন্তু অন্য ফার্মগুলিও তো এরকম করতে পারে। তখন এই ফার্মের বিক্রয় রেখা (dd) নীচের দিকে নামবে। এখানে প্রকৃত বিক্রয় রেখা হবে D′D′ রেখাটি। D′D′ রেখাটি dd রেখার চেয়ে বেশি খাড়া, কারণ একটি ফার্ম দাম কমিয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি বাড়াতে পারবে বলে আশা করবে, সে



১২.১৮ রেখাচিত্র: (খ) একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে দাম প্রতিযোগিতা যুক্ত এবং অবাধ প্রবেশের সুযোগবিহীন অবস্থায় একটি ফার্মের ভারসাম্য

দেখবে dd রেখা ধরে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার চাহিদা বাড়বে D′D′ রেখা ধরে অর্থাৎ কম পরিমাণে। যেমন, ফার্মটি যদি A বিন্দুতে থাকে এবং OP_1 দাম ধার্য করে, তাহলে সে ভারসাম্য অবস্থায় থাকবে না. মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য সে দাম কমাবে। ধরা যাক, সে OP_2 দাম ধার্য করল।

এর দ্বারা সে আশা করবে যে, সে BC পরিমাণ বেশি বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু তখন দাম প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলে এই ফার্মের বিক্রয় রেখা হবে dd_2. ফার্মটি দাম কমিয়ে কেবলমাত্র DB পরিমাণ বেশি দ্রব্য বিক্রি করতে পারবে। অতএব একটি ফার্ম ভাববে, সে দাম কমিয়ে dd রেখা ধরে তার বিক্রি বাড়াতে পারবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার dd রেখা দাম প্রতিযোগিতার ফলে ক্রমাগত নীচের দিকে সরে

আসবে। এই রেখাগ্যলির সন্তারপথ হবে D'D' নামক চাহিদা রেখাটি। মিঃ চেম্বারলিনের মতে এটি হল বাজারের মোট বিক্রির মধ্যে ফার্মের নির্দিষ্ট অংশস্চক রেখা। একে আমরা ফার্মের প্রকৃত বিক্রয় রেখাও বলতে পারি।

যাহোক দাম যখন OP_2, তখনও এই ফার্মটি ভারসাম্য লাভ করতে পারবে না। সে ভাববে দাম কমিয়ে dd_2 রেখা ধরে সে তার বিক্রি বাড়াতে পারবে। কাজেই সে দাম কমাবে। অন্য ফার্মও তার মত স্বল্পদ্দ্ষ্টিসম্পন্ন হওয়ায় তারাও দাম কমিয়ে বিক্রি বাড়িয়ে ম্নাফা সর্বাধিক করতে চাইবে। এর ফলে dd_3 রেখা নীচের দিকে নেমে যাবে। ফার্মের প্রকৃত বিক্রয় কমই বৃদ্ধি পাবে। অবশেষে দাম কমে যখন OP_n হবে তখন উৎপাদন হবে OQ_n.

এখানে প্রান্তিক ব্যয় রেখা (MC রেখা) ও dd_n-এর নীচে অঙ্কিত প্রান্তিক আয় রেখা (MR_n রেখা) পরস্পরকে E বিন্দ্বতে ছেদ করেছে। E হল ভারসাম্যের বিন্দ্ব।

এখানে dd_n রেখা AC রেখাকে F বিন্দ্বতে স্পর্শ করেছে। কাজেই দাম = গড় ব্যয় (P=AC). এখানে P=AC হওয়ায় ফার্মের কোন লাভ বা ক্ষতি হবে না। ফার্মটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক ম্নাফা পাবে। এখানে সে যদি দাম কমায় তাহলে তার ক্ষতিই হবে। কাজেই সে দাম কমাবে না।

১২.১১ ডুয়োপলি

(ক) ডুয়োপলি বা দ্বজন বিক্রেতার বাজারের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :

যে বাজারে দ্বজন মাত্র বিক্রেতা কিংবা দ্বটি মাত্র ফার্ম থাকে তাকে ড্বয়োপলি বলা হয়। এখানে দ্বজন বিক্রেতা দ্বটি দ্রব্য বিক্রয় করে, কিন্তু সেই দ্রব্য দ্বটি পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য, যাদের মধ্যে একটি দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা অন্য দ্রব্যটির দামের উপর খ্বব ঘনিষ্ঠভাবে নির্ভর করে।

বৈশিষ্ট্য : (১) এই বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা বাজারের সামগ্রিক চাহিদার একটি বড় অংশ দখল করে থাকে। আমরা বলি ড্বয়োপলিতে দ্বজন বিক্রেতার মধ্যে বাজার ভাগ হয়ে যায়।

(২) এর ফলে প্রত্যেক বিক্রেতার গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা নিম্নম্বখী হয়। অর্থাৎ একজন বিক্রেতা বেশি পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করতে চাইলে তাকে দ্রব্যের দাম কমাতে হয়।

(৩) এই বাজারে অসংখ্য ক্রেতা থাকে, যারা তাদের চাহিদা রেখা ধরে দ্রব্য ক্রয় করে। কোন ক্রেতাই দ্রব্যের দামের উপর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

(৪) এই বাজারের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানে দ্রব্যের দাম কিংবা দ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে দ্বজন বিক্রেতার মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা থাকে। প্রত্যেকেই বোঝে যে, তার একজন প্রতিযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতা আছে।

(৫) এই পারস্পরিক নির্ভরতা থাকায় প্রত্যেক বিক্রেতাই দ্রব্যের দাম বা পরিমাণ সম্বন্ধে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্বন্ধে পূর্ব থেকে অনুমান (conjecture) করে। সেই অনুমানের ভিত্তিতে নিজের কর্মকৌশল (strategy) ঠিক করে।

(৬) দ্বৈতাধিকারের ক্ষেত্রে দুজন বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের দাম নিয়ে কিংবা দাম ছাড়া অন্য ব্যাপারে তীব্র প্রতিযোগিতা থাকতে পারে। দাম-প্রতিযোগিতা থাকলে একজন বিক্রেতা তার দ্রব্যের দাম কমিয়ে তার বিক্রয় বাড়াবার চেষ্টা করে। তখন অন্য বিক্রেতা তার দ্রব্যের দাম কমিয়ে দেয়। এইভাবে দুজনের মধ্যে তীব্র দাম-প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে। আবার দাম ছাড়া অন্য বিষয়েও প্রতিযোগিতা থাকতে পারে। কোন একজন বিক্রেতা সমান দামে বেশি দ্রব্য দিতে পারে, কিংবা সমান দামে ক্রেতাকে দ্রব্যের সঙ্গে বাড়তি কোন পুরস্কারমূলক দ্রব্য দিতে পারে।

(খ) দ্বৈতাধিকারে কীভাবে দ্রব্যের পরিমাণ নির্ধারিত হয় (কুর্নো মডেল):

বিখ্যাত ফরাসী অর্থনীতিবিদ অগাস্টিন কুর্নো ১৮৩৮ সালে দুজন বিক্রেতা কীভাবে তাদের ভারসাম্য লাভ করে তার আঙ্কিক প্রমাণ দেন। আমাদের বর্তমান আলোচনা কুর্নোর ছকের (model) উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে।

আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা ধরে নেব যে,

(১) বাজারে A ও B নামক দুজন বিক্রেতা আছে।

(২) দুজনেই একটি দ্রব্য, কিংবা সমজাতীয় দুটি দ্রব্য বিক্রয় করে।

(৩) প্রত্যেক বিক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় (MC) শূন্য।

(৪) প্রত্যেকের কাছে দ্রব্যের পরিমাণই হল একমাত্র বিচার্য বিষয়।

(৫) বাজারে দ্রব্যটির অসংখ্য ক্রেতা আছে।

(৬) তাদের চাহিদা রেখা দেওয়া আছে। এই চাহিদা রেখা নিম্নমুখী ও সরলরৈখিক।

(৭) প্রত্যেক বিক্রেতা স্বাধীনভাবে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(৮) তাদের মধ্যে জোট বাঁধার কোন চেষ্টা নেই।

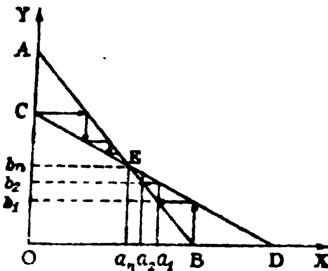
(৯) দ্রব্যের পৃথকীকরণ নেই, বিজ্ঞাপনও নেই।

(১০) প্রত্যেক বিক্রেতা মনে করে যে, যে-কোন সময়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর উৎপাদনের পরিমাণ তার পূর্ব সময়ের উৎপাদনের স্তরে স্থির থাকবে।

(১১) দুজন বিক্রেতাই সমানভাবে দক্ষ।

এক্ষেত্রে A ও B নামক দুজন বিক্রেতার মধ্যে কে কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং কীভাবে ভারসাম্য লাভ করবে তা পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্রে দেখানো হল। এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে A'র উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ এবং OY-অক্ষে B'র উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে AB হল A নামক বিক্রেতার প্রতিক্রিয়া রেখা (Reaction curve) এবং CD হল B'র প্রতিক্রিয়া রেখা।

এখানে AB ও CD রেখা দুটিকে সরলরৈখিক করে অঙ্কন করা হয়েছে। AB রেখার প্রত্যেকটি বিন্দুতে A ও B'র উৎপাদনের পরিমাণ সূচিত হয়। যদি B'র উৎপাদন কোন নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে তাহলে A যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করলে তার মুনাফা সর্বাধিক হতে পারে, A ও B'র সেই উৎপাদনের পরিমাণ দুটি AB রেখার উপর কোন বিন্দুর দ্বারা প্রকাশ করা যায়। B যদি বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করে তাহলে A'র সর্বাধিক মুনাফাদায়ী উৎপাদন কমে যায়। সেইজন্য AB রেখাটি নিম্নমুখী হয়। যেমন, A যদি ধরে নেয় যে, B শূন্য পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে, তাহলে A যখন OB পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে তখন তার মুনাফা হবে সর্বাধিক। এক্ষেত্রে বাজারে A হবে একচেটিয়া কারবারী। কাজেই OB-কে আমরা একচেটিয়া উৎপাদন (Monopoly output) বলতে পারি। কিন্তু B যদি Ob_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তাহলে A'র পক্ষে Oa_1 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করতে পারলেই মুনাফা সর্বাধিক হবে। এইভাবে দেখা যায়, B যত তার বিক্রয় বাড়িয়ে যায়, ততই A'র পক্ষে কম উৎপাদন ও বিক্রয় করাই লাভজনক হয়ে ওঠে। বিপরীতক্রমে B যত কম উৎপাদন ও বিক্রয় করে, A'র পক্ষে তত বেশি বিক্রয় করা লাভজনক হয়। কাজেই A'র প্রতিক্রিয়া রেখাটি বাম দিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়। অনুরূপভাবে B'র প্রতিক্রিয়া রেখা CD'র আকৃতিও ব্যাখ্যা করা যায়। A'র উৎপাদন কোন নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থির থাকলে B'র পক্ষে কী পরিমাণ উৎপাদন করা লাভজনক হবে তা CD রেখা থেকে জানা যায়। A যদি তার উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাহলে B'র পক্ষে উৎপাদন হ্রাস করা বা বৃদ্ধি করাই লাভজনক হয়। এখানে OC হল B'র একচেটিয়া উৎপাদন। যেহেতু A ও B-কে সমান বলে ধরা হয়েছে, কাজেই OC = OB এবং OA = OD হবে।



১২.১১ রেখাচিত্র : প্রতিক্রিয়া রেখার সাহায্যে কুর্নোপদ্ধি ভারসাম্য

AB ও CD রেখা দুটি পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হল ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে Oa_n ও Ob_n হল যথাক্রমে A ও B'র ভারসাম্য উৎপাদন। যদি A ও B যথাক্রমে Oa_n এবং Ob_n পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে তাহলে উভয়েই সর্বাধিক মুনাফা পাবে এবং কেউ উৎপাদনের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটাবে না। E বিন্দুর বাম দিকে অথবা ডান দিকে দুজনের প্রতিক্রিয়া থাকবে। কীভাবে এটা হয় দেখা যেতে পারে।

ধরা যাক, A মনে করল যে, B শূন্য পরিমাণ উৎপাদন করবে। তাহলে সে করবে OB. কিন্তু A যদি OB উৎপাদন করে, তাহলে B করবে Ob_1. B যদি

Ob_1 করে, তাহলে A করবে Oa_1, তখন B করবে Ob_2, তখন A করবে Oa_2. এভাবে B তার উৎপাদন বাড়িয়ে যাবে এবং A তার উৎপাদন কমাবে। এমনি করে তীরমুখে সূচিত পথে তাদের প্রতিক্রিয়া তাদেরকে E বিন্দুর দিকে নিয়ে যাবে। E বিন্দুতে এলে তাদের প্রতিক্রিয়ায় ভারসাম্য দেখা দেবে। অনুরূপভাবে E বিন্দুর বামদিকে কোন বিন্দু থেকে আরম্ভ করলে তারা তীরাঙ্কিত পথে E বিন্দুতে এসে পৌঁছাবে। অতএব E হল ভারসাম্যের বিন্দু।

মন্তব্য: কুর্নোর মডেলে ডুয়োপলির যে সমাধান দেওয়া হয় তার কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত—এখানে দ্রব্যের পৃথকীকরণ নেই। এটা অবাস্তব। দ্রব্যের পৃথকীকরণ থাকলে বিজ্ঞাপন থাকবে। বিজ্ঞাপন থাকলে একজন বিক্রেতা সহজেই তার অনুকূলে ক্রেতাদের চাহিদাকে আকৃষ্ট করতে পারবে।

দ্বিতীয়ত—কুর্নো উৎপাদন ব্যয়ের কথা ধরেননি। উৎপাদন ব্যয় না ধরলে আলোচনার বাস্তবতা থাকে না, থাকে অঙ্কের কারিকুরি মাত্র। কুর্নো অর্থনীতিতে অঙ্কের প্রয়োগ করার জন্য তাঁর ডুয়োপলি মডেল রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়।

তৃতীয়ত—কুর্নো মডেলে দ্রব্যের পরিমাণ নিয়েই ভাবা হয়েছে, দাম নিয়ে ভাবা হয়নি। যেহেতু উৎপাদনের ব্যয় নেই কাজেই দ্রব্যের দাম কত হবে তা এমনিতে জানা যায় না। অবশ্য বাজারের চাহিদা রেখা দেওয়া থাকলে পরিমাণ থেকে দ্রব্যের দাম জানা যেতে পারে। কিন্তু উভয় বিক্রেতার মধ্যে দাম-প্রতিযোগিতা থাকলে দাম কোথায় গিয়ে থামবে সেটা কুর্নোর মডেল থেকে জানা যায় না। কুর্নো মডেলের ত্রুটি দূর করার জন্য বারট্রান্ড একটি দাম ভিত্তিক মডেল রচনা করেছেন।

চতুর্থত—কুর্নোর মডেলের দুজন বিক্রেতা স্বল্পদৃষ্টির রোগে ভোগে। প্রত্যেকেই ধরে নেয় প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতা তার দ্রব্যের পরিমাণ পাল্টাবে না এবং সেই ধারণার ভিত্তিতে সে স্বাধীনভাবে নিজের কর্মকৌশল খাড়া করে। অথচ পরের মুহূর্তেই সে দেখতে বাধ্য হয় যে, তার ধারণা মিথ্যা হয়ে গেছে। তবু তার ভুল ভাঙে না। এটা বড় আশ্চর্যের ব্যাপার।

পঞ্চমত—সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল এই যে, কুর্নো মডেলে দুজন বিক্রেতাই ভুল পথে চলে এবং তারা অবশেষে ঠিক ভারসাম্য লক্ষ্যে গিয়ে উপনীত হয়। ভুল পথে চললে কেউ সঠিক লক্ষ্যে যেতে পারে কিনা সেটা বিতর্কের ব্যাপার এবং তার মধ্যে 'ভুল করলে ঠিক করা হয়' এরকম একটা স্ববিরোধ থেকে যায়।

১২.২০ (ক) ওলিগোপলির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য:

যে বাজারে কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা বা কয়েকটি মাত্র ফার্ম থাকে যারা একটি সমজাতীয় দ্রব্য কিংবা কয়েকটি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে সেই বাজারকে ওলিগোপলি বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ ওলিগোপলি হল অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি বিশেষ রূপ। ১। এখানে মাত্র কয়েকজন বিক্রেতা থাকে। ২। প্রত্যেক বিক্রেতা একটি সমজাতীয় অথবা পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করে। সকলে পৃথকীকৃত দ্রব্য বিক্রয় করলেও দ্রব্যগুলি প্রায় সমজাতীয় হবে। ৩। এই বাজারে বিক্রেতাদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependence) থাকবে। একজন বিক্রেতা যদি তার দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করে, তাহলে দ্রব্যগুলি প্রায় সমজাতীয় হওয়ায় আমরা বলতে পারব যে, তার ফলে বাজারের সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পাবে। এতে অন্যান্য বিক্রেতাও তাদের যোগানের পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে এবং এইভাবে বিক্রেতাদের একজনের কাজ অন্যদের প্রভাবিত করবে। অন্যভাবে বলা যায়—ওলিগোপলির বাজারে বিক্রেতাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থাকবে।

৪। দ্রব্যের পরিমাণ ও দ্রব্যের দাম—উভয় ব্যাপারেই প্রতিযোগিতা ও প্রতিক্রিয়া থাকিতে পারে। একজন বিক্রেতা তার দ্রব্যের বিক্রয় বৃদ্ধি করার জন্য দাম কমিয়ে দিতে পারে। এতে অন্যান্য বিক্রেতার বিক্রয় কমে যায়। তখন তারাও দাম কমিয়ে দেয়। এইভাবে ওলিগোপলিতে দাম প্রতিযোগিতা দেখা দেয়।

৫। ওলিগোপলিতে পণ্যের পৃথকীকরণ থাকতে পারে। তাহলে প্রত্যেকটি ফার্ম তার দ্রব্যকে পৃথক করার জন্য বিজ্ঞাপনের আশ্রয় নিতে পারে।

৬। বিজ্ঞাপন থাকলে বিজ্ঞাপনের ব্যয়ও থাকবে এবং এই ব্যয় দ্রব্যের দামকে প্রভাবিত করবে, চাহিদাকেও প্রভাবিত করবে।

৭। ওলিগোপলির বাজারে নতুন ফার্ম অবাধে প্রবেশ করতে পারে, অথবা অবাধ প্রবেশের পথে কোন বাধা থাকতেও পারে। অবাধ প্রবেশ থাকলে ওলিগোপলিতে ফার্মের সংখ্যা খুব বেশি হয়ে যাবে এবং সকলের দ্রব্য সমজাতীয় হলে ওলিগোপলির সঙ্গে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের কোন পার্থক্য থাকবে না। তবে ওলিগোপলির বাজারকে অবাধ প্রবেশাধিকারবিহীন বাজার বলাই উচিত।

৮। ওলিগোপলিতে ফার্মগুলি জোটবদ্ধ হতে পারে, আবার পৃথক থাকতে পারে।

(খ) ওলিগোপলিতে একটি ফার্ম কীভাবে ভারসাম্য লাভ করে ? ঃ

[**অধ্যাপক চেম্বারলিনের ছোট দল মডেল**]

ওলিগোপলিতে একটি ফার্ম কীভাবে ভারসাম্য লাভ করে সে সম্বন্ধে অধ্যাপক চেম্বারলিনের আলোচনাটি এখানে দেওয়া হল। চেম্বারলিন ধরে নিয়েছিলেন যে, ওলিগোপলির বাজারে নতুন ফার্ম প্রবেশ করে না। কাজেই দলের মধ্যে মাত্র কয়েকটি ফার্ম থাকবে। এজন্য একে ছোট দলের ব্যাপার বলা হয়। অবশ্য চেম্বারলিন আলোচনাকে সহজ করার জন্য ধরে নিয়েছিলেন যে, দলের মধ্যে দুটি মাত্র ফার্ম বা দুজন মাত্র বিক্রেতা আছে। চেম্বারলিনের অনুসরণে আমরাও ধরে নেব যে,

(১) দলের মধ্যে A ও B নামক দুজন মাত্র বিক্রেতা আছে,

(২) তারা উভয়ে একটি সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে,

(৩) আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা ধরে নেব যে, উভয়ের কোন উৎপাদন ব্যয় নেই, কাজেই প্রান্তিক ব্যয় শূন্য।

(৪) উভয়েই সর্বাধিক মুনাফা পেতে চায়। যেখানে মোট আয় সর্বাধিক সেখানে বিক্রেতার মুনাফাও সর্বাধিক (কারণ মুনাফা = আয় − ব্যয়, এখানে ব্যয় শূন্য, কাজেই মুনাফা = আয়, কাজেই আয় সর্বাধিক হলেই মুনাফা সর্বাধিক হবে)।

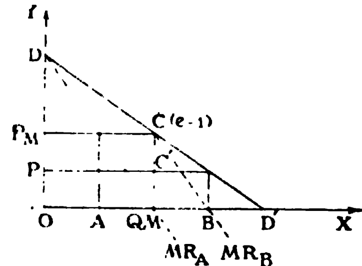
(৫) বাজারে অসংখ্য ক্রেতা আছে।

(৬) ক্রেতাদের চাহিদা রেখা সরলরৈখিক ও নিম্নমুখী।

(৭) প্রত্যেক বিক্রেতাই তার প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এই অনুধারণাগুলির ভিত্তিতে আমরা আলোচনা করতে পারি, ওলিগোপলিতে প্রত্যেক বিক্রেতা কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করবে এবং দ্রব্যের দামই বা কত হবে। নীচের রেখাচিত্রে এটি দেখানো হয়েছে।

এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে পরিমাণ ও OY-অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে DD′ হল দ্রব্যের জন্য ক্রেতাদের চাহিদা রেখা। একে আমরা বিক্রেতার গড় আয় রেখা বলতে পারি।



১২.২০ রেখাচিত্র : ওলিগোপলির ক্ষেত্রে বিক্রেতার ভারসাম্য (ছোট দল মডেল)

ধরা যাক, প্রথমে A উৎপাদন শুরু করল। সে হবে একচেটিয়া কারবারী। DD রেখাটি হবে তার AR রেখা এবং MR_A রেখাটি হবে তার MR রেখা। MR_A রেখাটি OX-অক্ষকে Q_M বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখানে $MR_A = O$.

আমরা ধরেছি যে, A-র MC = O. কাজেই মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য MR = MC = O হবে। এখানে Q_M হল A-র ভারসাম্য বিন্দু। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, যদি A একমাত্র বিক্রেতা হয়, তাহলে সে OQ_M পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে এবং সেই দ্রব্যের প্রতি একক OP_M দামে বিক্রয় করবে। এখানে OQ_M হল একচেটিয়া উৎপাদন (Monopoly output) এবং OP_M হল একচেটিয়া দাম। সেইজন্য Q ও P-এর গায়ে M অক্ষরটি বসানো হয়েছে।

এখন ধরা যাক, B. উৎপাদন বাজারে প্রবেশ করার সিদ্ধান্ত নিল। সে এসেই দেখবে যে, A OQ_M যোগান দিচ্ছে। সে ধরে নেবে যে, তার দ্রব্যের চাহিদা রেখা হল CD′; এটাই তার AR রেখা এবং তার নীচে MR_B হল তার MR রেখা। যেহেতু তার MC = O, কাজেই সে সর্বাধিক মুনাফার জন্য Q_MB পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে। তাহলে বাজারে মোট যোগান হবে $OQ_M + Q_MB = CB$ এবং দাম হবে OP.

OP দামে দ্রব্য বিক্রয় করার সময় A দেখবে যে, তার মোট আয় বা মুনাফা কমে গেছে। আগে তার মুনাফা ছিল $OP_M\ CQ_M$, এখন হয়েছে $OPC'Q_M$. C বিন্দুতে e = 1, কিন্তু CD' অংশে e < 1. কাজেই দাম কমিয়ে (অর্থাৎ উৎপাদন বাড়িয়ে) বেশি পরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করা যাবে সত্য, কিন্তু তাতে তার মোট আয় বা মোট মুনাফা কমে যাবে। কাজেই A তার উৎপাদন বৃদ্ধি করবে না। B বাজারে প্রবেশ করায় যে এটা হয়েছে তা A বুঝতে পারবে। সে এখন উৎপাদন কমাবে। চেম্বারলিনের মতে এখানে A উৎপাদন কমিয়ে B-র উৎপাদনের সমান করবে। রেখাচিত্রে A-র উৎপাদন = OA দেখানো হয়েছে। এখানে $OA = Q_MB$. অর্থাৎ A ও B দুজনেই বুঝতে পারবে যে, একচেটিয়া দামে দ্রব্য বিক্রয় করাই লাভজনক। কাজেই দ্রব্যের দাম হবে OP_M এবং এই দামে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ হবে OQ_M এই উৎপাদনের অর্ধেক করবে A এবং বাকি অর্ধেক করবে B. অতএব চেম্বারলিনের মতে দুজন ব্যয়বিহীন বিক্রেতার বাজারে দ্রব্যের উৎপাদন ও দাম একচেটিয়া বাজারের স্তরে নির্দিষ্ট হবে।

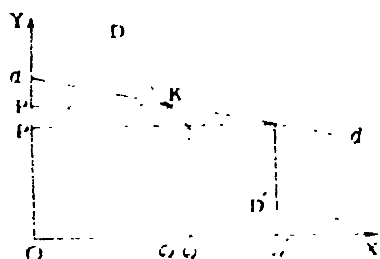
মন্তব্য : (১) চেম্বারলিনের এই মডেলটি কুর্নো মডেলের মতই দুজন বিক্রেতার বাজার নিয়ে আলোচনা করে। একে আমরা সঠিক অর্থে ওলিগোপলির আলোচনা বলতে পারি না।

(২ কুর্নোর মত চেম্বারলিন ধরে নিয়েছেন যে, বিক্রেতাদের কোন উৎপাদন ব্যয় নেই। এই অনুধারণাটি অবাস্তব।

(৩) এখানে নতুন প্রবেশের কথা বলা হয়নি। এটি একটি বন্ধ ব্যবস্থার আলোচনা।

৪) চেম্বারলিন যেভাবে দুজন বিক্রেতার উৎপাদন সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তাতে মনে হবে দুজন বিক্রেতা বুঝি একসঙ্গে তাদের মিলিত মুনাফা (Joint Profit) সর্বাধিক করতে চায়।

১১.২১ কোণযুক্ত চাহিদারেখা এবং ওলিগোপলির ক্ষেত্রে দামের অপরিবর্তনীয়তা (Kinky demand cruve and Price rigidity under Oligopoly) :



১১.২১ রেখাচিত্র : ওলিগোপলির ক্ষেত্রে কোণযুক্ত চাহিদারেখা

(ক) চাহিদারেখা কখন কোণযুক্ত হয় ? অধ্যাপক সুইজির মতে, ওলিগোপলিতে দাম প্রতিযোগিতা থাকলে একজন বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদারেখায় দুটি অংশ থাকবে— একটি বামদিকের অংশ, অপরটি ডানদিকের অংশ। বামদিকের অংশে চাহিদা রেখাটি বেশি হেলানো হবে এবং ডানদিকের অংশে এটি কিছুটা খাড়া হবে। এই দুটি অংশ যেখানে ছেদ করবে সেখানে একটি কোণের উৎপত্তি হবে। সেজন্য একে কোণযুক্ত চাহিদা রেখা (Kinky demand curve) বলা হয়। আমাদের উপরে রেখাচিত্রে dkD'

হল একটি কোণযুক্ত চাহিদা রেখা। K হল এই চাহিদা রেখার উপর কৌণিক বিন্দু (Kink)। এখানে OX-অক্ষে চাহিদা বা বিক্রয়ের পরিমাণ এবং OY-অক্ষে দাম পরিমাপ করা হচ্ছে। বস্তুত dkD′ চাহিদা রেখাটি DD′ ও dd′ নামক দুটি চাহিদা রেখার এক প্রকার মিশ্রণের ফলে উৎপন্ন হয়। মিঃ চেম্বারলিনের মতে dd′ হল একটি ফার্মের প্রত্যাশিত বিক্রয় রেখা (Expected Sales Curve) এবং DD′ হল প্রকৃত বিক্রয় রেখা (Actual Sales Curve)।

ওলিগোপলিতে বিক্রেতার সংখ্যা সীমিত। কোন একজন বিক্রেতা তার দ্রব্যের দাম হ্রাস করলে তার বিক্রয় বাড়বে এবং অন্যদের বিক্রয় সেই পরিমাণে কমবে।

বিক্রেতার সংখ্যা কম হওয়ায় গড়ে প্রত্যেকের বিক্রয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমে যাবে। কাজেই তারাও দাম কমাবে। তারা যদি সমান পরিমাণে দাম কমায়, তাহলে একটি ফার্ম পূর্বে দাম কমিয়ে যতখানি দ্রব্য বিক্রয় করবার আশা করেছিল, প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে কম বিক্রয় করতে পারবে। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়—একটি ফার্ম দাম কমিয়ে dd′ রেখা ধরে তার বিক্রয় বৃদ্ধি করার আশা করবে, কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে DD′ রেখা ধরে তার বিক্রয় বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে। কাজেই dd′ হল প্রত্যাশিত বিক্রয় রেখা এবং DD′ হল প্রকৃত বিক্রয় রেখা। এগুলি মিঃ চেম্বারলিনের কথা। উপরের রেখাচিত্রের প্রসঙ্গ টেনে বলা যায়—একজন বিক্রেতা দ্রব্যের দামকে OP থেকে কমিয়ে OP′ করলে সে আশা করবে যে, সে QQ′ পরিমাণে বিক্রয় বৃদ্ধি করতে পারবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে QQ″ (<QQ′) পরিমাণে। অতএব দ্রব্যের দাম যদি OP অপেক্ষা কম হয়, তাহলে dd′ রেখার KD′ অংশটি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং KD হবে প্রকৃতপক্ষে বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা রেখা। Kd′ অংশটি বাতিল হবে দেখানোর জন্য একে ভাঙা দাগে অঙ্কন করা হয়েছে।

আবার এই ফার্মটি যদি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করে, তাহলে তার বিক্রয় কমবে। কিন্তু অন্য ফার্মগুলিও দাম বৃদ্ধি করবে। যদি করে তাহলে বিক্রয় কমবে KD রেখা ধরে; কিন্তু অন্য ফার্মগুলি যদি দাম বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করে, তাহলে এই ফার্মের বিক্রয় খুব বেশি পরিমাণে কমবে। আমরা বলতে পারি যে, সে ক্ষেত্রে এই ফার্মের বিক্রয় Kd রেখা ধরে কমবে।

অর্থাৎ দাম কমালে একটি ফার্মের বিক্রয় বাড়বে KD′ রেখা ধরে এবং দাম বৃদ্ধি করলে তার বিক্রয় কমবে kd রেখা ধরে। দাম বৃদ্ধির সময় DD′ রেখার KD অংশটি বাতিল বলে গণ্য হবে। কাজেই একটি ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা রেখা হবে dkD নামক একটি কোণযুক্ত রেখা।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, dkD′ চাহিদা রেখার dk অংশটিতে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা বেশি এবং KD′ অংশটিতে এই স্থিতিস্থাপকতা কম। এর সঙ্গত কারণ আছে। একটি ফার্ম যখন দাম কমায় এবং অন্য ফার্মগুলিও দাম কমায় তখন এই ফার্মের বিক্রয় কম বৃদ্ধি পায়, কাজেই দাম হ্রাসের ক্ষেত্রে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কম হয়। অপরপক্ষে, একটি ফার্ম যখন দাম বৃদ্ধি করে কিন্তু অন্য

ফার্মগ্লি দাম ব্দ্ধি করে না (ধরা যেতে পারে যে, তারা দাম স্থির রাখে)। সে ক্ষেত্রে দাম ব্দ্ধিকারী ফার্মের বিক্রয় বেশি কমে যায়। কাজেই চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা বেশি হয়। স্থিতিস্থাপকতার এই পার্থক্যের জন্যই dKD′ চাহিদা রেখার dK অংশটি হেলানো হয় এবং KD′ অংশটি খাড়া হয়।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, ওলিগোপলিতে এক বিশেষ ধরনের দাম প্রতিযোগিতার ফলে একটি ফার্মের দ্রব্যের চাহিদা রেখা কোণযুক্ত হয়ে থাকে।

(খ) কোণযুক্ত চাহিদা রেখার সাহায্যে দামের অপরিবর্তনীয়তার ব্যাখ্যা ঃ

অধ্যাপক হল ও হিচ নামে দুজন গবেষক দাম নির্ধারণ বিষয়ে গবেষণা করার সময় লক্ষ্য করেন যে, অনেক দ্রব্যের দাম মোটামুটিভাবে নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে। কেন এমন হয়? অধ্যাপক সুইজির মতে কোণযুক্ত চাহিদা রেখার সাহায্যে এই ঘটনার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমরা নীচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দামের অপরিবর্তনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারি।

১২.২২ রেখাচিত্র : কোণযুক্ত চাহিদা রেখা

এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে দ্রব্যের পরিমাণ এবং OY-অক্ষে দাম পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে dKD′ হল কোণযুক্ত চাহিদা রেখা। দ্রব্যের চাহিদা রেখা হল বিক্রেতার গড় আয় রেখা। এখানে বিক্রেতার AR রেখার দুটি অংশ যথা dK এবং KD′. এদের নীচে dE এবং FG হল যথাক্রমে প্রান্তিক আয় (MR) রেখা। এই রেখাচিত্রে MC হল বিক্রেতার প্রান্তিক ব্যয় রেখা।

ওলিগোপলির বাজারে একজন বিক্রেতা তার দ্রব্যের দাম কমালে অন্য বিক্রেতারাও তাকে অনুসরণ করে, ফলে তার বিক্রয় কম বাড়ে। আবার একজন যদি দাম বৃদ্ধি করে এবং অন্যেরা তাকে অনুসরণ না করে তাহলে তার বিক্রয় খুব বেশি কমে যায়। সেইজন্য ওলিগোপলির বাজারের একজন বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা রেখায় একটি কৌণিক বিন্দু থাকে। এই বিন্দুর বাম দিকে চাহিদা রেখা স্থিতিস্থাপক হয় এবং এর ডানদিকে চাহিদা রেখা বেশি অস্থিতিস্থাপক হয়। অতএব ওলিগোপলিতে একজন বিক্রেতার গড় আয় রেখা বা দ্রব্যের চাহিদা রেখা dKD′ রেখার মত কোণযুক্ত হতে পারে। K হল কৌণিক বিন্দু।

চাহিদা রেখা এইরকম ভাঙা হলে ফার্মের MR রেখাও অবিচ্ছিন্ন হবে না। এখানে চাহিদা রেখার দুটি অংশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দুটি MR রেখা হবে এবং তাদের মধ্যে একটি বিচ্ছিন্নতার সীমার (Range of discontinuity) থাকবে। আমাদের উপরের রেখাচিত্রে dK রেখার নীচে অঙ্কিত dE রেখা এবং KD′ রেখার নীচে অঙ্কিত FG রেখা হল ফার্মের দুটি MR রেখা। এদের মধ্যে EF পরিমাণে

বিচ্ছিন্নতা থাকবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে—dK এবং KD′ অংশে চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্যের জন্যই এই বিচ্ছিন্নতার উদ্ভব ঘটে এবং এই দুটি অংশের স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য যত বেশি বা কম হবে EF অংশের দৈর্ঘ্যও তত বেশি বা কম হবে।

অধ্যাপক সুইজির মতে এইরূপে কোণযুক্ত চাহিদা রেখাসম্পন্ন জোটবিহীন ওলিগোপলিতে একজন বিক্রেতা কৌণিক বিন্দু K-তে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করবে এবং ফার্মের প্রান্তিক ব্যয় বেশি বা কম যাই হোক না কেন—এই দাম অনড় বা অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকবে। আমাদের উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে ফার্মের MC=MR হয়েছে E বিন্দুতে। এর বামদিকে MC কম, MR বেশি এবং ডানদিকে MC বেশি। কাজেই MC=MR নামক ভারসাম্যের শর্তটি E বিন্দুতেই পালিত হবে। অতএব E হবে ফার্মের ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে উৎপাদন হবে OQ এবং দ্রব্যের দাম হবে OP.

এখন ফার্মের MC রেখা যদি নীচে নেমে MC′ রেখা হয়, তাহলেও দাম OP স্তরে স্থির থাকবে। অতএব EF নামক অংশে যে-কোন বিন্দুর মধ্য দিয়ে MC রেখা যাক না কেন (অর্থাৎ ফার্মের MC যত বেশি বা কম হোক না কেন), দ্রব্যের দাম OP স্তরে স্থির থাকবে। সুইজির মতে—কোণযুক্ত চাহিদা রেখার সাহায্যে ওলিগোপলি বাজারের একটি ফার্মের ভারসাম্য নির্ধারণ করা যায়। শুধু তাই নয় এর সাহায্যে ওলিগোপলি বাজারের দামের অনড় ভাবকেও ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রশ্নাবলী

১। একচেটিয়া কারবার কাকে বলে? একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। একচেটিয়া কারবার কাকে বলে? একচেটিয়া কারবারীর গড় ও প্রান্তিক আয় রেখার আকৃতি কেমন হয় আলোচনা কর।

৩। একচেটিয়া কারবারী কি ইচ্ছামত দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৪। একচেটিয়া কারবারী কীভাবে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে পারে, আলোচনা কর।

৫। একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ও তার শর্তগুলি আলোচনা কর।

৬। একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ক্রেতাদের চা[illegible] স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয় দেখাও।

৭। বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার কাকে বলে? বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবারী কীভাবে দাম নির্ধারণ করবে? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

৮। দাম স্বতন্ত্রীকরণ কাকে বলে? দাম স্বতন্ত্রীকরণ কখন সম্ভব? কখন লাভজনক এবং কখন কাম্য হতে পারে? যুক্তিসহ বোঝাও।

৯। অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা কাকে বলে? এইরূপ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য এবং তার শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১০। একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে কী বোঝায়? এই বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

১১। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার কাকে বলে? এই বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ও তার শর্ত সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১২। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারের সঙ্গে একচেটিয়া বাজার অপেক্ষা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মিল বেশী। এই উক্তিটি কি ঠিক? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

১৩। একচেটিয়া বাজার, পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার ও একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের তুলনা কর।

১৪। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজার এবং পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের তুলনা কর।

১৫। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে কী ধরনের প্রতিযোগিতা দেখা যায় এবং এর পরিণাম কী হয়?

১৬। দাম-প্রতিযোগিতা (Price-Competition) এবং দাম বহির্ভূত অন্তর্বিষয়ে প্রতিযোগিতার (Non-price Competition) মধ্যে পার্থক্য কর এবং এদের প্রক্রিয়া ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

১৭। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে ছোট দল ও বড় দলের অন্তর্ভুক্ত কোন ফার্মের ভারসাম্য কীভাবে অর্জিত হয় আলোচনা কর।

১৮। দ্বৈতাধিকার কাকে বলে? দুজন বিক্রেতা কীভাবে উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে, প্রতিক্রিয়া রেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

১৯। দ্বৈতাধিকারে দুজন বিক্রেতার আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য যে কুর্নো মডেল আছে তার পর্যালোচনা কর।

২০। অলিগোপলির ক্ষেত্রে কীভাবে দাম নির্ধারিত হয়?

২১। কোণযুক্ত চাহিদা রেখা (Kinky Demand Curve) কাকে বলে? কীভাবে চাহিদা রেখার উপর কোণের সৃষ্টি হয়?

২২। কোণযুক্ত চাহিদা রেখার সাহায্যে কীভাবে অলিগোপলির ক্ষেত্রে দামের অনমনীয়তা ব্যাখ্যা করা যায়?

---

১৩ | ফার্মের ক্রয়

ভূমিকা ঃ কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম দ্রব্য উৎপাদন করে ও বাজারে বিক্রয় করে। দ্রব্যের বাজারে ফার্ম হল বিক্রেতা। কিন্তু এই দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য তাকে নানারকমের উপাদান সংগ্রহ করতে কিংবা ক্রয় করতে হয়। ফার্ম হল উপাদানের বাজারের ক্রেতা। তাহলে দেখা যায়, যে ফার্ম দ্রব্যের বাজারে যায় বিক্রেতা হিসেবে; সেই ফার্মই আবার উপাদানের বাজারে যায় উপাদানের ক্রেতা হিসেবে। কিন্তু উপাদানের বাজারে বিক্রেতা কে? এর উত্তরে বলা যায়—দেশের পরিবারগুলিই হল উপাদানের বাজারের বিক্রেতা। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে আমরা যদি শ্রম, জমি, মূলধন বলি—তাহলে বুঝতে হবে পরিবারগুলিই উপাদানের বাজারে শ্রমের বিক্রেতা, জমি নামক উপাদানের সেবার বিক্রেতা, মূলধন সেবার বিক্রেতা ইত্যাদি। সে যাহোক দ্রব্যের উৎপাদক হিসেবে ফার্ম কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দ্রব্যের পরিমাণ জানা হলে কারিগরিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা বলতে পারবেন—সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য ফার্মকে কোন্ কোন্ উপাদানের কী পরিমাণ নিয়োগ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এটি সম্পূর্ণ কারিগরিক ব্যাপার (Purely technical matter)। ফার্মের মালিক সেই সব কারিগরিক ব্যাপার ও উৎপাদনের সম্ভাবনার কথা নিশ্চয়ই জানবেন। তারপর দেখবেন- তাঁর সামর্থ্য কতখানি। উপাদান নিয়োগ করার জন্য তাঁকে অর্থ ব্যয় করতে হবে। আবার উপাদানের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন করে সেই উৎপাদন বাজারে বিক্রি করে আয় পাওয়া যাবে। ফার্মের মালিককে এই আয়-ব্যয়ের দোটানার মধ্যে একটি কাম্য অবস্থায় থাকতে হবে। তিনি চাইবেন নির্দিষ্ট ব্যয়ে কীভাবে সর্বাধিক দ্রব্য উৎপাদন করা যায়, কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য কীভাবে সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপাদন করা যায়। ব্যাপারটি ক্রেতার ভারসাম্যের সঙ্গে তুলনীয়।

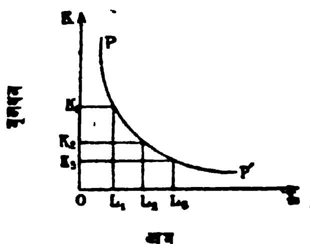
ক্রেতা যেমন নির্দিষ্ট আয় দিয়ে এমনভাবে দ্রব্য ক্রয় করে যাতে তার তৃপ্তি সর্বাধিক হয়, তেমনি ফার্মের মালিকও চান নির্দিষ্ট অর্থ ব্যয় করে এমনভাবে উপাদান ক্রয় করতে যাতে সেই উপাদানসমূহের নিয়োগ থেকে তাঁর উৎপাদন সর্বাধিক হয়। যেভাবে ভোগকারী ক্রেতার ভারসাম্য আলোচনা করা হয়, ঠিক সেইভাবেই উপাদান ক্রয়ের ক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্যের সমস্যার আলোচনা করা হয়। ভোগকারী ক্রেতার থাকে সমতৃপ্তি রেখা বা নিরপেক্ষতা রেখা ও বাজেট রেখা। ফার্মের থাকে সমোৎপাদন রেখা ও সমব্যয় রেখা। আমরা এখন এই সমোৎপাদন রেখা ও সমব্যয় রেখা সম্বন্ধে আলোচনা করব এবং তাদের সাহায্যে উৎপাদান ক্রয়ের ক্ষেত্রে ফার্ম কীভাবে ভারসাম্য লাভ করবে তার বিশ্লেষণ করব।

১৩.১ সমোৎপাদন রেখা ও তার বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) সমোৎপাদন রেখা কাকে বলে ?

কোন ফার্ম বিভিন্ন উপাদান নিয়োগ করে একটি দ্রব্য উৎপাদন করে। এখন যদি ধরা হয় যে—কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য দুটি মাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান, যেমন, শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হয়, তাহলে বিভিন্ন পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে ফার্ম কী পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে—তার কারিগরিক সম্ভাবনাগুলি ফার্মের উৎপাদন অপেক্ষকের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। ফার্মের এই উৎপাদন অপেক্ষকের একটি বিশেষ জ্যামিতিক রূপ হল সমোৎপাদন রেখা (Equal product curve)। শ্রম ও মূলধন—এই দুটি উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ধনাত্মক হলে যে-কোন একটি উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। দুটি উপাদানের মধ্যে একটির নিয়োগ বৃদ্ধি কর- এবং অপরটির নিয়োগ হ্রাস করে মোট উৎপাদন সমান রাখা যায়।

এইভাবে দুটি উপাদানের বিভিন্ন পরিমাণ থেকে একাধিক উপাদান সম্মিলন (Input combination) পাওয়া যায়, যাদের প্রত্যেকটিতে উৎপাদনের পরিমাণ সমান। এই সম্মিলনগুলির মধ্যদিয়ে একটি রেখা অঙ্কন করা হলে তার নাম হবে সমোৎপাদন রেখা। অতএব দুটি উপাদানের যে সব সম্মিলন থেকে কোন দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়, সেইসব সম্মিলনের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত রেখাকে সমোৎপাদন রেখা (Equal product curve) বলা হয়। ১৩.১নং রেখাচিত্রে PP′ হল একটি সমোৎপাদন রেখা। এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে শ্রম (L) ও উল্লম্ব অক্ষে মূলধন (K) পরিমাপ করা হচ্ছে। A, B ও C হল তিনটি বিন্দু। A বিন্দুতে শ্রমের পরিমাণ OL_1 ও মূলধনের পরিমাণ OK_1, B বিন্দুতে শ্রম $= OL_2$, মূলধন $= OK_2$, C বিন্দুতে শ্রম $= OL_3$, মূলধন $= OK_3$, A, B ও C—এই তিনটি বিন্দু একই সমোৎপাদন রেখার উপর অবস্থিত বলে এই তিনটি বিন্দুতে উৎপাদন সমান থাকবে। অর্থাৎ A বিন্দুতে OL_1 পরিমাণ শ্রম ও OK_1 পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে, B বিন্দুতে OL_2 পরিমাণ শ্রম ও OK_2 পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে সেই একই পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে B বিন্দুতে OL_2 শ্রম ও OK_2 মূলধনের সাহায্যে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে, C বিন্দুতে OL_3 শ্রম ও OK_3 পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা যাবে। অতএব সমোৎপাদন রেখার উপর অবস্থিত প্রত্যেকটি বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ সমান।



১৩.১ রেখাচিত্র : সমোৎপাদন রেখা

(খ) সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য

সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য ভোগ নিরপেক্ষতা রেখার মতই। নিরপেক্ষতা রেখা যেমন বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয় এবং রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়, সমোৎপাদন রেখাও তেমনি হয়। দুটি নিরপেক্ষতা রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না। সমোৎপাদন রেখা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। অতএব

(১) সমোৎপাদন রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়,

(২) রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়,

(৩) দুটি বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যক সমোৎপাদন রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না।

সমোৎপাদন রেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়, তার কারণ একটি উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কাজেই উৎপাদন সমান রাখার জন্য অন্য উপাদানটির নিয়োগ কমাতে হয়।

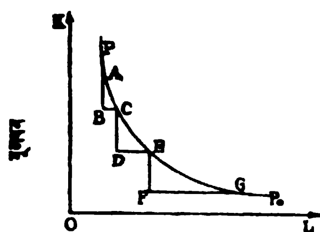
সমোৎপাদন রেখা যদি নিম্নমুখী না হয়, তাহলে হয় ঊর্ধ্বমুখী হবে, না হয় রেখাচিত্রের যে-কোন একটি অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হতে পারে। সমোৎপাদন রেখা ঊর্ধ্বমুখী হলে বুঝতে হবে—শ্রম ও মূলধন—এই দুটি উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও উৎপাদন সমান থাকে। যদি শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা শূন্য হয়, তাহলেই এমন হতে পারে। আমরা যদি ধরে নিই যে, শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ধনাত্মক, তাহলে সমোৎপাদন রেখা কখনই ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে না। আবার সমোৎপাদন রেখা যদি শ্রম-পরিমাপক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়, তাহলে বুঝতে হবে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা শূন্য। তা যদি না হয়, তাহলে সমোৎপাদন রেখাও শ্রম-অক্ষের সমান্তরাল হতে পারে না। অনুরূপভাবে—মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা যদি শূন্য না হয়, তাহলে সমোৎপাদন রেখা কখনই শ্রম-পরিমাপক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হতে পারবে না। অতএব সমোৎপাদন রেখা নিম্নমুখী হবে।

দুটি সমোৎপাদন রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না, যদি করে তাহলে সেই ছেদবিন্দুতে দুটি বিভিন্ন উৎপাদনের পরিমাণ সমান হয়ে যাবে। তা কখনই হতে পারে না। অতএব দুটি সমোৎপাদন রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না।

ক্রেতার নিরপেক্ষতা রেখার মতই সমোৎপাদন রেখাও রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়।

নিরপেক্ষতা রেখার ক্ষেত্রে ক্রেতা একটি দ্রব্যের ভোগ কমিয়ে তার পরিবর্তে তার বিকল্প হিসেবে অন্য দ্রব্যটির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারে। দুটি দ্রব্যের মধ্যে এরূপ পরিবর্তার হারকে প্রান্তিক পরিবর্তার হার বলা হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একজন মালিক একটি উপাদানের ব্যবহার কমিয়ে তার পরিবর্তে অন্য উপাদানটির ব্যবহার বা নিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারেন। শ্রমের পরিবর্তে মূলধন নিয়োগ করা যায়।

তেমনি যে কাজ যন্ত্রে হয় সেটি লোক দিয়ে করানো যায়। অতএব শ্রম ও মূলধন হল দুটি বিকল্প উপাদান। তবে সব দ্রব্যের উৎপাদনে এই বিকল্পতা সমান সুবিধা-জনকভাবে হয় না। এমন কোন দ্রব্য থাকতে পারে যার জন্য শ্রম ও মূলধন একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে নিযুক্ত হবে। এখানে পরিবর্তভার কোন সম্ভাবনা থাকবে না। আবার এমন কোন দ্রব্য থাকতে পারে যেখানে প্রথমে যত সহজে শ্রম ও মূলধনের পরিবর্তভা সম্ভব হয়, পরে আর তত সহজে হয় না। ফলে একটি উপাদানের সমান-সমান পরিমাণের পরিবর্তে অন্য উপাদানটির বেশি এবং আরো বেশি পরিমাণ ব্যবহার করতে হয়। এইভাবে সমোৎপাদন রেখা রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়। রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি বোঝান যায়। প্রদত্ত ১৩.২নং রেখাচিত্রে PP_0 হল একটি সমোৎপাদন রেখা। রেখাচিত্রে OX-অক্ষে শ্রম (L) ও OY-অক্ষে মূলধন (K) পরিমাপ করা হচ্ছে।



১৩.২ রেখাচিত্র : সমোৎপাদন রেখা

এখানে ধরা হচ্ছে যে, উৎপাদক বা ফার্মের মালিক মূলধনের পরিমাণ কমিয়ে তার পরিবর্তে শ্রমের ব্যবহার বাড়িয়ে উৎপাদন সমান রাখছেন। ধরলাম তিনি প্রত্যেকবার সমান সমান পরিমাণ মূলধন কমিয়ে দেন। প্রথমে AB, দ্বিতীয়বারে CD, তৃতীয়বারে EF পরিমাণ মূলধন কমিয়ে তার পরিবর্তে যথাক্রমে BC, DE এবং FG পরিমাণ অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করেন। এখানে $AB = CD = EF$

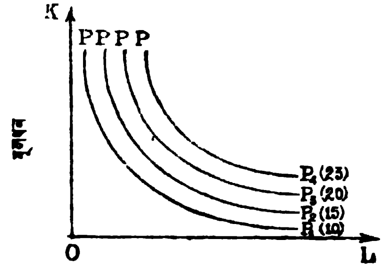
কিন্তু $BC < DE < FG$. কাজেই শ্রম ও মূলধনের প্রান্তিক কারিগরিক পরিবর্তভার হার (Marginal Rate of Technical Substituion বা MRTS) এখানে $\frac{AB}{BC}$ থেকে কমে $\frac{CD}{DE}$ এবং $\frac{CD}{DE}$ থেকে কমে $\frac{EF}{FG}$ হচ্ছে। এখানে MRTS ক্রম-হ্রাসমান হওয়ায় সমোৎপাদন রেখা PP_0 রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়েছে।

(গ) সমোৎপাদন মানচিত্র (Equal ProJuct Map)

দুটি উপাদানের অসংখ্য প্রকার সম্মিলন হতে পারে। এই সম্মিলনগুলির মধ্য দিয়ে আমরা অনেকগুলি সমোৎপাদন রেখা অঙ্কন করতে পারি। এখানে একটি সমোৎপাদন রেখার উপর অবস্থিত বিভিন্ন বিন্দুতে উৎপাদন সমান হবে, কিন্তু উচ্চতর সমোৎপাদন রেখায় উৎপাদন বেশি এবং নিম্নতর রেখায় উৎপাদন কম হবে। এইভাবে দুটি অক্ষরেখার মধ্যে আবদ্ধ স্থানে যে-সব সম্মিলন থাকবে—তাদের প্রত্যেকটির উৎপাদন সম্ভাবনা জানা যাবে। এখন সমস্ত সমোৎপাদন রেখা নিয়ে যে জ্যামিতিক চিত্রটি গড়ে উঠবে—তার নাম সমোৎপাদন মানচিত্র। দুটি উপাদানের সাহায্যে

উৎপাদন করলে উৎপাদনের যে-সব কারিগরিক সম্ভাবনা থাকবে—তারই জ্যামিতিক চিত্ররূপ হল সমোৎপাদন মানচিত্র। নীচে রেখাচিত্র দিয়ে এটি দেখানো হল।

এই রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে শ্রম (L) ও উল্লম্ব অক্ষে মূলধন (K) পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে PP_1, PP_2, PP_3 ইত্যাদি হল সমোৎপাদন রেখা। PP_1 রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুতে উৎপাদন ১০ একক, PP_2 রেখায় উৎপাদন ১৫ একক, PP_3 রেখায় ২০ একক ইত্যাদি। PP_1 রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুতে উৎপাদন সমান, কিন্তু PP_2 রেখায় উৎপাদনের পরিমাণ PP_1 রেখার চেয়ে বেশি। PP_3 রেখায় উৎপাদন PP_2 থেকে বেশি। এইভাবে সমোৎপাদন রেখা যত উঁচুতে থাকে, ততই তার উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হয়।



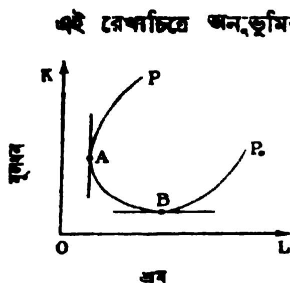
১৩.৩ রেখাচিত্র : সমোৎপাদন মানচিত্র

১৩.২. সমোৎপাদন রেখার কারিগরিক আকৃতি (Technical shape) ও অর্থনৈতিক আকৃতি (Economic shape) :

দুটি উপাদানের যে-সব সম্মিলন থেকে সমান পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়, সেই সব সম্মিলনকে যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায়—তাকে সমোৎপাদন রেখা বলা হয়। এই সমোৎপাদন রেখার আকৃতি দুরকম হতে পারে যথা—কারিগরিক আকৃতি ও অর্থনৈতিক আকৃতি।

দুটি উপাদানের যে সব সম্মিলন থেকে কারিগরিকভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়, সেই সব সম্মিলনকে যোগ করে যে সমোৎপাদন রেখা পাওয়া যায়—তাকে আমরা কোন দ্রব্য উৎপাদনের কারিগরিক সম্ভাবনা রেখা (Technical Possibility Curve) বলতে পারি। কারিগরিক দিক দিয়ে দেখলে বলা যায় কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য যদি দুটি উপাদান ব্যবহার করতে হয়, তাহলে সেই দুটি উপাদানকে বহুভাবে বিভিন্ন অনুপাতে নিয়োগ করা যায়। উপাদান দুটি যদি শ্রম (L) ও মূলধন (K) হয়, তাহলে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বাড়িয়ে-কমিয়ে, বহুভাবে তাদের নিয়োগ করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা কারিগরিক দিক দিয়ে সম্ভব হয়; এইভাবে শ্রম ও মূলধনের যেসব সম্মিলন থেকে সমান পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাদের যোগ করে সমোৎপাদন রেখা পাওয়া যায়। এই সমোৎপাদন রেখার আকৃতি উপবৃত্তের মত হয়। আমাদের নীচের রেখাচিত্রে PP_0 হল এরূপ একটি উপবৃত্তাকার (Elliptical) সমোৎপাদন রেখা।

এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে শ্রম (L) ও উল্লম্ব অক্ষে মূলধন (K) পরিমাপ করা হয়েছে। PP_0 রেখার উপর OK-অক্ষের সমান্তরাল করে একটি স্পর্শক আঁকা হয়েছে। এই স্পর্শকটি PP_0 রেখাকে A বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। অনুরূপভাবে OL-অক্ষের সমান্তরাল স্পর্শকটি PP_0 রেখাকে B বিন্দুতে স্পর্শ করে। AB হল সমোৎপাদন রেখাটির নিম্নমুখী অংশ। AP ও BP_0 অংশ দুটি উর্ধমুখী। সমোৎপাদন রেখার কারিগরিক আকৃতি বলতে উর্ধমুখী ও নিম্নমুখী সব অংশ ধরেই যে আকৃতি—তাকে বোঝায়। তাহলে আমরা পাই—সমোৎপাদন রেখার কারিগরিক আকৃতি হল উপবৃত্ত বা Ellipse-এর মত।



১৩.৪ রেখাচিত্র : সমোৎপাদন রেখার আকৃতি

উপবৃত্তাকার সমোৎপাদন রেখার উর্ধমুখী অংশে দুটি উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও উৎপাদন সমান থাকে। তাহলে বোঝা যায় যে, সমোৎপাদন রেখার উর্ধমুখী অংশে দুটি উপাদানেরই অপচয় হয়। যদি বলা হয় যে—একটি কাপড় তৈরি করতে এক একক শ্রম, এক একক মূলধন লাগে ; আবার দু একক শ্রম ও দু একক মূলধন দিয়েও একটি মাত্র কাপড় তৈরি করা যায়, তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমের এক একক ও মূলধনের এক একক উৎপাদনে নিযুক্ত হয়েও কোন উৎপাদন করছে না। অর্থাৎ শ্রম ও মূলধন নামক দুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদানের সদ্ব্যবহার করা হচ্ছে না। কিছুটা অপব্যবহারে অপচয়ে নষ্ট হচ্ছে। কোন হিসেবী উৎপাদক এমন করতে পারে না।

অর্থনীতিতে বলা হয়—কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সমান পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য দুটি উপাদানকে এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে তার উৎপাদনের ব্যয় সবচেয়ে কম হয়। উপাদানগুলির যোগান সীমিত, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। কাজেই অর্থ ব্যয় করে উপাদান ক্রয় করে কোন উৎপাদকই সেই উপাদানের অপচয় করতে পারে না। কাজেই কোন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মিতব্যয়ী উৎপাদক সমোৎপাদন রেখার উর্ধমুখী অংশে অবস্থিত উপাদান সম্মিলনগুলি ব্যবহার করবে না। মিতব্যয়িতার নীতি অনুসারে—উৎপাদক সমোৎপাদন রেখার কেবলমাত্র নিম্নমুখী অংশে অবস্থিত উপাদান সম্মিলনগুলির মধ্যে যে কোন একটি সম্মিলন গ্রহণ করবে। এই নিম্নমুখী অংশে একটি উপাদানের নিয়োগ বাড়লে অন্যটির নিয়োগ কমে। অর্থাৎ উপাদান দুটি এখানে পরিবর্ত বা বিকল্প উপাদান হিসেবে গণ্য হতে পারে।

সমোৎপাদন রেখাটি যদি আমাদের রেখাচিত্রে PP_0 রেখার মত হয়, তাহলে সেই রেখার নিম্নমুখী অংশ হবে AB. এই নিম্নমুখী অংশটি হবে সমোৎপাদন রেখার অর্থনৈতিক আকৃতি। অতএব আমরা বলতে পারি—সমোৎপাদন রেখার

অর্থনৈতিক আকৃতি হবে নিম্নমুখী রেখার মত। এই অংশে দুটি উপাদান হবে পরিবর্ত বা বিকল্প উপাদান এবং তাদের মধ্যে প্রান্তিক কারিগরিক পরিবর্ততার হার (MRTS) ক্রমহ্রাসমান হওয়ার সমোৎপাদন রেখাটি রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হবে।

১০.৩ পরিবর্তার প্রান্তরেখা (Ridge lines) ও পরিবর্তার ক্ষেত্র (Area of substitution) :

দুটি পরিবর্তনশীল উপাদানের সাহায্যে কোন দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হলে সেই দুটি উপাদানের যে-সব বিভিন্ন সম্মিলন থেকে কোন একটি দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করা যায় তাদের মধ্য দিয়ে অঙ্কিত রেখাকেই সমোৎপাদন রেখা বলা হয়। সমোৎপাদন রেখার দ্বারা উৎপাদনের-কারিগরিক সম্ভাবনা বোঝায়। কারিগরিক দিক থেকে দেখলে বলা যায়—সমোৎপাদন রেখা দেখতে উপবৃত্তের মত হয়। কোন একটি সমোৎপাদন রেখার দুটি উর্ধ্বমুখী অংশ এবং একটি নিম্নমুখী অংশ থাকে। উর্ধ্বমুখী অংশ দুটিতে উপাদান দুটির পরিমাণ বৃদ্ধি করলেও উৎপাদন সমান থাকে। কাজেই সমোৎপাদন রেখার উর্ধমুখী অংশে দুটি উপাদানেরই কিছুটা করে অপচয় হয়।

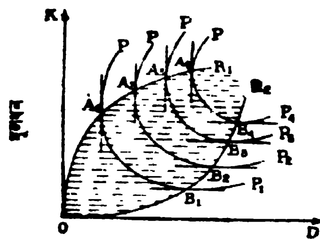
অন্যভাবে বলা যেতে পারে—সমোৎপাদন রেখার উর্ধ্বমুখী অংশে দুটি উপাদানের অপচয় হলেও তারা পরিপূরক উপাদান হিসেবে কাজ করে। উপাদান দুটি যদি শ্রম ও মূলধন হয়, তাহলে শ্রমের অপচয় হলে বুঝতে হবে অতিরিক্ত শ্রমিকদের সঙ্গে অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য বা যন্ত্রপাতিরও অব্যবহার হচ্ছে। কাজেই শ্রম ও মূলধনকে এখানে পরিপূরক উপাদান (Complementary factors) বলা যেতে পারে। কিন্তু সমোৎপাদন রেখার নিম্নমুখী অংশে দুটি উপাদান বিকল্প বা পরিবর্ত (Substitutes) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একটি উপাদানের নিয়োগ হ্রাস করলে অন্যটির নিয়োগ বৃদ্ধি করতে হয়। শ্রম ও মূলধনের ক্ষেত্রে বলা যায়—শ্রমের নিয়োগ হ্রাস করলে মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করতে হয়, কিংবা মূলধনের পরিমাণ হ্রাস করলে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করতে হয়। অতএব সমোৎপাদন রেখার নিম্নমুখী অংশে দুটি উপাদানের মধ্যে পরিবর্ততা চলে।

এখন একটি সমোৎপাদন রেখার নিম্নমুখী অংশটিকে তার উর্ধমুখী অংশ দুটি থেকে পৃথক করার জন্য সমোৎপাদন রেখার উপর দুটি স্পর্শক অঙ্কন করা হয়; এদের মধ্যে একটি স্পর্শক OX-অক্ষের এবং অপরটির OY-অক্ষের সমান্তরাল হয়। এই স্পর্শবিন্দু দুটির মধ্যবর্তী অংশটিই হয় সমোৎপাদন রেখার নিম্নমুখী অংশ যেখানে দুটি উপাদানের মধ্যে পরিবর্ততা চলে। একটি সমোৎপাদন মানচিত্রে যতগুলি সমোৎপাদন রেখা থাকবে তাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এইভাবে স্পর্শক অঙ্কন করে প্রত্যেকের নিম্নমুখী অংশ বার করা হয়। তাহলে প্রত্যেকটি সমোৎপাদন রেখার উপর দুটি করে স্পর্শবিন্দু থাকে। এই স্পর্শবিন্দুগুলির মধ্যে কতগুলি থাকে বাম দিকে এবং কতগুলি থাকে ডান দিকে। এখন বাম দিকের এবং ডান দিকের সব

স্পর্শবিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে দুটি রেখা অঙ্কন করা যায়। এই রেখা দুটিকেই পরিবর্ততার প্রান্তরেখা (Ridge lines) বলা হয়।

তাহলে আমরা বলতে পারি—**বিভিন্ন সমোৎপাদন রেখার নিম্নমুখীর অংশের প্রান্তবিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে যে রেখাদ্বয় অঙ্কিত হয় তাদেরকেই পরিবর্ততার প্রান্তরেখা বলা হয়।**

নীচের রেখাচিত্রে OR_1 ও OR_2 হল দুটি প্রান্তরেখা। এখানে PP_1, PP_2, PP_3 ও PP_4 হল চারটি সমোৎপাদন রেখা। A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3, A_4B_4 হল ওদের নিম্নমুখী অংশগুলি। সমোৎপাদন রেখাগুলির বামদিকে OY-অক্ষের সমান্তরাল করে যে স্পর্শকগুলি অঙ্কন করা হয়েছে তাদের স্পর্শবিন্দু A_1, A_2, A_3 ও A_4 বিন্দুর মধ্য দিয়ে OR_1 প্রান্তরেখা অঙ্কন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাম দিকের স্পর্শবিন্দু B_1, B_2, B_3, B_4-এর মধ্য দিয়ে অঙ্কিত হয়েছে OR_2 প্রান্ত রেখা। রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে A_1, A_2, A_3, A_4 বিন্দুগুলির বাম দিকে এবং B_1, B_2, B_3, B_4 বিন্দুগুলির ডানদিকে রয়েছে সমোৎপাদন রেখাগুলির উর্ধমুখী অংশগুলি। কিন্তু দুদিকের এই উর্ধমুখী অংশের মধ্যে থাকে নিম্নমুখী অংশ। উর্ধমুখী অংশগুলিকে যদি উঁচু ভূমির মত মনে করা হয়, তাহলে নিম্নমুখী অংশটি হবে উপত্যকার মত নীচু অংশ। অতএব প্রান্তরেখা দুটিকে সেই উপত্যকার দুদিকের সীমারেখা বলা যায়।



১০.৫ রেখাচিত্র: পরিবর্ততার প্রান্তরেখা (Ridge Lines)

পরিবর্ততার ক্ষেত্র (Area of substitution) **:** **সমোৎপাদন মানচিত্রে প্রান্তরেখা দুটির দ্বারা সীমাবদ্ধ অংশকে পরিবর্ততার ক্ষেত্র বলা যায়।** পরিবর্ততার ক্ষেত্রটি থাকে সমোৎপাদন রেখাগুলির নিম্নমুখী অংশে। এই অংশে দুটি উপাদানের মধ্যে একটির পরিমাণ হ্রাস করলে অন্য উপাদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়। কাজেই এই অংশে উপাদান দুটি পরস্পর বিকল্প হিসেবে কাজ করে। বলা যায়— এই অংশে দুটি উপাদানের মধ্যে যে পরিবর্ততা ঘটে সেই অংশকে পরিবর্ততার ক্ষেত্র বলা যাবে। আমাদের প্রদত্ত ১০.৫ নং রেখাচিত্রে OR_1 ও OR_2 রেখাদুটির মধ্যবর্তী ছায়াময় ক্ষেত্রটি (Shaded area) হল পরিবর্ততার ক্ষেত্র।

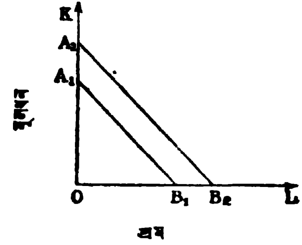
১০.৪ সমব্যয় রেখা (Iso Cost Line) :

উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম যে অর্থের সাহায্যে উপাদানের সেবার পরিমাণ ক্রয় করে সেই অর্থের পরিমাণ যদি স্থির বা নির্দিষ্ট থাকে এবং উপাদানগুলির প্রতি একক সেবার দাম যদি স্থির ও নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে সেই নির্দিষ্ট অর্থের সাহায্যে ফার্ম দুটি উপাদানের যে সব পরিমাণ সেবা ক্রয় করতে পারবে—সেই সব সম্মিলনের মধ্যে

দিয়ে অঙ্কিত রেখাকে সমব্যয় রেখা (Iso Cost Line) বলা হয়। এই রেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে উপাদান নিয়োগের জন্য ফার্মের মোট ব্যয় সমান থাকে বলেই এই রেখাকে সমব্যয় রেখা বলা হয়।

ধরা যাক, দুটি উপাদান হল শ্রম ও মূলধন। শ্রমের সেবার পরিমাণকে L এবং মূলধনের সেবার পরিমাণকে K দ্বারা সূচিত করা যেতে পারে।

ধরা যাক, w = মজুরীর হার = শ্রমের প্রতি একক শ্রম-সেবার দাম, r = সুদের হার = প্রতি একক মূলধন-সেবার দাম। এখন ফার্ম যদি L একক শ্রম-সেবা ও K একক মূলধন-সেবা ক্রয় করে, তাহলে শ্রমের জন্য মজুরী বাবদ ফার্মের ব্যয় হবে wL এবং মূলধনের জন্য সুদ বাবদ ফার্মের ব্যয় হবে rK, তাহলে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করার জন্য ফার্মের মোট ব্যয় হবে $wL+rK=M$. এখানে ধরা হচ্ছে যে, ফার্মের মালিক শ্রম ও মূলধনের জন্য M পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছেন। ফার্ম যদি কেবলমাত্র L একক শ্রম নিয়োগ করে এবং কোন মূলধন না ব্যবহার করে, তাহলে সেক্ষেত্রে



১৩.৬ রেখাচিত্র : সমব্যয় রেখা

$K=O$ হবে, কাজেই $rK=O$ হবে,

কাজেই $wL=M$ হবে।

$wL=M$ থেকে পাই $L=\frac{M}{w}$.

ধরা যাক, আমাদের রেখাচিত্রে $OB_1=\frac{M}{w}$. অনুরূপভাবে ফার্ম যদি কোন শ্রমিক নিয়োগ করতে না চায়, তাহলে $L=O$ হবে এবং $M=Kr$ হবে। কাজেই $K=\frac{M}{r}$ হবে। ধরা যাক, রেখাচিত্রে $OA_1=\frac{M}{r}$. এখন OK-অক্ষের A_1 বিন্দু এবং OL-অক্ষের B_1 বিন্দুকে একটি রেখার সাহায্যে যুক্ত করলে সমব্যয় রেখা পাওয়া যাবে। আমাদের রেখাচিত্রে A_1B_1 হল একটি সমব্যয় রেখা।

সমব্যয় রেখার ঢাল : সমব্যয় রেখা যদি একটি সরলরেখা হয় তাহলে তার ঢাল হবে তার লম্ব দূরত্ব ÷ অনুভূমিক দূরত্ব। উপরের রেখাচিত্রে A_1B_1 সমব্যয় রেখার ঢাল হবে $\frac{OA_1}{OB_1}$. আমরা জানি $OA_1=\frac{M}{r}$ এবং $OB_1=\frac{M}{w}$. অতএব A_1B_1 নামক সমব্যয় রেখার ঢাল হল

$$\frac{OA_1}{OB_1}=\frac{M}{r}\div\frac{M}{w}=\frac{M}{r}\times\frac{w}{M}=\frac{w}{r}=\frac{\text{মজুরীর হার}}{\text{সুদের হার}}$$

$$=\frac{\text{অনুভূমিক অক্ষে পরিমিত উপাদানের সেবার দাম।}}{\text{উল্লম্ব অক্ষে পরিমিত উপাদানের সেবার দাম।}}$$

কাজেই যদি মজুরীর হার ও সুদের হার স্থির থাকে, তাহলে $\frac{w}{r}$ স্থির থাকবে। অর্থাৎ w ও r স্থির থাকলে সমব্যয় রেখার ঢালের কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ সমব্যয় রেখাটি একটি সরলরেখা হবে।

উপাদানের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকলে কোন একটি ফার্ম তার একক চেষ্টায় উপাদানের দামকে প্রভাবিত করতে পারবে না। একটি ফার্মের কাছে উপাদানের দাম হবে নির্দিষ্ট। তাহলে আমরা বলতে পারি, **শ্রম ও মূলধনের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকলে মজুরীর হার ও সুদের হার যে-কোন একটি ফার্মের কাছে স্থির থাকবে, কাজেই সমব্যয় রেখা সরলরেখা হবে।**

১০.৫ ফার্ম কীভাবে দুটি উপাদানের সেবা ক্রয় করে ? (দুটি পরিবর্তনশীল উপাদানের নিয়োগের ক্ষেত্রে ফার্ম কীভাবে ভারসাম্য লাভ করে ?)

সাধারণত আমরা ধরে নিতে পারি যে, কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মের উদ্দেশ্য হল দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা। দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য আবার উৎপাদনের উপাদান চাই। উপাদানগুলির যোগান সীমাবদ্ধ এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা আছে। কাজেই উপাদানগুলির দাম থাকবে। ফার্ম যদি উপাদান নিয়োগ করতে চায় তাহলে তাকে উপাদানগুলির জন্য দাম দিতে হবে। এই দাম হল ফার্মের ব্যয়। ফার্ম যত বেশি উপাদান নিয়োগ করবে ততই তার ব্যয় বাড়বে। আবার ফার্ম উপাদান নিয়োগ করে দ্রব্য উৎপাদন করে। বেশি পরিমাণে উপাদান নিয়োগ করলে উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কাজেই সেই বর্ধিত উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করে ফার্মের রেভেনিউ বা আয়ও বৃদ্ধি পায়।

তাহলে উপাদানের নিয়োগের পরিমাণ বাড়লে একদিকে ফার্মের আয় বাড়ে, অন্যদিকে তেমনি ব্যয় বাড়ে। আবার উপাদানের নিয়োগ কমলে ফার্মের আয় কমে এবং ব্যয়ও কমে। ফার্মের মুনাফা হল আয় ও ব্যয়ের বিয়োগ ফল। অর্থাৎ মুনাফা = আয় − ব্যয়। যদি π = মুনাফা, R = আয় এবং C = ব্যয় ধরা হয়, তাহলে আমরা পাই, $\pi = R - C$. ফার্মের উদ্দেশ্য হল π-কে সর্বাধিক করা। ফার্ম এমনভাবে উপাদান নিয়োগ করবে এবং এমন পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করবে যাতে তার মুনাফা সর্বাধিক হয়। যে পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করলে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে, সেখানে ফার্ম উপাদানের নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য লাভ করবে। বাইরে থেকে কোন চাপ না এলে ফার্ম সেই অবস্থা থেকে বিচ্যুত হতে চাইবে না। ফার্মের মুনাফা $\pi = R - C$. এখানে R = ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় = ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ (Q) × প্রতি একক উৎপাদনের দাম P. অর্থাৎ R = PQ. আবার ফার্মের ব্যয় C = উপাদানের পরিমাণ × প্রতি একক উপাদানের দাম। ধরা যাক, বাজারে শ্রম (L) এবং মূলধন (K) নামে দুটি মাত্র উপাদান আছে। ধরা যাক, w = মজুরীর হার, r = মূলধনের জন্য সুদের হার। ফার্ম যদি w মজুরীর হারে L একক শ্রম

এবং r সুদের হারে K একক মূলধন নিয়োগ করে তাহলে উপাদান নিয়োগের জন্য ফার্মের মোট ব্যয় (C) হবে $wL+rK$. অর্থাৎ $C=wL+rK$.

তাহলে আমরা পাই, $\pi=R-C$.

এখন $R=PQ$ এবং $C=wL+rK$ বসিয়ে পাই, $\pi=PQ-(wL+rK)$

তাহলে ফার্মের মুনাফা নির্ভর করছে (১) দ্রব্যের পরিমাণ (Q), (২) দ্রব্যের দাম (P), (৩) শ্রমের পরিমাণ (L), (৪) শ্রমের মজুরীর হার (w), (৫) মূলধনের পরিমাণ (K) এবং (৬) মূলধনের সুদের হারের (r) উপর।

এখন দ্রব্যের ও উপাদানের বাজারে যদি পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকে তাহলে কোন একটি ফার্ম দ্রব্যের দাম (P) এবং উপাদানের সেবার দাম (w ও r) নির্ধারণ করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে P, w ও r-কে আমরা স্থির বলে ধরে নিতে পারব। অতএব পূর্ণপ্রতিয়োগিতামূলক ফার্মের কাছে দ্রব্যের পরিমাণ (Q) এবং উপাদানের পরিমাণ (L ও K) হল একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয় (Decision Variable) বা বিচার্য বিষয়। আবার দ্রব্যের পরিমাণ (Q) নির্ভর করে উপাদানের নিয়োগের পরিমাণের (L ও K) উপর। কাজেই উপাদানের নিয়োগই হল একমাত্র বিচার্য বিষয়। অতএব আমরা বলতে পারি ফার্মের উদ্দেশ্য হল সেই উপাদান সম্মিলন (Factor Combination) নির্বাচন করা যাতে তার মুনাফা সর্বাধিক হয়। এখন দেখা যাক, কীভাবে এই মুনাফা সর্বাধিক হতে পারে।

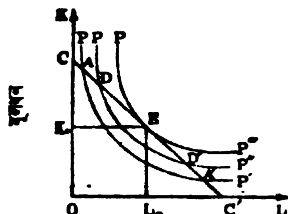
আমরা পেয়েছি $\pi=R-C$

অথবা $\pi=PQ-C$. এখন π বা মুনাফা সর্বাধিক হতে পারে দুভাবে (১) প্রথমত, যদি C স্থির থাকে তাহলে π সর্বাধিক হবে, যদি Q সর্বাধিক হয়,

কিংবা (২) দ্বিতীয়ত, যদি Q স্থির থাকে, তাহলে π সর্বাধিক হবে, যদি C সর্বনিম্ন হয়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এখানে ধরে নেব যে, ফার্মের ব্যয় স্থির আছে। তাহলে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে যদি ফার্মের উৎপাদন সর্বাধিক হয়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যয়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারলেই ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে। অন্যভাবে বলা যায়—ফার্মের মোট ব্যয় যদি নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে ফার্ম এমনভাবে উপাদান সম্মিলন নির্বাচন করবে যাতে তার উৎপাদন সবচেয়ে বেশি হয়। তাহলেই তার মুনাফা সর্বাধিক হবে।

ফার্মের ব্যয় নির্ণয় করা যায় তার সমব্যয় রেখার সাহায্যে। ফার্মের ব্যয় নির্দিষ্ট থাকলে একটি মাত্র সমব্যয় রেখা পাওয়া যায়। ধরা যাক, পর-পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রের CC' রেখাটি হল একটি নির্দিষ্ট সমব্যয় রেখা। এই সমব্যয় রেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে ফার্মের ব্যয় সমান, কিন্তু উৎপাদনের কারিগরিক সম্ভাবনা বিভিন্ন।

এই সম্ভাবনাগুলি জানতে হলে এই রেখাচিত্রের মধ্যে ফার্মের সমোৎপাদন মানচিত্র অঙ্কন করতে হবে। ১০.৭নং রেখাচিত্রে তাই করা হয়েছে। এখানে PP′, PP″, PP‴ ইত্যাদি হল বিভিন্ন সমোৎপাদন রেখা। আমরা জানি উচ্চতর সমোৎপাদন রেখায় উৎপাদন বেশি হয় এবং নিম্নতর রেখায় কম হয়। মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য ফার্ম নির্দিষ্ট ব্যয়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে চাইবে। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়, ফার্ম নির্দিষ্ট সমব্যয় রেখার উপর থেকে সবচেয়ে উঁচু সমোৎপাদন রেখায় উৎপাদন করবে। আমাদের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে, ফার্মের সমব্যয় রেখা CC′ সমোৎপাদন রেখা PP′-কে A ও A′ বিন্দুতে PP″-কে D ও D′ বিন্দুতে ছেদ করেছে এবং সবচেয়ে উঁচু সমোৎপাদন রেখা PP‴-কে E বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। অতএব E হল ফার্মের ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে দেখা যাচ্ছে ফার্ম যদি OL_0 পরিমাণ শ্রম ও OK_0 পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে তাহলে তার মুনাফা সর্বাধিক হবে। E বিন্দুর ডানদিকে কিংবা বাম দিকে ফার্মের ব্যয় সমান থাকবে, কিন্তু উৎপাদন কমে যাবে। অতএব বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ফার্মের মালিক E বিন্দুর বামদিকে বা ডানদিকে কোন উপাদান সম্মিলন ক্রয় করবেন না। অর্থাৎ তিনি E বিন্দুতেই ভারসাম্য লাভ করবেন।



১০.৭ রেখাচিত্র : উপাদান নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য

এই ভারসাম্যের শর্ত :

এই ভারসাম্যের শর্ত দুটি। প্রথমত, বাজেট রেখা ও সমোৎপাদন রেখা পরস্পরকে স্পর্শ করবে, অর্থাৎ স্পর্শবিন্দুতে বাজেট রেখার ঢাল $\left(\frac{w}{r} = \frac{\text{মজুরীর হার}}{\text{সুদের হার}}\right)$ ও সমোৎপাদন রেখার ঢাল (MRTS = দুটি উপাদানের প্রান্তিক কারিগরিক পরিবর্তনের হার) সমান হবে। অর্থাৎ $\frac{w}{r} = MRTS_{LK}$ হবে। দ্বিতীয়ত, সমোৎপাদন রেখা রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল (Convex) হবে। এখানে প্রথম শর্তটির কথা আর একটু বিস্তৃতভাবে বলা যেতে পারে। আমরা জানি, সমব্যয় রেখার ঢাল হল $\frac{w}{r}$ = মজুরীর হার / সুদের হার। আবার সমোৎপাদন রেখার ঢাল হল $MRTS = \frac{\Delta K}{\Delta L}$ = শ্রমের নিয়োগের পরিবর্তন / মূলধনের নিয়োগের পরিবর্তন। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি অনুযায়ী শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে (ΔL), শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন (MP_L) কমবে। অর্থাৎ ΔL ও MP_L-এর বিপরীত সম্পর্ক

আছে। আমরা পাই $\Delta L = \frac{1}{MP_L}$. অনুরূপভাবে $\Delta K = 1/M_K$. তাহলে সমোৎপাদন রেখার ঢাল $= \Delta K \div \Delta L = \frac{1}{MP_K} \div \frac{1}{MP_L} = \frac{MP_L}{MP_K}$ = শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন / মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন। তাহলে সমব্যয় রেখা ও সমোৎপাদন রেখার স্পর্শবিন্দুতে $\frac{w}{r} = \frac{MP_L}{MP_K}$ হবে। অর্থাৎ $\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$ হবে।

অর্থাৎ ফার্মের মালিক দুটি পরিবর্তনশীল উপাদান শ্রম (L) ও মূলধন (K) এমন পরিমাণে নিয়োগ করবেন যাতে তিনি প্রত্যেকটি উপাদান থেকে সমান পরিমাণ প্রান্তিক উৎপাদন (অর্থের হিসেবে) পেতে পারেন। এটি হল ভারসাম্যের প্রথম শর্তের অর্থ। দ্বিতীয় শর্ত মতে সমোৎপাদন রেখা রেখাচিত্রের মূল বিন্দুর দিকে উত্তল হবে। কোন উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনবিধি দেখা দিলেই এই শর্ত পালিত হবে।

১৩.৬ সর্বনিম্ন সম্মিলন (Least Cost Combination):

কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য ফার্ম বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন সম্মিলন নিয়োগ করতে পারে। এই সম্মিলনগুলির ব্যয় বিভিন্ন হতে পারে। তাদের মধ্যে যে সম্মিলনটির জন্য ফার্মের ব্যয় সবচেয়ে কম হবে তাকেই বলা হয় সর্বনিম্নব্যয় সম্মিলন। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা শ্রম (L) ও মূলধন (K) নামক দুটি মাত্র উপাদানের কথা ধরতে পারি। তাহলে L ও K-এর বিভিন্ন পরিমাণকে এক একটি সম্মিলন বলা যাবে। এই সম্মিলনগুলির জন্য ফার্মের ব্যয় বিভিন্ন হবে। তাদের মধ্যে যে সম্মিলনটিতে শ্রমের মজুরি ও মূলধনের সুদ বাবদ ফার্মের মোটব্যয় সবচেয়ে কম হবে সেই সম্মিলনটিকেই সর্বনিম্নব্যয়ের সম্মিলন বলা যেতে পারে। অতএব—

যে উপাদান সম্মিলন থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ফার্মের মোট ব্যয় সবচেয়ে কম হয় তাকেই সর্বনিম্নব্যয় সম্মিলন বলা হয়।

আমার যদি ধরে নিই যে, ফার্মের উদ্দেশ্য হল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা, তাহলে দ্রব্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য সবচেয়ে কম ব্যয়ে উৎপাদন করতে পারলেই ফার্মের পক্ষে সবচেয়ে বেশি মুনাফা লাভ করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ সর্বনিম্নব্যয় সম্মিলন থেকে প্রাপ্ত উৎপাদনই হল সর্বাধিক মুনাফাসম্পন্ন উৎপাদন (The least cost output is the best profit output)। নিম্নলিখিতভাবে এটা দেখানো যায়:

ধরা যাক π = মুনাফা,
P = দ্রব্যের দাম,
Q = দ্রব্যের পরিমাণ,
R = বিক্রয়লব্ধ আয়,
C = উৎপাদনের ব্যয়,

তাহলে $\pi = R - C$ হবে। এখানে $R = PQ$. ফার্মটি যদি পূর্ণপ্রতিযোগিতা-মূলক ফার্ম হয়, তাহলে ফার্মের পক্ষে দ্রব্যের দাম বা P-এর কোন পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে R নির্ভর করবে Q-এর উপর। তাহলে আমরা পাই—

$$\pi = Q - C$$

Q ও C উভয়েই উপাদানের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে। অর্থাৎ $Q = Q(L, K)$ এবং $C = C(L, K)$ হবে। তাহলে আমরা পাই $\pi = Q(L, K) - C(L, K)$।

এখন Q যদি নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে π সর্বাধিক হবে, যদি C সবচেয়ে কম হয়। অর্থাৎ উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকলে ব্যয়ের পরিমাণ যত কমবে মুনাফাও তত্ই বাড়বে, যেখানে ব্যয় সবচেয়ে কম হবে সেখানেই মুনাফা সর্বাধিক হবে। পাশের রেখাচিত্রের সাহায্যে এটা দেখানো হল। এখানে উৎপাদনের পরিমাণ নির্দিষ্ট বলে ধরা হয়েছে। কাজেই আমরা একটি মাত্র সমোৎপাদন রেখা পাব। আমাদের রেখাচিত্রে এই রেখাটি হল PP_0.

১৩.৮ রেখাচিত্র : সর্বনিম্নব্যয় সম্মিলন

এখানে CC_0, CC_1, CC_2, CC_3 হল সমব্যয় রেখা। আমরা জানি উচ্চতর সমব্যয় রেখায় ফার্মের ব্যয় বেশী হয়, নিম্নতর রেখায় কম হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ব্যয়ের দিক দিয়ে বিচার করলে $CC_3 > CC_2 > CC_1 > CC_0$. রেখাচিত্রে আরো দেখা যাচ্ছে যে, CC_0 রেখা PP_0 রেখাকে E বিন্দুতে স্পর্শ করেছে। CC_1 রেখা PP_0 রেখাকে A_1 ও B_1 বিন্দুতে, CC_2 রেখা PP_0-কে A_2 ও B_2 বিন্দুতে এবং CC_3 রেখা PP_0 রেখাকে A_3 ও B_3 বিন্দুতে ছেদ করেছে। A_1, B_1, A_2, B_2 ইত্যাদি ছেদবিন্দুগুলিতে ফার্মের উৎপাদন সমান, কিন্তু ব্যয় বেশি। কিন্তু E বিন্দুতে উৎপাদন সমান অথচ ব্যয় সবচেয়ে কম। অর্থাৎ PP_0 সমোৎপাদন রেখায় যে পরিমান উৎপাদন সূচিত করে সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য সর্বনিম্ন-ব্যয় হবে কেবল মাত্র E বিন্দুতে। অতএব E সর্বনিম্নব্যয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্যের বিন্দু। E বিন্দুতে ফার্মটি OL_0 পরিমাণ শ্রম ও OK_0 পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করবে। অন্যভাবে বলা যায়, ফার্মটি যদি PP_0 রেখার উপর কোন বিন্দুতে দ্রব্য উৎপাদন করে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করতে চায় তাহলে তাকে OL_0 পরিমাণ শ্রম এবং OK_0 পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করতে হবে।

অতএব OL_0 পরিমাণ শ্রম ও OK_0 পরিমাণ মূলধনের সম্মিলনই হল সর্বনিম্ন-ব্যয়বিশিষ্ট উপাদান সম্মিলন বা সংক্ষেপে সর্বনিম্নব্যয় সম্মিলন

১০.৭ (ক) ফার্মের সম্প্রসারণ পথ (Expansion path of the firm) :

ফার্ম যদি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চায় তাহলে তাকে নিম্নতর সমোৎপাদন রেখা থেকে উচ্চতর সমোৎপাদন রেখায় যেতে হবে ; এর জন্য তাকে উপাদান দুটির নিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। যেমন, আগে ফার্মটি যদি 100 একক দ্রব্য উৎপাদন করত এবং তার জন্য যদি 10 একক শ্রম ও 15 একক মূলধন নিয়োগ করত এবং এখন যদি ফার্মটি 200 একক উৎপাদন করতে চায়, তাহলে তাকে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হতে পারে।

কিন্তু ফার্ম যদি শ্রম ও মূলধন—এই দুটি উপাদানেরই নিয়োগ বৃদ্ধি করে এবং তার উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি করে, তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ফার্মের আয়তন সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সম্প্রসারণের জন্য ফার্ম যে পথ ধরে চলে তাকে সম্প্রসারণ পথ বলা হয়।

এখানে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি পাবে, তার ফলে ফার্মের ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে। ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফার্মের সমব্যয় রেখাও সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যাবে এবং ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুও উপরের উচ্চতর সমোৎপাদন রেখায় সরে যাবে। এইভাবে যতবার ব্যয় বাড়বে, ততবার ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু উচ্চতর সমোৎপাদন রেখায় সরে যাবে।

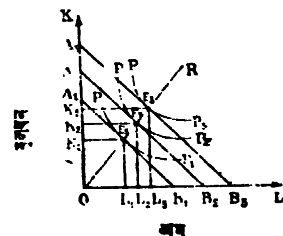
এখন আমরা যদি ফার্মের এই ভারসাম্য বিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে একটি রেখা অঙ্কন করি তাহলে সেই রেখাটিই হল ফার্মের সম্প্রসারণ পথ। একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল।

এই রেখাচিত্রে PP_1, PP_2, PP_3 ইত্যাদি রেখাগুলি হল ফার্মের সমোৎপাদন রেখা।

A_1B_1, A_2B_2, A_3B_3 হল ফার্মের সমব্যয় রেখা।

E_1, E_2, E_3 ইত্যাদি হল যথাক্রমে ফার্মের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ভারসাম্য বিন্দু। E_1 বিন্দুতে ফার্ম OL_1 পরিমাণ শ্রম ও OK_1 পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে।

অনুরূপভাবে, E_2 ও E_3 বিন্দুতে ফার্মটি যথাক্রমে OL_2 পরিমাণ শ্রম, OK_2 পরিমাণ মূলধন এবং OL_3 পরিমাণ শ্রম ও OK_3 পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করে। এই বিন্দুগুলির মধ্যে দিয়ে OR রেখা অঙ্কিত হয়েছে। এখানে OR হল ফার্মের সম্প্রসারণ পথ।



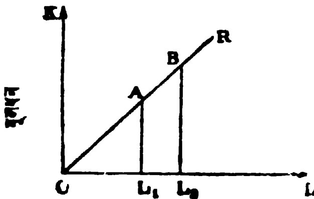
১০.৯ রেখাচিত্র : ফার্মের সম্প্রসারণ পথ

ফার্মের সম্প্রসারণ পথ সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে—(১) এটি ফার্মের আয়তন বৃদ্ধির সঞ্চারপথ, (২) এটি একটি দীর্ঘকালীন ব্যাপার, কারণ কেবলমাত্র দীর্ঘকালেই ফার্ম তার আয়তনের পরিবর্তন

করতে পারে, (৩) সম্প্রসারণ পথ-রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুই হল উপাদান নিয়োগের ক্ষেত্রে ও দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু, (৪) সম্প্রসারণ পথ রেখাচিত্রের মূল বিন্দু থেকে শুরু হয়ে উপরের দিকে বা উত্তর-পূর্ব দিকে প্রসারিত হয়।

(খ) ফার্মের সম্প্রসারণ পথের আকৃতি ঃ

সম্প্রসারণ পথ সরলরৈখিক অথবা বক্ররৈখিক হতে পারে। সরলরৈখিক সম্প্রসারণ পথের ক্ষেত্রে দুটি উপাদানের অনুপাত (Factor Proportion) স্থির থাকে। কিন্তু বক্ররৈখিক সম্প্রসারণ পথের ক্ষেত্রে এই অনুপাত স্থির থাকে না ; একবিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে এই অনুপাত পৃথক হয়ে যায়।



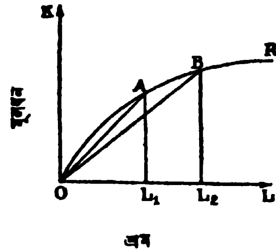
১৩.১০ রেখাচিত্র : সরলরৈখিক সম্প্রসারণ পথ

আমাদের ১৩.১০নং রেখাচিত্রে OR হল একটি সরলরৈখিক সম্প্রসারণ পথ। এর উপর যদি A নামক একটি বিন্দু নেওয়া যায়, তাহলে A বিন্দুতে শ্রম $= OL_1$ এবং মূলধন $= AL_1$ হবে। তাহলে A বিন্দুতে মূলধনের ও শ্রমের অনুপাত $\left(\frac{K}{L}\right) = \frac{AL_1}{OL_1} =$ OA রেখার ঢাল। আবার OR রেখার উপর আর একটি বিন্দু B নিলে B বিন্দুতে শ্রম $= OL_2$, মূলধন $= BL_2$. অতএব B বিন্দুতে মূলধন ও শ্রমের অনুপাত $\left(\frac{K}{L}\right)$ হবে $\frac{BL_2}{OL_2}$ = OB রেখার ঢাল। এখন A ও B বিন্দু দুটি একই সরলরেখার উপর অবস্থিত বলে OA রেখার ঢাল ও OB রেখার ঢাল সমান হবে। তাহলে আমরা পাই **সরলরৈখিক সম্প্রসারণ পথের সব বিন্দুতে দুটি উপাদানের অনুপাত সমান থাকে।**

সরলরৈখিক সম্প্রসারণ পথের উপর উপাদান দুটির অনুপাত সমান থাকে, কিন্তু বাম দিক থেকে ডান দিকে উৎপাদন বেশি হয়। কোন ফার্মে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ যদি সমান হারে বৃদ্ধি করা হয় তাহলে শ্রম ও মূলধনের অনুপাত স্থির থাকবে। যেমন—ফার্ম যদি 100 টাকার শ্রম ও 1,000 টাকার মূলধন বিনিয়োগ করে তাহলে শ্রম ও মূলধনের অনুপাত হবে $\frac{100}{1000} = \frac{1}{10}$. এখন ফার্ম যদি 200 টাকার শ্রম ও 2000 টাকার মূলধন নিয়োগ করে তাহলে শ্রম ও মূলধনের অনুপাত হবে $\frac{200}{2000} = \frac{1}{10}$ অর্থাৎ শ্রম ও মূলধন নামক দুটি উপাদানের নিয়োগকে যদি একসঙ্গে সমান হারে বৃদ্ধি (বা হ্রাস) করা যায়, তাহলে শ্রম ও মূলধনের অনুপাত সমান থাকবে। শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ একসঙ্গে সমান হারে পরিবর্তিত হলে মোট উৎপাদনের পরিমাণও সমান হারে পরিবর্তিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে উৎপাদনের

ব্যাপারে আয়তন বৃদ্ধির জন্য সমহারে প্রতিদানের নিয়ম (Law of Constant Returns to Scale) কার্যকরী হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি—**সম্প্রসারণ পথ সরলরৈখিক হলে দুটি উপাদানের অনুপাত সমান থাকে এবং ফার্মের আয়তন-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমহারে প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হয়।**

ফার্মের সম্প্রসারণ পথ যদি বক্ররৈখিক হয়, তাহলে উপাদান দুটির অনুপাত সমান থাকে না। আমাদের ১৩.১১ নং রেখাচিত্রে OR হল ফার্মের সম্প্রসারণ পথ। এর উপর A বিন্দুতে শ্রম $= OL_1$ এবং মূলধন $= AL_1$. অতএব $\frac{\text{মূলধন}}{\text{শ্রম}} = \frac{AL_1}{OL_1} =$ OA রেখার ঢাল। অনুরূপভাবে B বিন্দুতে এই অনুপাত হল OB রেখার ঢাল। যেহেতু OB রেখার ঢাল OA রেখার ঢাল অপেক্ষা কম, অতএব B বিন্দুতে মূলধন ও শ্রমের অনুপাত A বিন্দুর তুলনায় কম।



১৩.১১ রেখাচিত্র : বক্ররৈখিক সম্প্রসারণ পথ

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, ফার্মের সম্প্রসারণ পথ সরলরৈখিক অথবা বক্ররৈখিক হতে পারে। ফার্মের সম্প্রসারণ পথ সরলরৈখিক হলে উপাদানের অনুপাত স্থির থাকে, কিন্তু সম্প্রসারণ পথ বক্ররৈখিক হলে উপাদান অনুপাত পরিবর্তনশীল হয়। **উপাদান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমহারে প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী না হলেই সম্প্রসারণ পথ বক্ররৈখিক হয়।**

প্রশ্নাবলী

১। সমোৎপাদন রেখা কাকে বলে? সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা কর।

২। সমোৎপাদন মানচিত্র কাকে বলে? এটি কী দেখায়? সমোৎপাদন রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

৩। সমব্যয় রেখা কাকে বলে? সমব্যয় রেখার ঢালের অর্থ কী? কখন ও কীভাবে এই রেখার অবস্থানের পরিবর্তন হয় আলোচনা কর।

৪। সর্বনিম্নব্যয় সম্মিলন বলতে কী বোঝায়? ফার্ম কীভাবে এই সম্মিলন নির্বাচন করে?

৫। দুটি উপাদান নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ফার্ম কীভাবে ভারসাম্য লাভ করে রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝাও। এই ভারসাম্যের শর্ত কী?

৬। সর্বনিম্ন ব্যয়ে কীভাবে ফার্ম দ্রব্য উৎপাদন করে রেখাচিত্রের সাহায্যে আলোচনা কর।

৭। সর্বনিম্নব্যয়বিশিষ্ট উৎপাদন হল সর্বাধিক মুনাফা সম্পন্ন উৎপাদন—ব্যাখ্যা কর।

৮। সম্প্রসারণ পথ কাকে বলে? এর আকৃতি আলোচনা কর।

৯। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) সংজ্ঞা দাও : (১) সমোৎপাদন রেখা; (২) দুটি উপাদানের প্রান্তিক কারিগরি পরিবর্তার হার; (৩) সমব্যয় রেখা; (৪) সমব্যয় রেখার ঢাল; (৫) সমোৎপাদন রেখার

আয়তক্ষেত্রিক আকৃতি ও অর্ধবৃত্তিক আকৃতি; (৬) পরিবর্তনের প্রান্তরেখা (Ridge Lines); (৭) পরিবর্তনের ক্ষেত্র (Area of substitution); (৮) সর্বনিম্ন ব্যয়বিশিষ্ট উপাদান সম্মিলন; (৯) সম্প্রসারণ পথ; (১০) সমহার প্রতিদানের নিয়ম।

(ঘ) সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(১) উৎপাদকের সমোৎপাদন রেখা ও ভোগকারীর নিরপেক্ষতা রেখার মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়?

(২) সমোৎপাদন রেখা কেন রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল হয়?

(৩) সমোৎপাদন রেখার আকৃতি কখন নিম্নমুখী হয়?

(৪) কার্যের মালিক সমোৎপাদন রেখার ঊর্ধ্বমুখী অংশের উপাদান সম্মিলনগুলি গ্রহণ করেন কি? যুক্তিসহ বোঝাও।

(৫) সম্প্রসারণ পথ কখন সরলরৈখিক হয় এবং কখন হয় না?

(৬) দুটি উপাদান নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যের মালিক কীভাবে দুটি উপাদানের উপর তাঁর ব্যয় বণ্টন করেন?

(৭) কার্যের মুনাফা কখন সর্বাধিক হয়?

---

১৪ বণ্টনতত্ত্ব

ভূমিকা ঃ ফার্মের মালিক বিভিন্ন উপাদান নিয়োগ করে তাদের সাহায্যে যে দ্রব্য উৎপাদন করেন সেই দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য পাঠানো হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ ফার্মের আয় হিসেবে ফার্মে ফিরে আসে। এরপর মালিক সেই আয়কে উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন উপাদানের মালিকদের মধ্যে ভাগ করে দেন। কীভাবে এই ভাগ করা হবে—সেটা নির্ণয় করা এবং সেই নীতি অনুযায়ী বণ্টন করাই হল বণ্টনতত্ত্বের মূল সমস্যা।

উৎপাদনের কাজে যে সব উপাদান অংশ গ্রহণ করে তাদের শ্রম, মূলধন, জমি ও সংগঠন বা উদ্যোগ—এই চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। মানুষের শারীরিক ও মানসিক শক্তির ও বুদ্ধির প্রয়োগকে শ্রম বলা হয়। যাঁরা শারীরিক শক্তি ও সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করে কাজ করেন, তাঁদের অদক্ষ শ্রমিক বলা হয়। অদক্ষ শ্রমিকেরা মজুরী পান। যাঁরা কোন বিশেষ দক্ষতার অধিকারী তাঁদের দক্ষ শ্রমিক বলা হয়। তাঁরা বেতন পান। তাহলে মজুরী ও বেতন হল শ্রম নামক উৎপাদন উপাদানের পাওনা। বণ্টনতত্ত্বে মজুরী সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। একে আমরা মজুরীতত্ত্ব বলতে পারি।

শ্রম ছাড়াও উৎপাদনে মূলধন ব্যবহৃত হয়। মূলধন হল মানুষের তৈরি উৎপাদনের উপকরণ। এর মধ্যে পড়ে যন্ত্রপাতি, কারখানা ঘর, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ইত্যাদি। এইসব মূলধন দ্রব্যের নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। একে বিনিয়োগ বলা হয়। বিনিয়োগ আসে সঞ্চয় থেকে। কোন ব্যক্তি বা পরিবার তার উদ্বৃত্ত আয় ব্যাঙ্কে জমা রাখে। ব্যাঙ্ক থেকে বিনিয়োগকারীরা সেই আয় সংগ্রহ করে; একে মূলধন ঋণ বলা হয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হলে তার জন্য যে দাম দিতে হয় তাকে সুদের হার বলা হয়। বণ্টনতত্ত্বে ঠিক করা হয় সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হবে। সুদের হার নির্ধারিত হলে—মূলধন নামক উপাদানের পাওনা কত হবে সেটি বোঝা যায়। অতএব সুদের হার নির্ধারণ পদ্ধতির আলোচনা বণ্টনতত্ত্বের আর একটি অংশ।

শ্রম ও মূলধন ছাড়াও উৎপাদনের কাজে জমি ব্যবহৃত হয়। জমি হল মূলত একটি প্রাকৃতিক সম্পদ—যা উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যার যোগান সীমিত। কৃষি জমি, কারখানার জমি, মাটির নীচের খনিজ সম্পদ, বন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে জমি বলা হয়। যে ব্যক্তি বা পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান এই জমি নামক সম্পদ অধিকার করে থাকে তাদের জমির মালিক বলা হয়। জমির মালিক জমির উপর তাঁর মালিকানা সাময়িক পরিত্যাগ করেন এবং তারজন্য পুরস্কার

পান। এর নাম খাজনা। বণ্টনতত্ত্বের মধ্যে খাজনা নির্ধারণতত্ত্ব একটি আলোচ্য ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শ্রম, মূলধন ও জমি নামক উপাদানের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন করে ফার্ম যে অর্থ পায় তাকে বিক্রয়লব্ধ আয় বা শুধু আয় বলা হয়। এই আয় থেকে ফার্মের মালিক শ্রমিকদের মজুরী দেন, মূলধনের মালিকদের সুদ দেন, জমির মালিকদের দেন খাজনা। তারপর নিজে নেন মুনাফা। মুনাফা হল উদ্যোক্তা হিসেবে মালিকের পাওনা। বণ্টনতত্ত্বে আলোচনা করা হয় মোট আয়ের মধ্যে শ্রমিকেরা কত মজুরী পাবেন, মূলধনের মালিকেরা কত সুদ পাবেন, জমির মালিক বা মালিকেরা কত খাজনা পাবেন এবং ফার্মের মালিক কত মুনাফা পাবেন।

১৪.১ প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন (MPP) ; প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য (VMP), এবং প্রান্তিক আয় উৎপাদন (MRP)-এর সংজ্ঞা ও পার্থক্য :

বণ্টনতত্ত্বের মূল কাজ হল উৎপন্ন দ্রব্য বা তার মূল্যকে উপাদানগুলির মধ্যে ন্যায্যভাবে ভাগ করে দেওয়া। ন্যায্যভাবে ভাগ করা বলতে বোঝায় প্রত্যেক উপাদানকে তার অবদান অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া। কোন উপাদানের অবদান জানার উপায় হল সেই উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপ করা। কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাকে তিন ভাবে পরিমাপ করা যায়। এই পরিমাপগুলি হল প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন (Marginal Physical Product বা MPP), প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য (Value of Marginal Product বা VMP) এবং প্রান্তিক আয় উৎপাদন (Marginal Revenue Product বা MRP). বণ্টনতত্ত্বে এই শব্দগুলির বহুল ব্যবহার হয়। কাজেই এদের সংজ্ঞা ও পার্থক্য জানা প্রয়োজন।

(ক) প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন (MPP) : কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন একটি উপাদানের নিয়োগ সামান্য বৃদ্ধি করলে এবং অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ ও উৎপাদনের অন্যান্য অবস্থার কোন পরিবর্তন না হলে সেই উৎপাদন ক্ষেত্রে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাকেই বলা হয় সেই পরিবর্তনশীল উপাদানের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন। ধরা যাক আমরা শ্রম (L) নামক উপাদানের কথা আলোচনা করছি। তাহলে শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন হবে $MPP_L = \frac{\Delta P}{\Delta L}$

এখানে ΔP = উৎপাদনের সামান্য পরিবর্তন (বৃদ্ধি), এখানে ΔL = কেবলমাত্র শ্রম নিয়োগের সামান্য বৃদ্ধি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, শ্রমিকেরা যে দ্রব্য উৎপাদন করে সেই উৎপন্ন দ্রব্যের আকারে শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন পরিমাপ করা হয়। যেমন কোন কাপড়ের মিলে শ্রমিকদের MPP পরিমাপ করা হবে কাপড়ের হিসেবে। লোহার কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিকদের MPP পরিমাপ করা হবে লোহার পরিমাণ দ্বারা ইত্যাদি। উৎপন্ন দ্রব্যের হিসেবে MPP পরিমাপ করা হয় বলেই একে বস্তুগত বা বাস্তব উৎপাদন বলা হয়।

বস্তুগতভাবে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপ করার প্রধান অসুবিধা হল এই যে, এর দ্বারা বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের বা অন্যান্য উপাদানের MPP বিভিন্ন দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশিত হওয়ায় তাদের মধ্যে তুলনা করা যায় না। তাছাড়া বাস্তব ক্ষেত্রে উপাদানের অবদান দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশ করার রীতি নেই। এই অসুবিধাগুলির জন্য উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অর্থের হিসেবে প্রকাশিত হয়। অর্থের হিসেবে প্রকাশিত প্রান্তিক উৎপাদন দুরকমের হতে পারে, যথা - প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য (VMP) এবং প্রান্তিক আয় উৎপাদন (MRP).

(খ) প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য (VMP) : কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য হল সেই উপাদানের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের বিক্রয় মূল্য। অর্থাৎ কোন উপাদানের MPPকে সেই দ্রব্যের বাজার দাম (P) দ্বারা গুণ করলে VMP পাওয়া যায়। আমরা বলতে পারি $VMP_L = P_x \cdot MPP_L$ এখানে P_x হল X-দ্রব্যের দাম এবং MPP_L হল X-দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশিত শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন।

(গ) প্রান্তিক আয় উৎপাদন (MRP) : কোন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে সেই দ্রব্য বিক্রয় করে যে আয় পায় তাকে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় (Total Reveune) বলা হয়। অন্য সব উপাদান স্থির রেখে কোন একটি উপাদানের নিয়োগ সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করলে ফার্মের মোট উৎপাদন এবং সেই সঙ্গে মোট আয় বৃদ্ধি পাবে। কোন উপাদানের নিয়োগ সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করে ফার্মের মোট আয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাকে সেই উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপাদন (MRP) বলা হয়। যদি শ্রম নামক উপাদানের কথা ধরা হয়, তাহলে

$$MRP_L = \frac{\delta}{\delta L}(R) \quad \text{যখানে } R = \text{মোট বিক্রয়লব্ধ আয়.}$$

এবং $\frac{\delta}{\delta L}(R)$ হল শ্রম-নিয়োগের সামান্য বৃদ্ধির ফলে R-এর পরিবর্তন।

কোন ফার্ম বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করলে [illegible] সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধি পায়। ফলে দ্রব্যের দাম কমে যায়। সেক্ষেত্রে মোট [illegible] দুরকম পরিবর্তন হবে। প্রথমত, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মোট আয় বাড়[illegible] এবং দাম কমার জন্য মোট আয় কমবে। কাজেই মোট আয় বাড়বে, কি [illegible] কি করবে—সেটা নির্ভর করছে উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ [illegible] হার এবং [illegible] পরিমাণ ও হারের উপর। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, MRP [illegible] VMP [illegible] হবে। কারণ VMP হল প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য, MPP-কে [illegible] (P) দ্বারা গুণ করে VMP পাওয়া যায়। কিন্তু MRP হিসেব করার সময় [illegible] হবে যে, দ্রব্যের দাম (P) ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কাজেই MRP < VM[illegible]। অবশ্য যেখানে একজন বা কয়েকজন মাত্র বিক্রেতা থাকে সেখানেই [illegible] উৎপাদন বাড়ে, তার ফলে বাজারের সামগ্রিক যোগান বাড়ে এবং [illegible] কমে যায়। কিন্তু

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক দ্রব্যের বাজারে অসংখ্য বিক্রেতা থাকায় একজন বিক্রেতার যোগান বাড়লেও মোট যোগান বিশেষ বাড়ে না। কাজেই সে দিক দিয়ে দাম কমে যাওয়ার কোন কারণ ঘটে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের MRP = VMP হয়। কিন্তু দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা থাকলেই MRP এবং VMP পৃথক হয়।*

এখন আমরা MPP, VMP ও MRP-র মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। (১) MPP প্রকাশিত হয় দ্রব্যের হিসেবে। কিন্তু MRP বা VMP প্রকাশিত হয় অর্থের হিসেবে। (২) MPP দ্বারা বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত উপাদানগুলির উৎপাদন ক্ষমতার তুলনা করা যায় না, MRP ও VMP দ্বারা তুলনা করা যায়। (৩) MPP বৃদ্ধি পেলে বোঝা যায় উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতার প্রকৃত বৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু MRP বা VMP-র বৃদ্ধি দেখে সে রকম অনুমান করা হলে সেই অনুমান সত্য হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। কারণ উপাদানের বাস্তব উৎপাদন ক্ষমতা স্থির থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটলেও MRP বা VMP বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু তার দ্বারা উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতার প্রকৃত বৃদ্ধি সূচিত হবে না। (৪) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে MRP = VMP হয়। কিন্তু অন্য বাজারে MRP ও VMP সমান হয় না।

---

* আমরা অঙ্কের সাহায্যে এটি দেখাতে পারি।

ধরা যাক Q = উৎপাদনের মোট পরিমাণ, P = দাম, তাহলে

$$MPP_L = \frac{dQ}{dL} \text{ এবং } VMP_L = P.\frac{dQ}{dL}$$

ধরা যাক R = মোট আয়, অতএব আমরা পাই R = PQ

$$\frac{dR}{dL} = P.\frac{dQ}{dL} + Q.\frac{dP}{dL}$$

Q বাড়লে যদি P কমে তাহলে $\frac{dP}{dQ} < O$ হবে।

সেক্ষেত্রে $\frac{dR}{dL} = P\frac{dQ}{dL} + Q\frac{dP}{dQ}\cdot\frac{dQ}{dL} < P.\frac{dQ}{dL}$.

অর্থাৎ $MRP_L < VMP_L$.

কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে $\frac{dP}{dQ} = O$. উৎপাদন বাড়লেও দামের কোন পরিবর্তন হয় না।

কাজেই পূর্ণ প্রতিযোগিতায় $\frac{dR}{dL} = P.\frac{dQ}{dL}$

অর্থাৎ $MRP_L = VMP_L$.

১৪.২ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ত্ব :

কোন দ্রব্যের উৎপাদনে কয়েকটি উপাদান অংশ গ্রহণ করে। এই উপাদানগুলি হল শ্রম, মূলধন, জমি এবং উদ্যোগ বা সংগঠন। কার্মের মধ্যে যে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার মধ্যে শ্রমের, মূলধনের, জমির এবং উদ্যোগের অবদান থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কোন্ উপাদানের অবদান কতখানি তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন। অথচ অবদান অনুসারে প্রত্যেক উপাদানকে পারিশ্রমিক না দিলে চলে না। যে উপাদানের অবদান বেশি তাকে কম দেওয়া এবং যার অবদান কম তাকে বেশি দেওয়া – দুটোই অন্যায়। আবার সব উপাদানকে সমান দেওয়াও চলে না, কারণ যেখানে বিভিন্ন উপাদানের অবদান বিভিন্ন সেখানে সাম্যের নীতি ন্যায়-নীতি নয়। বণ্টনের ব্যাপারে যদি ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে প্রত্যেকটি উপাদানকে তার নিজস্ব অবদানের সমান পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। এজন্য প্রত্যেক উপাদানের অবদান পরিমাপ করা চাই।

কোন উপাদানের অবদান পরিমাপ করার কোন সর্বজনগ্রাহ্য ও সন্তোষজনক উপায় নেই। তবে এর মধ্যে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ত্বটি যথেষ্ট আলোকপাত করে। এই তত্ত্বটির মতে কোন উপাদানের অবদান তার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা পরিমাপ করা যায়। কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য অন্য উপাদানগুলির পরিমাণ স্থির রেখে সেই উপাদানটির নিয়োগ সামান্য বৃদ্ধি করতে হয়। তার ফলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাকেই আমরা সেই উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বলতে পারি। ধরি, কোন প্রতিষ্ঠানে ১০ জন শ্রমিক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন, জমি ইত্যাদি উপাদান নিয়োগ করে ১০০ একক দ্রব্য পাওয়া যায়। এখন অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ স্থির রেখে ১১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে যদি ১০৭ একক দ্রব্য পাওয়া যায় তাহলে একাদশতম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৭ একক দ্রব্য।

আমরা যদি ধরে নিই যে, সব শ্রমিকের যোগ্যতা সমান তাহলে যে-কোন শ্রমিক একাদশতম শ্রমিকের স্থানে নিযুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হবে ৭ একক দ্রব্য। তাহলে ১০ জন শ্রমিক মোট ৭০ একক দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। ১০০ একক দ্রব্যের মধ্যে ৭০ একক দ্রব্য শ্রমিকদের পরিশ্রমের ফল, বাকি ৩০ একক দ্রব্য অন্য উপাদানগুলির অবদান। এখন যদি প্রত্যেক শ্রমিককে ৭ একক করে মজুরী দেওয়া হয় তাহলে তা ন্যায়সম্মত হবে। অতএব প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ত্ব অনুসারে—শ্রমিকের মজুরী = শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন হবে।

শুধু শ্রমিক নয়, যে-কোন উপাদানের পারিশ্রমিক সেই উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হবে।

অর্থাৎ শ্রমের মজুরী = শ্রমিকের অবদান = শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন,
মূলধনের সুদ = মূলধনের অবদান = মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন,
জমির খাজনা = জমির অবদান = জমির প্রান্তিক উৎপাদন,

এবং উদ্যোক্তার মুনাফা = উদ্যোক্তার অবদান = উদ্যোক্তার প্রান্তিক উৎপাদন।

এখানে প্রান্তিক উৎপাদনকে দ্রব্যের আকারে ধরা হয়েছে। একে প্রান্তিক বস্তুগত বা বাস্তব উৎপাদন (Marginal Physical Product বা MPP) বলা হয়। আবার অর্থের হিসেবেও প্রান্তিক উৎপাদনকে পরিমাপ করা যেতে পারে। ফার্ম যে দ্রব্য উৎপাদন করে সেই দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করে যে অর্থ বা আয় পেয়ে থাকে তাকে আয়-উৎপাদন (Revenue Product) বলা হয়। অন্যান্য উপাদান স্থির রেখে শ্রমের নিয়োগ সামান্য বৃদ্ধি করে যে পরিমাণ অতিরিক্ত আয়-উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে সেই উপাদানের প্রান্তিক আয়-উৎপাদন (Marginal Revenue Product বা MRP) বলা হয়। পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ফার্মের MR = AR = P = দাম। কাজেই প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনকে P দ্বারা গুণ করলে MRP পাওয়া যাবে। MRP = P. MPP যদি W = শ্রমের আর্থিক মজুরী হয়, তাহলে আমরা বলতে পারি শ্রমিকের আর্থিক মজুরী শ্রমিকের প্রান্তিক আয় উৎপাদনের সমান হবে, অর্থাৎ W = MRP = P MPP হবে। এখানে W = P.MPP.

অতএব $\frac{W}{P}$ = MPP. (উভয়পক্ষকে P দ্বারা ভাগ করে)

এখানে P হল দ্রব্যের দাম। $\frac{W}{P}$ হল $\frac{\text{আর্থিক মজুরী}}{\text{দ্রব্যের দাম}}$ = সেই দ্রব্যের আকারে শ্রমিকের মজুরী। একে বস্তুগত বা বাস্তব মজুরী বলা হয়। বাস্তব মজুরী বলতে আর্থিক মজুরীর ক্রয়ক্ষমতা বোঝায়। যেমন, শ্রমিকের মজুরী যদি ৬০০ টাকা হয় এবং চালের দাম যদি ৩০০ টাকা কুইণ্টাল হয়, তবে ৬০০ টাকা আর্থিক মজুরী = ২ কুইণ্টাল চাল। এটি হল চালের হিসেবে শ্রমিকের বস্তুগত মজুরী। বাস্তব মজুরী দ্রব্যের আকারে প্রকাশিত হয়। শ্রমিক যে প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত থাকেন, সেই প্রতিষ্ঠান যে দ্রব্য উৎপাদন করে, সেই দ্রব্যের হিসেবে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপ করলে আমরা পাই শ্রমিকের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন। শ্রমিকের বাস্তব মজুরী $\left(\frac{W}{P}\right)$ শ্রমিকের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের সমান।

অনুরূপভাবে অন্য উপাদানের বস্তুগত বা বাস্তব পারিশ্রমিক সেই উপাদানের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনের সমান হয়। বাস্তব সুদ হয় মূলধনের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের সমান। বাস্তব খাজনা জমির প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনের সমান, ইত্যাদি। অতএব প্রান্তিক উৎপাদনের তত্ত্বটি সব উপাদানের ক্ষেত্রে একই নীতি প্রয়োগ করে। এইজন্য এই তত্ত্বটিকে আমরা বণ্টনতত্ত্বের সাধারণ সমাধান হিসেবে ধরে নিতে পারি।

প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে, কোন উপাদানকে পারিশ্রমিক বা মজুরী দেওয়া উচিত তার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী। কোন উপাদানকে যদি এর চেয়ে কম দেওয়া হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাকে শোষণ করা হচ্ছে। যেমন,

কোন শ্রমিক যদি কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে ১০ একক দ্রব্য উৎপাদন করেন, তাহলে তাঁর পাওনা হবে ১০ একক। কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি তাঁকে ৮ একক মজুরী দেওয়া হয়, তাহলে বুঝতে হবে শ্রমিক ২ একক কম পাচ্ছেন। মালিক শ্রমিককে ২ একক দ্রব্যের পরিমাণে শোষণ করছেন। এটাই মালিকের মুনাফা বা অতিরিক্ত লাভ। মালিক যদি শ্রমিককে তাঁর প্রান্তিক উৎপাদন অনুযায়ী মজুরী দিয়ে দেন, তাহলে তাঁর কোন অতিরিক্ত মুনাফা থাকবে না। অতিরিক্ত মুনাফা না থাকলে কে উৎপাদন চালাবে ?

কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বটিতে বলা হয় যে—মালিক যদি শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে মজুরী দেন, তাহলেই মালিকের মুনাফা সর্বাধিক হবে। তিনি যদি কম দেন, তাহলে মুনাফা সর্বাধিক হবে না, আবার তিনি যদি বেশি দেন, তাহলে তাঁর ক্ষতি হবে। অর্থাৎ শ্রমিককে তাঁর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী মজুরী দিলেই মুনাফা সর্বাধিক হবে এবং মালিক যদি সর্বাধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হন, তাহলে তিনি অবশ্যই শ্রমিককে তাঁর প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরী দেবেন।

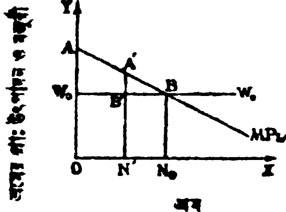
আপাতদৃষ্টিতে এটি অসম্ভব মনে হলেও এর রহস্য লুকিয়ে আছে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির মধ্যে। এই বিধিমতে—যে উপাদানের নিয়োগ বাড়ে (অন্য উপাদানগুলি স্থির) সেই উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে আসে। তাই কোন উপাদানের আগের দিকের এককগুলির প্রান্তিক উৎপাদন পরের দিকের এককগুলির প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হয়। এখন সব একককে পরের দিকের এককের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরী দিলে তাদের কম দেওয়া হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে এটি বোঝান যায়। ধরি, প্রথম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ১০ একক, দ্বিতীয় শ্রমিকের ৮ একক, তৃতীয়ের ৬ একক, চতুর্থের ৪ একক এবং পঞ্চমের ২ একক। মোট ৫ জন শ্রমিক থেকে মোট উৎপাদন আসছে ১০ + ৮ + ৬ + ৪ + ২ = ৩০ একক। এখন মজুরী = পঞ্চম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন = ২ একক। সব শ্রমিককে পঞ্চম শ্রমিকের সমান ধরে নিলে এবং সকলকে ২ একক করে মজুরী দিলে মোট মজুরী লাগে ৫ ২ = ১০ একক। মালিকের মুনাফা = ৩০ − ১০ = ২০ একক। মজুরীর হার যদি ২ একক হয়, তাহলে তিনি পাঁচজন শ্রমিক নিয়োগ করবেন এবং পাঁচজন শ্রমিককেই পঞ্চম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরী দেবেন এবং এতেই তাঁর মুনাফা সর্বাধিক হবে। আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখাতে পারি। ১৪.১নং রেখাচিত্রে OX অক্ষে শ্রমের নিয়োগ, OY অক্ষে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ও বাস্তব মজুরীর হার পরিমাপ করা হয়েছে।

এখানে MP_L হল শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন রেখা।

W_0W_L হল মজুরী রেখা। উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকায় কোন একটি ফার্ম মজুরীর হারকে পরিবর্তন করতে পারবে না, নির্দিষ্ট মজুরীতে যে-কোন পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করতে পারবে, তাই মজুরী রেখাটি শ্রম অক্ষের সমান্তরাল হবে।

এখানে W_0W_0 রেখা MP_L রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করেছে। B বিন্দুতে বাস্তব মজুরীর হার = শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন হয়েছে। ফার্ম ON_0 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে।

এখানে মজুরীর হার = OW_0. নিয়োগ = ON_0. অতএব ON_0 সংখ্যক শ্রমিকদের জন্য লাগবে $OW_0 \times ON_0 = OW_0BN_0$. কিন্তু ফার্মের মালিক ON_0 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করে মোট উৎপাদন পাবেন $OABN_0$. এর থেকে OW_0BN_0 বাদ দিলে মালিকের মুনাফা থাকবে AW_0B নামক ত্রিভুজটি। এটিই সর্বাধিক মুনাফা। তিনি যদি ON_0 অপেক্ষা কম শ্রম নিয়োগ করতেন, তাহলে মুনাফা এর চেয়ে কম হত। যেমন তিনি যদি ON' পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করতেন এবং প্রত্যেক শ্রমিককে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে কম মজুরী দিতেন, তাহলে তাঁর মুনাফা কমে গিয়ে হত $W_0AA'B'$ নামক ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রটি। অতএব ফার্মের স্বার্থেই শ্রমিকদের মজুরী শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান হওয়া উচিত। এটিই হল প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বের মূল বক্তব্য এবং এই বক্তব্যটি শ্রম ছাড়া অন্যান্য উপাদান সম্বন্ধেও সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। তাহলে প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বটির বক্তব্য হল যে --



১৪.১ রেখাচিত্র : শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও মজুরীর হার

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক উপাদানের বাজারে যে-কোন উপাদানের বস্তুগত পারিশ্রমিক সেই উপাদানের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনের সমান হবে। এর ফলে উপাদানের মালিকেরা ন্যায্য পাওনা পাবেন এবং উপাদানের নিয়োগকারীর মুনাফাও সর্বাধিক হবে।

১৪.৩. প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্বের সমালোচনা

প্রথমেই বলা উচিত যে, প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বটির মত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খুবই কম আছে। এর আগে বণ্টনের যে সব তত্ত্ব ছিল সেগুলি কোন উপাদানের পারিশ্রমিককে সেই উৎপাদনের অবদানের সঙ্গে যুক্ত করত না। শ্রমিকের মজুরী সেখানে নির্ধারিত হত মালিকের ইচ্ছার দ্বারা (মজুরী তহবিল তত্ত্ব), কিংবা শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়ের দ্বারা ও তাদের সন্তান জন্মদানের ইচ্ছার দ্বারা (ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব)। কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্বে এই প্রথম উপাদানের মজুরীকে তার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করা হল।

কিন্তু এই তত্ত্বের ত্রুটি হল যে, এটি অনেক অবাস্তব অনুধারণার আশ্রয় নেয়। এই তত্ত্বে প্রথমেই ধরে নেওয়া হয় যে, প্রত্যেকটি উপাদান সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য, যার ফলে একটি উপাদানের নিয়োগ সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু বাস্তবে অনেক উপাদানের বিভাজ্যতা থাকে না, থাকলেও সে বিভাজ্যতা সম্পূর্ণ নয়। এই সব উপাদানের ক্ষেত্রে তত্ত্বটি প্রযোজ্য হবে না।

দ্বিতীয়ত, কোন দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানগুলিকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে নিযুক্ত করতে হতে পারে। যেমন, জল উৎপাদনের জন্য হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনকে H_2O—এই অনুপাতে রাখতে হয়। এখানে হাইড্রোজেনকে স্থির রেখে অক্সিজেনকে বৃদ্ধি করলে কোন অতিরিক্ত জল হবে না। অর্থনীতিতেও এরকম উৎপাদন অপেক্ষক থাকতে পারে যেখানে একটি উপকরণকে বেশি পরিমাণে নিয়োগ করলে অন্য উপাদানগুলিকেও সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করতে হয়। নাহলে কোন অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে কোন উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন নির্ণয় করা যাবে না।

তৃতীয়ত, মিসেস রবিনসনের মতে উপাদানের পারিশ্রমিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর যেমন নির্ভর করে, তেমনি উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতাও তার পারিশ্রমিকের উপর নির্ভর করে। যে শ্রমিক ভালো মজুরী পান, ভালোভাবে খেতে, পরতে, থাকতে পান, ভালো শিক্ষা পান তাঁর উৎপাদন ক্ষমতা যে দরিদ্র শ্রমিকের চেয়ে বেশি হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও পারিশ্রমিক পরস্পরের উপর নির্ভর করে।

চতুর্থত, প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্বটি প্রত্যেকটি উপাদানের বিভিন্ন এককগুলিকে সমান বা সমজাতীয় বলে গণ্য করে। কিন্তু একই উপাদানের বিভিন্ন এককের মধ্যে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির পার্থক্য থাকতে পারে।

পঞ্চমত, প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় কার্যকরী হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় না।

কাজেই এই তত্ত্বটিকে খুব বেশি তাত্ত্বিক এবং খুব কম বাস্তব তত্ত্ব বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। বণ্টনতত্ত্বের মূল সমস্যা কী? কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করা হয়?

২। প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্বের সাহায্যে কীভাবে বণ্টন সমস্যার সমাধান করা হয়? এই তত্ত্বের ত্রুটিগুলি উল্লেখ কর।

৩। প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্বটির পর্যালোচনা কর।

৪। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) মূলধন কী? মূলধনের আয়ের নাম কী?

(খ) সুদ কাকে বলে?

(গ) খাজনা কী? খাজনা কেন দেওয়া হয়?

(ঘ) প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন ও প্রান্তিক আয় উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য কর।

(ঙ) প্রান্তিক ও গড় আয় উৎপাদন কাকে বলে? ওদের সম্পর্ক কেমন?

(চ) শ্রমের বাস্তব মজুরী কি শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের সমান হয়? যুক্তি দিয়ে বোঝাও

১৫.১ (ক) **মজুরী কাকে বলে?** শ্রম নামক উপাদানের সেবাকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করার জন্য শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাকেই মজুরী বলা হয়। শ্রম দৈহিক এবং মানসিক শ্রম হতে পারে। অদক্ষ শ্রমের পারিশ্রমিককে মজুরী বলা হয়। দক্ষ শ্রমিকের মজুরীকে বেতন বলা হয়। কিন্তু এটি লৌকিক শব্দ ব্যবহার মাত্র।

(খ) **আর্থিক মজুরী ও বাস্তব মজুরীর সংজ্ঞা ও পার্থক্য:** কোন শ্রমিক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অর্থের হিসেবে যে মজুরী বা বেতন পেয়ে থাকেন তাকে আর্থিক মজুরী বলা হয়। বর্তমানে প্রায় সব শ্রমিকেরা অর্থের হিসেবে মজুরী পেয়ে থাকেন।

বাস্তব বা বস্তুগত মজুরী: শ্রমিক তার কর্মস্থল থেকে যদি কোন দ্রব্যের আকারে তাঁর মজুরী পেয়ে থাকেন তবে সেই দ্রব্যের পরিমাণকে শ্রমিকের বাস্তব বা বস্তুগত মজুরী বলা হয়। আমাদের গ্রামেগঞ্জে-কৃষি খামারে যে সব কৃষি শ্রমিক কাজ করেন তাঁরা এখনো দিন শেষে ধান বা চাল, মুড়ি, তেল, তামাক প্রভৃতির হিসেবে তাঁদের মজুরী পান। কিন্তু যেখানে শ্রমিক অর্থের হিসেবে মজুরী পান সেখানে সেই আর্থিক মজুরীকে কোন একটি দ্রব্যের আকারে প্রকাশ করা যায়। যেমন, কোন শ্রমিকের আর্থিক মজুরী যদি ১০০০ টাকা হয় এবং চালের দাম যদি ২০০ টাকা কুইন্টাল হয়, তাহলে চালের হিসেবে তাঁর বস্তুগত মজুরী হবে ৫ কুইন্টাল চাল। এখানে বস্তুগত মজুরী হল ১০০০ টাকার আর্থিক মজুরীর ক্রয় ক্ষমতা।

তাহলে আমরা বলতে পারি—শ্রমিক তাঁর আর্থিক মজুরী দিয়ে বাজার থেকে প্রচলিত দামে যে সব দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারেন, সেইসব দ্রব্য ও সেবার মোট পরিমাণকে শ্রমিকের বাস্তব মজুরী বলা হয়। এখানে বাস্তব মজুরী = আর্থিক মজুরীর ক্রয় ক্ষমতা। আবার শ্রমিক তাঁর কর্মস্থল থেকে নানারূপ সুযোগ-সুবিধা (যেমন বিনাভাড়ার বাড়ি, আলো, জল, জ্বালানি, চিকিৎসার সুযোগ ইত্যাদি) পেতে পারেন। এইসব সুযোগ-সুবিধাকেও বাস্তব মজুরীর মধ্যে ধরতে হয়। তাহলে শ্রমিকের বাস্তব মজুরী = আর্থিক মজুরীর ক্রয় ক্ষমতা + অন্যান্য প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। যদি W = আর্থিক মজুরী, P = দামস্তর এবং K = অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হয় তাহলে বাস্তব মজুরী হবে $\frac{W}{P}+K$. যদি $K=O$ হয়, তাহলে বাস্তব মজুরী $=\frac{W}{P}$ হবে।

(গ) **আর্থিক মজুরী ও বস্তুগত মজুরীর পার্থক্য:**

আর্থিক ও বস্তুগত বা বাস্তব মজুরীর মধ্যে পরপৃষ্ঠায় বর্ণিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে:

১। আর্থিক মজুরী অর্থের হিসেবে প্রকাশিত হয়, কিন্তু বাস্তব মজুরী প্রকাশিত হয় দ্রব্য বা সেবার হিসেবে।

২। আর্থিক মজুরী নির্ভর করে প্রাপ্য অর্থের পরিমাণের উপর। কিন্তু বস্তুগত মজুরী হল আর্থিক মজুরীর ক্রয় ক্ষমতা। কাজেই বাস্তব মজুরী নির্ভর করে—

(ক) আর্থিক মজুরী (W) এবং (খ) দামস্তরের (P) উপর। যদি W বাড়ে, P স্থির থাকে, তাহলে বাস্তব মজুরী $\left(\frac{W}{P}\right)$ বাড়বে। যদি W কমে, P স্থির থাকে তাহলে $\frac{W}{P}$ কমবে। যদি W স্থির থাকে, কিন্তু P বাড়ে বা কমে, তাহলে $\frac{W}{P}$—যথাক্রমে কমবে বা বাড়বে। আবার যদি W এবং P একই হারে বাড়ে বা কমে, তাহলে $\frac{W}{P}$ স্থির থাকবে।

৩। শ্রমিকের বাস্তব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আর্থিক মজুরী অপেক্ষা বাস্তব মজুরীর দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। যদি বাস্তব মজুরী বৃদ্ধি পায়, তাহলেই শ্রমিকের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হবে। কিন্তু শ্রমিকের আর্থিক মজুরী বৃদ্ধি পেলেই যে তাঁর বাস্তব অবস্থার উন্নতি হবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

(খ) বাস্তব মজুরী কীভাবে নির্ধারিত হয়: শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Wages)

শ্রমিকদের বাস্তব মজুরীর হার কীভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে অর্থনীতিতে একাধিক তত্ত্ব প্রচলিত আছে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তত্ত্ব হল, প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে, সকল শ্রমিকের বাস্তব মজুরীর হার শ্রম নামক উপাদানের প্রান্তিক বাস্তব উপাদানের সমান হবে।

কোন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রমিকের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন পরিমাপ করার সময় ধরে নিতে হয় যে—(১) শ্রম হল সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য একটি উপাদান, (২) সকল শ্রমিকের দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি সমান, (৩) শ্রম সম্পূর্ণ গতিশীল বা সচল উপাদান। এই অবস্থায় সকল শ্রমিকের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন ক্ষমতা সমান হবে। যে-কোন শ্রমিককে প্রান্তিক শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা যাবে। কাজেই কোন শ্রমিকের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপ করার জন্য শ্রম নামক উপাদানের নিয়োগ সামান্য বৃদ্ধি করলেই হল। অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ অপরিবর্তিত রেখে শ্রম নামক উপাদানের নিয়োগ অতিরিক্ত সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে তাকেই বলা হবে শ্রমিকদের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন। অবশ্য অন্যান্য উপাদান স্থির রেখে যত বেশি পরিমাণে শ্রম নিয়োগ করা যাবে ততই শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল উপাদান অনুপাতের প্রতি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি

(Law of diminishing marginal product to variable factor proportions) কাজ করায় শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন ক্রমশ কমে আসবে। শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন রেখাটি হবে ১৪.১ নং রেখাচিত্রে অঙ্কিত MP রেখার মত নিম্নমুখী।

এখন যদি ধরে নেওয়া যায় যে, শ্রমের নিয়োগকর্তা উৎপাদনের মালিক শ্রমের নিয়োগ থেকে সর্বাধিক মুনাফা পেতে চায় এবং নিয়োগের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে, তাহলে যে-কোন একজন নিয়োগকর্তা নির্দিষ্ট মজুরীর হারে যত ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করতে পারবে। অর্থাৎ একজন নিয়োগকারীর কাছে শ্রমের যোগান রেখাটি হবে ১৪.১নং রেখাচিত্রে অঙ্কিত W_0 W_0 রেখার মত। এই অবস্থায় মালিকের মুনাফা সর্বাধিক হবে যেখানে শ্রমিকদের মজুরী শ্রমিকদের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের সমান হবে। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়—যেখানে নিম্নমুখী MP_L রেখা W_0 W_0 রেখাকে উপরের দিক থেকে ছেদ করবে সেই ছেদবিন্দুতে শ্রমের নিয়োগ ও মজুরীর হার নির্ধারিত হবে। ১৪.১নং রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে, MP রেখাটি W_0 W_0 রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখানে মজুরীর হার OW_0. নিয়োগ$=ON_0$. শ্রমিকদের মোট উৎপাদন হল $OABN_0$ নামক ট্রাপিজিয়ামটি এবং শ্রমিকদের মোট মজুরী হল OW_0 BN_0 নামক আয়তক্ষেত্রটি। অতএব মালিকের সর্বাধিক মুনাফা$=OABN_0$ $-OW_0$ $BN_0=W_0AB$ নামক ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রটি।

এখানে দেখা যাচ্ছে, B বিন্দুটি MP_L এবং W_0W_0 রেখার উপর অবস্থিত। কাজেই এখানে শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদন$=BN_0$ এবং মজুরীর হার$=OW_0$। কিন্তু OW_0 এবং BN_0 হল OW_0BN_0 নামক আয়তক্ষেত্রের বিপরীত বাহু। কাজেই $OW_0=BN_0$ অর্থাৎ মজুরীর হার$=$শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন। এইভাবে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ত্বের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, শ্রমিকদের মজুরীর হার তাদের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের সমান হলে শ্রমিকরা তাদের প্রান্তিক পাওনা পায়। শুধু তাই না, এতে মালিকদের মুনাফাও সর্বাধিক হয়। প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ত্ব শ্রমিক ও মালিক সকলের স্বার্থই রক্ষা করে। বণ্টন সমস্যার এর চেয়ে ভালো সমাধান হতে পারে না।

প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ত্বের পূর্বে মজুরী নির্ধারণের জন্য একাধিক তত্ত্ব ছিল। কিন্তু সেই তত্ত্বগুলিকে শ্রমিকদের জীবনধারণের নিম্নতম ব্যয়, মালিকের ইচ্ছা, ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হত। কাজেই সেই তত্ত্বগুলি অবৈজ্ঞানিক। প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ত্বেই প্রথম স্বীকার করা হয় যে, শ্রমিকদের মজুরী শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করবে। অতএব প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাতত্ত্বের মধ্যেই আমরা প্রথম একটি বৈজ্ঞানিক শোষণবিহীন মজুরী তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই।

এ কথা স্বীকার করেও আমরা এই তত্ত্বের কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করতে পারি।

এই তত্ত্বে শ্রমিক, মালিক, উৎপাদনের অবস্থা ও বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে এমন

অনেক অনুধারণা করা হয় যেগুলি বাস্তব জগতে প্রযোজ্য নয়। কাজেই অত্যধিক অনুধারণা-নির্ভরতা এবং অনুধারণার অবাস্তবতাই হল এই তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি।

(১) এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, শ্রম সম্পূর্ণ বিভাজ্য উপাদান। মাথা গুনতি-ভাবে শ্রম অবিভাজ্য। সময়ের হিসেবে ধরলে শ্রমকে বিভাজ্য বলা যায়। কিন্তু এই বিভাজ্যতার ফলে শ্রমের গুণ ও দক্ষতার কোন ক্ষতি হবে না এমন বলা যায় না। তাছাড়া, ম্যানেজার, দক্ষ প্রশাসক প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর শ্রমিকদের ক্ষেত্রে শ্রমের বিভাজ্যতার কথা বলা যায় না। তাঁরা উৎপাদন পরিচালনা করেন। অতিরিক্ত এক সেকেণ্ড অফিসে বসে থাকলে কারখানার উৎপাদন যতটুকু বাড়বে তাই হবে ম্যানে-জারের প্রান্তিক উৎপাদন এমন মনে করাও হাস্যকর।

(২) এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, সকল শ্রমিকের দক্ষতা ও যোগ্যতা সমান। এটি অত্যন্ত অবাস্তব ধারণা। মানুষ সব দিক দিয়ে সমান হতে পারে না। শ্রমিকদের মধ্যেও উৎপাদন ক্ষমতার পার্থক্য আছে। মনোযোগ, অভ্যাস, চরিত্র সকলের সমান হয় না। কাজেই সকল শ্রমিককে যে-কোন একজনের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের সমান মজুরী দিলে যার উৎপাদন ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে বেশি সে কম পাবে এবং শোষিত হবে। সেইজন্য বম্ বয়ার্ক এই তত্ত্বের মধ্যেও শোষণ আবিষ্কার করেছিলেন।

(৩) অনেক উৎপাদন ক্ষেত্র আছে যেখানে অন্যান্য উপাদান স্থির রেখে শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে মোট উৎপাদনের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সে সব ক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন পরিমাপ করা সম্ভব হবে এবং এই তত্ত্বটিও প্রয়োগ করা যাবে না।

(৪) আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন মূলধন বা যন্ত্র স্থির রেখে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করা যায় না। এর ফলে যন্ত্রের গঠনের পরিবর্তন হয়। যে যন্ত্রে একজন শ্রমিক কাজ করে, তাতে একটা হাতল থাকে। কিন্তু সেই যন্ত্রে দুজন শ্রমিক কাজ করলে তার দুটো হাতল থাকতে হবে। এতে যন্ত্রের সংখ্যা ঠিক থাকলেও যন্ত্রের গঠন ও গুণ বদলে যাবে। লোহার বা শক্ত কোন ধাতুর যন্ত্র হলে তাতে ঘন ঘন হাতল জোড়া যাবে না। কোন নরম পদার্থ, যেমন কাদা বা জেলির তৈরি যন্ত্র হলেই তাতে ক্রমাগতভাবে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে। অন্যথায় শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ণয় করাও যাবে না।

(৫) অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসন মনে করেন, শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা মজুরীর হার দ্বারা নির্ধারিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে মজুরীর হার ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা পরস্পরের উপর নির্ভর করবে এবং কোনটির দ্বারা অন্যটি নির্ধারিত হতে পারবে না।

(৬) এই তত্ত্বে শ্রমের সচলতার কথা ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আমরা জানি কোন শ্রমিক এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে গেলে, বাড়ি ঘর বানিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলে, তার পক্ষে সেই সব বন্ধন ছিঁড়ে অন্যত্র যাওয়া বা অন্য কোন

কর্মে নিযুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। আবার যে দেশে দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতা বেশি সেখানে শ্রমের সচলতা প্রায় নেই বললেই চলে।

(৭) এই তত্ত্বে পূর্ণ প্রতিযোগিতার যে অস্তিত্ব ধরে নেওয়া হয় তাও অবাস্তব। শ্রমের ক্ষেত্রে দেখা যায় মালিকরা যেমন মালিক সংঘ গড়ে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে, শ্রমিকরাও সেইরূপ শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে নিজেদের সংঘবদ্ধ করে। শ্রমের চাহিদা ও যোগান উভয় দিকেই পূর্ণ প্রতিযোগিতার অভাব এবং অপূর্ণ প্রতিযোগিতার প্রাধান্য দেখা যায়। এখানে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করা যায় না।

১৫.২ শ্রমের যোগান রেখা ও তার আকৃতি :

(ক) শ্রমের ব্যক্তিগত যোগান রেখা

শ্রমের যোগান বলতে বোঝায় শ্রমের পরিকল্পিত যোগান। কোন নির্দিষ্ট মজুরীর হারে একজন শ্রমিক যতক্ষণ কাজ করতে রাজি থাকেন, তাকেই সেই শ্রমিকের শ্রমের যোগান বলা যায়।

শ্রমের যোগান পরিমাপ করা হয় সময়ের হিসেবে বা ঘণ্টা ধরে। শ্রমিক যদি বেশি সময় ধরে কাজ করেন তাহলে তাঁর শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। এখন—বিভিন্ন মজুরীর হারে একজন শ্রমিক যেসব বিভিন্ন পরিমাণ শ্রমের যোগান দিতে রাজি থাকেন তাদের নিয়েই গড়ে ওঠে শ্রমিকের ব্যক্তিগত যোগান রেখা। সাধারণ অবস্থায় আশা করা যায় যে, মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক বেশিক্ষণ ধরে কাজ করতে রাজি হবেন। অর্থাৎ মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে তাঁর শ্রমের যোগানও বৃদ্ধি পাবে।

শ্রমিক শ্রমের যোগান দেন আয় পাবার জন্য। তিনি যতক্ষণ কাজ করেন, সেই শ্রম বিক্রয় করে তার বিনিময়ে তিনি আয় উপার্জন করেন। তাঁর আয়ের চাহিদা যদি বেশি থাকে, তাহলে তিনি বেশি শ্রমের যোগান দিতে রাজি হন। এক্ষেত্রে শ্রমের যোগানরেখা উর্ধ্বমুখী হবে। কিন্তু যদি শ্রমিকের আয়ের চাহিদা কম থাকে, তাহলে তিনি শ্রমের যোগান কমিয়ে দেন। মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে তিনি শ্রমের যোগান কমিয়ে বাকি সময়টা বিশ্রাম করেন। এক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎমুখী হবে।

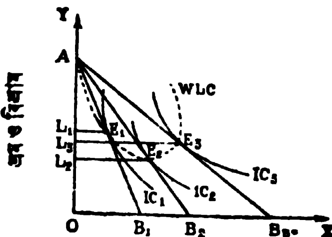
কোন শ্রমিকের আয়ের চাহিদা বেশি হবে—যদি তাঁর আর্থিক অবস্থা ভালো না হয়। আর্থিক অবস্থা ভালো না হলে তিনি জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবার অভাব বোধ করবেন। এই অভাব পূরণের জন্য তিনি বেশি আয় চাইবেন। আয় পেতে হলে তাঁকে বেশি সময় ধরে পরিশ্রম করতে হবে। কাজেই মজুরীর হার বেশি হলে সেই শ্রমিক আয় উপার্জনের অনুকূল অবস্থা দেখে শ্রমের যোগান বাড়িয়ে দিতে পারেন। এখানে শ্রমের যোগান রেখা উর্ধ্বমুখী হবে। এইভাবে কিছুদিন যাবার পর শ্রমিকের আয়ের চাহিদা মিটে যাবে। তাঁর অবস্থার উন্নতি

হবে। তখন মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে তিনি আয় ছেড়ে বিশ্রামের দিকে ঝুঁকবেন। বিশ্রাম থেকে মনের স্ফূর্তি আসে। বিশ্রাম শ্রমিককে আগামীদিনের কাজের জন্য প্রস্তুত করে দেয়। তাছাড়া—বিশ্রামের সময় মানুষ রুটিনমাফিক কাজের সীমা ছাড়িয়ে যথার্থ সৃষ্টিশীল কাজের মধ্যে নিজের মনের মুক্তি খুঁজে পায়। কাজেই একজন শ্রমিকের কাছে আয়ের যেমন চাহিদা থাকবে, তেমনি চাহিদা থাকবে বিশ্রামের।

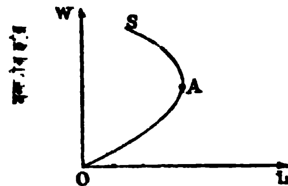
আয় ও বিশ্রামকে আমরা দুটি পরিবর্ত বস্তু হিসেবে দেখতে পারি। আয় বেশি পেতে হলে বিশ্রাম কমাতে হয়। বিশ্রাম বেশি হলে আয় কম পাওয়া যায়। আয় ও বিশ্রাম—উভয়েরই তৃপ্তি আছে। তাহলে আমরা শ্রমিকের নিকট সমান তৃপ্তি-দায়ক আয় ও বিশ্রামের কতগুলি সম্মিলনের কথা ভাবতে পারি যাদের প্রতি শ্রমিক নিরপেক্ষ থাকবেন। এই সম্মিলনগুলির সংযোগকারী রেখা হবে আয়-বিশ্রাম নিরপেক্ষতা রেখা (Income-Leisure Indifferénce Curve) এবং এরূপ অনেক নিরপেক্ষতা রেখা নিয়ে গড়ে উঠবে শ্রমিকের নিরপেক্ষতা মানচিত্র। এখানে প্রত্যেকটি নিরপেক্ষতা রেখা নিম্নমুখী, রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর দিকে উত্তল এবং পরস্পর অচ্ছেদী হবে। শ্রমিক সবসময় উচ্চতর নিরপেক্ষতায় থাকতে চাইবেন। এখন আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি আলোচনা করতে পারি।

আমরা যাকে দিন বলি—তারমধ্যে একটি দিন ও একটি রাত মিলে মোট ২৪ ঘণ্টা থাকে। শ্রমিকের শ্রমের যোগান ও বিশ্রাম উভয়ে ২৪ ঘণ্টার বেশি হতে পারে না। ১৫·১নং রেখাচিত্রে OA হল ২৪ ঘণ্টা। যদি W=মজুরীর হার (প্রতি ঘণ্টায়) হয়, তাহলে শ্রমিক OA ঘণ্টা পরিশ্রম করলে মোট W.OA পরিমাণ আয় পাবেন।

ধরা যাক OX-অক্ষে $OB_1 = W.OA$. এখন A ও B_1 বিন্দুকে সরলরেখার সাহায্যে যোগ করলে আমরা AB_1 রেখাটি পাব। এটি হল মজুরী রেখা। মজুরীর



১৫·১ রেখাচিত্র : মজুরীর হার ও শ্রমের যোগান



১৫.২ রেখাচিত্র : শ্রমের যোগান রেখা

হার (W) বৃদ্ধি পেলে OA ঘণ্টা পরিশ্রম করে শ্রমিক বেশি আয় পাবেন। কাজেই মজুরী রেখাটি OY-অক্ষে A বিন্দুতে স্থির থেকে OX-অক্ষে ডান দিকে সরে যাবে।

যতই মজুরীর হার বাড়বে, ততই এরকম হবে। আমাদের রেখাচিত্রে AA_1, AB_2, AB_3 হল তিনটি মজুরী রেখা। এরকম আরো অনেক মজুরী রেখা অঙ্কন করা যায়। এখানে AB_3 রেখা দ্বারা প্রকাশিত মজুরীর হার AB_2 রেখা দ্বারা প্রকাশিত মজুরীর হার অপেক্ষা বেশি। আবার, AB_2 রেখাটি AB_1 রেখার চেয়ে বেশি মজুরীর হার সূচিত করে। এইভাবে বলা যায়—মজুরীর হার যত বৃদ্ধি পায়, মজুরী রেখাটি ততই OX-অক্ষে ডান দিকে সরে যায়।

এই মজুরী রেখা যে বিন্দুতে আয়-বিশ্রাম নিরপেক্ষতা রেখাকে স্পর্শ করবে সেই স্পর্শবিন্দুতে শ্রমিক ভারসাম্য লাভ করবেন। এখন তাঁর আয় কত হবে এবং তিনি কতক্ষণ কাজ করবেন সব জানা যাবে। যেমন, মজুরী রেখাটি AB_1 হলে শ্রমিক E_1 বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করেন। E_1 বিন্দুতে শ্রমিকের বিশ্রাম $= OL_1$, আয় $= L_1E_1$ অর্থাৎ A বিন্দুতে শ্রমিকের হাতে বিশ্রাম করার মত সময় ছিল OA ঘণ্টা। তার থেকে তিনি AL_1 ঘণ্টা সময় কাজ করেছেন, বাকি OL_1 ঘণ্টা সময় বিশ্রামের জন্য রাখছেন। AB_1 রেখার ঢাল অনুসারে AL_1 ঘণ্টা সময় কাজ করে তিনি L_1E_1 পরিমাণ আয় পাবেন। A বিন্দুতে তাঁর কোন আয় ছিল না। মজুরীর হার বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি আয় উপার্জনে মন দিলেন এবং কিছুটা বিশ্রাম বিক্রি করে শ্রমের যোগান দিলেন এবং E_1 বিন্দুতে নেমে এলেন।

মজুরীর হার যদি আরো বেড়ে যায়, তাহলে মজুরী রেখাটি হবে AB_2, শ্রমিকের ভারসাম্য বিন্দু হবে E_2. E_2 বিন্দুতে শ্রমের যোগান হবে AL_2. আয় হবে L_2E_2. দেখা যাচ্ছে $AL_2 > AL_1$ অর্থাৎ মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়, শ্রমিকের আয়ও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বরাবর এরকম হয় না।

রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে, মজুরীর হার আরো বেড়ে গেলে মজুরী রেখাটি হবে AB_3. ভারসাম্যের বিন্দু হবে E_3. শ্রমের যোগান হবে AL_3. দেখা যাচ্ছে $AL_3 < AL_2$ অর্থাৎ মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান কমে যাচ্ছে। E_3-বিন্দুতে শ্রমিকের আয় হবে L_3E_3. এখানে মজুরীর হার এত বেশি যে শ্রমিক আগের চেয়ে কম সময় ধরে কাজ করেও আগের চেয়ে বেশি আয় পাচ্ছেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—মজুরীর হার বাড়লে কিছুদূর পর্যন্ত শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়, তারপর শ্রমের যোগান কমে যেতে পারে। বিভিন্ন মজুরীর হারে শ্রমিকের বিভিন্ন ভারসাম্য বিন্দুগুলি যোগ করে আমরা মজুরী-শ্রম-রেখা (Wages-Labour Curve বা WLC) অঙ্কন করতে পারি। আমাদের রেখাচিত্রে WLC হল মজুরী-শ্রম রেখা। এই রেখাটি E_1, E_2, E_3 ইত্যাদি ভারসাম্য বিন্দুগুলির মধ্য দিয়ে অঙ্কিত হয়েছে। এই WLC রেখাটির আকৃতি দেখেই আমরা শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি জানতে পারব। এই রেখাটি যতক্ষণ পর্যন্ত বামদিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মজুরীর হার বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়বে। যেখানে WLC উপরের দিকে উঠবে, সেখানেই মজুরী বাড়লে শ্রমের যোগান কমবে।

আমাদের রেখাচিত্রে E_2 বিন্দু পর্যন্ত WLC নিম্নমুখী হয়ে তারপর উপরের দিকে উঠে গেছে বা পশ্চাৎমুখী হয়েছে। তাহলে মজুরীর হার বাড়লে শ্রমের যোগান AL_2 পর্যন্ত বাড়বে এবং তারপর কমবে। এক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখাটি প্রথমে উর্ধ্বমুখী হয়ে পরে পশ্চাৎমুখী হবে। ১৫-২নং রেখাচিত্রে OAS রেখাটি হল ১৫·১নং রেখাচিত্রের WLC-এর মতই। OAS রেখাটি A বিন্দু পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী হয়ে পরে পশ্চাৎমুখী হয়েছে।

অতএব মজুরীর হার বাড়লেও শ্রমের যোগান কিছুদূর পর্যন্ত বাড়তে পারে, তারপর কমে যেতে পারে।

(খ) শ্রমের মোট যোগান রেখা: কোন নির্দিষ্ট মজুরীর হারে কোন নির্দিষ্ট কর্মে সব শ্রমিকেরা যে পরিমাণ শ্রমের যোগান দিতে রাজী থাকেন তাই হল শ্রমের মোট যোগান। বিভিন্ন মজুরীর হারে একই কর্মে নিযুক্ত সকল শ্রমিকের শ্রমের বিভিন্ন যোগানগুলিকে যোগ করে পাওয়া যায় মোট যোগান রেখা। অন্যভাবে বলা যায়—সকল শ্রমিকের ব্যক্তিগত শ্রমের যোগান রেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে শ্রমের মোট যোগান রেখা পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত শ্রমের যোগান রেখা যদি উর্ধ্বমুখী হয় তাহলে মোট যোগান রেখাও উর্ধ্বমুখী হয়। কিন্তু কোন শ্রমিকের যোগান রেখা যদি উর্ধ্বমুখী হয় এবং অপর কোন শ্রমিকের পশ্চাৎমুখী হয় তাহলে মোট যোগান রেখার আকৃতি কেমন হবে বলা যাবে না। তবে সাধারণত শ্রমের মোট যোগান রেখাকে উর্ধ্বমুখী ধরা হয়।

১৫.৩ শ্রমের চাহিদা রেখা:

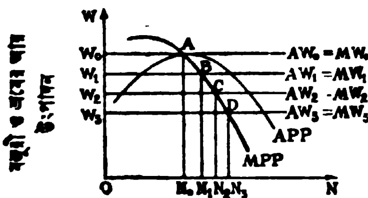
শ্রমের চাহিদা আসে ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট থেকে। ফার্মগুলি হল শ্রমের বাজারের ক্রেতা। এই বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে কোন ক্রেতাই মজুরীর হার নির্ধারণ করতে পারবে না। নির্ধারিত মজুরীতে সে তার প্রয়োজনমত শ্রম নিয়োগ করতে পারবে। এইজন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের নিকট গড় ও প্রান্তিক মজুরী (Average Wage বা AW এবং Marginal Wage বা MW) সমান ও স্থির হবে। সকল শ্রমিককে যে মোট মজুরী দেওয়া হয়, তাকে শ্রমিকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় শ্রমিক পিছু মজুরী বা গড় মজুরী (AW), গড় মজুরী ও মজুরীর হার একই ব্যাপার। যেমন ১০ জন শ্রমিককে যদি ১৫০ টাকা মোট মজুরী দেওয়া হয়, তাহলে একজন শ্রমিকের গড় মজুরী বা মজুরীর হার হবে $\frac{\text{১৫০ টাকা}}{\text{১০}}$ = ১৫ টাকা। এবার প্রান্তিক মজুরী (MW) সম্বন্ধে বলা যায়। অতিরিক্ত একজন শ্রমিক নিয়োগ করলে মোট মজুরী যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাকেই সেই একক শ্রমের প্রান্তিক মজুরী বলা হয়। যেমন ১০ জন শ্রমিকের জন্য যদি ১৫০ টাকা মোট মজুরী লাগে, কিন্তু ১১ জন শ্রমিকের জন্য যদি ১৬৫·টাকা লাগে তাহলে একাদশতম শ্রমিকের জন্য ১৫ টাকা বেশি মজুরী লাগছে। এখানে প্রান্তিক মজুরী হল ১৫ টাকা। আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে গড় মজুরী ও

প্রান্তিক মজুরীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে। আমরা বলতে পারি—গড় মজুরী যদি স্থির থাকে তাহলে প্রান্তিক মজুরীও স্থির থাকবে এবং গড় ও প্রান্তিক মজুরী পরস্পর সমান হবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের কাছে গড় মজুরী স্থির, কাজেই প্রান্তিক মজুরী ও গড় মজুরী স্থির ও সমান হবে। মজুরী বলতে আর্থিক বা বস্তুগত—যে-কোন মজুরী বোঝাক না কেন—সব ক্ষেত্রে এই সম্পর্কটি বজায় থাকবে। আমাদের বর্তমান আলোচনায় অবশ্য মজুরী হল বাস্তব বা বস্তুগত মজুরীর হার (Real Wage Rate).

রেখাচিত্রের ভাষায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় ও প্রান্তিক মজুরী রেখা পরিমাণ অক্ষের সমান্তরাল হবে।

বাস্তব মজুরী হল ফার্মের ব্যয়ের দিক। এই বাস্তব মজুরীর সঙ্গে ফার্ম তুলনা করবে শ্রমিকদের নিয়োগ থেকে প্রাপ্ত গড় ও প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনকে (Average Physical Product বা APP এবং Marginal Physical Product বা MPP)। শ্রম যদি একমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদান হয়, তাহলে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন প্রথম দিকে বাড়লেও পরিণামে কমবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন বিধি দেখা দেওয়ায় এরকম হবে। রেখাচিত্রে APP ও MPP রেখা দুটি উল্টানো বাটির মত হবে। প্রথমে APP ও MPP উভয়েই ঊর্ধ্বমুখী হবে এবং MPP রেখা APP রেখার উপর থাকবে, তারপর APP ও MPP রেখা নিম্নমুখী হবে এবং MPP রেখা APP রেখার নীচে থাকবে। MPP রেখা APP রেখাকে উপর দিক থেকে তার শীর্ষবিন্দুতে ছেদ করবে। APP ও MPP হল ফার্মের আয়ের দিক।

এখন কোন নির্দিষ্ট মজুরী হারে একটি ফার্ম কী পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করলে তার মুনাফা সর্বাধিক হবে তার শর্ত হল দুটি—(১) MW = MPP. (২) MPP রেখা MW রেখাকে উপর থেকে ছেদ করবে। অর্থাৎ যে বিন্দুতে শ্রমের MPP রেখা ফার্মের MW রেখাকে উপর থেকে ছেদ করে সেই ছেদবিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য হবে। এই ভারসাম্য বিন্দুটি হবে ফার্মের চাহিদা রেখার উপর একটি বিন্দু। পাশের ১৫.৩ রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল।



১৫.৩ রেখাচিত্র : শ্রমের চাহিদা রেখা

আমাদের এই রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে—মজুরীর হার যখন OW_0 তখন ফার্ম A বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করে এবং ON_0 পরিমাণ শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে। তাহলে A হল শ্রমের জন্য ফার্মের চাহিদা রেখার উপর একটি বিন্দু। এখানে $MW = AW = OW_0$. নিয়োগ $= ON_0$. মোট মজুরী $= OW_0 \times ON_0 = OW_0AN_0$. এখানে $APP \times AN_0, =$ মোট উৎপাদন $= OW_0AN_0 =$ মোট মজুরী, কাজেই ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা শূন্য।

মজুরী যদি OW_0 অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে ফার্ম কোন শ্রমিক নিয়োগ করবে না, কাজেই OW_0 হল সর্বাধিক মজুরী। ON_0 হল সর্বনিম্ন শ্রমের চাহিদা এবং A-বিন্দু হল শ্রমের জন্য ফার্মের চাহিদা রেখার আরম্ভের বিন্দু।

এরপর মজুরীর হার যত কমবে শ্রমের জন্য ফার্মের চাহিদাও তত বৃদ্ধি পাবে। যেমন, মজুরীর হার $OW_1 < OW_0$ হলে নিয়োগ হবে $ON_1 > ON_0$. মজুরীর হার OW_1 হলে ফার্মের ভারসাম্যের বিন্দু হবে B. B বিন্দুটি ফার্মের চাহিদারেখার উপর আর একটি বিন্দু। এইভাবে OW_2 মজুরীতে C বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা হবে $ON_2 > ON_1$, OW_3 মজুরীতে D বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা হবে ON_3 ইত্যাদি। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, ফার্মের চাহিদা রেখার উপর A, B, C, D ইত্যাদি বিন্দুগুলি MPP রেখার নিম্নমুখী অংশে অবস্থিত। অতএব আমরা বলতে পারি—APP রেখার শীর্ষবিন্দু থেকে শুরু করে MPP রেখার নিম্নমুখী অংশটি হল শ্রমের জন্য ফার্মের চাহিদা রেখা। দ্বিতীয়ত, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজুরীর হার শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনের সমান হয়। এখানে $W = MW$ এবং $MW = MPP$, কাজেই $AW = MPP$ হবে। আমাদের রেখাচিত্রে MPP রেখার যে অংশটি শ্রমের চাহিদা রেখা হবে সেই অংশটি মোটা দাগে আঁকা হয়েছে।

প্রত্যেকটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের কাছে শ্রমের চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হবে। সব ফার্মের চাহিদা রেখাকে পাশাপাশি রেখে যোগ করে শ্রমের যে মোট চাহিদা রেখা পাওয়া যাবে তা অবশ্যই নিম্নমুখী হবে।

১৫.৪ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজুরী নির্ধারণ :

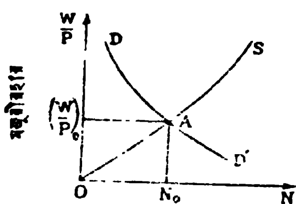
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে অসংখ্য শ্রমের ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। ফার্মগুলি হল শ্রমের ক্রেতা। শ্রমিকেরা হলেন শ্রমের বিক্রেতা। ক্রেতারা শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে। শ্রমিকেরা দেন শ্রমের যোগান। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজুরী কোন একজন শ্রমিক বা কোন একটি ফার্মের দ্বারা নির্ধারিত হবে না। এখানে মজুরী নির্ধারিত হবে শ্রমের মোট যোগান ও মোট চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতে।

শ্রমের যোগান :— ব্যক্তিগত কোন শ্রমিকের যোগান বস্তুগত মজুরীর হারের উপর নির্ভর করে। যদি W = আর্থিক মজুরী এবং P = দামস্তর হয় তাহলে বস্তুগত মজুরী হবে $\frac{W}{P}$. $\frac{W}{P}$ বেশি হলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। $\frac{W}{P}$ কমলে শ্রমের যোগান কমে। $\frac{W}{P}$ কে রেখাচিত্রের লম্ব-অক্ষে এবং শ্রমের যোগানকে অনুভূমিক অক্ষে পরিমাপ করলে আমরা শ্রমের ঊর্ধ্বমুখী যোগান রেখা পাই। কোন শ্রমিকের যোগান রেখা অবশ্য প্রথমে ঊর্ধ্বমুখী ও পরে পশ্চাৎমুখী হতে পারে। বস্তুগত মজুরীর হার খুব বেশি হলে শ্রমিকের আয়ের চাহিদা কমে আসে এবং বিশ্রামের চাহিদা বেড়ে যায়। তখন তিনি শ্রমের যোগান কমিয়ে বাকি সময়টি বিশ্রাম হিসেবে

উপভোগ করেন। এখানে শ্রমের যোগান পশ্চাৎমুখী হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই সম্ভাবনাটিকে বাতিল করব। তাহলে একজন শ্রমিকের যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে।

সকল শ্রমিকের ঊর্ধ্বমুখী যোগান রেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে শ্রমের মোট যোগান রেখা পাওয়া যাবে। এই যোগান রেখাটিও ঊর্ধ্বমুখী হবে।

শ্রমিকের চাহিদা রেখা ঃ ফার্মের মালিক শ্রম নিয়োগ করেন কারণ শ্রম থেকে তাঁর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ স্থির থাকলে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন কমে যায়। অর্থাৎ শ্রমের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদন রেখা নিম্নমুখী হয়। এই রেখাটিই হল শ্রমের জন্য ফার্মের চাহিদা রেখা। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক উপাদানের বাজারে প্রান্তিক মজুরী ও গড় মজুরী সমান হবে। ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হলেই শ্রমের নিয়োগ হবে। সর্বাধিক মুনাফার প্রাথমিক শর্ত হল ঃ MPP = MW. এখানে MW = AW. অতএব মজুরীর হার = AW = MPP. অর্থাৎ মজুরীর হার দেওয়া থাকলে ফার্মটি এমনভাবে শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করবে যাতে মজুরীর হার শ্রমিকের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনের সমান হয়। মজুরীর হার কমলে (বাড়লে) শ্রমের নিয়োগ বাড়বে (কমবে)। এইভাবে শ্রমের জন্য ফার্মের চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হবে। এখন সব ফার্মের নিম্নমুখী চাহিদা রেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে আমরা শ্রমের যে মোট চাহিদা রেখা পাই তাও নিম্নমুখী হবে। বস্তুগত মজুরীর হার কমলে (বাড়লে শ্রমের চাহিদা বাড়বে (কমবে)।



শ্রমের চাহিদা ও যোগান
১৫.৪ রেখাচিত্র : পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজুরী নির্ধারণ

এখন শ্রমের মোট যোগান রেখা ও মোট চাহিদা রেখা দুটিকে একটি রেখাচিত্রে এঁকে আমরা মজুরী নির্ধারণের ব্যাপারটি বুঝতে পারি। যে মজুরীর হারে শ্রমের যোগান ও শ্রমের চাহিদা সমান হয় সেই মজুরীর হারটিকে ভারসাম্য মজুরীর হার বলা হয়। যে বিন্দুতে শ্রমের যোগান রেখা শ্রমের চাহিদা রেখাকে ছেদ করে সেই বিন্দুতে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সঙ্গতি দেখা দেয় এবং সেই বিন্দুতে মজুরীর হার নির্ধারিত হয়। আমাদের ১৫ ৪নং রেখাচিত্রে OS হল শ্রমের যোগান রেখা এবং DD' হল চাহিদা রেখা। এরা A বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখানে ভারসাম্য মজুরীর হার $= \left(\frac{W}{P}\right)_0$ এবং এই মজুরীর হারে শ্রমের চাহিদা $= ON_0 =$ শ্রমের যোগান। অন্য মজুরীর হারে এই সমতা থাকবে না। যদি মজুরীর হার $\left(\frac{W}{P}\right)_0$ অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে শ্রমের যোগান চাহিদার চেয়ে বেশি

হবে। ফলে মজুরীর হার কমবে। অপরপক্ষে মজুরীর হার $\left(\frac{W}{P}\right)_0$ অপেক্ষা/কম হলে চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি হবে এবং মজুরী বাড়বে। এইভাবে মজুরীর হার ওঠানামা করতে করতে এমন একটি অবস্থায় এসে পেঁছাবে যেখানে শ্রমের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হবে এবং তখন মজুরীর হারে আর কোন পরিবর্তন দেখা দেবে না।

১৫.৫ অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজুরী ও নিয়োগ :

শ্রমের বাজারে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা থাকতে পারে যদি—

(ক) শ্রমের ক্রেতা অসংখ্য, কিন্তু বিক্রেতা মাত্র কয়েকজন বা একজন থাকে. কিংবা—

(খ) শ্রমের বিক্রেতা অসংখ্য. কিন্তু ক্রেতা মাত্র কয়েকজন বা একজন থাকে, কিংবা—

(গ) শ্রমের ক্রেতা ও বিক্রেতা কয়েকজন, বা একজন করে থাকে। অর্থাৎ শ্রমের চাহিদা ও যোগান—এই দুটো দিকের যে কোন একটি কিংবা উভয় দিকেই অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার লক্ষণ থাকতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নেব যে, শ্রমের বাজারে শ্রমের অসংখ্য বিক্রেতা (অর্থাৎ শ্রমিক) আছে, কিন্তু শ্রমের ক্রেতা মাত্র একজন। যে বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকে, তাকে মনোপসনি (Monopsony) বলা হয়।

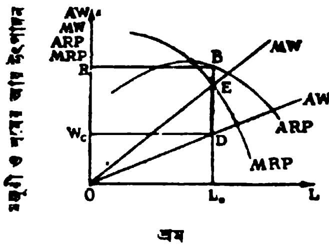
শ্রমের বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকলে তার ব্যক্তিগত চাহিদাই হবে শ্রমের মোট চাহিদা। শ্রমের যোগান যদি স্থির থাকে, তাহলে শ্রমের জন্য ক্রেতার চাহিদা বাড়লে মজুরীর হার (W) বাড়বে, চাহিদা কমলে মজুরীর হার কমবে।

মজুরীর হার হল শ্রমের গড় মজুরী (Average Wage বা AW)। শ্রমের বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা থাকলে শ্রমের চাহিদার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে AW বাড়বে। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়—AW রেখা উর্ধমুখী হবে। শ্রমের গড় মজুরী বাড়লে বুঝতে হবে অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগের জন্য দেয় মজুরী, অর্থাৎ প্রান্তিক মজুরী (Marginal Wage বা MW) বাড়বে এবং গড় মজুরীর চেয়ে বেশি বাড়বে। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়, AW রেখা উর্ধমুখী হলে MW রেখাও উর্ধমুখী হবে এবং MW রেখা AW রেখার উপরে থাকবে।

মজুরী হল উপাদানের ক্রেতা বা ফার্মের কাছে ব্যয়ের বিষয়। ফার্ম শ্রম নিয়োগ করে আয়-উৎপাদন পেয়ে থাকে। আয়-উৎপাদনও দুরকম হতে পারে, যথা—(ক) গড়-আয় উৎপাদন (Average Revenue Product বা ARP) ও (খ) প্রান্তিক আয়-উৎপাদন (Marginal Revenue Product বা MRP): অন্য উপাদানের নিয়োগ যদি স্থির থাকে, তাহলে শ্রমের নিয়োগ বাড়লে শ্রমের ARP ও MRP প্রথমে বাড়লেও পরিণামে কমে যাবে। রেখাচিত্রের ভাষায় শ্রমের ARP ও MRP রেখা দুটি প্রথমে উর্ধমুখী ও পরে নিম্নমুখী হবে। যখন ARP বাড়বে, তখন

MRP তার চেয়ে বেশি বাড়বে ; যখন ARP কমবে, তখন MRP তার চেয়ে বেশি কমবে। অর্থাৎ ARP কমবে যখন উর্ধ্বমুখী হয়, তখন MRP রেখাও উর্ধ্বমুখী হয় এবং MRP রেখা ARP রেখার উপরে থাকে। আবার ARP রেখা যখন নিম্নমুখী হয়, তখন MRP রেখাও নিম্নমুখী হয় এবং MRP রেখা ARP রেখার নীচে থাকে। যেখানে ARP রেখার শীর্ষবিন্দু, সেই শীর্ষবিন্দুতে MRP রেখা ARP রেখাকে ছেদ করে।

এখন অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজুরীর হার ও শ্রমের নিয়োগ কীরূপ হতে পারে তা রেখাচিত্রের সাহায্যে আলোচনা করা যায়। আমাদের নীচে দেখানো ১৫.৫ নং রেখাচিত্রে ARP ও MRP রেখাদুটি হল যথাক্রমে গড় ও প্রান্তিক আয়-উৎপাদন রেখা। AW ও MW রেখা দুটি হল যথাক্রমে গড় ও প্রান্তিক মজুরী রেখা।



১৫.৫ রেখাচিত্র : অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা-মূলক শ্রমের বাজারে মজুরী ও নিয়োগ

আমরা ধরে নেব যে, শ্রমের ক্রেতা বা ফার্ম সর্বাধিক মুনাফার জন্য শ্রম নিয়োগ করে। তার মুনাফা সর্বাধিক হবে সেখানে যেখানে MRP রেখা উপর দিক থেকে MW রেখাকে ছেদ করে। আমাদের রেখাচিত্রে E বিন্দুতে MRP রেখা MW রেখাকে ছেদ করেছে। E হল শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রে ফার্মের ভারসাম্যের বিন্দু।

E বিন্দুতে শ্রমের নিয়োগ $= OL_0$. মজুরীর হার (গড় মজুরী) $= OW_0$. গড়-আয়-উৎপাদন $= OR$. অতএব ফার্মের মোট আয় $= ORBL_0$ এবং ফার্মের মোট ব্যয় (মজুরী) $= OW_0DL_0$. অতএব ফার্মের অতিরিক্ত মুনাফা $= W_0RBD$.

এখানে শ্রমের প্রান্তিক আয়-উৎপাদন (MRP) হল EL_0 এবং মজুরীর হার হল DL_0.

অতএব দেখা যাচ্ছে—**অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে শ্রমের মজুরী শ্রমের প্রান্তিক (আয়) উৎপাদনের চেয়ে কম হয়।** অর্থাৎ অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে শ্রমিকরা মালিকদের দ্বারা শোষিত হন। শ্রমিকদের যদি প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী মজুরী দেওয়া হয়, তাহলে মজুরীর হার হবে EL_0, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দেওয়া হবে DL. শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী EL_0 কিন্তু শ্রমিকেরা পাবেন DL_0. কাজেই এখানে শোষণের মাত্রা (Extent of exploitation) হবে ED.

১৫.৬ শ্রমিক সংঘের উদ্ভব : মজুরীর হার ও নিয়োগ :

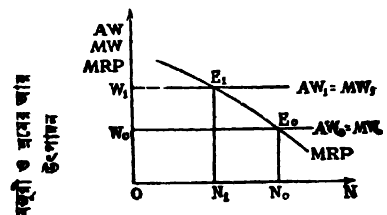
শ্রমিক সংঘ বলতে বোঝায় শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ ও মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে গঠিত শ্রমিকদের একটি স্থায়ী ও স্বেচ্ছামূলক সংগঠন। শ্রমিক সংঘের প্রধান কাজ

হল মালিকদের সঙ্গে দর-কষাকষি করা, যাতে মালিকেরা শ্রমিকদের বেশি মজুরী দেন, অথবা প্রচলিত মজুরীতে বেশি শ্রমিক নিয়োগ করেন। অথবা মজুরী ও নিয়োগ উভয়কেই বৃদ্ধি করে। মজুরীর হারকে W এবং নিয়োগকে যদি N বলা হয়, তাহলে শ্রমিক সংঘের প্রধান কাজ হল (ক) বেশি W, কিন্তু সমান N, কিংবা (খ) বেশি N, কিন্তু সমান W কিংবা (গ) বেশি W ও বেশি N-এর জন্য মালিকদের সঙ্গে দরাদরি করা, প্রয়োজন হলে সংগ্রামের পথে নামা। এ ব্যাপারে শ্রমিক সংঘের প্রধান হাতিয়ার হল আন্দোলন বা ধর্মঘট। শ্রমিক সংঘের উদ্ভব হলে, সব শ্রমিক সংঘের সভ্য হলে, সেই সংঘই হয় শ্রমের যোগানের একমাত্র উৎস। সব শ্রমিকের প্রতিনিধি হিসেবে শ্রমিক সংঘ মালিকদের সঙ্গে দর-কষাকষি করে। এইভাবে দর-কষাকষি দ্বারা যে মজুরীর হার নির্ধারিত হবে, সেই নির্দিষ্ট মজুরীতে সব শ্রমিক শ্রমের যোগান দিতে রাজি হবেন। মালিকেরা নির্দিষ্ট মজুরীর হারে যে-কোন পরিমাণ শ্রমের যোগান পাবেন। তাহলে বলা যায়—শ্রমিক সংঘের উদ্ভব হলে শ্রমের যোগান রেখা বা মজুরীরেখা শ্রম পরিমাপক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হবে। অর্থাৎ এখানে গড় মজুরী একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির হবে এবং তার জন্য প্রান্তিক মজুরীও গড় মজুরীর সমান হবে।

এখন শ্রমিক সংঘ যদি বেশি মজুরীর জন্য আন্দোলন করে এবং মালিকেরা যদি সেই দাবি মেনে নেন, তাহলে শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের ফলে মজুরীর হার বাড়বে। কিন্তু নিয়োগের পরিমাণ বাড়বে কি কমবে তা এমনি বলা যায় না। নিয়োগের পরিমাণ কী হবে—সেটা নির্ভর করবে শ্রমের বাজারের অবস্থার উপর। এখানে আমরা দুটি অবস্থার কথা আলোচনা করতে পারি : (ক) শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের আগে শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকতে পারে, অথবা (খ) শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের আগে শ্রমের বাজারে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা থাকতে পারে। নীচে রেখাচিত্রের সাহায্যে এই দুটি অবস্থার আলোচনা করা হল।

(ক) প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের প্রভাব।

শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের আগে শ্রমের বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ছিল। কাজেই গড় ও প্রান্তিক মজুরীর হার কোন একটি ফার্মের কাছে স্থির ছিল।



শ্রমের নিয়োগ

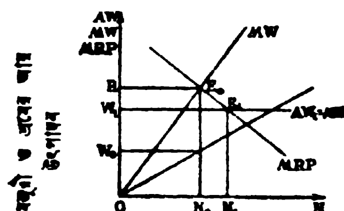
১৫.৬ রেখাচিত্র : মজুরীর হার ও নিয়োগের উপর শ্রমিক সংঘের প্রভাব

ধরলাম, আগে মজুরীর হার ছিল OW_0. এই হারে ফার্মের গড় ও প্রান্তিক মজুরী রেখা ছিল $AW_0 = MW_0$. এখানে MRP রেখা হল প্রান্তিক আয়-উৎপাদনরেখা। প্রথমে ভারসাম্য বিন্দু ছিল E_0. এখানে শ্রমের নিয়োগ $= ON_0$ অর্থাৎ OW_0 মজুরীর হারে কোন একটি ফার্ম ON_0 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করত।

এখন ধরলাম, শ্রমিক সংঘ মজুরীর হার বাড়িয়ে OW_1 করার দাবি করল। এর ফলে গড় ও প্রান্তিক মজুরী রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে গেল। এখন নতুন মজুরী রেখা হল $AW_1 = MW_1$ রেখা। এখানে ভারসাম্যের বিন্দু E_1 এবং শ্রমের নিয়োগ হল $ON_1 < ON_0$. অতএব—শ্রমের বাজারে যদি আগে পূর্ণ-প্রতিযোগিতা থাকে, তাহলে শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের ফলে ও দর-কষাকষির ফলে মজুরীর হার বাড়বে কিন্তু নিয়োগের পরিমাণ কমবে। এখানে শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের আগে শ্রমিকেরা তাঁদের প্রান্তিক (আয়) উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী মজুরী পেতেন, শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের পরও তাঁরা তাই পাবেন। পূর্বে তাঁদের উপর শোষণ ছিল না, পরেও শোষণ থাকবে না।

(খ) অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের প্রভাব।

শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের আগে যদি শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে বিশেষত যদি একটি মাত্র ফার্ম শ্রমের ক্রেতা হিসেবে থাকে তাহলে AW ও MW রেখা উর্ধ্বমুখী হবে। AW রেখার উপরে MW রেখা থাকবে। পূর্বে মজুরীর হার থাকবে OW_0 এবং নিয়োগ থাকবে ON_0 এবার শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের পর AW ও MW রেখা অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে যাবে। শ্রমিক সংঘ যদি $OW_1 > OW_0$ মজুরীর হার দাবি করে এবং মালিকেরা যদি সে দাবি মেনে নেন, তাহলে মজুরীর হার বাড়বে। শুধু তাই নয়, এখানে নিয়োগের পরিমাণও ON_0 থেকে বেড়ে ON_1 হবে। পূর্বে ফার্মের ভারসাম্যের বিন্দু E_0 থাকলে পরে সেটি E_1 বিন্দুতে সরে আসবে। শ্রমিক সংঘের



শ্রমের নিয়োগ
১৫.৭ রেখাচিত্র : অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজুরীর হার ও নিয়োগের উপর শ্রমিক সংঘের প্রভাব

উদ্ভবের আগে শ্রমিকেরা যে মজুরী পেতেন (OW_0) সেটা তাঁদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (OR) অপেক্ষা কম ছিল। শ্রমিকেরা আগে শোষিত হতেন। শোষণের মাত্রা ছিল পূর্বে W_0R. শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের পরে শ্রমিকেরা তাঁদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী মজুরী পাবেন। অর্থাৎ তাঁদের শোষণ দূর হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে—শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে এবং সেখানে শ্রমিক সংঘের উদ্ভব হলেও মজুরীর হার ও নিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিকদের শোষণ দূর হয়।

১৫.৭. শ্রমিক সংঘ ও মজুরীর হার। শ্রমিক সংঘ কি আন্দোলনের মাধ্যমে মজুরীর হার বৃদ্ধি করতে পারে ?

শ্রমিক সংঘ হল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য গঠিত একটি স্থায়ী

সংগঠন। শ্রমিক সংঘই হল তার সদস্যদের শ্রমের একমাত্র যোগানদার। সংঘ মজ্‌রীর হার ও শ্রমের যোগান উভয় ব্যাপারেই একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর মত শ্রমিক সংঘ উভয় ব্যাপারকেই একসঙ্গে স্থির করতে পারে না। শ্রমিক সংঘ যদি বেশি মজ্‌রীর হার দাবি করে তাহলে সেই মজ্‌রীর হারে মালিকেরা কী পরিমাণ শ্রমের চাহিদা বা নিয়োগ সৃষ্টি করবেন সেটা তাঁরা ঠিক করবেন। আবার শ্রমিক সংঘ যদি নিয়োগের পরিমাণ স্থির করে তাহলে শ্রমের জন্য মালিকদের চাহিদা স্থির করবে মজ্‌রীর হার। শ্রমিক সংঘ যদি মজ্‌রীর হার বৃদ্ধি করে তাহলে মালিকেরা শ্রমিক ছাঁটাই করে নিয়োগ কমিয়ে দেবেন। অপর পক্ষে শ্রমিক সংঘ যদি বেশি শ্রমিকের চাকুরির দাবি করে তাহলে মালিকেরা মজ্‌রীর হার কমিয়ে দেবেন। অর্থাৎ শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের ফলে শ্রমের যোগানের দিকে একচেটিয়া কারবারের সৃষ্টি হয় এবং শ্রমিক সংঘ একচেটিয়া কারবারীর মত শ্রম নামক সেবার দাম (মজ্‌রীর হার) ও সেবার পরিমাণ উভয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিন্তু উভয়কে একসঙ্গে প্রভাবিত করতে পারে না। এখানে শ্রমের জন্য মালিকদের চাহিদার একটি ভূমিকা আছে।

এখানে ধরা হয়েছে যে, শ্রমের অসংখ্য ক্রেতা। কিন্তু মালিকেরা যদি শ্রমিকদের মত সংঘবদ্ধ হন তাহলে চাহিদার দিকেও একচেটিয়া কারবার গড়ে ওঠে। তখন মালিকপক্ষের শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। মজ্‌রীর হার এবং নিয়োগের পরিমাণ—উভয়ের উপর মালিক সংঘের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থাটিকে দ্বিপার্শ্বিক একচেটিয়া কারবার (Bilateral Monopoly) বলা হয়। এখানে শ্রমিক সংঘ একদিকে শ্রমের একমাত্র যোগানদার এবং মালিকপক্ষ একমাত্র ক্রেতা। শ্রমিক সংঘ চায় মজ্‌রীর হার বৃদ্ধি করতে, অথবা নিয়োগ বৃদ্ধি করতে অথবা মজ্‌রী ও নিয়োগ উভয়ই বৃদ্ধি করতে। মালিকেরা চায় মজ্‌রী বা নিয়োগ হ্রাস করতে। এইভাবে শ্রমিক সংঘের ও মালিক সংগঠনের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী হয়ে পড়ে। এখানে মজ্‌রীর হার নির্ধারিত হয় যৌথ দর-কষাকষির মাধ্যমে। যৌথ দর-কষাকষির ক্ষেত্রে মজ্‌রীর হারের উপর শ্রমিক সংঘের প্রভাব খাটবেই এমন কথা বলা যায় না। যদি মালিক সংগঠনের ক্ষমতা আপেক্ষিকভাবে বেশি হয় তাহলে তাঁরা মজ্‌রীর হারকে নিজেদের অনুকূলে টেনে নিয়ে যাবে।

শ্রমিক সংঘ এ ক্ষেত্রে মজ্‌রী বৃদ্ধি করতে পারবে না অবশ্য শ্রমিক সংঘের আপেক্ষিক ক্ষমতা যদি বেশি হয় তাহলেই তারা মজ্‌রী বৃদ্ধি করতে পারবে।

অনেকে মনে করেন, শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দ্বারা আর্থিক মজ্‌রী বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু আন্দোলনের দ্বারা শ্রমিকদের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় না। বাস্তব মজ্‌রী = প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন। এখন আন্দোলনের দ্বারা আর্থিক মজ্‌রী বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকদের আয় বাড়বে ফলে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা বাড়বে। কিন্তু সেই সঙ্গে দ্রব্য-সামগ্রীর যোগান বাড়বে না। ফলে দাম বাড়বে। দাম বাড়লে বাস্তব মজ্‌রী কমবে কিংবা স্থির থাকবে। তাহলে শ্রমিক আন্দোলন

শ্রমিকদের বাস্তব অবস্থার কোন উন্নতি করতে পারে না। এটি শুধু মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে অশ্রমিক জনসাধারণের অসুবিধা ঘটায়।

যাঁরা শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষমতায় বিশ্বাসী তাঁরা বলেন—বাস্তব বাজারে পূর্ণ-প্রতিযোগিতা নেই, আছে অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা। এখানে শ্রমিকের মজুরী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে কম। শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দ্বারা শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে না সত্য কিন্তু শ্রমিকদের মজুরীকে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে।

শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের দ্বারা মজুরীর হার বৃদ্ধি করতে পারে কিনা সেটি আন্দোলনের সাফল্যের উপর নির্ভর করে। এই সাফল্য আবার নির্ভর করে (১) শ্রম ও মূলধনের পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতার উপর, (২) শ্রমের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর, (৩) শ্রমিক সংঘের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার উপর, (৪) শ্রমিকেরা যে দ্রব্য উৎপাদন করছে তার চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর। শ্রমের পরিবর্তে যদি সহজে মূলধনের ব্যবহার করা যায় তাহলে শ্রমিক আন্দোলনের সময় মালিকেরা শ্রমিকদের ছাঁটাই করে যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন করবেন। এর ফলে শ্রমিক আন্দোলন ব্যর্থ হতে পারে। তবে অনেক উৎপাদনে শ্রমের প্রয়োজন খুব বেশি হয়, সেখানে শ্রমিক আন্দোলন সফল হতে পারে। শ্রমের যোগান যদি খুব বেশি স্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে নির্দিষ্ট মজুরীতে মালিকেরা অন্য শ্রমিক পেয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের আন্দোলন সফল হবে না। শ্রমিক সংঘ যদি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান্ হয়ে ওঠে তাহলে তার আন্দোলন সফল হতে পারে। পরিশেষে বলা যায়—

শ্রমিকেরা যে দ্রব্যটি উৎপাদন করেন তার চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি পেলে প্রান্তিক ব্যয় বাড়বে, দ্রব্যের দাম বাড়বে এবং চাহিদা খুব কমবে না। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের আন্দোলন সফল হতে পারে। অপরপক্ষে এই চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা খুব বেশি কমে যাবে। তখন আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্যই নষ্ট হবে। কিন্তু ক্রেতাদের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ব্যাপারে শ্রমিক সংঘের কিছু করার নেই। ক্রেতারা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। কেউ এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

১৫.৮ মজুরীর হারের পার্থক্য (Differences in Wage Rates)

সমতারক্ষাকারী ও অ-সমতারক্ষাকারী পার্থক্য (Equalising and Non-equalising differences):

মজুরী নির্ধারণের তাত্ত্বিক আলোচনায় মজুরীর হার কীভাবে নির্ধারণ করা হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। এখানে শ্রমকে একটি সমজাতীয় ও একক উপাদান হিসেবে দেখা হয়। সেইজন্য মজুরী বা মজুরীর হার বলতে একটি মাত্র হারকে বোঝায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়—বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকেরা বিভিন্ন হারে

মজুরী পান, আবার একই কর্মেও মজুরী বিভিন্ন হয়। বাস্তবে একটি মাত্র মজুরীর হার দেখা যায় না।

আমরা বলতে পারি—মজুরীর হারে দুরকমের পার্থক্য থাকতে পারে, যথা—(ক) প্রথমত—বিভিন্ন কর্মে সমান দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের মজুরী বিভিন্ন হতে পারে, (খ) দ্বিতীয়ত—একই কর্মে নিযুক্ত বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের মজুরী বিভিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে কর্ম পৃথক, শ্রম সমান; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কর্ম সমান, কিন্তু শ্রম পৃথক। যেখানে শ্রমের গুণগত সমতা থাকে, কিন্তু কর্মের পার্থক্যের জন্য মজুরীর হারে পার্থক্য দেখা দেয়, যেমন—নির্বিঘ্ন ও পরিচ্ছন্ন কাজে কম মজুরী ও নোংরা এবং বিপজ্জনক কাজে বেশি মজুরী হয়, সেখানে মজুরীর পার্থক্যকে সমতা-রক্ষাকারী পার্থক্য (Equalising differences) বলা হয়। আবার—যেখানে কর্ম সমান, কিন্তু শ্রমের গুণগত পার্থক্যের জন্য মজুরীর পার্থক্য হয়, যেমন—কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রমিক কম মজুরী পান, বেশি দক্ষতা বা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শ্রমিক বেশি মজুরী পান, সেখানে মজুরীর পার্থক্যকে অ-সমতারক্ষাকারী পার্থক্য (Non-equalising differences) বলা হয়।

নির্বিঘ্ন ও পরিচ্ছন্ন কাজে আর্থিক মজুরী কম হতে পারে, কিন্তু কাজের আনন্দ ও সুবিধা বেশি। বাস্তব মজুরীর হিসেবে বলা যায়, নির্বিঘ্ন ও পরিচ্ছন্ন কাজে বাস্তব মজুরী বেশী। বাস্তব মজুরী=আর্থিক মজুরীর ক্রয়ক্ষমতা+অন্যান্য সুবিধা। পরিচ্ছন্ন কাজে আর্থিক মজুরী কম হয়, ফলে আর্থিক মজুরীর ক্রয়ক্ষমতাও কম হয়, কিন্তু অন্যান্য সুবিধা বেশি হয়, কাজেই পরিচ্ছন্ন কাজে বাস্তব মজুরী বেশি হবে। আবার নোংরা বা বিপজ্জনক কাজে অন্যান্য সুবিধা নেই, বরং বিপদ, প্রাণনাশের আশঙ্কা কিংবা সামাজিক সম্মানের অভাব থাকতে পারে। এক্ষেত্রে যদি নোংরা বা বিপজ্জনক কাজে আর্থিক মজুরী বেশি হয়, তাহলেই তার বাস্তব মজুরী বেশি হতে পারে। এইভাবে বিভিন্ন ধরনের কাজে বাস্তব সুযোগ-সুবিধার পার্থক্যের ক্ষতিপূরণ হিসেবে আর্থিক মজুরীর হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে বাস্তব মজুরীর মধ্যে সমতা আনয়ন করা হয়। সেইজন্য এই পার্থক্যগুলিকে সমতা আনয়নকারী পার্থক্যও বলা যেতে পারে। অপরপক্ষে, যেখানে শ্রমিকের দক্ষতা বা প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বেশি, সেখানে শ্রমিকের বাস্তব মজুরী বেশি হবে। একই কর্মে নিযুক্ত সকল শ্রমিক সমান সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। কাজেই ই অবস্থায় যে শ্রমিকের আর্থিক মজুরী বেশি হবে, তাঁর বাস্তব মজুরীও বেশি হবে। এইভাবে আর্থিক মজুরীর হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে বিভিন্ন গুণ বা দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের মজুরীর হারে যে পার্থক্য রক্ষা করা হয়, তাকে অ-সমতারক্ষাকারী পার্থক্য বলা হয়।

(ক) সমতারক্ষাকারী পার্থক্য : বিভিন্ন কর্মে শ্রমিকদের মজুরীর হারের পার্থক্য নানা কারণে থাকতে পারে :

১। যেসব কাজ নোংরা কাজ—যেমন, রাস্তা-ঘাট, ড্রেন ইত্যাদি পরিষ্কার করার কাজ, কারখানার ধোঁয়ার মধ্যে কাজ ইত্যাদি—সেইসব কাজে আর্থিক মজুরীর হার বেশি হয়।

২। যেসব কাজে শরীর বা মনের উপর চাপ পড়ে সেই সব কাজে আর্থিক মজুরী বেশি হয়। দিনের বেলায় কোন শ্রমিক যে বেতনে কাজ করতে রাজি হন, রাত্রে তিনিই সেই কাজের জন্য বেশি আর্থিক মজুরী দাবি করেন।

৩। যে কাজে সামাজিক মর্যাদাহানির আশঙ্কা থাকে তাতে আর্থিক মজুরী বেশি হয়। এই কারণে কসাই, জেলের প্রহরী, ফাঁসি দেওয়ার লোকের মজুরী বেশি হতে পারে।

৪। যে কাজে শরীর নষ্ট হয়, প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে কিংবা আয়ু কমে যায়—এমন কাজে আর্থিক মজুরী বেশি হয়। যে শ্রমিক ইঞ্জিনের বয়লারে কাজ করেন তাঁর বিপদের আশঙ্কা বেশি, কাজেই তাঁর মজুরী বেশি হবে।

৫। যে কাজের স্থায়িত্ব কম, ছাঁটাই হবার ভয় বেশি, সেই কাজে মজুরী বেশি হয়। ঠিকা কাজে এই কারণে মজুরী বেশি হয়।

৬। যে সব কাজ শিক্ষা করতে বেশি সময় লাগে বা বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় সেই সব কাজে মজুরী বেশি হয়। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ইত্যাদি কাজের শিক্ষালাভ করতে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। বহুদিন সময় লাগে। সেইজন্য এইসব কাজে মজুরী বেশি হয়।

(খ) অ-সমতারক্ষাকারী পার্থক্য ঃ একই প্রতিষ্ঠানে বা একই কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরীতে অ-সমতারক্ষাকারী পার্থক্য নানা কারণে থাকতে পারে ঃ

১। অভিজ্ঞতার পার্থক্যের জন্য এইরূপ পার্থক্য থাকতে পারে। যে শ্রমিক বেশি দিন ধরে কাজ করছেন তিনি সেই কর্মে নিযুক্ত নতুন শ্রমিকদের চেয়ে বেশি মজুরী পাবেন।

২। আবার একই কর্মে নিযুক্ত বেশি দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিক অন্য শ্রমিকদের চেয়ে বেশি মজুরী পেতে পারেন।

৩। আঞ্চলিক অবস্থার পার্থক্যের জন্যও বিভিন্ন স্থানে একই কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকেরা বিভিন্ন হারে মজুরী পেতে পারেন।

ভারতের মহারাষ্ট্রে কারখানা-শ্রমিকের যে মজুরী, বিহারে বা রাজস্থানে তার চেয়ে কম হতে পারে। সাধারণত বিভিন্ন স্থানের অর্থনৈতিক পরিবেশের পার্থক্যের জন্যও মজুরী হারে পার্থক্য থাকে।

৪। যে সব শ্রমিকের গতিশীলতা কম, যাঁদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব নেই তাঁরা একই কর্মে নিযুক্ত থেকে বেশি গতিশীল শ্রমিকের চেয়ে কম মজুরী পেতে পারেন।

৫। আবার কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের রাজনৈতিক সংগঠন দৃঢ় হলে সেখানের শ্রমিকদের মজুরী সমান কাজে নিযুক্ত অন্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের চেয়ে বেশি হয়।

৬। অনেক সময় একই কর্মে নিযুক্ত কোন কর্মী অন্য কর্মীদের চেয়ে বেশি মজুরী পেয়ে যান—কিন্তু তার যুক্তিগ্রাহ্য অর্থনৈতিক কারণ থাকে না। হয়তো সেই

শ্রমিকের এমন কোন আভ্যন্তর গুণ থাকে কিংবা বাহ্যিক কোন সংযোগ থাকে যার ফলে তার পক্ষে বেশি মজুরী পাওয়া সম্ভব হয়। সাধারণ মানুষে একে "ভাগ্য" বলে মেনে নেয়।

প্রশ্নাবলী

১। মজুরী কাকে বলে? পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে কীভাবে মজুরী নির্ধারিত হয়?

২। তুমি কি মনে কর যে—পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে মজুরীর হার শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান হয়? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৩। শ্রমের যোগান রেখা কাকে বলে? শ্রমের যোগান রেখার আকৃতি কীরূপ হয়, রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝাও।

৪। মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ত্বটির পর্যালোচনা কর।

৫। "অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে শ্রমের মজুরী শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের চেয়ে কম হয়।"—এই উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

৬। শ্রমিক সংঘ কাকে বলে? শ্রমিক সংঘের উদ্ভবের ফলে শ্রমের মজুরী ও শ্রমের নিয়োগের উপর কীরূপ প্রভাব পড়ে আলোচনা কর।

৭। শ্রমিক সংঘ কি আন্দোলনের দ্বারা মজুরী বৃদ্ধি করতে পারে? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৮। মজুরীর হারে সমতারক্ষাকারী পার্থক্য ও অ-সমতারক্ষাকারী পার্থক্যের প্রভেদ দেখাও। মজুরীর হারে কেন পার্থক্য দেখা দেয়?

৯। আর্থিক মজুরী ও বাস্তব মজুরীর পার্থক্য কর। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আর্থিক মজুরীর পার্থক্য দেখা দেয়? কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বাস্তব মজুরীর পার্থক্য দেখা দেয়?

১০। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:**

(ক) শ্রম কী? অদক্ষ শ্রম ও দক্ষ শ্রমে কী পার্থক্য আছে?

(খ) বাস্তব মজুরী কী? বাস্তব মজুরী কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

(গ) শ্রমের যোগান রেখা কীভাবে পশ্চাদ্মুখী হতে পারে?

(ঘ) প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন ও প্রান্তিক আয় উৎপাদনের পার্থক্য কর।

(ঙ) শ্রমের চাহিদা রেখার আকৃতি কেমন হয় সংক্ষেপে বোঝাও।

(চ) "শ্রমের নিয়োগকর্তা তাঁর মুনাফা সর্বাধিক করার জন্যই শ্রমিকদের প্রান্তিক উৎপাদনের সমান মজুরী দেন"—এটা কি ঠিক? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

(ছ) শোষণ কাকে বলে? কোন্ শ্রমের বাজারে শ্রমিকদের শোষণ করা হয়?

(জ) শ্রমিক সংঘ কখন শুধুমাত্র মজুরী বাড়াতে পারে, কখন মজুরী ও নিয়োগ বাড়াতে পারে?

(ঝ) মজুরীর সমতারক্ষাকারী পার্থক্য বলতে কী বো[illegible]? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

(ঞ) মজুরীর অ-সমতারক্ষাকারী পার্থক্য বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

১৬ খাজনা

১৬.১ জমি কাকে বলে ?

(ক) সাধারণ ভাষায় জমি হল পৃথিবীর স্থলভাগের অংশ যেখানে মানুষ কৃষি-কার্যের দ্বারা নানারকম শস্য উৎপাদন করে। বলা বাহুল্য এই জমি হল কৃষি জমি। অর্থনীতিতে জমি বলতে কৃষি জমি ছাড়াও খনিজ সম্পদ, দেশের নদী, সমুদ্র, পাহাড়, বন সব কিছুকে বোঝায়। জমি হল, এমন একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, যার যোগান সীমাবদ্ধ এবং যে সম্পদ মানুষের উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(খ) খাজনা কাকে বলে—খাজনা হল জমি নামক উৎপাদন উপাদানের সেবার দাম। জমির কোন একজন মালিক থাকেন। সেই মালিক জমিকে উৎপাদন কাজে ব্যবহার করেন কিংবা অন্যকে ব্যবহার করতে দেন। অন্যকে ব্যবহার করতে দিলে, জমির মালিককে সাময়িকভাবে জমির মালিকানা পরিত্যাগ করতে হয়। অতএব খাজনা হল এই মালিকানা পরিত্যাগের পুরস্কার। জমি উৎপাদন কার্যে অংশ গ্রহণ করে উৎপাদনে সাহায্য করে বলে জমির মালিককে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি—খাজনা জমির দাম নয়। খাজনা হল জমি নামক সম্পদের সেবার দাম।

অন্যভাবে বলা যায়, জমি নামক উৎপাদনের উপাদান উৎপাদনের কাজে অংশ গ্রহণ করে দ্রব্যের উৎপাদনকে সম্ভব করে তোলে। জমির মালিক তাঁর জমির মালিকানা সাময়িকভাবে পরিত্যাগ করে পরোক্ষভাবে এই উৎপাদন কার্যে অংশ গ্রহণ করে থাকেন এবং তার জন্য তিনি যে পুরস্কার পেয়ে থাকেন তাকেই খাজনা বলা হয়।

১৬.২ জমি ও খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্ব :

(ক) ভূমিকা : ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত অর্থ-নীতিবিদ ডেভিড্ রিকার্ডো প্রথম জমি ও খাজনা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। রিকার্ডোর সময়ে ইংল্যাণ্ডে জমিদারদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেশি ছিল। রিকার্ডো তাঁর খাজনাতত্ত্বে এই জমিদার শ্রেণীর মানুষদের ভূমিকা এবং তাঁদের আয়ের স্বরূপ নির্ণয় করেন। রিকার্ডোর এই খাজনাতত্ত্বটির একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। এই খাজনাতত্ত্বে রিকার্ডো দেখিয়েছিলেন যে, জমিদার শ্রেণীর মানুষেরা অনুপার্জিত আয় ভোগ করে থাকেন। কৃষিকার্যে জমির প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু জমি জমিদারের সৃষ্টি নয় জমি প্রকৃতির দান। কাজেই জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নেই। জমিদার জমির মালিক। কিন্তু এই মালিকানা ব্যয় শূন্য ব্যাপার। কাজেই জমির মালিক যে খাজনা পেয়ে থাকেন সেটা পুরোপুরি উদ্বৃত্ত। জমিদার শ্রেণীর মানুষেরা সমাজের

পরজীবী বিশেষ। সরকার যদি কর চাপিয়ে সব খাজনা আদায় করে নেন, তাহলেও কৃষিকার্যের কোন ক্ষতি হবে না, সমাজেরও কোন ক্ষতি হবে না। এইভাবে দেখলে বলা যায়—রিকার্ডোর তত্ত্বটি একটি বৈপ্লবিক তত্ত্ব।

(খ) **রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব :** বিখ্যাত ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডো জমির খাজনা সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটি বিস্তারিত তত্ত্ব প্রচার করেন। এই তত্ত্বটি রিকার্ডোর খাজনা-তত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ।

রিকার্ডোর মতে, জমি হল মাটির আদিম ও অবিনশ্বর শক্তি (Original and Indestructible power of the soil)। মাটির এই শক্তি বীজকে অঙ্কুরিত করে, চারা গাছকে বাড়িয়ে তোলে এবং তার ফুল ও ফল হতে সাহায্য করে। রিকার্ডোর মতে, জমির এই উর্বরতা শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক শক্তি। মানুষ উর্বরতা শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না, তাকে ধ্বংস করতেও পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, রিকার্ডো মনে করতেন যে, মাটির উর্বরতা শক্তি সকল জমির ক্ষেত্রে সমান নয়। কোন জমি খুব বেশী উর্বর, কোন জমির উর্বরতা কম, আবার কোন জমি অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের। অর্থাৎ, রিকার্ডোর মতে, জমির উর্বরতার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, রিকার্ডোর মতে, জমির কোন বিকল্প ব্যবহার থাকে না, যার জন্য চাষের কাজে জমি ব্যবহার করতে হলে জমির কোন ব্যয় থাকে না।

চতুর্থতঃ, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্য থাকায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জমিতে উৎপাদনের ব্যয় বিভিন্ন হয়। সাধারণতঃ বেশী উর্বর জমিতে এই ব্যয় বেশী হয়। এই অবস্থায় অধিক উর্বরতাসম্পন্ন জমিতে ফসল উৎপাদন ও বিক্রয় করে যে মোট আয় পাওয়া যায় সেই আয় থেকে উৎপাদনের ব্যয় বাদ দিলে কিছু উদ্বৃত্ত বা খাজনা সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ রিকার্ডোর মতে, খাজনা হল একপ্রকার উদ্বৃত্ত, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের জন্য যে উদ্বৃত্তের উদ্ভব ঘটে। এইজন্য খাজনাকে তিনি পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত (Differential Surplus) বলেছেন।

পঞ্চমতঃ, রিকার্ডোর মতে জমিতে যে খাজনা সৃষ্টি হয় সেই খাজনা ভোগ করেন জমিদারগণ। কিন্তু তাঁরা ফসল উৎপাদনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত থাকেন না। তাঁরা জমি নামক একটি প্রাকৃতিক সম্পদের উপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বা মালিকানা সৃষ্টি করেন এবং এর দ্বারা জমির যোগানকে সীমাবদ্ধ করে তোলেন। খাজনা হল জমি নামক একটি প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যক্তিগত অধিকারে সংকুচিত করার পুরস্কার। জমিদার যেহেতু ফসল চাষের জন্য কোন পরিশ্রম করেন না, সেজন্য জমির খাজনাকে তিনি জমিদারদের অনুপার্জিত উদ্বৃত্ত (Unearned Surplus) বলেছেন।

যাই হোক, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের জন্য কীভাবে খাজনার উদ্ভব হয় সেই বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যায়। ধরা যাক্ কোন স্থানে

A, B ও C নামক তিন প্রকার জমি আছে। A জমি সবচেয়ে বেশী উর্বর, B জমির উর্বরতা তার চেয়ে কম এবং C জমির উর্বরতা B জমির উর্বরতার চেয়ে কম। ধরা যাক, এই তিন প্রকার জমিতে ১০০ একক করে ফসল উৎপন্ন হয় এবং তার জন্য মোট ব্যয় হয় A জমিতে ১০০ টাকা, B জমিতে ২০০ টাকা এবং C জমিতে ৩০০ টাকা। C জমি যদি চাষ করতে হয় তাহলে ১০০ একক ফসল বিক্রয় করে মোট আয় কমপক্ষে ৩০০ টাকা হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ ফসলের দাম প্রতি এককের জন্য ৩ টাকা না হলে C জমিতে চাষ হয় না। এর ফলে দেশে খাদ্যশস্যের অভাব দেখা দিতে পারে। ফসলের দাম প্রতি একক ৩ টাকা হলে সেই দামে ফসল বিক্রয় করে প্রত্যেক জমিতে ৩০০ টাকা মোট আয় হবে। মোট আয় থেকে ফসলের মোট ব্যয় বাদ দিলে A জমিতে ২০০ টাকা, B জমিতে ১০০ টাকা উদ্বৃত্ত বা খাজনা সৃষ্টি হবে। C জমিতে কোন উদ্বৃত্ত বা খাজনা হবে না। এখানে C হল খাজনাবিহীন জমি (No-rent land)। নীচের ছকে এই বিষয়টি দেখানো হয়েছে।

জমির শ্রেণী	ফসলের পরিমাণ	উৎপাদন ব্যয়	ফসলের দাম	মোট আয়	খাজনা বা উদ্বৃত্ত
A	১০০ একক	১০০ টাকা	৩ টাকা	৩০০ টাকা	২০০ টাকা
B	১০০ „	২০০ „	৩ „	৩০০ „	১০০ „
C	১০০ „	৩০০ „	৩ „	৩০০ „	০

এর থেকে বোঝা যায় যে, জমির উর্বরতা শক্তির পার্থক্যের জন্য অধিক উর্বর জমিতে খাজনা হয়। সকল জমির উর্বরতা যদি সমান হয় তাহলে রিকার্ডোর মতে খাজনা হয় না।

(গ) **রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের সমালোচনা :** আধুনিক অর্থনীতিতে রিকার্ডোর এই খাজনাতত্ত্বটির নানারকমভাবে সমালোচনা করা হয়েছে।

প্রথমত, রিকার্ডো জমির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে জমিকে অত্যন্ত সীমিত অর্থে ধরা হয়েছে। জমি বলতে তিনি প্রধানত কৃষি জমিকেই ধরেছেন। কিন্তু জমিতে বাড়ি-ঘর তৈরী করা যায়, কারখানা গড়ে তোলা যায়। জমি বহু প্রকার উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হতে পারে। আমরা বলতে পারি জমির বিকল্প ব্যবহার আছে। রিকার্ডোর সংজ্ঞা মতে কিন্তু জমির কোন বিকল্প ব্যবহার থাকে না।

দ্বিতীয়ত, জমির উর্বরতা শক্তি অবিনশ্বর বা আদিম কিছুই নয়। জমির উর্বরতা সার প্রয়োগে বৃদ্ধি পায়। সার প্রয়োগ না করে জমিতে বছরের পর বছর শস্য উৎপাদন করলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। সার, সেচ প্রয়োগ করতে হলে জমির উপর শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হয়। কাজেই জমিকে আদিম শক্তি বা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির দান বলা যায় না।

তৃতীয়ত, জমির উৎপাদন ব্যয় নেই একথাটি ঠিক নয়। জমিকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করতে হলে জমিকে সমতল করতে হয়, বেড়া দিতে হয়, সেচের ব্যবস্থা

করতে হয় এবং এসবের জন্য শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করতে হয়। জমির মালিক যখন জমিকে উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করেন এবং তার জন্য যে খাজনা পেয়ে থাকেন তার সম্পূর্ণটি উদ্বৃত্ত নয়। অর্থাৎ জমির উৎপাদন ব্যয় আছে এবং খাজনাও পুরোপুরি উদ্বৃত্ত নয়।

চতুর্থত, জমিদারের কোন সামাজিক ভূমিকা নেই, জমিদার উত্তরাধিকারসূত্রে জমির মালিকানা ভোগ করেন এবং সেই মালিকানা পরিত্যাগ করার জন্য যে খাজনা পেয়ে থাকেন তা সম্পূর্ণ অনুপার্জিত আয়—একথাও ঠিক নয়।

জমি যদি প্রাকৃতিক সম্পদ হয় এবং জমিদারের আয়কে যদি অনুপার্জিত আয় বলা হয় তাহলে শ্রম ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রমিকের আয়কেও অনুপার্জিত আয় বলতে হয়। মূলধনের মালিক যে সুদ পান তাকেও তো অনুপার্জিত আয় বলতে হয়। মুনাফাও তাহলে অনুপার্জিত আয়। গভীর অর্থে মানুষ প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে কোন আয় উপার্জন করতে পারে না।

পঞ্চমত, অনুপার্জিত আয়ের মালিককে যদি উদ্বৃত্তভোগী সামাজিক পরজীবী বলা হয়, তাহলে সমাজের প্রায় সকলেই কোন-না-কোনভাবে পরজীবী।

ষষ্ঠত, জমির উর্বরতার পার্থক্যের জন্যই খাজনার উদ্ভব হয়—একথাও ঠিক নয়। সব জমির উর্বরতা সমান হলেও খাজনার উদ্ভব হতে পারে। অধ্যাপক মার্শালের মতে খাজনার উদ্ভবের কারণ হল জমির দুষ্প্রাপ্যতা।

১৬.৩ মার্শালের খাজনাতত্ত্ব :

(ক) ভূমিকা : অধ্যাপক মার্শাল রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা যায়—একে আরও মার্জিত ও উন্নত করেছেন এবং জমি ছাড়া অন্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগকে সম্প্রসারিত করেছেন।

মার্শালের খাজনাতত্ত্বের মূল বক্তব্য দুটি (ক) খাজনা হল জমির দুষ্প্রাপ্যতার পরিণাম, (খ) জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনার প্রভাব থাকতে পারে।

(খ) দুষ্প্রাপ্যতাজনিত খাজনা (Scarcity rent) :

মার্শালের মতে জমি হল একটি বিশেষ প্রাকৃতিক সম্পদ যার যোগান সীমিত। আলো বা হাওয়া প্রাকৃতিক সম্পদ। উৎপাদনের কাজে আলো বা হাওয়ার ব্যবহার হতে পারে। কিন্তু আলো ও হাওয়ার যোগান অফুরন্ত বলে এদের জমি বলা যায় না। যে প্রাকৃতিক সম্পদ উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং যার যোগান সীমাবদ্ধ তাকেই জমি বলা যায়। জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা হল জমির দুষ্প্রাপ্যতা।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বে ধরা হয় জমির উর্বরতা সমান নয়। এর অর্থ হল যে, একটি বিশেষ মানের উর্বরতাসম্পন্ন জমি দুষ্প্রাপ্য, তাই মানুষকে কম উর্বর জমিতে চাষ করতে হয়। অর্থাৎ জমির উর্বরতার পার্থক্যই হল জমির দুষ্প্রাপ্যতার আর এক নাম।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বে দেখানো হয় যে, সব জমির উর্বরতা সমান হলে খাজনার উদ্ভব হয় না। মার্শালের তত্ত্বে দেখানো হয়—সব জমির উর্বরতা সমান হলেও খাজনার উদ্ভব হয়। জমির উর্বরতা সমান হলেও জমির যোগান সীমাবদ্ধ হতে পারে। সেখানে একই জমি থেকে বেশি পরিমাণে শস্য উৎপাদন করতে হলে নিবিড় পদ্ধতিতে চাষ করতে হয়। একই জমিতে বেশি পরিমাণে শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু জমির পরিমাণ স্থির রেখে অন্য উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে শস্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি দেখা দেয়। অর্থাৎ সমান খরচ করে প্রত্যেকবার কম পরিমাণে শস্য পাওয়া যায়, কিংবা, একই জমি থেকে সমান পরিমাণ শস্য পেতে হলে প্রত্যেকবার বেশি খরচ করতে হয়। ধরি, একখণ্ড জমি থেকে প্রত্যেক বার ১০০ একক শস্য উৎপাদন করতে হচ্ছে। তার জন্য ব্যয় হয় প্রথম বারে, ধরি ১০০ টাকা, দ্বিতীয় বারে ২০০ টাকা, এবং তৃতীয় বারে ৩০০ টাকা। এখানে মোট ব্যয় ৬০০ টাকা। প্রান্তিক ব্যয় ৩০০ টাকা। শস্যের বাজারে যদি পূর্ণ-প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে শস্যের দাম প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হবে। অর্থাৎ প্রতি ১০০ একক শস্যের দাম হবে ৩০০ টাকা। এই দামে ৩০০ একক শস্যের দাম হবে ৯০০ টাকা। এখানে ৯০০ টাকা হল শস্য উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত মোট আয়। তার থেকে মোট ব্যয় ৬০০ টাকা বাদ দিলে ৩০০ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। এই ৩০০ টাকা হল খাজনা। অতএব জমির খাজনা = শস্যের উৎপাদন ও বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত মোট আয়—উৎপাদনের মোট ব্যয়। তাহলে আমরা পাই—

জমির উর্বরতা সমান হলেও খাজনার উদ্ভব হতে পারে, কারণ খাজনার উদ্ভবের কারণ জমির উর্বরতার পার্থক্য নয়। জমির দুষ্প্রাপ্যতাই খাজনা উদ্ভবের কারণ। মার্শালের মতে, সব পার্থক্যজনিত খাজনাই হল দুষ্প্রাপ্যতাজনিত খাজনা (All differential rents are scarcity rents)।

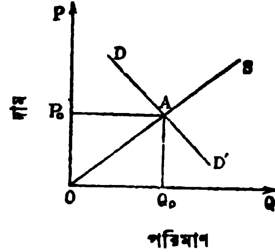
১৬.৪ যোগান, যোগান-দাম ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে খাজনার সম্পর্ক :

মার্শালের মতে জমির যোগান সীমাবদ্ধ বলেই জমিতে খাজনার উদ্ভব হয়। যোগানের সীমাবদ্ধতা হল যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা। তাহলে আমরা বলতে পারি—**জমির যোগানের অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় জমিতে খাজনার উদ্ভব হয়।** জমির যোগান যত বেশি অস্থিতিস্থাপক হবে, খাজনাও তত বেশি হবে। অপর পক্ষে, যোগান যত স্থিতিস্থাপক হবে খাজনাও তত কম হবে। এই ব্যাপারটি যোগান-দাম নামক ধারণার সাহায্যে ভালোভাবে বোঝানো যায়।

যোগান-দাম (Supply price) হল একটি নিম্নতম দাম যা না পেলে কোন দ্রব্য বা উপাদানের মালিক সেই দ্রব্য বা উপাদানের যোগান দিতে রাজী হন না। কোন দ্রব্যের যোগান-দামকে আমরা সেই দ্রব্যের প্রান্তিক ব্যয় বলতে পারি। **যোগান রেখার নীচে রেখাচিত্রের যে অংশ থাকে তাকেই মোট যোগান-দাম বলা হয়।** মোট যোগান দাম হল মোট ব্যয় অর্থাৎ বিভিন্ন এককের প্রান্তিক ব্যয়ের বা যোগান-দামের যোগফল।

রেখাচিত্র দিয়ে এটি দেখানো হল। আমাদের ১৬.১নং রেখাচিত্রে OS হল জমির যোগান রেখা। যদি OQ_0 পরিমাণ জমির যোগান পেতে হয়, তাহলে তার জন্য মোট যোগান দাম দিতে হবে OAQ_0. OAQ_0 ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রটি OS যোগান রেখার নীচে আছে।

এখন ধরি DD′ হল জমির চাহিদা রেখা। তাহলে জমি নামক উপাদানের প্রতি একক সেবার দাম হবে OP_0. জমির মালিকের মোট আয় হবে $OP_0 \times OQ_0 = OP_0AQ_0$. এই মোট আয় থেকে জমির মোট যোগান-দাম OAQ_0 বিয়োগ করলে OAP_0 নামক ত্রিভুজটি থাকবে। এটি হল জমির মালিকের মোট উদ্বৃত্ত আয়। একে খাজনা বলা যায়। আপাত দৃষ্টিতে জমির মালিক খাজনা হিসেবে পাবেন OP_0AQ_0. কিন্তু OP_0AQ_0 থেকে জমির মোট যোগান-দাম OAQ_0 বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত থাকবে, তাই হবে মোট উদ্বৃত্ত বা খাজনা। আমাদের রেখাচিত্রে এই উদ্বৃত্ত হল OAP_0.



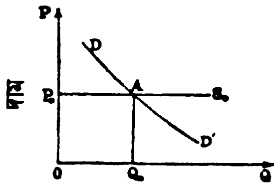
১৬.১ রেখাচিত্র: যোগান-দাম ও খাজনা

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, জমি পুরোপুরি প্রকৃতির দান, জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নেই—এই ধারণাকে এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার জায়গায় ধরা হয়েছে যে, জমির উৎপাদন ব্যয় আছে। এই উৎপাদন ব্যয়ই হল জমির যোগান-দাম। জমির মালিক অপরকে যদি জমি চাষ করতে দেন, তাহলে তিনি চাষীর কাছ থেকে নিম্নতম যোগান-দাম স্বরূপ কিছু অর্থ দাবি করবেন, এই অর্থ না পেলে তাঁর পক্ষে জমির যোগান দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু তিনি যদি বেশি পান, তাহলে তাঁর উদ্বৃত্ত কিছু পাওনা হবে। একে আমরা বিশুদ্ধ খাজনা (Pure rent) বলতে পারি। জমির মালিক অন্যাকে জমি ব্যবহার করতে দিয়ে যে অর্থ পান, তাকে সাধারণ খাজনা বলা যেতে পারে। এই সাধারণ খাজনা বা জমির মালিকের প্রকৃত আয় চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়। যোগান যদি স্থির থাকে তাহলে চাহিদা বেশি হলে জমির মালিকের প্রকৃত আয় বেশি হয়; চাহিদা কম থাকলে জমির মালিকের প্রকৃত আয় কম হয়।

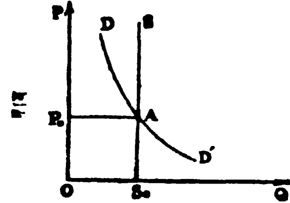
যাহোক, প্রকৃত আয় থেকে মোট যোগান-দাম বাদ দিলে যে উদ্বৃত্ত থাকে তা নির্ভর করছে প্রকৃত আয় ও যোগান-দামের উপর। খাজনা = প্রকৃত আয় — মোট যোগান-দাম। এখন প্রকৃত আয় যদি স্থির থাকে তাহলে যোগান-দাম যত বাড়বে (বা কমবে) খাজনা তত কমবে (বা বাড়বে)। এখানে খাজনা যোগান-দামের উপর নির্ভর করবে।

যোগান-দাম আবার নির্ভর করবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর। ১৬.১ নং রেখাচিত্রে A বিন্দুটিকে স্থির রেখে OS রেখাটিকে যদি ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরানো যায়, তাহলে যোগান রেখার স্থিতিস্থাপকতা বাড়বে এবং তার সঙ্গে তাল রেখে বাড়বে

যোগান-দাম। যোগান-দাম বাড়লে খাজনা কমবে। বিপরীত পক্ষে, OS রেখাটি যদি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে, তাহলে যোগান রেখার স্থিতিস্থাপকতা কমবে এবং যোগান-দাম কমবে। যোগান-দাম কমলে খাজনা বা উদ্বৃত্ত বাড়বে। তাহলে আমরা পাই, জমির যোগান যত স্থিতিস্থাপক হবে জমির যোগান-দাম তত বাড়বে এবং খাজনা বা উদ্বৃত্ত তত কমবে। জমির যোগান যদি পূর্ণস্থিতিস্থাপক ($e_s = \infty$) হয়, তাহলে জমির আয়ের সম্পূর্ণটি হবে যোগান-দাম। আমাদের ১৬.২নং রেখাচিত্রে



১৬.২ রেখাচিত্র: পূর্ণস্থিতিস্থাপক যোগান ও খাজনা



১৬.৩ রেখাচিত্র: পূর্ণঅস্থিতিস্থাপক যোগান ও খাজনা

এটি দেখানো হয়েছে। এখানে P_0S হল জমির পূর্ণস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা। এখানে জমির প্রাপ্ত আয় $= OP_0AQ_0 =$ মোট যোগান-দাম। কাজেই এখানে উদ্বৃত্ত বা খাজনা শূন্য। অর্থাৎ কোন খাজনা থাকবে না। অপরপক্ষে, জমির যোগান যদি পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক ($e_s = O$) হয়, তাহলে জমির যোগান-দাম হবে শূন্য। সে-ক্ষেত্রে জমির প্রাপ্ত আয়ের সমগ্রটি খাজনা বা উদ্বৃত্ত হবে। আমাদের ১৬.৩ নং রেখা-চিত্রে এটি দেখানো হয়েছে। এখানে SS_0 হল জমির পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা।

এখানে জমির প্রাপ্ত আয় $= OP_0AS_0$. এখানে যোগান দাম $= O$. অতএব খাজনা $=$ প্রাপ্ত আয় $-$ যোগান-দাম প্রাপ্ত আয় $= OP_0AS_0$ (কারণ যোগান-দাম $= O$)।

১৬.৫ অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনার প্রভাব থাকে কি ?

অধ্যাপক মার্শালের মতে জমির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়ায় জমিতে খাজনার উদ্ভব হয়। জমির যোগান সীমাবদ্ধ বললে বোঝায় জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক। এখানে খাজনা বলতে বোঝায় জমির মোট আয় এবং জমির মোট যোগান-দামের পার্থক্য।

জমি হল একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। যদি ধরে নিই জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নেই, তাহলে জমির যোগান-দাম শূন্য হবে। এই অবস্থায় জমির সেবার জন্য যে মোট আয় পাওয়া যাবে, তার সমগ্রটিই হবে উদ্বৃত্ত বা খাজনা। খাজনা = জমির আয় —

জমির ব্যয়, কিংবা, জমির যোগান-দাম। জমি যদি পুরোপুরি প্রকৃতির দান হয়, তাহলে তার যোগান-দাম থাকবে না। কাজেই খাজনা হিসেবে জমিদার যা পাবেন, তার সমগ্রটি হবে উদ্বৃত্ত। রিকার্ডোর সংজ্ঞানুযায়ী এই উদ্বৃত্তকে খাজনা বলা হয়।

মার্শালের মতে জমি পুরোপুরি প্রকৃতির দান নয়। জমি মূলত প্রকৃতির দান। কিন্তু প্রকৃতির দান হিসেবে যে জমি পাওয়া যায়, তার উপর শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করে জমিকে চাষযোগ্য বা ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে হয়। এর জন্য যে খরচ হয় তাকে জমির যোগান-দাম বলা হয়। জমির যোগান-দাম হল জমি যোগান দেওয়ার ব্যয়। একে আমরা জমির প্রান্তিক ব্যয় বলতে পারি। প্রান্তিক ব্যয় রেখা উর্ধমুখী হয়, তার কারণ অতিরিক্ত জমি যোগান দিতে হলে অতিরিক্ত ব্যয় হয়। অতিরিক্ত ব্যয় করে জমির যোগান খুব বেশি পরিমাণে বাড়ানো সম্ভব নয়। সেইজন্য জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক। জমির যোগান স্থিতিস্থাপক হলে খুব সহজেই জমির যোগান বৃদ্ধি করা যেত। জমির যোগান যদি পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে জমির যোগান কোন মতেই বাড়বে না। সেখানে অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। কাজেই জমির যোগান দাম-শূন্য হবে। তখন জমির পাওনা হিসেবে যে আয় পাওয়া যাবে তার সমগ্রটি খাজনা হবে। জমির যোগান যদি বেশি পরিবর্তনশীল বা স্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে জমির যোগান-দাম বেশি হবে, কাজেই জমির আয়ের মধ্যে একটি অংশ হবে জমির যোগান-দাম এবং বাকি অংশটি হবে জমির খাজনা। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, এক বিঘা জমির জন্য যদি ৩০ টাকা আয় পাওয়া যায় এবং তার মধ্যে জমির যোগান-দাম যদি ২০ টাকা হয়, তাহলে খাজনা বা উদ্বৃত্ত হবে ১০ টাকা। জমির যোগান পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হলে, জমির যোগান-দাম থাকত না। সেক্ষেত্রে ৩০ টাকাই খাজনা বা উদ্বৃত্ত হত। আবার জমির যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হলে, ৩০ টাকাই যোগান-দাম হত এবং সেক্ষেত্রে খাজনা শূন্য হত।

তাহলে আমরা পাই, **জমির যোগান অস্থিতিস্থাপক হওয়ার জন্যই জমিতে উদ্বৃত্ত খাজনার উদ্ভব হয়। মার্শালের এই তত্ত্বটিকে সহজেই অন্য উপাদানগুলির প্রতি প্রয়োগ করা যায়। জমির মত শ্রম, কিংবা মূলধন কিংবা উদ্যোগের যোগানও যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে মজুরী, সুদ কিংবা মুনাফার মধ্যেও খাজনার অংশ থাকবে।** মার্শাল মনে করেন, জমির মতো শ্রম, মূলধন এবং উদ্যোগও অস্থিতিস্থাপক যোগান-সম্পন্ন হতে পারে।

কোন বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের যোগান অস্থিতিস্থাপক হতে পারে। এরকম শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি করতে হলে দক্ষতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হয়। দক্ষতা সৃষ্টির জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়তে হয়, শ্রমিককে প্রকৃত কর্মস্থলে প্রশিক্ষণ দিতে হয়। এসবই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই স্বল্পকালে দক্ষ শ্রমিকের যোগান অস্থিতিস্থাপক হতে পারে। সেক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক যে মজুরী পাবেন, তার মধ্যে একটি অংশ খাজনা বা উদ্বৃত্ত হিসেবে গণ্য হবে। শ্রমিকের যোগান যত বেশি অস্থিতিস্থাপক হবে, ততই তার মজুরীর মধ্যে খাজনার অংশ বৃদ্ধি পাবে।

শ্রমিকের মতো কোন বিশেষ মূলধন দ্রব্য বা যন্ত্রপাতির যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক হতে পারে। যে প্রতিষ্ঠান সেই মূলধন দ্রব্যটি উৎপাদন করে তার কোন অসুবিধা থাকতে পারে। সেই দ্রব্যের উৎপাদন খুবই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হতে পারে। আবার সেই মূলধন দ্রব্য বা যন্ত্র বসাতে অনেক সময় লাগতে পারে। এরূপ নানা কারণে কোন বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির যোগান সীমাবদ্ধ হতে পারে। তাহলে সেই যন্ত্রের আয় বা সুদের মধ্যেও খাজনার অংশ থাকবে।

জমি, শ্রম ও মূলধনের মতো উদ্যোগ নামক উপাদানের যোগানও অস্থিতিস্থাপক হতে পারে। সব উদ্যোক্তার দক্ষতা ও দূরদৃষ্টি সমান হয় না। কোন উদ্যোক্তার দক্ষতা বেশি হয়। সেই উদ্যোক্তার আয় বা মুনাফার মধ্যেও খাজনার প্রভাব থাকবে, একে সামর্থ্যের জন্য খাজনা (Rent of ability) বলা হয়। যে উদ্যোক্তার দক্ষতা সাধারণ মাপের, তিনি খাজনা বা উদ্বৃত্ত পান না। তিনি কেবল সাধারণ মুনাফা পান। আমরা বলতে পারি—কোন বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তার যোগান অস্থিতিস্থাপক হতে পারে। তাহলে উদ্যোক্তার মুনাফার মধ্যেও খাজনার অংশ থাকবে।

এইভাবে আমরা দেখি, শুধু জমিতেই যে খাজনার উদ্ভব হয়—এমন নয়। জমিতে খাজনার উদ্ভব হয় সত্য; কিন্তু জমিছাড়া শ্রম, মূলধন ও উদ্যোগের যোগানও স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক হতে পারে, তাহলে শ্রমের মজুরী, মূলধনের সুদ ও উদ্যোক্তার মুনাফার মধ্যেও খাজনার প্রভাব থাকতে পারে। জমির খাজনা হল একটি সাধারণ আয়—যা সবকটি উপাদানের মধ্যেই থাকতে পারে। তবে জমির খাজনার সঙ্গে অন্য উপাদানের খাজনার একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। জমির যোগান স্বল্পকালে স্থির হয়। এমন কি দীর্ঘকালেও জমির যোগান সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল বা অস্থিতিস্থাপক থাকতে পারে। কিন্তু শ্রম, মূলধন, উদ্যোগ প্রভৃতি যোগানের সীমাবদ্ধতা স্বল্পকালীন ব্যাপার মাত্র। দীর্ঘকালে শ্রম, মূলধন ও উদ্যোগের যোগান বৃদ্ধি করা যায়। ফলে দীর্ঘকালে ঐ সব উপাদানের যোগান স্থিতিস্থাপক হতে পারে। তখন তাদের আয়ের মধ্যে খাজনার প্রভাব আর থাকবে না। খাজনার অংশ শূন্য হবে। কিন্তু জমির যোগান দীর্ঘকালেও অস্থিতিস্থাপক থাকতে পারে। অতএব জমির খাজনা স্বল্পকালে তো থাকবেই দীর্ঘকালেও থাকতে পারে। সেইজন্য মার্শাল জমির খাজনাকে **leading species of a large genus** বলেছেন।

১৬.৬ আধুনিক খাজনাতত্ত্ব (Modern Theory of Rent)

আধুনিক খাজনাতত্ত্বে জমিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির দান হিসাবে দেখা হয় না। তাছাড়া জমির কোন বিকল্প ব্যবহার থাকতে পারে না সে কথাও স্বীকার করা হয় না। বরং বলা হয় যে, জমির বহু বিকল্প ব্যবহার আছে। কোন জমিতে চাষ করা যায়, আবার বসত বাড়ি করা যায়, কিংবা কারখানা ঘর গড়ে তোলা যায়। চাষের কাজে যে জমি ব্যবহৃত হয় তাকে সমতল করতে হয়, সেচের ব্যবস্থা করতে হয়, সীমানা

বাঁধতে হয়। এ সবের জন্য শ্রম ও মূলধনের প্রয়োজন এবং তার জন্য যে ব্যয় হয় তাকে জমির উৎপাদন ব্যয় বলা যেতে পারে। কাজেই জমি হল অংশত মানুষের দ্বারা উৎপাদিত উৎপাদনের উপাদান এবং অংশত প্রাকৃতিক সম্পদ। এই ধারণা অনুযায়ী জমির সঙ্গে মূলধনের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তবে মূলধন দ্রব্য যেমন কয়েক বছর পর নষ্ট হয়ে যায় বা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে—জমির ক্ষেত্রে তা হয় না। উপযুক্ত মত পরিচর্যা করলে, সেচ ও সার দিলে, ভূমিক্ষয় রোধ করলে একই জমিতে বছরের পর বছর শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। এর কারণ জমির উর্বরতা শক্তি হল পুনরুৎপাদনশীল ক্ষমতা।

আধুনিক খাজনাতত্ত্বে খাজনাকে জমি নামক উপাদানের নির্দিষ্ট সেবার দাম বলে গণ্য করা হয়। এই সেবার দাম নির্ধারিত হয়—জমির চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে। এক একক জমি উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হলে শস্য উৎপাদন কার্যে সেই জমির যতটুকু শক্তি শোষিত হয় তাকেই বলা হয় জমি নামক উপাদানের সেবা। এই সেবার দাম কত হবে তা নির্ভর করছে সেই সেবার চাহিদা ও যোগানের উপর। কোন একজন উৎপাদক যখন জমির চাহিদা সৃষ্টি করে তখন বুঝতে হবে সে সেই জমির কোন নির্দিষ্ট সময়ের সেবার চাহিদা সৃষ্টি করেছে। এই চাহিদা কোথা থেকে আসে? জমির চাহিদা আসে জমির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা থেকে। কোন উৎপাদন কার্যে জমি ছাড়া শ্রম, মূলধন এবং সংগঠন নামক উপাদানও নিযুক্ত থাকে। আমরা ধরতে পারি যে, ঐ সব উপাদানের পরিমাণ স্থির আছে এবং জমির পরিমাণ সামান্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর জন্য জমি নামক উপাদানকে সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য বলে ধরে নেওয়ার প্রয়োজন হবে। আমরা সেই অনুধারণাও করতে পারি। যা হোক, অন্য সব উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে জমির পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি করলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়া যায় তাকেই বলা হয় জমির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা। জমির চাহিদার পশ্চাতে থাকে জমির এই প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা। অর্থাৎ জমির চাহিদা জমির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা থেকে উদ্ভূত হয়। সেজন্য জমির চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা বলা হয়।

এখন অন্য সব উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে জমির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হলে জমির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ হ্রাস পাবে। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি অনুযায়ী এমন হবে। এর থেকে আমরা বলতে পারি, জমির প্রান্তিক উৎপাদন রেখাটি হবে একটি নিম্নমুখী রেখা। জমির চাহিদা জমির প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান হওয়ায় আমরা বলতে পারি যে, জমির নিম্নমুখী প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা রেখাটি হবে জমির চাহিদা রেখা। অর্থব্যবস্থায় যতগুলি জমি ব্যবহারকারী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থাকবে জমির জন্য তাদের প্রত্যেকের একটি করে নিম্নমুখী চাহিদা রেখা থাকবে। এই রেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে আমরা পাব জমির সামগ্রিক চাহিদা রেখা। স্বভাবতই এই চাহিদা রেখাটিও নিম্নমুখী হবে।

জমির চাহিদার সঙ্গে জমির যোগান রেখাকে স্থাপন করলে আমরা জমির সেবার দাম বা খাজনা জানতে পারব। এর জন্য জমির যোগান রেখা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করতে হবে। আধুনিক তত্ত্বে স্বীকার করা হয় যে, জমির বিকল্প ব্যবহার আছে। জমির বিকল্প ব্যবহার থাকায় জমির বিকল্প আয় বা স্থানান্তর আয় থাকবে। এই স্থানান্তর আয়কেই আমরা জমির যোগান দাম বলতে পারব। জমির খাজনা ন্যূনতম পক্ষে এই বিকল্প আয় বা স্থানান্তর আয়ের সমান হবে। কোন উৎপাদক যত বেশি জমি চাইবে ততই তাকে অন্য ব্যবহার থেকে সরিয়ে জমি আনতে হবে এবং ততই জমির স্থানান্তর আয় বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে আমরা বলতে পারি—জমির যোগানও স্থানান্তর আয়ের সঙ্গে বাড়ে বা কমে। অর্থাৎ জমির যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী। কোন একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে দেখলে এই উক্তির সত্যতা বোঝা যায়। কিন্তু সমগ্র সমাজের দিক থেকে দেখলে বলা যায় জমির কোন বিকল্প ব্যবহার নেই। হয় জমি উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হবে, না হয় পতিত থাকবে। পতিত অবস্থায় থাকলে জমির আয় হয় শূন্য। বলা যায়—জমির যোগান স্থির এবং জমির বিকল্প-আয় শূন্য। কাজেই সমগ্র সমাজের দিক থেকে দেখলে বলা যায়—জমির যোগান স্থির এবং জমির বিকল্প-আয় শূন্য। কিন্তু একটি ফার্ম বা শিল্পের দিক থেকে দেখলে বলা যায় জমির যোগান পরিবর্তনশীল। স্পষ্ট করে বলা যায়—জমির যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে। ধরা যাক জমির যোগান রেখা হল ১৬.১নং রেখাচিত্রে অঙ্কিত OS রেখার মত একটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা।

এখানে DD' হল জমির সামগ্রিক চাহিদা রেখা। OS ও DD' রেখা পরস্পরকে A বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখানে জমি নামক উপাদানের প্রতি একক সেবার দাম হল OP_0. একেই আমরা খাজনা বলতে পারি। এই খাজনার হারে জমির চাহিদা হবে OQ_0 এবং জমির যোগান হবে OQ_0. অতএব OP_0 খাজনার হারে জমির যোগান ও চাহিদা পরস্পর সমান হবে। জমির মালিক প্রতি একক জমির জন্য তার OP_0 খাজনা পাবে। OQ_0 পরিমাণ জমির জন্য তার খাজনা হবে OP_0AQ_0. তার মধ্যে জমির মোট স্থানান্তর আয় হবে OAQ_0 নামক ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রটি। মোট খাজনা থেকে OAQ_0 নামক ক্ষেত্রটি বাদ দিলে থাকবে OAP_0 নামক ক্ষেত্রটি। এই ক্ষেত্রটিকে বলা হয় বিক্রেতার উদ্বৃত্ত পাওনা। অনেকে একেই খাজনা বলেন। আমরা একে উদ্বৃত্ত হিসেবে খাজনা (Rent as surplus) বলতে পারি। বলা বাহুল্য এই উদ্বৃত্ত খাজনা জমির স্থানান্তর আয়ের উপর নির্ভর করে। যতই স্থানান্তর আয় বৃদ্ধি পায়, ততই খাজনা হ্রাস পায়। স্থানান্তর আয় আবার জমির বিকল্প ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। জমির যত বেশি বিকল্প ব্যবহার থাকবে ততই জমির বিকল্প আয় বা স্থানান্তর আয় বাড়বে এবং ততই জমির উদ্বৃত্ত খাজনা কমবে।

১৬.৭ স্থানান্তর আয় (Transfer earning)

(ক) স্থানান্তর আয় কাকে বলে ?

যদি কোন উপাদানের বিকল্প ব্যবহার থাকে, তবে সেই উপাদানকে এক স্থান

থেকে অন্য স্থানে, কিংবা এক ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারে স্থানান্তরিত করতে হলে উপাদানের মালিককে যে নিম্নতম পারিশ্রমিক দিতে হয় তা হল উপাদানের মালিকের স্থানান্তর আয় এবং উপাদানের ব্যবহারকারীর স্থানান্তর ব্যয়। যেমন, কোন শ্রমিক কলকাতায় কাজ করলে, ধরি, প্রতিদিন ১৫ টাকা মজুরী পান, তাঁকে দুর্গাপুরে সরিয়ে আনতে হলে কমপক্ষে ১৫ টাকা দিতে হবে। তাহলে এই ১৫ টাকা হল শ্রমিকের স্থানান্তর আয়।

শ্রমিক একস্থান থেকে অন্যস্থানে যেতে পারেন, কিন্তু জমি পারে না। সেজন্য বলা হয়—জমির কোন স্থানগত গতিশীলতা নেই কিন্তু জমির ব্যবহারগত গতিশীলতা থাকতে পারে। যেমন, একই জমিতে ধান অথবা পাট চাষ করা যেতে পারে। কোন জমিতে যদি ধান চাষ না করে পাট চাষ করা হয়, তাহলে জমি ব্যবহারগতভাবে ধান চাষ থেকে পাট চাষে স্থানান্তরিত হয়েছে বলা যায়। এক্ষেত্রে ধান চাষী জমির মালিককে যদি ১০০ টাকা খাজনা দেন, তাহলে পাট চাষীকেও কমপক্ষে ১০০ টাকা খাজনা দিতে হবে। তাহলে ১০০ টাকা হবে জমির মালিকের স্থানান্তর আয় এবং পাট চাষীর স্থানান্তর ব্যয় (Transfer cost)।

(খ) খাজনা ও স্থানান্তর আয়ের সম্পর্ক ঃ

জমির বিকল্প ব্যবহার থাকলে জমির আয়ের মধ্যে স্থানান্তর আয় থাকবে। জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের সম্বন্ধেও এ কথাটি সত্য। শ্রমের বিকল্প ব্যবহার থাকলে শ্রমের পাওনা মোট মজুরীর মধ্যেও স্থানান্তর আয় থাকবে। তেমনি যদি মূলধন ও উদ্যোগ নামক উপাদানের বিকল্প ব্যবহার থাকে, তাহলে মূলধনের সুদ ও উদ্যোক্তার মুনাফার মধ্যেও স্থানান্তর আয় থাকবে।

এখন কোন উপাদানের প্রকৃত আয় যদি তার স্থানান্তর আয়ের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তার উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা থাকবে। যেমন, কোন শ্রমিক কলকাতায় যদি ১৫ টাকা দৈনিক মজুরী পান, তাহলে দুর্গাপুরে আসতে হলে তাঁকে কমপক্ষে ১৫ টাকা পেতে হবে, এই ১৫ টাকা হল সেই শ্রমিকের স্থানান্তর আয়। এখন দুর্গাপুরে সেই শ্রমিক যদি প্রকৃতপক্ষে ২০ টাকা মজুরী পান, তাহলে তার প্রকৃত আয় হবে ২০ টাকা ; তার মধ্যে ১৫ টাকা হবে শ্রমিকের স্থানান্তর আয় এবং বাকি ৫ টাকা হবে শ্রমিকের উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা। অতএব কোন **উপাদানের আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত খাজনা = উপাদানের প্রাপ্ত আয় - উপাদানের স্থানান্তর আয়।** এখন প্রাপ্ত আয় যদি স্থির থাকে, তাহলে উদ্বৃত্ত বা খাজনা উপাদনের স্থানান্তর আয়ের উপর নির্ভর করবে। আমরা বলতে পারি—

(১) যদি স্থানান্তর আয় বাড়ে (বা কমে) তাহলে খাজনা কমবে (বা বাড়বে)।

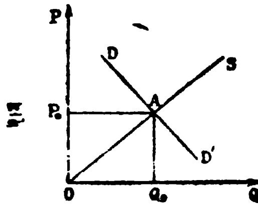
(২) যদি স্থানান্তর আয় শূন্য হয়, তাহলে প্রাপ্ত আয়ের সমগ্রটাই উদ্বৃত্ত বা খাজনা হবে।

(৩) অপর পক্ষে প্রাপ্ত আয় ও স্থানান্তর আয় সমান হলে খাজনা শূন্য হবে।

উপাদানের স্থানান্তর আয় নির্ভর করে উপাদানের বিকল্প ব্যবহারের উপর। যত বিকল্প আয় বেশি হবে, ততই স্থানান্তর আয় বেশি হবে এবং উপাদানের যোগান

ততই স্থিতিস্থাপক হবে। অপরপক্ষে যে উপাদানের কোন বিকল্প ব্যবহার নেই, তার স্থানান্তর আয় শূন্য হবে। কাজেই সে উপাদান যদি কোন প্রকৃত আয় পেয়ে থাকে তবে তার সমগ্রটাই হবে উদ্বৃত্ত বা খাজনা। যে উপাদানের কোন বিকল্প ব্যবহার নেই তার যোগান পূর্ণঅস্থিতিস্থাপক হবে। মার্শালের ভাষায় তার যোগান দাম শূন্য। কাজেই তার সমগ্র আয় হবে উদ্বৃত্ত।

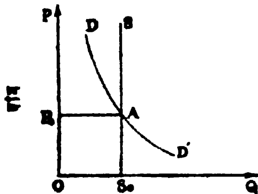
রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বে জমিকে বিকল্প-ব্যবহার-বিহীন উপাদান হিসেবে ধরা হয়েছিল। সেজন্য জমির খাজনা হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে উদ্বৃত্ত। কিন্তু জমির বিকল্প ব্যবহার নেই—এ ধারণাটি বাস্তব নয়। জমির বিকল্প ব্যবহার আছে। এক ব্যবহার থেকে অন্য ব্যবহারে জমিকে সরিয়ে আনতে হলে জমির মালিককে যে খাজনা দিতে হয় তার একটি অংশকে আমরা জমির স্থানান্তর আয় বলতে পারি। বাকি যদি কিছু থাকে তবে তাকে আমরা উদ্বৃত্ত বলব। স্থানান্তর আয় ও খাজনার সম্পর্ক ১৬.৪ নং রেখাচিত্রের সাহায্যেও দেখানো যায়। জমির প্রাপ্ত আয় নির্ধারিত হয় জমির যোগান ও চাহিদার দ্বারা। আমাদের ১৬.৪ নং রেখাচিত্রে OS হল জমির যোগান রেখা। DD′ হল চাহিদা রেখা। এখানে Q হল জমির সেবার পরিমাণ। P হল জমির সেবার দাম। রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে জমির পরিমাণ ও উল্লম্ব অক্ষে দাম মাপা হচ্ছে। এখানে জমির প্রাপ্ত আয় OP AQ. তার মধ্যে OAQ হল জমির স্থানান্তর আয় এবং বাকি OAP হল উদ্বৃত্ত বা খাজনা। সাধারণ ভাষায় অবশ্য প্রাপ্ত আয় OP AQ-কেই খাজনা বলা হয়।



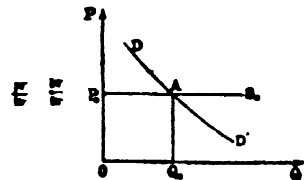
১৬.৪ রেখাচিত্র: স্থানান্তর আয় ও খাজনা

জমির যোগান যদি পূর্ণঅস্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে জমির যোগান রেখাটি ১৬.৫ নং রেখাচিত্রের যোগান রেখার মত পরিমাণ অক্ষের উপর লম্ব হবে।

এখানে SS_0 হল পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা। এখানে জমির স্থানান্তর



১৬.৫ রেখাচিত্র: স্থানান্তর আয় ও খাজনা



১৬.৬ রেখাচিত্র: স্থানান্তর আয় ও খাজনা

আয় শূন্য এবং জমির প্রকৃত আয় OP_0 AS_0. অতএব জমির উদ্বৃত্ত বা খাজনা = OP_0AS_0. অর্থাৎ জমির আয়ের পুরোটাই উদ্বৃত্ত।

জমির যোগান যদি পূর্ণস্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে যোগান রেখাটি ১৬.৬নং রেখাচিত্রের যোগান রেখার মত পরিমাণ অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হবে। এখানে P_0S_0 হবে পূর্ণস্থিতিস্থাপক যোগান রেখা এবং জমির প্রকৃত আয় হবে $OP_0\ AQ_0$ এবং জমির স্থানান্তর আয়ও হবে OP_0AQ_0. অতএব এখানে উদ্বৃত্ত বা খাজনা থাকবে না।

এই হল স্থানান্তর আয় এবং খাজনার সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি জমি এবং জমি ছাড়া অন্য সব উপাদানের পক্ষেই প্রযোজ্য হবে।

১৬.৮. খাজনা ও দামের সম্পর্ক :

ডেভিড রিকার্ডোর মতে জমির মালিককে যে খাজনা দেওয়া হয় তা শস্যের উৎপাদন ব্যয় ও তার দামের মধ্যে প্রবেশ করে না এবং প্রবেশ করতে পারে না। রিকার্ডোর সময়ের একটি প্রচলিত ধারণার বিরোধিতা করে রিকার্ডো এই মতটি প্রচার করেছিলেন। তাঁর সময়ে ইংলন্ডে খাদ্যশস্যের দাম খুব বেশি ছিল। শস্য উৎপাদন-কারীরা এর জন্য জমিদারদের খাজনা বৃদ্ধিকে দায়ী করেছিলেন। রিকার্ডো তাঁর খাজনা তত্ত্বে দেখিয়েছিলেন খাজনা বাড়লে দাম বাড়ে না বরং দাম বাড়লেই খাজনা বেড়ে যায়। (Corn is high not because rent is high ; rent is high because corn is high.) অর্থাৎ রিকার্ডোর মতে শস্যের দাম খাজনা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং জমিদারের খাজনাই দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়।

রিকার্ডোর এই উক্তির পিছনে কয়েকটি বিশেষ অনুধারণা কাজ করেছিল। ১। তাঁর মতে জমি বলতে জমির উৎপাদিকা শক্তিকে বোঝায়। ২। এই উর্বরতা শক্তি প্রাকৃতিক। অর্থাৎ মানুষ উৎপাদিকা শক্তি সৃষ্টি করতে কিংবা ধ্বংস করতে পারে না। কাজেই জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নেই। ৪। জমির যোগান স্থির। ৫। জমির কোন বিকল্প ব্যবহার নেই। ৬। শস্যের বাজারে পূর্ণপ্রতি-যোগিতা থাকে, কাজেই শস্যের দাম (P) শস্যের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের (MC) সমান হয়।

যেহেতু জমির উৎপাদন ব্যয় নেই, অতএব জমির যোগান-দাম (Supply price) নেই। জমির বিকল্প ব্যবহার নেই, কাজেই জমির স্থানান্তর আয়ও নেই। জমির স্থানান্তর আয় নেই বললে বোঝায় জমির জন্য কোন স্থানান্তর ব্যয় লাগে না। তাহলে জমিকে কৃষিকার্যে ব্যবহার করার জন্য কোন ব্যয় হয় না। এক্ষেত্রে জমির মালিককে যে খাজনা দেওয়া হবে তা সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত হবে। উদ্বৃত্ত বলতে বোঝায় উৎপাদন ব্যয়ের ঊর্ধ্বে উদ্বৃত্ত। জমির কোন উৎপাদন ব্যয় বা স্থানান্তর ব্যয় নেই, কাজেই জমির মালিক যা পাবেন তা হবে পুরোপুরি উদ্বৃত্ত।

শস্যের দাম নির্ধারিত হয় শস্যের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় দ্বারা। প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে থাকে শ্রমের মজুরী, বীজ, সার ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য চলতি মূলধন এবং তার সুদ। জমি যেহেতু স্থির উপাদান, অতএব জমির খাজনা প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে

প্রবেশ করবে না। রিকার্ডোর মতে অবশ্য জমির খাজনা কোন ভাবেই কোন উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যেই প্রবেশ করবে না। খাজনা যেহেতু প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে প্রবেশ করে না এবং শস্যের দাম যেহেতু প্রান্তিক ব্যয়ের সমান, কাজেই খাজনা শস্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করবে না (Rent does not enter into price)। অন্যভাবে বলা যায়—জমির খাজনা উৎপাদন ব্যয়কে ও দামকে নির্ধারণ করে না।

দামই খাজনাকে নির্ধারণ করে। অর্থাৎ দাম বাড়লে বা কমলে খাজনা বাড়ে বা কমে। এটি দেখানোর জন্য আমরা একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্য নিতে পারি।

ধরি কোন দেশে A, B ও C শ্রেণীভুক্ত তিনপ্রকার জমি আছে। A জমি সবচেয়ে উর্বর, B তার চেয়ে একটু কম উর্বর, C তার চেয়ে আর একটু কম উর্বর জমি। ধরি প্রত্যেক জমিতে ১০০ একক করে শস্য উৎপন্ন হয়, তার জন্য A, B ও C জমিতে ব্যয় হয় যথাক্রমে ১০০ টাকা, ২০০ টাকা ও ৩০০ টাকা। শস্যের দাম C জমির উৎপাদন ব্যয় দ্বারা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ ১০০ একক শস্য বিক্রয় হবে ৩০০ টাকায়। তাতে উৎপাদন ব্যয় মিটিয়ে A জমিতে ২০০ টাকা এবং B জমিতে ১০০ টাকা খাজনার সৃষ্টি হবে। C জমিতে কোন খাজনা হবে না। C এখানে প্রান্তিক জমি। এর খাজনা নেই।

এখন ধরি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বা অন্য কোন কারণে দেশে খাদ্যের চাহিদা বেড়ে ৪০০ একক হল। তাহলে D জমিতে ১০০ একক শস্য উৎপাদন করতে হবে। ধরি তাতে D জমিতে ব্যয় হবে ৪০০ টাকা। এখন শস্যের দাম বাড়বে। আগে ছিল ১০০ এককের দাম ৩০০ টাকা (প্রতি একক ৩ টাকা) এখন হবে ৪০০ টাকা। এই দামে শস্য বিক্রয় করে A জমিতে ৩০০ টাকা, B জমিতে ২০০ টাকা এবং C জমিতে ১০০ টাকা খাজনা হবে। D জমিতে কোন খাজনা হবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শস্যের দাম বৃদ্ধি পেলে A ও B জমির খাজনা বাড়বে এবং পূর্বে যে C জমি খাজনাবিহীন ছিল তাতেও এখন খাজনার সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ দাম বাড়লে খাজনা বাড়ে।

কিন্তু রিকার্ডোর এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নেই এটা পুরোপুরি সত্য নয়। আমরা জানি, জমির উৎপাদন ব্যয় আছে। পৃথিবীর অনাবৃত ভূমিকে জমি বলা যায় না। অনাবৃত ও অনুর্বর ভূমিকে সমতল করে, সেচযুক্ত করে, সার দিয়ে কৃষির উপযোগী জমিতে পরিণত করতে হয়। এরজন্য শ্রম ও মূলধন প্রয়োগ করতে হয়। এবং তার জন্য যে ব্যয় হয় তাকেই আমরা জমির উৎপাদন ব্যয় বা যোগান-দাম বলতে পারি। জমির মালিককে যে খাজনা দেওয়া হয় তার একটি অংশ অবশ্যই এই উৎপাদন ব্যয় বা যোগান-দামের উপর নির্ভর করবে। এই পৃথিবীতে যখন মানুষ কম ছিল, তখন হয়তো জমির কোন যোগান-দাম ছিল না। জমি প্রকৃতির অকৃপণ হস্তের দান হিসেবে গণ্য হত। কিন্তু, যত

দিন যাচ্ছে, যত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে ততই জমির দুষ্প্রাপ্যতা বাড়ছে। এখন জমিকে প্রকৃতির বদান্যতার প্রমাণ বলে মনে করা যায় না, জমি যেন প্রকৃতির কৃপণতার নির্মম সাক্ষী।

অতএব জমির কোন উৎপাদন ব্যয় নেই এমন মনে করা এখন অবাস্তর।

তাছাড়া জমির কোন বিকল্প ব্যবহার নেই—এমন মনে করাও ভুল। একই জমিকে এখন বহুভাবে বহুকাজে ব্যবহার করা যায়। কাজেই কোন উৎপাদনকারী যদি তার উৎপাদনের জন্য জমি ভাড়া নিতে চায় তাহলে জমির অন্য ব্যবহারকারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেই তাকে সেই জমি সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলে জমির স্থানান্তর আয় দিতে হবে বরং তার চেয়ে বেশি দিতে হবে। পাটচাষী যদি কোন জমির জন্য ১৫ টাকা খাজনা দিতে চান, তাহলে ধানচাষীকে ১৫ টাকার বেশী দিতে হবে। নাহলে তিনি জমি পাবেন না। ধানচাষী যদি প্রতিযোগিতা করে জমি ভাড়া নেন, তাহলে সে জমির ভাড়া বা খাজনাকে উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ধরে হিসেব করবেন এবং সেইমত শস্যের দাম চাইবেন। যদি খাজনা বেশি হয়, এবং উপাদানের অন্যান্য ব্যয় স্থির থাকে, তাহলে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে এবং শস্যের দামও বাড়বে।

তাহলে একজন চাষীর কাছে জমির খাজনা শস্যের উৎপাদন ব্যয়ের অংশ। অনুরূপভাবে একটি শিল্পের মধ্যে যে ফার্মগুলি থাকে তাদের কাছেও খাজনা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ বলে গণ্য হবে। কোন একটি ফার্ম যদি জমি পেতে চায়, তাহলে তাকে স্থানান্তর ব্যয় হিসেবে খাজনা দিতে হবে। খাজনা না দিলে জমি অন্য ফার্মের হাতে চলে যাবে।

শুধু ফার্ম নয় একটি দেশে একাধিক দ্রব্যের উৎপাদনকারী ফার্মদের নিয়ে যে একাধিক শিল্প থাকে তাদের মধ্যেও জমি নিয়ে প্রতিযোগিতা হতে পারে। কোন শিল্প যদি খাজনা না দেয়, তাহলে জমি অন্য শিল্পের হাতে চলে যাবে।

অতএব **কোন ফার্ম কিংবা শিল্পের দিক থেকে দেখলে খাজনাকে উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হিসেবেই ধরতে হবে। সেক্ষেত্রে খাজনা দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করবে।** কিন্তু যদি সমগ্র সমাজের দিক থেকে দেখা যায়, তাহলে বলা যায়—জমির কোন বিকল্প ব্যবহার নেই। সেক্ষেত্রে জমি হয় যে কোন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে, না হয় এমনি পড়ে থাকবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে জমির আয় শূন্য। অতএব সমাজের দিক থেকে দেখলে বলা যায়—জমির খাজনা সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত।

১৬.৯ প্রায়-খাজনা (Quasi Rent) :

অধ্যাপক মার্শাল প্রায়-খাজনা নামক ধারণাটি প্রথম ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে স্বল্পকালে কোন কোন বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি বা অন্য কোন মূলধন দ্রব্যের যোগান স্থির থাকতে পারে। এবং তার জন্য ফার্মের মালিক খাজনা নামক উদ্বৃত্ত আয় পেতে পারে। দীর্ঘকালে সেই মূলধন দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পেতে পারে এবং

দীর্ঘকালে সেই খাজনা হ্রাস পেতে পারে। মূলধনের যোগান যদি দীর্ঘকালে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তনশীল হয়, তাহলে সেই উপাদানের জন্য কোন উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা হয় না। বলা যায় যে, দীর্ঘকালে মূলধনের খাজনা অবলুপ্ত হয়। **এইভাবে কোন উপাদানের যোগান স্বল্পকালে স্থির বা অস্থিতিস্থাপক হওয়ায় যে খাজনার উদ্ভব হয় এবং দীর্ঘকালে উপাদানের যোগান পরিবর্তনশীল বা স্থিতিস্থাপক হওয়ায় যে খাজনা অবলুপ্ত হয় তাকে প্রায় খাজনা বলা হয়।** জমির যোগান স্বল্পকালে বা দীর্ঘকালে স্থির থাকে বলে ধরা হয়। সেইজন্য জমির খাজনা হল প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ খাজনা। জমি ব্যতীত অন্য উপাদানের যোগানও স্বল্পকালে স্থির হয়ে পড়তে পারে এবং সেই উপাদান খাজনা পেতে পারে। কোন উপাদান স্থির হয়ে পড়লে তার স্থানান্তর আয় শূন্য হয়। কাজেই সেই উপাদান প্রকৃতপক্ষে যে আয় পেয়ে থাকে তাকে খাজনার মত উদ্বৃত্ত-আয় বলা যায়। এর থেকে বোঝা যায় যে, জমি ব্যতীত অন্য যে কোন উপাদানের প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে স্বল্পকালে খাজনা থাকতে পারে। দীর্ঘকালে সেই উপাদানের যোগান পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হলে খাজনা অবলুপ্ত হয়। কাজেই জমি ব্যতীত অন্য উপাদানের স্বল্পকালীন খাজনাকে প্রায় খাজনা বলা হয়। রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রায়-খাজনার পরিমাণ দেখানো যায়। প্রদত্ত রেখাচিত্রে OX-অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং OY-অক্ষে ফার্মের গড় ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয়, গড় ও প্রান্তিক আয় এবং দ্রব্যের দাম পরিমাপ করা হয়েছে। এই রেখাচিত্রে একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের একটি বিশেষ অবস্থা দেখানো হয়েছে। এখানে AC হল গড় ব্যয় রেখা, AVC হল গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা, MC হল প্রান্তিক ব্যয় রেখা। এখানে AR = MR নামক রেখাটি হল পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় রেখা। দ্রব্যের দাম যদি OP হয়, তাহলে ফার্মের MC রেখা AR = MR রেখাকে নীচের দিক থেকে E বিন্দুতে ছেদ করে। কাজেই E হবে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দু। E বিন্দুতে ফার্মের উৎপাদন হয় OQ, দাম হল OP. কাজেই মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হয় $OP \times OQ = OPEQ$. ফার্মের গড় ব্যয় OC এবং মোট ব্যয় $OC \times OQ = OCSQ$. কাজেই মোট অতিরিক্ত মুনাফা = মোট আয় − মোট ব্যয়

$$= OPEQ - OCSQ = CPES.$$

১৬.৭ রেখাচিত্র : প্রায়-খাজনা (Quasi-Rent)

ফার্মের মোট ব্যয় OCSQ. এর মধ্যে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) = OVTQ

এবং মোট স্থির ব্যয় (TFC) = VCST. ফার্ম যে সকল পরিবর্তনশীল উপাদান নিয়োগ করে তাদের জন্য ফার্মের মোট ব্যয় হল OVTQ. পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির জন্য OVTQ পরিমাণ অর্থ না দিলে তারা এই ফার্ম পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবে। কিন্তু স্থির উপাদান অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে না, কাজেই তাদের স্থানান্তর আয় শূন্য। এই অবস্থায় স্থির উপাদানকে যে VCST পরিমাণ অর্থ দেওয়া হল তাকে উদ্বৃত্ত বা খাজনা বলা যেতে পারে। কাজেই, এখানে মোট উদ্বৃত্ত বা খাজনার পরিমাণ হল VCST পরিমাণ স্থির ব্যয় + CPES পরিমাণ অতিরিক্ত মুনাফা।

অর্থাৎ প্রায়-খাজনা = মোট স্থির ব্যয় + মোট অতিরিক্ত মুনাফা।

এবং অতিরিক্ত মুনাফা = প্রায়-খাজনা − মোট স্থির ব্যয়।

এর থেকে বোঝা যায় যে, দীর্ঘকালে যেহেতু মোট স্থির ব্যয় থাকে না এবং কোন অতিরিক্ত মুনাফাও থাকে না, কাজেই দীর্ঘকালে মোট স্থির ব্যয় এবং মোট অতিরিক্ত মুনাফা উভয়েই শূন্য হওয়ায় দীর্ঘকালে প্রায়-খাজনাও শূন্য হয়।

প্রশ্নাবলী

১। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটির আলোচনা কর।

২। "জমির উর্বরতা-শক্তির পার্থক্যের জন্য খাজনার উদ্ভব হয়।" উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

৩। খাজনা সম্বন্ধে মার্শালের তত্ত্বটির আলোচনা কর।

৪। খাজনা সম্বন্ধে রিকার্ডো ও মার্শালের তত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা কর। তোমার মতে কোন্ তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য? যুক্তিসহ উত্তর লিখ।

৫। জমির যোগান ও তার স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে খাজনার সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৬। তুমি কি মনে কর যে, সব উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা থাকতে পারে? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

৭। স্থানান্তর আয় কাকে বলে? খাজনা ও স্থানান্তর আয়ের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৮। খাজনা ও দামের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

অথবা

তুমি কি মনে কর যে, জমির খাজনা দ্রব্যের দামের মধ্যে প্রবেশ করে না? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৯। "খাজনা বাড়লে দাম বাড়ে না, দাম বাড়লে খাজনা বাড়ে"—এই উক্তিটির ব্যাখ্যা কর এবং এর সত্যতা পরীক্ষা কর।

১০। "কোন ফার্মের দিক থেকে দেখলে জমির খাজনা দামের মধ্যে প্রবেশ করে, কিন্তু সমগ্র সমাজের দিক থেকে দেখলে বলা যায় খাজনা সম্পূর্ণ উদ্বৃত্ত।" আলোচনা কর।

১১। প্রায়-খাজনা কাকে বলে? কীভাবে প্রায়-খাজনার উদ্ভব হতে পারে?

১২। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

(ক) জমি কী?

(খ) খাজনা কাকে বলে?

(গ) খাজনা কি জমির দাম? যুক্তি দিয়ে বোঝাও।

(ঘ) পার্থক্যজনিত খাজনা কী?

(ঙ) যোগান-দাম কী? যোগান-দাম কখন ধনাত্মক, কখন শূন্য হয়?

(চ) উপাদানের প্রকৃত আয় কী? উদ্বৃত্ত আয় কী?

(ছ) 'স্থানান্তর আয়' কাকে বলে উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

(জ) বিকল্প ব্যবহার ও স্থানান্তর আয়ের সম্পর্কটি বোঝাও।

(ঝ) প্রায়-খাজনা কী?

(ঞ) জমির খাজনা ও অন্য উপাদানের খাজনার মধ্যে পার্থক্য কর।

---

১৭ | সুদ

১৭.১ (ক) সুদের হিসেব

সুদ বলতে সুদের হার কিংবা মোট সুদ বোঝায়। সুদের হার বলতে শতকরা বার্ষিক সুদকে বোঝাতে পারে। আবার অন্য কোন হিসেবে সুদের হার প্রকাশিত হতে পারে। সময়ের হিসেবে সুদের হার বার্ষিক, ষাম্মাসিক, মাসিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি হতে পারে। মোট সুদ হল সুদের হার × মোট মূলধনের পরিমাণ। যদি বার্ষিক ১০% হারে ৫০০ টাকার মূলধন ধার করা হয় তাহলে বছরের শেষে মোট সুদ হবে $\frac{১০}{১০০} \times ৫০০$ টা. = ৫০ টাকা। যদি r% হারে P পরিমাণ মূলধন ধার করা হয় তাহলে বছরের শেষে মোট সুদ হবে $P.\frac{r}{১০০}$ টাকা। অতএব সুদের হার এবং মোট সুদ এই দুটি পৃথক ধারণা।

সুদ তত্ত্বে আমরা সুদের হার সম্বন্ধে আলোচনা করি। এখানে সুদের হার বোঝাতে কেবলমাত্র সুদ শব্দের ব্যবহার করা হবে।

(খ) সুদ কাকে বলে ?

সুদ হল মূলধন নামক উৎপাদন উপাদানের প্রতি একক সেবার দাম। অতএব সুদ কাকে বলে বুঝতে হলে মূলধনের সেবার মূল্য শব্দটির অর্থ বুঝতে হবে এবং তার আগে বুঝতে হবে মূলধনের অর্থ।

মূলধন হল একটি ভাণ্ডার মাত্র। চৌবাচ্চা যেমন জলের ভাণ্ডার, মূলধন তেমনি আয়ের ভাণ্ডার। জল গিয়ে চৌবাচ্চায় জমে। আয় গিয়ে মূলধনের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়। আয় বলতে বোঝায় দ্রব্য বা সেবার প্রবাহ। সেই আয়ের একটি অংশ ভোগের কাজে ব্যবহৃত হয়। অন্য অংশটি সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চয়ের দ্বারা পরবর্তী পর্যায়ের উৎপাদনের জন্য উপাদান সংগ্রহ করা হয়. অতএব মূলধন হল মানুষের সৃষ্ট সেই আয় যা তাৎক্ষণিক ভোগের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আয় হয় দ্রব্যের আকারে। সেই দ্রব্যকে মূলধন দ্রব্যে রূপান্তরিত করা হয়। মূলধন দ্রব্য তখন যন্ত্রের রূপ ধারণ করে। যন্ত্র ভোগ্য দ্রব্য নয়, মূলধন দ্রব্য বা উৎপাদনের উপকরণ। যন্ত্র ছাড়াও বাড়িঘর, কারখানা, গুদামঘর, আসবাবপত্র ইত্যাদি যা কিছুই উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয় তাকেই মূলধন বলা যেতে পারে।

মূলধন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অর্থাৎ মূলধনের অবদান আছে। কোন মূলধন দ্রব্য যখন উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়

তখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে যে পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তাকে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (Marginal Productivity of Capital) বলা হয়। সুদের হার হল মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার জন্য মূলধনের পাওনা। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধনকে কোন উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করলে সেই মূলধনের যেটুকু সেবা গ্রহণ করা হয় এবং তা থেকে যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায় তার জন্য মূলধনের মালিককে যা দেওয়া হয় তাকে সুদ বলা হয়।

(গ) **আর্থিক সুদ ও বাস্তব সুদ :** মূলধনের পরিমাণকে যদি অর্থের হিসেবে প্রকাশ করা হয় তাহলে তাকে আর্থিক মূলধন বলা হয়। এই আর্থিক মূলধনের জন্য অর্থের হিসেবে যে সুদ দেওয়া হয় তাকে আর্থিক সুদ বলা হয়। আমরা সাধারণত অর্থের হিসেবে মূলধন ও সুদের হিসেব করে থাকি। মোট ১০০ টাকার মূলধন ১ বছরের জন্য ব্যবহার করলে যদি ১০ টাকা সুদ দেওয়া হয় তাহলে সুদের হার হবে শতকরা বার্ষিক ১০ টাকা।

মূলধনের পরিমাণকে কোন দ্রব্যের আকারে প্রকাশ করলে তাকে বাস্তব বা বস্তুগত মূলধন বলা হয়। এই বাস্তব মূলধনের জন্য যে বাস্তব সুদ দেওয়া হয় তাকে বাস্তব সুদের হার বলা হয়।

(ঘ) সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হয় ?

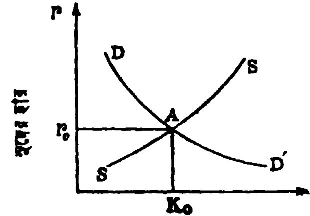
সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হয় সে সম্বন্ধে দুটি প্রধান তত্ত্ব আছে। প্রথমটি হল ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব এবং দ্বিতীয়টি কীনসীয় তত্ত্ব। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বটি কীনসের আগেকার সময়ের লেখকদের তত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার। এই তত্ত্বটির কোন একজন প্রবক্তা ছিলেন না। পরবর্তীকালে লর্ড কীনস্ এই তত্ত্বটির সমালোচনা করেন। তাঁর সমালোচনার ফলে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বটির ত্রুটিগুলি সকলের চোখে পড়ে। কীনস্ যে শুধু ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের সমালোচনা করেছিলেন তাই নয়, তিনি সেই সঙ্গে নতুন তত্ত্বের সৃষ্টি করেন। এই তত্ত্বটিকেই কীনসের তারল্য পছন্দ তত্ত্ব বলা হয়, পরবর্তীকালে কীনসের তত্ত্বটিতেও অনেক ভুল দেখা যায়। সেই ত্রুটিগুলি দূর করে একটি সুন্দর ও সঠিক সুদ তত্ত্বের আবিষ্কারের অনেক চেষ্টা করা হয়েছে।

১৭.২ ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব :

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সুদ বলতে বাস্তব সুদ ধরা হয়। এই বাস্তব সুদ হল বাস্তব মূলধনের পাওনা। বাস্তব মূলধন যেমন—যন্ত্রপাতি, কারখানা ঘর, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে এবং উৎপাদনকে সম্ভব করে তোলে। আমরা বলতে পারি—মূলধনের সেবা উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হয়। তার জন্য মূলধনের মালিকরা সুদ পেতে চান। এই সুদ নির্ধারিত হবে মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে।

(ক) **মূলধনের চাহিদা :** মূলধনের চাহিদা আসে উৎপাদকদের নিকট থেকে। মূলধন দ্রব্যকে উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ স্থির রেখে অতিরিক্ত এক একক মূলধন নিয়োগ করলে যে পরিমাণে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাকে মূলধনের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন বলা হয়। এই প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন থেকেই মূলধনের চাহিদার উদ্ভব হয়। কোন নির্দিষ্ট সুদের হারে কোন উৎপাদক বা বিনিয়োগকারী কী পরিমাণ মূলধন নিয়োগ করবেন তা নির্ভর করছে সুদের হার ও মূলধনের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদন ক্ষমতার উপর। উৎপাদকের উদ্দেশ্য হল মূলধনের নিয়োগ থেকে সর্বাধিক মুনাফা আদায় করা। যেখানে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের সঙ্গে সমান হবে সেখানেই উৎপাদক মূলধনের নিয়োগ স্থির করবেন। যদি r = বাস্তব সুদের হার এবং MP_K = মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন হয় তাহলে মূলধন নিয়োগের প্রাথমিক শর্ত হল $r = MP_K$.

অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ স্থির রেখে মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে MP_K পরিণামে কমে আসবে। অর্থাৎ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন রেখাটি হবে নিম্নমুখী। তাহলে আমরা বলতে পারি কোন একজন উৎপাদকের মূলধনের চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হবে। সব উৎপাদকদের চাহিদা রেখাকে জ্যামিতিক পদ্ধতিতে যোগ করে মূলধনের যে মোট চাহিদা রেখা পাওয়া যাবে তা অবশ্যই নিম্নমুখী হবে। আমাদের রেখাচিত্রে DD′ হল মূলধনের চাহিদা রেখা। এখানে OX-অক্ষে মূলধনের পরিমাণ ও OY-অক্ষে সুদের হার পরিমাপ করা হয়েছে।



মূলধনের পরিমাণ
১৭.১ রেখাচিত্র : ক্লাসিক্যাল তত্ত্বমতে সুদের হার নির্ধারণ

মূলধনের চাহিদা রেখাটি নিম্নমুখী হবার অর্থ হল যে, সুদের হার কমলে (বা বাড়লে) মূলধনের চাহিদা বাড়বে (বা কমবে)।

(খ) **মূলধনের যোগান রেখা :** মূলধনের যোগান আসে সঞ্চয়কারীদের নিকট থেকে। মূলধন হল আয়ের সঞ্চিত অংশ। ব্যক্তি বা পরিবার যে আয় পেয়ে থাকে তার একটি অংশ ভোগের কাজে ব্যয় করে, বাকি অংশটি সঞ্চয় করে। ভোগ থেকে তৃপ্তি বা আনন্দ পাওয়া যায়। ব্যক্তি যখন সঞ্চয় করে তখন বুঝতে হবে সে ভোগের আনন্দ ত্যাগ করছে। সঞ্চয়কে সেইজন্য ভোগবিরতি বলা হয়। এই ভোগবিরতির জন্য ব্যক্তি বা পরিবার সুদ পাবার আশা করে। সুদের হার যত বেশি হয়, সঞ্চয়ের পরিমাণ তত বৃদ্ধি পায়।

ব্যক্তি বা পরিবারগুলি আয়ের যে অংশ সঞ্চয় করে তারা সেই সঞ্চয় ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমা দেয়। বিনিয়োগকারীরা ব্যাঙ্ক বা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের মাধ্যমে সেই সঞ্চয় নিয়ে যান। সেই ঋণ মূলধনে রূপান্তরিত হয়।

অতএব সঞ্চয় থেকে মূলধনের যোগান আসে। কোন একজন ব্যক্তি বা একটি

পরিবারের মূলধনের যোগান সুদের হারের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে। সুদের হার বাড়লে (বা কমলে) মূলধনের যোগানও বাড়বে (বা কমবে)। অর্থাৎ মূলধনের ব্যক্তিগত যোগান রেখা ঊর্ধ্বমুখী হবে। এখন সব ব্যক্তিদের যোগান রেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে মূলধনের যে মোট যোগান রেখা পাওয়া যাবে তা ঊর্ধ্বমুখী হবে। সুদের হার বাড়লে (বা কমলে) মূলধনের মোট যোগান বাড়বে (বা কমবে)। আমাদের ১৭·১ নং রেখাচিত্রের SS′ হল মূলধনের মোট যোগান রেখা।

এখন মূলধনের চাহিদা ও যোগানকে একসঙ্গে বিচার করে দেখা হবে তাদের দ্বারা কীভাবে সুদের হার নির্ধারিত হবে। সুদের হার এমন স্তরে স্থির হবে যাতে সেই হারে মূলধনের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়। অন্য সুদের হারে চাহিদা ও যোগান সমান হবে না। হয় চাহিদা, না হয় যোগান বেশি হবে। যদি মূলধনের চাহিদা বেশি হয় তাহলে সুদের হার বাড়বে, যদি যোগান বেশি হয় তাহলে সুদের হার কমবে। এইভাবে ওঠানামা করতে করতে সুদের হার এমন একটি স্তরে এসে স্থির হবে যাতে মূলধনের চাহিদা ও যোগান সমান হবে। তখন সুদের হারের আর কোন পরিবর্তন হবে না। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়, যেখানে মূলধনের চাহিদা ও যোগান রেখা পরস্পরকে ছেদ করে সেই ছেদবিন্দুতে সুদের ভারসাম্য হার নির্ধারিত হয়। আমাদের রেখাচিত্রে DD′ ও SS′ রেখা দুটি পরস্পরকে A বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখানে ভারসাম্য সুদের হার হল Or_0। এই সুদের হারে মূলধনের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হয়েছে। এখানে মূলধনের চাহিদা = OK_0 = মূলধনের যোগান।

(গ) **ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের ত্রুটি ঃ** ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের অনেক ত্রুটি আছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলির কথা এখানে বলা হল।

১। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সুদের হারকে একটি বাস্তব ঘটনা (Real Phenomenon) বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সুদের হার সম্পূর্ণ বাস্তব ঘটনা নয়। বিনিয়োগকারীরা অর্থের হিসেবে ঋণ নেন এবং তার জন্য যে সুদ দিতে চান তা আর্থিক সুদের হার। সুদের হারের মধ্যে যে একটি আর্থিক অংশ থাকে তা ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে অস্বীকৃত হয়েছে।

২। সুদের হারকে যদি বাস্তব মূলধনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয় তাহলেও ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বটি ত্রুটিযুক্ত থেকেই যায়। বাস্তব মূলধন দ্রব্য বলতে যদি যন্ত্রপাতি বোঝায় তাহলে আমরা বলতে পারি একটি যন্ত্র থেকে অনেকদিন ধরে উৎপাদন বা প্রতিদান পাওয়া যায়। একটি যন্ত্র থেকে ভবিষ্যতে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে তার বর্তমান মূল্য বার করতে হয়। এই প্রতিদানকে যন্ত্রের ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এইভাবে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার হিসেব পাওয়া যাবে। মূলধনের চাহিদা এই প্রান্তিক দক্ষতার উপর নির্ভর করবে। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে এই বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে।

৩। এই তত্ত্বে সঞ্চয়কে সুদের হারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। অনেকে মনে করেন সঞ্চয় মূলত আয়ের উপর নির্ভর করে। সুদের হারের সঙ্গে এর যোগ যদি বা থাকে তাহলেও তা খুবই সামান্য।

৪। সঞ্চয় যদি আয়ের উপর নির্ভর করে তাহলে আয় স্তরের পরিবর্তন হলে মূলধনের যোগান রেখার অবস্থান সরে যাবে। তখন সুদের হারও পরিবর্তিত হবে। অতএব আয় স্তর নির্ধারিত না হলে সুদের হারও নির্ধারিত হবে না। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে সুদের হার অনির্ধারিত (Indeterminate) থেকে যায়।

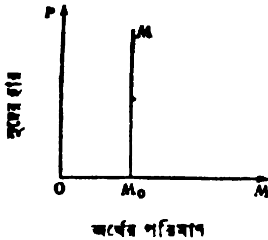
৫। মূলধনের চাহিদাও কেবলমাত্র সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। সুদের হারের সঙ্গে বিনিয়োগের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ।

৬। সঞ্চয়কে ভোগবিরতি এবং সুদকে ভোগবিরতির পুরস্কার বলা যায় না। কার্ল মার্ক্সের মতে সঞ্চয় যদি ভোগবিরতি হয় তাহলে ভোগকেও সঞ্চয় বিরতি বলা যায় এবং সেক্ষেত্রে ভোগের জন্যও কোন ব্যক্তি বা পরিবার সুদ দাবি করতে পারে। মার্ক্স ভোগবিরতি তত্ত্বটিকে উপহাস করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি কাজ তার বিপরীত কাজ থেকে বিরতি বোঝায়। জেগে থাকা ঘুমানো থেকে বিরতি, তেমনি ঘুমানোও হল জেগে থাকা থেকে বিরতি। চলা থেমে থাকা হতে বিরতি এবং থেমে থাকা হল চলা থেকে বিরতি। অতএব সঞ্চয়কে ভোগবিরতি বললে কিছুই বলা হয় না।

১৭.৩ কীন্সের তারল্য পছন্দ তত্ত্ব (Liquidity Preferency Theory) :

কীন্সের মতে সুদ হল পুরোপুরি একটি আর্থিক ব্যাপার (Rate of interest is a purely monetary phenomenon) এবং সুদের হার অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কীন্সের মতে অর্থ হল একটি সম্পদ, যে সম্পদকে যে কোন সময় যে কোন দ্রব্যে রূপান্তরিত করা যায়। অর্থের এই গুণকে তারল্য (Liquidity) বলা হয়। কোন তরল পদার্থকে যখন যে পাত্রে রাখা যায়—সেই তরল পদার্থের আকৃতি সেই পাত্রের মতই হয়। অর্থকেও তেমনি যে-কোন বস্তুতে রূপান্তরিত করা যায়। অর্থের এই গুণ থাকায় মানুষ সব সময় অর্থ হাতে ধরে থাকতে চায়। একে অর্থের চাহিদা বলা হয়। অর্থাৎ অর্থের চাহিদা বলতে বোঝায় নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার ইচ্ছা। যার কাছে অর্থ থাকে সে নিশ্চিন্ত থাকে। যার কাছে অর্থ থাকে না সে মনে মনে চঞ্চল হয়ে পড়ে। মা যেমন মৃদু করাঘাতে শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে দেন, হাতের অর্থও তেমনি মানুষের অশান্ত মনকে শান্ত করে রাখে। কোন ব্যক্তি যখন অপর কাউকে এই অর্থ ধার দিয়ে দেয় তখন সে অর্থের তারল্য থেকে বিদায় গ্রহণ করে। তার মনে আবার অশান্তির আশঙ্কা দেখা দেয়। কাজেই অর্থ ছাড়ার জন্য ব্যক্তি সুদ পাবার আশা করে। সুদ হল একটি সান্ত্বনা। তাহলে সুদ হল আর্থিক ব্যাপার। কাজেই অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হবে। প্রথমে অর্থের যোগানের কথা বলা যেতে পারে।

(ক) অর্থের যোগান ঃ দেশে নগদ অর্থের যোগান দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও সরকার। এদের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বলা হয়। কীন্‌সের মতে আর্থিক কর্তৃপক্ষ সুদের হার কিংবা অন্য কোন বিষয়ের দিকে না তাকিয়েই দেশের নগদ অর্থের যোগান দিয়ে থাকে। সুদের হার বেশি বা কম যা হোক না কেন, অর্থের যোগান একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়, অর্থের যোগান রেখাটি সুদ পরিমাপক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়। আমাদের ১৭.২নং রেখাচিত্রের MM_0 হল অর্থের যোগান রেখা।



১৭.২ রেখাচিত্র ঃ কীন্‌সীয় তত্ত্বে অর্থের যোগান রেখা

আর্থিক কর্তৃপক্ষ যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধি করে তাহলে MM_0 রেখাটি সমান্তরালভাবে ডানদিকে সরে যাবে। অপরপক্ষে অর্থের যোগান হ্রাস পেলে MM_0 রেখাটি সমান্তরালভাবে বামদিকে সরে যাবে।

(খ) অর্থের চাহিদা ঃ কীন্‌সের মতে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার ইচ্ছাই হল অর্থের চাহিদা। কোন ব্যক্তি বা পরিবার কিংবা কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান নানা উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ কাছে ধরে রাখতে চায়। কীন্‌স এই উদ্দেশ্যগুলোকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে তিনপ্রকার অর্থের চাহিদার কথা বলেছেন, যথা—

(১) লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা (Transaction demand for money)।

(২) পূর্ব-সাবধানতার উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা (Precautionary demand for money)।

(৩) ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা (Speculative demand for money)।

(১) লেনদেনের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা ঃ

প্রাত্যহিক লেনদেন করার জন্য কিছু অর্থ হাতে রাখতে হয়, না হলে বিভিন্ন পাওনাদারেরা মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করতে পারে। কোন ব্যক্তি একদিনে যে আয় পেয়ে থাকে তা দিয়ে তাকে সারা সময়ের জন্য কেনাবেচা করতে হয়। আমরা বাঁজ মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে অর্থ পেয়ে থাকে এবং তা থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে অর্থ ব্যয় করে। বিচ্ছিন্নভাবে আয় প্রাপ্তি ও অবিচ্ছিন্নভাবে ব্যয় মেটানোর জন্য মানুষকে কিছু অর্থ হাতে রাখতে হয়। এই উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা পরিবারসমূহ যে পরিমাণ নগদ অর্থ ধরে রাখে তাকে লেনদেনের উদ্দেশ্যে রক্ষিত অর্থের চাহিদা বলা হয়। এই অর্থের চাহিদা আর্থিক আয়ের উপর নির্ভর করে। আর্থিক আয় বাড়লে বা কমলে লেনদেনের উদ্দেশ্যে রক্ষিত অর্থের চাহিদাও বাড়ে বা কমে।

(২) পূর্ব-সাবধানতার উদ্দেশ্যে রক্ষিত অর্থের চাহিদা :

মানুষের দৈনন্দিন লেনদেনের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ অর্থ রাখলেই চলে না। ভবিষ্যতে কখন কী দরকার হবে আগে থেকে জানা যায় না। এইসব অদৃষ্ট প্রয়োজনে যে পরিমাণ অর্থ হাতে ধরে রাখা হয় তাকে সাবধানতার উদ্দেশ্যে রক্ষিত অর্থের চাহিদা বলা হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝানো যায়। ধরা যাক, কোন ব্যক্তি নিজের মোটর গাড়িতে দূরবর্তী কোন জায়গায় যাবার সময় পেট্রোলের দাম, খাবার ও থাকার খরচ নিল। ফেরার পথে তার মোটর গাড়ি যদি বিকল হয়ে যায় তাহলে অর্থের অভাবে তাকে প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়তে হবে। কিন্তু তার কাছে যদি যাওয়া-আসার খরচ ছাড়াও বিপদ-আপদের জন্য আরও কিছু বেশি অর্থ থাকে তাহলে মোটর গাড়ি বিকল হয়ে গেলেও সে সহজেই বাড়ি আসতে পারে। এখানে যাওয়া-আসার খরচ ছাড়াও তার কাছে যে অতিরিক্ত অর্থ থাকবে তাকে পূর্ব-সাবধানতার জন্য রক্ষিত অর্থ বলা হয়। এই প্রয়োজনগুলো আগে থেকে জানা যায় না, কিন্তু মোটামুটি বলা যায় যে, যার আয় বেশি তার এই প্রয়োজনও বেশি হবে। অর্থাৎ সাবধানতার উদ্দেশ্যে রক্ষিত অর্থের চাহিদাও আর্থিক আয়ের উপর সরাসরিভাবে নির্ভর করে।

সামগ্রিকভাবে লেনদেন ও সাবধানতার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট অর্থের চাহিদা মোট আর্থিক আয়ের উপর নির্ভর করবে। এই উভয় উদ্দেশ্যে রক্ষিত অর্থের চাহিদাকে আমরা L_1 বলতে পারি। L_1 সারসরিভাবে আর্থিক আয়ের উপর নির্ভর করে। যদি P = দামস্তর এবং Y = মোট বাস্তব আয় হয়, তাহলে মোট আর্থিক আয় = PY = বাস্তব আয়ের আর্থিক পরিমাপ হবে। L_1 যেহেতু সরাসরিভাবে PY-এর সঙ্গে বাড়ে বা কমে (L_1 varies directly with PY), অতএব $\frac{L_1}{PY} = k$ (k একটি ধ্রুবক) অর্থাৎ $L_1 = k\,PY$. . (1)

(৩) ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা :

ফাটকা কী ?

কোন বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব থেকে ধারণা করে নিয়ে সেই ধারণানুযায়ী কাজ করাকে আমরা ফাটকা কারবার বলতে পারি। ফাটকা কারবার চলে সাধারণত কোন দ্রব্যের দামের উপর। আজ এই দাম আছে, আগামীকাল দাম বাড়বে— অতএব আজই দ্রব্যটি ক্রয় করা যাক, অথবা, আজ দাম বেশি আছে আগামীকাল দাম কমে যাবে, অতএব আজই জিনিসটা বিক্রয় করে দেওয়া ভাল— ইত্যাদি প্রকার মানসিক বিচার-বিবেচনাকেই ফাটকা বলা হয়। যারা কোন না কোন ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে তাদের মধ্যেই ফাটকা থাকে। ফাটকার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে, সকলে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একই অনুমান করে না। কেউ ভাবে দাম কমবে, কেউ ভাবে বাড়বে। বাস্তবিক পক্ষে দাম যদি কমে—তাহলে যারা

দাম কমবে ভেবে কাজ করেছিল তারা লাভবান হবে, আর যারা ভেবেছিল দাম বাড়বে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফাটকা ব্যাপারটি জুয়া খেলার মত। ভবিষ্যতে কী হতে পারে সেই অনুমানের উপর নির্ভর করে এখানে বাজি ধরা হয়। যার অনুমান সত্য হয় সে লাভ করে। যার অনুমান মিথ্যা হয় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(গ) ফাটকার সঙ্গে সুদের হারের সম্পর্ক :

কীনস সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফাটকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, লোকে অর্থ ধার দেবে কি হাতে ধরে রাখবে সেটা নির্ভর করে (ক) সুদের হারের উপর এবং (খ) সুদের হারের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন সম্বন্ধে লোকের অনুমানের উপর।

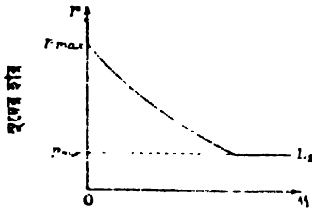
(ক) সুদের হার ও অর্থের চাহিদা : সুদ হল অর্থ ধার দেওয়ার পুরস্কার। সুদ বেশি হলে লোকে বেশি অর্থ ধার দিতে চায় এবং কম অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায়। অর্থাৎ সুদ বেশি হলে নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার চাহিদা কমে। সুদ কম হলে এই চাহিদা বাড়ে। সুদের হার ও অর্থের চাহিদার সম্পর্ক বিপরীতমুখী হয় কারণ সুদ হল আয়, যত বেশী অর্থ ধার দেওয়া যায় ঋণদাতার আয় ততই বৃদ্ধি পায়। সুদের হার বৃদ্ধি পেলে আয়ের সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়, কাজেই অর্থ ধরে না রেখে লোকে অর্থ ধার দিতে চায়। সুদের হার কম হলে সকলে অর্থ ধার না দিয়ে হাতে ধরে রাখতে চায়। অর্থাৎ সুদের হার কম হলে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

(খ) সুদের হার যখন একটি নির্দিষ্ট স্তরে থাকে তখন অনেকে মনে করে এবার সুদের হারের পরিবর্তন হবে, সেই অনুমান মত তারা অর্থের চাহিদার পরিবর্তন করে। যদি সুদের হার কম থাকে তাহলে অনেকে ভাবে ভবিষ্যতে সুদের হার বাড়বে, তখন অর্থ ধার দেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে অর্থের চাহিদা বাড়বে। আবার সুদের হার যখন বেশি থাকবে তখন অনেকে ভাববে সুদের হার এরপর কমে যাবে, অতএব এখনই ধার দেওয়া ভালো। এক্ষেত্রে অর্থের চাহিদা কমবে।

তাহলে আমরা পাই, সুদের হারের সঙ্গে অর্থের ফাটকা চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক আছে। সুদের হার বেশি হলে অর্থ ধার দিয়ে বেশি আয় পাওয়া যায়, এবং দ্বিতীয়ত ভবিষ্যতে সুদের হার কমে যেতে পারে বলে অনেকে মনে করতে পারে—এই দুটি কারণে অর্থের চাহিদা কমে। অপরপক্ষে সুদের হার কম হলে অর্থের ফাটকা চাহিদা বেড়ে যায়—তার কারণ কম সুদ মানে কম আয় এবং দ্বিতীয়ত কম সুদ হলে লোকে অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে সুদের হার বাড়বে। আমরা যদি r = সুদের হার এবং L_2 = অর্থের ফাটকা চাহিদা ধরি—তাহলে পাই $L_2 = L(r)$···(2). r বাড়লে L_2 কমে, r কমলে L_2 বাড়ে। এখন রেখাচিত্রের লম্ব-অক্ষে r এবং অন্য অক্ষে L_2 পরিমাপ করলে L_2 ও r-এর বিপরীতমুখী সম্পর্ক থেকে আমরা একটি নিম্নমুখী রেখা পাই। কীনস ধরেছিলেন সুদের হার খুব বেশী হলে, অর্থাৎ $r = r_{max}$ হলে $L_2 = O$ হবে। অর্থাৎ খুব বেশী সুদের হারে কেউ

অর্থ হাতে ধরে রাখতে চাইবে না। কাজেই অর্থের ফাটকা চাহিদা শূন্য হবে। আবার সুদের হার যদি খুব কমে $r = r_{min}$ হয়ে যায় তাহলে অর্থ ধার দিয়ে বিশেষ আয় পাওয়া যাবে না। তাছাড়া সুদের হার যদি আগেকার সব রেকর্ড ভেঙ্গে খুব নীচে নেমে যায় তাহলে সকলে ভাববে এবার নিশ্চয়ই সুদের হার বাড়বে। এক্ষেত্রে কেউ অর্থ ধার দিতে চাইবে না ; সকলে অর্থ হাতে ধরে রাখতে চাইবে। অর্থের ফাটকা চাহিদা অসম্ভব বেড়ে যাবে। তাই কীন্‌স্ ধরেছিলেন $r = r_{min}$ হলে $L_2 = \infty$ হবে।

সুদের হার যখন r_{max} তখন L_2 রেখা r-অক্ষকে ছেদ করবে এবং $L_2 = O$ হবে। আবার $r = _{min}$ হলে $L_2 = \infty$ হবে, কাজেই যেখানে r_{min} সেখানে L_2 রেখাটি OL-অক্ষের সমান্তরাল হবে। কীন্‌সের মতে সুদের হার প্রায় ২% হলে বুঝতে হবে সুদের হার নিম্নতম স্তরে এসে পেঁছেছে।



১৭.৩ রেখাচিত্র : অর্থের ফাটকা-চাহিদা রেখা

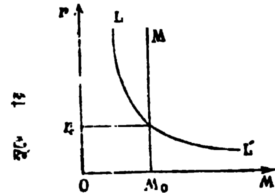
আমাদের ১৭.৩ নং রেখাচিত্রে L_2 হল অর্থের ফাটকা-চাহিদা রেখা।

অর্থের মোট চাহিদা :

অর্থের মোট চাহিদা হল $L_1 + L_2$.
(১) নং সমীকরণ থেকে পাই $L_1 = KPY$
(২) নং সমীকরণ থেকে পাই $L_2 = L(r$

তাহলে অর্থের মোট চাহিদা হবে $L_1 + L_2 = KPY + L(r)$। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অর্থের মোট চাহিদা নির্ভর করে (ক) দামস্তর (P), (খ) বাস্তব আয় (Y) এবং (গ) সুদের হারের (r) উপর। কীনস্ ধরেছিলেন P এবং Y স্থির আছে। তাহলে অর্থের চাহিদা কেবলমাত্র r-এর উপর নির্ভর করবে। ধরি $P = P_0$ এবং $Y = Y_0$; তাহলে অর্থের মোট চাহিদা $= KP_0Y_0 + L(r)$। এখানে r বাড়লে অর্থের মোট চাহিদা কমবে এবং r কমলে অর্থের চাহিদা বাড়বে। অর্থাৎ অর্থের চাহিদা রেখাটি নিম্নমুখী হবে। আমাদের ১৭.৪ নং রেখাচিত্রে LL হল অর্থের মোট চাহিদারেখা।

এখন ১৭.৪ নং রেখাচিত্রের মধ্যে যদি অর্থের যোগান রেখাটি অংকন করা যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারব কীভাবে অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হবে।



১৭.৪ রেখাচিত্র : কীন্‌সীয় তত্ত্বে সুদের হার নির্ধারণ

আমরা ধরেছি দাম (P) স্থির এবং আয় (Y) স্থির। এখন যদি ধরি ব্যক্তি বা পরিবারসমূহের নগদ অর্থের চাহিদার অন্যান্য বিষয় স্থির আছে তাহলে LL' রেখার অবস্থানের কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থের যোগানও স্থির আছে। কাজেই আমরা

MM_0 রেখাটি পাব। LL' ও MM_0 রেখা দুটি পরস্পরকে যে বিন্দুতে ছেদ করবে সেই ছেদবিন্দুটি হবে ভারসাম্যের বিন্দু। সেই বিন্দুতে অর্থের চাহিদা ও যোগান সমান হবে এবং ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হবে। আমাদের রেখাচিত্রে Or_0 হল ভারসাম্য সুদের হার।

(ঘ) **কীনসের তত্ত্বের পর্যালোচনা :**

কীনসের সুদতত্ত্বটির প্রধান গুণ হল যে, এতেই প্রথম অর্থের দুটি কাজের কথা বলা হয়েছে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন অর্থ কেবল বিনিময়ের মাধ্যম মাত্র। সেইজন্য তাঁদের অর্থতত্ত্বে অর্থের একটিমাত্র চাহিদা ছিল। কিন্তু কীনস্ প্রথম দেখালেন যে, অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম এবং সম্পদের ভাণ্ডার। অতএব অর্থের দুরকম চাহিদা হবে—বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে লেনদেনের উদ্দেশ্যে রক্ষিত অর্থের চাহিদা, এবং সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে অর্থের ফাটকা চাহিদা। অর্থকে যদি পাখি বলা যায় তাহলে আমরা বলতে পারি—ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা এই পাখির গায়ে একটি মাত্র ডানা বসিয়েছিলেন। কিন্তু কীনস বসিয়েছিলেন দুটি। অর্থাৎ ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে অর্থের আলোচনা অসম্পূর্ণ, কীনস্ তাকে সম্পূর্ণতা দান করেছিলেন।

দ্বিতীয়ত, কীনস্ প্রথম সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ফাটকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন। কীনসের আলোচনাতেই মানুষের আশা-আশঙ্কার একটি বড় ভূমিকা আছে। সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আশা-আশঙ্কার প্রভাব অর্থনৈতিক জীবনে খুবই বেশী। এদের কথা না বললে সব বলা হয় না। কিন্তু কীনসের আগের যুগের সুদতত্ত্বে এই সব ব্যাপার ছিল না।

কিন্তু এত গুণ সত্ত্বেও কীনসের সুদতত্ত্বে কয়েকটি ত্রুটি থেকে গেছে।

১। কীনস্ সুদের হারকে পুরোপুরি আর্থিক ব্যাপার বলে ধরেছিলেন। ক্ল্যাসিক্যালরা বলতেন সুদ পুরোপুরি বাস্তব ব্যাপার। সেই বক্তব্য যেমন অসম্পূর্ণ ও অর্ধসত্য, তেমনি সুদ সম্পূর্ণ আর্থিক ব্যাপার নামক ধারণাটিও অসম্পূর্ণ ও অর্ধসত্য। সুদ অংশত আর্থিক এবং অংশত বাস্তব ব্যাপার। সুদের হার যেমন অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়, তেমনি মূলধনের কার্যকারিতা, সঞ্চয় প্রবণতা প্রভৃতি বাস্তব বিষয়গুলিও সুদের হারকে প্রভাবিত করে।

২। কীনস্ তাঁর পূর্ববর্তী ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে যে ভুলের উল্লেখ করেছিলেন—তিনি নিজেও সেই একই ভুল করেছিলেন। কীনস্ অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখিয়েছিলেন যে, আয়স্তর নির্ধারিত না হলে সুদের হারও নির্ধারিত হয় না। কীনসের তত্ত্বেও দেখা যায় যে, আয়স্তর নির্ধারিত হয়নি। তিনি আয়স্তরকে স্থির বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু আয়স্তর যদি স্থির না থাকে, যদি আয়স্তরের পরিবর্তন হয় তাহলে অর্থের চাহিদার পরিবর্তন হবে। আয়স্তর (Y) বাড়লে L_1 বাড়বে এবং LL' রেখাটি উপরের দিকে উঠে যাবে। তখন সুদের হারও পাল্টে যাবে। বিপরীতক্রমে, যদি আয়স্তর কমে যায়, তাহলে L_1 কমবে এবং LL' রেখাটি নীচের দিকে নেমে যাবে। তখন

সুদের হারও অন্য হবে। এইভাবে দেখা যায় আয়স্তর নির্ধারিত না হলে সুদের হার নির্ধারিত হয় না। কীনসের তত্ত্বে সুদের হার অনির্ধারিত (Indeterminate) থেকে যায়। কীনস্ ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের মধ্যে এই ত্রুটিটি লক্ষ্য করে নিজেই সেই ভুলের জালে কীভাবে জড়িয়ে পড়লেন ভেবে পাওয়া যায় না।

৩। কীনসের তত্ত্বে অর্থের চাহিদা দাম স্তরের উপর নির্ভর করে। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে বলা হয় দামস্তর অর্থের চাহিদার উপর নির্ভর করে। কীনসের সুদ তত্ত্বে অন্য কথা বলা হয়েছে। অথচ কীনস্ তাঁর দাম-তত্ত্বে স্বীকার করেছিলেন পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরে দামস্তর অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হবে। অতএব কীনসের সুদ ও দামস্তর তত্ত্বের মধ্যে কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়।

৪। অর্থের যোগান বাড়লে যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায় তাহলে KPY বৃদ্ধি পাবে, L_1 বাড়বে এবং LL′ রেখাটি উপরের দিকে উঠে যাবে. তখন সুদের হারও অন্য হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দামস্তর নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট না হলে কীনসের তত্ত্বে সুদের হার নির্ধারণ করা যাবে না।

৫। কীনস্ তাঁর তত্ত্বে অর্থের যোগানকে অবহেলা করেছেন। অর্থের যোগান বলতে এখানে কেবলমাত্র নগদ অর্থের কথাই ধরা হয়েছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট অর্থের কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। একটি উন্নত অর্থব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সৃষ্ট অর্থের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

৬। কীনস্ তাঁর অর্থের চাহিদা তত্ত্বে অর্থের ফাটকা চাহিদার কথা বলেছেন এবং সুদের হারের সঙ্গে অর্থের চাহিদাকে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে একটি অগ্রসারী পদক্ষেপ। কিন্তু বর্তমানে অর্থের চাহিদাকে আরো বহু বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আমরা বলতে পারি কীনসের তত্ত্বে অর্থের চাহিদাকে অনেক বেশি সরল করে দেখানো হয়েছে।

১৭.৪ ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব (Loanable Funds Theory)

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সুদের হারকে বাস্তব বিষয় (Real Phenomenon) বলে ধরা হয়েছিল। কীনসের তত্ত্বে সুদের হারকে আর্থিক বিষয় (Monetary Phenomenon) বলে ধরা হয়েছিল। ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বে সুদ নির্ধারণের উপর বাস্তব ও আর্থিক—উভয় বিষয়ের প্রভাব স্বীকার করা হয়েছিল। এই তত্ত্ব অনুসারে সুদের হার ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে সুদের হারে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও যোগান সমান হয় সেই সুদের হারকে বলা হয় ভারসাম্য সুদের হার। ঋণযোগ্য তহবিল বলতে বোঝায় যে তহবিল (Fund) থেকে ঋণ দেওয়া যেতে পারে। অনেকেই ঋণ নিতে চায়, এরা ঋণের চাহিদা সৃষ্টি করে। অনেকেই ঋণ দিতে চায়, এরা যোগান সৃষ্টি করে।

(ক) ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা (Demand for Loanable Funds)

ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা আসে দেশের পরিবার, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের

কাছ থেকে। যে সব পরিবারের চলতি আয় থেকে চলতি ভোগব্যয় পূরণ করা সম্ভব হয় না, তারা ঋণ করে। এর জন্য তাদের সুদ দিতে হয়। সুদ হল ঋণের ব্যয়। সুদ যত বেশি হয়, ঋণের ব্যয় তত কম হয়। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, সুদের হারের সঙ্গে পরিবারগুলির ঋণের চাহিদা বিপরীত সম্পর্কে আবদ্ধ থাকবে। সুদের হার বাড়লে বা কমলে পরিবারগুলির ঋণের চাহিদা যথাক্রমে কমবে বা বাড়বে।

পরিবার ছাড়াও প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়ে অর্থবিনিয়োগ করতে চায়। তাদের কাজ থেকে ঋণযোগ্য অর্থের চাহিদা আসে। একে বিনিয়োগের চাহিদা বলা হয়। সুদের হারের সঙ্গে এই চাহিদারও বিপরীত সম্পর্ক স্থাপন করা হয় অর্থাৎ সুদের হার বাড়লে বা কমলে বিনিয়োগের জন্য ঋণের চাহিদা যথাক্রমে কমবে বা বাড়বে।

ঋণযোগ্য তহবিলের আর একটি চাহিদা আসে সরকারের কাছ থেকে। সরকার জনগণের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সেই অর্থের সাহায্যে নানারূপ কাজে ব্যয় করেন। ঋণযোগ্য তহবিলের সরকারী চাহিদা সুদের হারের উপর নির্ভর করে না বলেই ধরা হয়। সরকার প্রয়োজন দেখেন, ব্যয় দেখেন না। কাজেই যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন—যে কোন সুদের হারে তা সংগ্রহ করাই হল সরকারের উদ্দেশ্য।

তাহলে আমরা পাই ঋণের মোট চাহিদা = পরিবারগুলির ভোগব্যয়জনিত চাহিদা + প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগজনিত চাহিদা + সরকারী চাহিদা। ধরা যাক,

D_L = ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা

C_L = ভোগব্যয়ের জন্য ঋণের চাহিদা

I_L = বিনিয়োগের জন্য ঋণের চাহিদা

G_L = সরকার কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের চাহিদা।

তাহলে আমরা পাই $D_L = C_L + I_L + G_L \cdots\cdots (1)$

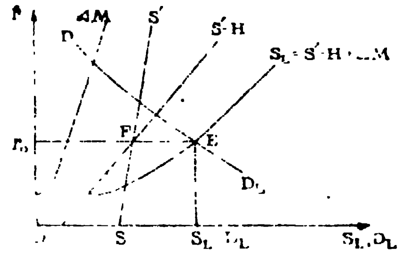
D_L এবং সুদের হারের সম্পর্ক হল বিপরীত সম্পর্ক। r বাড়লে D_L কমে। r কমলে D_L বাড়ে।

(খ) ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান (Supply of Loanable Funds)

ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান আসে (১) পরিবারগুলির সঞ্চয় থেকে, (২) অলস সঞ্চয় মোচন (dishoarding) এবং (৩) অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি থেকে। পরিবারগুলি তাদের চলতি আয়ের একটি অংশ দিয়ে ভোগ ব্যয় মেটায়, বাকি অংশটি চলতি সঞ্চয়ে জমা রাখে। সঞ্চয় করা হল ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করা। সুদ প্রাপ্তির জন্যই পরিবারগুলি সঞ্চয় করে থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা সেরকম ধরেই সুদের হার ও সঞ্চয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা বলেছিলেন। পরবর্তীকালে কীনস্‌ এবং অন্যান্য অর্থনীতিবিদরা বললেন, সঞ্চয় প্রধানত ব্যক্তির বা পরিবারের আয়ের উপর নির্ভর করে। সুদের হারের সঙ্গে সঞ্চয়ের

কোন সম্পর্ক নেই, থাকলেও তা অতিশয় দুর্বল সম্পর্ক। ধরা যাক, S = সঞ্চয়, y = আয় এবং r = সুদের হার। তাহলে আমরা পাই,

$S = S(y, r)$ অর্থাৎ সঞ্চয় আয় সুদের হারের উপর নির্ভর করে। আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে, আয় কমলে সঞ্চয় কমে। কাজেই $\frac{ds}{dy} > O.$ ধরা যাক, সুদের হার বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে এবং সুদের হার কমলে সঞ্চয় কমে। অর্থাৎ $\frac{ds}{dr} > O$। নীচের রেখাচিত্রে উল্লম্ব অক্ষে r এবং অনুভূমিক অক্ষে ঋণযোগ্য অর্থের পরিমাণ পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে SS' রেখাটি হল সঞ্চয় রেখা। এখানে ধরা হয়েছে যে, আয়স্তর নির্দিষ্ট পরিমাণে স্থির আছে। আয়স্তরের পরিবর্তন হলে SS' রেখাটির অবস্থানের পরিবর্তন হবে। আয় বাড়লে SS রেখাটি সমান্তরালভাবে ডানদিকে এবং আয় কমলে বাম দিকে সরে যাবে। যেহেতু সুদের হারের উপর সঞ্চয়ের নির্ভরশীলতা খুবই কম, সেই জন্য SS রেখার ঢাল খুবই কম রাখা হয়েছে। SS' রেখাটি ডানদিকে সামান্য হেলানো অবস্থায় থাকবে।



[illegible] রেখাচিত্র : অর্থের পরিমাণ

ঋণযোগ্য অর্থের যোগান আসে পরিবারগুলির অতীত সঞ্চয় থেকেও। পরিবারগুলি অতীতে যে অর্থ অলস সঞ্চয় তহবিলে জমা করে রেখেছিল সেই সঞ্চয় ভেঙেও ঋণ দিতে পারে। একে আমরা অলস সঞ্চয় মোচন বলতে পারি। সাধারণ সুদের হার বেশি হলেই পরিবারগুলি তাদের অতীত অলস সঞ্চয় ভেঙে অর্থ ঋণ দিতে চায়। এর ফলে ঋণযোগ্য তহবিলে যোগান বাড়ে। অলস সঞ্চয়ে অর্থ জমা করে রাখা হলে তাকে অলস সঞ্চয় ধারণ (Hoarding) বলা হয়। অলস সঞ্চয় মোচন হল অলস সঞ্চয় ধারণের বিপরীত ক্রিয়া। যদি H দ্বারা অলস সঞ্চয় ধারণ করা বোঝান হয় তাহলে - H দ্বারা অলস সঞ্চয় মোচন বোঝাবে। ধরা যাক,

DH (Dishoarding) $= -H$। আমরা বলতে পারি DH সুদের হার (r)-এর নির্ভর উপর করে। r বাড়লে DH বাড়ে, r কমলে DH কমে (অর্থাৎ H বাড়ে)।

সঞ্চয়ের সঙ্গে DH যোগ করলে আমরা ঋণের যোগান পাব। সঞ্চয় ও DH একসঙ্গে ধরলে ঋণের যোগান হবে $S+DH$. কিন্তু $DH = -H$.

অতএব ঋণের যোগান হবে $S+(-H) = S-H$. রেখাচিত্রে S'—H রেখাটির

দ্বারা ঋণের এই যোগান দেখানো হয়েছে। r বাড়লে S বাড়ে এবং DH বা $-H$ বাড়ে কাজেই r বাড়লে $S-H$ বাড়ে।

সেইজন্য $S-H$ রেখাটি ডানদিকে দেখানো হয়েছে।

ঋণের যোগানের তৃতীয় উৎস হল ব্যাঙ্ক সৃষ্ট অতিরিক্ত অর্থ। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আমানতকারীদের আমানত থেকে এই ঋণ দিয়ে থাকে। সুদের হার বৃদ্ধি পেলে এই অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। ধরা যাক $\triangle M$ = অতিরিক্ত অর্থের যোগান। $\triangle M$ নির্ভর করে r-এর উপর। r বাড়লে $\triangle M$ বাড়ে। রেখাচিত্রে $\triangle M$ রেখাটি সেইজন্য ডানদিকে হেলানো হয়েছে।

তাহলে আমরা পাই ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান = সঞ্চয় + অলস সঞ্চয় মোচন + অতিরিক্ত অর্থ।

ধরা যাক, S_L = ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান। তাহলে আমরা পাই

$$L_L = S - H + \triangle M \cdots\cdots (2).$$

S_L নির্ভর করে r-এর উপর। r বাড়লে S বাড়ে; r কমলে S_L কমে।

(গ) **ভারসাম্য:** যেখানে S_L ও D_L পরস্পর সমান হবে সেখানে ঋণের বাজারে ভারসাম্য দেখা দেবে। আমরা বলতে পারি ভারসাম্য অবস্থায়

$$S_L = D_L \text{ হবে} \cdots\cdots (3).$$

১৪.৩ [illegible] এই ভারসাম্য দেখানো হয়েছে। $S-H$ রেখার সঙ্গে $\triangle M$ রেখাটিকে [illegible] পাওয়া গেছে। S_L রেখা [illegible] E বিন্দুতে ছেদ করেছে। [illegible] E বিন্দুতে ভারসাম্য সুদের হার $= Or_1$। এই সুদের হারে $S_L = D_L$ হয়েছে।

(ঘ) মন্তব্য: (১) সুদ নির্ধারণের ক্লাসিক্যাল ও কীনসীয় তত্ত্বের তুলনায় ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বটি অনেক দিক থেকে একটি উন্নত তত্ত্ব। ক্লাসিক্যাল তত্ত্বে সুদের হারকে বাস্তব বিষয়, যেমন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রবণতার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু অর্থের কোন বাস্তব চাহিদা নেই এবং অর্থের চাহিদার কোন প্রভাব সুদের হারের উপর পড়ে না বলে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা ধরে নেন। এটা ঠিক নয়। কারণ অর্থ হল একটি সম্পদ এবং মূল্যের ভাণ্ডার। অর্থের চাহিদা আছে। বিশেষ করে ফাটকার জন্য অর্থের চাহিদা সুদের হারকে প্রভাবিত করে। একে অস্বীকার করা উচিত নয়। ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে যেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তেমনি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অলস সঞ্চয় মোচনের উপর। অলস সঞ্চয় ধারণ ও মোচন উভয়েই অর্থের ফাটকা চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

আবার, কীনস্ তাঁর সুদ তত্ত্বে সুদের হারকে কেবলমাত্র অর্থের চাহিদা ও যোগানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত করেছেন। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবণতার মত বাস্তব বিষয়গুলি তাঁর আলোচনায় গুরুত্ব পায়নি। এটাও ঠিক নয়। ক্লাসিক্যাল ও

কীন্‌সীয় তত্ত্বের যে অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায় ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বে সেই অসম্পূর্ণতা নেই। কাজেই একে আমরা গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব বলতে পারি।

(২) কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই তত্ত্বেও সুদের হার অনির্ধারিত (Indeterminate) থেকে যায়। সঞ্চয় যেহেতু আয়স্তর Y-এর উপর নির্ভর করে, অতএব আয় নির্ধারিত না হলে SS' রেখার অবস্থান নির্দিষ্ট হবে না। Y-এর পরিবর্তন হলে SS' রেখার এবং সেই সঙ্গে S_L রেখার অবস্থানের পরিবর্তন হবে। কাজেই সুদের হারও পাল্টে যাবে। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বেও এই সমস্যা ছিল। কীন্‌সীয় তত্ত্বেও ছিল। আবার ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বেও এই সমস্যা রয়েছে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, সুদের হার নির্ধারণ করার প্রধান সমস্যা হল একই সঙ্গে আয় (Y) এবং সুদের হার (r) নির্ধারণ করার সমস্যা। ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বেও এই সমস্যার সমাধান করা হয়নি।

(৩) আয়ের ভারসাম্যের জন্য

$Y = C + I + G$ হবে, C = ভোগব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয় এবং G = সরকারী ব্যয়।

অর্থাৎ $Y - C = I + G$.

অর্থাৎ $S = I + G$

সরকার যদি কেবলমাত্র ঋণের সাহায্যে ব্যয় মেটান তাহলে $G = G_L$ হবে। অতএব আয়ের ভারসাম্যের শর্ত হল যে,

$S = I_L + G_L = D_L$। কিন্তু ১৭.৫ রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে $S = D_L$ শর্ত পালিত হতে পারে F বিন্দুতে। E বিন্দুতে $S = D_L$ হয়নি।

অতএব E বিন্দুতে আয়ের ভারসাম্য থাকবে না। কাজেই সুদের হারও ভারসাম্য অবস্থায় থাকবে না। অর্থাৎ E বিন্দুটি ভারসাম্যের বিন্দু নয়। এটি হল ভারসাম্যহীনতার বিন্দু (Point of disequilibrium)।

১৭.৫ হিক্স-হ্যানসেন তত্ত্ব (Hicks-Hansen Analysis):

সুদের হারের হিক্স-হ্যানসেন প্রণীত তত্ত্ব হল ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব ও কীন্‌সীয় তত্ত্বের সম্মিলিত রূপ। প্রথমে অধ্যাপক হিক্স এর আভাস দেন এবং অধ্যাপক হ্যানসেন তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন বলে এই তত্ত্বকে হিক্স-হ্যানসেন তত্ত্ব বলা হয়।

অধ্যাপক হিক্সের মতে, সুদের হার (r) নির্ধারণের ক্ষেত্রে সঞ্চয় (S), বিনিয়োগ (I), অর্থের চাহিদা (L) এবং অর্থের যোগান (M) —সকলেরই গুরুত্ব আছে। দ্বিতীয়ত— হিক্স মনে করেন সুদের হার নির্ধারণ করার সমস্যাটি আয়স্তর (Y) নির্ধারণের সমস্যার সঙ্গে জড়িত। আয়স্তর এবং সুদের হার একই সঙ্গে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। r এবং Y-এর মান এমন হওয়া চাই যাতে Y-এর ক্ষেত্রে এবং r-এর ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনের ঝোঁক থাকবে না। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিতে

পারি যে, অর্থব্যবস্থার দুটি মাত্র বাজার আছে—একটি হল দ্রব্যের বাজার (Commodity market) এবং অন্যটি হল অর্থের বাজার (Money market)। দ্রব্যের বাজারে আছে আয়ের চাহিদা এবং আয়ের যোগান। অর্থের বাজারে আছে অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান। ধরা যাক দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে না এবং সেখানে সরকারের কোন অর্থনৈতিক কর্ম নেই। এই রকম দেশে দ্রব্যের বাজারে আয়ের চাহিদা হবে ভোগব্যয়ের চাহিদা (C) এবং বিনিয়োগের চাহিদা (I)।

মোট চাহিদা $= C + I$, দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য থাকবে যদি

$Y = C + I$ হয়, অর্থাৎ $Y - C = I$

অর্থাৎ $S = I$ ($\therefore \quad S = Y - C$)

ধরা যাক S নির্ভর করে y এবং r-এর উপর এবং I নির্ভর করে r-এর উপর। তাহলে আমরা পাই—

$S = S\ (Y, r) \cdots\cdots (1)$ সঞ্চয় অপেক্ষক

$I = I\ (r) \cdots\cdots\cdots (2)$ বিনিয়োগ অপেক্ষক

$S = I \cdots\cdots\cdots\cdots (3)$ ভারসাম্যের শর্ত।

এখানে ধরা হয় যে, Y বাড়লে S বাড়ে, r বাড়লে S বাড়ে

এবং Y কমলে S কমে, r কমলে S কমে।

অর্থাৎ $\frac{ds}{dY} > O$ এবং $\frac{ds}{dr} > O$, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে

ধরা হয় যে, r বাড়লে I কমে এবং r কমলে I বাড়ে। অর্থাৎ $\frac{dI}{dr} < O$,

উপরের (I), (2) এবং (3) থেকে পাই।

$$S(Y, r) = I\ (r) \cdots\cdots\cdots (4)$$

(4) নং সমীকরণ থেকে আমরা Y এবং r-এর একক মান পাব না। কারণ এখানে ২ টি অজ্ঞাত বিষয় (Y ও r) এবং একটি সমীকরণ রয়েছে। এখান থেকে আমরা Y এবং r-এর এমন কয়েকজোড়া মান পাব যাদের প্রত্যেকটির জন্য $I = S$ হয়। সেই মানগুলিকে রেখাচিত্রে বসিয়ে আমরা IS রেখা অঙ্কন করতে পারব। y বাড়লে S বাড়ে। তাহলে ভারসাম্যের জন্য I বাড়াতে হয়। তার জন্য r কমাতে হবে। অতএব আমরা পাই যে, Y বাড়লে r কমে। অর্থাৎ Y এবং r-এর সম্পর্কটি হল বিপরীত-মুখী সম্পর্ক। এইজন্য IS রেখাটি সাধারণত বামদিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, IS রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুতে S ও I সমান। অর্থাৎ IS রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দু দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য সূচিত করে।

এবার অর্থের বাজারের দিকে তাকানো যেতে পারে। অর্থের বাজারে অর্থের চাহিদা (Liquidity Preference) আছে। এই চাহিদা সুদের হার এবং আয়-স্তরের উপর নির্ভর করে। ধরা যাক $L =$ অর্থের চাহিদা। $L = L(y, r)$।

আয় বাড়লে কেনাকাটার প্রয়োজন বেশি হয়। তার জন্য অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অতএব Y বাড়লে L বাড়ে। আবার সুদের হার কমলে লোকে অর্থ হাতে ধরে রেখে দেয়, ধার দিতে চায় না। অর্থ হাতে ধরে রাখাই হল অর্থের চাহিদা। কাজেই আমরা বলতে পারি সুদের হার কম হলে অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। বিপরীত পক্ষে r বেশি হলে হাতে বেশি অর্থ ধরে রাখার জন্য অর্থের চাহিদা কমে যায়। আমরা পাই—r বাড়লে L কমে। তাহলে অর্থের চাহিদা অপেক্ষকটিকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করিতে পারি :

$$L = L(y,r) \cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

কীন্সের মতে অর্থের যোগান সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ যে অর্থের যোগান দেন তার পরিমাণ আর্থিক নীতির উপর নির্ভর করে। অর্থের যোগান হল একটি ধ্রুবক।

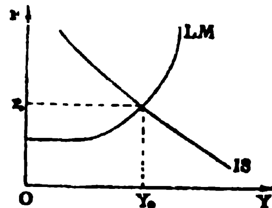
অর্থাৎ $M = M_0 \ldots\ldots\ldots\ldots (2)$

ভারসাম্যের জন্য $L = M$ হবে............(3).

(1), (2) এবং (3) থেকে পাই—

$L(Y, r) = M \cdots (4)$. এই সমীকরণ থেকে আমরা Y এবং r-এর কয়েকজোড়া মান পাব যাদের প্রত্যেকটির জন্য $L = M$ হবে ; অর্থাৎ অর্থের বাজারে ভারসাম্য থাকবে। Y এবং r-এর সেই মানগুলির মধ্য দিয়ে যে রেখা অঙ্কন করা যাবে তাকেই বলা হবে LM রেখা। এই রেখা সাধারণত ঊর্ধ্বমুখী হয়। কারণ Y বাড়লে L বাড়ে, ফলে অর্থের চাহিদা রেখা উপরের দিকে উঠে যায় এবং সুদের হার বেড়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, LM রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুতে $L = M$. অতএব LM রেখার প্রত্যেকটি বিন্দুতে অর্থের বাজারের ভারসাম্য অবস্থা সূচিত করে।

এখন একটি মাত্র রেখাচিত্রে IS এবং LM রেখা অঙ্কন করে তাদের ছেদবিন্দুতে Y এবং r নির্ধারণ করা যায়। সেই সুদের হার ও আয়স্তর হবে ভারসাম্য সুদের হার ও ভারসাম্য আয়স্তর, কারণ সেই সুদের হার ও আয়স্তরে দ্রব্যের বাজারে ও অর্থের বাজারে একই সঙ্গে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। পাশের রেখাচিত্রে IS ও LM রেখা দুটি পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E বিন্দুতে সুদের হার $= Or_0$ এবং আয়স্তর হল OY_0. যেহেতু E বিন্দুটি একই সঙ্গে IS এবং LM রেখার উপর আছে অতএব ঐ বিন্দুটি দ্রব্যের বাজার ও অর্থের বাজারের যুগপৎ ভারসাম্য সূচিত করছে।



১৮.৬ রেখাচিত্র : সুদের এবং আয়স্তর

প্রশ্নাবলী

১। সুদের হার বলতে কী বোঝ? সুদের হার নির্ধারণের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটির পর্যালোচনা কর।

২। সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কীন্‌সীয় তত্ত্বটির পর্যালোচনা কর।

৩। "সুদের হার অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়"—আলোচনা কর।

৪। তুমি কি মনে কর যে, সুদের হার অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৫। ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। "সুদের হার ঋণযোগ্য অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়"—আলোচনা কর।

৭। তুমি কি মনে কর যে, ক্লাসিক্যাল, কীন্‌সীয় এবং ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বের কোনটির দ্বারা সুদের হার নির্ধারণ সমস্যার সঠিক সমাধান করতে পারে না? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

৮। সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে হিক্‌স-হ্যানসেন তত্ত্বটি আলোচনা কর।

৯। তুমি কি মনে কর যে, সুদের হার এবং আয়স্তর একই সঙ্গে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

১০। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) আর্থিক সুদ ও বাস্তব সুদের পার্থক্য কর। (খ) "অর্থ সবচেয়ে তরল সম্পদ।"—কথাটির ব্যাখ্যা কর।

(গ) ফাটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদার সঙ্গে সুদের হারের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

১৮ | মুনাফা

১৮.১ (ক) মুনাফা কাকে বলে ?

কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে। দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি নানারূপ উপাদান নিয়োগ করে। প্রতিষ্ঠান বা ফার্মটি যদি বাইরে থেকে এইসব উপাদান ক্রয় করে তবে সেই উপাদানগুলিকে ভাড়াটিয়া উপাদান (hired factors) বলা হয়। ভাড়াটিয়া উপাদানগুলি জমি, শ্রম, মূলধন হতে পারে। ফার্ম নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে এই সব উপাদান সংগ্রহ করে। সেইজন্য জমির খাজনা, শ্রমের মজুরী ও মূলধনের সুদকে আমরা চুক্তিভিত্তিক ব্যয় বলতে পারি। এখন ফার্ম দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে যে বিক্রয়লব্ধ আয় পেয়ে থাকে তা থেকে ভাড়াটিয়া উপাদানসমূহের জন্য ফার্মের চুক্তিভিত্তিক ব্যয় বিয়োগ করে যদি কোন উদ্বৃত্ত থাকে তবে সেই উদ্বৃত্তকে মুনাফা বলা হয়। অতএব মুনাফা হল ফার্মের নীট বিক্রয়লব্ধ আয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, ফার্মের মুনাফা হল ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট চুক্তিভিত্তিক ব্যয়ের পার্থক্য। মুনাফা = মোট বিক্রয়লব্ধ আয়—মোট (চুক্তিভিত্তিক) ব্যয়। মোট আয় ও মোট ব্যয় সমান হলে মুনাফা শূন্য হবে। মোট আয় যদি মোট ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে মুনাফা ধনাত্মক হবে। তাহলে মুনাফা হল অবশিষ্ট আয় (residual income), প্রতিষ্ঠানের মালিক এই মুনাফা পেয়ে থাকেন। যেখানে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানটি এক-মালিকী কারবার—সেখানে মুনাফা হবে সেই মালিকের উদ্যোগ নামক সেবার মূল্য। যৌথমূলধনী কারবারে বহু মালিক বা শেয়ার-হোল্ডার থাকেন। সেখানে একজন মালিক মুনাফা বা লাভের একটি অংশ পেয়ে থাকেন। একে লভ্যাংশ বলা হয়। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য ধরব যে, সব প্রতিষ্ঠানই একমালিকী কারবার। এখানে মালিককে বলা হবে উদ্যোক্তা এবং মুনাফা হবে সেই মালিকের অবশিষ্ট পাওনা।

(খ) মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা :

উৎপাদনের মালিক দ্রব্য বিক্রয় করে যে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় পেয়ে থাকেন তা থেকে বাইরে থেকে ভাড়া করে আনা উপাদানসমূহের পাওনা মিটিয়ে যে উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্ত আয় পান তাকে মোট মুনাফা বলা হয়। মোট মুনাফা একটি মিশ্র আয়।

উৎপাদনের মালিক বাইরে থেকে জমি, শ্রম ও মূলধন সংগ্রহ করেন এবং তার জন্য জমির মালিককে খাজনা দেন, শ্রমিকদের মজুরী দেন এবং মূলধনের মালিককে সুদ দেন। অনেক সময় মালিক উৎপাদনের কার্যে নিজের জমি, শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে থাকেন। জমি, শ্রম ও মূলধন দেওয়ার পর মালিক উদ্যোগ দিয়ে উৎপাদনকে

সম্ভব করে তোলেন। কাজেই মালিকের উদ্যোগ হল মালিকের বিশেষ শ্রম। উদ্যোগের জন্য মালিক মুনাফা পেয়ে থাকেন। তাছাড়া মালিক নিজের জমির জন্য খাজনা, নিজের জন্য মজুরী ও নিজের মূলধনের জন্য সুদও পেয়ে থাকেন। এই সব পাওনাগুলিকে ধরে মালিক যে মুনাফা পান তাকেই মোট মুনাফা বলা হয়। অতএব মোট মুনাফা = মালিকের উদ্যোগের মুনাফা + নিজের জমির খাজনা + নিজের শ্রমের মজুরী + মালিকের মূলধনের সুদ।

উৎপাদনের মালিক বাইরে থেকে যে সব উপাদান ক্রয় করে আনেন সেইসব উপাদানের জন্য ফার্মের যে ব্যয় হয় তাকে স্পষ্ট ব্যয় (explicit cost) বলা হয়। অপর পক্ষে মালিক উৎপাদন কার্যে যে-সব নিজস্ব উপাদান ব্যবহার করে থাকেন তাদের জন্য মালিককে কোন স্পষ্ট ব্যয় অন্য কাউকে দিতে হয় না বলে এই ব্যয়-গুলোকে মালিকের অন্তর্নিহিত পাওনা (implicit earning) বা অন্তর্নিহিত ব্যয় বলা হয়। মোট মুনাফা হল—মোট বিক্রয়লব্ধ আয় — ফার্মের মোট স্পষ্ট ব্যয় = মালিকের উদ্যোগের মুনাফা + অন্যান্য অন্তর্নিহিত পাওনা।

মালিকের মোট মুনাফা নামক মিশ্র আয় থেকে যদি মালিকের নিজস্ব উপাদান-গুলির দামস্বরূপ মোট অন্তর্নিহিত ব্যয় বাদ দেওয়া যায়, তাহলে যে মুনাফা থাকে তাকে নীট মুনাফা বলা হয়। নীট মুনাফা হল কেবলমাত্র মালিকের উদ্যোগ নামক সেবার পারিশ্রমিক। আমরা বলতে পারি নীট মুনাফা = মোট মুনাফা — মালিকের অন্তর্নিহিত পাওনা বা আয়। অতএব যদি মালিকের অন্তর্নিহিত পাওনা কিছু না থাকে, অর্থাৎ মালিক যদি উদ্যোগ ছাড়া আর কোন উপাদানের যোগান দেন তাহলে মালিকের মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা সমান হবে। যদি অন্তর্নিহিত পাওনা বৃদ্ধি পায় তাহলে নীট মুনাফা কমবে।

যদি মোট মুনাফা ও মালিকের অন্তর্নিহিত পাওনা সমান হয় তাহলে মালিকের নীট মুনাফা শূন্য হবে। তাহলে মোট ও নীট মুনাফার মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করতে পারি।

১। মোট মুনাফা নীট মুনাফার চেয়ে বেশি হয়, ২। মোট মুনাফার মধ্যে উদ্যোগের পুরস্কার ছাড়াও মালিকের অন্যান্য উপাদানের আয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, কিন্তু নীট মুনাফার মধ্যে কেবলমাত্র মালিকের উদ্যোগের পুরস্কার থাকে।

১৮.২ মুনাফার উপাদান :—

উৎপাদনের মালিক দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য নানারূপ ভাড়াটিয়া উপাদান নিয়োগ করেন। সেই সব ভাড়াটিয়া উপাদানের জন্য তাঁকে বিভিন্ন প্রকার ব্যয় মেটাতে হয়। দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে যে আয় পাওয়া যায় তার থেকে উপাদানগুলির পারিশ্রমিক দিতে হয়। তারপর যা উদ্বৃত্ত থাকে তাকে মালিকের মুনাফা বলা হয়। এই মুনাফার মধ্যে একাধিক উপাদান থাকে।

মোট মুনাফা হল একটি মিশ্র আয়। এর মধ্যে উৎপাদনের মালিকের নিজস্ব শ্রমের মজুরী, নিজস্ব জমির খাজনা, নিজস্ব মূলধনের সুদ অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাছাড়া

থাকে মালিকের নীট মুনাফা। মালিক উৎপাদনের কাজে নিজের উপাদান নিয়োগ করলে তাদের জন্য তাকে স্পষ্ট কোন ব্যয় বহন করতে হয় না। অথচ মোট ব্যয়ের হিসাব করার সময় এই ব্যয় ধরা হয়। কাজেই এই ব্যয়কে অন্তর্নিহিত ব্যয় বলা হয়। অন্তর্নিহিত ব্যয় মালিকের আয়। কাজেই একে অন্তর্নিহিত আয়ও বলা যেতে পারে। মালিক নিজের উপাদান ব্যবহার করে যে সব অন্তর্নিহিত পাওনা পান তাদেরকেই বলা হয় মুনাফার উপাদান।

সাধারণত একমালিকী ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেই মুনাফার বিভিন্ন উপাদানগুলির পৃথকীকরণ সম্ভব। একমালিকী ব্যবসায়ে মালিক সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। শ্রমিক নিয়োগ করা, মূলধন সংগ্রহ করা, জমি জোগাড় করা সব কিছুই তাঁর দায়িত্ব। এইসব উপাদান নিয়োগ করা হলে তাদের সহায়তায় দ্রব্য উৎপাদন হয়। সেই উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব মালিকের। মালিক নিজের কারবারের পরিচালক। দ্রব্য উৎপন্ন হলে বিক্রয় করার দায়িত্বও তাঁর। দ্রব্য বিক্রয় হলে অন্য সব ভাড়াটিয়া উপাদানের পারিশ্রমিক মিটিয়ে দিতে হয়। কোনক্রমে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় না হলেও মালিক ভাড়াটিয়া উপাদানগুলির পাওনা মিটিয়ে দিতে বাধ্য থাকেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ক্ষতি হয়। মালিক ব্যতীত অন্য কেউ ক্ষতি বহন করে না। মালিকই হলেন ঝুঁকিবাহক। উৎপাদনের যত কিছু ঝামেলা ও ঝুঁকি সব কিছু মালিককে সহ্য করতে হয়। এতসব করার জন্য তিনি নিজের কাছ থেকে কিছু মুনাফা পাওয়ার আশা করেন। একে আমরা স্বাভাবিক মুনাফা বলতে পারি। স্বাভাবিক মুনাফা হল মুনাফার প্রধান উপাদান।

মালিকের স্বাভাবিক মুনাফা তাঁর বিকল্প আয়ের সমান হয়। মালিক বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে অন্যত্র যে আয় পেতে পারেন নিজের কারবার থেকে তিনি সেই পরিমাণ আয় পাওয়ার আশা করবেন। অন্যত্র কাজ করলে যা পাওয়া যায় তা হল মালিকের বিকল্প আয়। মালিকের স্বাভাবিক মুনাফা এই বিকল্প আয়ের সমান হয়। অনেকে বলেন স্বাভাবিক মুনাফা হল সেই নিম্নতম মুনাফা যা না পেলে মালিক উৎপাদন বন্ধ করে দেন। অধ্যাপিকা জোয়ান রবিনসনের মতে, যে মুনাফার প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে নতুন ফার্ম প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না সেই নিম্নতম মুনাফাই হল স্বাভাবিক মুনাফা।

স্বাভাবিক মুনাফা ছাড়াও মালিকের মুনাফার মধ্যে অন্য যে সব উপাদান থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, মালিকের বিভিন্ন নিজস্ব উপাদানের অন্তর্নিহিত পাওনা। মালিক যদি বাইরের থেকে জমি না নিয়ে নিজের জমিতে উৎপাদন কার্য চালিয়ে যান তাহলে তিনি জমিদার হিসাবে খাজনা পাবেন এবং সেই খাজনা তাঁর মুনাফার হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। আমাদের দেশের কৃষকরা কৃষিকর্ম নামক উৎপাদন ক্রিয়ার মালিক ও পরিচালক। কৃষক নিজের জমিতে কৃষিকর্ম করে যে আয় পেয়ে থাকে তার মধ্যে থাকে তার নিজের জমির খাজনা এবং মালিক হিসাবে তার স্বাভাবিক মুনাফা। কৃষকের আয় হল একটি মিশ্র আয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মালিক বাইরে থেকে ভাড়াটিয়া শ্রমিক নিয়োগ করেন

না। নিজের কিংবা তাঁর পরিবারের সদস্যদের শ্রমের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন করেন। আমাদের দেশের কুটীর শিল্পীদের কথা এর সবচেয়ে উপযুক্ত উদাহরণ। কুটীর শিল্পের মালিক যে আয় পেয়ে থাকেন তাকে সাধারণত মুনাফা বলা হলেও তার মধ্যে থাকে মালিকের মজুরী বা তাঁর পরিবারের সদস্যদের শ্রমের মজুরী এবং মালিক হিসাবে তাঁর স্বাভাবিক মুনাফা। শুধু কুটীর শিল্পী নয়, অনেক খুচরা ব্যবসায়ী, ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক প্রভৃতিরাও মুনাফার সঙ্গে মজুরী পেয়ে থাকে। মালিকের শ্রমের মজুরী হল মুনাফার অন্য উপাদান।

পরিশেষে বলা যায়, অনেক ক্ষেত্রে মালিক তাঁর উৎপাদনকার্যে নিজের মূলধন নিয়োগ করে থাকেন। বড় বড় যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলিও অবণ্টিত মুনাফাকে প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করেন। এর জন্য কোম্পানি যে সুদ পায় তা অংশীদারদের লভ্যাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। মালিক বা মালিকদের বিনিয়োগ-কৃত মূলধনের সুদ মুনাফার অন্য একটি উপাদান।

১৮.৩ নীট মুনাফা কেন পাওয়া যায় ?

নীট মুনাফা হল উদ্যোক্তার উদ্যোগ নামক সেবার পুরস্কার। কিন্তু উদ্যোগ কাকে বলে, কিংবা, উদ্যোক্তার ভূমিকা কী—সে বিষয়ে স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা নেই। যদি বলা হয়—উদ্যোগ হল উৎপাদন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ—তাহলে ঠিক বলা হয় না। মালিক নিজে উৎপাদন পরিচালনা না করে বেতনভোগী পরিচালক বা ম্যানেজার নিয়োগ করতে পারেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে—পরিচালনা হল এক-প্রকার শ্রম যার বিনিময়ে বেতন বা মজুরী পাওয়া যায়। মুনাফা পরিচালনার পুরস্কার হতে পারে না। তাহলে উদ্যোগ কী, উদ্যোক্তার কাজ কী—এইসব প্রশ্ন থেকেই যায়।

উদ্যোক্তার ভূমিকা কী ও নীট মুনাফা কেন পাওয়া যায় এ সম্বন্ধে অর্থনীতিতে একাধিক তত্ত্ব আছে। আমরা তাদের মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করতে পারি।

১। ঝুঁকিবহন তত্ত্ব (Theory of Risk Bearing) :

প্রথমে অধ্যাপক নাইট প্রদত্ত ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনতত্ত্বটির কথা বলা যেতে পারে। নাইটের মতে উৎপাদনের মালিক উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করেন এবং তার পুরস্কার হিসেবে নীট মুনাফা পেয়ে থাকেন। অন্য কোন উপাদান এই ঝুঁকি বহন করে না। শ্রমিকেরা চুক্তিমত মজুরী নিয়ে চলে যান ; জমির মালিক খাজনা পেলেই সন্তুষ্ট ; মূলধনের মালিক সুদ পেলেই খুশী ; উৎপাদনের ক্ষতি হল কি লাভ হল—তাতে তাদের কোন আগ্রহ থাকে না। কিন্তু দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে উপাদান সংগ্রহ করতে হয়, তাদের সার্থকভাবে উৎপাদন-কার্যে নিয়োগ করতে হয়—উৎপন্ন দ্রব্যকে বাজারে বিক্রয় করতে হয়—এই কাজগুলির প্রত্যেক স্তরে অসংখ্য রকমের ঝুঁকি ও ঝামেলা থাকে ; পদে পদে অনিশ্চয়তা থাকে। উপাদান পাওয়া যাবে এমন কোন স্থিরতা নেই। শ্রমিকেরা আন্দোলনের পথে নামতে পারেন।

যন্ত্র বিকল হয়ে যেতে পারে। কারখানায় অগ্নিকাণ্ড বা অন্য কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। পরিশেষে বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে দ্রব্য গেল—তা বিক্রি না হয়ে ফিরে আসতে পারে, অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা পড়ে যেতে পারে। এমনি কত যে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকে তার ইয়ত্তা নেই। উৎপাদনের মালিক ছাড়া অন্য কেউ এই সব ঝুঁকি নিতে চায় না, নেয় না।

নাইটের মতে উদ্যোগ হল ঝুঁকিবহন এবং নীট মুনাফা হল এই ঝুঁকিবহনের পুরস্কার।

উৎপাদন ক্ষেত্রে দু'রকমের ঝুঁকি থাকে, যথা—(ক) প্রাকৃতিক ও (খ) অর্থনৈতিক। প্রাকৃতিক ঝুঁকির জন্য বীমা করা যায়। তার জন্য মুনাফা পায় বীমা প্রতিষ্ঠান। উদ্যোক্তা কেবলমাত্র অবীমাযোগ্য ঝুঁকি (uninsurable risks) বহন করেন। সাধারণত অর্থনৈতিক ঝুঁকিকেই অবীমাযোগ্য ঝুঁকি বলা যায়। দ্রব্যের চাহিদা ও দাম এবং উপাদানের যোগান ও দামের মধ্যে অর্থনৈতিক ঝুঁকি থাকে। উদ্যোক্তা যে দ্রব্যের উৎপাদন করছেন—বাজারে তার চাহিদা যদি বেশি হয়—তাহলে দাম বেশি হবে। উদ্যোক্তার ব্যয় যদি স্থির থাকে তাহলে দাম বাড়লে উদ্যোক্তার মুনাফা হবে। আবার দ্রব্যের চাহিদা যদি কম থাকে—তাহলে দাম কমে যাবে এবং সেই সঙ্গে মুনাফাও হ্রাস পাবে। উদ্যোক্তার ঝুঁকি চাহিদার দিকে যেমন, ব্যয়ের দিকেও তেমনি থাকে। চাহিদা অনিশ্চিত। আবার উপাদানের যোগানও অনিশ্চিত। যোগানের অনিশ্চয়তা হল ব্যয়ের অনিশ্চয়তা। চাহিদার অনিশ্চয়তা হল দামের অনিশ্চয়তা। চাহিদা ও যোগানের অনিশ্চয়তা হল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। কোন বীমা কোম্পানি এদের ঝুঁকি বহন করে না। উদ্যোক্তাকে এই ঝুঁকি বহন করতে হয় এবং তার জন্য উদ্যোক্তা নীট মুনাফা পায়। অতএব নাইটের মতে—নীট মুনাফা হল অবীমাযোগ্য অর্থনৈতিক ঝুঁকি বহনের পুরস্কার।

নাইট-তত্ত্বের উপর মন্তব্য :

নাইটের যুক্তি বোঝার পক্ষে সহজ বলে মনে হয়। আধুনিক অর্থব্যবস্থার বিশেষত্ব হল অনিশ্চয়তা। উৎপাদন যখন সরল ছিল, উৎপাদক যখন নিজের ভোগের জন্যই দ্রব্য উৎপাদন করত—তখন উৎপাদক ও ভোগকারীর মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। তখন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তাও এত প্রবল ছিল না। বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা অত্যন্ত বিশাল ও জটিল আকার ধারণ করেছে। এখানে উৎপাদকরা ভোগকারীদের জন্য দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে; কিন্তু ভোগকারীদের সঙ্গে উৎপাদকদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। সেইজন্য উৎপাদকরা নিতান্ত অনুমানের উপর নির্ভর করে দ্রব্য উৎপাদন করে। ফলে লাভ বা ক্ষতি—যে কোন একটি হবার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এই ঝুঁকি খুব বেশি। কিন্তু ঝুঁকি দিয়ে মুনাফার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না বলেই মনে হয়। নাইটের তত্ত্বের বিরুদ্ধে বক্তব্য হল যে—

প্রথমত, ঝুঁকি সকলের ক্ষেত্রেই আছে। সাধারণ শ্রমিককেও ঝুঁকির ভিতর দিয়ে কাজ করতে হয়; তাহলে শ্রমিকের পাওনাকেও মজুরী না বলে মুনাফা বলা উচিত। তেমনি জমি, মূলধন ইত্যাদি উপাদান ও উপকরণের মালিকদেরও নানারূপ ঝুঁকি বহন করতে হয়। ঝুঁকি যদি সব ক্ষেত্রেই থেকে থাকে তাহলে কেবলমাত্র মুনাফাকেই ঝুঁকি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, ঝুঁকি পরিমাপযোগ্য বিষয় নয়। কিন্তু মুনাফা পরিমাপযোগ্য। তাহলে ঝুঁকি দিয়ে মুনাফাকে পরিমাণগতভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

তৃতীয়ত, বাজারে দেখা যায়, যে সব ফার্ম পুরানো, ক্রেতাদের কাছে যাদের সুনাম আছে, যাদের আয়তন বড়—তাদের ঝুঁকি কম, কিন্তু মুনাফা বেশি। নাইটের ঝুঁকিতত্ত্বে এর ব্যাখা পাওয়া যায় না।

চতুর্থত, নাইট-তত্ত্বে মুনাফা অর্জনের ব্যাপারে উৎপাদনের মালিকের যেন কোন প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই বলে মনে হয়। এটা ঠিক নয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মালিক মুনাফা অর্জনের জন্য সব রকম চেষ্টা ও অপচেষ্টা করে থাকেন। মালিক কখনই মুনাফাকে ভাগ্যের দান হিসেবে মেনে নেন না। অতএব নাইটের তত্ত্ব বাস্তবতা বিরোধী।

২। মুনাফার খাজনা তত্ত্ব (Rent Theory of Profit) ঃ

অধ্যাপক ওয়াকারের মতে ঝুঁকি উদ্যোক্তার দক্ষতার পার্থক্যের পুরস্কার। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে যেমন বলা হয় যে—সব জমিতে খাজনা হয় না, কেবলমাত্র উর্বর জমিতেই খাজনা হয়, তেমনি ওয়াকারের মতে সব উদ্যোক্তাই মুনাফা পান না, কেবলমাত্র দক্ষ উদ্যোক্তারাই মুনাফা পেয়ে থাকেন। জমির খাজনা যেমন জমির উর্বরতার পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত, উদ্যোক্তার মুনাফাও তেমনি দক্ষতার পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত। মার্শালের ভাষার অনুকরণে বলা যায়—মুনাফা হল সার্থক ও সফল উদ্যোগের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার উদ্বৃত্ত।

ওয়াকারের মতে সব উদ্যোক্তা সমান দক্ষতাসম্পন্ন নন। কারো দক্ষতা, পরিচালনা ইত্যাদি এত ভালো যে, তিনি কম ব্যয়ে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে পারেন। অন্যেরা এমন পারেন না। কাজেই একই দামে দ্রব্য বিক্রয় করে একজন যখন লাভ পেয়ে যান—অন্যেরা তখন কোনমতে খরচটুকু তুলতে পারেন কিংবা তাও পারেন না, শুধু ক্ষতির মুখ দেখেন।

মন্তব্য ঃ

১। ওয়াকারের এই তত্ত্বে মুনাফাকে খাজনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাহলে উদ্যোগকে জমির মত একটি প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে তুলনা করতে হয়। সেটা করা যায় না।

২। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বে খাজনাকে উদ্বৃত্ত বলা হয়েছে। মুনাফা বলতে আমরা যদি নীট মুনাফা বোঝাই তাহলে ওয়াকারের তত্ত্বে তাকেও উদ্বৃত্ত বলতে হয়। কিন্তু নীট মুনাফা উদ্বৃত্ত নয়। ব্যয়ের উর্ধ্বেও নয়।

৩। আধুনিক যৌথ মূলধনী কারবারে উৎপাদনের অসংখ্য মালিক থাকেন, যাঁদের শেয়ার-হোল্ডার বলা হয়। তাঁরা মুনাফার অংশ পান। যে বছর উৎপাদনে লোকসান হয় সে বছর সাধারণ শেয়ার-হোল্ডাররা কিছু পান না। অতএব এই লভ্যাংশকে মূলধন বিনিয়োগের সুদ না বলে মুনাফা বলাই উচিত। কিন্তু অসংখ্য শেয়ার-হোল্ডার উৎপাদন পরিচালনা করেন না। আবার তাঁদের দক্ষতা অন্যাদের চেয়ে ভালো এমন বলাও যায় না। অতএব ওয়াকারের তত্ত্ব এই সব শেয়ার-হোল্ডারদের মুনাফাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না।

৩। **উদ্ভাবন তত্ত্ব (Innovation Theory) :**

অধ্যাপক স্যুম্‌পিটারের মতে মুনাফা হল উদ্ভাবনের পুরস্কার। কোন বৈজ্ঞানিক কিংবা কোন প্রতিভাধর ব্যক্তি নতুন দ্রব্যের কিংবা নতুন উপাদান পদ্ধতির আবিষ্কার করতে পারেন। এটা হল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। এই আবিষ্কারকে অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যিনি সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পারেন তাঁর নাম উদ্ভাবক (Innovator)। কোন উদ্যোক্তা উদ্ভাবক হিসেবে কাজ করতে পারেন। তাহলে নতুন দ্রব্য বাজারে ছেড়ে তাঁর পক্ষে প্রথম প্রথম লাভ করা সম্ভব হবে। কালক্রমে অনেকেই সেই দ্রব্য কিংবা সেই পদ্ধতি শিখে যাবে। তখন তার যোগান এত বেশি হয়ে পড়বে যে, দাম কমে যাবে। অথচ নতুন দ্রব্য বাজারে চালু করলেই ক্রেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। প্রথম কিছুদিন সেই দ্রব্যের বিক্রেতারা বেশ কিছু টাকা লাভ করতে পারবে। পরে এই লাভ কমে যাবে। আবার নতুন দ্রব্যের প্রচলন হবে। এইভাবে চলতেই থাকবে।

মন্তব্য : বলা বাহুল্য, স্যুম্‌পিটারের এই তত্ত্বটিও স্বাভাবিক মুনাফার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যে সব ফার্ম দীর্ঘদিন ধরে উৎপাদন করে চলেছে সেই রকম প্রতিষ্ঠিত ফার্মগুলির মুনাফার ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে নেই। এখানে মুনাফাকে আকস্মিক উদ্ভাবনের পুরস্কার হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু সে মুনাফা হল অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক মুনাফা। তাছাড়া নতুন উৎপাদন পদ্ধতি কিংবা নতুন আবিষ্কার হলে পুরাতন পদ্ধতি ও পুরাতন যন্ত্র অচল হয়ে যায়। তার ফলে নতুন ফার্মের লাভ হতে পারে, কিন্তু পুরাতন ফার্মের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। কাজেই উদ্ভাবন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত ফার্মের মুনাফার ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

৪। **একচেটিয়া ক্ষমতা-তত্ত্ব (Theory of Monopoly Power) :**

এই তত্ত্বে বলা হয় উদ্যোক্তার উদ্যোগের জন্য মুনাফার উদ্ভব হয় না। মুনাফার উদ্ভব হয় উদ্যোক্তার আর্থিক ক্ষমতা থেকে। কোন প্রতিষ্ঠান যদি আয়তনে খুব বড় হয়ে যায়—তাহলে তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেউ পেরে ওঠে না। কালক্রমে ছোট প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। একটি বা দুটি প্রতিষ্ঠান প্রচণ্ড ক্ষমতার সঙ্গে বাজারে প্রভুত্ব বিস্তার করে। তারা একদিকে উপাদানের বাজার থেকে কম দামে, কম মজুরীতে উপাদান সংগ্রহ করে, এইভাবে উৎপাদন ব্যয় কমায়;

অন্যদিকে, উৎপাদনের বাজারেও দ্রব্যের যোগান ও দামকে এমনভাবে প্রভাবিত করে যাতে তাদের মুনাফা খুব বেশি হয়।

কাজেই মুনাফা হল একচেটিয়া ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। যে প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া প্রভাব যত বেশি, তার মুনাফা তত বেশি। প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। অপূর্ণাঙ্গ বাজারে দাম প্রান্তিক ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয়। বাজারে প্রতিযোগিতা যত কমবে, দাম (P) ও প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) পার্থক্যও তত বাড়বে। কাজেই P−MC-কে আমরা একচেটিয়া ক্ষমতার পরিমাপ বলতে পারি। মুনাফা এই P−MC-র সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে বা কমবে। অর্থাৎ—

মুনাফা = $K(P-MC)$, এখানে $K>O$

মন্তব্য: মুনাফার যতগুলি তত্ত্ব আছে তার মধ্যে এই তত্ত্বটিতেই বোধ হয় মুনাফার আসল স্বরূপ ধরা পড়েছে।

এই তত্ত্বে মুনাফাকে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ফল বলা হয়েছে। কিন্তু শুধু মুনাফা কেন সব পাওনাই তো অর্থনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। কাজেই এই তত্ত্বটিকে মুনাফা-নির্ধারণের একটি বিশেষ তত্ত্ব বলা যাবে না। তাছাড়া একচেটিয়া ক্ষমতা ব্যাপারটি P−MC-র দ্বারা পুরোপুরি পরিমাপ করা যায় না। সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একচেটিয়া ক্ষমতাকে পরিমাপ করা উচিত এবং মুনাফাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাফল্যের হিসেবে ধরা উচিত। অর্থাৎ এই তত্ত্বে মুনাফা নামক একটি অর্থনৈতিক বিষয়কে অন্য জগতের মধ্যে নিয়ে যায় এবং সেখানকার ব্যাপার দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চায়।

৫। **শ্রমিক-শোষণ তত্ত্ব:**

বিখ্যাত ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক কার্ল মার্ক্স মনে করেন উৎপাদনের মালিক যে দামে দ্রব্য উৎপাদন করেন সেই দামেই দ্রব্য বিক্রয় করেও মুনাফা লাভ করতে পারেন—কারণ, মালিক শ্রমিকদের শোষণ করেন। মার্ক্সের মতে শ্রমিকেরা যত মজুরী পান তার চেয়ে অনেক বেশি দ্রব্যের সামগ্রী উৎপাদন করেন। কোন শ্রমিক হয়ত ৮ ঘণ্টার শ্রম বিক্রয় করে ১০ টাকা মজুরী পান; কিন্তু তিনি ৮ ঘণ্টায় হয়ত ১৫ টাকার দ্রব্য উৎপাদন করেন। তাহলে ৫ টাকা হবে শ্রমিকের অতিরিক্ত উৎপাদন। অর্থাৎ শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন শ্রমের দামের চেয়ে বেশি।

শ্রমিক যা দেন তার চেয়ে কম পান। কাজেই অতিরিক্ত উৎপাদনের সৃষ্টি হয়। শ্রম ছাড়া অন্য কোন উপাদানই এই অতিরিক্ত উৎপাদন সৃষ্টি করতে পারে না। কিন্তু উৎপাদনের উপর শ্রমিকদের কোন মালিকানা নেই। শ্রমিক যে অতিরিক্ত উৎপাদন করেন—তা শ্রম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মালিকের পকেটে ঢোকে। শ্রম যদিও অতিরিক্ত উৎপাদন সৃষ্টি করে তবু মালিক এই অতিরিক্ত উৎপাদন কুক্ষিগত করে নেন। কারণ মালিক উৎপাদন সম্পর্কের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারেন। শ্রমিকেরা দরিদ্র—শ্রমছাড়া তাঁদের অন্য কোন সম্পদ নেই। কাজেই তাঁরা নিম্নতম

মজুরীতে শ্রম বিক্রয় করতে রাজি হন। কিন্তু মালিকের মূলধন আছে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক পদমর্যাদা আছে। এ সবের জোরে মালিক শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেন। মুনাফা হল এই বঞ্চনার বস্তুগত রূপ।

মালিকেরা শ্রমিকদের শোষণ করে যে মুনাফা বা অতিরিক্ত মূল্যোৎপাদন কুক্ষিগত করেন তাই জমিয়ে জমিয়ে মূলধনে পরিণত করেন। মূলধন হল অতীত শ্রমের পুঞ্জীভূত রূপ। এই শ্রম মৃত শ্রম মালিকের কুক্ষিগত এবং মূল বা যন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে শ্রমিকদের হাতে পৌঁছায়। তাতেই শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। মৃত শ্রম জীবিত শ্রমকে আরো উৎপাদনশীল করে তোলে। কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা বাড়লেই যে শ্রমিকদের মজুরী বাড়বে এমন কোন কথা নেই। কাজেই ক্রমবর্ধমান অতিরিক্ত মূল্যোৎপাদন মালিকের মুনাফাকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে দেয়। শ্রমিকদের মজুরীর হার স্থির থাকে। কিংবা জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে শ্রমের যোগান বাড়ে, যন্ত্রের ব্যবহার হলে শ্রমের চাহিদা কমে এবং এইভাবে বেকার মানুষের ভিড় বেড়ে যায়। মজুরী বরং আরো কমে যায়। এইভাবে উৎপাদন যত বাড়তে থাকে মুনাফাও তত বাড়তে থাকে। শ্রমিকদের দুর্দশাও সেই সঙ্গে বেড়ে যায়। মার্ক্সের মতে অসমাজতান্ত্রিক, বিশেষত ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় এইভাবেই মুনাফার উদ্ভব হয়।

মন্তব্য ঃ মার্ক্সের এই মুনাফা তত্ত্বটি তাঁর বিখ্যাত মূল্যতত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। মার্ক্সের মূল্যতত্ত্বটি আবার পূর্ববর্তী অর্থনীতিবিদদের আলোচনা থেকে নেওয়া হয়েছে। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল—উৎপাদন হল বিনিময় মূল্যের উৎপাদন এবং শ্রম ছাড়া আর কোন উপাদানই অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি করতে পারে না। অনেকে এই মতটি মানেন না। উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের, বিশেষতঃ জমির ভূমিকা আছে। মার্ক্স একে উপেক্ষা করেছেন। দ্বিতীয়ত, মূলধনকে পুঞ্জীভূত শ্রম বললে সব বলা হয় না। গতকালের শ্রম ও আজকের শ্রমের মধ্যে শ্রম থাকে এবং শ্রম ছাড়াও থাকে আগামী দিনের জন্য প্রতীক্ষা (waiting)।

এই প্রতীক্ষার সঙ্গে সুদের হারের সম্পর্ক জড়িত। কাজেই মূলধনের কোন ভূমিকা নেই বললে বোঝাবে প্রতীক্ষা ও প্রকৃতির কোন গুরুত্ব নেই, উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তাও নেই।

তৃতীয়ত, মার্ক্সের মুনাফাতত্ত্বে সংগঠনকে বা উদ্যোগ গ্রহণকে পৃথক উপাদান হিসেবে ধরা হয়নি কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশেও দেখা যায়— রাষ্ট্র উৎপাদনের সংগঠক হিসেবে মুনাফা দাবি করে। শ্রমিকরা উৎপাদন করে সত্য, কিন্তু সংগঠন না থাকলে পরিকল্পনাবিহীন অসংগঠিত শ্রমিকদের দিয়ে কোন কিছু উৎপাদন করানো যায় না। এক্ষেত্রে সংগঠন নামক একটি পৃথক উপাদানের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতেই হচ্ছে।

চতুর্থত, সব উৎপাদন শ্রমিকদের পাওনা মনে করে যদি সব উৎপাদন শ্রমিকদের দিয়ে দেওয়া হয় এবং তারা যদি স্বভাব অনুযায়ী সেই উৎপাদন খেয়ে উড়িয়ে দেয়

তাহলে বিনিয়োগ কীভাবে হবে? সমাজতান্ত্রিক দেশেও তো শূন্য মুনাফায় বণ্টন পদ্ধতির প্রচলন নেই? সেখানেও মুনাফা আছে। রাষ্ট্র সেই মুনাফা দিয়ে সমাজের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করে। কাজেই মুনাফাকে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার একটি অব্যাখ্যাত ব্যাধি বললে সব বলা শেষ হয়ে যায় না।

১৮'৪. দীর্ঘকালে কী মুনাফা থাকে?

মুনাফাকে দুভাগে ভাগ করা যায়; যথা—স্বাভাবিক মুনাফা ও অস্বাভাবিক বা অতিরিক্ত মুনাফা। পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে কোন একটি ফার্ম অস্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে। কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকা সত্ত্বেও স্বল্পকালে নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘকালে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। দীর্ঘকালে নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে; দ্রব্যের দাম যদি গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে শিল্পান্তর্ভুক্ত ফার্মগুলি অস্বাভাবিক মুনাফা পেতে থাকে। তখন নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করে। এর ফলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যের দাম কমে যায়। অস্বাভাবিক মুনাফা কমে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত অস্বাভাবিক মুনাফা সম্পূর্ণরূপে শূন্য না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত নতুন ফার্ম শিল্পের মধ্যে প্রবেশ করে। অবশেষে দ্রব্যের দাম ও ফার্মের গড় ব্যয় সমান হয়। অস্বাভাবিক মুনাফা শূন্য হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি—পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ব্যবস্থায় দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফা থাকে না। কিন্তু স্বাভাবিক মুনাফা থাকে। দ্রব্যের দাম যতক্ষণ গড় উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ফার্মের মালিক স্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে থাকে। স্বাভাবিক মুনাফা হল গড় ব্যয়ের অংশ। দাম গড় ব্যয়ের নীচে নেমে গেলে ফার্মের ক্ষতি হয়। স্বল্পকালে ক্ষতি সত্ত্বেও প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্মের ক্ষতি মোট স্থির ব্যয়ের চেয়ে কম হয় ততক্ষণ সে ক্ষতি সত্ত্বেও উৎপাদন চালিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় বলে কিছু থাকে না। কাজেই দীর্ঘকাল ক্ষতি হলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। এর ফলে শিল্পের মধ্যে ফার্মের সংখ্যা কমে যায়। প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে দাম বেড়ে গড় ব্যয়ের সমান হয় এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা পেতে থাকে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে দীর্ঘকালে প্রত্যেকটি ফার্ম গড় ব্যয় রেখার নিম্নতম বিন্দুতে উৎপাদন করে। দ্রব্যের দাম নিম্নতম গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হতে পারে না। আবার বেশিও হতে পারে না। কম হলে ফার্মের প্রস্থান ঘটে। বেশি হলে প্রবেশ ঘটে। এইভাবে দাম নিম্নতম গড় ব্যয়ের সমান হয়। এই দামে শিল্পের দ্রব্যের যোগান রেখা পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়। চাহিদা যাই হোক না কেন, দ্রব্যের দাম এই নিম্নতম গড় ব্যয়ের নীচে নামতে পারে না, বা উপরে উঠতে পারে না। অতএব আমরা বলতে পারি—পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে দীর্ঘকালে সব ফার্ম

কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেয়ে থাকে। দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা থাকে। অস্বাভাবিক মুনাফা থাকে না।

কিন্তু দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বদলে একচেটিয়া প্রভাব থাকলে অবাধ প্রবেশের পথে আইনগত বাধা থাকে। সরকার একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট ট্রেডমার্কের সুবিধা দেয়, বা পেটেন্ট রাইট দেয়। অন্য কোন ফার্ম সেই দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না। অবাধ প্রবেশের পথে বাধা থাকলে একচেটিয়া ফার্ম দীর্ঘকালেও অস্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে। দীর্ঘকালে অস্বাভাবিক মুনাফার অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকলে বুঝতে হবে দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নেই। বরং একচেটিয়া প্রভাব ও অবাধ প্রবেশের পথে বাধা আছে। অবাধ প্রবেশাধিকারের অভাব হল অস্বাভাবিক মুনাফার দীর্ঘকালীন অস্বিত্বের কারণ।

১৮.৫ মুনাফা কি দামের মধ্যে প্রবেশ করে ?

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম (P) ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমান হয়। প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় থাকে। আমরা বলতে পারি MC=MVC. অতএব পূর্ণ প্রতিযোগিতায় P=MVC হয়। MVC র মধ্যে ফার্মের মুনাফা থাকে না। কারণ ফার্মের মালিক যে স্বাভাবিক মুনাফা পাওয়ার আশা করে সেই স্বাভাবিক মুনাফার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে স্থির থাকে। ফার্মের মালিক উৎপাদনের দায়-দায়িত্ব ও ঝুঁকি বহন করার জন্য নিম্নতম পরিমাণে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়ার আশা করে তাকে বলা হয় স্বাভাবিক মুনাফা। এই স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ, কিন্তু উৎপাদনের মোট ব্যয় কিংবা গড় ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফা প্রবেশ করে। প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফার মত স্থির ব্যয় থাকে না। দাম যেহেতু প্রান্তিক ব্যয়ের সমান, কাজেই স্বাভাবিক মুনাফাও দামের মধ্যে প্রবেশ করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা স্বাভাবিক মুনাফাকে স্থির ব্যয় হিসাবে ধরব ততক্ষণ আমাদের এই উক্তি সত্য হবে।

স্বল্পকালে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্ম তার গড় ব্যয়ের চেয়ে কম দামে দ্রব্য বিক্রয় করতে বাধ্য হতে পারে। যেখানে P<AC, সেখানে দ্রব্য বিক্রয় করে ফার্মের ক্ষতি হবে। ফার্মের মালিক স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষতির পরিমাণ স্থির ব্যয়ের চেয়ে কম থাকবে ততক্ষণ ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যাবে। ক্ষতির পরিমাণ স্থির ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়ে গেলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেবে।

কিন্তু দীর্ঘকালে ফার্ম ক্ষতি সহ্য করেও উৎপাদন চালু রাখে না। দীর্ঘকালে ক্ষতি হলে ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে দেয়। তখন দ্রব্যের দাম বেড়ে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের সমান হয়। আবার দাম গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে নতুন ফার্মের প্রবেশ ঘটে। এর ফলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং দাম কমে গিয়ে দীর্ঘকালীন

গড় ব্যয়ের সঙ্গে সমান হয়। এইভাবে দীর্ঘকালে দ্রব্যের দাম নিম্নতম গড় ব্যয়ের সমান হয়। অর্থাৎ দীর্ঘকালে P = AC হয়। এই গড় ব্যয়ের মধ্যে থাকে শ্রমিকদের মজুরী, জমির জন্য খাজনা ও ভাড়া, মূলধনের সুদ ও অবচয় বাবদ ব্যয় এবং মালিকের ঝুঁকি গ্রহণের পারিশ্রমিক হিসাবে স্বাভাবিক মুনাফা। অতএব দীর্ঘকালে দ্রব্যের দাম = দ্রব্যের একক প্রতি মজুরী, খাজনা, সুদ, অবচয় ও স্বাভাবিক মুনাফা। অতএব দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা গড় ব্যয় ও দামের অংশ হিসাবে গণ্য হয় এবং দামকে প্রভাবিত করে।

স্বাভাবিক মুনাফা ছাড়াও মালিক অস্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে। অস্বাভাবিক মুনাফা হল স্বাভাবিক মুনাফা ছাড়াও অতিরিক্ত মুনাফা। দ্রব্যের দাম যখন গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়, তখনই অস্বাভাবিক মুনাফা পাওয়া যায়। কাজেই অস্বাভাবিক মুনাফা হল উদ্বৃত্ত। এই উদ্বৃত্ত কখনই উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, অস্বাভাবিক মুনাফা কখনই দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। রিকার্ডো খাজনা ও দামের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার জন্য বলেছিলেন—খাজনা বাড়লে দাম বাড়ে না, দাম বাড়লেই খাজনা বাড়ে। মুনাফা ও দামের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আমরা রিকার্ডোর অনুকরণে বলতে পারি—মুনাফা বাড়লে দাম বাড়ে না, দাম বাড়লেই মুনাফা বাড়ে।

প্রশ্নাবলী

১। মুনাফা কাকে বলে? মোট মুনাফা ও নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কর। মুনাফার মধ্যে কী কী উপাদান থাকে?

২। নীট মুনাফা কাকে বলে? নীট মুনাফা কেন পাওয়া যায়?

৩। মুনাফা একটি মিশ্র আয়—উক্তিটির আলোচনা কর।

৪। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বলতে কী বোঝ? মুনাফা কি ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৫। তুমি কি মনে কর মুনাফা একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকার? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৬। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) মুনাফা কী? (খ) মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা কী? ওদের পার্থক্য কর। (গ) বীমাযোগ্য ও অবীমাযোগ্য ঝুঁকির পার্থক্য কর। (ঘ) মুনাফাকে অবশিষ্ট আয় বলা হয় কেন? (ঙ) মুনাফা দক্ষতার পার্থক্যজনিত উদ্বৃত্ত—কথাটি বুঝিয়ে দাও। (চ) উদ্ভাবন কাকে বলে? উদ্ভাবনের সঙ্গে মুনাফার সম্পর্ক কী? (ছ) একচেটিয়া ক্ষমতা কাকে বলে? এর সঙ্গে মুনাফার সম্পর্ক কী? (জ) ধনতন্ত্রের সমাজে শ্রমিকদের শোষণ করেই মুনাফা উদ্ভব হয়—উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

আধুনিক অর্থনীতি

২য় খণ্ড

সমষ্টিগত আলোচনা
(Macro-analysis)

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় | সমষ্টিগত অর্থনীতি-তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়

সমষ্টিগত অর্থনীতি নামক পাঠ্য বিষয়ে একটি দেশ বা একটি সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থার বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মের আলোচনা করা হয়। আলোচনাকে সহজবোধ্য ও সরল করার জন্য আমরা ধরে নিতে পারি যে, একটি অর্থব্যবস্থায় চারটি পৃথক ক্ষেত্র আছে, যথা : ১। পরিবারসমূহ, ২। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ, ৩। সরকার এবং ৪। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্র। এই চারটি ক্ষেত্রেই নানারকম অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলে এবং একটি অংশের কর্মের সঙ্গে অন্য অংশের কর্মের নানা সূত্রে যোগাযোগ থাকে।

একের কর্ম, একের সিদ্ধান্ত বহু ভাবে অন্যের কর্মকে ও কর্মের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। বাস্তবে ব্যাপারটি অত্যন্ত জটিল। কোন একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে শত সহস্র দিকে শত সহস্র কাজকর্ম ঘটছে, তারা আবার একে অন্যকে প্রভাবিত করছে এবং এমনিভাবে সব কিছু চলছে। এই ব্যাপারটিকে মনে মনে ধারণা করাও যায় না, ব্যাখ্যা করা তো দূরের কথা। সেইজন্য সমষ্টিগত আলোচনায় নানা রকম অনুধারণার আশ্রয় নিতে হয়। এই অনুধারণাগুলি একদিকে আলোচনাকে সরল করে যেমন, অন্যদিকে তেমনি অবাস্তবও করে তোলে। কিন্তু এছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোন উপায়ও নেই। এখনো পর্যন্ত এমন কোন আলোচনা নেই যা একসঙ্গে সরল এবং বাস্তবতা অনুযায়ী হয়েছে। (এখন নেই, ভবিষ্যতে হতে পারে।) সেইজন্য এখন আমাদের গতানুগতিক পথ ধরে চলতে হবে। এই পথে প্রথমে অনুধারণার বেড়া দিয়ে অর্থব্যবস্থাকে একটি ছোট্ট বোধগম্য স্তরে আনা হয়। পরে এক একটি অনুধারণার বেড়া তুলে ফেলা হয়। তাতে বাস্তব জগতের বাতাস এসে আলোচনাকে কিছুটা জীবন্ত করে তোলে। কিন্তু প্রথম প্রথম বোঝবার জন্য এবং বোঝাবার জন্য অনুধারণার প্রয়োজন। সেই ব্যাপারটা ভালোভাবে বোঝা হলে পরে আলোচনাকে বাস্তব করার চেষ্টা করা হয়। আমাদের এই প্রাথমিক স্তরে একটি সরল অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্ম নিয়ে আলোচনা করা হবে।

একটি সরল অর্থব্যবস্থায় যে সব লোক বাস করে—সামগ্রিকভাবে তাদের কাজ হল—ভোগ করা এবং ভোগের জন্যই নানারূপ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করা। উৎপাদন করতে গেলেই আবার শ্রমের প্রয়োজন হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য শ্রমের চাহিদা

বেড়ে যায়। শুধু শ্রম দিয়ে উৎপাদন হয় না। তার জন্য যন্ত্র চাই, যন্ত্র হল মূলধন। বিনিয়োগের দ্বারা নতুন মূলধনের সৃষ্টি হয়। কাজেই একটি অর্থব্যবস্থার প্রধান কাজ হল—ভোগ ও বিনিয়োগ। ভোগ মানে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা। এতে উৎপাদন বাড়ে। আবার বিনিয়োগ থেকেও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে এবং উৎপাদন বাড়ে। সমষ্টিগত অর্থনীতিতে সামগ্রিক ভোগ নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ভোগের পরেই আলোচনা করা হয় বিনিয়োগ নিয়ে। এখানে আমরা দুটি তত্ত্ব পাই, যথা—ভোগতত্ত্ব ও বিনিয়োগ তত্ত্ব।

ভোগ ও বিনিয়োগ হল উৎপাদনের চাহিদার কথা। দেশে যে সব দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় তাদের মোট যোগান নির্ভর করে—(১) দেশের অধীনে ও আয়ত্তে অবস্থিত প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ ও ব্যবহারের উপর, (২) শ্রমশক্তির পরিমাণ, গুণ ও ব্যবহারের উপর, (৩ মূলধন সম্পদের পরিমাণ, গুণ ও ব্যবহারের উপর এবং (৪) কারিগরিক জ্ঞানের উপর। এগুলোকে স্থির বলে ধরে নিলে দ্রব্য-সামগ্রীর যোগান নির্দিষ্ট থাকবে। এখন এই যোগানকে দ্রব্যের চাহিদার (ভোগ ও বিনিয়োগের) সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। এই দেখাকে উৎপাদন বা আয়ের ভারসাম্য নিধারণ বলা হয়। সমষ্টিগত আলোচনায় ভোগ ও বিনিয়োগের আগে জাতীয় উৎপাদনের ভারসাম্য সমস্যার আলোচনা করা হয়। তার আগে থাকে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাপের সমস্যা। এটি মূলত পরিসংখ্যানের সমস্যা। তাহলে সমষ্টিগত অর্থনীতিতে থাকে—

(১) জাতীয় উৎপাদন ও আয় পরিমাপ,
(২) জাতীয় উৎপাদন ও আয়ের ভারসাম্য,
(৩) সামগ্রিক ভোগ, এবং
(৪) বিনিয়োগের আলোচনা।

এ ছাড়া কোন দেশে, বিশেষত আধুনিক মিশ্র অর্থব্যবস্থায়, সরকারী কাজকর্ম দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত, সরকার প্রত্যক্ষভাবে ভোগ, উৎপাদন ও বিনিয়োগ করতে পারেন; দ্বিতীয়ত, সরকার তাঁর বাজেটের মাধ্যমে ও অন্যভাবে দেশের বেসরকারী ভোগ, উৎপাদন, বিনিয়োগকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারেন। সমষ্টিগত অর্থনীতিতে সরকারের এই সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কাজের কথা আলোচনা করা হয়।

আবার কোন দেশ যা ভোগ করে তার মধ্যে কোন কোন দ্রব্য সে বিদেশ থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসে। আবার নিজের উৎপাদন অন্য দেশে বিক্রয় করে। এইভাবে আমদানি-রপ্তানি ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে। সমষ্টিগত আলোচনায় এ সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়।

এ ছাড়াও আছে দেশের অর্থ (নগদ ও ঋণ অর্থের মোট যোগানকে অর্থ বলা যেতে পারে) ব্যবস্থার আলোচনা, বাণিজ্যিক ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের

ও পারস্পরিক সম্পর্কের আলোচনা, দাম-স্তর সংক্রান্ত আলোচনা, মুদ্রাস্ফীতির আলোচনা প্রভৃতি। অতএব সমষ্টিগত অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সব বিষয়ের মধ্যে কয়েকটি নির্বাচিত বিষয় সম্বন্ধেই এখানে আলোচনা করা হবে।

প্রশ্নাবলী

১। সমষ্টিগত অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায় | কয়েকটি মৌল ধারণা ও সমস্যার কথা

২.১ **উৎপাদন :** উৎপাদন হল একটি প্রবাহ। প্রবাহ বলতে বোঝায় নদীর স্রোতের মত একটি বহমান ধারা। সময় দিয়ে এই প্রবাহকে বুঝতে ও বোঝাতে হয়। কারণ বিভিন্ন সময়ে এই প্রবাহ বিভিন্ন হতে পারে। সময় ছাড়া প্রবাহের হিসেব অর্থহীন। অতএব উৎপাদন হল একটি নির্দিষ্ট সময়ের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ দ্রব্য ও সেবার স্রোত। দ্রব্য বলতে দৃশ্য ও বস্তুগত পদার্থকে বোঝায়, যেমন, চাল, ডাল, কাপড় ইত্যাদি। সেবা বলতে বোঝায় অদৃশ্য বস্তু, যেমন চিকিৎসা। চিকিৎসককে দেখা যায়। কিন্তু তাঁর চিকিৎসা নামক সেবাকে দেখা যায় না। শিক্ষককে দেখা যায়, কিন্তু তাঁর শিক্ষাদানকে দেখা যায় না। শিক্ষা একটি সেবা। এমনি বহু আছে।

২.২ **বাস্তব উৎপাদন ও আর্থিক উৎপাদন :** উৎপাদন ক্রিয়ার ফলে দ্রব্য ও সেবার যে প্রবাহ পাওয়া যায় তার মোট পরিমাণকে দ্রব্যের আকারে প্রকাশ করলে তাকে বাস্তব উৎপাদন বলা হবে। অপরপক্ষে, অর্থের হিসেবে সেই পরিমাণকে প্রকাশ করলে তাকে আর্থিক উৎপাদন বলা হবে। যেমন, কোন কাপড়ের মিলে যদি প্রতিদিন ৩০০টি কাপড় উৎপন্ন হয় তাহলে ৩০০টি কাপড় কিংবা তার দৈর্ঘ্য কিংবা ক্ষেত্রফল হবে কাপড় নামক দ্রব্যের বাস্তব উৎপাদন। আবার প্রত্যেকটি কাপড়ের দাম যদি ৫০ টাকা হয়, তাহলে সেই মিলের প্রতিদিনের উৎপাদনের পরিমাণ টাকার অঙ্কে হবে ৩০০ × ৫০ টাকা = ১৫,০০০ টাকা। একে আমরা অর্থের হিসেবে উৎপাদন বা আর্থিক উৎপাদন বলতে পারি। আর্থিক উৎপাদনকে অনেক

সময় মূল্যোৎপাদন (value production) বলা হয়, যদিও মূল্য শব্দটি এখানে দাম অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আর্থিক উৎপাদন = বাস্তব উৎপাদন উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি এককের গড় দাম।

একটি দেশে বহু রকমের দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন হয়। এদের একক পৃথক। কাজেই সব দ্রব্য ও সেবার মোট পরিমাণ প্রকাশ করা সহজ নয়। এক্ষেত্রে বাস্তব উৎপাদন বলতে যে-কোন একটি দ্রব্যের বা সেবার হিসেবে প্রকাশিত মোট উৎপাদনকে বোঝায়। কোন দেশে ৫ কুইণ্টাল চাল ও ৩০ মিটার কাপড় উৎপন্ন হয়েছে। কুইণ্টালের সঙ্গে মিটার যোগ করা যায় না। এক্ষেত্রে দেশের মোট উৎপাদনকে হয় চালের হিসেবে, না হয় কাপড়ের হিসেবে প্রকাশ করা যেতে পারে। এরজন্য চাল ও কাপড়ের বিনিময় হার জানা দরকার। অর্থের হিসেবে প্রকাশিত এই বিনিময় হারকে আমরা দাম বলি। ধরি, চালের কুইণ্টাল ৩০০ টাকা এবং কাপড়ের মিটার ১০ টাকা, তাহলে ৩০ মিটার কাপড় = ৩০০ টাকা - ১ কুইণ্টাল চাল। অতএব, চালের হিসেবে দেশের মোট বাস্তব উৎপাদন ৫ কুইণ্টাল চাল + ৩০ মিটার কাপড় = ৫ কুইণ্টাল চাল + ১ কুইণ্টাল চাল মোট ৬ কুইণ্টাল চাল। আবার ৫ কুইণ্টাল চাল = ১,৫০০ টাকা = ১৫০ মিটার কাপড়। অতএব, কাপড়ের হিসেবে দেশের মোট বাস্তব উৎপাদন = ৫ কুইণ্টাল চাল + ৩০ মিটার কাপড় = ১৫০ মি. কাপড় + ৩০ মি. কাপড় = ১৮০ মি কাপড়। দেশে যতগুলি দ্রব্য ও সেবা থাক না কেন তাদের প্রত্যেকের দাম জানলে আমরা যে কোন একটি দ্রব্য বা সেবার হিসেবে সেই দেশের মোট বাস্তব উৎপাদন পরিমাপ করতে পারব।

অর্থের হিসেবে মোট উৎপাদনের হিসেব করা খুবই সহজ। এরজন্য দেশের প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম জানতে হবে। দাম জানা হলে প্রত্যেকটি দ্রব্য ও সেবাকে তার নিজস্ব দাম দিয়ে গুণ করে যে অর্থমূল্য পাওয়া যাবে সেই অর্থমূল্যকে যোগ করলেই মোট উৎপাদনের হিসেব পাওয়া যাবে।

যদি দেশে n সংখ্যক দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়, এবং তাদের বাস্তব পরিমাণ হয় $Q_1, Q_2, Q_3, \cdots, Q_n$, এবং তাদের দাম হয় যথাক্রমে $P_1, P_2, \cdots, P_n$, তাহলে অর্থের হিসেবে মোট উৎপাদন হবে

$$P_1Q_1 + P_2Q_2 + P_3Q_3 + \cdots + P_nQ_n = \sum_{i=1}^{n} P_i Q_i.$$

২.৩ : উৎপাদন পরিমাপ করার সমস্যা

আর্থিক উৎপাদন পরিমাপের অনেক সমস্যা থাকতে পারে। কোন দ্রব্য বা সেবার উৎপাদনের আর্থিক মূল্য জানতে হলে দ্রব্য বা সেবার পরিমাপ বা Q জানতে হয় এবং দাম বা P জানতে হয়। Q ও P জানতে পারলে কোন সমস্যা

থাকে না। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় যদি Q অথবা P, কিংবা Q ও P জানা না যায়। Q না জানলে P জানার প্রশ্নই ওঠে না। তবে Q জানলেও P জানা যায় না। বাস্তব জগতে এমন অনেক উৎপাদন আছে যার Q জানা যায় কিন্তু P জানা যায় না, কারণ সেই দ্রব্যটি হয়তো বিক্রয়ের জন্য বাজারে যায় না, কিংবা সেই দ্রব্যটির হয়তো কোন বাজারই নেই। উদাহরণ দেওয়া যাক। কোন শিকারী যদি বন থেকে একটা হরিণ মেরে আনে তাহলে সেই হরিণ শিকারকে আমরা উৎপাদন বলব। হরিণটাকে মেরে যদি ২০ কেজি মাংস পাওয়া যায় তাহলে সেই শিকারীর বাস্তব উৎপাদন হল ২০ কেজি মাংস। এখানে Q জানা যাচ্ছে। কিন্তু শিকারী তো বাজার থেকে হরিণটি কিনে আনেনি। কাজেই তার বাজার দাম জানা যাবে না। অর্থাৎ P অজ্ঞাত থাকবে। এক্ষেত্রে শিকারীর আর্থিক উৎপাদন জানা যাবে না। অনেকে বলতে পারেন—এখানে হরিণের মাংসের বাজার দর সংগ্রহ করে সেই দাম দিয়ে মাংসের পরিমাণকে গুণ করা যেতে পারে। হ্যাঁ, তা করা যেতে পারে। সেখানে যে দাম ধরা হবে তাকে আরোপিত দাম (imputed price) বলা হয়। এই দামটি প্রকৃত দাম (actual price) নয়। উৎপাদনের আর্থিক মূল্য পরিমাপ করার সময় অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত দামের অভাবে আরোপিত দাম নেওয়া যায়। আর একটা উদাহরণ দিই।

ধরি কোন দেশে ৩০ কিলোমিটার রাস্তা তৈরি হল। এখানে Q জানা যাচ্ছে, কিন্তু P ? রাস্তার কি কোন বাজার দাম আছে ? রাস্তা কি বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য (যাকে পণ্য বলা যায়) ? কখনই না। তাহলে এখানে P জানা যাবে না। P না জানলে PQ জানা যাবে না। অতএব দেশের মোট উৎপাদন পরিমাপ করার সময় রাস্তা নামক একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেব থেকে বাদ পড়ে যাবে। শুধু রাস্তা নয়। সরকার আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্য যে প্রশাসনিক সেবা দিচ্ছেন তার পরিমাণ জানা যায়। দাম জানা যায় না। প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা নামক সেবা দেওয়া হচ্ছে তার হয়তো পরিমাণ আছে, কিন্তু দাম নেই। চিকিৎসার সুবিধের জন্য সরকার কত হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ তৈরি করছেন, তার দাম জানা যায় না। তাহলে এগুলো সব হিসেব থেকে বাদ যাবে! বাদ যাবে কবির কাব্য প্রতিভার অবদান, শিল্পীর শিল্পকর্ম, দার্শনিকের চিন্তা, রাজ-নীতিকের নেতৃত্ব। নেহাৎ বাজার দামের অভাবে যদি এদের বাদ দিতে হয়, তাহলে পড়ে থাকে কুমড়ো, কাপড়, লোহালক্কড়ের মত দামী অথচ কম গুরুত্বপূর্ণ বস্তুরাশি। আবার অনেক ব্যাপারে Q জানা যায় না। আমি আমার শখের বাগানে যদি কোন ফুল-ফলের চাষ করি তাহলে মোট কত উৎপাদন হল বলা যাবে না। অনেকে বলবেন তা কেন, এখানে ফল ও ফুলের পরিমাণ বা সংখ্যা তো সহজেই জানা যাচ্ছে। তাছাড়া ঐ সব ফল ও ফুল বাজারেও পাওয়া যায়। ওদের বাজার দামও আছে। তাহলে পরিমাণকে দাম দিয়ে গুণ করে দিলেই তো আর্থিক

মূল্য পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যাপারটি এত সোজা নয়। নিজের বাগানে যে বাঁধাকপিটা হল তার পরিমাণ কি বাজার থেকে কিনে আনা কপির পরিমাণের সমতুল্য? কখনই না। মা যে স্নেহ-মমতা দিয়ে সন্তান পালন করেন তাকে আয়ার সেবাযত্নের মাপকাঠিতে মাপা যায় না, মাপা উচিতও নয়। কোন আয়া যদি ঘণ্টায় ২ টাকা নেন, যেদিন মায়ের চাকরিতে ছুটি থাকে, যেদিন তিনি নিজের সন্তানদের দেখাশোনা করেন সেদিন কি তিনি মাত্র ১৬ টাকার মাতৃত্ব নামক সেবা উৎপাদন করেন? এরকম বলা হাস্যকর। অর্থনীতিবিদরা বলেন—মায়ের সন্তান পালন কোন উৎপাদনই নয়। তেমনি শখের বাগানে যে সব ফুল ও ফল হয় সেগুলোও উৎপাদন নয়। সরকার প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনের জন্য যে সব কাজ করে থাকে। তাও উৎপাদন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এসব ক্ষেত্রে Q পাওয়া যায় না, P-ও পাওয়া যায় না।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এ ব্যাপারে পরিসংখ্যানে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যেমন, কোন বাড়ির মালিক নিজের বাড়িতে থাকলে তার আরোপিত ভাড়া ধরতে হয়। কৃষক যে ফসল পরিবারের ভোগের কাজে ব্যয় করে তার আরোপিত দাম হিসেবের মধ্যে আসবে, অথচ শিক্ষকপিতার সন্তানকে শিক্ষাদানের ব্যাপারে তার আরোপিত মূল্য হিসেবের মধ্যে ধরা হবে না। এখানে কোনটা উৎপাদন এবং কোনটা উৎপাদন নয় সে বিষয়ে প্রচলিত রীতি ব্যতীত অন্য কোন নিয়ম নেই।

উৎপাদন পরিমাপ করার আর একটি অসুবিধে হল দুবার গোনার ভুল এড়ানোর অসুবিধে। অনেক সময় একই দ্রব্য অন্য দ্রব্যের মধ্যে ঢুকে পড়ে, ফলে সেই দ্রব্যটি দুবার বা তার চেয়ে বেশিবার হিসেবের মধ্যে এসে পড়তে পারে। আমরা জানি, গম থেকে ময়দা, ময়দা থেকে রুটি হয়। এখন যদি আমরা গম, ময়দা ও রুটির হিসেব নিই, তাহলে গম দুবার বেশি এবং ময়দা একবার বেশি ধরা হয়ে যায়। এতে গমের পরিমাণ খুব বেড়ে যেতে পারে। ময়দাও বেড়ে যেতে পারে। এটা ভুল। এই ভুল হল দুবার গোনার ভুল (mistake of double counting)। গম, ময়দা ও রুটির ক্ষেত্রে এই ভুল এড়ানো হয়তো সহজ, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এটা সহজ নয়।

২৪ **আয়ঃ** আয় হল দ্রব্য, সেবা বা অর্থ প্রাপ্তির প্রবাহ। এই প্রবাহ দুভাবে ঘটতে পারে, যথা— ক) উৎপাদন কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অথবা (খ) কারো নিকট থেকে দান হিসেবে আয় পাওয়া যেতে পারে। দানগ্রহীতার নিকট এই আয় হবে অনুপার্জিত আয়। আমরা একে হস্তান্তরিত আয় (Transfer Income) বলব। অর্থাৎ দাতার আয় গ্রহীতার নিকট হস্তান্তরিত হচ্ছে। উৎপাদন কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে যে আয় পাওয়া যায় তাকে অর্থনৈতিক আয় বলা যায়। এই আয়ের একটি অংশ আয়-প্রাপক ব্যক্তি অন্যকে বিনা বিনিময়ে অর্থাৎ কোন কিছু না নিয়ে দিয়ে দিতে পারে। এর ফলে আয়

দাতার কাছ থেকে গ্রহীতার নিকট চলে যায়। আয়ের হিসেব করার সময় দাতার আয় হিসেবের মধ্যে ধরা হলে গ্রহীতার হস্তান্তরিত আয় আর ধরা হবে না। কারণ তা করলে দ্বিত্ব গণনার ভুল হয়ে যাবে।

তাহলে মানুষ দুভাবে আয় পেয়ে থাকে। প্রথম, উৎপাদন কার্যে অংশ গ্রহণ করে অথবা, দ্বিতীয়, দান হিসেবে। উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ-ভাবে হতে পারে। শ্রমিক নিজের শ্রম দেন। জমির মালিক দেন জমি। তাহলে শ্রমিক প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত। জমির মালিক পরোক্ষভাবে জড়িত। জমির মালিক তাঁর জমি নামক উৎপাদনের উপাদানের উপর সাময়িকভাবে মালিকানা পরিত্যাগ করেন। এটাই হল জমির মালিকের পরোক্ষ অংশগ্রহণ। সেজন্য তিনি খাজনা পান। আয়ের হিসেব করার সময় শ্রমের মজুরী যেমন ধরা হবে, তেমনি জমির বা জমির মালিকের খাজনাকেও ধরা হবে। উৎপাদনের মালিক যদি অন্যের মূলধন ধার হিসেবে নেন, তাহলে মূলধনের মালিকও পরোক্ষভাবে উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করেছেন বলা যাবে এবং সেক্ষেত্রে মূলধনের সুদও অর্থনৈতিক আয় হিসেবে গণ্য হবে।

মজুরী, খাজনা, সুদ ছাড়াও আমরা আর একটি আয়ের কথা ধরতে পারি। এর নাম মুনাফা। মুনাফা হল উদ্বৃত্ত আয় (Residual Income)। মজুরী, খাজনা ও সুদ হল চুক্তিভিত্তিক (contractual) আয়। উৎপাদনের মোট মূল্য থেকে মজুরী, খাজনা ও সুদ মিটিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকবে তাকেই মুনাফা বলা হবে।

মজুরী, খাজনা, সুদ ও মুনাফাকে অর্থনৈতিক আয় বলা হয়। এদের সঙ্গে বিনিময় যুক্ত থাকে। শ্রমিক শ্রম দেন, তার বিনিময়ে মজুরী পান। জমির মালিক ও মূলধনের মালিকও বিনিময়ের মাধ্যমে আয় পেয়ে থাকেন। কিন্তু সমাজে অনেকে কিছু না দিয়ে আয় পেয়ে থাকে। তাদের আয়কে হস্তান্তর-আয় বলা হয়। যেমন, বৃদ্ধরা পেনসন পান। পেনসন হস্তান্তরিত আয়। স্কুল, কলেজের হোস্টেলে থেকে যে সব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে তারা তাদের অভি-ভাবকদের কাছ থেকে যে মাসোহারা পায় সেটা উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য তারা পায় না। এমনি পায়। এটাও হস্তান্তরিত আয়। চোর-ডাকাত চুরি করে যে আয় করে তাও সমাজের অন্য কারোর আয়। চোর-ডাকাতরা গৃহস্থকে কিছু না দিয়ে জোর করে নিয়ে যায়। এটা গৃহস্থদের অর্থনৈতিক আয়—অনিচ্ছা-কৃতভাবে চোর-ডাকাতদের হাতে হস্তান্তরিত হয় মাত্র। তেমনি শিশুমঙ্গলের জন্য সরকার যা করেন, সরকার যে বেকারভাতা দেন, বন্যাত্রাণে যারা অর্থ পায় সবই হল হস্তান্তর আয়। এইসব আয় হিসেবের মধ্যে আসে না।

২.৫ **সম্পদ :** সম্পদ হল আয়ের ভাণ্ডার। ভাণ্ডার (Stock) শব্দটি প্রবাহ (Flow) শব্দটির বিপরীত ধারণা। ভাণ্ডারের মধ্যে গতি থাকে না। প্রবাহের মধ্যে গতি থাকে। তবে ভাণ্ডারকে প্রবাহের পুঞ্জীভূত পরিণাম বলা যায় এবং

প্রবাহকে ভান্ডারের নিঃসরণ বলা যেতে পারে। জমি হল একটি সম্পদ। কিন্তু জমি থেকে যে ফসল পাওয়া যায় তাকে আমরা প্রবাহ বলতে পারি। যে ভান্ডার থেকে আয় প্রবাহ ঘটে তাকে আমরা সম্পদ বলতে পারি। জমি, খনি, বন ইত্যাদি হল প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সব সম্পদ থেকে আয় পাওয়া যায়। তেমনি শ্রম হল একটি সম্পদ। এই সম্পদ থেকে যে আয় প্রবাহ ঘটে তার নাম মজুরী। তেমনি মূলধন হল একটি সম্পদ। এর থেকেও আয় স্রোত প্রবাহিত হয়। এর নাম সুদ।

কোন দেশে দ্রব্য ও সেবার যে স্রোত প্রবাহিত হয় তাকে উৎপাদন বলা হয়। এই উৎপাদন আসে দেশের ১। প্রাকৃতিক সম্পদ, ২। মূলধন সম্পদ এবং ৩। শ্রম সম্পদের ব্যবহার থেকে। যে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম সম্পদ ও মূলধন সম্পদের পরিমাণ ও গুণ খুব বেশি সেই দেশে উৎপাদনের প্রবাহ যে খুবই উচ্চস্তরে বইবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। উৎপাদন বা আয়ের উদ্ভব হয় সম্পদ থেকে নয়, সম্পদের ব্যবহার থেকে। কোন দেশে বেশি সম্পদ থাকলেই সেই দেশে আয় বেশি হবে এমন কোন মানে নেই। ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। কিন্তু কারিগরিক জ্ঞান ও মূলধনের অভাবে সেই সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। ফলে ভারতের দারিদ্র্য যাচ্ছে না। আবার ভারতে শ্রম সম্পদের এত প্রাচুর্য; কিন্তু মূলধনের অভাবে ও অন্যান্য কারণে সেই শ্রম সম্পদের একটি বিশাল অংশকে আমরা কাজে লাগাতে পারছি না। অনেকে এখন কর্মহীন বা বেকার অবস্থায় রয়েছেন। এঁদের যদি কাজ দেওয়া যেত তাহলে উৎপাদন আরো বাড়ত। তেমনি মূলধন সম্বন্ধেও বলা চলে।

মানুষ তার উৎপাদন কার্যে যে সব সম্পদ ব্যবহার করে তার মধ্যে দুটো বড়ো ভাগ করা যেতে পারে, যথা—(ক) প্রাকৃতিক সম্পদ এবং (খ) মানবিক বা মানবসৃষ্ট সম্পদ। যদিও এই বিভাজনটি বেশিদূর যেতে পারে না, তবু বলা যায়—মানবসৃষ্ট সম্পদ বলতে মূলধন বোঝায়। মূলধন বলতে যন্ত্রপাতি, বাড়ি, ঘর, যোগাযোগ, পরিবহণ সবকিছুকেই বোঝায়। মূলধন হল মানবসৃষ্ট ভান্ডার। মানুষ চেষ্টা করে এই ভান্ডারের বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা বোধহয় মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

২.৬ **বিনিয়োগ :** মূলধন ভান্ডারের বৃদ্ধিকে বিনিয়োগ বলা হয়। যেমন ধরা যাক, কোন প্রতিষ্ঠানে ১০টি যন্ত্র বা মূলধন ছিল। পরের বছর সেই প্রতিষ্ঠানটি তার মূলধন ভান্ডার বৃদ্ধি করে ১৫টি করল। এখানে মূলধন ভান্ডারের বৃদ্ধি হল ৫টি যন্ত্র। একেই আমরা বিনিয়োগ বলব। এখানে মনে রাখা দরকার যে, মূলধন হল একটি ভান্ডার, কিন্তু বিনিয়োগ হল একটি প্রবাহ।

প্রতিষ্ঠানের মূলধনের মধ্যে পড়ে প্রতিষ্ঠানের মূলধন দ্রব্যের ভান্ডার ও প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের ভান্ডার। কোন কাপড়ের মিলে কাপড় তৈরির জন্য যে সব যন্ত্রপাতি বসানো থাকে সেগুলো প্রতিষ্ঠানের মূলধন দ্রব্যের ভান্ডারের মধ্যে

পড়ে। এছাড়াও মিলের মালিক কিছু সুতো ক্রয় করে রাখতে পারেন। আবার কিছু কাপড়ও গুদামে রাখতে পারেন। কাপড়ের মিলের কাছে সুতো হল কাঁচামাল, আর কাপড় হল উৎপন্ন দ্রব্য বা শেষ দ্রব্য (final goods)। ভবিষ্যতে যদি সুতোর অভাব দেখা দেয় সেই আশঙ্কায় মালিক সুতোর মজুত ভাণ্ডার গড়ে তুলতে পারেন। আবার বাজারে কাপড়ের চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা দিতে পারে। সেইজন্য মিলের মালিক তাঁর শেষ দ্রব্য অর্থাৎ কাপড় মজুত করে রাখতে পারেন। উপকরণের যোগান এবং শেষ দ্রব্যের চাহিদার অনিশ্চয়তার জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কাঁচামাল ও শেষ দ্রব্যের মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলা ছাড়া উপায় থাকে না। তাহলে প্রতিষ্ঠানের মূলধনের মধ্যে থাকে—যন্ত্রপাতি, কারখানা ঘর, গুদাম ইত্যাদি বাস্তব মূলধনের ভাণ্ডার ও কাঁচামাল ও শেষ দ্রব্যের মজুত ভাণ্ডার। এখন তার মূলধনের ভাণ্ডার এবং কিংবা মজুত ভাণ্ডারের বৃদ্ধি হলে আমরা বলব যে—সেই প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ হয়েছে। তাহলে বিনিয়োগ হল মূলধনের ভাণ্ডারের বৃদ্ধি এবং / কিংবা মজুত ভাণ্ডারের বৃদ্ধি।

২.৭ **অবচয় (Depreciation) :** কোন মূলধন দ্রব্য উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তার যে অংশটুকু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাকে মূলধনের অবচয় বলা হয়। যেমন, একটি জামা তৈরী করতে কোন একটি সেলাইকলের যতটুকু ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তাকেই সেলাইকলের অবচয় বলতে পারি। সাধারণত কোন মূলধন দ্রব্যের বর্তমান মূল্যকে তার আয়ুষ্কাল দিয়ে ভাগ করে সেই নির্দিষ্ট একক সময়ে মূলধনের যে গড় ক্ষয় হয় তাকেই সেই মূলধনের অবচয় বা গড় অবচয় বলা হয়। যেমন, একটি ১০ লক্ষ টাকা দামের যন্ত্র যদি ১০ বছর ধরে উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাহলে প্রতি বছর গড়ে মোটামুটি ১ লক্ষ টাকা হবে সেই মূলধনের অবচয়।

২.৮ **মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product or, G. N P.) এবং নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product or N. N. P.)**

(ক) **মোট জাতীয় উৎপাদন :** আলোচনার সুবিধের জন্য যদি ধরে নেওয়া হয় যে, কোন দেশে সরকারের কোন অর্থনৈতিক কর্ম নেই এবং দেশের কোন বহির্বাণিজ্য নেই—তাহলে সেই দেশ একটি নির্দিষ্ট সময়ে, যথা—এক বৎসরে, তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর শ্রম, মূলধন ও কারিগরিক জ্ঞান প্রয়োগ করে যে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তাদের আর্থিক মূল্যের যোগফলই হল মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product বা G. N. P.)।

দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে অনেক সময় তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা—প্রাথমিক ক্ষেত্র (Primary Sector), মাধ্যমিক ক্ষেত্র (Secondary Sector) এবং তৃতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্র (Tertiary Sector)।

তাহলে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন = প্রাথমিক ক্ষেত্রের উৎপাদন + মাধ্যমিক

ক্ষেত্রের উৎপাদন + তৃতীয়-পর্যায়ের ক্ষেত্রের উৎপাদন। দেশের প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে কৃষি, বন, শিকার, মৎস্য চাষ, পশু, পক্ষী, মক্ষিকা ও কীট পালন প্রভৃতি। মাধ্যমিক ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে—সমস্ত রকমের শিল্প যথা, কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, বৃহৎ শিল্প, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, অফিস, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, জলসেচ ব্যবস্থা, ইত্যাদি নির্মাণ কার্য, খনি, বাগিচা প্রভৃতি। খনি ও বাগিচাকে অনেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের মধ্যে না রেখে প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে রাখতে চান। এতে অবশ্য বিশেষ কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না। উৎপাদনের তৃতীয় ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে—ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ, যোগাযোগ, পর-নিযুক্ত ও স্বয়ং-নিযুক্ত পেশা, সরকারী সেবা ইত্যাদি। তৃতীয় ক্ষেত্রটিকে সাধারণত সেবাক্ষেত্র বলা হয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্র থেকে পাওয়া যায় দ্রব্য, তৃতীয় ক্ষেত্র থেকে আসে সেবা। জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে এই সব দ্রব্য ও সেবা প্রবাহকে হিসেব করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন দ্রব্যের একক ভিন্ন, সেবার একক দ্রব্যের এককের থেকে পৃথক। কাজেই এই সব দ্রব্য ও সেবার বাস্তব পরিমাণকে যোগ করা যায় না। সেইজন্য প্রত্যেকটি দ্রব্যকে অর্থমূল্যে প্রকাশ করে সব দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্যের যোগফল হিসেব করা হয়। অর্থমূল্যে প্রকাশিত মোট উৎপাদনের হিসেবকে মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product or G.N.P.) বলা হয়।

(খ) নীট জাতীয় উৎপাদন : জাতীয় উৎপাদনের জন্য নানাবিধ মূলধন দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট সময়ে সেই সব মূলধন দ্রব্যের একটি অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একে মূলধন দ্রব্যের অবচয় বলা হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে যন্ত্রপাতি, কারখানা ঘর ও অন্যান্য স্থায়ী মূলধন সম্পদের অবচয় বিয়োগ করে জাতীয় উৎপাদনের যে হিসেব পাওয়া যায় তাকে নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product or N.N.P) বলা হয়। অতএব

নীট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় উৎপাদন – অবচয়
অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাদন = নীট জাতীয় উৎপাদন + অবচয়
এবং অবচয় = মোট জাতীয় উৎপাদন – নীট জাতীয় উৎপাদন।

২৯ মোট জাতীয় আয় (Gross National Income) ও নীট জাতীয় আয় (Net National Income)

(ক) মোট জাতীয় আয় (Gross National Income or G.N.I.) : কোন অর্থব্যবস্থায় যদি সরকারের অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও বহির্বাণিজ্য না থাকে, তাহলে সেই দেশের নাগরিকগণ সেই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, বিশেষত এক বৎসরে যে মোট আয় পেয়ে থাকে তাকে বলা হয় মোট জাতীয় আয়। মোট জাতীয় আয় হল দেশের অধিবাসীদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আয়ের যোগফল মাত্র।

দেশের অধিবাসীদের আয়কে আমরা মোট মজুরী + মোট খাজনা + মোট সুদ + মোট মুনাফা বলতে পারি। দেশের শ্রমিকেরা জাতীয় উৎপাদন কার্যে শ্রম প্রয়োগ করেন এবং তার বিনিময়ে মজুরী পান। দেশে যত জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ আছে তাদের মালিকেরা খাজনা পান। মূলধনের মালিকেরা সুদ পান। এই তিনটি আয় হল চুক্তিভিত্তিক (contractual)। মোট উৎপাদন থেকে মোট মজুরী, খাজনা ও সুদ মিটিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে তার নাম মুনাফা। মুনাফা হল উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিকদের আয়। এখন দেশের সব শ্রমিকদের প্রাপ্ত মজুরী, সব জমির মালিকদের প্রাপ্ত মোট খাজনা, সব মূলধনের মালিকদের প্রাপ্ত মোট সুদ এবং প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মোট মুনাফা যোগ করলে যে যোগফল পাওয়া যাবে তাকে বলা হয় মোট জাতীয় আয়।

(খ) নীট জাতীয় আয় (Net National Income or NNI) : কোন দেশের মোট জাতীয় আয় থেকে সেই দেশের মূলধন-সম্পদসমূহের গড় বার্ষিক অবচয় বিয়োগ করে যে আয় পাওয়া যায় তাকে নীট জাতীয় আয় বলা হয়। অর্থাৎ নীট জাতীয় আয় = মোট জাতীয় আয় – অবচয়।

অতএব মোট জাতীয় আয় = নীট জাতীয় আয় + অবচয়

এবং অবচয় = মোট জাতীয় আয় – নীট জাতীয় আয়।

২.১০ **(ক) মোট জাতীয় ব্যয় (Gross National Expenditure) :**

যে দেশে সরকারের কোন অর্থনৈতিক কর্ম থাকে না এবং যে দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে না সেই দেশের ব্যক্তি বা পরিবারগুলি ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্নভাবে যে অর্থব্যয় করে থাকে তাদের সমষ্টিকে মোট জাতীয় ব্যয় বলা হয়।

মোট জাতীয় ব্যয় = মোট ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয়। দেশের পরিবার-সমূহ প্রাপ্ত আয় থেকে তাদের তাৎক্ষণিক অভাব পূরণের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবার উপর যে অর্থ ব্যয় করে থাকে তাকে মোট ভোগ ব্যয় বলা হয়। মোট ভোগ ব্যয়ের মধ্যে থাকে দেশবাসীদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যয়।

সামগ্রিকভাবে দেখলে বলা যায়—একটি দেশে দেশবাসীদের হাতে যে মোট আয় এসে থাকে—তার একটি অংশ দেশবাসীদের জীবনধারণের জন্য ব্যয়িত হয়। আয়ের অপর অংশটি আগামী বৎসরের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মূলধন গঠনের কাজে লাগে। একে বিনিয়োগ বলা হয়। 'বিনিয়োগ হল মূলধন ভান্ডারের বৃদ্ধি। দেশবাসীদের হাতে যে মূলধন ভান্ডার থাকে, যার সাহায্যে তারা নানারূপ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে—তার বৃদ্ধি হলে আমরা বলি—দেশ মূলধন গঠনে অর্থ বিনিয়োগ করছে। সাধারণত উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের মালিকেরাই বিনিয়োগ ব্যয় করে থাকেন কিন্তু

দেশবাসীরাই যেহেতু দেশের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক, কাজেই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ ব্যয় হল দেশবাসীদেরই মোট ব্যয়ের একটি অংশ।

তাহলে মোট জাতীয় ব্যয়=দেশবাসীদের মোট ভোগ ব্যয়+দেশবাসীদের মোট বিনিয়োগ ব্যয়। আমরা যদি ধরে নিই যে, দেশের পরিবারগুলি কেবলমাত্র ভোগ ব্যয় করে এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র বিনিয়োগ ব্যয় করে তাহলে আমরা পাই,—

মোট জাতীয় ব্যয়=পরিবারগুলির মোট ভোগ ব্যয়+প্রতিষ্ঠানগুলির মোট বিনিয়োগ ব্যয়।

ধরি E = মোট ব্যয় (Expenditure)

C = মোট ভোগ ব্যয় (Consumption)

I = মোট বিনিয়োগ ব্যয় (Investment)

তাহলে আমরা পাই, $E = C + I$.

দেশের সরকারের যদি অর্থনৈতিক কাজ থাকে তাহলে দেশের মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারী ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি G = সরকারী ব্যয় (Government Expenditure) ধরা হয়, তাহলে সেই দেশের মোট ব্যয় হবে

$$E = C + I + G$$

সরকারী ব্যয়কে ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ে ভাগ করা যায়। সরকার তাঁর প্রতিরক্ষামূলক ও প্রশাসনিক কাজের জন্য সেনা বাহিনী, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক ও অসংখ্য অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করেন। তাঁদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য খরচ-সরকারের ভোগব্যয় হিসেবে গণ্য হয়। আবার সরকার দেশের শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ, রাজনৈতিক সভাসমিতি, নির্বাচন গ্রহণ প্রভৃতি অসংখ্য কাজে যে অর্থ ব্যয় করেন তাকেও সরকারী ভোগব্যয় বলা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ত্রাণ ও কল্যাণমূলক কাজে সরকারী ব্যয়কেও ভোগব্যয়ের মধ্যে ধরা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে সরকারের ব্যয়ের অধিকাংশই হল ভোগব্যয়।

কিন্তু সরকার যদি কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক হন, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে মূলধন ভাণ্ডার থাকবে তাকে সরকারী মূলধন বলা হয়। সরকার যদি সেই মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটান তবে তাকে সরকারী বিনিয়োগ বলা হবে। এই সরকারী বিনিয়োগ বেসরকারী বিনিয়োগের মতই। এর উদ্দেশ্য হল সরকারের মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটানো।

জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকার যে নিজের প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই বিনিয়োগ করেন এমন নয়, সরকার দেশের সব উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্যই, কিংবা বলা যায়, সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই সামাজিক মূলধন ভাণ্ডার বৃদ্ধিতে অর্থ বিনিয়োগ করেন। একে সামাজিক মূলধন গঠন (Social Capital formation) বা সামাজিক বিনিয়োগ (Social investment) বলা হয়। সরকার

দেশের রাস্তা-ঘাট, রেলপথ, সেতু নির্মাণ, পরিবহণ ব্যবস্থার অন্যান্য সুবিধার জন্য, জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন তাকে সামাজিক বিনিয়োগ বলা যায়। দেশের আভ্যন্তর কাঠামো (Infra-Structure) গঠনে সরকার পরিবহণ, জল সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, কারিগরিক শিক্ষা, চিকিৎসা ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষা প্রকল্পে যে অর্থ ব্যয় করেন তাকেও সামাজিক বিনিয়োগের মধ্যে ধরা হয়। তাহলে দেশের মোট ব্যয় = মোট বেসরকারী ভোগব্যয় + বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় + মোট সরকারী ভোগব্যয় + সরকারী বিনিয়োগ ব্যয়।

ধরি C_P = বেসরকারী ভোগ ব্যয় (Private Consumption), I_P = বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় (Private Investment)

C_G = সরকারী ভোগব্যয় (Government Consumption)

I_G = সরকারী বিনিয়োগ (Government Investment) ব্যয়, তাহলে আমরা পাই ,

$$E = C_P + I_P + C_G + I_G.$$

অর্থাৎ $E = (C_P + C_G) + (I_P + I_G) = C + I$

যে দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে তার মোট ব্যয়ের মধ্যে বিদেশ আমদানিকৃত দ্রব্য ও সেবার জন্য ব্যয়। কিন্তু একটি দেশ যেমন বিদেশ থেকে নানারূপ দ্রব্য ও সেবা আমদানি করে, তেমনি সেই দেশ বিদেশে দ্রব্য ও সেবা রপ্তানিও করে। রপ্তানি থেকে আয় আসে। যদি দেশের মোট আমদানির মূল্য মোট রপ্তানির মূল্যের সমান হয়, তাহলে তো খুবই ভালো হয়। সেখানে দেশের রপ্তানি দ্রব্যগুলোই তো দেশের আমদানির দাম দিয়ে দেয়। কিন্তু আমদানির মূল্য রপ্তানির মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়ে গেলে দেশের নীট ব্যয় হয়ে যায়। তখন দেশের রপ্তানি দেশের আমদানির দাম দিতে পারে না।

ধরি M = দেশের আমদানির ব্যয়

X = দেশের রপ্তানির আয়।

তাহলে দেশের বহির্বাণিজ্যের জন্য দেশের নীট ব্যয় = $M - X$, এখন প্রশ্ন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণকারী দেশে মোট ব্যয়ের হিসেবে কি এই নীট ব্যয় ($M - X$) যুক্ত হবে? এমনিতে মনে হতে পারে, এটি যুক্ত হবে। কিন্তু আসলে এটি বিযুক্ত হবে। তার কারণ কোন দেশ যে ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় করে সেই ব্যয় দেশের আয়ের একটি অংশ হিসেবে দেশের মধ্যেই থাকে। কিন্তু কোন দেশ যখন বিদেশের দ্রব্য সামগ্রীর উপর ব্যয় করে তখন সেই দেশ দ্রব্য সামগ্রী পায় সত্য, কিন্তু আয়টা অন্য দেশে চলে যায়। সেই জন্য $M - X$ বিয়োগ করা হয়। তাহলে আমরা পাই—

মুক্ত অর্থ ব্যবস্থায় মোট ব্যয়

$$= C + I + G - (M - X)$$
$$= C + I + G + X - M.$$

এখানে $X - M$ = মোট রপ্তানির মূল্য − মোট আমদানির মূল্য = নীট রপ্তানি (Net exports)

(খ) নীট জাতীয় ব্যয় : কোন দেশের মোট জাতীয় ব্যয় থেকে পুরাতন মূলধন সম্পদের গড় বার্ষিক অবচয় বিয়োগ করলে দেশের মোট ব্যয়ের যে হিসেব পাওয়া যায় তাকে নীট জাতীয় বায় বলা হয়। অতএব

নীট ব্যয় = মোট ব্যয় − অবচয়। অর্থাৎ মোট ব্যয় = নীট ব্যয় + অবচয় এবং অবচয় = মোট ব্যয় − নীট ব্যয়।

দেশের মোট ব্যয়ের মধ্যে থাকে ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। বিনিয়োগ ব্যয় থেকে দেশের মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু সেই সময়ের মধ্যে কিছু মূলধন দ্রব্য বা যন্ত্রপাতি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তাহলে নীট ভাবে বলতে গেলে দেশের মোট মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি কিছুটা কম হয়। যেমন, কোন দেশে যদি প্রতি বৎসর ১০ টি যন্ত্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ১৫টি নতুন যন্ত্র বসানো হয়, তাহলে সেই দেশের মূলধন ভাণ্ডারেব মোট বৃদ্ধি হবে ১৫, কিন্তু নীট বৃদ্ধি হবে ১৫ − ১০ = ৫। আমরা বলতে পারি—

নীট বিনিয়োগ = মোট বিনিয়োগ − অবচয়।

ধরি GI = মোট বিনিয়োগ (Gross Investment),

NI = নীট বিনিয়োগ (Net Investment), D = অবচয় (Depreciation)।

তাহলে আমরা পাই,

$$NI = GI - D$$

অতএব $GI = NI + D.$

এবং $D = GI - NI.$

তাহলে দেশের নীট ব্যয়

$$= C + (I - D) + G + X - M.$$
$$= C + NI + G + X - M.$$

২.১১ **সমীকরণ ও অভেদ (Equation and Identity) :** দুটি স্বভাবত অসম বিষয়ের সমতাকে সমীকরণ বলা হয়। যারা সমান নয়, তারা যদি কোনমতে সমান হয় তবে তাদের সেই সমতার সম্পর্ককে সমীকরণ বলা যেতে পারে। $X = 5$ একটি সমীকরণ। কারণ X-এর মান 5 অপেক্ষা বেশি বা কম বা 5-এর সমান হতে পারে। যেখানে X ঠিক 5-এর সমান হয় সেখানে আমরা $X = 5$ সমীকরণটি পাই।

দুটি স্বভাবত সমান বিষয়ের সমতাকে অভেদ বলা হয়। যদি বলা হয় যে, ১০ হল ৫-এর দ্বিগুণ, তাহলে আমরা পাই ১০=২×৫, অর্থাৎ ১০ এবং ৫-এর দ্বিগুণের মধ্যে কোন ভেদ নেই। ওরা অভেদ এবং ওদের সম্পর্ককেও অভেদ বলা হয়।

তাহলে আমরা সমীকরণ ও অভেদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। সমীকরণে যে সমতার কথা বলা হয় সেই সমতা সব সময় থাকে না. কখনো কখনো থাকে। কিন্তু অভেদে যে সমতার কথা বলা হয় তা সর্বদা বজায় থাকে। যেমন, X সব সময় 5-এর সঙ্গে সমান নয়, কখনো সমান হয়। তাহলে X = 5 হবে একটি সমীকরণ।

অঙ্কশাস্ত্রে সমীকরণের সমতাকে বোঝাবার জন্য দুটি সমান্তরালরেখা (=) ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অভেদের সমতাকে বোঝাবার জন্য তিনটি সমান্তরাল রেখা (≡) ব্যবহার করা হয়। যেমন, আমরা বলি ১০≡২×৫ কিংবা ৫≡৫, অথবা ৪+৪≡৮ ইত্যাদি।

২.১২ **প্রকৃত মান (Ex-post value) এবং সম্ভাব্য মান (Ex-ante value) :**

কোন বিষয়ের অতীত মানকে প্রকৃত মান বলা হয়। প্রকৃত মান হল প্রাপ্ত মান। অর্থাৎ যা ঘটে গেছে। অপরপক্ষে সম্ভাব্য মান বলতে বোঝায় সেই মান যা ঘটতে পারে বলে আশা বা আশঙ্কা করা হয়। সম্ভাব্য মান হল যা ঘটেনি, কিন্তু যা ঘটতে পারে বলে মনে হয়। আয়, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, ক্রয়, বিক্রয়, চাহিদা, যোগান ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রত্যেকটির দুটি করে মান থাকতে পারে; যেমন—প্রকৃত আয় মানে যে আয় পাওয়া গেছে; সম্ভাব্য আয় মানে যে আয় পাওয়ার আশা আছে। প্রকৃত ভোগ মানে যে ভোগ করা হয়েছে; সম্ভাব্য ভোগ মানে যে ভোগ করার পরিকল্পনা আছে ইত্যাদি।

জাতীয় আয় বা উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধতিতে যে আয় উৎপাদন, ব্যয় ইত্যাদি যে সব শব্দ ব্যবহৃত হয় তারা সব প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। সারা বছর ধরে সারা দেশে যে উৎপাদন ক্রিয়া চলে তার পরিণাম প্রকৃত বা প্রাপ্ত উৎপাদন বা প্রাপ্ত আয়। তা থেকে যা খরচ করা হয়েছে তাই প্রকৃত ব্যয়! প্রকৃত ব্যয়ের মধ্যে আছে প্রকৃত ভোগ ব্যয় ও প্রকৃত বিনিয়োগ ব্যয়।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রকৃত অর্থে ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন, চাহিদা-যোগান —সব সময় সমান হয়। আমি যদি কোন বিক্রেতার কাছ থেকে ১০ টাকার দ্রব্য ক্রয় করি তাহলে আমার প্রকৃত ক্রয় = ১০ টাকা এবং বিক্রেতার প্রকৃত বিক্রয় = ১০ টাকা। অর্থাৎ প্রকৃত ক্রয় ও প্রকৃত বিক্রয় সর্বদা সমান। অন্যভাবে বলা যায়, প্রকৃত ক্রয় ও প্রকৃত বিক্রয় হল অভেদ।

আমরা লিখি প্রকৃত ক্রয় = প্রকৃত বিক্রয়। সম্ভাব্য ক্রয় ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এরূপ হয় না। আমি ভাবছি ১০ টাকার দ্রব্য কিনব। ওদিকে বিক্রেতা হয়তো ভাবছে সে আমাকে ৫ টাকার দ্রব্য বিক্রয় করবে। তাহলে আমার সম্ভাব্য ক্রয় ও বিক্রেতার সম্ভাব্য বিক্রয় সমান হবেই এমন কোন কথা নেই। অর্থাৎ সম্ভাব্য ক্রয় ও সম্ভাব্য বিক্রয় সব সময় সমান হয় না, কখনো কখনো সমান হয়। অন্যভাবে বলা যাবে—সম্ভাব্য ক্রয় ও সম্ভাব্য বিক্রয়ের সমতা হল সমীকরণের সমতা, কিন্তু প্রকৃত ক্রয় ও প্রকৃত বিক্রয়ের সমতা হল অভেদের সমতা।

২.১৩ **ভারসাম্য (Equilibrium) :** স্বভাবত বিপরীতমুখী বিষয়ের মধ্যে যে সমীকরণ বা সমতা স্থাপিত হয় তাকে ভারসাম্য অবস্থা বলা যায়। এই অবস্থার বাইরে বিষয়গুলির মধ্যে কোন সমতা থাকে না। আমরা যদি দুটি মাত্র বিষয়ের কথা ধরি—তাহলে ভারসাম্য বলতে বোঝাবে সেই দুটি বিষয়ের সম্ভাব্য মানের সমতা। যে অবস্থায় দুটি স্বভাবত বিপরীতমুখী বা অন্য ধর্মী বিষয়ের সম্ভাব্য মানের সমতা আসে তাকে ভারসাম্য অবস্থা বলা হয়। ভারসাম্যহীন অবস্থায় সম্ভাব্য মান সমান হয় না। শুধু তাই নয়। ভারসাম্যহীন অবস্থায় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। যেমন, সম্ভাব্য চাহিদা ও সম্ভাব্য যোগান যদি সমান না হয়, তাহলে—হয় সম্ভাব্য চাহিদা বেশি হবে, না হয় সম্ভাব্য যোগান বেশি হবে। যদি চাহিদা বেশি হয়, তাহলে দ্রব্যের দাম বাড়বে। দাম বাড়লে চাহিদা কমবে। চাহিদা কমলে চাহিদা ও যোগান সমান হবে। অনুরূপভাবে—যদি যোগান বেশি হয়, তাহলে দাম কমবে। দাম কমলে যোগান কমবে এবং এইভাবে চাহিদা ও যোগান সমান হবে। অতএব ভারসাম্য অবস্থায়—সম্ভাব্য চাহিদা ও সম্ভাব্য যোগান সমান হয়, কিন্তু অন্য অবস্থায় সমান হয় না। সমান না হলে চাহিদা বা যোগানের এমন পরিবর্তন হয় যাতে সম্ভাব্য চাহিদা ও যোগানের পার্থক্য দূর হয়। এই ভারসাম্যকে স্থিতিশীল ভারসাম্য (Stable equilibrium) বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? উৎপাদন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা দেখা দেয় উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

২। আয় বলতে কী বোঝায়? কীভাবে আয় পাওয়া যেতে পারে? আয় পরিমাপ করার সময় কোন্ কোন্ আয়কে ধরা হয় এবং কোন্ আয়কে ধরা হয় না উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

৩। মোট জাতীয় উৎপাদন, নীট জাতীয় উৎপাদন, মোট জাতীয় আয় ও নীট জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা দাও।

৪। দেশের মোট জাতীয় ব্যয় বলতে কী বোঝায়? এই ব্যয়ের মধ্যে কী কী থাকে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১। আর্থিক ও বাস্তব উৎপাদনের পার্থক্য কর।

২। প্রবাহ ও ভাণ্ডার শব্দ দুটির অর্থ বোঝাও ও উদাহরণসহ ওদের পার্থক্য কর।

৩। "দুবার গোনার ভুল" কী? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

৪। আয় কী? উপার্জিত আয় ও হস্তান্তর আয়ের পার্থক্য কর।

৫। সম্পদ বলতে কী বোঝায়? কোন একটি দেশে কত রকমের সম্পদ থাকতে পারে?

৬। কাজের শ্রেণীবিভাগ কর।

৭। বিনিয়োগ কী?

৮। দেশের মোট মূলধন ভাণ্ডারের মধ্যে কী কী মূলধন থাকে?

৯। সামাজিক বিনিয়োগ বলতে কী বোঝ?

১০। আভ্যন্তর কাঠামো (Infra-structure) বলতে কী বোঝায়? কোন দেশের আভ্যন্তর কাঠামোর মধ্যে কী কী থাকে?

১১। অবচয় কী? কী ভাবে অবচয়ের হিসেব করা হয়?

১২। মোট বিনিয়োগ ও নীট বিনিয়োগের পার্থক্য কর।

১৩। বদ্ধ ও মুক্ত অর্থ-ব্যবস্থায় জাতীয় ব্যয়ের হিসেবের মধ্যে কী পার্থক্য থাকে?

১৪। মোট ও নীট জাতীয় ব্যয়ের পার্থক্য কর।

১৫। সমীকরণ ও অভেদ কাদের বলা হয়? উদাহরণসহ ওদের মধ্যে পার্থক্য কর।

১৬। প্রকৃত মান ও সম্ভাব্য মান বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিয়ে ওদের পার্থক্য বোঝাও।

১৭। ভারসাম্য কী?

১৮। (ক) চাহিদা ও যোগান কী সব সময় সমান?

(খ) চাহিদা ও যোগান সব সময় সমান নয়—কথা দুটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

কীভাবে জাতীয় উৎপাদন বা আয় পরিমাপ করা যায়

৩.১ পরিমাপ পদ্ধতিসমূহ :

কোন দেশের জাতীয় উৎপাদন বা আয় পরিমাপ করার তিনটি পদ্ধতি আছে, যথা—(ক) উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধতি, (খ) আয় পরিমাপ পদ্ধতি এবং (গ) ব্যয় পরিমাপ পদ্ধতি।

কোনো দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় উপরের যে-কোন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করলেও চলে, কিন্তু বাস্তব সুবিধা ও অসুবিধার কথা ভেবে অনেক সময় একই সঙ্গে একাধিক পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়। যে সব উৎপাদনক্ষেত্র থেকে দ্রব্য পাওয়া যায়, সে সব ক্ষেত্রে উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করাই ভালো। আর যে সব ক্ষেত্রে কোন সেবার সৃষ্টি হয় তাতে আয় পরিমাপ পদ্ধতি প্রয়োগ করাই যুক্তিযুক্ত।

(ক) উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে সমগ্র দেশটিকে একটি বিশাল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে মোট উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। জাতীয় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়। এদের প্রত্যেকের একক আলাদা। ধান, গম, ডাল ইত্যাদি দ্রব্য টনে, কাপড় মিটারে, কেরোসিন ব্যারেলে বা লিটারে, রাস্তা কিলোমিটারে, বিদ্যুৎ মেগাওয়াটে, এইভাবে প্রকাশিত হয়। এই সব দ্রব্য ও সেবার মোট পরিমাণ যোগ করা যায় না। সেইজন্য প্রত্যেক দ্রব্য বা সেবাকে তার বাজার দাম দিয়ে গুণ করা হয়। এইভাবে জাতীয় উৎপাদনের যে আর্থিক মূল্য পাওয়া যায়, তাকে আমরা বাজার দামে জাতীয় উৎপাদন (National Product at market price) বলতে পারি। যে সব দ্রব্য বাজারে নিয়ে যাওয়া হয় না, যাদের বাজার দাম নির্ধারিত হয়নি, তাদের ক্ষেত্রে দ্রব্যের পরিমাণকে দ্রব্যের আরোপিত দাম (Imputed price) দিয়ে গুণ করতে হয়। বাড়ি থেকে আবাসন নামক সেবার উৎপাদন হয়। যে বাড়ির ভাড়া আছে সে বাড়ির আবাসন-সেবার দাম জানা যায়, কিন্তু যেখানে বাড়ির মালিক নিজের বাড়িতে বাস করেন এবং তার জন্য কোন ভাড়া দেন না, সেক্ষেত্রে বাড়ির আরোপিত ভাড়া হিসেব করা হয়। আবার অনেক দ্রব্য বা সেবা থাকতে পারে যাদের কোন বাজার নেই। সাধারণত সরকার যে প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, আইন-শৃংখলা প্রভৃতি সেবার যোগান দেন তাদের পরিমাণ ও দাম কিছুই জানা যায় না। এগুলি কোন উৎপাদন কিনা সন্দেহ।

এদের পরিমাণ জানা যায় না। আবার সরকার যে রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরি করেন তাদের পরিমাণ জানা যায়, কিন্তু তাদের বাজার দাম জানা যায় না। রাস্তাঘাট, সেতু, জলসেচ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়গুলি বিক্রয়যোগ্য পদার্থ বা পণ্য নয়। এসব ক্ষেত্রে ব্যয়ের হিসেবে উৎপাদনের মূল্য ধরা হয়। যেমন, একটি রাস্তার মূল্য = রাস্তার পরিমাণ × প্রতি একক রাস্তার জন্য ব্যয়। প্রশাসনিক সেবা-উৎপাদনের মূল্য = প্রশাসনিক সেবাক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি এবং অন্যান্য ব্যয়। সরকারের প্রতিরক্ষা নামক সেবা উৎপাদনের মূল্য - সামরিক বাহিনীর লোকেদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি ও অন্যান্য ব্যয়। এইভাবে উৎপাদন ব্যয় ধরে জাতীয় উৎপাদনের মূল্যকে উপাদানের ব্যয়ের হিসেবে জাতীয় উৎপাদন (National Product at factor cost) বলা হয়।

দেশের সরকার দ্রব্য ও সেবার উপর বিক্রয় কর, উৎপাদন শুল্ক প্রভৃতি পরোক্ষ কর বসান। পরোক্ষ করের ফলে দ্রব্যের বাজারে দাম বৃদ্ধি পায়। বাজার দাম হল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও পরোক্ষ করের সমষ্টি।

ধরি Q = উৎপাদনের পরিমাণ,
P = বাজার দাম,
C = উৎপাদন ব্যয়,
T = পরোক্ষ কর।

তাহলে আমরা পাই,

বাজার দাম = উৎপাদন ব্যয় + পরোক্ষ কর।
অর্থাৎ, $P = C + T.$
তাহলে $P.Q = (C + T)Q = CQ + TQ$
অর্থাৎ, $PQ > CQ.$

অর্থাৎ বাজার দামে জাতীয় উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে জাতীয় উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হয়। যদি $T = O$ হয়, তাহলে $PQ = CQ$ হয়। অর্থাৎ সরকার যদি কোন পরোক্ষ কর না বসান তাহলে বাজার দামে জাতীয় উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যয়ে জাতীয় উৎপাদন সমান হয়।

উৎপাদন পরিমাপ-পদ্ধতিতে জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করার সময় কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। প্রথমত, যাতে কোন একটি দ্রব্য একাধিক বার গণনার মধ্যে ধরা না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। কোন একটি বিষয়কে একাধিকবার গণনা করলে দ্বিত্ব-গণনার ভুল (mistake of double counting) হয়। এতে জাতীয় উৎপাদন বেড়ে যায়।

দেশের উৎপন্ন দ্রব্যগুলিকে (ক) কাঁচামাল (Raw materials), (খ) মধ্যবর্তী দ্রব্য (Intermediate goods) এবং (গ) শেষ দ্রব্য (Final goods)—এই তিন

শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, তুলোকে কাঁচামাল, সুতোকে মধ্যবর্তী দ্রব্য, কাপড়কে শেষ দ্রব্য বলা যেতে পারে। কাপড়ের মধ্যে সুতো থাকে। কাপড়ের সুতোর মধ্যে তুলো থাকে। কাজেই কাপড় ধরলেই তুলো ও সুতো সব ধরা হয়। কিন্তু তা না করে যদি তুলো, সুতো ও কাপড়—সব ধরা হয়, তাহলে তুলো তিনবার ও সুতো দুবার ধরা হবে। ফলে যদি ১৫ টাকার তুলো, ২৫ টাকার সুতো ও ৫০ টাকার কাপড় তৈরি হয় তাহলে মোট উৎপাদন হবে ৫০ টাকা। কিন্তু তুলো, সুতো ও কাপড়—সব ধরলে মোট উৎপাদন হবে ৯০ টাকা। এতে দ্বিত্ব-গণনার ভুল থেকে যাবে।

দুভাবে এই ভুল এড়ানো যায়। (১) যদি কেবলমাত্র শেষ দ্রব্য ধরা হয় এবং কাঁচামাল বা মধ্যবর্তী দ্রব্য ধরা না হয়, অথবা (২) যদি উৎপাদনের প্রত্যেক স্তরে যুক্ত অতিরিক্ত মূল্য (Value added) ধরা হয়—তাহলে দ্বিত্ব-গণনার ভুল এড়ানো যায়। কিন্তু কোন্ দ্রব্যকে শেষ দ্রব্য বলা হবে ঠিক বোঝা যায় না। কয়লা কোলিয়ারির শেষ দ্রব্য, কিন্তু লোহার কারখানায় সেই কয়লা আবার কাঁচামাল. সার কারখানার শেষ দ্রব্য হল সার। সেই সার কৃষির কাঁচামাল বা মধ্যবর্তী দ্রব্য। কাজেই প্রথম পদ্ধতিটি অনুসরণ করার অসুবিধে আছে. সেইজন্য—উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধতিতে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট অতিরিক্ত মূল্য যোগ করা হয়। সুতো কারখানায় ২৫ টাকার সুতো হয়। তার জন্য ১৫ টাকার তুলো ব্যবহৃত হয়। অতএব সুতো কারখানায় অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি হল ২৫ টাকা—১৫ টাকা =১০ টাকা।

দেশের মধ্যে অনেক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থাকে। এক প্রতিষ্ঠানের শেষ দ্রব্য অন্য বহু প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল। এইভাবে এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য সব প্রতিষ্ঠানে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় চলে। এখন কোন একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট অতিরিক্ত মূল্য সেই প্রতিষ্ঠানের দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য—অন্য প্রতিষ্ঠানের ক্রীত দ্রব্যের মূল্য। সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এরূপ করলে প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রয়-বিক্রয় পরস্পর সমান হয়ে বাদ পড়ে যাবে। সে যা হোক, সব প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত মূল্য যোগ করলে আমরা জাতীয় উৎপাদনের সঠিক হিসেব পাব।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধতিতে জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করার সময় আর একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। যে সব উৎপাদন অর্থনৈতিক অর্থে উৎপাদন নয় তাদের জাতীয় উৎপাদনে ধরা হয় না। অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে বিক্রয়ের জন্য কিংবা অপরের অভাব পূরণের জন্য যে উৎপাদন করা হয় তাকেই বোঝায়। কোন পরিবার তার রান্নাঘর সংলগ্ন বাগানে যে সব ফল ও ফুলের চাষ করে সেগুলি বিক্রয়ের জন্য নয়। কাজেই ওদের উৎপাদন বলা হবে না এবং জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ধরা হবে না।

তৃতীয়ত, দেশের নীট উৎপাদন পরিমাপ করার সময় যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি

বাদ দিতে হয়। দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়, তাদের ক্ষয় হয়। এর ফলে দেশের মোট মূলধন ভান্ডারের মান কমে যায়। কোন যন্ত্র হয়তো একেবারে বিকল হয়ে যায় না। যন্ত্রটা যন্ত্রই থাকে, কিন্তু তার মূল্য বা মান কমে যায়। একে অবচয় বলা হয়। অবচয় হল মূলধনের আংশিক মৃত্যু। উৎপাদনের ফলে যে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে কিছু দ্রব্য দেশের যন্ত্রপাতিতে রূপ নেয়। এতে মূলধন ভান্ডার বাড়ে। কিন্তু সারা বছরে দ্রব্য উৎপাদন করে যন্ত্রপাতির আংশিক মৃত্যু ঘটে। একে বাদ না দিলে দেশের মোট উৎপাদনের সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না।

চতুর্থত, দেশের উৎপাদনের পরিমাণকে দ্রব্যের দাম দ্বারা গুণ করা হয়। কিন্তু দামের মধ্যে সরকারের চাপানো পরোক্ষ কর থেকে যায়। কর কিন্তু উৎপাদন নয়। কাজেই দেশের প্রকৃত উৎপাদন জানতে হলে পরোক্ষ কর বাদ দেওয়া উচিত।

পঞ্চমত, অনেক সময় সরকার দেশের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভরতুকি (subsidy) দেন। ভরতুকির দ্বারা কোন উৎপাদন বোঝায় না। কাজেই ভরতুকি বাদ দেওয়া উচিত।

ষষ্ঠত, সরকার যে সব সেবার যোগান দিয়ে থাকেন, যাদের কোন বাজার নেই, বাজার দর নেই—সেই সব সেবার ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয় ধরে উৎপাদন পরিমাপ করা উচিত।

সপ্তমত, দেশটি যদি বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, তাহলে বহির্বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত নীট আয় জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে ধরতে হয়।

(খ) আয় পরিমাপ পদ্ধতি :

কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে যখন কোন দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন হয়, তখন একদিকে দ্রব্য বা সেবার প্রবাহ সৃষ্টি হয়, অপরদিকে একটি আয় প্রবাহও সৃষ্টি হয়। উৎপাদন কার্যে যে সব উপাদান অংশ গ্রহণ করে যেমন—শ্রম, মূলধন, জমি, সংগঠন, তারা প্রতিষ্ঠান থেকে আয় পেয়ে থাকে। শ্রমিকেরা মজুরী পান, জমির মালিকেরা খাজনা পান, মূলধনের মালিকেরা সুদ পান। মজুরী, খাজনা ও সুদ দেওয়ার পর যে উদ্বৃত্ত থাকে সেটা মুনাফা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। এখন কোন প্রতিষ্ঠানে আয়ের হিসেবে কী পরিমাণে দ্রব্য উৎপন্ন হল—তা জানতে হলে উৎপাদন পরিমাপ করে যা পাওয়া যাবে, সেই উৎপাদনে অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলির আয়ের হিসেব জেনে যোগ করলেও সেই একই হিসেব পাওয়া যাবে। অর্থাৎ কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের আর্থিক মূল্য = সেই প্রতিষ্ঠানে বণ্টিত মোট আয় = সেই প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী + জমির মালিকের খাজনা + মূলধনের মালিকদের সুদ + প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মুনাফা।

এখন সমগ্র দেশটাকে যদি একটি বিশাল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বলে মনে করি তাহলে জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্য = মোট মজুরী + মোট খাজনা + মোট

সুদ + মোট মুনাফা = মোট জাতীয় আয় হবে। অন্যভাবে বলা যায়, একটি দেশে যতগুলি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থাকবে তাদের সকলের বণ্টিত আয়ের যোগফলই হবে মোট জাতীয় আয় = মোট মজুরী + মোট খাজনা + মোট সুদ + মোট মুনাফা।

আয় পরিমাপ পদ্ধতি থেকে আমরা পাই যে—কোন দেশের জাতীয় উৎপাদন ও সেই দেশের জাতীয় আয় সর্বদা পরস্পর সমান। অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় অভেদ মাত্র। আমরা লিখতে পারি—

জাতীয় উৎপাদন ≡ জাতীয় আয়।

আয় পরিমাপ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

(১) উৎপাদন কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে যে আয় প্রাপ্তি ঘটে সেই আয়কেই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরতে হয়। যে সব আয় দান বা ভিক্ষা হিসেবে একজনের নিকট থেকে অন্যের নিকট হস্তান্তরিত হয়, সেই সব হস্তান্তরিত আয়কে (Transfer income) জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা উচিত নয়, কারণ তাহলে একই আয়কে একাধিক বার হিসেবের মধ্যে ধরা হবে, এবং দ্বিত্ব-গণনার ভুল হবে। অতএব ভিখারিদের আয়, চোর-ডাকাতদের চুরি করা আয়, বৃদ্ধদের পেনসন, বেকারদের বেকার ভাতা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হোস্টেলে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীদের মাসিক আয় ইত্যাদি জাতীয় আয়ের হিসেব থেকে বাদ যাবে।

(২) উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে যে আয় সৃষ্ট হয় তাই হল উদ্ভূত আয়। এই আয় উপাদানের মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। আমরা তাকে প্রাপ্ত আয় বলতে পারি। এখন কোন প্রতিষ্ঠান যদি তার সব উদ্ভূত আয়কে বণ্টন না করে, যদি একটি অংশ অবণ্টিত রাখে, তাহলে উদ্ভূত আয় থেকে প্রাপ্ত আয় কম হবে। মজুরী, সুদ, খাজনার ক্ষেত্রে সব উদ্ভূত আয় বণ্টিত হয়, কিন্তু মুনাফার ক্ষেত্রে দেখা যায়—যৌথ মূলধনী কারবারগুলি তাদের মুনাফার একটি অংশ অবণ্টিত রাখে। এক্ষেত্রে, মোট মুনাফা = মোট বণ্টিত মুনাফা + মোট অবণ্টিত মুনাফা।

জাতীয় আয় পরিমাপের সময় বণ্টিত মুনাফা ও অবণ্টিত মুনাফাকে ধরতে হয়।

(৩) যে সব ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত না থেকে স্বয়ং-প্রবৃত্ত পেশায় নিযুক্ত থাকেন এবং নিজেদের নিকট থেকে আয় পেয়ে থাকেন, তাঁদের আয়কেও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরতে হয়।

(৪) দেশের ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ তাদের আয়ের একটি অংশ সরকারকে আয়কর হিসেবে দেয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মুনাফা থেকে সরকারকে মুনাফা-কর দেয়। আয়-কর ও মুনাফা-কর হল প্রত্যক্ষ কর। জাতীয় আয়ের মধ্যে এই ধরনের প্রত্যক্ষ করকে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

(৫) কোন দেশ বহির্বাণিজ্য থেকে যে আয় পেয়ে থাকে সেই আয়ও জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন দেশ বিদেশ

থেকে বিভিন্নভাবে আয় পেয়ে থাকে, যেমন, রপ্তানি থেকে আয়, বিদেশে মূলধন ঋণ দিলে তার জন্য সুদ, বিদেশে কোন বিনিয়োগ করলে তার জন্য লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ডস্, বিদেশ থেকে দান বা অনুদান ইত্যাদি পেয়ে থাকে। তেমনি সেই দেশ বিদেশকে আমদানির দাম দেয়, বিদেশ থেকে প্রাপ্ত মূলধনের সুদ দেয়, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের লভ্যাংশ দেয় এবং বিদেশকে দান বা অনুদান ইত্যাদি দেয়। দেশের আয় থেকে ব্যয় বিয়োগ করলে যে নীট আয় পাওয়া যায় সেই নীট আয়কে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হবে।

(৬) জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় জাতীয় মূলধনের অবচয় বাদ দিতে হয়। এই অবচয় বাদ দিয়ে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

(গ) **ব্যয় পরিমাপ পদ্ধতি:** কোন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে যে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয় তাদের কতকগুলি দেশবাসীদের নানারূপ প্রত্যক্ষ অভাব পূরণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এদের বলা হয় ভোগ্য দ্রব্য। উৎপন্ন দ্রব্যসমূহের বাকি অংশটি প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন ভাণ্ডারে মূলধন দ্রব্য হিসেবে যুক্ত হয় এবং এর ফলে মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটে। একে বিনিয়োগ বলা হয়।

দেশের ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ দৈনন্দিন অভাব পূরণের জন্য যে সব দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে সেই ক্রয়কে ভোগব্যয় বলা হয়। ভোগব্যয় হল মোট ব্যয়ের একটি অংশ। বাকি অংশটি হল উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগ ব্যয়। অতএব দেশের মোট ব্যয় = মোট ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয়।

দেশের ব্যক্তি ও পরিবারসমূহ একদিকে ভোগকারী হিসেবে ভোগব্যয় করে। অন্যদিকে এই পরিবারসমূহ থেকেই প্রবাহিত হয় শ্রম, জমি, মূলধন ও সংগঠনের সেবা স্রোত। এই স্রোত যায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহের দিকে। সেখানে এই সেবাসমূহ উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হয় এবং মোট জাতীয় উৎপাদনকে সম্ভব করে তোলে। জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে যে সব দ্রব্য ও সেবা স্রোতের উদ্ভব হয় তাদের আর্থিক মূল্যই হল জাতীয় উৎপাদন। এই উৎপাদন বিক্রয় করে যে আয় পাওয়া যায় সেই আয় আবার শ্রম, জমি, মূলধন ও সংগঠনের মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। সেই বণ্টিত আয়ের সমষ্টি হল জাতীয় আয়। এটিও একটি প্রবাহ। এই প্রবাহ আসে পরিবারসমূহের দিকে। সেই আয় থেকে পরিবারসমূহ ভোগকারী হিসেবে ভোগ ব্যয় করে এবং বাকি অংশ বিনিয়োগ করে। তাহলে মোট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় আয় = মোট ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয় = মোট জাতীয় ব্যয়।

এখন জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয় পরস্পর সমান হওয়ায় জাতীয় আয় বা জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করার জন্য আমরা দেশের মোট ভোগ ব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয় পরিমাপ করে যোগ করে সেই দেশের জাতীয় ব্যয়ের হিসেব পাব এবং এই জাতীয় ব্যয়ই হবে জাতীয় আয়।

দেশের মোট বিনিয়োগ থেকে অবচয় বাদ দিলে নীট বিনিয়োগ পাওয়া যায়। অতএব দেশের নীট ব্যয়

= ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয়—অবচয়

= ভোগ ব্যয় + নীট বিনিয়োগ

৩.২ জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয়ের অভেদ :

কোন দেশের বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব দ্রব্য ও সেবা পাওয়া যায় তাদের অর্থ মূল্যের যোগফলকে সেই দেশের জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। দেশের উৎপাদন কার্যে যে সব উপাদান নিযুক্ত থাকে তাদের আয়ের যোগফলকে জাতীয় আয় বলা হয়। প্রাপ্ত জাতীয় আয় থেকে দেশবাসীরা ভোগ ও বিনিয়োগে যে অর্থ ব্যয় করে থাকে তাদের সমষ্টিকে জাতীয় ব্যয় বলা হয়। এখানে জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয়—এই তিনটি পরিমাপের কথা বলা হয়েছে। সমষ্টিগত অর্থনীতিতে দেখানো হয় যে, এই তিনটি পরিমাপ সর্বদা সমান। এরা একটি অভেদের তিনটি অংশ। অর্থাৎ জাতীয় উৎপাদন = জাতীয় আয় = জাতীয় ব্যয়।

এই অভেদ সম্পর্কটি দেখানোর জন্য আমরা কয়েকটি অনুধারণার আশ্রয় নেব। আলোচনার সুবিধের জন্যই এই সব অনুধারণার আশ্রয় নেওয়া হল। আমরা ধরব যে—

(১) *দেশের সরকার কোন অর্থনৈতিক কাজ করেন না ;*

(২) *দেশের বৈদেশিক বাণিজ্য নেই ;*

(৩) *দেশের পরিবারসমূহ জমি, শ্রম, মূলধন, উদ্যোগ নামক উপাদানসমূহের মালিক ; তারাই এই সব উপাদানের সেবা বিক্রয় করে এবং তার জন্য আয় পেয়ে থাকে ;*

(৪) *পরিবারসমূহ কেবলমাত্র ভোগ করে, তারা উৎপাদন করে না ;*

(৫) *উৎপাদন হয় কেবলমাত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহে ;*

(৬) *উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সব দ্রব্য উৎপাদন করে তাদের একটি অংশ তাদের মূলধন ভাণ্ডারে যোগ করে। একে বিনিয়োগ ব্যয় বলে ;*

(৭) *উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ কোন অবণ্টিত মুনাফা রাখে না।*

আমাদের কল্পিত দেশে পরিবারসমূহ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট শ্রম, জমি, মূলধন ও উদ্যোগ নামক সেবা বিক্রয় করে। সেই সব উপাদান দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রব্য উৎপাদন করে। উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বাজারে যায়। বিক্রীত অর্থ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহে ফিরে আসে। তারপর শ্রম, জমি, মূলধন ও উদ্যোগ নামক সেবার মালিকদের মধ্যে যথাক্রমে মজুরী, খাজনা, সুদ ও মুনাফা হিসেবে বণ্টিত হয়। মজুরী, খাজনা, সুদ ও মুনাফা হল পরিবারসমূহের আয়।

এই আয় থেকেই পরিবারসমূহ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় করে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলধন দ্রব্য ক্রয় করে। পরিবারগুলির ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়কে ভোগ ব্যয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলির অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য ক্রয়কে বিনিয়োগ ব্যয় বলা হয়। মোট ভোগ ব্যয় ও মোট বিনিয়োগের যোগফল হল মোট ব্যয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে মোট জাতীয় উৎপাদন = মোট আয় = মোট ব্যয়।

এই আলোচনায় দেখা যায় যে, পরিবারগুলি প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট উপাদান বিক্রয় করে যে আয় পায় তাই দিয়ে প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেরা মূলধন দ্রব্য ক্রয় করে। এতে একটি ব্যাপার বাদ পড়ে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট থেকে কাঁচামাল, মধ্যবর্তী দ্রব্য বা শেষ দ্রব্যও ক্রয় করে। সেটা ধরা হয়নি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়—প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের মধ্যে যে সব দ্রব্যের কেনাবেচা করে থাকে, সেগুলি যোগ করার সময় যোগ ও বিয়োগের দ্বারা কেটে যায়। এটি বোঝানোর জন্য আমরা ধরে নিতে পারি যে, দেশে ক ও খ নামক দুটি মাত্র প্রতিষ্ঠান আছে। এখন এই দেশের মোট উপাদান = ক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট অতিরিক্ত মূল্য + খ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট অতিরিক্ত মূল্য।

= ক প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় – খ প্রতিষ্ঠান থেকে ক-এর ক্রয় + খ প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় – ক থেকে খ-এর ক্রয়।

= (পরিবারসমূহের নিকট ক-এর বিক্রয় + খ-এর নিকট ক-এর বিক্রয় + ক-এর মজুত ভাণ্ডারে অতিরিক্ত দ্রব্য রক্ষণ – খ থেকে ক-এর ক্রয়) + (পরিবারসমূহের নিকট খ এর বিক্রয় + ক-এর নিকট খ-এর বিক্রয় + খ-এর মজুত ভাণ্ডারে যোগ – ক থেকে খ-এর ক্রয়)

= পরিবারসমূহের নিকট ক ও খ-এর বিক্রয় + ক ও খ-এর মজুত ভাণ্ডারে অতিরিক্ত দ্রব্যের সংযোজন + খ-এর নিকট ক-এর বিক্রয় + ক-এর নিকট খ-এর বিক্রয় – খ থেকে ক-এর ক্রয় – ক থেকে খ-এর ক্রয়।

= (পরিবারসমূহের নিকট ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় + প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ব্যয় + খ-এর নিকট ক-এর বিক্রয় – ক থেকে খ-এর ক্রয়) + (ক-এর নিকট খ-এর বিক্রয় – খ থেকে ক-এর ক্রয়) খ-এর নিকট ক-এর বিক্রয় ও ক থেকে খ-এর ক্রয় সব সময় সমান। তাই ওরা কেটে যাবে। অনুরূপভাবে ক-এর নিকট খ-এর বিক্রয় ও খ থেকে ক-এর ক্রয় পরস্পর সমান বলে কেটে যাবে

= মোট ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয় = মোট ব্যয়। তাহলে আমরা পাই, মোট উৎপাদন = মোট ভোগব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয় = মোট ব্যয়। দুই-এর বেশি প্রতিষ্ঠান থাকলেও মোট উৎপাদন ও মোট ব্যয় পরস্পর সমান হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে উৎপাদন পরিমাপ করার জন্য সব প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত মূল্য যোগ করার সময় প্রতিষ্ঠানগুলির পারস্পরিক লেনদেন যোগবিয়োগে কেটে যায়।

এখন আমরা জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের অভেদটি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারি।

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে দ্রব্য উৎপন্ন হয়। সেই দ্রব্য বিক্রয় করে যে আয় পাওয়া যায় তাই উৎপাদনে অংশ গ্রহণকারী উপাদানগুলির মালিকদের মধ্যে বণ্টিত হয়। কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট অতিরিক্ত মূল্য = প্রতিষ্ঠানের ব্যয়। আমাদের উদাহরণে ক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট অতিরিক্ত মূল্য = শ্রমের জন্য ব্যয় + জমির জন্য ব্যয় + মূলধনের জন্য ব্যয় + মুনাফা = মজুরী + খাজনা + সুদ + মুনাফা = ক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত পরিবারসমূহের আয়।

অনুরূপভাবে খ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট অতিরিক্ত মূল্য = মজুরী + খাজনা + সুদ + মুনাফা = খ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত পরিবারসমূহের আয়। এখন যে দেশে ক ও খ নামক দুটি মাত্র প্রতিষ্ঠান আছে তার মোট জাতীয় উৎপাদন = ক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট অতিরিক্ত মূল্য + খ প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট অতিরিক্ত মূল্য = ক ও খ প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত পরিবারসমূহের মজুরী + খাজনা + সুদ + মুনাফা = মোট জাতীয় আয়। তাহলে মোট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় আয়। দুই-এর বেশী প্রতিষ্ঠান থাকলেও এরকম হবে। তাহলে আমরা পাই,

মোট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় আয় = মোট জাতীয় ব্যয় = ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয়।

এখন এই অভেদের প্রত্যেকটি অংশ থেকে অবচয় বাদ দিলে আমরা পাব,

নীট জাতীয় উৎপাদন = নীট জাতীয় আয় = নীট জাতীয় ব্যয় = ভোগ ব্যয় + নীট বিনিয়োগ ব্যয়।

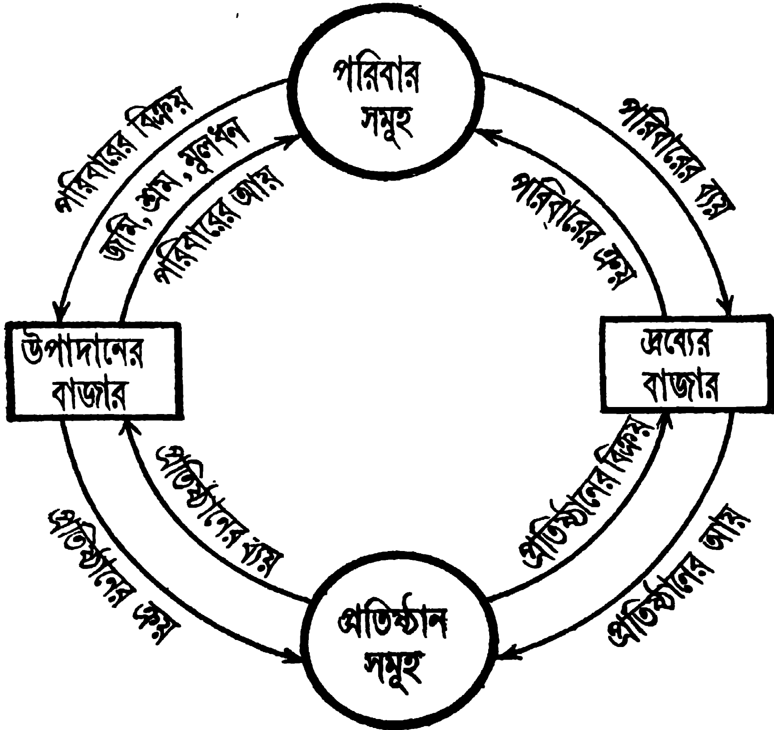
৩ ৩ আয়-ব্যয়ের বৃত্তস্রোতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

কোন সামগ্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় কতগুলি দ্বিমুখী স্রোত প্রবাহিত হয়। আমাদের শরীরে যেমন প্রতিনিয়ত অবিরাম গতিতে রক্ত প্রবাহ চলে সমগ্র সমাজ-শরীরে তেমনি সর্বত্র দ্রব্য ও সেবার স্রোত বয়ে চলেছে। একেই সংক্ষেপে আয় ও ব্যয়ের বৃত্তস্রোত (circular flow of income and expenditure) বলা যেতে পারে।

সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা পরিবার একদিকে দ্রব্য বা সেবার ক্রেতা, অন্যদিকে সে অন্য কোন দ্রব্য বা সেবার বিক্রেতা। জেলে মাছ ধরে বিক্রয় করে। সে মাছের বিক্রেতা। মাছ বিক্রয় করে সে যে অর্থ পায় তা দিয়ে সে চাল ক্রয় করে। সে আবার চালের ক্রেতা। এইভাবে সমাজের সব লোক বিক্রেতা হিসেবে যে সব দ্রব্য ও সেবার যোগান দেয়—এবং এইভাবে যে আয় পায়—তার সাহায্যে তারা ক্রেতা হিসেবে সব দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে নেয়। এটাই আয় ও ব্যয়ের বৃত্তস্রোতের মূল কথা।

সমাজে কতগুলি পরিবার থাকে। তারা জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোগ নামক

সেবা প্রয়োগ করে নানারূপ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে। আমরা যদি ধরে নিই যে, কেবলমাত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন করে, তাহলে আমরা এখানে একটি দ্বিমুখী স্রোত লক্ষ্য করতে পারি। পরিবারগুলি থেকে উপাদানের সেবার স্রোত প্রবাহিত হয় প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে। প্রতিষ্ঠানগুলি আবার পরিবারগুলির সেবা ক্রয় করার জন্য শ্রমের মজুরী, জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও উদ্যোগের মুনাফা



পাঠায় পরিবারগুলির দিকে। পরিবারগুলি সেই আয় নিয়ে আসে দ্রব্যের বাজারে। তারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে। আয় চলে আসে পরিবার থেকে প্রতিষ্ঠানের দিকে। তা থেকে আবার পরিবারের দিকে এবং এইভাবে চলতে থাকে। রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখানো হল। আমাদের রেখাচিত্রে উপরের বৃত্তে পরিবার, নীচের বৃত্তে প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাখা হয়েছে। পরিবারগুলি থেকে শ্রম, জমি, মূলধন, উদ্যোগ যায় প্রতিষ্ঠানের দিকে। আমাদের রেখাচিত্রের

বাম দিকের বাইরের লাইনে এগুলি পরিবারের বিক্রয় নামে চিহ্নিত হয়েছে। পরিবারগুলি কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরাসরি উপাদান দেয় না। ধরা হয়েছে, তারা প্রথমে উপাদানের বাজারে সেগুলি বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যায়। সেখান থেকে প্রতিষ্ঠানগুলি ঐ সব উপাদান ক্রয় করে। অতএব পরিবারের বিক্রয় হল প্রতিষ্ঠানের ক্রয়। অতএব উপাদানের সেবাস্রোত পরিবারগুলি থেকে বের হয়ে উপাদানের বাজারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে। প্রতিষ্ঠানগুলি এইজন্য ব্যয় করে। সেই ব্যয়স্রোত উপাদানের বাজারে ঢোকে এবং সেখান থেকে পরিবারের মজুরী, খাজনা, সুদ ও মুনাফা নামক আয় হয়ে পরিবারগুলির মধ্যে প্রবেশ করে।

প্রতিষ্ঠানগুলি যে সব উপাদান ক্রয় করে তাদের উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত করে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে। সেই দ্রব্য ও সেবাস্রোত এবার দ্রব্যের বাজারে বিক্রয়ের জন্য যায়। আমাদের রেখাচিত্রে "প্রতিষ্ঠান" বৃত্ত থেকে ডান দিকে ভিতরের রেখা ধরে এটি দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের বাজারে প্রতিষ্ঠানগুলি হল বিক্রেতা। কিন্তু পরিবারগুলি এখানে ক্রেতা। প্রতিষ্ঠানগুলি যে দ্রব্য ও সেবা দ্রব্যের বাজারে বিক্রয় করে তাই পরিবারের ক্রয় হিসেবে "পরিবার" বৃত্তে প্রবেশ করে। কিন্তু তার জন্য পরিবারগুলিকে দাম দিতে হয়। অতএব পরিবারগুলি থেকে একটি ব্যয়ের স্রোত প্রবাহিত হয় দ্রব্যের বাজারের দিকে। সেখান থেকে সেই ব্যয়স্রোত প্রতিষ্ঠানের আয়স্রোতে রূপান্তরিত হয়ে "প্রতিষ্ঠান" বৃত্তে প্রবেশ করে। প্রতিষ্ঠানগুলি সেই আয় নিয়ে যায় উপাদানের বাজারে। সেখান থেকে উপাদান ক্রয় করে থাকে। এমনিভাবে শরীরের রক্ত প্রবাহের মত অর্থনৈতিক সমাজ-শরীরেও অনবরত আয় ও ব্যয়ের বৃত্তস্রোত প্রবাহিত হয়ে চলে।

এখানে একটি কথা বলার আছে। প্রতিষ্ঠানগুলি যে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তাদের সবগুলিই ভোগ্য দ্রব্য হিসেবে পরিবারে যায় না। কতগুলি যায় ভোগ্য দ্রব্য হিসেবে এবং বাকিগুলি যায় অন্য দ্রব্য হিসেবে। যেহেতু পরিবার-গুলিই হল প্রতিষ্ঠানের মালিক, অতএব পরিবারগুলিই উৎপাদক। তারা যে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তাদের কতকগুলি দিয়ে ভোগের কাজ চালায়, বাকিগুলিকে নিক্ষেপ করে মূলধন দ্রব্য হিসেবে মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটাবার কাজে। একেই বিনিয়োগ বলা হয়। অতএব পরিবারগুলির মোট আয় থেকেই ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সৃষ্টি হয়।

৩৪ জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা :

কোন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় বহু অসুবিধে দেখা দিতে পারে। এই অসুবিধেগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে—যথা, (ক) ধারণাগত

অসুবিধে (Conceptual difficulties) এবং (খ) পরিসংখ্যানগত অসুবিধল (Statistical difficulties)।

(ক) **ধারণাগত অসুবিধে**—ধারণাগত অসুবিধের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হল কাকে উৎপাদন বলব, কাকে আয় বলব এবং কাকে বলব না—এই সম্বন্ধে একই নীতি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অসুবিধে। কৃষক যে ফসল উৎপাদন করে এবং নিজের পরিবারের ভোগের কাজে ব্যবহার করে তাকে উৎপাদন বলা হবে এবং তার বাজার দাম হিসেব করে তাকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরতে হবে। অথচ কোন ভদ্রলোক যদি তাঁর শখের বাগানে কোন ফুল-ফলের চাষ করেন তাকে উৎপাদন বলা হবে না—এবং তাকে জাতীয় আয়ের মধ্যেও ধরা হবে না। তেমনি সরকার, প্রতিরক্ষা ও আভ্যন্তর প্রশাসনিক কাজে যে বিপুল অর্থ ব্যয় করছে তাকে উৎপাদনশীল বলা হবে কিনা—সে বিষয়ে অর্থনীতিবিদরা একমত নন। প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে উৎপাদনের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নেই। আবার একেবারে যোগ নেই বললেও ভুল হবে। কাজেই এগুলি উৎপাদন কিনা বোঝা যায় না। তেমনি ধারণাগত অসুবিধে আরো অনেক আছে।

(খ) **পরিসংখ্যানগত অসুবিধে**—জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে যেসব পরিসংখ্যানের অসুবিধে দেখা দেয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো হল তথ্যের অভাব। উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবার পরিমাণ ও দাম উভয় সম্বন্ধেই তথ্য পাওয়া মুশকিল। দেশে ছোট ছোট উৎপাদকরা উৎপাদনের কোন হিসেব রাখে না। হিসেব রাখতে অভ্যস্ত নয়। ভারতের মত অশিক্ষিত ও দরিদ্র দেশে তথ্যের দারিদ্র্যও কম বেদনাদায়ক নয়। এসব ক্ষেত্রে অনুমান প্রয়োগ করতে হয়। সেবাক্ষেত্রেও সরকারী ও বড়ো বড়ো বেসরকারী সেবাক্ষেত্রে মোট ব্যয় হয়তো জানা যায়। কিন্তু ছোট ছোট সেবাক্ষেত্রে, স্বয়ং-নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আয়ের হিসেব পাওয়া যায় না। এখানেও অনুমান করতে হতে পারে।

দেশবাসীরা তথ্য দিতে ভয় করে। তথ্য গোপন করে এবং ভুল তথ্যের সংগ্রহ দেয়। এগুলো দরিদ্র ও অশিক্ষিত দেশে বেশি হয়।

তবে সবচেয়ে মারাত্মক অসুবিধে দেখা দেয় যদি তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি থাকে। তথ্য সংগ্রহের জন্য নমুনা নিতে হয়। নমুনা বিচার করতে হয়। এগুলির জন্য পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। দেশে পরিসংখ্যানের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা অনুন্নত হলে অসুবিধে দেখা দেয়।

অনেক সময় তথ্য সংগ্রাহকরাও ফাঁকি দিতে পারে। দূরে থেকে তথ্য সংগ্রহ করা, ভুল তথ্য সংগ্রহ করা এবং দুর্নীতির শিকার হওয়ার সমস্যাও আছে।

প্রশ্নাবলী

১। কোন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার জন্য কোন্ কোন্ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় তা সংক্ষেপে লেখ।

২। আয় পরিমাপ পদ্ধতি ও উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধতির সাহায্যে কীভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায় আলোচনা কর।

৩। দেখাও যে, আয় পরিমাপ পদ্ধতি, উৎপাদন পরিমাপ পদ্ধতি ও ব্যয় পরিমাপ পদ্ধতির সাহায্যে একই ফল পাওয়া যায়।

৪। জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয়ের অভেদ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। আয় ও ব্যয়ের বৃত্তস্রোত সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

১। জাতীয় আয় বলতে কী বোঝায় ?

২। নীট জাতীয় উৎপাদন বলতে কী বোঝায় ?

৩। বাজার দামে জাতীয় উৎপাদন ও উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য কর।

৪। জাতীয় আয়ের হিসেবের মধ্যে কোন্ কোন্ আয় ধরা হয় না ?

৫। সরকারী কাজের ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাপের কিরূপ অসুবিধে দেখা দেয় ?

৬। অতিরিক্ত মূল্য সৃষ্টি বলতে কী বোঝায় ? কোন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট অতিরিক্ত মূল্যের হিসেব কীভাবে করা হয় ?

৪.১ **আয়-পরিমাপ ও আয়-নির্ধারণের পার্থক্য ঃ** জাতীয় আয় পরিমাপ করা ও জাতীয় আয় নির্ধারণ করা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। (১) পরিমাপের সমস্যা হল পরিসংখ্যানের কিংবা হিসাবশাস্ত্রের বিষয়; কিন্তু আয় নির্ধারণের সমস্যা হল একটি জটিল অর্থনৈতিক সমস্যা। (২) পরিমাপ করার সময় প্রকৃত (ex post) বিষয়কেই পরিমাপ করা হয়। কিন্তু নির্ধারণের সময় সম্ভাব্য (ex ante) বিষয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করতে হয়। প্রকৃত বিষয় ও সম্ভাব্য বিষয় সম্পূর্ণ পৃথক হতে পারে। (৩) পরিমাপের মধ্যে তত্ত্ব থাকে না, নির্ধারণের মধ্যে তত্ত্ব থাকে। তত্ত্ব মানে হল একটি অনুমান নির্ভর সিদ্ধান্ত যা বাস্তবকে ব্যাখ্যা করতেও পারে, আবার অবাস্তবও হতে পারে। অতএব নির্ধারণের সমস্যা পরিমাপের সমস্যার চেয়ে বেশি তাৎপর্যময় ও আগ্রহ সঞ্চারী (Interesting) হয়। (৪) জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় দেখা যায় জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয় সব সময় সমান হয়। জাতীয় আয় ও জাতীয় ব্যয় একই বিষয়ের দুটি পৃথক নাম মাত্র। কিন্তু জাতীয় আয়ের ভারসাম্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেখা হয়—সম্ভাব্য জাতীয় আয় ও অসম্ভাব্য জাতীয় ব্যয় কীভাবে সমতা পায়; যদি সম্ভাব্য আয় কিংবা ব্যয় বেশি হয় তাহলেই বা কী হয়। এসব ব্যাপার পরিমাপের সময় আসে না।

৪.২ **কীভাবে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য নির্ধারিত হয় ঃ** সম্ভাব্য জাতীয় আয় ও সম্ভাব্য জাতীয় ব্যয় যেখানে সমান হয় সেখানে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য দেখা দেয়। সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সমতায় না থাকলে দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সেই প্রতিক্রিয়ার ফলে যদি আয় ও ব্যয়ের এমন পরিবর্তন হয় যে, আয় ও ব্যয় সমান হয়, তাহলে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়। ভারসাম্য অবস্থায় আয় ও ব্যয়ের মধ্যে আর কোন পরিবর্তন বা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। সেইজন্য ভারসাম্য অবস্থাকে স্থিতিশীল অবস্থাও বলা যেতে পারে।

সম্ভাব্য আয় আসে উৎপাদন থেকে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাহলে নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি পেলে পরিবার-গুলির আয় বৃদ্ধি পায়, কারণ পরিবারগুলিই উপাদানের যোগান দেয়।

উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থেকে পরিবারগুলি আয় পেয়ে থাকে। এই আয়ের একটি অংশের সাহায্যে তারা ভোগকারী হিসেবে ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় করে। অপর অংশটির সাহায্যে পরিবারগুলি বিনিয়োগকারী বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে মূলধন দ্রব্য ক্রয় করে সামগ্রিক মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটায়। মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি হল বিনিয়োগ। তাহলে আমরা বলতে পারি—দেশের সম্ভাব্য আয় থেকে দুরকমের সম্ভাব্য ব্যয় হতে পারে, যথা—ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়।

দেশের সরকারের যদি অর্থনৈতিক কাজ থাকে তাহলে সরকারের সম্ভাব্য ব্যয় মোট ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। আবার সেই দেশটি যদি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে তাহলে তার জন্য যে সম্ভাব্য ব্যয় হতে পারে তাও মোট ব্যয়ের সঙ্গে যুক্ত হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরব যে, সরকারের কোন অর্থনৈতিক কর্ম নেই এবং দেশটিও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে না, তাহলে দেশের সম্ভাব্য মোট ব্যয় = ভোগ ব্যয় + বিনিয়োগ ব্যয়।

আমরা জানি দেশের ভোগ ব্যয় আসে ভোগকারীদের নিকট থেকে। ভোগকারীরা ভোগের ব্যাপার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই ভোগকারীরা পরিবারে বাস করে। তাহলে আমরা পরিবারগুলিকেই ভোগকারী হিসেবে ধরতে পারি। পরিবারগুলি উৎপাদন কার্যে উপাদানের যোগান দিয়ে আয় পেয়ে থাকে এবং সেই আয়ের উপর ভিত্তি করে ভোগের উপর পরিকল্পনা করে। আয় কত হবে তা অনুমান করে পরিবারগুলি ভোগের উপর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অনুমিত আয়কে প্রত্যাশিত আয় (expected income) বলা হয়। সেই প্রত্যাশিত আয় থেকে কী পরিমাণ পরিকল্পিত ভোগ ব্যয় (Planned Consumption expenditure) হবে তা পরিবারগুলির ভোগ প্রকরণ (Consumption function) থেকে জানা যায়। আমরা এখানে ধরে নেব যে, পরিবারগুলির পরিকল্পিত ভোগব্যয় কেবলমাত্র পরিবারগুলির প্রত্যাশিত আয়ের উপর নির্ভর করে। অন্য ভাবে বলতে পারি, সম্ভাব্য ভোগ ব্যয় সম্ভাব্য আয়ের উপর নির্ভর করে ধরি C = পরিকল্পিত বা সম্ভাব্য ভোগ ব্যয় Y = প্রত্যাশিত বা সম্ভাব্য আয় হয়, তাহলে আমরা পাই

$$C = C(Y) \cdots\cdots (1)$$

এখানে Y বাড়লে বা কমলে C বাড়বে বা কমবে। অর্থাৎ Y ও C একমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ। আমরা C ও Y-এর মধ্যে একটি সরলরৈখিক সম্পর্ক ধরতে পারি। ধরে নিই

$$C = aY + b \quad \cdots \quad \cdots (2)$$

অর্থাৎ পরিকল্পিত ভোগ ব্যয় (C)—সম্ভাব্য আয়ের a ভাগ অপেক্ষা b পরিমাণ বেশি হবে। এখানে a হল একটি ধনাত্মক ভগ্নাংশ (Positive fraction) a-কে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (Marginal Propensity to Consume or MPC) বলা হয়।

যদি $Y = 0$ হয়, তাহলে $C = b$ হবে। অতএব b হল ভোগ ব্যয়ের সেই অংশ যা আয়ের উপর নির্ভর করে না। একে আমরা স্বয়ম্ভূত ভোগ ব্যয় (Autonomous Consumption expenditure) বলতে পারি।

যদি $a = \frac{1}{2}$ এবং $b = 30$ টাকা হয়, তাহলে ভোগ প্রকরণটি হবে —

$C = \frac{1}{2}Y + 30$ এখানে আয় যত হবে, ভোগ ব্যয় তার অর্ধেকের চেয়ে 30 টাকা বেশি হবে। যেমন, Y যদি 100 টাকা হয়, তাহলে C হবে $\frac{1}{2} \times 100 + 30 = 50 + 30 = 80$ টাকা। Y যদি 200 টাকা হয়, তাহলে $C = 130$ টাকা হবে, ইত্যাদি।

এবার সম্ভাব্য বিনিয়োগ ব্যয় সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি। কিন্তু উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিকেরাও পরিবারে বাস করেন। সে দিক দিয়ে দেখলে আমরা পরিবারগুলিকে উৎপাদন ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বলতে পারি। কিন্তু সাধারণত পরিবারগুলিকে ভোগকারী হিসেবেই দেখা হয়, বিনিয়োগকারী হিসেবে নয়। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান-গুলিকেই বিনিয়োগকারী বলা হয়।

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মূলধন দ্রব্য বা যন্ত্রের ব্যবহার করে। দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে বেশি মূলধন চাই। তাহলে বলতে পারি যে, অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্যের বা বিনিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয় উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনেই। উৎপাদন বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে; উৎপাদন কমলে বিনিয়োগ কমে। উৎপাদন আবার পরিবারের সম্ভাব্য আয়ের উপর নির্ভর করে। পরিবার-গুলির আয় বেশি হলেই তারা বেশি পরিমাণে জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে চায়। তার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশি উৎপাদন করতে হয়। তার জন্য বেশি বিনিয়োগ করতে হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, বিনিয়োগ নির্ভর করে আয়ের উপর। অর্থাৎ পরিকল্পিত বিনিয়োগ (Planned investment) সম্ভাব্য আয়ের উপর নির্ভর করে। আমরা পাই, $I = I\ (Y)$ ···(3).

Y বাড়লে বা কমলে I বাড়বে বা কমবে। আমরা এখানেও I ও Y-এর মধ্যে একটি সরলরৈখিক সম্পর্কের কথা ভাবতে পারি। ধরি $I = dY + f$···(4).

এখানে d হল প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রবণতা (Marginal Propensity to Invest or MPI) এবং f হল স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment)।

এখন দেশের আয়ের ভারসাম্য কীভাবে অর্জিত হয় তা আলোচনা করতে পারা যাবে। আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেখা দেবে যদি সম্ভাব্য আয় ও সম্ভাব্য ব্যয় সমান হয়। এখানে সম্ভাব্য আয় $= Y$.

সম্ভাব্য ব্যয় = ভোগ ব্যয় + বিনিয়োগ ব্যয়।

অর্থাৎ $Y = C + I$ (5).

এখন (2) নং ও (4) নং সমীকরণ থেকে C ও I-এর মান (5) নং সমীকরণে বসানো যেতে পারে।

তাহলে আমরা পাই,

$$Y = C + I \qquad \cdots(5)$$

অথবা, $$Y = (aY + b) + (dY + f) \qquad \cdots(6)$$

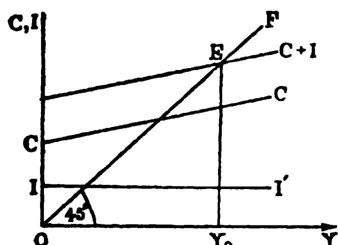
অথবা, $$Y - aY - dY = b + f$$

অথবা, $$Y(1 - a - d) = b + f.$$

অর্থাৎ, $$Y = \frac{b + f}{1 - (a + d)} \qquad \cdots(7)$$

অর্থাৎ আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকবে যদি $Y=\frac{b+f}{1-(a+d)}$ হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভারসাম্য আয় (Y) নির্ধারিত হয়, স্বয়ম্ভূত ভোগ (b), স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ (f), প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (a) এবং প্রান্তিক বিনিয়োগ (d) প্রবণতার দ্বারা। যদি বিনিয়োগ পুরোপুরিভাবে স্বয়ম্ভূত হয়, তাহলে $I=f$ হবে এবং $d=0$ হবে। সেক্ষেত্রে আয় (Y) নির্ধারিত হবে মোট স্বয়ম্ভূত ব্যয় $(b+f)$ এবং প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা a দ্বারা।

আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যেও আয় নির্ধারণ দেখাতে পারি। আমাদের এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আয় (Y) এবং উলম্ব অক্ষে ভোগ ব্যয় (C) ও বিনিয়োগ ব্যয় (I) পরিমাপ করা হচ্ছে। এখানে CC′ রেখাটি হল সরলরৈখিক ভোগ প্রকরণ রেখা। এর সমীকরণ $C=aY+b$. এখানে $b=OC$, এবং a হল CC রেখার ঢাল। এই রেখাচিত্রে OF হল 45° রেখা। এই রেখার উপর যে কোন বিন্দুতে অনুভূমিক দূরত্ব ও লম্ব-দূরত্ব পরস্পর সমান। এর ঢাল হল এক। CC′ রেখার ঢাল a যদি এক অপেক্ষা কম হয়, তাহলে CC′ রেখাটি OF রেখাকে বাম ও উপর দিক থেকে ছেদ করবে। এখানে CC′ রেখা তাই করেছে। অর্থাৎ ধরা হয়েছে যে, a (MPC) একের চেয়ে কম।



৪.১ রেখাচিত্র
জাতীয় আয়ের ভারসাম্য নির্ধারণ

এই রেখাচিত্রে II′ রেখাটি হল স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা। এখানে $OI=f$ এবং সর্বত্র এই দূরত্বটি সমান আছে। Y বাড়লে বা কমলে I বাড়েনা, কমেও না। অর্থাৎ বিনিয়োগ আয়ের উপর নির্ভর করে না। বিনিয়োগ এখানে পুরোপুরিভাবে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ। সেইজন্য II′ রেখাটি OY-অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়েছে।

এখন CC′ রেখাটির সঙ্গে II′ রেখাটিকে যোগ করলে আমরা মোট ব্যয় রেখা পাব। ১নং রেখাচিত্রে এই রেখাটির নাম C+I রেখা। C+I রেখাটি CC′ রেখার সঙ্গে সমান্তরাল, কাজেই এর ঢাল হবে CC′ রেখার ঢাল$=MPC=a$. বিনিয়োগকে স্বয়ম্ভূত ধরে নেওয়ায় II′ রেখার ঢাল (MPI) শূন্য হয়েছে। CC′ রেখাটি OF রেখাকে বাম ও উপর দিক থেকে ছেদ করায় C+I রেখাটিও তাই করেছে। CC′ রেখাকে f পরিমাণে উপরের দিকে তুললে C+I রেখা পাওয়া যায়। অতএব C+I ও CC′ রেখা দুটির মধ্যবর্তী ব্যবধান হল মোট স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ$=f$. আমাদের রেখাচিত্রে C+I হল সম্ভাব্য ব্যয় রেখা।

C+I রেখাটি OF রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হল ভারসাম্যের বিন্দু।

E বিন্দুতে মোট আয় = $OY_0 = EY_0$ এবং মোট ব্যয় = EY_0. অতএব E বিন্দুতে মোট সম্ভাব্য আয় ও মোট সম্ভাব্য ব্যয় সমান হয়েছে ; অর্থাৎ, E বিন্দুতে আয়ের ভারসাম্য দেখা দিয়েছে। $EY_0 = OY_0$ হল ভারসাম্য আয়-স্তর (Equilibrium level of income).

৪.৩ আয়ের ভারসাম্যের শর্ত ঃ

অন্যান্য ভারসাম্যের মত আয়ের ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও দুটি শর্ত আছে। একটি হল **প্রয়োজনীয় শর্ত** (Necessary condition) বা প্রাথমিক শর্ত (First order condition)। অপরটি হল মাধ্যমিক শর্ত। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শর্ত দুটিকে একসঙ্গে ধরে আমরা পাই **যথেষ্ট শর্ত** (Sufficient conditions)।

আয়ের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত হল যে—মোট সম্ভাব্য আয় ও মোট সম্ভাব্য ব্যয় সমান হবে অর্থাৎ $Y = C + I$ হবে। এই শর্তটিকে অন্যভাবেও বলা যায়—

$$Y = C + I$$

অতএব $$Y - C = I$$

অর্থাৎ আয় − ভোগব্যয় = বিনিয়োগ ব্যয়। কিন্তু $Y - C$ হল সম্ভাব্য আয় − সম্ভাব্য ভোগব্যয় = সম্ভাব্য সঞ্চয় = পরিকল্পিত সঞ্চয় (Planned Saving)। ধরি S = পরিকল্পিত সঞ্চয়, তাহলে আমরা পাই $S = Y - C = I$.

অথবা $S = I$ ... ...(৪)

অর্থাৎ আয়ের ভারসাম্য দেখা দিলে পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনেয়োগ সমান হবে। কিন্তু সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হলেই যে আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেখা দেবে এমন বলা যায় না। সেইজন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতাকে আয়ের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, দেশের পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ যদি সমান না হয় তাহলে আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য হবে না।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান না হলে

হয় (১) $S > I$ হবে,

কিংবা, (২) $S < I$ হবে।

(১) ধরা যাক $S > I$, অর্থাৎ পরিকল্পিত সঞ্চয় পরিকল্পিত বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশি। এখানে আয়ের পরিবর্তন হবে। বিনিয়োগের চেয়ে সঞ্চয় বেশি হলে আয়ের কেমন পরিবর্তন হবে দেখা যাক,

$S > I$ হলে বোঝায়

$Y - C > I$ হয়েছে ($\because S = Y - C$)

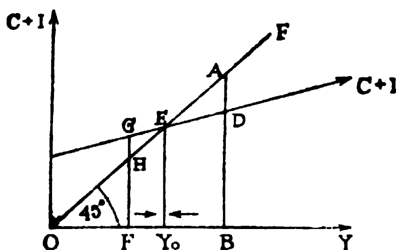
অর্থাৎ $Y > C + I$ হয়েছে, অর্থাৎ মোট আয় মোট সম্ভাব্য ব্যয় অপেক্ষা বেশি। সম্ভাব্য ব্যয় কম। ব্যয় কম হলে প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী সম্পূর্ণ

বিক্রয় করতে পারবে না। অনেক দ্রব্য অবিক্রীত থাকবে। যারা দ্রব্যের বাজারে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করতে নিয়ে যাবে তারা কিছু পরিমাণ দ্রব্য ফিরিয়ে এনে মজুত ভাণ্ডারে জমা দেবে। **এর ফলে মজুত ভাণ্ডার (Stock of inventories) বাড়বে।** মজুত ভাণ্ডার বৃদ্ধির অর্থ হল বিনিয়োগ বৃদ্ধি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলি এই বিনিয়োগ বৃদ্ধি চায়নি। এটা পরিকল্পিত বিনিয়োগ নয়। একে অপ্রত্যাশিত বিনিয়োগ (Unintended investment) বলা হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, যদি **সঞ্চয় বিনিয়োগ অপেক্ষা বেশি হয় তাহলে প্রতিষ্ঠানগুলির ভাণ্ডারে অপ্রত্যাশিত মজুত ভাণ্ডার বেড়ে উঠবে।**

মজুত ভাণ্ডার বেড়ে উঠলে প্রতিষ্ঠানগুলি মজুত কমাবে। মজুত কমানোর জন্য তারা উৎপাদন কমাবে, নিয়োগ কমাবে। তাহলে আয়ও কমবে। **এইভাবে দেখা যায়, সঞ্চয় বিনিয়োগের চেয়ে বেশী হলে দেশে সংকোচনমুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।** অর্থাৎ আয় অপেক্ষা ব্যয় কম হলে, আয় কমবে। যতক্ষণ আয় বেশি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ হতে থাকবে। অবশেষে আয় ও ব্যয়ের সমতা আবার ফিরে আসবে।

(২) যদি $S<I$ হয়, তাহলে $Y-C<I$ হবে, অর্থাৎ $Y<C+I$ হবে। এখানে আয় কম, সম্ভাব্য ব্যয় বেশি। কাজেই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাবে, তার চেয়ে বেশি দ্রব্য বিক্রয় হবে। কাজেই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মজুত ভাণ্ডার কমিয়ে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান দেবে। এর ফলে মজুত ভাণ্ডার কমবে। এটাও পরিকল্পিত নয়। আমরা একে অপ্রত্যাশিত অবিনিয়োগ (Unintended disinvestment) বলতে পারি। তাহলে আমরা পাই, **সঞ্চয় যদি বিনিয়োগ অপেক্ষা কম হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানগুলির মজুত ভাণ্ডার হ্রাস পাবে।**

প্রতিষ্ঠানগুলির মজুত ভাণ্ডার কমে গেলে তারা মজুত পূরণ করার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। এর ফলে নিয়োগ বাড়বে, আয় বাড়বে, সঞ্চয় বাড়বে।



৪.২ রেখাচিত্র : জাতীয় আয়ের ভারসাম্য

এইভাবে দেখা যায়, **সঞ্চয় বিনিয়োগের চেয়ে কম হলে দেশে সম্প্রসারণমুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে।** যতক্ষণ পর্যন্ত আয় বেড়ে সম্ভাব্য ব্যয়ের সমান না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ চলবে।

আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে এই প্রতিক্রিয়াগুলি ব্যাখ্যা করতে পারি। ৪.২নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল।

এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আয় (Y) এবং উল্লম্ব অক্ষে মোট ব্যয় (C+I) পরিমাপ করা হচ্ছে। এখানে OF রেখাটি হল 45° রেখা। C+I রেখাটি হল মোট ব্যয় রেখা। C+I

রেখাটি OF রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হল ভারসাম্যের বিন্দু। ভারসাম্য-আয়-স্তর $= OY_0$. E বিন্দুর ডান দিকে OF রেখাটির উচ্চতা C+I রেখার উচ্চতা অপেক্ষা বেশি।

অর্থাৎ $Y > C + I$.

অর্থাৎ $Y - C > I$

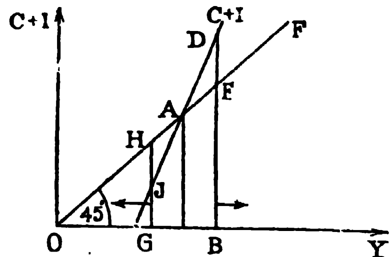
অর্থাৎ $S > I$

ধরি আয় $= OB > OY_0$. এখানে $OB = AB =$ আয়। এই আয়ে সম্ভাব্য ব্যয় $= BD$. $BD < AB$. অর্থাৎ ব্যয় কম, আয় বেশি। তাহলে সংকোচনমুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আয়স্তর OB থেকে হ্রাস পেয়ে Y_0 বিন্দুর দিকে যাবে। বামমুখী তীরের সাহায্যে এটি দেখানো হয়েছে। তাহলে আমরা পাই আয়স্তর E বিন্দুর ডানদিকে থাকলে বামদিকে আসার প্রবণতা দেখা দেবে।

অনুরূপভাবে, E বিন্দুর বাম দিকে থাকলে সম্প্রসারণমুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। এর ফলে আয় বাড়বে এবং গোটা ব্যবস্থাটি ডানদিকে সরে যাবে। যদি আয় = অনুভূমিক অক্ষে $OF < OY_0$ হয়, তাহলে সেই আয়ে ব্যয় হবে GF. এখানে আয় $= OF = HF$. ব্যয় $= GF$. অতএব ব্যয় > আয়। ফলে গোটা ব্যবস্থাটি ডানদিকে সরে যাবে। দক্ষিণমুখী তীর এঁকে এটি দেখানো হয়েছে। তাহলে আমরা পাই—যেখানে আয়ের ভারসাম্য দেখা দেবে সেখানে আয় ও ব্যয় সমান হবে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ—আয়-স্তরে ভারসাম্য থাকলে আয় ও ব্যয় সমান হবে। কিন্তু আয় ও ব্যয় সমান হলেই আমরা বলতে পারব না যে, আয়-স্তরে ভারসাম্য দেখা দেবে। অর্থাৎ আয় ও ব্যয়ের সমতা হল আয়ের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত। এটি যথেষ্ট শর্ত নয়। ৪.৩নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল।

এখানে C+I রেখাটি ডানদিক থেকে ও নীচে থেকে OF রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করেছে। A বিন্দুতে আয় = ব্যয় হয়েছে। কিন্তু A বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু নয়। তার কারণ A বিন্দুর ডানদিকে সরে গেলে ক্রমাগত ডানদিকে চলে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেবে। আবার, A বিন্দুর বামদিকে সরে গেলে ক্রমাগত বামদিকে যাবার প্রবণতা দেখা দেবে।



৪.৩ রেখাচিত্র ঃ জাতীয় আয়ের ভারসাম্য

যেমন, A বিন্দুর ডানদিকে, ধরি আয় $= OB = FB$. এই আয়ে ব্যয় $= BD$, $BD > BF$. অর্থাৎ ব্যয় বেশি।

কাজেই উৎপাদন বাড়বে। আয় বাড়বে। সম্প্রসারণমুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। দক্ষিণমুখী তীর এঁকে এটি দেখানো হয়েছে।

A বিন্দুর বামদিকে, ধরি আয় $= OG = GH$. এই আয়ে ব্যয় $= GJ < GH$ অর্থাৎ ব্যয় কম। ফলে উৎপাদন ও আয় কমবে। সংকোচনমুখী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। বামমুখী তীর এঁকে এটি দেখানো হয়েছে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে $Y = C + I$ হলেই যে আয়ের ভারসাম্য হবে—এমন বলা যায় না। কিন্তু $C + I$ রেখা যদি 45° রেখাকে বাম ও উপর থেকে ছেদ করে তাহলে $Y = C + I$ হলে ভারসাম্য হবে। অপরপক্ষে $C + I$ রেখা যদি 45° রেখাকে ডান ও নীচ দিক থেকে ছেদ করে তাহলে $Y = C + I$ হলেও ভারসাম্য হবে না।

আমাদের এই ক্ষেত্রে $C + I$ রেখার ঢাল $=$ MPC. (কারণ বিনিয়োগকে স্বয়ম্ভূত ধরা হয়েছে।)

MPC যদি এক অপেক্ষা কম হয় তাহলেই $C + I$ রেখা 45° রেখাকে বাম ও উপর দিক থেকে ছেদ করে এবং জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য হয়। অপর পক্ষে, MPC এক অপেক্ষা বেশি হলে $C + I$ রেখা 45° রেখাকে নীচ দিক থেকে ছেদ করে এবং ছেদ বিন্দুতে ভারসাম্য হয় না।

অতএব, ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্ত হল যে, MPC এক অপেক্ষা কম কিন্তু শূন্য অপেক্ষা বেশি হবে; অর্থাৎ

$$0 < MPC < 1 \text{ হবে।}$$

৪৪ **সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা:** সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সম্পর্ক সম্বন্ধে দুটি আপাত-বিরোধী উক্তি করা হয়। (ক) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদা সমান এবং (খ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদা সমান নয়। এই দুটি পরস্পর-বিরোধী উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই আমাদের বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ শব্দ দুটি দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সঞ্চয় বলতে প্রকৃত সঞ্চয় (Actual saving) অথবা পরিকল্পিত সঞ্চয় (Planned saving) বোঝায়। অনুরূপভাবে বিনিয়োগ বলতে প্রকৃত বিনিয়োগ (Actual Investment) অথবা পরিকল্পিত বিনিয়োগ (Planned Investment) বোঝায়।

প্রকৃত সঞ্চয় বলতে বোঝায় যে সঞ্চয় করা হয়ে গেছে। তেমনি প্রকৃত বিনিয়োগ বলতে বোঝায় যে বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে। অপরপক্ষে, পরিকল্পিত সঞ্চয় বলতে বোঝায় যে সঞ্চয় এখনো হয়নি, তবে হতে পারে বলে সম্ভাবনা আছে। পরিকল্পিত সঞ্চয়কে আমরা সম্ভাব্য সঞ্চয় বলতে পারি। অনুরূপভাবে, পরিকল্পিত বিনিয়োগ বলতে বোঝায় যে বিনিয়োগ এখনো হয়নি, তবে হতে পারে বলে ধরা যেতে পারে। পরিকল্পিত বিনিয়োগকে আমরা সম্ভাব্য বিনিয়োগ বলতে পারি।

(ক) প্রথম উক্তির ব্যাখ্যা: একটি দেশে কোন নির্দিষ্ট সময়ের শেষে প্রকৃত সঞ্চয় ও প্রকৃত বিনিয়োগ সর্বদা সমান হয়। প্রকৃত সঞ্চয় ও প্রকৃত বিনিয়োগের সমতা একটি অভেদ মাত্র। আমরা লিখতে পারি প্রকৃত সঞ্চয় ≡ প্রকৃত বিনিয়োগ। এটি হল প্রথম উক্তির অর্থ।

প্রকৃত অর্থে সঞ্চয় হল দেশের আয়ের সেই অংশ যা পরিবারের ভোগ ব্যয় মিটিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে। পরিবারগুলি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপাদানের সেবার যোগান দিয়ে যথাক্রমে খাজনা, মজুরী ও সুদ পায়। উৎপাদন মূল্য থেকে খাজনা, মজুরী ও সুদ দিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাই মুনাফা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের মালিকরা পেয়ে থাকেন। এই মালিকরাও পরিবারে থাকেন। তাহলে আমরা বলতে পারি—পরিবারগুলি খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা পেয়ে থাকে। দেশের মোট উৎপাদন বণ্টন পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবারগুলির মধ্যে ফিরে আসে মোট আয় হিসেবে। পরিবারগুলি এই আয় থেকে তাদের ভোগ ব্যয় মেটায়। ভোগ ব্যয় মিটিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাকেই আমরা দেশের মোট প্রকৃত সঞ্চয় বলতে পারি। অতএব **দেশের মোট প্রকৃত সঞ্চয় ≡ দেশের পরিবারগুলির প্রাপ্ত আয় – পরিবারগুলির প্রকৃত ভোগ ব্যয়।** যদি Ya = প্রকৃত আয় Ca = প্রকৃত ভোগ ব্যয় এবং Sa = প্রকৃত সঞ্চয় হয়, তাহলে আমরা পাই,

$$Sa \equiv Ya \; Ca \cdots\cdots(1)$$

আবার জাতীয় আয় থেকেই জাতীয় ব্যয় মেটানো হয়। পরিবারগুলি যে আয় পায়, তার একটি অংশ দিয়ে তারা ভোগকারী হিসেবে ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় করে। পরিবারগুলিই আবার অন্য দিক দিয়ে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক। তারা যে সব দ্রব্য উৎপাদন করে তাদের কতকগুলি ভোগ্য দ্রব্য হিসেবে পরিবারের ভোগে ব্যবহৃত হয়। বাকি দ্রব্যগুলি মূলধন-দ্রব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটাতে ব্যবহৃত হয়। মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধিকে বিনিয়োগ বলে। তাহলে দেশের ব্যয় দুরকম, যথা—ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। আমরা বলতে পারি দেশের মোট প্রকৃত ব্যয় ≡ মোট প্রকৃত ভোগ ব্যয় + মোট প্রকৃত বিনিয়োগ ব্যয়। প্রকৃত অর্থে দেশের মোট আয় ও মোট ব্যয় সর্বদা সমান। অর্থাৎ মোট প্রকৃত ব্যয় ≡ মোট প্রকৃত আয় ≡ Ya. তাহলে আমরা পাই, **প্রকৃত আয় ≡ প্রকৃত ভোগ ব্যয় + প্রকৃত বিনিয়োগ ব্যয়। অর্থাৎ**

$$Ya \equiv Ca + Ia \cdots\cdots(2)$$

অর্থাৎ $Ya - Ca \equiv Ia \cdots\cdots(3)$

তাহলে আমরা পাই,

$$Ya - Ca \equiv Sa \cdots\cdots(1)$$

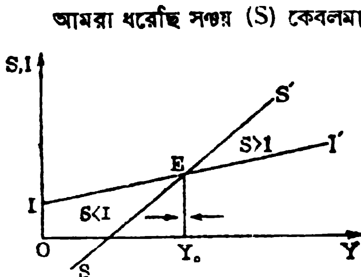
এবং $Ya - Ca \equiv Ia \cdots\cdots(3)$

এখন Sa ও Ia উভয়েই Ya – Ca এর সমান। অতএব Sa = Ia

অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সর্বদা সমান। এটি হল প্রথম উক্তির ব্যাখ্যা।

(খ) **দ্বিতীয় উক্তির ব্যাখ্যা ঃ** পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ সব সময় সমান হয় না ; যেখানে আগের ভারসাম্য দেখা দেয়—সেখানেই ওরা সমান হয়। এটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল। আমাদের নীচের রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আয় (Y) এবং উল্লম্ব অংশে সঞ্চয় (S) ও বিনিয়োগ (I) পরিমাপ করা হচ্ছে। এখানে SS′ হল পরিকল্পিত সঞ্চয় রেখা ও II′ হল পরিকল্পিত বিনিয়োগ রেখা।

আমরা ধরেছি সঞ্চয় (S) কেবলমাত্র আয়ের (Y) উপর নির্ভর করে। Y বাড়লে বা কমলে S বাড়ে বা কমে। আমাদের রেখাচিত্রে SS′ রেখাটি সেইজন্য ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। অনুরূপভাবে আমরা ধরেছি পরিকল্পিত বিনিয়োগ (I) কেবলমাত্র Y-এর উপর নির্ভর করে। Y বাড়লে I বাড়ে, Y কমলে I কমে। সেইজন্য II′ নামক পরিকল্পিত বিনিয়োগ রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।



৪.৪ রেখাচিত্র ঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা

রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে SS′ ও II′ রেখা দুটি পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E বিন্দুতে পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ সমান। অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেখা দিয়েছে। এখানে ভারসাম্য আয়স্তর = OY_0. এই আয়ে সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় সমান। কাজেই জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য থাকবে। কিন্তু E বিন্দুর ডানদিকে SS′ রেখাটি II′ রেখার উপরে আছে এবং E বিন্দুর বামদিকে নীচে আছে।

E বিন্দুর ডান দিকে S>I এবং E বিন্দুর বামদিকে S<I. তাহলে দেখা যাচ্ছে—**পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ সব সময় সমান হয় না, কেবলমাত্র ভারসাম্য অবস্থাতেই সমান হয়। এই হল দ্বিতীয় উক্তির অর্থ।** আমরা এখন এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারি।

সমাজে পরিকল্পিত অর্থে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সব সময় সমান হয় না, তার কারণ সমাজের মধ্যে যারা সঞ্চয় করে তারাই বিনিয়োগ করে না ; আবার যারা বিনিয়োগ করে তাদের সকলেই সঞ্চয় করে না। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ দুটি পৃথক কর্ম, পৃথক ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদিত হয় বলেই যোগাযোগের অভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না।

যদি সঞ্চয়কারীরাই বিনিয়োগ করত তাহলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা

রক্ষার কোন সমস্যা থাকত না। ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন—পরিকল্পিত অর্থেও সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হতে পারে। তাঁদের এই কথা মনে করার কারণ ক্লাসিকাল যুগে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিকেরাই পুঁজিপতি হিসেবে সঞ্চয় করতেন এবং তাঁরাই সেই সঞ্চয় বিনিয়োগ করতেন। কাজেই সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে সমতা থাকত। কখনই সমতার অভাব দেখা দিত না।

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় সঞ্চয় করে ভোগকারী পরিবারগুলি। সেই সঞ্চয় তারা ব্যাঙ্কে জমা দেয়। ব্যাঙ্ক থেকে বিনিয়োগকারীরা সেই অর্থ ঋণ হিসেবে নিয়ে যায় ও বিনিয়োগ করে। অনেক পরিবার আবার সঞ্চিত অর্থকে ব্যাঙ্কে নিয়ে যায় না। এই অবস্থায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ যে সর্বদা পরস্পর সমান হবে না তা সহজেই বোঝা যায়।

প্রশ্নাবলী

১। জাতীয় আয় পরিমাপ করা ও জাতীয় আয় নির্ধারণ করার পার্থক্য কী?

২। কোন দেশে সরকারের অর্থনৈতিক কাজ ও বৈদেশিক বাণিজ্য না থাকলে কীভাবে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য দেখা দেয় আলোচনা কর।

৩। জাতীয় আয়ের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? কীভাবে এই ভারসাম্য দেখা দেয়?

৪। জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের শর্ত কী? এই শর্তগুলির আলোচনা কর।

৫। (ক) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হলে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেখা দেয়,

(খ) জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেখা দিলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হয়—এই দুটি উক্তির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক এবং কেন ঠিক যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৬। তুমি কি মনে কর যে, পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ সমান হলেই জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেখা দেয়? যুক্তিসহ আলোচনা কর। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান না হলে কী হয়?

৭। (ক) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সব সময় সমান,

(খ) সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সব সময় সমান নয়—এই দুটি আপাত-বিরোধী উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধান কর।

৮। প্রকৃত সঞ্চয়, পরিকল্পিত সঞ্চয়, প্রকৃত বিনিয়োগ ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ—এই শব্দগুলির ব্যাখ্যা কর এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৯। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(১) পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ কখন সমান হয়?

(২) পরিকল্পিত সঞ্চয় পরিকল্পিত বিনিয়োগের চেয়ে বেশি হলে কী হয়? কম হলে কী হয়?

(৩) "প্রকৃত অর্থে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পর সমান"—উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

(৪) আয়ের ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত কী? এই শর্তটি কেন প্রয়োজনীয় শর্ত, কেন যথেষ্ট শর্ত নয়?

(৫) আয়ের ভারসাম্যের যথেষ্ট শর্ত কী? সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(৬) প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান শূন্য অপেক্ষা বেশি এবং এক অপেক্ষা কম হওয়ার গুরুত্ব কী?

(৭) কোন দেশের জাতীয় আয় নির্ধারক বিষয়গুলি কী কী হতে পারে বলে তোমার মনে হয়?

পঞ্চম অধ্যায় | ভোগতত্ত্ব

৫.১ **ভোগতত্ত্বের গুরুত্ব:** বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কীন্‌স্ সমষ্টিগত বা সামগ্রিক ভোগতত্ত্বের উপর প্রথম বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। তাঁর অবদানের জন্যই এই তত্ত্বটি কীন্‌সীয় ভোগতত্ত্ব নামে বিখ্যাত। কীন্‌সের আগে সামগ্রিক অর্থনীতিতে ক্লাসিকাল তত্ত্ব দিয়ে সব কিছু ব্যাখ্যা করা হত। তাঁদের মতে কোন দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান ও চাহিদা সব সময় সমান হয়। যোগান বাড়লেই চাহিদা বাড়ে। কারণ যোগান বাড়লে বুঝতে হবে নিয়োগ বেড়েছে। নিয়োগ বাড়লে পরিবারগুলির আয় বাড়বে। সেই আয় থেকেই আসবে অতিরিক্ত চাহিদা। এইভাবে যোগান যত বাড়বে ততই চাহিদা বাড়বে। কাজেই উৎপাদকদের পক্ষে বিক্রয় করার সমস্যা বা অত্যুৎপাদনের সমস্যা (Problem of over-production) থাকতেই পারে না। অর্থাৎ কোন দেশে কখনই মন্দা দেখা দিতে পারে না। বেকার সমস্যাও থাকতে পারে না। অথচ কীন্‌স যখন তাঁর বিখ্যাত "সাধারণ তত্ত্ব" রচনায় নিমগ্ন তখন পৃথিবীতে প্রায় সব দেশে মন্দার ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করে উঠতে পারছে না। চাহিদা পড়ে গেছে। জিনিসপত্রের দাম কম হওয়া সত্ত্বেও কেউ কিনতে পারছে না। কেন এমন হল? এর ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্যই কীন্‌স্ তাঁর ভোগতত্ত্ব প্রণয়ন করেন।

কীন্‌সের মতে সাধারণ ভোগব্যয় নির্ভর করে আয়স্তরের উপর। ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন—দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা নির্ভর করে সুদের হারের উপর। সুদের হার বেশি হলে লোকে সঞ্চয়ে উৎসাহী হন। তখন তাঁরা ভোগ

কমিয়ে বেশি সঞ্চয় করেন। আবার সুদের হার কমলে সঞ্চয় কমে ও ভোগ বাড়ে। কীন্‌স দেখলেন ভোগের সঙ্গে আয়ের সম্পর্কই হল সব থেকে বেশি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুদের হারের সঙ্গে ভোগব্যয়ের তেমন কোন সম্পর্ক নেই। ভোগ নির্ভর করে প্রধানত আয়ের উপর। আয় বাড়লে ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে, কাজেই ভোগব্যয় বাড়ে। কিন্তু, কীন্‌সের মতে, আয় যত বাড়ে, ভোগ তার চেয়ে কম বাড়ে। বাকি কিছু সঞ্চয় হয়ে যায়। সঞ্চয়ের জন্যই ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা কম হয়। এখন সঞ্চিত অর্থ যদি বিনিয়োগ করা হয়, তাহলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমলেও মূলধন দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। ফলে অত্যুৎপাদনের সমস্যা থাকে না। সঞ্চয় যখন বিনিয়োগ হয় না, তখন অত্যুৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয়। এ সব কথা আমরা কীন্‌সের ভোগতত্ত্ব থেকেই জানতে পারি। অতএব কীন্‌সের ভোগতত্ত্বের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

তাছাড়া আমরা জানি, দেশের আয় নির্ধারিত হয় প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার দ্বারা। প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা হল কীন্‌সের ভোগ তত্ত্বেরই একটি অংশ। দেশের আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রেও ভোগতত্ত্বের গুরুত্ব আছে।

কীন্‌স্ "গুণকতত্ত্ব" নামে আর একটি তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছিলেন। গুণকতত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে—দেশের বিনিয়োগ যত বাড়বে, দেশের আয় তার কয়েকগুণ বেশি বাড়বে। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধি হবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি গুণিতক। এই গুণকের মানও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার উপর নির্ভর করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কীন্‌সের ভোগতত্ত্ব একাধিক দিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫.২ ভোগ অপেক্ষক (Consumption function) কাকে বলে ?

কোন দেশের সামগ্রিক ভোগব্যয় কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর কেমনভাবে নির্ভর করে সে সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক অনুমানকেই ভোগপ্রকরণ বলা হয়। দেশের সামগ্রিক ভোগব্যয় একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দেশের মোট আয়, দেশের সম্পত্তির পরিমাণ, সুদের হার, আয়ের বণ্টন, ইত্যাদি।

ধরি C = ভোগব্যয়,
Y = আয়,
A = সম্পত্তির পরিমাণ (Assets),
r = সুদের হার,
d = আয়ের বণ্টন।

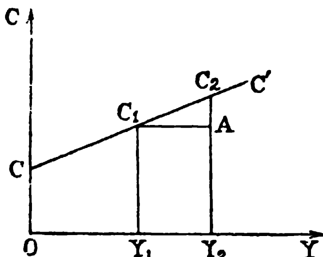
তাহলে আমরা বলি C নির্ভর করে Y, A, r, d ইত্যাদি বিষয়ের উপর। এই বিষয়গুলিকে স্বাধীন বিষয় ধরে এদের সঙ্গে ভোগব্যয়ের পরিমাণের আঙ্কিক সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। এই সম্পর্ককে ভোগ প্রকরণ (Consumption function) বলা হয়। $C = F(Y, A, r, d)$ হল ভোগ প্রকরণের সাধারণ রূপ। অতএব কোন দেশের সামগ্রিক ভোগব্যয় যে-সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেই সব বিষয়ের সঙ্গে সামগ্রিক ভোগব্যয়ের আঙ্কিক সম্পর্ককে ভোগ প্রকরণ বলা হয়।

আমরা যদি ধরে নিই যে, দেশের আয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহ স্থির আছে তাহলে সামগ্রিক ভোগব্যয় কেবলমাত্র মোট আয়ের উপর নির্ভর করবে। আমরা পাব C = C (Y). এটি হল **সাধারণ** ভোগ প্রকরণের **একটি বিশেষ রূপ।** সাধারণ ভাষায় ভোগ প্রকরণ বলতে এই বিশেষ ভোগ প্রকরণটিকেই বোঝায়।

এখানে C বলতে বাস্তব ভোগব্যয় এবং Y বলতে বাস্তব আয় বোঝায়। আবার, ভোগব্যয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দেশের পরিবারসমূহ। এখানে ভোগব্যয় বলতে পরিবারগুলির পরিকল্পিত ভোগব্যয় (Planned consumption expenditure) বোঝায়। পরিবারগুলি উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে যে আয় পাওয়ার আশা করে তাকে প্রত্যাশিত আয় (Expected income) বলা হয়। এই প্রত্যাশিত আয়ের উপর ভিত্তি করে পরিবারগুলি ভোগ ব্যয়ের পরিকল্পনা করে। আমরা বলতে পারি, **দেশের পরিবারগুলির পরিকল্পিত ভোগব্যয় প্রত্যাশিত আয়ের উপর নির্ভর করে। প্রত্যাশিত ও পরিকল্পিত ভোগব্যয়ের এই নির্ভরশীলতার সূত্রটিকেই বিশেষ অর্থে ভোগ প্রকরণ বলা হয়।**

৫.৩ **ভোগরেখা কাকে বলে? এর আকৃতি কীরূপ হয়?**

বিশেষ ভোগ প্রকরণ থেকে জানা যায় C = C (Y). এখানে C = পরিকল্পিত ভোগব্যয় এবং Y = প্রত্যাশিত আয়। এই ভোগ প্রকরণটির মধ্যে Y ও C-এর মধ্যে যে সম্পর্কের কথা বলা হয়, সেই সম্পর্কটি যদি স্পষ্টরূপে দেওয়া থাকে তাহলে আমরা তাতে Y-এর বিভিন্ন মান বসিয়ে C-এর বিভিন্ন মান পাব। Y ও C-এর সেই সব সম্মিলনগুলিকে রেখাচিত্রে বসিয়ে আমরা যে রেখা পাব তার নাম ভোগরেখা। অর্থনীতিতে বলা হয় আয় ও ভোগ একমুখী সম্পর্কে আবদ্ধ, অর্থাৎ Y বাড়লে বা কমলে C বাড়বে বা কমবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ভোগরেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হবে। ভোগরেখা সরল কিংবা বক্ররেখা হতে পারে। আমরা এখানে ভোগরেখাকে সরলরেখা বলে ধরে নেব। ৫.১ নং রেখাচিত্রে CC' **হল** একটি সরল-রৈখিক ভোগরেখা।



৫.১ রেখাচিত্র : মোট ভোগরেখা

এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে প্রত্যাশিত আয় (Y) এবং উল্লম্ব অক্ষে পরিকল্পিত ভোগ ব্যয় (C) পরিমাপ করা হয়েছে। O হল মূলবিন্দু। এখানে আয় শূন্য। কিন্তু ভোগ ব্যয় = OC. অর্থাৎ আয় শূন্য হলেও ভোগব্যয় শূন্য হয় না। ভোগব্যয় শূন্য হলে মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

OC পরিমাণ ভোগ ব্যয়কে স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় (Autonomous Consumption) বলা হয়, কারণ এই ভোগব্যয় আয়ের উপর নির্ভর করে না। এরপর আয় বাড়লে

ভোগব্যয় বাড়ে। যেমন, আয় যখন OY_1, তখন ভোগব্যয় C_1Y_1. আবার আয় যখন OY_2, তখন ভোগব্যয় C_2Y_2. এখানে $OY_2 > OY_1$ এবং $C_2Y_2 > C_1Y_1$. এখানে আয়ের বৃদ্ধি $= Y_1Y_2 = C_1A$ এবং ভোগব্যয়ের বৃদ্ধি $= AC_2$, অর্থাৎ আয় যখন C_1A পরিমাণে বাড়ে, তখন ভোগব্যয় বাড়ে AC_2 পরিমাণে।

৫.৪ **গড় ভোগ প্রবণতা (Average Propensity to Consume or APC) ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (Marginal Propensity to Consume or MPC) কাকে বলে ?**

ভোগ করার ইচ্ছাকে ভোগপ্রবণতা বলা হয়। আয় থেকেই এই প্রবণতার উদ্ভব হয়। সেইজন্য ভোগপ্রবণতাকে আয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। ভোগ প্রবণতাকে ভোগব্যয়ের পরিমাণ দিয়ে বোঝানো হয়। একদিকে থাকে আয়ের পরিমাণ, অন্যদিকে থাকে ভোগের পরিমাণ। ভোগব্যয়ের পরিমাণকে আয়ের পরিমাণের সঙ্গে দুভাবে সম্পর্ক যুক্ত করা হয় এবং সেই মত গড় প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা নামক দুটি ধারণার কথা বলা হয়।

(ক) গড় ভোগপ্রবণতা (APC) :

ভোগ প্রকরণ থেকে জানা যায় যে—দেশের পরিকল্পিত ভোগব্যয় দেশের মোট প্রত্যাশিত বা সম্ভাব্য আয়ের উপর নির্ভর করে। মোট সম্ভাব্য আয় ও মোট পরিকল্পিত ভোগব্যয়ের পরিমাণ যদি জানা যায় তাহলে মোট ভোগব্যয়কে মোট আয় দিয়ে ভাগ করলে প্রতি একক আয় থেকে উদ্ভূত ভোগ ব্যয়ের যে হিসেব পাওয়া যায়—তাকে গড় ভোগপ্রবণতা বলা হয়।

অর্থাৎ—প্রতি একক সম্ভাব্য আয় থেকে যে পরিমাণ পরিকল্পিত ভোগব্যয় হতে পারে তাকে গড় ভোগ প্রবণতা বলা হয়। যদি C = মোট ভোগব্যয় এবং Y = মোট আয় হয়, তাহলে গড় ভোগপ্রবণতা $(APC) = \frac{C}{Y}$ হবে। যেমন, কোন দেশের আয় যদি ৬০০০ কোটি টাকা হয় এবং মোট ভোগব্যয় ৪০০০ কোটি টাকা হয়, তাহলে গড় ভোগপ্রবণতা $= \frac{\text{৪০০০ কোটি টাকা}}{\text{৬০০০ কোটি টাকা}} = \frac{৪}{৬} = \frac{২}{৩}$। গড় ভোগ প্রবণতা একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা (pure number)। (কারণ ভগ্নাংশের উপরে ও নীচে "কোটি টাকা" পরস্পর কেটে যাবে, টাকার অংকে APC-র মান প্রকাশিত হবে না।)

(খ) প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) :

দেশের ভোগ প্রকরণ থেকে জানা যায়—মোট পরিকল্পিত ভোগব্যয় দেশের সম্ভাব্য আয়ের উপর নির্ভর করে। অতএব সম্ভাব্য আয়ের পরিবর্তন হলে পরিকল্পিত ভোগব্যয়ের পরিবর্তন হবে। ভোগ প্রকরণে বলা হয় যে—আয় বাড়লে বা কমলে, ভোগব্যয়ও বাড়বে বা কমবে। যদি আয়ের পরিবর্তন $= \Delta Y$ হয়, এবং

তার ফলে উদ্ভূত অতিরিক্ত ভোগব্যয় = ΔC হয়, তাহলে অতিরিক্ত এক একক সম্ভাব্য আয় থেকে অতিরিক্ত ভোগব্যয় হবে $\frac{\Delta C}{\Delta Y}$ অতিরিক্ত ভোগব্যয় ও অতিরিক্ত আয়ের এই অনুপাতকে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) বলা হয়।

অতএব, **অতিরিক্ত এক একক সম্ভাব্য আয়ের পরিবর্তন থেকে যে অতিরিক্ত ভোগব্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে বলে ধরা হয় তাকে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) বলা হয়।**

$$\text{প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা} = \frac{\text{ভোগব্যয়ের বৃদ্ধি}}{\text{আয়ের বৃদ্ধি}} = \frac{\Delta C}{\Delta Y}.$$

যদি দেশের পরিবারগুলির আয় ৪০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় এবং তা থেকে পরিবারগুলি যদি ৩০০ কোটি টাকা ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় করে তাহলে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা হবে $= \frac{\text{৩০০ কোটি টাকা}}{\text{৪০০ কোটি টাকা}} = \frac{৩}{৪}$ । প্রান্তিক ভোগ প্রবণতাও একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা।

৫.৫ গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার পরিমাণ :

(ক) APC-র মান

আমরা জানি গড় ভোগ প্রবণতা (APC)

$$= \frac{\text{মোট ভোগব্যয়}}{\text{মোট আয়}} = \frac{C}{Y}. \quad \text{অতএব } APC = \frac{C}{Y}.$$

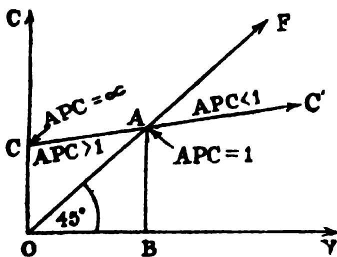
এই সংজ্ঞাটি থেকে বলা যায়

(১) যদি $C = 0$ হয় তাহলে $APC = 0$ হবে। কিন্তু বাস্তবে C শূন্য হয় না। কাজেই $APC = 0$ এই মানটি আমরা একটি বিরল ঘটনা বলতে পারি।

(২) যদি $C = Y$ হয়, তাহলে $APC = 1$ হবে,

(৩) যদি $C < Y$ হয়, তাহলে $APC < 1$ হবে,

(৪) যদি $C > Y$ হয়, তাহলে $APC > 1$ হবে।



৫.২ রেখাচিত্র : গড় ভোগপ্রবণতার মান

(৫) যদি $Y = 0$ হয় এবং C ধনাত্মক হয়, তাহলে $APC = \infty$ হবে। অতএব আমরা বলতে পারি APC শূন্যের চেয়ে বড় হবে। ঊর্ধ্বতম পক্ষে APC অনন্তও হতে পারে। তবে বাস্তবে APC একের চেয়ে বেশি বা কম হবে। আমরা ভোগ রেখা থেকেও গড় ভোগ প্রবণতার বিভিন্ন মান নির্ণয় করতে পারি। পাশের রেখাচিত্রে CC' হল একটি সরলরৈখিক ভোগ রেখা। এখানে OF হল একটি 45° রেখা। এই রেখার উপর কোন বিন্দুতে লম্বদূরত্ব ও অনু-

ভূমিক দূরত্ব সমান। অর্থাৎ OF রেখার চাল এক। যেমন, OF রেখার A বিন্দুতে লম্বদূরত্ব $= AB$ এবং অনুভূমিক দূরত্ব $= OB$ কিন্তু $\angle AOB = 45^\circ$, $\angle ABO = 90^\circ$, অতএব $\angle OAB = 45^\circ$ অর্থাৎ $\triangle AOB$ ত্রিভুজের OB বাহু $=$ AB বাহু। কাজেই OF রেখার ঢাল $= \frac{AB}{OB} = 1$ হবে।

CC′ রেখার উপর A একটি বিন্দু। A বিন্দুতে আয় $= OB$, ভোগব্যয় $= AB$. এখানে $OB = AB$. অতএব এখানে $APC = \frac{AB}{OB} = \frac{AB}{AB} = 1$. অতএব CC রেখা যে বিন্দুতে 45° রেখাকে ছেদ করে সেই ছেদ বিন্দুতে $APC = 1$ হবে।

A বিন্দুর বাম দিকে ভোগব্যয় আয় অপেক্ষা বেশি। কারণ এখানে CC′ রেখা OF রেখার উপরে থাকে। অথাৎ $C > Y$. কাজেই A বিন্দুর বাম দিকে $APC > 1$ হবে। আবার, A বিন্দুর ডান দিকে আয় অপেক্ষা ভোগব্যয় কম। কাজেই $APC < 1$ হবে। তাহলে আমরা পাই,

ভোগরেখা যে বিন্দুতে 45° রেখাকে ছেদ করে সেই ছেদবিন্দুতে $APC = 1$, সেই ছেদবিন্দুর বাম দিকে $APC > 1$ এবং ডান দিকে $APC < 1$ হবে। অতএব CC ভোগরেখার বাম দিক থেকে ডান দিকে যত যাওয়া যাবে, ততই APC কমবে।

(খ) MPCর মান :

আমরা জানি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $= \frac{\text{ভোগব্যয়ের পরিবর্তন}}{\text{আয়ের পরিবর্তন}} = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$.

এই সংজ্ঞা থেকে আমরা প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার নিম্নলিখিত মানগুলি পেতে পারি :

(১) যদি $\Delta C = O$ হয়, তাহলে $MPC = O$ হবে।

(২) যদি $\Delta C < O$ (ঋণাত্মক) হয়, তাহলে $MPC < O$ হবে। কিন্তু ঋণাত্মক ভোগ অর্থহীন। কাজেই $\Delta C < O$ হতে পারে না। অর্থাৎ MPC কখনই ঋণাত্মক হবে না। অর্থাৎ MPC কখনই শূন্যের চেয়ে ছোট হবে না।

(৩) যদি $\Delta C = \Delta Y$ হয়, তাহলে $MPC = 1$ হবে।

(৪) যদি $\Delta C > \Delta Y$ হয়, তাহলে $MPC > 1$ হবে। কিন্তু ΔC কখনই ΔY অপেক্ষা বেশি হতে পারে না।

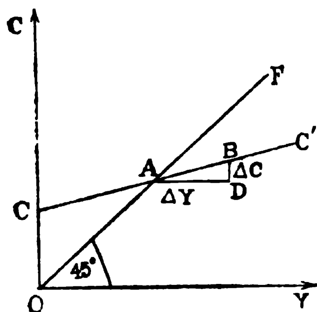
(৫) অর্থাৎ MPC কখনই একের চেয়ে বেশী হতে পারে না। যদি $\Delta C < \Delta Y$ হয়, তাহলে $MPC < 1$ হবে।

তাহলে আমরা পাই, MPC শূন্যের চেয়ে ছোট এবং একের চেয়ে বড় হবে না। MPC-র নিম্নতম মান শূন্য এবং উর্ধ্বতম মান এক হতে পারে। MPC সব সময় শূন্য ও একের মধ্যে থাকবে। আমরা বলতে পারি $O < MPC < 1$.

ভোগরেখা থেকেও আমরা MPC-র মান সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। নীচের রেখাচিত্রে CC′ হল একটি সরলরৈখিক ভোগ রেখা। এর উপর A ও B নামক দুটি বিন্দু নেওয়া হল। A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে গেলে আয়ের বৃদ্ধি হয় AD পরিমাণে এবং ভোগব্যয়ের বৃদ্ধি হয় DB পরিমাণে অর্থাৎ $\Delta C = DB$ ও $\Delta Y = AD$, অতএব $MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{BD}{AD}$ = AB রেখার ঢাল = CC′ রেখার ঢাল।

অতএব ভোগরেখা যদি সরলরেখা হয় তাহলে MPC হবে সেই রেখার ঢাল।

এই রেখাচিত্রে OF রেখাটি হল 45° রেখা। এর ঢাল একের সমান। এখন OF রেখার সঙ্গে তুলনা করে আমরা MPC-র মান সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি।



৫.৩ রেখাচিত্র : প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার জ্যামিতিক পরিমাপ।

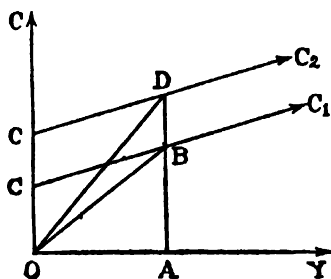
(১) MPC যেহেতু একের চেয়ে কম হয়, সেইজন্য CC′ রেখার ঢাল একের চেয়ে কম হবে। অর্থাৎ CC′ রেখাটি 45° রেখাকে বাম দিক থেকে এবং উপর দিক থেকে ছেদ করবে।

(২) যদি MPC = O হয়, তাহলে CC′ রেখাটি আয়-অক্ষের সমান্তরাল হবে।

(৩) যদি MPC = 1 হয়, তাহলে CC′ রেখাটি OF রেখার সমান্তরাল হবে, কারণ সেক্ষেত্রে CC′ রেখা ও OF রেখার ঢাল সমান হবে।

(৪) যদি MPC > 1 হয় তাহলে CC′ রেখাটি ডান দিক থেকে ও নীচ দিক থেকে OF রেখাকে ছেদ করবে।

৫.৬ **ভোগরেখার অবস্থান ও ঢাল :** মোট ভোগরেখার দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল ভোগরেখার অবস্থান (position) এবং অপরটি হল ভোগরেখার ঢাল (slope)। **ভোগরেখার অবস্থান থেকে আমরা APC জানতে পারি এবং ভোগরেখার ঢাল থেকে আমরা MPC জানতে পারি।** দুটি ভোগরেখা যদি পরস্পর সমান্তরাল হয়, তাহলে তাদের ঢাল সমান হবে; অর্থাৎ—তাদের MPC সমান হবে। কিন্তু যে ভোগরেখাটি উপরে থাকবে তার APC নীচের রেখাটির APC অপেক্ষা বেশি হবে। আমরা এখানে APC ও MPC সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সম্পর্কগুলি পাই :—(১) MPC যদি



৫.৪ রেখাচিত্র : ভোগরেখার অবস্থান

সমান থাকে এবং APC বাড়ে তাহলে ভোগরেখা সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যাবে। অপরপক্ষে, MPC সমান থেকে যদি APC কমে, তাহলে ভোগরেখা সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যাবে। এটি ৫.৪ রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে CC_1 ও CC_2 হল দুটি সমান্তরাল ভোগরেখা। অতএব এদের MPC সমান।

ধরা যাক আয় (Y) = OA. এই আয়ে CC_1 রেখায় মোট ভোগ (C) হবে AB, কিন্তু CC_2 রেখায় মোট ভোগ হবে AD.

CC_1 রেখায় $APC = \frac{AB}{OA} = OB$ রেখার ঢাল

CC_2 রেখায় $APC = \frac{AD}{OA} = OD$ রেখার ঢাল

এখানে $AD > AB$। অতএব $\frac{AD}{OA} > \frac{AB}{OA}$.

অর্থাৎ CC_2 রেখার APC, CC_1 রেখার APC অপেক্ষা বেশি। তাহলে আমরা বলতে পারি—**ভোগরেখার অবস্থান APC নির্ধারণ করে। ভোগরেখার অবস্থান যত উপরে হবে APC তত বেশি হবে।**

আমরা জানি—**ভোগরেখার ঢাল বলতে MPC বোঝায়। ঢাল যত কমবে, MPC তত কমবে। ঢাল যত বাড়বে MPC তত বাড়বে।**

(২) ভোগরেখার উপর কোন বিন্দুতে APC পরিমাপ করতে হলে ভোগরেখার উপর সেই নির্দিষ্ট বিন্দুকে রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। সেই রেখার ঢাল = APC হয়। যেখানে ভোগরেখাটি নিজেই রেখাচিত্রের মূলবিন্দু থেকে বহির্গত হয়, সেখানে ভোগরেখাটির ঢালই APCর সমান হয়। আবার ভোগরেখার ঢাল হল MPC। কাজেই আমরা বলতে পারি, ভোগরেখাটি রেখাচিত্রের মূল বিন্দু থেকে বহির্গত হলে এবং সরলরেখা হলে সেই রেখার ঢাল দ্বারা APC ও MPC উভয়েই নির্ধারিত হবে। সেক্ষেত্রে APC = MPC হবে। অপরপক্ষে ভোগরেখা যদি মূলবিন্দুর উপর থেকে অঙ্কিত হয়, তাহলে APC ও MPC পৃথক হবে।

(৩) ভোগরেখাটি যদি সরলরেখা হয় এবং রেখাচিত্রের মূলবিন্দুর উপর কোন বিন্দু থেকে অংকিত হয়, তাহলে ঐ রেখার উপর সর্বত্র MPC সমান হবে, কিন্তু ভোগরেখার বামদিক থেকে ডানদিকে APC ক্রমাগত কমবে।

৫.৭ ভোগরেখার সমীকরণ :

ভোগপ্রকরণে আয়ের সঙ্গে ভোগব্যয়ের সম্পর্ক দেখানো হয়। এখানে ভোগব্যয় (C) হল নির্ভরশীল চলমান (Dependent variable) এবং আয় (Y) হল অনির্ভরশীল চলমান (Independent variable)। ভোগ প্রকরণটিতে এই সম্পর্কটি যদি স্পষ্টরূপে (Explicitly) দেওয়া থাকে তাহলে ভোগ-সমীকরণ

পাব। এই সমীকরণে নির্ভরশীল চলমান হিসেবে C থাকবে সমান চিহ্নের বামদিকে এবং ডান দিকে থাকবে Y. ভোগব্যয় সাধারণত আয়ের থেকে কম হয়। যেমন, কারো আয় ১০০ টাকা হলে তার ভোগব্যয় যদি ৮০ টাকা হয় তাহলে আমরা বলতে পারি $C=\frac{4}{5}Y$. $\left(\frac{C}{Y}=\frac{80}{100}=\frac{4}{5}\therefore C=\frac{4}{5}Y\right)$. C যদি Y এর অর্ধেক হয়, তাহলে $C=\frac{1}{2}Y$ হবে, ইত্যাদি। আমরা যদি ধরে নিই যে, C হল Y-এর a অংশ এবং আরো কিছু টাকা (ধরা যাক b টাকা) তাহলে ভোগ সমীকরণ হবে $C=aY+b$. এখানে $Y=O$ হলে $C=b$ হবে। অতএব b হল ভোগব্যয়ের সেই অংশ যা আয়ের উপর নির্ভর করে না। একে আমরা আয়-নিরপেক্ষ বা স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয় (Autonomous consumption expenditure) বলতে পারি।

সমীকরণের b সম্বন্ধে বলার পর a সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। a হল আয়ের সেই ভগ্নাংশ যা ভোগের কাজে ব্যবহৃত হয়। যদি আয় ΔY পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহলে ভোগব্যয় ΔC পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। এখানে $\Delta C = a\Delta Y$. তাহলে আমরা পাই, $\Delta C=a\Delta Y$, এখন উভয় পক্ষকে ΔY দ্বারা ভাগ করে পাই, $\frac{\Delta C}{\Delta Y}=a=MPC$. অর্থাৎ সমীকরণের a হল আয় জাত প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (Marginal propensity to consume out of real income).

৫.৮ গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার পার্থক্য :

গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি করতে পারি :

(১) সংজ্ঞাগত পার্থক্য :

গড় ভোগ প্রবণতা (APC) হল প্রতি একক সম্ভাব্য আয় (Y) থেকে সম্ভাব্য ভোগব্যয় (C). প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) হল অতিরিক্ত এক একক আয় থেকে অতিরিক্ত ভোগব্যয়। অর্থাৎ $APC=\frac{C}{Y}$, $MPC=\frac{\Delta C}{\Delta Y}$. অন্যভাবে বলা যায়, **APC দ্বারা ভোগের স্তর বোঝায়, কিন্তু MPC দ্বারা বোঝায় আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভোগের পরিবর্তনের হার।**

(২) মান-গত পার্থক্য :

$APC=\frac{C}{Y}$. যদি $C=O$ হয়, তাহলে $APC=O$ হবে। সাধারণত $C=O$ হয় না, কাজেই APC শূন্য হয় না। আবার, $C=Y$ হলে, $APC=1$ হবে, $C>Y$ হলে $APC>1$ এবং $C<Y$ হলে $APC<1$ হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে APC সাধারণত শূন্যের চেয়ে বেশি যে-কোন মান নিতে পারে। APC একের চেয়ে ছোট, একের সমান, আবার একের চেয়ে বড়ও হতে পারে।

$MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y}$. যদি $\Delta C < O$ হয়, তাহলে $MPC < O$ হবে, কিন্তু $\Delta C < O$ হতে পারে না। অতএব $MPC < O$ হবে না। যদি $\Delta C = O$ হয়, তাহলে $MPC = O$ হবে। যদি $\Delta C < \Delta Y$ হয় কিংবা $\Delta C = \Delta Y$ হয়, তাহলে $MPC < 1$ কিংবা $MPC = 1$ হবে, যদি $\Delta C > \Delta Y$ হয়, তাহলে $MPC > 1$ হবে কিন্তু ΔY থেকে তার চেয়ে বেশি ভোগব্যয় হওয়া অসম্ভব। কাজেই $MPC > 1$ হতে পারে না। অতএব MPC শূন্যের চেয়ে ছোট এবং একের চেয়ে বড়ো হতে পারে না। MPC-র নিম্নতম মান শূন্য এবং ঊর্ধ্বতম মান এক। আমরা লিখি $O < MPC \leqslant 1$. APC কিন্তু সহজেই একের চেয়ে বড় হতে পারে। আবার কোন দেশের মোট ভোগব্যয় যেহেতু কখনই শূন্য হতে পারে না, অতএব APC শূন্য হতে পারে না। তাহলে আমরা বলতে পারি—APC শূন্যের চেয়ে বড়ো হতে পারে। একের চেয়েও বড়ো হতে পারে। অতএব APC-র মান MPC-র চেয়ে বেশি হয়। APC যে MPC-র বেশি হয় সেটি ভোগ সমীকরণ থেকেও প্রমাণ করা যায়। আমরা যদি একটি সরলরৈখিক (Linear) ভোগ সমীকরণের উদাহরণ নিই, তাহলে পাই—

$C = aY + b$. $(a > o, b > o)$ এখানে a হল MPC, b হল স্বয়ম্ভূত ভোগ (Autonomous Consumption). এখন উভয় পক্ষকে Y দিয়ে ভাগ করে আমরা পাই—

$$\frac{C}{Y} = \frac{aY}{Y} + \frac{b}{Y}$$

অর্থাৎ $$\frac{C}{Y} = a + \frac{b}{Y}$$

এখানে $$\frac{C}{Y} = \frac{\text{মোট ভোগব্যয়}}{\text{মোট আয়}} = APC$$

$a = MPC$. তাহলে আমরা পাই $APC = MPC + \frac{b}{Y}$. যতক্ষণ $\frac{b}{Y}$ শূন্যের চেয়ে বেশি থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত APC MPC অপেক্ষা বড় হবে। অর্থাৎ **APC-র মান MPC-র মানের থেকে বেশী হয়।**

যদি $b = o$ হয়, তাহলে ভোগ সমীকরণটি হবে $C = aY$. সেখানে $\frac{C}{Y} = a$ অর্থাৎ $APC = MPC$ হবে। অতএব $APC > MPC$ হবে।

(৩) **রেখাচিত্রগত পার্থক্য :**

রেখাচিত্রে যে ভোগরেখা অংকন করা হয়, তার দুটি বিষয় থাকে, একটি হল ভোগরেখার অবস্থান (Position) এবং অপরটি হল ভোগরেখার ঢাল (Slope). ভোগরেখার অবস্থান থেকে APC জানা যায় এবং ভোগরেখার ঢাল থেকে MPC

জানা যায়। ভোগরেখা যত উঁচুতে থাকে, APC ততই বেশি হয় বা বেড়ে যায়। বিপরীতক্রমে, ভোগরেখা যতই নীচে নেমে যায়, ততই APC কমে যায়। ৫.৪ নং রেখাচিত্রে এটি দেখানো হয়েছে।

৫.৪ নং রেখাচিত্রে CC_1 ও CC_2 দুটি ভোগরেখা। CC_2 রেখাটি CC_1 রেখার চেয়ে উঁচুতে আছে। কাজেই CC_2 রেখার APC, CC রেখার APC অপেক্ষা বেশি হবে। যে-কোন একটি নির্দিষ্ট আয় ধরে নিলে দেখা যাবে, সেই নির্দিষ্ট আয়ে CC_2 রেখায় ভোগব্যয় CC_1 রেখা অপেক্ষা বেশি হয়। আয় যদি OA ধরা হয়, তাহলে OA পরিমাণ আয় থেকে CC_1 রেখায় ভোগব্যয় হবে AB, কিন্তু CC_2 রেখায় ভোগব্যয় হবে AD. অতএব CC_2 রেখাতেই গড়ে প্রতি একক আয় থেকে বেশি ভোগব্যয় হবে। অর্থাৎ CC_2 রেখাতে APC, CC_1 রেখা থেকে বেশি হবে।

ভোগরেখার অবস্থান থেকে যেমন APC জানা যায়, তেমনি ভোগরেখার ঢাল থেকে MPC জানা যায়। যে ভোগরেখার ঢাল বেশি, তার MPC বেশি, যে ভোগরেখার ঢাল কম, তার MPC কম হবে। দুটি ভোগরেখা যদি সমান্তরাল হয়, তাহলে তাদের ঢাল সমান হবে, অর্থাৎ তাদের MPC সমান হবে। আমাদের ৫.৪ নং রেখাচিত্রে CC_1 ও CC_2 দুটি সমান্তরাল ভোগরেখা। কাজেই ওদের ঢাল সমান হবে, সুতরাং ওদের MPC সমান হবে।

(৪) **বিষয়গত পার্থক্য :**

কোন দেশের APC যে-সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেই সব বিষয়গুলি এক ধরনের বিষয় এবং দেশের MPC যে-সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলি অন্য ধরনের বিষয়। আমরা বলি APC নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, সরকারী নিয়ম-কানুন, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানাদির মত বস্তুগত বিষয়ের উপর, কিন্তু MPC নির্ভর করে বিভিন্ন আভ্যন্তর বিষয়ের উপর। পরিবারের ভোগ-স্পৃহা, সঞ্চয়-স্পৃহা, আর্থিক সচ্ছলতার প্রতি মনোভাব প্রভৃতি ব্যক্তিগত বিষয়গুলি এদের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট আয়ের কী পরিমাণ ভোগব্যয়ে লাগে—তার দ্বারা APC নির্ধারিত হয়। অপরপক্ষে পরিবারগুলির আয় বাড়লে সেই অতিরিক্ত আয়ের কতটা তারা ভোগব্যয়ে লাগাবে তা নির্ভর করবে MPC-র উপর। কোন পরিবারের মোট আয় যদি কম হয়, তাহলে তার আয়ের প্রায় সবটাই ভোগব্যয়ে লেগে যায়। অপরপক্ষে যে পরিবারের আয় বেশি—তার ভোগাকাঙ্ক্ষা অনেকটা মিটে গেছে, কাজেই মোট আয়ের একটি বড়ো অংশ সে সঞ্চয় করবে। এখানে কম আয়বিশিষ্ট পরিবারের APC বেশি হবে এবং বেশি আয়বিশিষ্ট পরিবারের APC কম হবে। ধরি কোন পরিবারের মাসিক আয় ২০০০ টাকা। সেই পরিবারটি ২০০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা ভোগব্যয় করে বাকি ১০০০ টাকা সঞ্চয় করে। এই পরিবারের $APC = \frac{১০০০ \text{ টাকা}}{২০০০ \text{ টাকা}} = \frac{১}{২} =$ আয়ের ৫০ শতাংশ। আবার কোন পরিবারের

মাসিক আয় যদি ১০০০ টাকা হয় এবং তার থেকে সেই পরিবার যদি ৭০০ টাকা ভোগ-ব্যয় করে, তাহলে তার APC হবে $\frac{\text{৭০০ টাকা}}{\text{১০০০ টাকা}} = \frac{৭}{১০}$ = মোট আয়ের ৭০ শতাংশ। এই উদাহরণে ধনী পরিবারের মোট ভোগব্যয় বেশি, কিন্তু APC কম, কিন্তু স্বল্প আয়সম্পন্ন পরিবারের মোট ভোগ ব্যয় কম, কিন্তু APC বেশি। অনুরূপভাবে, একটি ধনী দেশের APC কম ও দরিদ্র দেশের APC বেশি হতে পারে। অতএব কোন পরিবার কিংবা কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা কোন্ স্তরে রয়েছে তার উপর তার APC নির্ভর করবে।

অতিরিক্ত আয়ের কতটা অতিরিক্ত ভোগের কাজে লাগবে, সেটা পরিবারের ভোগ প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করবে। ধরি দুজন লোক আছে। দুজনেরই আয় ২০ টাকা বাড়ল। তার থেকে একজন ১৬ টাকা ভোগ করল, অপরজন করল ১০ টাকা। এখানে প্রথম জনের MPC হল $\frac{১৬}{২০} = \frac{৪}{৫}$ = ৮০ শতাংশ। যে ১০ টাকা খরচ করল, তার MPC হল $\frac{১০}{২০} = \frac{১}{২}$ = ৫০ শতাংশ। কাজেই দ্বিতীয় জনের MPC কম; এর কারণ প্রথম ব্যক্তির অভ্যাসই হল বেশি ভোগ করা। দ্বিতীয় ব্যক্তির ভোগের দিকে ঝোঁক বেশি নয়, তার ঝোঁক সঞ্চয়ের দিকে। এগুলো ব্যক্তিগত বিষয়। তাহলে আমরা বলতে পারি—MPC প্রধানত ব্যক্তিগত বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

৫.৯ সঞ্চয় প্রবণতা (Propensity to Save) :

(ক) সঞ্চয় প্রবণতা কাকে বলে? পরিবারগুলি তাদের প্রত্যাশিত আয়ের একটি অংশ পরিকল্পিত ভোগব্যয়ে নিয়োগ করে, বাকি অংশটি পরিকল্পিত সঞ্চয়ে ধরা থাকে। অতএব সঞ্চয় ও ভোগ উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। পরিকল্পিত ভোগব্যয় ও সঞ্চয় উভয়ে প্রত্যাশিত আয়ের সমান হবে। আমরা যদি S দ্বারা পরিকল্পিত সঞ্চয়, C দ্বারা পরিকল্পিত ভোগব্যয়, Y দ্বারা প্রত্যাশিত বা সম্ভাব্য আয় ধরি, তাহলে আমরা পাই—

$$C + S = Y$$

অতএব $S = Y - C.$

এবং $C = Y - S.$

আমরা যদি ধরে নিই যে, S নির্ভর করে Y-এর উপর, তাহলে আমরা পাই—

$S = S(Y)$. অর্থাৎ সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভর করে। এখানে $S = S(Y)$ হল সঞ্চয় প্রকরণ (Saving Function)। এই সঞ্চয় প্রকরণ থেকে আমরা প্রত্যাশিত আয় কত হলে পরিকল্পিত সঞ্চয় কত হবে তা জানতে পারব। প্রত্যাশিত

আয়ের উপর পরিকল্পিত সঞ্চয়ের এই নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে আমরা সঞ্চয় প্রবণতা বলতে পারি।

(খ) গড় সঞ্চয় প্রবণতা কাকে বলে ?

প্রতি একক প্রত্যাশিত বা সম্ভাব্য আয়ের যে অংশ সঞ্চিত হতে পারে তাকে গড় সঞ্চয় প্রবণতা (Average propensity to save বা APS) বলা হয়। অর্থাৎ $APS = \frac{S}{Y}$. এখানে S = পরিকল্পিত সঞ্চয় ও Y = মোট সম্ভাব্য আয়।

কোন দেশের পরিবারগুলির মোট সম্ভাব্য আয় যদি ৪০,০০০ কোটি টাকা হয় এবং তার থেকে পরিবারগুলি যদি ১০,০০০ কোটি টাকা সঞ্চয় করার পরিকল্পনা করে থাকে, তাহলে $APS = \frac{\text{১০,০০০ কোটি টাকা}}{\text{৪০,০০০ কোটি টাকা}} = \frac{১}{৪}$ হবে। APS হল একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা।

(গ) প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা :

অতিরিক্ত এক একক আয়ের যে অংশ সঞ্চিত হতে পারে তাকে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা (Marginal Propensity to Save বা MPS) বলা হয়। সম্ভাব্য আয় যদি ΔY পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং তার জন্য সঞ্চয় যদি ΔS পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহলে MPS হবে $\frac{\Delta S}{\Delta Y} = \frac{\text{সঞ্চয়ের বৃদ্ধি}}{\text{আয়ের বৃদ্ধি}}$। আবার আয় যদি কমে যায়, তাহলে ΔY ঋণাত্মক হবে। আয় কমলে যদি সঞ্চয় কমে তাহলে ΔSও ঋণাত্মক হবে, সেখানে MPS হবে $\frac{-\Delta S}{-\Delta Y} = \frac{\Delta S}{\Delta Y}$. অতএব MPS হল আয়ের পরিবর্তনের ফলে সঞ্চয়ের পরিবর্তনের হার। কোন দেশের আয় যদি ১০,০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় এবং তারজন্য পরিবারগুলি যদি ২,০০০ কোটি টাকা সঞ্চয় করার পরিকল্পনা করে, তাহলে MPS হবে $\frac{\text{২,০০০ কোটি টাকা}}{\text{১০,০০০ কোটি টাকা}}$ $= \frac{২}{১০} = \frac{১}{৫}$. MPS একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা।

(ঘ) ভোগ প্রবণতা ও সঞ্চয় প্রবণতার সম্পর্ক :

প্রথমে APC ও APS সম্বন্ধে বলা যায়। ধরি C = মোট ভোগব্যয়, S = মোট সঞ্চয় এবং Y = আয়। আমরা জানি মোট ভোগব্যয় + মোট সঞ্চয় = মোট আয় অর্থাৎ $C + S = Y$. উভয়পক্ষকে Y দ্বারা ভাগ করে আমরা পাই,

$$\frac{C}{Y} + \frac{S}{Y} = \frac{Y}{Y} = 1.$$

অর্থাৎ $APC+APS=1$.

অতএব $APC=1-APS$.

এবং $APS=1-APC$. অর্থাৎ আমরা যদি APC-র মান জানতে পারি, তাহলে APS-এর মানও জানতে পারব। এখানে আমরা নিম্নলিখিত মন্তব্যগুলি করতে পারি :

(১) APC ও APS উভয়ে মিলে এক হয়। কাজেই এককভাবে দেখলে বলা যায় যে, APC ও APS পরস্পরের পরিপূরক ;

(২) APC যদি বাড়ে, তাহলে APS কমবে ; APC যদি কমে, তাহলে APS বাড়বে ;

(৩) $APS=O$ হলে $APC=1$ হবে। $APS=0$ হলে $APS=1$ হবে। কিন্তু APC শূন্য হতে পারে না, কাজেই $APS=1$ হতে পারে না।

এরপর MPC ও MPS সম্বন্ধে বলা যায়।

$$C+S=Y.$$

$$\therefore \quad \Delta C+\Delta S=\Delta Y.$$ উভয়পক্ষকে ΔY দ্বারা

ভাগ করে $\frac{\Delta C}{\Delta Y}+\frac{\Delta S}{\Delta Y}=\frac{\Delta Y}{\Delta Y}=1.$

এখানে $\frac{\Delta C}{\Delta Y}=MPC$ এবং $\frac{\Delta S}{\Delta Y}=MPS.$

অতএব আমরা পাই, $MPC+MPS=1$.

অর্থাৎ MPS 1-এর চেয়ে ছোট। আবার $MPS=1-MPC$, কাজেই MPC বাড়লে MPS এমনভাবে কমবে যাতে তাদের যোগফল এক থাকে।

(৬) ভোগরেখা থেকে কী ভাবে সঞ্চয় রেখা অংকন করা যায় :

মোট আয়ের একটি অংশ ভোগব্যয়ে লাগে, বাকি অংশটি সঞ্চিত হয়। বিভিন্ন আয়ে কত ভোগব্যয় হয় সেটা জানা থাকলে সেই সব আয়ে কত সঞ্চয় হবে, তা আমরা জানতে পারব।

কারণ, ভোগ + সঞ্চয় = আয়।

ধরি $C=$ ভোগব্যয়,

$S=$ সঞ্চয়,

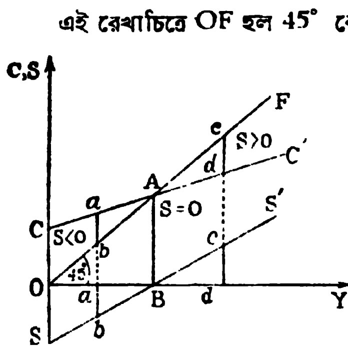
$Y=$ আয়, তাহলে আমরা পাই, $C+S=Y$.

অথবা $S=Y-C$. "আমরা যদি Y জানি, তাহলে C জানতে পারব ; C জানলে S জানতে পারব ; এইভাবে Y জানলে সেই Y-এর জন্য কত S হবে সেটা জানা যাবে"।

Y কত হলে C কত হবে সেটা ভোগরেখা থেকে জানা যায়। অতএব আমরা ভোগরেখা থেকে সঞ্চয় রেখা আঁকতে পারব। পরের পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে CC' হল

ভোগরেখা। এই ভোগরেখা থেকে কীভাবে সঞ্চয় রেখা SS' আঁকা হয়েছে তা বোঝানো হল।

এই রেখাচিত্রে OF হল 45° কোণবিশিষ্ট রেখা। এই রেখার উপর প্রত্যেকটি বিন্দুতে অনুভূমিক ও উল্লম্ব দূরত্ব সমান হয়। এখানে CC' হল ভোগরেখা। এই ভোগরেখা থেকে জানা যায় যখন Y = O, তখন C = OC. C + S = Y. যদি Y = O হয়, তাহলে C + S = O. অতএব S = − C = − OC অর্থাৎ আয় যখন শূন্য তখন সঞ্চয় হল ঋণাত্মক। শূন্য আয়ে পরিবারগুলি যে ভোগব্যয় করে, সেই ভোগব্যয় আসে পরিবারগুলির পূর্ব সঞ্চয় থেকে। পূর্ব সঞ্চয় ভেঙে ফেলাকে আমরা অবসঞ্চয় (dissaving) বলতে পারি। শূন্য আয়ে ভোগব্যয় যতখানি অবসঞ্চয় ঠিক ততখানি হবে। রেখাচিত্রে OS = OC. কিন্তু S বিন্দুটি মূলবিন্দুর নীচে আছে বলে এখানে সঞ্চয় ঋণাত্মক হয়েছে বোঝায়।



৫ ৫ রেখাচিত্র : ভোগরেখা থেকে কীভাবে সঞ্চয় রেখা অংকন করা যায়।

A বিন্দুতে CC' রেখাটি OF রেখাকে ছেদ করেছে। এখানে আয় = OB = AB. এবং ভোগব্যয় = AB. অতএব A বিন্দুতে যত আয়, তার সবটাই ভোগব্যয়ে লেগে যায়। এখানে সঞ্চয় শূন্য। আমরা জানি,

$$C + S = Y, S = Y - C$$

A বিন্দুতে C = Y. অতএব S = Y − Y = O. অতএব A বিন্দুর নীচে B বিন্দুতে S = O. B বিন্দুর বামদিকে আয়ের চেয়ে ভোগব্যয় বেশি, কাজেই সঞ্চয় ঋণাত্মক (S<O)। B বিন্দুর ডান দিকে আয়ের চেয়ে ভোগব্যয় কম, কাজেই সঞ্চয় ধনাত্মক (S > O) হবে। আমাদের রেখাচিত্রে OAC অংশে ঋণাত্মক সঞ্চয় থাকায় উপরের রেখাচিত্রে OBS অংশেও সঞ্চয় ঋণাত্মক হবে। OAC অংশটির প্রতিবিম্ব হল OBS অংশটি। অনুরূপভাবে, B বিন্দুর ডান দিকে FAC অংশে সঞ্চয় ধনাত্মক। এই অংশের প্রতিবিম্ব হল S'BY অংশটি। রেখাচিত্রে A বিন্দুর বাম দিকে OAC অংশে ab দূরত্ব B বিন্দুর বামদিকে OBS অংশে অঙ্কিত ab দূরত্বের সঙ্গে ঠিক সমান হবে। ab অংশের প্রতিবিম্ব (Mirror image) হল ab অংশটি। অনুরূপভাবে A বিন্দুর ডানদিকের FAC' অংশে অঙ্কিত cd দূরত্ব S'BY অংশে অঙ্কিত cd দূরত্বের সমান।

এইভাবে আমরা ভোগরেখা থেকে সঞ্চয় রেখা অঙ্কন করতে পারি। আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়ে, কাজেই ভোগরেখা ঊর্ধ্বমুখী হয়। কিন্তু আয় যে হারে বাড়ে

ভোগব্যয় তার চেয়ে কম হারে বাড়ে, ফলে সঞ্চয় বাড়ে। সেইজন্য সঞ্চয় রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হয়।

৫.১০ ভোগ প্রবণতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

ভোগ প্রবণতা বলতে ভোগ করার জন্য অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছাকে বোঝায়। পরিবারগুলি সম্ভাব্য আয়ের ভিত্তিতে ভোগব্যয়ের পরিকল্পনা রচনা করে। এই ভোগ পরিকল্পনাকেও ভোগ প্রবণতা বলা যায়। ভোগ প্রবণতা দুরকমের হয়, (ক) গড় ভোগ প্রবণতা, (খ) প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা। পরিবারগুলি সামগ্রিকভাবে তাদের মোট আয়ের কী পরিমাণ ভোগের কাজে ব্যয় করবে তাই হল গড় ভোগ প্রবণতা। পরিবারগুলি তাদের অতিরিক্ত আয়ের কতটা ভোগ করতে চায় তাই হল প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা। পরিবারগুলির গড় ভোগ প্রবণতা কতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তেমনি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতাও অন্য কতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

যে বিষয়গুলির উপর গড় ভোগ প্রবণতা নির্ভর করে, সেই বিষয়গুলির উপর প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা নির্ভর না করতেও পারে। আবার কতগুলি বিষয় থাকতে পারে যাদের উপর গড় ও প্রান্তিক উভয় ভোগ প্রবণতাই নির্ভর করবে। কীন্স্ তাঁর ভোগ তত্ত্বের আলোচনায় ভোগ প্রবণতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহের যে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে বেশ জটিলতা আছে। তারপরে অধ্যাপক হ্যান্সেন তাঁর "A Guide to Keynes" নামক গ্রন্থে এই ব্যাপারে কিছুটা অতিরিক্ত আলোকপাত করেন। কীনস্ ও হ্যান্সেনের আলোচনা থেকে আমরা ভোগ প্রবণতা নির্ধারণকারী নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করতে পারি। কীন্সের মতে ভোগ প্রবণতা নির্ধারণকারী বিষয়গুলি দুরকমের—(ক) ব্যবহারিক (Subjective) বিষয় ও (খ) বস্তুগত (Objective) বিষয়।

(ক) ভোগ প্রবণতা নির্ধারণকারী ব্যবহারিক বিষয়সমূহ :

যে বিষয়গুলি সমাজের পরিবার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত আচার-আচরণ নির্ধারণ করে সেই বিষয়গুলিকে ব্যবহারিক বিষয় বলা হয়। এই বিষয়গুলিকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) পরিবার বা ব্যক্তির ভোগব্যয় নির্ধারণকারী মনোগত বিষয় (Psychological factors) এবং (২) সামাজিক আচার-আচরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক বিধি নিয়ম (Social practices and institutional rules)। কীন্সের মতে, ব্যবহারিক বিষয়গুলির পরিবর্তন হয় সত্য, কিন্তু কম সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু না ঘটলে এই বিষয়গুলি স্থির থাকে। ভোগ রেখার আকৃতি (form) নির্ভর করে এই ব্যবহারিক বিষয়গুলির উপর। ভোগরেখার আকৃতির মধ্যে থাকে ভোগ রেখার অবস্থান (Position) ও ঢাল (Slope)। ভোগ রেখার অবস্থান থেকে APC জানা যায় এবং ভোগরেখার ঢাল থেকে MPC জানা যায়। অতএব আমরা বলতে পারি—ব্যবহারিক বিষয়গুলি প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা নির্ধারণ করে।

(১) **ভোগ নির্ধারণকারী মনোগত বিষয়ঃ** ব্যক্তি বা পরিবারগ্নলি তাদের আয় থেকে ভোগ ব্যয় করে এবং সঞ্চয় করে। বর্তমানের তৃপ্তির জন্য ভোগ করা হয়। সঞ্চয় করা হয় ভবিষ্যতের তৃপ্তির জন্য। কোন পরিবার বা ব্যক্তি যদি দ্রেদ্ঢিসম্পন্ন হয়, তাহলে তার কাছে ভোগের চেয়ে সঞ্চয়ের আকর্ষণ বেশি হবে। আর যে ব্যক্তি বর্তমানের সুখকে বড়ো করে দেখে, তার সঞ্চয় কম ও ভোগব্যয় বেশি হবে। যে ব্যক্তি সাবধানী, ভবিষ্যৎ দ্র্দিনের জন্য ভাবে, তার সঞ্চয় প্রবণতা বেশি এবং ভোগ প্রবণতা কম হবে। কাজেই এখানে এক শ্রেণীর বিষয় থাকছে যেগ্লো একই সঙ্গে ভোগ প্রবণতা ও সঞ্চয় প্রবণতা নির্ধারণ করে। যে বিষয়গ্লি সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি করে, তারা ভোগ প্রবণতা হ্রাস করে। বিপরীতপক্ষে, যে বিষয়গ্লি সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস করে সেগ্লি ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি করে। কীন্সের মতে সঞ্চয় প্রবণতা যে সব উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—সতর্কতা, দ্রেদ্ঢি, হিসেবীপনা, উন্নতি করার চেষ্টা, স্বাধীন হওয়ার ইচ্ছা, উদ্যোগ, অহংকার, লোভ ইত্যাদি। কাজেই ভোগ প্রবণতা নির্ভর করবে এদের বিপরীত উদ্দেশ্যগ্লি দ্বারা। যে ব্যক্তি বা পরিবারের আমোদ-আহ্লাদের শখ বেশি, দ্রেদর্শিতা কম, উদারতা বেশি, বেহিসেবীভাবও বেশি, লোক দেখানোর ইচ্ছা প্রবল সেই ব্যক্তি বা পরিবারের ভোগ প্রবণতা যে বেশি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যক্তি ও পরিবারগ্নলি আবার উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। তারজন্যও সঞ্চয়ের প্রয়োজন। কতগ্নলি বিষয় পরিবারগ্নলির সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি করে (কাজেই ভোগ প্রবণতা হ্রাস করে)। এই বিষয়গ্নলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য সঞ্চয় তহবিল গড়ে তোলা, বর্তমান আয়ের একটি বড় অংশের প্নর্বিনিয়োগ করে ভবিষ্যতের আয় বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, বড় কিছ্ করার ইচ্ছা, স্বাধীনভাবে ব্যয় করার ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি। অনেকে আবার ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য টাকা পয়সা, ঘর বাড়ি বা অন্য কোন সম্পত্তি রেখে যাওয়ার চেষ্টায় বর্তমান ভোগ থেকে বিরত থাকে। এদের ভোগ প্রবণতা কম এবং সঞ্চয় প্রবণতা বেশি হবে। আবার অনেকে কৃপণতার জন্যই সঞ্চয় করে থাকে। এদের ভোগ প্রবণতা কম হবে।

(২) **প্রাতিষ্ঠানিক আচরণ নির্ধারণকারী বিষয়ঃ** সমাজে যে সব অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকে তাদের সঞ্চয় ও ভোগ প্রবণতা নির্ধারিত হয়। (১) প্রতিষ্ঠানগ্নলির উদ্যোগ, (২) আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে সচ্ছল অবস্থায় থাকার ইচ্ছা, (৩) ক্রমবর্ধমান আয় লাভের চেষ্টা, (৪) দক্ষ পরিচালনার ক্ষমতা প্রদর্শন করার লোভ এবং (৫) আর্থিক বিচক্ষণতা ইত্যাদি বিষয় দ্বারা।

অ্যাক্লের মতে ভোগকারীদের আশা-আশংকা-সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তাও ভোগ প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং এই বিষয়টিকে মনোগত বিষয়সম্হের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। ভোগকারীরা সাধারণত দ্রব্যসামগ্রীর দাম সম্বন্ধে বেশি ভাবনা-চিন্তা করে। যদি দাম বাড়ে তাহলে অনেকেই মনে করে ভবিষ্যতে দাম

আরো বেড়ে যাবে, অতএব এখনই দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে নেওয়া যাক। এর ফলে তাদের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে। অপরপক্ষে লোকে যদি ভাবে দাম কমবে তাহলে ভোগব্যয় কমবে। এইভাবে দেখা যায়—ভোগকারীদের আশা-আশঙ্কাও ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। সরকার প্রত্যক্ষ কর হ্রাস করলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে। অনুরূপভাবে সরকার যদি দ্রব্যসামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করে, তাহলে তাদের দাম বাড়বে এবং ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমবে। পরোক্ষ কর কমলে ভোগব্যয় বাড়বে।

কর সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমে সরকার প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি করতে পারেন, পরোক্ষ কর কমিয়ে দিতে পারেন, কিংবা প্রত্যক্ষ কর কমিয়ে পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করতে পারেন, কিংবা উভয় কর বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারেন। এই পরিবর্তনগুলিকে আমরা কর-কাঠামোর পরিবর্তন বলতে পারি। এদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে দেশের ভোগ ও সঞ্চয় প্রবণতা পৃথকভাবে প্রভাবিত হবে।

(৩) আশা-আশঙ্কার পরিবর্তনও ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করে। যুদ্ধের সময় লোকে ভাবে জিনিসপত্র বুঝি পাওয়া যাবে না। এই সময় তাদের ভোগ প্রবণতা বেড়ে যায়। তেমনি মন্দার সময় লোকে ভাবে তাদের আয় খুবই কমে যাবে। কাজেই তারা বর্তমান ভোগব্যয় কমিয়ে দেয়। এইভাবে যুদ্ধের সময় ভোগ রেখা উপরের দিকে উঠে যায়, মন্দার সময় নীচের দিকে নেমে যায়। আশা-আশঙ্কার পরিবর্তনকে কীন্স বস্তুগত বিষয়ের মধ্যে রেখেছেন। অ্যাক্‌লে একে মনোগত বিষয়ের মধ্যে রাখতে চান। এটাই ঠিক পদ্ধতি।

(৪) সুদের হারের পরিবর্তন হলেও ভোগ ও সঞ্চয় প্রবণতা প্রভাবিত হয়। সুদের হার বাড়লে বর্তমান ভোগ কমিয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করার প্রবণতা বাড়ে। সঞ্চয় থেকে আয় আসে। সুদের হার হল এই আয়। সুদের হার যত বেশি হবে তত সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়বে। সুদের হার কমে গেলে সঞ্চয় প্রবণতাও কমবে। সঞ্চয় প্রবণতার এই পরিবর্তনের ফলে ভোগ প্রবণতার বিপরীত পরিবর্তন ঘটে।

কিন্তু সুদের হারের সঙ্গে ভোগ বা সঞ্চয় প্রবণতার সম্পর্কটি খুবই শিথিল সম্পর্ক। ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদরা এই সম্পর্কের উপর যত জোর দিয়েছিলেন, কীন্স তত জোর দেননি।

(৫) বস্তুগত বিষয়ের মধ্যে আর যে দুটি বিষয় বাকি থাকল (মজুরীর হারের পরিবর্তন ও অবচয় হিসাব পদ্ধতির পরিবর্তন) সে দুটি বিষয় তত গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে কীন্স মনে করতেন। কাজেই তাদের আলোচনা এখানে থাকবে না।

(৬) **অন্যান্য বিষয়:** কীন্স যে সব বস্তুগত বিষয়ের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে পড়ে, অথচ কীন্স পরিষ্কারভাবে তাদের আলোচনা করেননি—এমন কয়েকটি বিষয়ের কথা বলা যায়। এই বিষয়গুলি হল

(ক) জনসংখ্যার পরিবর্তন ও জনসংখ্যার গঠনের পরিবর্তন,
(খ) আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন,
(গ) যৌথ মূলধনী কারবারের ডিভিডেণ্ড বণ্টনের নীতির পরিবর্তন, ও
(ঘ) সম্পত্তির বাস্তব মূল্যের পরিবর্তন।

(ক) জনসংখ্যার পরিবর্তন :

জনসংখ্যার পরিবর্তন (বৃদ্ধি বা হ্রাস) হয় জন্মের হার ও মৃত্যুর হারের পার্থক্য থেকে। যদি মোট জনসংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে, অন্যান্য অবস্থা স্থির থাকলে, মোট ভোগব্যয় বাড়বে। জনসংখ্যা কমে গেলে মোট ভোগব্যয় কমবে। জনসংখ্যা স্থির থাকলে ভোগব্যয় স্থির থাকবে বলে আশা করা যায়।

মোট জনসংখ্যা স্থির থাকলেও জনসংখ্যার গঠনের (Structure of the Population) পরিবর্তন হতে পারে। যেমন, আগে যদি ১০ জন শিশু ২০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ২০ জন বৃদ্ধ (অবসরপ্রাপ্ত) থাকে তাহলে মোট জনসংখ্যা হবে ৫০ জন। এখন যদি ১৫ জন শিশু, ১০ জন প্রাপ্তবয়স্ক ও ২৫ জন বৃদ্ধ হয়, তাহলে মোট জনসংখ্যা ৫০ই থাকবে সত্য, কিন্তু জনসংখ্যার গঠনের পরিবর্তন হবে। আমরা জানি শিশু ও বৃদ্ধরা সকলে আয় উপার্জন করতে পারে না, অথচ তারা অন্যদের আয় ভোগ করে। এখন যদি জনসংখ্যার গঠনের এমন পরিবর্তন হয় যে. মোট জনসংখ্যা স্থির থাকলেও শিশু, রোগী, বৃদ্ধদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহলে মোট ভোগব্যয় বাড়বে। অন্য পরিবর্তনের জন্য ভোগব্যয়ের অন্যরকম পরিবর্তন হবে।

(খ) আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন :

সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে আয় উপার্জন করে। ক্লাসিকাল অর্থনীতি-বিদদের পন্থা অনুসরণ করে আমরা সমাজের মানুষদের দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যথা—শ্রমিক (Labourers) ও পুঁজিপতি (Capitalists); শ্রমিকেরা পান মজুরী (Wages) ও পুঁজিপতিরা পান মুনাফা (Profits)।

ধরি W = মোট মজুরী,
P = মোট মুনাফা,
Y = মোট আয়।

তাহলে আমরা পাই, $Y = W + P$. এখন মোট আয় যদি স্থির থাকে, কিন্তু W বেড়ে যায় (ও P কমে যায়) তাহলে দেশের আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন হবে এবং আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন হলে মোট ভোগব্যয়ের পরিবর্তন হবে।

আমরা ধরতে পারি যে, শ্রমিকদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা পুঁজিপতিদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার চেয়ে বেশি। তাহলে মোট আয় স্থির থেকে যদি মোট মজুরী বাড়ে এবং মোট মুনাফা কমে তাহলে ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ

শ্রমিকদের অনুকূলে আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন হলে ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। অপরপক্ষে পুঁজিপতিদের অনুকূলে আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন হলে ভোগ প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝানো যায়।

ধরা যাক, দেশের মোট আয় Y=100 টাকা, তার মধ্যে মোট মজুরী W= 60 টাকা ও মোট মুনাফা P=40 টাকা। ধরি শ্রমিকরা, তাঁদের আয়ের সবটাই ভোগ করেন এবং পুঁজিপতিরা তাঁদের আয়ের অর্ধেক ভোগ ব্যয় করেন। তাহলে এক্ষেত্রে মোট ভোগ ব্যয় C হবে 60 টাকা + 40 টাকার অর্ধেক (20 টাকা) = 60 টাকা + 20 টাকা = 80 টাকা। আমরা পাই,

Y = 100 টাকা,	W = 60 টাকা,	P = 40 টাকা
C = 80 টাকা	Cw = 60 টাকা,	Cp = 20 টাকা

এখানে Cw = মজুরী প্রাপকদের ভোগব্যয় এবং Cp = মুনাফা প্রাপকদের ভোগ ব্যয়।

তাহলে গড় ভোগ প্রবণতা (APC) হয়

$$APC=\frac{C}{Y}=\frac{80 \text{ টাকা}}{100 \text{ টাকা}}=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$$

এবার ধরা যাক, মোট আয় (Y) 100 টাকাই থাকল, কিন্তু শ্রমিকদের মজুরী বেড়ে হল 70 টাকা এবং পুঁজিপতিদের মুনাফা কমে হল 30 টাকা। তাহলে আমরা পাই,

W = 70 টাকা, P = 30 টাকা, Y = 100 টাকা, Cw = 70 টাকা, Cp = 15 টাকা। এখানে C = 85 টাকা, অতএব $APC=\frac{C}{Y}=\frac{85}{100}=\frac{17}{20}>\frac{4}{5}$. অতএব APC বাড়ল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, মোট আয় স্থির থাকলেও আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন হলে গড় ভোগ প্রবণতার পরিবর্তন হতে পারে। এইভাবে বলা যায়— আয়ের বণ্টন ভোগ প্রবণতাকে প্রভাবিত করে।

(গ) যৌথ মূলধনী কারবারের ডিভিডেন্ড বণ্টন নীতির পরিবর্তন :

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বণ্টন করে। অনেক সময় দেখা যায়—যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের মুনাফার একটি অংশ অবণ্টিত রেখে দেয়। প্রতিষ্ঠানটি যদি ভবিষ্যতে বড়ো হতে চায় তাহলে তার অর্থের প্রয়োজন হবে। আবার অদেখা বিপদের জন্যও প্রতিষ্ঠানকে কিছু অর্থ জমা রাখতে হয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি সেজন্য সব মুনাফা বণ্টন করে না। কিছুটা বণ্টন করে দেয়, বাকিটা অবণ্টিত রেখে দেয়। অবশ্য এটা চিরকাল আটকে রাখা হয় না। কোন বছর আগের বছরের অবণ্টিত মুনাফাও বণ্টন করে দেওয়া হয়। যা হোক, কোন নির্দিষ্ট বছরে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের

মোট মুনাফার কতটা অংশ বণ্টিত হবে সে সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠান সিদ্ধান্ত নেয়। একেই ডিভিডেন্ড বণ্টন নীতি বলা হয়। প্রতিষ্ঠান এই নীতির পরিবর্তন করতে পারে।

যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান যদি তার মোট মুনাফার একটি বড়ো অংশ ডিভিডেন্ডস্ হিসেবে বণ্টন করে দেয়, তাহলে শেয়ার-হোল্ডারদের আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে তাদের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে। বিপরীতক্রমে যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি ডিভিডেন্ডস্ বণ্টনের হার কমিয়ে দেয়—তাহলে শেয়ার-হোল্ডারদের প্রাপ্ত আয় কম হবে এবং ভোগব্যয় কমবে। এইভাবে বলা যায়—যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলির লভ্যাংশ বা ডিভিডেন্ডস্ বণ্টনের নীতির দ্বারা ভোগ প্রবণতা প্রভাবিত হয়।

(ঘ) সম্পত্তির বাস্তব মূল্যের পরিবর্তন :

সম্পত্তি দুরকমের—আর্থিক ও বস্তুগত। নগদ টাকা, ব্যাঙ্কের আমানত, যৌথ মূলধনী কোম্পানীর ঋণপত্র ও শেয়ার, সরকারের ঋণপত্র ইত্যাদি হল আর্থিক সম্পত্তি। আবার ঘর, বাড়ি, জমি, পুকুর, মোটর গাড়ি, মূল্যবান ধাতু ও পাথর ইত্যাদি হল বস্তুগত সম্পত্তি। উভয় প্রকার সম্পত্তির মান অর্থের হিসেবে প্রকাশিত হয়। ধরি কোন পরিবারের মোট সম্পত্তির আর্থিক পরিমাণ হল A. ধরা যাক P হল দামস্তর। তাহলে A পরিমাণ সম্পত্তির ক্রয় ক্ষমতা হবে $\frac{A}{P}$. এই $\frac{A}{P}$-কে আমরা সম্পত্তির বাস্তব মূল্য (Real Value of Assets) বলতে পারি। অর্থাৎ সম্পত্তির সাহায্যে প্রচলিত দামে যে সব দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করা যায় তাদের বাস্তব পরিমাণ হল সম্পত্তির ক্রয় ক্ষমতা বা বাস্তব মূল্য। এখন যদি A স্থির থাকে, কিন্তু P বৃদ্ধি পায়, তাহলে $\frac{A}{P}$ কমবে। যদি P স্থির থাকে, A বাড়ে তাহলে $\frac{A}{P}$ বাড়বে ইত্যাদি অনেক রকমের হতে পারে। অর্থাৎ সম্পত্তির বাস্তব মূল্যের পরিবর্তন হতে পারে।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পিগুর মতে মানুষের ভোগ ও সঞ্চয় প্রবণতা সম্পত্তির বাস্তব মূল্যের উপর নির্ভর করে। তাঁর মতে অন্যান্য অবস্থার কোন পরিবর্তন না হলে সম্পত্তির বাস্তব মূল্য বৃদ্ধি পেলে সঞ্চয় করার প্রয়োজন হ্রাস পায়, ফলে ভোগব্যয় বাড়ে ; অপরপক্ষে সম্পত্তির বাস্তব মূল্য হ্রাস পেলে সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পায়, ফলে ভোগব্যয় কমে। সম্পত্তির মূল্যের পরিবর্তনের ফলে ভোগপ্রবণতার উপর এই যে প্রভাব পড়ে একে পিগু প্রভাব (Pigou Effect) বলা হয়। পরবর্তীকালে অনেক অর্থনীতিবিদ এই ব্যাপারটিকে আরো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রশ্নাবলী

১। কীন্সের ভোগতত্ত্বের গুরুত্ব আলোচনা কর।

২। ভোগ প্রকরণ কাকে বলে? গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার পার্থক্য কর।

৩। ভোগরেখা কাকে বলে? ভোগরেখা থেকে কীভাবে গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা জানা যায় রেখাচিত্রের সাহায্যে আলোচনা কর।

৪। ভোগ প্রকরণ ও সঞ্চয় প্রকরণ শব্দ দুটির ব্যাখ্যা কর। রেখাচিত্র দিয়ে বোঝাও ভোগ রেখা থেকে কীভাবে সঞ্চয় রেখা অংকন করা যায়?

৫। গড় ভোগ ও সঞ্চয় প্রবণতা এবং প্রান্তিক ভোগ ও সঞ্চয় প্রবণতার সংজ্ঞা দাও এবং ওদের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৬। ভোগব্যয় কোন কোন বিষয়ের উপরে নির্ভর করে?

৭। (ক) আয়ের বণ্টন, (খ) সম্পদের পরিমাণ, (গ) সুদের হার, (ঘ) জনসংখ্যার গঠন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, (ঙ) কর কাঠামোর ও (চ) যৌথ মূলধনী কারবারের মুনাফা বণ্টন নীতি—কীভাবে ভোগব্যয়কে প্রভাবিত করে?

৮। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) সংজ্ঞা দাও : (১) ভোগ প্রকরণ (২) ভোগ রেখা, (৩) গড়ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা, (৪) গড় ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা।

(খ) পার্থক্য কর : (১) প্রকৃত ভোগ ও পরিকল্পিত ভোগ, (২) গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা, (৩) ভোগরেখার ঢাল ও অবস্থান, (৪) ভোগ নির্ধারণকারী মনোগত বিষয় ও বস্তুগত বিষয়।

(গ) ভোগরেখা থেকে কীভাবে গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা জানা যায়?

(ঘ) গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার বিভিন্ন মান সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ঙ) দেখাও যে, গড় ভোগ ও গড় সঞ্চয় প্রবণতার মান একের বেশি হতে পারে না।

(চ) প্রান্তিক ভোগ ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার সম্পর্ক নির্ণয় কর।

(ছ) আয়ের বণ্টন কীভাবে ভোগব্যয়কে প্রভাবিত করতে পারে?

(জ) প্রত্যক্ষ কর ও ভোগব্যয়ের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

ষষ্ঠ অধ্যায় | মূলধন ও বিনিয়োগতত্ত্ব

৬১ মূলধন কাকে বলে? মূলধন কয় প্রকার?

যে সব দ্রব্য মানুষের দ্বারা উৎপাদিত হয়ে মানুষের ভোগের কাজে ব্যবহৃত না হয়ে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাদের মূলধন দ্রব্য (capital goods) বলা হয়। মূলধন দ্রব্যের মধ্যে আমরা ধরি—(১) যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ইত্যাদি উৎপাদনের যান্ত্রিক উপাদান, (২) কারখানার বাড়িঘর, অফিস, কোয়ার্টার্স, গোডাউন ঘর ইত্যাদি গৃহাদি সম্পর্কিত উপাদান, (৩) উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আসবাব-পত্র, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, (৪) প্রতিষ্ঠানের পরিবহণ সামগ্রী, (৫) যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন, টেলিফোন, টেলেক্স যোগাযোগ ইত্যাদি (৬) প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ব্যবহৃত অন্য প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্য যেগুলি এই প্রতিষ্ঠানে কাঁচামাল বা মধ্যবর্তী দ্রব্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, (৭) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্যের মজুত। এখানে (৬) ও (৭) নং দ্রব্যগুলি হল দ্রব্যের মজুত ভাণ্ডার (Stock of Inventory)।

উপরে যে সব মূলধন দ্রব্যের কথা বলা হয় সেগুলি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অধীনে রক্ষিত মূলধন দ্রব্যের ভাণ্ডার। এই মূলধন ভাণ্ডারকে দুভাবে প্রকাশ করা যায়। প্রথমত, মূলধনকে দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশ করা যায়। দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশিত মূলধন ভাণ্ডারকে বাস্তব বা বস্তুগত মূলধন ভাণ্ডার বলা হয়। দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানের অধীনে রক্ষিত মূলধনকে অর্থের হিসেবে অর্থের দ্বারা প্রকাশ করা যায়। অর্থের হিসেবে প্রকাশিত মূলধনকে আর্থিক মূলধন বলা হয়। তাত্ত্বিক আলোচনায় বাস্তব মূলধনের কথা বলা হলেও বাস্তবে মূলধন বলতে আমরা আর্থিক মূলধনকেই বোঝাই।

প্রতিষ্ঠানের অধীনে রক্ষিত আর্থিক মূলধনের মধ্যে ধরা হয় (১) যন্ত্রপাতির দাম, (২) বাড়িঘরের দাম, (৩) আসবাবপত্র ইত্যাদির দাম (৪) যোগাযোগ ব্যবস্থার দাম, (৫) অন্য প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের দাম ও (৬) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্যের মজুতের দাম এবং (৭) প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কেনাকাটার জন্য প্রয়োজনীয় চলতি মূলধন।

সমগ্র সমাজের দিক থেকে দেখলে মূলধনকে একটি সম্পদ বলা যায়।

সম্পদ হল আয়ের ভাণ্ডার। আয় হল দ্রব্য বা সেবার স্রোত। যে সব সম্পদ মানুষের দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাদের থেকে দ্রব্য বা সেবার স্রোত (অর্থাৎ

উপযোগিতার স্রোত) প্রবাহিত হয় তাদের ম‍ূলধন বলা হয়। দেশের মোট ম‍ূলধন সম্পদের মধ্যে থাকে—

(১) দেশের সব উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের অধীনে রক্ষিত ও উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত ম‍ূলধন দ্রব্যের ভাণ্ডার, যাদের থেকে দ্রব্য বা সেবাস্রোত প্রবাহিত হয়,

(২) দেশের সব বাড়িঘর, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চিকিৎসালয় প্রভৃতি, যাদের থেকে আবাসন নামক সেবাস্রোত প্রবাহিত হয়,

(৩) দেশের রাস্তা, সেতু, রেলপথ ইত্যাদি পরিবহণ ব্যবস্থা, যার থেকে পরিবহণ ও যোগাযোগ নামক সেবাস্রোত প্রবাহিত হয়,

(৪) দেশের জলসেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, কারিগরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাকেন্দ্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান যারা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে দেশের সামগ্রিক উৎপাদনকে সাহায্য করে।

একটি আধ‍ুনিক মিশ্র অর্থব্যবস্থায় দেশের মোট ম‍ূলধনকে দ‍ুভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানগত ম‍ূলধন দ্রব্যের ভাণ্ডার এবং (২) সামাজিক ম‍ূলধনের ভাণ্ডার। যে সব ম‍ূলধন দ্রব্য কোন ব্যক্তি, পরিবার বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় থাকে, যাদের প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করার স‍ুবিধে সেই ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কেউ পায় না, তাদের বলা হয় ব্যক্তিগত ম‍ূলধন দ্রব্য। অপর পক্ষে যে সব ম‍ূলধন দ্রব্যের স‍ুবিধে সমাজের সকলেই ভোগ করে এবং সাধারণত যাদের উপর সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে সরকারের মালিকানা থাকে তাদের সামাজিক ম‍ূলধন (Social Capital) বলে। সামাজিক ম‍ূলধনকে আবার দেশের আভ্যন্তর গঠন (Infra structure) বলা হয়। সামাজিক ম‍ূলধনের মধ্যে ধরা হয়—দেশের রাস্তাঘাট, সেতু, রেলপথ ইত্যাদি পরিবহণ ববস্থা, জলসেচ ও বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ নির্মাণ ব্যবস্থা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত বা সামাজিক ম‍ূলধন হল দ্রব্য বা বস্তুগত ম‍ূলধন। অনেকে আবার মানবিক ম‍ূলধন (Human Capital) নামক আর একপ্রকার ম‍ূলধনের কথাও বলে থাকেন। মানবিক ম‍ূলধন বলতে দেশের শ্রম-সম্পদের দক্ষতা ব‍ৃদ্ধিকে বোঝায়।

শ্রম হল দ‍ুরকমের, অদক্ষ শ্রম এবং দক্ষ শ্রম। অদক্ষ শ্রম হল মান‍ুষের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক শক্তির প্রয়োগ। অদক্ষ শ্রমকে কারিগরিক জ্ঞানের দ্বারা দক্ষ শ্রমকে র‍ূপান্তরিত করতে হয়। এই র‍ূপান্তর সাধনের মাধ্যমে দক্ষ শ্রম নামক যে উৎপাদনের উপাদান পাওয়া যায় তাকে ম‍ূলধন বলা চলে। কিন্তু এই ম‍ূলধন অন্য ম‍ূলধনের মত জড় পদার্থ নয়। জড় পদার্থের র‍ূপে যে ম‍ূলধন তার থেকে এই বিশেষ ধরনের ম‍ূলধনকে প‍ৃথক করার জন্যই একে মানবিক ম‍ূলধন বলা হয়।

মানবিক মূলধনের মধ্যে শ্রমিকদের কারিগরিক জ্ঞান ছাড়াও তাদের সুস্বাস্থ্য ও নীরোগ দেহ-মনের কর্মক্ষমতাকেও বোঝায়।

৬.২ বিনিয়োগ কাকে বলে ?

মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধিকে বিনিয়োগ বলা হয়। ধরি কোন প্রতিষ্ঠানের অধীনে গত বৎসর ১০০০ টাকার মূলধন ছিল। এই বৎসর তার মূলধন হল ১২০০ টাকার। তাহলে এক বছরের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠানের মূলধন ভাণ্ডার ২০০ টাকার মতো বেড়েছে। এই ২০০ টাকার মূলধন বৃদ্ধিকে সেই প্রতিষ্ঠানের সেই এক বছরের বিনিয়োগ বলা হয়।

মূলধন শব্দটি একটি ভাণ্ডারবাচক শব্দ (Capital is a stock concept), কিন্তু বিনিয়োগ একটি প্রবাহবাচক শব্দ (investment is a flow concept)। বিনিয়োগের দ্বারা মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি হয়। কাজেই **যে হারে মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি হয় সেই হারকে বিনিয়োগ বলা হয়।**

বিনিয়োগ যেহেতু একটি প্রবাহ, অতএব বিনিয়োগকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের হিসেবে প্রকাশ করা হয়। প্রবাহ বা গতিকে সময়ের হিসেবে প্রকাশ না করলে তার কোন সম্পূর্ণ অর্থ হয় না। যেমন—আমরা যদি বলি, একটি গাড়ি পঁচিশ কিলোমিটার বেগে ছুটছে, তাহলে স্পষ্ট বোঝা যায় না। আমাদের বলা উচিত—ঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার, কি দুঘণ্টায় পঁচিশ কিলোমিটার। গাড়ির গতি বলতে হলেই সময়ের হিসেবে বলতে হয়। তেমনি বিনিয়োগের মত একটি গতিশীল ব্যাপারকে বোঝাবার জন্যও সময়ের কথা বলতে হয়।

ধরি I = বিনিয়োগ (Investment),
K = মূলধন ভাণ্ডার (Capital Stock),
t = সময়,

তাহলে K_t হবে 't' নামক সময়ে মূলধন ভাণ্ডারের পরিমাণ। t যদি 't' নামক সময় হয়, তাহলে t_{-1} হবে তার ঠিক আগের সময়। যেমন, t বলতে যদি ১৯৮২ সাল বোঝায়, তাহালে t_{-1} হবে তার আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৮১ সাল এবং t_{+1} হবে পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৮৩ সাল ইত্যাদি। মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি বলতেও একটি সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি বোঝায়। যেমন, ১৯৮২ সালের মধ্যে মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি = ১৯৮২ সালের মূলধন ভাণ্ডার—১৯৮১ সালের মূলধন ভাণ্ডার $= K_{1982} - K_{1981} = K_t - K_{t-1}$. তাহলে ১৯৮২ সালের বিনিয়োগ হল $I_{1982} = K_{1982} - K_{1981}$. অনুরূপভাবে, যে কোন t সময়ের বিনিয়োগ = t সময়ের মূলধন ভাণ্ডার—t_{-1} সময়ের মূলধন ভাণ্ডার। অর্থাৎ $I_t = K_t - K_{t-1}$.

বিনিয়োগকে শুধুমাত্র মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি না বলে, মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধির হার বলা হয়।

কোন বিষয়ের ব‌ৃদ্ধিহার = $\frac{\text{সেই বিষয়ের ব‌ৃদ্ধি}}{\text{সেই বিষয়ের ম‌ূলমান}}$

অতএব ম‌ূলধন ভাণ্ডারের ব‌ৃদ্ধির হার = $\frac{\text{ম‌ূলধন ভাণ্ডারের ব‌ৃদ্ধি}}{\text{প্রাথমিক ম‌ূলধন ভাণ্ডার}} = \frac{K_t - K_t}{K_t}$

অতএব $I_t = \frac{K_t - K_{t-1}}{K_t}$

এখানে 't' বলতে একটি বড় মাপের সময়কে বোঝায়। কিন্তু 't' বলতে যদি একটি ম‌ুহ‌ূর্ত মাত্র সময়কে বোঝায়, তাহলে সময় হবে একটি একটানা প্রবাহ (Continuous flow) যার প্রত্যেক বিন্দ‌ুতে ম‌ূলধন ভাণ্ডারের ব‌ৃদ্ধি হয়। সেক্ষেত্রে $I_t = \frac{dK}{d_t}$ হবে, এখানে $\frac{dK}{d_t}$ হল প্রতিম‌ুহ‌ূর্ত সময়ের জন্য ম‌ূলধন ভাণ্ডারের ব‌ৃদ্ধির হার।

প্রতিষ্ঠানের অধীনে দ‌ুধরনের ম‌ূলধন থাকে, যথা, যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর ইত্যাদির আকারে ম‌ূলধন এবং দ্রব্যের মজ‌ুত ভাণ্ডারের (Inventory) আকারে রক্ষিত ম‌ূলধন। যেমন, কোন কাপড়ের মিলে কারখানা ঘর, অন্যান্য ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ম‌ূলধন দ্রব্য থাকতে পারে। তাছাড়া সেই মিলে কিছ‌ু স‌ুতো ও কিছ‌ু তৈরী কাপড়ও মজ‌ুত থাকতে পারে। ভবিষ্যতে স্নতোর যোগান অনিশ্চিত হতে পারে ভেবে কাপড়ের মিলের মালিক আগে ভাগে কিছ‌ু স‌ুতো মজ‌ুত করে রাখতে পারেন। আবার কাপড়ের বাজারের ক্রেতাদের চাহিদা ওঠানামা করতে পারে বলে কিছ‌ু কাপড় গ‌ুদামে মজ‌ুত রাখতে পারেন। তাছাড়া কাপড় উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য উপকরণও মজ‌ুত থাকতে পারে। এইসব মজ‌ুত দ্রব্যের ভাণ্ডারকে মোট মজ‌ুত ভাণ্ডার বলা হয়। তাহলে কোন প্রতিষ্ঠানের মোট ম‌ূলধন ভাণ্ডারের ব‌ৃদ্ধি বলতে বোঝাবে (১) যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর ইত্যাদি প্রকার বাস্তব ম‌ূলধনের ব‌ৃদ্ধি এবং অথবা (২) মজ‌ুত ভাণ্ডারের ব‌ৃদ্ধি।

দেশের সামগ্রিক ম‌ূলধন ভাণ্ডারে থাকে (১) উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগ‌ুলির অধীনে রক্ষিত ম‌ূলধন ভাণ্ডার + দ্রব্যের মজ‌ুত ভাণ্ডার + (২) পারিবারিক ম‌ূলধন যথা, আবাস গ‌ৃহাদি নামক ম‌ূলধন সম্পদ + (৩) সামাজিক ম‌ূলধন + (৪) মানবিক ম‌ূলধন। তাহলে দেশের বিনিয়োগ বলতে বোঝাবে উপরের চারটি ম‌ূলধন ভাণ্ডারের যে-কোন একটি, দ‌ুটি, তিনটি কিংবা চারটির ব‌ৃদ্ধি।

৬.৩ বিনিয়োগের প্রকারভেদ :

(ক) মোট বিনিয়োগ (Gross Investment) ও নীট বিনিয়োগ (Net Investment)।

কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত মোট ম‌ূলধন ভাণ্ডারের ব‌ৃদ্ধিকে সেই প্রতিষ্ঠানের মোট বিনিয়োগ বলা হয়। ধরি, অর্থের হিসেবে কোন উৎপাদন

প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধন ভাণ্ডারের পরিমাণ হল ১০ লক্ষ টাকা। ধরি, সেই প্রতিষ্ঠানে এক বছর পরে মোট মূলধন ভাণ্ডারের পরিমাণ হয় ১০ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। অর্থাৎ সেই বছরের মধ্যে সেই প্রতিষ্ঠানের মূলধন ভাণ্ডারের পরিমাণ ৩০ হাজার টাকা বেড়েছে। তাহলে সেই বছরে সেই প্রতিষ্ঠানের মোট বিনিয়োগ হবে ৩০ হাজার টাকা। বিনিয়োগের ফলে নতুন মূলধনের জন্ম হয় এবং এইভাবে মোট মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের মূলধনের একটি অংশ উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মূলধন দ্রব্যের এই ক্ষয়প্রাপ্তিকে অবচয় (Depreciation) বলা হয়। যেমন, কোন প্রতিষ্ঠানে যদি ১০ লক্ষ টাকার মোট মূলধন ভাণ্ডার থাকে এবং যদি সেই মোট মূলধনের ১০ শতাংশ এক বছরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহলে বুঝতে হবে সেই প্রতিষ্ঠানের ১ লক্ষ টাকার মূলধন দ্রব্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। আবার অবচয়ের হার যদি ২ শতাংশ হয়, তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের মূলধন ভাণ্ডারের ক্ষয় হবে ২০ হাজার টাকা।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে অবচয় হল মূলধনের মৃত্যু। মানুষের মৃত্যুর ফলে যেমন জনসংখ্যা কমে, তেমনি অবচয়ের ফলে মোট মূলধন ভাণ্ডার কমে যায়।

বিনিয়োগের ফলে মোট মূলধন ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়, কিন্তু অবচয়ের ফলে মোট মূলধন ভাণ্ডার হ্রাস পায়। অতএব, বিনিয়োগ থেকে অবচয় বাদ দিলে মোট মূলধন ভাণ্ডার যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া যায় সেটাই হবে মোট মূলধন ভাণ্ডারের নীট বৃদ্ধি। একেই নীট বিনিয়োগ বলা হয়।

অনুরূপভাবে সমগ্র অর্থব্যবস্থার মোট মূলধন ভাণ্ডারের একটি অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। একে মোট অবচয় বলা হয়। মোট বিনিয়োগের ফলে মোট মূলধন ভাণ্ডার যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তার থেকে অবচয় বাদ দিলে মূলধন ভাণ্ডারের নীট বৃদ্ধি পাওয়া যায়। একে নীট বিনিয়োগ বলা হয়।

অতএব, নীট বিনিয়োগ = মোট বিনিয়োগ − অবচয়

ধরি, GI = মোট বিনিয়োগ (Gross Investment)

NI = নীট বিনিয়োগ (Net Investment)

D = অবচয় (Depreciation)

অতএব $NI = GI - D$.

অর্থাৎ $GI = NI + D$.

অর্থাৎ $D = G.I - NI$

অতএব, $D = 0$ হলে $GI = NI$ হবে এবং $GI > D$ হলে $NI > 0$ হবে, $GI < D$ হলে $NI < 0$ হবে।

তাহলে আমরা পাই—

(১) মোট বিনিয়োগ হল মোট মূলধনের সাধারণ বৃদ্ধি, নীট বিনিয়োগ হল অবচয় বাদ দিয়ে মূলধনের প্রকৃত বৃদ্ধি ;

(২) নীট বিনিয়োগ ধনাত্মক হলে মোট মূলধন ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায় ;

(৩) নীট বিনিয়োগ ঋণাত্মক হলে মোট মূলধন ভাণ্ডার হ্রাস পায় ;

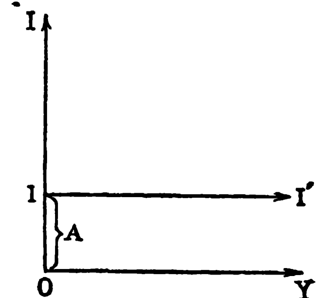
(৪) নীট বিনিয়োগ শূন্য হলে মোট মূলধন ভাণ্ডার অপরিবর্তিত থাকে।

(খ) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment) ও উদ্ভূত বিনিয়োগ (Induced Investment)।

স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ঃ বিনিয়োগ হল মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি। বিনিয়োগকারী বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বিনিয়োগকারীর এই সিদ্ধান্ত কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করতে পারে আবার নাও পারে। যেখানে **বিনিয়োগ কেবলমাত্র বিনিয়োগকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এবং অন্য কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে না, তখন সেই বিনিয়োগকে বলা হয় স্বয়ম্ভূত বা স্বাধীন বিনিয়োগ।** সাধারণত দেখা যায়—সরকার যে বিনিয়োগ করে সেই বিনিয়োগের পরিমাণ অন্য কোন বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। সেইজন্য সরকারী বিনিয়োগকে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বলা যেতে পারে। তবে সরকারী বিনিয়োগ ছাড়া বেসরকারী বিনিয়োগও স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ হতে পারে।

স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ একটি নির্দিষ্ট স্তরে সাময়িকভাবে স্থির থাকে। সেইজন্য স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগকে একটি ধ্রুবক সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায়। আমরা যদি ধরি I = স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ এবং A = একটি স্থির মান,
তাহলে আমরা লিখতে পারি $I = A$.

রেখাচিত্রের সাহায্যে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ দেখানো যায়। রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে আয় (Y) এবং উল্লম্ব অক্ষে বিনিয়োগ (I) পরিমাপ করলে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা আয়-অক্ষের সমান্তরাল হবে। আমাদের রেখাচিত্রে II হল স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা। এখানে আয় শূন্য (Y = O) হলে I = OI হবে। আয় (Y) বাড়লে বা কমলে I-এর কোন পরিবর্তন হবে না। কারণ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ আয়ের উপর নির্ভর করে না। সেইজন্য II' রেখাটি OY-অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে।



৬.১ রেখাচিত্র ঃ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা

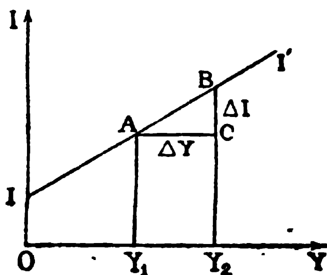
স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়ে II' রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যাবে। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ কমলে II' রেখাটি সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যায়।

উদ্ভূত বিনিয়োগ ঃ বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগের পরিমাণ যখন আয়ের স্তর, সুদের হার, কিংবা অন্য কোন অর্থনৈতিক বিষয়ের

উপর নির্ভর করে, যার ফলে সেই সব বিষয়ের পরিবর্তন হলে বিনিয়োগকারীদের পরিকল্পিত বিনিয়োগের পরিবর্তন হয়, তখন সেই বিনিয়োগকে উদ্ভূত বিনিয়োগ বলা হয়।

বিনিয়োগ যদি আয়ের উপর নির্ভর করে, তাহলে আমরা লিখতে পারি :

$I=I(Y)$ একে আমরা বিনিয়োগ প্রকরণ (Investment Function) বলতে পারি। এখানে I হল উদ্ভূত বিনিয়োগ এবং Y হল আয়ের স্তর। I বলতে মোট বিনিয়োগ বোঝালে Y হবে মোট আয়। এই বিনিয়োগ প্রকরণটির বক্তব্য হল যে, দেশের মোট বিনিয়োগব্যয় মোট আয়ের উপর নির্ভর করবে। মোট আয় থেকে দেশের লোকেদের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা আসে। আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে। চাহিদা বাড়লে দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হয়। দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য চাই অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি, কারখানা ঘর। অর্থাৎ বেশি দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়। মূলধনের পরিমাণের বৃদ্ধি হলেই বিনিয়োগ হয়। অতএব আয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে। আয়ের সঙ্গে বিনিয়োগের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। আয় বাড়লে বিনিয়োগ বাড়ে; আয় কমলে বিনিয়োগ কমে। আয় ও উদ্ভূত বিনিয়োগের এই সম্পর্কটি রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল।



৬.২ রেখাচিত্র : উদ্ভূত বিনিয়োগ রেখা

এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আয় (Y) ও উল্লম্ব অক্ষে উদ্ভূত বিনিয়োগ (I) পরিমাপ করা হচ্ছে। এখানে II' হল বিনিয়োগ রেখা। Y বাড়লে I বাড়ে, কাজেই II' রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। ধরলাম আয় $=OY_1$. এই আয়ে বিনিয়োগ হবে AY_1. আয় যদি বেড়ে OY_2 হয়, তাহলে সেই বর্ধিত আয়ে বর্ধিত বিনিয়োগ হবে BY_2. এখানে আয়ের বৃদ্ধি $(\Delta Y)=Y_1Y_2=AC$ এবং বিনিয়োগের বৃদ্ধি $(\Delta I)=BC$. অতএব $\frac{BC}{AC}$ হল $\frac{\Delta I}{\Delta Y}=$ এক একক অতিরিক্ত আয় থেকে উদ্ভূত পরিকল্পিত বিনিয়োগ। কারণ আয় যখন ΔY একক বাড়ে, তখন বিনিয়োগ বাড়ে ΔI পরিমাণে। অতএব আয় যখন I একক বাড়ে, তখন বিনিয়োগ বাড়ে $\frac{\Delta I}{\Delta Y}$ পরিমাণে তাহলে $\frac{\Delta I}{\Delta Y}$ হল অতিরিক্ত একক আয়ের জন্য অতিরিক্ত পরিকল্পিত বিনিয়োগ। একে প্রান্তিক বিনিয়োগের প্রবণতা (Marginal Propensity to Invest বা MPI) বলা হয়। রেখাচিত্রের ভাষায় MPI হল বিনিয়োগ রেখার ঢাল (slope)।

৬.৪ ম‌ূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal Efficiency of Capital) সম্পর্কিত ধারণা :

(ক) বর্তমান আয় (Present Income) ও ভবিষ্যৎ আয় (Future Income) এবং ভবিষ্যৎ আয়ের বর্তমান ম‌ূল্য (Present value of future income)

ধরা যাক, আজ P_0 টাকা ধার দিলে n বছর পরে P_n টাকা পাওয়া যায়। এখানে P_0 হল বর্তমান আয় এবং P_n হল ভবিষ্যৎ আয়। আমরা যদি P_0 ও সুদের হার জানতে পারি, তাহলে P_n হিসেব করে বার করতে পারব। ধরা যাক, সুদের হার হল চক্রব‌ৃদ্ধি হার। এই সুদের হারে সুদ ক্রমাগতভাবে বর্তমান আয়ের সঙ্গে য‌ুক্ত হয়। সুদের হায় যদি বার্ষিক $r\%$ হয়, তাহলে আমরা পাই,

1 বছরে 100 টাকার স‌ুদ r টাকা,

$\therefore$ 1 „ 1 „ „ $\frac{r}{100}$ „

$\therefore$ 1 „ P_0 „ „ $P_0 \ \frac{r}{100} = \frac{P_0 r}{100}$ টাকা।

1 বছর পরে ম‌ূল হল $P_0 + \frac{P_0 r}{100}$

ধরা যাক, প্রথম বছর শেষে প্রাপ্ত সব‌ৃদ্ধিম‌ূল $= P_1$.

তাহলে, $P_1 = P_0 + \frac{P_0 r}{100} = P_0\left(1 + \frac{r}{100}\right)$

P_1 হল প্রথম বছরের শেষে, অর্থাৎ দ্বিতীয় বছরের ম‌ূলধন। আবার হিসেব করি,

100 টাকার 1 বছরের স‌ুদ r টাকা

$\therefore$ 1 „ 1 „ „ $\frac{r}{100}$ „

$\therefore$ P_1 „ 1 „ „ $\frac{P_1 r}{100}$ „

এটা হল দ্বিতীয় বছরের সব‌ৃদ্ধি ম‌ূল $= P_2$

অতএব $P_2 = P_1 + \frac{P_1 r}{100} = P_1\left(1 + \frac{r}{100}\right)$

কিন্তু উপরে আমরা পেয়েছি $P_1 = P_0\left(1 + \frac{r}{100}\right)$

অতএব $P_2 = P_1\left(1 + \frac{r}{100}\right) = P_0\left(1 + \frac{r}{100}\right)\left(1 + \frac{r}{100}\right)$

$= P_0\left(1 + \frac{r}{100}\right)^2$. অর্থাৎ $P_2 = P_0\left(1 + \frac{r}{100}\right)^2$

আবার P_2 টাকার সুদ হবে $P_2 \frac{r}{100}$

অতএব তৃতীয় বছরের আয় P_3 হবে

$$P_3 = P_2 + P_2 \frac{r}{100} = P_2\left(1 + \frac{r}{100}\right)$$

কিন্তু $P_2 = P_0\left(1 + \frac{r}{100}\right)^2$ বসিয়ে পাই,

$$P_3 = P_0\left[1 + \frac{r}{100}\right]^2\left[1 + \frac{r}{100}\right]$$

$$= P_0\left[1 + \frac{r}{100}\right]^3.$$ এইভাবে

$$P_4 = P_0\left[1 + \frac{r}{100}\right]^4,$$ এবং n বছর পরে

$$P_n = P_0\left[1 + \frac{r}{100}\right]^n$$ হবে। তাহলে আমরা পাই, বর্তমান আয় P_0 টাকা যদি শতকরা বার্ষিক r টাকা চক্রবৃদ্ধি সুদের হারে ধার দেওয়া হয়, তাহলে n বছর পরে ভবিষ্যৎ আয় হবে $P_n = P_0\left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$ টাকা।

অন্যভাবে বলা যায়, n বছর পরে P_n টাকা পেতে হলে আজ P_0 টাকা দিতে হবে। এখানে P_0 হল P_n টাকার বর্তমান মূল্য (Present value)। ধরা যাক, আমি P_0 টাকা দিয়ে আজ একটা বণ্ড বা ঋণপত্র কিনলাম যাতে n বছর পরে P_n টাকা পাওয়া যাবে। আমি যদি আজই সেই বণ্ডটাকে কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে বিক্রি করে দিই, তাহলে ব্যাঙ্ক আমাকে নিশ্চয়ই P_n টাকা দেবে না, ব্যাঙ্ক দেবে P_n টাকার বর্তমান মূল্য। এই বর্তমান মূল্য ভবিষ্যৎ মূল্যের চেয়ে কম হবে। এই কমানো মূল্যকে discounted value বা বাট্টাকৃত মূল্য বলা হয়। ব্যাঙ্ক যে হারে ভবিষ্যৎ মূল্যকে কমিয়ে তা থেকে বর্তমান মূল্যের হিসেব করবে তাকে Rate of discount বা বাট্টার হার বলা হয়।

ব্যাঙ্ক যদি $m\%$ হারে বণ্ডটি বাট্টা করে তাহলে ব্যাঙ্ক হিসেব করে দেখবে আজ কত টাকা $m\%$ সুদে ধার দিলে n বছর পরে P_n টাকা পাওয়া যাবে। ধরা যাক, সেই টাকাটা হল V (Value), তাহলে $V\left(1 + \frac{m}{100}\right)^n = P_n$.

উভয় পক্ষকে $\left(1 + \frac{m}{100}\right)^n$ দিয়ে ভাগ করে

আমরা পাই $V = \dfrac{P_n}{\left(1 + \frac{m}{100}\right)^n}$. এখানে

V হল P_n টাকা ভবিষ্যৎ আয়ের বর্তমান মূল্য, m হল বাট্টার হার। তাহলে আমরা পাই

$$\text{বর্তমান মূল্য} = \frac{\text{ভবিষ্যৎ আয়}}{\left(1+\frac{\text{বাট্টার হার}}{100}\right)^{\text{বছর}}}$$

এখানে $\frac{\text{বাট্টার হার}}{100} = \frac{m}{100}$ হল প্রতি টাকায় বাট্টার হার (per rupee rate of discount). একটি উদাহরণ নিয়ে ব্যাপারটি বোঝান যায়। ধরা যাক, ২ বছর পরে একটি বন্ড থেকে ১২১ টাকা পাওয়া যাবে। ১২১ টাকা হল ভবিষ্যৎ আয়। এখন এই বন্ডটিকে কোন ব্যাঙ্কে ভাঙ্গিয়ে নিলে কত টাকা পাওয়া যাবে? ধরি বাট্টার হার ১০%। তাহলে আমাদের সূত্র মতে ১০% বাট্টার হারে ২ বছর পরে প্রাপ্য ১২১ টাকা ভবিষ্যৎ আয়ের বর্তমান মূল্য

$$= \frac{\text{১২১ টাঃ}}{\left\{১+\frac{১০}{১০০}\right\}^{২}} = \frac{১২১}{\left\{\frac{১১০}{১০০}\right\}^{২}} \text{ টাঃ}$$

$$= \frac{১২১}{\frac{১১০ \times ১১০}{১০০ \times ১০০}} \text{ টাঃ} = \frac{১২১ \times ১০০ \times ১০০}{১১০ \times ১১০} \text{ টাঃ}$$

= ১০০ টাকা।

অন্যভাবে বলা যায়, আজ ১০০ টাকা ১০% বার্ষিক সুদে ধার দিলে ২ বছর পরে ১২১ টাকা পাওয়া যাবে, কিংবা ১০% বার্ষিক সুদে ২ বছর পরে ১২১ টাকা পেতে হলে আজ ১০০ টাকা দিতে হবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উপরের সূত্রে বাট্টার হার ভগ্নাংশের নীচে অর্থাৎ 'হর'-এ আছে। কাজেই P_n যদি স্থির থাকে, কিন্তু m (বাট্টার হার) যদি বাড়ে, তাহলে বর্তমান মূল্য কমবে। বাট্টার হার কমলে বর্তমান মূল্য বাড়বে।

(খ) মূলধন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাট্টার প্রয়োগ ও বর্তমান মূল্যের হিসেব :

কোন যন্ত্রকে মূলধন দ্রব্য বলা যেতে পারে। ধরি, একটি যন্ত্রের আয়ু হল দশ বছর। দশ বছর ধরে যন্ত্রটি দ্রব্য উৎপাদন করবে। সেই দ্রব্য বিক্রয় করে আয় পাওয়া যাবে। ধরি, যন্ত্রটি থেকে প্রথম বছরে R_1 টাকার, দ্বিতীয় বছরে R_2 টাকার, তৃতীয় বছরে R_3 টাকার, এইভাবে দশম বছরে R_{10} টাকার আয় পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। এখানে R_1 , R_2, R_3,......, R_{10} হল যন্ত্রটি থেকে প্রাপ্য ভবিষ্যৎ আয়। আয়কে প্রতিদান (Return) বলা যায়। তাহলে R_1, R_2, R_3 ইত্যাদি হল সম্ভাব্য প্রতিদান বা প্রত্যাশিত প্রতিদান (Expected returns)।

কোন বিনিয়োগকারী যদি যন্ত্রটি ক্রয় করতে চায় তাহলে সে R_1, R_2, R_3

ইত্যাদি ভবিষ্যৎ আয়গুলোকে যোগ করবে না ; সে বরং ঐ ভবিষ্যৎ আয়গুলোর বর্তমান মূল্য (Present value) হিসেব করবে। বর্তমান মূল্য হিসেব করার জন্য বাট্টার হার হল, ধরা যাক, প্রতি টাকায় m টাকা প্রতি বছর।

তাহলে R_1 টাকার বর্তমান মূল্য হবে $\frac{R_1}{1+m}$ টাকা

R_2 টাকার বর্তমান মূল্য হবে $\frac{R_2}{(1+m)^2}$ টাকা,

R_3 টাকার বর্তমান মূল্য হবে $\frac{R_3}{(1+m)^3}$ টাকা, ইত্যাদি।

এইভাবে যন্ত্রটি থেকে প্রাপ্য সব ভবিষ্যৎ আয়ের মোট বর্তমান মূল্য হবে

$$\frac{R_1}{1+m}+\frac{R_2}{(1+m)^2}+\frac{R_3}{(1+m)^3}+\cdots+\frac{R_{10}}{(1+m)^{10}}$$

মোট বর্তমান মূল্যকে যদি V বলি এবং যন্ত্রটি যদি n বছর থাকে

তাহলে $V=\frac{R_1}{1+m}+\frac{R_2}{(1+m)^2}+\cdots+\frac{R_n}{(1+m)^n}$ হবে।

n বছর পরে যন্ত্রটি কাজের অযোগ্য হয়ে যাবে। কিন্তু তাকে ওজন দরে বিক্রি করেও তো কিছু পয়সা পাওয়া যাবে? এটি হল যন্ত্রের ধাতুগত মূল্য (scrap value)। ধরি, S হল যন্ত্রের ধাতুগত মূল্য। তার বর্তমান মূল্য হবে $\frac{S}{(1+m)^n}$. একে ধরলে যন্ত্রের মোট বর্তমান মূল্য হবে—

$$V=\frac{R_1}{1+m}+\frac{R_2}{(1+m)^2}+\cdots+\frac{Rn}{(1+m)^n}+\frac{S}{(1+m)^n}.$$

যন্ত্রটি থেকে প্রতি বছর সমান মূল্যের প্রতিদান পাওয়া গেলে $R_1, R_2, \cdots; R_n$ সব সমান হবে। তখন R-এর গায়ে 1, 2, 3, ইত্যাদি সংখ্যাগুলি বসাতে হবে না। সেক্ষেত্রে $V=R\left[\frac{1}{1+m}+\frac{1}{(1+m)^2}+\cdots+\frac{1}{(1+m)^n}\right]+\frac{S}{(1+m)^n}.$

উপরের এই সূত্রটিতে V, R ও m নামক তিনটি বিষয় জড়িত। V হল মোট বর্তমান মূল্য, R হল যন্ত্রের সম্ভাব্য প্রতিদান এবং m হল বাট্টার হার। এখন V, R ও m-এর মধ্যে আমরা নিম্নলিখিত সম্পর্কগুলি লক্ষ্য করতে পারি—

(১) V, R ও m-এর মধ্যে যে-কোন দুটির মান জানতে পারলে তৃতীয়টির মান জানা যাবে ;

(২) যদি R বাড়ে, m স্থির থাকে, তাহলে V বাড়বে, R কমলে V কমবে ;

(৩) যদি R স্থির থাকে এবং m কমে তাহলে V বাড়বে, যদি m বাড়ে, তাহলে V কমবে।

অতএব Rকে যদি স্থির বলে ধরা হয়, তাহলে V ও m পরস্পর বিপরীত

সম্পর্কে আবদ্ধ হবে। অর্থাৎ m বাড়লে V কমবে, m কমলে V বাড়বে। কীন্সীয় বিনিয়োগতত্ত্বে V ও m-এর এই বিপরীত সম্পর্কটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

(গ) যন্ত্রের ব্যয় (cost), যন্ত্রের বর্তমান মূল্য ও বাট্টার হারের সম্পর্ক।

বিনিয়োগকারী কোন মূলধন দ্রব্য বা যন্ত্র ক্রয় করতে চাইলে তাকে যন্ত্রের দাম দিতে হবে। এটা হল যন্ত্রের জন্য বিনিয়োগকারীর ব্যয় (cost)। পুরোনো অকেজো যন্ত্রকে সরিয়ে নতুন যন্ত্র বসাতে এই ব্যয় লাগে, সেজন্য এই ব্যয়কে মূলধনের পুনঃস্থাপন ব্যয় (Replacement cost) বলা হয়।

মূলধনের ব্যয়কে মূলধনের বর্তমান মূল্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। বর্তমান মূল্য (V) যদি পুনঃস্থাপন ব্যয় (C) অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে বিনিয়োগকারী নতুন যন্ত্র বসায়। ধরি, কোন যন্ত্রের দাম 10,000 টাকা। সেই যন্ত্র থেকে যে প্রতিদান পাওয়া যাবে হিসেব করে দেখা গেল তার বর্তমান মূল্য 9,000 টাকা। তাহলে বিনিয়োগকারী যন্ত্রটি বসাবে না। আমরা বলতে পারি—$C > V$ হলে, বিনিয়োগ হবে না, $V > C$ হলেই বিনিয়োগ হবে।

যদি $V > C$ হয়, তাহলে বিনিয়োগ বাড়বে। বিনিয়োগ বাড়লে মূলধন বাড়বে এবং অন্য সব উপাদানের পরিমাণ স্থির থাকলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির জন্য প্রতিদান বা R কমবে। বাট্টার হার সমান থাকলে R কমার জন্য V কমবে। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত $V = C$ না হয়, ততক্ষণ বিনিয়োগ বাড়তে থাকবে। অবশেষে $V = C$ হবে।

৬.৫ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (MEC) কাকে বলে ?

কোন মূলধন দ্রব্য থেকে বিভিন্ন বছরে যে সব সম্ভাব্য প্রতিদান (Expected returns) পাওয়া যায়, সেই প্রতিদানগুলিকে একটি নির্দিষ্ট বাট্টার হারে বাট্টা করে পাওয়া যায় সম্ভাব্য প্রতিদানের বর্তমান মূল্য বা বাট্টাকৃত মূল্য। সেই বর্তমান মূল্যগুলি যোগ করে পাওয়া যায় মোট বর্তমান মূল্য। সেই বর্তমান মূল্যকে মূলধনের পুনঃস্থাপন ব্যয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। যদি বর্তমান মূল্য ব্যয়ের থেকে কম হয়, তাহলে বাট্টার হার কমানো হয়, যাতে বর্তমান মূল্য বাড়ে। ব্যয় কম হলে, বাট্টার হার বাড়ানো হয়, যাতে বর্তমান মূল্য কম হয়। এইভাবে বাট্টার হার যখন এমন হয় যে, সেই বাট্টার হারে মূলধনের বর্তমান মূল্য ও পুনঃস্থাপন ব্যয় সমান হয়, তাহলে সেই বাট্টার হারকে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal Efficiency of Capital বা MEC) বলা হয়। অতএব আমরা পাই, **যে বাট্টার হারে কোন মূলধন দ্রব্যের সম্ভাব্য সব প্রতিদানের মোট বর্তমান মূল্য সেই মূলধনের পুনঃস্থাপন ব্যয়ের সমান হয়, সেই বাট্টার হারকে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বলা হয়।**

ধরি C = কোন মূলধন দ্রব্যের পুনঃস্থাপন ব্যয়,

V = মোট বর্তমান মূল্য,

n = মূলধন দ্রব্যের আয়ুষ্কাল,

R_1, R_2,…R_n = মূলধন দ্রব্যটি থেকে প্রত্যাশিত যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, …n-তম বৎসরের সম্ভাব্য প্রতিদান, S = মূলধনের শেষ দাম (Scrap Value), m = বাট্টার হার,

তাহলে $V=\frac{R_1}{(1+m)}+\frac{R_2}{(1+m)^2}+\cdots+\frac{R_n}{(1+m)^n}+\frac{S}{(1+m)^n}$ হবে মূলধনের মোট বর্তমান মূল্য। এখন m যদি এমন হয় যে, সেই m দিয়ে R_1, R_2,…R_n ও S-কে বাট্টা করলে যে V পাওয়া যাবে সেই V মূলধনের ব্যয় বা C-এর সমান হয়, তাহলে সেই বাট্টার হার বা m-কে বলা হবে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (MEC) অতএব MEC হল সেই m, যে m-এর জন্য V = C হবে।

৬.৬ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (MEC) রেখা ও তার আকৃতি :

(ক) মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা রেখা কাকে বলে ?

কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন দ্রব্যের ব্যয় ও সম্ভাব্য প্রতিদান জানা থাকলে আমরা তার প্রান্তিক দক্ষতা বার করতে পারি। এইভাবে বিভিন্ন পরিমাণ মূলধন (K) ও তাদের প্রত্যেকের প্রান্তিক দক্ষতার (MEC বা m) মান রেখাচিত্রে বসিয়ে আমরা যে রেখা পাই তার নাম মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা রেখা। এই রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে মূলধন (K) এবং উল্লম্ব অক্ষে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (MEC বা m) পরিমাপ করা হয়। আমরা এই রেখাকে সংক্ষেপে MEC রেখা বলে থাকি।

(খ) এই রেখার আকৃতি :

MEC রেখা রেখাচিত্রের বাম দিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয়। মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ক্রমহ্রাসমান হওয়ার জন্যই MEC রেখা নিম্নমুখী হয়। এখন প্রশ্ন হতে পারে—মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কেন ক্রমহ্রাসমান হয় ?

এর উত্তরে বলা যায় যে—অন্যান্য উপাদানের-নিয়োগ স্থির রেখে উৎপাদন কার্যে যদি মূলধনের নিয়োগ অতিরিক্ত এক একক বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে মূলধনের অতিরিক্ত নিয়োগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিদান ক্রমশ কমে আসে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনবিধি কার্যকরী হওয়ার জন্যই এরূপ হয়। অর্থাৎ অতিরিক্ত একটি যন্ত্র বসালে তার থেকে কম আয় পাওয়া যাবে। এটা হল প্রতিষ্ঠানের আয়ের দিকের পরিবর্তন। কিন্তু অতিরিক্ত যন্ত্র বসালে শুধু যে আয়ের পরিবর্তন হবে তা নয়, প্রতিষ্ঠানের ব্যয়েরও পরিবর্তন হবে।

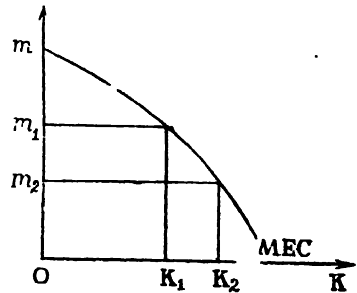
অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্য বসাতে হলে তার পুনঃস্থাপন ব্যয় বাড়তে পারে, স্থির

থাকতে পারে, আবার কমে যেতেও পারে। যেমন, একটি যন্ত্রের দাম ১০,০০০ টাকা। দুটি যন্ত্র বসাতে হলে প্রত্যেকটির দাম ১২,০০০ টাকাও হতে পারে, ১০,০০০ টাকা থাকতে পারে, আবার কমে গিয়ে ৮,০০০ টাকাও হতে পারে।

যে শিল্পে সেই যন্ত্র তৈরী হচ্ছেতার ব্যয়ের অবস্থার উপর এই ব্যাপারটা নির্ভর করবে। যন্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি যদি স্থির ব্যয়ে যন্ত্র উৎপাদন করে, তাহলে অতিরিক্ত যন্ত্রের দাম বা ব্যয় স্থির থাকবে। কিন্তু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানটি যদি ক্রমবর্ধমান ব্যয় স্তরে থাকে, তাহলে অতিরিক্ত যন্ত্রের জন্য ব্যয় বেশি হবে। আমরা একেই স্বাভাবিক ঘটনা বলে ধরে নিতে পারি।

তাহলে অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগ করলে একদিকে যন্ত্রের প্রতিদান ও বর্তমান মূল কমে, অন্যদিকে তার পুনঃস্থাপন ব্যয় বাড়ে। অর্থাৎ K বাড়লে V কমে, C বাড়ে। তাহলে ভারসাম্যের জন্য \-কে বাড়াতে হয়। তার জন্য মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (m) কমে, অর্থাৎ K বাড়লে m কমে। এইভাবে MEC রেখা নিম্নমুখী হয়। নীচে রেখাচিত্র দিয়ে MEC রেখার আকৃতি দেখানো হল।

এই রেখাচিত্রে MEC নামক রেখাটি হল একটি নিম্নমুখী MEC রেখা। এই রেখা থেকে বোঝা যায় যে, মূলধনের নিয়োগ (K) বৃদ্ধি পেলে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (m) কমে যায়। যেমন, মূলধন যখন OK_1, তখন MEC হল Om_1, মূলধন বেড়ে OK_2 হলে MEC কমে গিয়ে Om_2 হয়।



৬ ৩ রেখাচিত্র : মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা রেখা।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার ধারণাটি কীন্‌সের মূলধন-তত্ত্বের প্রধান স্তম্ভ। তাঁর আগে ছিল মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা-তত্ত্ব। এই তত্ত্বে বলা হত যে, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হবে। কীন্‌স এই তত্ত্বটিকেই পরিমার্জিত করে তাঁর নিজের তত্ত্বের উদ্ভব ঘটান।

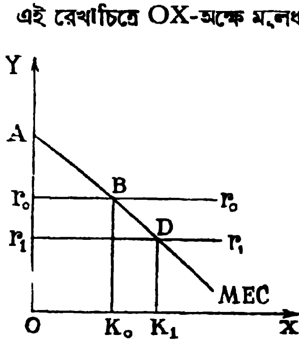
৬.৭ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার সঙ্গে সুদের হারের সম্পর্ক।

কোন মূলধন দ্রব্যকে উৎপাদন কার্যে প্রয়োগ করে যে আয় পাওয়া যায়, তারই একটি পরিমার্জিত হিসেব হল মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (Marginal Efficiency of Capital বা MEC). এটা হল বিনিয়োগকারীর আয়ের দিক।

বিনিয়োগকারী যে মূলধন দ্রব্য ব্যবহার করে তার দাম আছে। সেই দাম দেওয়ার জন্য তাকে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। বিনিয়োগকারী যদি অন্যের কাছ থেকে টাকা ধার করে যন্ত্র ক্রয় করে, তাহলে ঋণদাতাকে সুদ দিতে হবে।

বিনিয়োগকারী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (যেমন, ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান) থেকে ঋণ নিতে পারে। সেই ঋণের সুদ হল বিনিয়োগের ব্যয় (Cost of investment). বিনিয়োগকারী মূলধন দ্রব্য ক্রয় করে ও উৎপাদনে ব্যবহার করে যে আয় পাবে সেই আয়কে সুদের হারের সঙ্গে তুলনা করে দেখবে। অর্থাৎ বিনিয়োগকারী মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (MEC) ও সুদের হারের তুলনা করবে। যদি MEC সুদের হারের থেকে বেশি হয়, তাহলে বিনিয়োগ করবে; বিনিয়োগ করলে মূলধনের নিয়োগ বাড়বে এবং MEC কমবে। যতক্ষণ MEC সুদের হারের থেকে বেশি থাকবে ততক্ষণ মূলধনের বিনিয়োগ বাড়বে এবং MEC কমবে। অবশেষে MEC ও সুদের হার সমান হবে। যেখানে MEC ও সুদের হার সমান হবে সেখানে বিনিয়োগকারী ভারসাম্য লাভ করবে। নীচে রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখানো হল।

এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে মূলধনের পরিমাণ ও OY-অক্ষে MEC ও সুদের হার পরিমাপ করা হচ্ছে। এখানে MEC হল মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা রেখা। r_0r_0 হল সুদের হার রেখা। এখানে সুদের হার স্থির আছে বলে ধরা হয়েছে। MEC রেখা ও r_0r_0 রেখা B বিন্দুতে ছেদ করেছে। B হবে ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে সুদের হার Or_0. সেই সুদের হারে OK_0 পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করা হবে। এর ফলে বিনিয়োগকারীর মোট সর্বাধিক মুনাফা হবে Ar_0B নামক ত্রিভুজাকৃতি ক্ষেত্রটি।



৬.৪ রেখাচিত্র : সুদের হার ও মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার সম্পর্ক

সুদের হার যদি কমে, তাহলে সুদের হার প্রকাশক রেখাটি সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যাবে। রেখাচিত্রে r_1r_1 হল নিম্নতর সুদের হার রেখা। এখানে ভারসাম্যের বিন্দু হবে D বিন্দু। এখানে Or_1 সুদের হারে OK_1 পরিমাণ মূলধন ব্যবহৃত হবে।

অতএব সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে, বিনিয়োগ বাড়লে MEC কমে এবং এইভাবে সুদের হার ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

৬.৮ মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (MEC) কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (MEC) প্রধানত মূলধন দ্রব্য থেকে সম্ভাব্য আয়প্রাপ্তি ও মূলধন দ্রব্যের দামের উপর নির্ভর করে। এখানে দুটি বিষয় জড়িত : এক—মূলধন দ্রব্য থেকে কী পরিমাণ আয় পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশা (Expectation) এবং দুই—মূলধন দ্রব্যের জন্য কী পরিমাণ দাম দিতে হবে। মূলধন

দ্রব্য বা যন্ত্র বসিয়ে দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। সেই দ্রব্য বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু দ্রব্যগুলো যে বিক্রি হবেই এমন কোন কথা নেই। দ্রব্যের চাহিদা খুবই অনিশ্চিত ব্যাপার। কাজেই ব্যবসায়ীদের আশা-আশঙ্কা থাকবেই। কীন্স এই আশা-আশঙ্কাকে MEC নির্ধারণকারী বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। আমরা বলতে পারি MEC নির্ভর করে—

(১) ব্যবসায়ীদের আস্থার অবস্থা (State of business confidence), বা আশা-আশঙ্কা,

(২) কর-কাঠামোর পরিবর্তন (Changes in tax structure),

(৩) মজুরীর হারের পরিবর্তন (Changes in wage rates),

(৪) কারিগরিক উন্নয়ন (Technological development) এবং

(৫) জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population growth) ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

১। ব্যবসায়ীদের আশা বলতে বোঝায়, লাভের আশা এবং আশঙ্কা হল ক্ষতির আশঙ্কা। ভবিষ্যতে কোন্ মূলধন দ্রব্য থেকে কী পরিমাণ সম্ভাব্য আয় বা প্রতিদান পাওয়া যাবে তার হিসেব করার সময় বিনিয়োগকারীরা আশা-আশঙ্কার দ্বারা প্রভাবিত হয়। কীন্স এই আশা-আশঙ্কাগুলির দুটি শ্রেণীবিভাগ করেছেন—(ক) স্বল্পকালীন আশা ও (খ) দীর্ঘকালীন আশা। খুব কাছাকাছি ভবিষ্যতের ঘটনাকে সামান্য পুরোনো অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করা হলে আমরা তাকে স্বল্পকালীন আশা-আশঙ্কার প্রভাব বলতে পারি। যেমন, আগামী মাসে কীরকম বিক্রি হবে সেটা গত দুমাসের বিক্রি দেখে, আঁচ করার চেষ্টা করা হলে তাকে স্বল্পকালীন আশা বলা যায়। অপরপক্ষে, দীর্ঘকালীন আশা-আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের মনের গঠনের মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকে। কীন্সের মতে স্বল্পকালীন আশা-আশঙ্কাগুলি আবার বহু আভ্যন্তর (Endogeneous) অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দামস্তর, মুনাফা, কর্মনিয়োগের স্তর, বিক্রয়ের পরিমাণ, মজুরীর হার, সুদের হার, অর্থের যোগান, ঋণের যোগান ও সহজলভ্যতা ইত্যাদি। স্বল্পকালে ব্যবসায়ীরা এই বিষয়গুলির পরিবর্তন হবে না বলে ধরে নেয়। কাজেই স্বল্পকালে ব্যবসায়ীদের আচরণের খুব একটা বেশি রকমের ওঠা-নামা হয় না। কীন্সের মতে দীর্ঘকালীন আশা-আশঙ্কাগুলি বহু বাহ্যিক (Exogeneous) বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নতুন যুদ্ধ বেধে যাওয়ার আশঙ্কা, অথবা পুরানো যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি অথবা শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা, জনসংখ্যার গঠন ও পরিমাণ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, অর্থনৈতিক আবিষ্কার বা নতুন দ্রব্যের প্রচলন, রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সম্ভাবনা, শ্রমিক আন্দোলন, স্বদেশ ও বিদেশের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন ইত্যাদি। এই বিষয়গুলো খুবই অনিশ্চিত। কোন্ পথে এদের পরিবর্তন হবে সে সম্বন্ধে আগে থেকে কিছুই বলা যাবে না। সেইজন্য ব্যবসায়ীরা ও বিনিয়োগকারীরা নিজেদের ধ্যান-

ধারণা, ভাবনা-চিন্তার উপর নির্ভর করে থাকে। অর্থাৎ বিনিয়োগকারীরা নিজেদের animal spirit-এর উপর ভর করে থাকে।

(২) সরকার উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয় কর ইত্যাদি পরোক্ষ কর এবং প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর মুনাফা কর বসান। উৎপাদন শুল্ক ও বিক্রয় করের ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। দাম বৃদ্ধি পেলে চাহিদা হ্রাস পায়। কাজেই নতুন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে MEC কমে যায়। আবার কোম্পানীর উপর মুনাফা কর চাপলে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ করার উৎসাহ কমে যায়। অবশ্য অনেকে মনে করেন কয়েকটি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কর নিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

(৩) মজুরীর হারের পরিবর্তনের ফলে MEC কীরূপ প্রভাবিত হয় সে সম্বন্ধে স্থির করে কিছু বলা যায় না। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন মজুরীর হার কমলে উৎপাদনের ব্যয় কমে, কাজেই MEC বৃদ্ধি পেতে পারে। কীন্সের মতে মজুরীর হার কমলে ব্যয় কমে সত্যই, কিন্তু প্রতিষ্ঠানের ব্যয় কমে যাওয়ার অর্থই হল শ্রমিকদের আয় কমে যাওয়া। এর ফলে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা কমে যেতে পারে। চাহিদা কমে যেতে পারে বলে মনে করলেই নতুন বিনিয়োগ-কারীরা বিনিয়োগ করতে ভয় পাবে। অর্থাৎ মজুরীর হার কমলে MEC কমে যেতে পারে। অবশ্য কীন্সের মতে মজুরীর হার কমলে লেনদেনের জন্য অর্থের চাহিদা কমে যায়। লোকে টাকা ধার দিতে চায় বেশি করে। এতে সুদের হার কমে যায়। সুদের হার কমলে বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হয়। ফলে MEC রেখা উপরের দিকে উঠে যায়। অবশ্য সুদের হারের সঙ্গে বিনিয়োগের যোগ যে খুবই ঘনিষ্ঠ এমন বলা যায় না। অন্ততপক্ষে কীন্স তাই মনে করতেন। কাজেই মজুরীর হার কমিয়ে MECকে প্রভাবিত করা যাবে বলে মনে হয় না।

(৪) কারিগরিক উন্নয়ন দুভাবে MECকে প্রভাবিত করতে পারে। প্রথমত, কারিগরিক উন্নয়নের ফলে পুরোনো ধরনের যন্ত্র সচল থাকলেও সেকেলে বলে বাতিল হয়ে যায়, কারণ নতুন উৎপাদন পদ্ধতিতে সেই যন্ত্র ব্যবহার করা যায় না। এতে বিনিয়োগকারীর ক্ষতি হয়, বহু টাকার নতুন যন্ত্র ক্রয় করতে হয়, বহু টাকার পুরোনো যন্ত্র বাদ দিতে হয়। এইভাবে কারিগরিক উন্নয়ন MECকে কমিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, নতুন উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধনের কার্যকারিতা খুব বেড়ে যায়। ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে বিনিয়োগকারীরা উৎসাহিত হতে পারে। এইভাবে কারিগরিক উন্নয়ন MEC-কে বাড়িয়ে দেয়।

(৫) জনসংখ্যা ও তার গঠন MECকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য-সামগ্রীর চাহিদা বাড়ে, কাজেই নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা লাভজনক হয়। জনসংখ্যা হ্রাস পেলে এর বিপরীত ঘটনা ঘটতে পারে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়, আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জন্মের

হার কমে যায়, ফলে জনসংখ্যাও কমতে থাকে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতা কমে যাবে, অবশ্য জনসংখ্যা কমলেও বা স্থির থাকলেও জনগণের জীবন-যাত্রার মান যত উন্নত হবে, ততই ভোগ্যদ্রব্য, বিশেষ করে আরামদায়ক স্থায়ী ও অর্ধ-স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য যেমন, মোটরগাড়ি, টি. ভি. ইত্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। সেদিক থেকে বিনিয়োগ উৎসাহ পাবে এবং MEC বাড়বে।

পরিশেষে বলা যায় যে, MEC প্রধানত ব্যবসায়ীদের আশা-আশঙ্কার উপর নির্ভর করে। অন্য বিষয়গুলি প্রথমে আশা-আশঙ্কাকে প্রভাবিত করে, তারপর তার মাধ্যমে MECকে প্রভাবিত করে।

প্রশ্নাবলী

১। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কাকে বলে ? এর সাহায্যে বিনিয়োগকারী কীভাবে মূলধনের পরিমাণ স্থির করে ?

২। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কাকে বলে ? মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা রেখার আকৃতি আলোচনা কর।

৩। সুদের হার ও মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার সম্পর্ক বিচার কর।

৪। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

৫। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

সংজ্ঞা দাও : (১) মূলধনের মোট বর্তমান মূল্য, (২) পুনঃস্থাপন ব্যয় (৩) প্রত্যাশিত প্রতিদান, (৪) বাট্টার হার।

সপ্তম অধ্যায়

সরল কীন্সীয় গুণকতত্ত্ব
(The Simple Keynesian Multiplier Theory)

৭.১ (ক) গুণক কাকে বলে ?

কীন্সের মতে দেশের কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দেশের আয় বাড়ে, আয় বাড়লে তা থেকে আবার ব্যয় বাড়ে, তার ফলে আবার আয় বাড়ে, এইভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মোট আয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, সেই আয় বৃদ্ধি প্রাথমিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির বেশ কয়েক গুণ হয়ে যায়। বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে ΔI এবং আয়-বৃদ্ধিকে ΔY বললে, আমরা পাই

$$\Delta Y = K\Delta I$$

অর্থাৎ আয়ের বৃদ্ধি হল বিনিয়োগের বৃদ্ধির K গুণ। এখানে K হল গুণক (Multiplier)। **তাহলে কোন দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে সেই দেশের আয় সেই অতিরিক্ত বিনিয়োগের যতগুণ বৃদ্ধি পায়, তাকে গুণক বলা হয়।**

যেমন, কোন দেশে 100 টাকা বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে দেশের আয় 200 টাকা বৃদ্ধি পেলে গুণক হবে 2, আয় 300 টাকা বৃদ্ধি পেলে গুণক হবে 3 ইত্যাদি।

(খ) কোন দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে সেই দেশের আয় কীভাবে বৃদ্ধি পায় (গুণক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা) :

কীন্সের মতে কোন দেশের বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে সেই দেশের মোট আয় বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগ যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, দেশের মোট আয় তার কয়েক গুণক বেশি বৃদ্ধি পায়। দেশের আয় মোট বিনিয়োগ বৃদ্ধির যত গুণ বৃদ্ধি পায় তাকে গুণক বলা হয়। বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে কীভাবে মোট আয় বাড়ে তা একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখানো যায়।

গুণকতত্ত্বের মূল কথা হল যে—সমাজে একজনের ব্যয় থেকেই অন্যজনের আয় হয়। সেই অন্যজন আবার তার বর্ধিত আয় থেকে ভোগব্যয় করে। এর ফলে যারা ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে তাদের আয় বেড়ে যায়। সেই বর্ধিত আয় থেকে আবার ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়, তা থেকে আবার আয় হয় এবং এইভাবে চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত মোট আয় প্রাথমিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির কয়েক গুণ বেড়ে যায়। ব্যয় থেকে আয়, আয় থেকে ব্যয় ও আয়—এই চক্রের মূল শক্তি হল ভোগব্যয়। আয় যত বৃদ্ধি পায়, ভোগব্যয় সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি পর্যায়ের আয় বৃদ্ধি সমান তালে চলতে থাকে। কিন্তু সাধারণত তা হয় না। সমাজের বর্ধিত আয়ের সবটাই ভোগব্যয়ে লাগে না।

কিছুটা সঞ্চিত হয়ে আয়-ব্যয়-আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। এই-জন্য সঞ্চয়কে আয়-ব্যয়-আয় স্রোতের ছিদ্র (Leakage) বলা হয়।

দেশের বর্ধিত আয়ের কতটা ভোগব্যয়ে ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে দেশের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বা MPC-র উপর। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা এই MPC-কে স্থির বলে ধরে নিই। ধরা যাক, কোন দেশের MPC হল $\frac{1}{2}$. অর্থাৎ বর্ধিত আয়ের অর্ধেক ভোগব্যয়ে ব্যবহৃত হয়, বাকি অর্ধেক সঞ্চিত হয়। এই অবস্থায় ধরলাম কোন দেশের বিনিয়োগ 100 টাকা বাড়ল। ধরা যাক, কোন ঠিকাদার 100 টাকার রাস্তা তৈরি করলেন। তাহলে যাঁরা রাস্তার কাজে নিযুক্ত হবেন, তাঁদের আয় 100 টাকা বাড়বে। এটা হল **প্রাথমিক আয় বৃদ্ধি = প্রাথমিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি**। যাঁরা রাস্তা তৈরির কাজে নিযুক্ত থাকবেন, তাঁদের আয় 100 টাকা বাড়লে তা থেকে তাঁরা 50 টাকা ভোগব্যয় করবেন। ফলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনকারীদের আয় 50 টাকা বাড়বে। এটা হল **দ্বিতীয় পর্যায়ের আয় বৃদ্ধি**।

এই 50 টাকা বর্ধিত আয় থেকে 25 টাকা ভোগব্যয় হবে। তার ফলে সমাজের আয় আবার 25 টাকা বাড়বে। এটা হল **তৃতীয় পর্যায়ের আয় বৃদ্ধি**। এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে মোট আয় বৃদ্ধি হবে 100 টাকা + 50 টাকা + 25 টাকা। 12.5 টাকা + 6.25 টাকা + 3.12 টাকা + 1.56 টাকা + ইত্যাদি = প্রায় 200 টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন দেশের MPC = $\frac{1}{2}$ হলে 100 টাকার বিনিয়োগ বৃদ্ধি থেকে 200 টাকার আয় বৃদ্ধি হবে। তাহলে গুণক হল 2

$$\text{এখানে গুণক} = 2 = \frac{1}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = \frac{1}{1-\text{MPC}}$$

তাহলে আমরা পাই, গুণকের মান হল $\frac{1}{1-\text{MPC}}$ অর্থাৎ গুণকের মান MPC-র উপর নির্ভর করে।

বীজগণিতের পদ্ধতির সাহায্যেও গুণক প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করা যায়।

ধরা যাক (১) দেশের সরকারের কোন অর্থনৈতিক কাজ নেই,

(২) দেশটি বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে না,

(৩) দেশের ভোগব্যয় কেবলমাত্র বাস্তব আয়ের উপর নির্ভর করে,

(৪) দেশের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা স্থির ও নির্দিষ্ট,

(৫) সব বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত,

(৬) দেশের সব সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ হয়নি, অর্থাৎ সম্পদের নিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা মোট উৎপাদন বৃদ্ধির অবকাশ আছে,

(৭) দেশের কোন দ্রব্য বা সম্পদের যোগানের কোন অস্থিতিস্থাপকতা নেই,

(৮) দেশের দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যস্তর স্থির আছে,

(৯) আয়ের বণ্টন, বিনিয়োগকারীদের আশা-আশঙ্কা ইত্যাদি বিষয়ের কোন বিপরীত পরিবর্তন হয় না,

(১০) অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত আছে।

উপরের এই অনুধারণাগুলো হল কীন্সীয় গুণকতত্ত্বের সাধারণ অনুধারণাসমূহ।

ধরলাম, Y = আয়

C = ভোগব্যয়

I = স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ

$a = MPC$

Δ = বৃদ্ধি।

আমরা জানি—যে দেশে সরকারী অর্থনৈতিক কাজ নেই ও বহির্বাণিজ্য নেই সেই সরল বন্ধ অর্থব্যবস্থায় আয়ের ভারসাম্যের শর্ত হল,

$$Y = C + I \quad \cdots \quad \cdots (1)$$

ধরি $C = aY$ হল ভোগ-প্রকরণের সমীকরণ, তাহলে (1) নং শর্তে $C = aY$ বসিয়ে আমরা পাই,

$$Y = aY + I \quad \cdots \quad \cdots (2)$$

এখন ধরলাম, সেই দেশের মোট বিনিয়োগ ΔI পরিমাণে বাড়ল এবং তার ফলে আয় বাড়ল ΔY পরিমাণে। আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়বে।

এখন ভোগব্যয় হবে $C + \Delta C = aY + a\Delta Y$. তাহলে নতুন ভারসাম্য অবস্থায়

আয় হবে $Y + \Delta Y$,

ভোগব্যয় হবে $aY + a\Delta Y$,

বিনিয়োগ হবে $I + \Delta I$, তাহলে

আমরা পাই, নতুন ভারসাম্য অবস্থায়

$$Y + \Delta Y = aY + a\Delta Y + I + \Delta I \quad \cdots \quad \cdots (3)$$

এখন আয়ের বৃদ্ধি বা ΔY জানতে হলে (3) নং সমীকরণ থেকে (2) নং সমীকরণটি বিয়োগ করতে হবে। (3) নং সমীকরণের নীচে (2) নং সমীকরণটিকে লিখে আমরা পাই,

$$Y + \Delta Y = aY + a\Delta Y + I + \Delta I \quad \cdots \quad \cdots (3)$$

$$-Y \quad = -aY \pm \quad I \quad \cdots \quad \cdots (2)$$

অতএব $\Delta Y = a\Delta Y + \Delta I$

$$\therefore \quad \Delta Y - a\Delta Y = \Delta I$$

$$\therefore \quad \Delta Y(1-a) = \Delta I$$

$$\therefore \quad \Delta Y = \Delta I \times \frac{1}{1-a}.$$

$$\text{আয়বৃদ্ধি } (\Delta Y) = \text{বিনিয়োগবৃদ্ধি } (\Delta I) \times \frac{1}{1-a}.$$

$$\text{এখানে গুণক} = \frac{1}{1-a} = \frac{1}{1-MPC}$$

আবার ধরা যাক $Y=$ আয়,

$C=$ ভোগব্যয়,

$S=$ সঞ্চয়,

$$MPC = \frac{\Delta S}{\Delta Y} = \frac{\text{অতিরিক্ত ভোগ}}{\text{অতিরিক্ত আয়}}$$

$$\text{তাহলে } MPS = \frac{\Delta C}{\Delta Y} = \frac{\text{অতিরিক্ত সঞ্চয়}}{\text{অতিরিক্ত আয়}}$$

আমরা জানি, $C+S=Y$,

$$\therefore \quad \Delta C + \Delta S = Y$$

$$\therefore \quad \frac{\Delta C}{\Delta Y} + \frac{\Delta S}{\Delta Y} = \frac{\Delta Y}{\Delta Y} = 1.$$ (উভয়পক্ষকে ΔY দিয়ে ভাগ করে)

অর্থাৎ $MPC + MPS = 1$

$$\therefore \quad MPS = 1 - MPC.$$

$$\text{আমরা পাই, গুণক} = \frac{1}{1-MPC} = \frac{1}{MPS} \quad (\because \ 1-MPC = MPS)$$

অর্থাৎ গুণক হল প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার অন্যোন্যক (Reciprocal) ধরি· $K=$ গুণক, তাহলে আমরা পাই, $K = \frac{1}{MPS}$

অতএব (১) MPS বাড়লে K কমবে,

(২) MPS কমলে K বাড়বে,

(৩) $MPS = 1$ হলে $K = 1$ হবে,

(৪) $MPS = O$ হলে $K = \infty$ হবে,

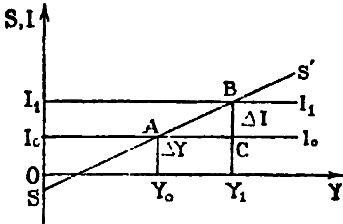
(৫) অতএব MPS যত এক থেকে কমে শূন্যের দিকে যাবে, K-এর মান ততই এক থেকে বেড়ে অনন্ত হবে।

(গ) রেখাচিত্রের সাহায্যে গুণকের মান নির্ণয়।

আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যেও গুণকের মান নির্ণয় করতে পারি।

আমরা জানি, আয়ের ভারসাম্যের শর্ত হল $Y=C+I$ অর্থাৎ $Y-C=I$ অর্থাৎ $S=I$ রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়, যেখানে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা পরস্পরকে ছেদ করে সেই ছেদবিন্দুতে আয়ের ভারসাম্য ঘটে। আমাদের নিচের রেখাচিত্রে SS' হল সঞ্চয়রেখা ও II_0 হল স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ রেখা। সঞ্চয়রেখার ঢাল হল

প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা। এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে (Y) ও উল্লম্ব অক্ষে সঞ্চয় (S) ও বিনিয়োগ (I) পরিমাপ করা হচ্ছে। বিনিয়োগ স্বয়ম্ভুত বলে II_0 রেখাটি আয়-অক্ষের সমান্তরাল হয়েছে।



৭.১ রেখাচিত্র : স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে কীভাবে আয় বৃদ্ধি পায়।

এখানে A হল প্রথম ভারসাম্যের বিন্দু। আয় $= OY_0$. এবার ধরি, স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ ΔI পরিমাণে বাড়ল। তার ফলে বিনিয়োগ রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে সরে গেল। এই রেখাটি হল I_1I_1. নতুন ভারসাম্যের বিন্দু হল B. এই বিন্দুতে আয় $= OY_1$. A বিন্দু থেকে BY_1 রেখার উপর AC লম্ব আঁকা হল। এখানে আয়ের বৃদ্ধি $= \Delta Y = Y_0Y_1 = AC$. বিনিয়োগের বৃদ্ধি $= \Delta I = I_0I_1 = BC$. দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগ যে পরিমাণে বেড়েছে, আয় তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে বেড়েছে।

এখানে $\Delta Y = AC = \frac{AC}{BC} \times BC$ (BC দ্বারা গুণ ও ভাগ করে)

অতএব $\Delta Y = BC \times \frac{AC}{BC}$

$$= BC \times \frac{1}{\frac{BC}{AC}}$$

$= \Delta I \times \frac{1}{MPS}$. কারণ $BC = I_0I_1 = \Delta I$ এবং MPS হল সঞ্চয়রেখার ঢাল $= \frac{BC}{AC}$. তাহলে রেখাচিত্রের সাহায্যেও আমরা পাই, গুণক $= \frac{1}{MPS}$.

(ঘ) সরল কীনসীয় গুণকতত্ত্বের ত্রুটি।

কীনসীয় গুণকতত্ত্বে বিনিয়োগের সঙ্গে আয় বৃদ্ধির সম্পর্কটি প্রথম এমন পরিচ্ছন্নভাবে দেখান হয় যে, এর জন্য কীনসের কাছে মানুষের ঋণ থেকে যায়। তথাপি কীনসের গুণকতত্ত্বের কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করতে হয়।

(১) অনেকে মনে করেন—এই গুণকতত্ত্বটি নাকি কীনসের আগেও ছিল। কীনস এর আবিষ্কর্তা নন। কীনস আগের প্রচলিত তত্ত্বটির নাম বদল করে দেন, নতুন ভাষায় লিখে দেন এবং এইভাবে পুরোনো মদকে নতুন বোতলে ভরে দিয়ে বিখ্যাত হয়ে যান।

(২) কীন্সের গুণকতত্ত্বটি অনেকগুলি অনুধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। এই অনুধারণাগুলোর মধ্যে অবাস্তবতা থাকলে গুণকতত্ত্বটিও অবাস্তব হয়ে যাবে।

(৩) দেশের কোন একটি অংশে বিনিয়োগ বাড়লে অন্য অংশের বিনিয়োগের কী পরিবর্তন হতে পারে কীন্স সেটা ভাবেননি।

(৪) দেশের এক অংশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে অন্য অংশের বিনিয়োগ কমে যেতে পারে। কোন অংশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে শ্রম, কাঁচামাল, মূলধন ইত্যাদির চাহিদা বাড়ে, ফলে তাদের দাম বাড়ে এবং অন্য ক্ষেত্রের বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে পারে। তার জন্য তারা বিনিয়োগ কমিয়ে দিতে পারে। এইভাবে একদিকে বিনিয়োগ বাড়লে অন্যদিকে যদি বিনিয়োগ কমে যায় তাহলে ধনাত্মক গুণকের ফলে আয় বাড়বে, কিন্তু ঋণাত্মক বিনিয়োগের ফলে আয় কমবে এবং যোগ বিয়োগে মোট আয় কমে যেতে পারে। তাহলে বিনিয়োগ বাড়লেই যে আয় বাড়বে এমন বলা যায় না।

(৫) অনুরূপভাবে কাঁচামাল, শ্রম ও মূলধনের যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি অনুন্নত হয়, তাহলে সেই দেশে বিনিয়োগ বাড়লেই যে আয় বাড়বে এমন বলা যায় না ; বরং সেই দেশে বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রীর অভাব দেখা দিতে পারে। তখন দেশে আয় না বেড়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যেতে পারে।

(৬) গুণকতত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, দেশের MPC স্থির থাকে। কিন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে দেশের কোন শ্রেণীর লোকের আয় অন্য শ্রেণীর তুলনায় বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন হবে এবং তার ফলে MPCও বদলে যেতে পারে। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে যদি সমাজের ধনী লোকদের আয় বেশি বেড়ে যায়, তাহলে MPC কমে যেতে পারে। তখন গুণকের মান কমে যাবে।

(৭) কীন্সীয় গুণকতত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, বিনিয়োগ বাড়লে আয় বাড়বে, আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়বে। অর্থাৎ যখনই বিনিয়োগ বাড়বে, তখনই আয় বাড়বে এবং তখনই ভোগব্যয় বাড়বে। এখানে কোন ব্যবধানের কথা ধরা হয় না। কিন্তু আমরা জানি, আয় বাড়লেই সঙ্গে সঙ্গে ভোগ বাড়ে না। মানুষের ভোগের অভ্যাস পরিবর্তন হতে দেরি হয়। আজ যদি কারো আয় বাড়ে, তাহলে আগামীকাল হয়তো সে ভোগব্যয় বাড়াতে পারবে। কিন্তু আজ আয় বাড়লে যে আজই ভোগব্যয় বাড়বে—এমন মনে করা উচিত নয়। তেমনি বিনিয়োগ বাড়লেই যে সঙ্গে সঙ্গে আয় বাড়বে এমন নয়। অর্থাৎ বিনিয়োগ, আয়, ভোগ ইত্যাদির মধ্যে ব্যবধান আছে। কীন্স তাঁর সরল গুণকতত্ত্বে সেই ব্যবধানকে ধরেননি, কাজেই তাঁর তত্ত্ব বাস্তবসম্মত নয়।

৭.২ মুক্ত অর্থব্যবস্থার গুণক (Multiplier in an Open Economy)

যে দেশ বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে তাকে মুক্ত অর্থব্যবস্থা (Open Economy) বলা হয়। এরূপ দেশে আয়ের ভারসাম্যের শর্ত হল

$$Y = C + I + G + X - M \cdots\cdots (1)$$

এখানে Y = আয়, C = ভোগব্যয়, I = বিনিয়োগ ব্যয়, G = সরকারী ব্যয়, X = রপ্তানি, M = আমদানি।

আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা ধরে নিতে পারি যে—(১) দেশের বিনিয়োগ ব্যয় স্বয়ম্ভূত, অর্থাৎ বিনিয়োগ আয় কিংবা সুদের হার কিংবা অন্য কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে না, (২) সরকারী ব্যয় G হল স্বয়ম্ভূত ব্যয়, অর্থাৎ G অন্য কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে না।

(৩) কোন দেশের রপ্তানি হল অন্য দেশের আমদানি। অতএব কোন দেশের রপ্তানি অন্য দেশের আয়ের দ্বারা নির্ধারিত হবে। আমরা যদি ধরে নিই যে, অন্য দেশের আয় বা অন্য কোন অর্থনৈতিক বিষয় স্থির আছে, তাহলে এই দেশের রপ্তানিকেও স্বয়ম্ভূত ব্যাপার বলতে পারি। এখানে X হল স্বয়ম্ভূত রপ্তানি।

(৪) আমরা ধরব যে, এই দেশের ভোগব্যয় (C) কেবলমাত্র দেশের আয়স্তর (Y) দ্বারা নির্ধারিত হয়, এবং

(৫) দেশের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (MPC) হল স্থির ও নির্দিষ্ট।

ধরি দেশের ভোগ অপেক্ষকটি হল C = aY. এখানে a = MPC

(৬) দেশের আমদানি (M) কেবলমাত্র দেশের আয়স্তর (Y) দ্বারা নির্ধারিত হয়।

(৭) এই দেশের প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা (Marginal propensity to import) স্থির ও নির্দিষ্ট।

ধরা যাক, দেশের আমদানি অপেক্ষকটি হল M = bY. এখানে b = প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা। এখন আমরা আয়ের ভারসাম্যের (1) নং শর্তটিতে C = aY ও M = bY বসিয়ে পাই,

$$Y = aY + I + G + X - bY \cdots\cdots (2)$$

এখানে I, G ও X হল স্বয়ম্ভূত বিষয়। এই তিনটি স্বয়ম্ভূত বিষয়ের প্রত্যেকটির জন্য একটি করে গুণক হতে পারে। যেমন, মুক্ত অর্থব্যবস্থায় (ক) বিনিয়োগ (I) বৃদ্ধির গুণক, (খ) সরকারী ব্যয় (G) বৃদ্ধির গুণক, (গ) রপ্তানি (X) বৃদ্ধির গুণক হতে পারে। কিন্তু এই তিনটি গুণকের মান সমান হবে বলে আমরা যে কোন একটি গুণকের মান আলোচনা করতে পারি। এখানে কেবলমাত্র রপ্তানি বৃদ্ধির গুণক সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

কোন দেশের রপ্তানি (X) বৃদ্ধি পেলে সেই দেশের আয় (Y) বাড়বে, আয় বাড়লে একদিকে বাড়বে ভোগব্যয় (C), অন্য দিকে বাড়বে আমদানি (M). এই

দেশের ভোগব্যয় বাড়লে এই দেশের আয় বাড়বে, কিন্তু এই দেশের আমদানি বাড়লে অন্য দেশের আয় বাড়বে। অর্থাৎ এই দেশের আমদানির উপর যে ব্যয় হবে সেটা এই দেশের আয়-ব্যয়ের স্রোত থেকে আমদানির ছিদ্র পথে অন্য দেশে চলে যাবে। বৈদেশিক বাণিজ্যবিহীন অর্থব্যবস্থাকে বন্ধ অর্থব্যবস্থা (Closed Economy) বলা হয়। কোন বন্ধ অর্থব্যবস্থায় গুণক প্রক্রিয়ায় সঞ্চয় হল একটি ছিদ্র। মুক্ত অর্থব্যবস্থায় আয়-ব্যয়ের বৃত্তস্রোতে দুটো ছিদ্র থাকবে, একটি সঞ্চয়ের ছিদ্র, অন্যটি আমদানির ছিদ্র।

আমরা জানি বন্ধ অর্থব্যবস্থায় গুণক $= \dfrac{1}{\text{প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা}}$

অতএব মুক্ত অর্থব্যবস্থায়

$$\text{গুণক} = \frac{1}{\text{প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা} + \text{প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা}}$$

$= \dfrac{1}{MPS+MPI}$ হবে। [এখানে MPI = প্রান্তিক আমদানি প্রবণতা]

বীজগণিতের পদ্ধতিতে এটি দেখানো যায়।

মুক্ত অর্থব্যবস্থায় আয়ের ভারসাম্যের শর্তটি হল

$$Y = aY + I + G + X - bY \qquad \cdots(2)$$

এখন দেশের রপ্তানি যদি ΔX পরিমাণে বাড়ে, তাহলে আয় (Y) বাড়বে, ধরা যাক ΔY পরিমাণে। তাহলে বর্ধিত আয় হবে $Y + \Delta Y$, তার জন্য ভোগব্যয় বেড়ে হবে $a(Y+\Delta Y) = aY + a\Delta Y$ এবং আমদানি বেড়ে হবে $b(Y+\Delta Y) = bY + b\Delta Y$, নতুন ভারসাম্য অবস্থায়,

আয় হবে	$Y+\Delta Y$
ভোগব্যয় হবে	$aY+a\Delta Y$,
রপ্তানি হবে	$X+\Delta X$,
আমদানি হবে	$bY+bY$,

বিনিয়োগ ও সরকারী ব্যয় সমান থাকবে।

তাহলে আমরা পাই, নতুন ভারসাম্য অবস্থায়

$$Y + \Delta Y = aY + a\Delta Y + I + G + X + \Delta X - bY - b\Delta Y \cdots \cdots(3)$$

এখন (3) নং সমীকরণটির নীচে (2) নং সমীকরণটিকে লিখে বিয়োগ করতে হবে, তাহলে আয়ের বৃদ্ধি (ΔY) জানা যাবে।

$$\begin{array}{l} \text{এখানে } Y+\Delta Y=aY+a\Delta Y+I+G+X+\Delta X-bY-b\Delta Y \\ \quad Y \quad = aY \quad +I+G+X \quad -bY \\ \quad - \quad\quad - \quad\quad - \; - \; - \quad\quad + \end{array}$$

$\therefore \quad \Delta Y = a\Delta Y + \Delta X - b\Delta Y$

$\therefore \quad \Delta Y - a\Delta Y + \Delta bY = \Delta X$

$\therefore \quad \Delta Y(1-a+b) = \Delta X$

$\therefore \quad \Delta Y = \Delta X \dfrac{1}{1-a+b}.$

এখানে গুণক হল $\dfrac{1}{1-a+b}$.

এখানে $1-a=1-MPC=MPS$ এবং $b=MPI$.

অতএব $1-a+b=MPS+MPI$.

MPS ও MPI-এর যোগফল একের চেয়ে কম হবে, কাজেই $\dfrac{1}{1-a+b}$ একের চেয়ে বেশি হবে। আমরা পেলাম মুক্ত অর্থব্যবস্থায় রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে আয় বৃদ্ধি পায় এবং আয় বৃদ্ধি রপ্তানি বৃদ্ধির $\dfrac{1}{1-a+b}$ গুণ হয়।

প্রশ্নাবলী

১। গুণক কী? একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে গুণক প্রক্রিয়াটি কীভাবে কাজ করে বোঝাও।

২। কোন দেশের স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে কীভাবে এবং কী পরিমাণে সেই দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে তার বিস্তৃত আলোচনা কর।

৩। কোন মুক্ত অর্থব্যবস্থায় রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে কিংবা বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে কীভাবে ও কী পরিমাণে জাতীয় আয় বাড়বে বোঝাও।

৪। গুণক প্রক্রিয়ার অনুধারণাগুলির উল্লেখ কর এবং ওদের বাস্তবতার উপর মন্তব্য কর।

৫। সরল কীন্সীয় গুণক প্রক্রিয়ার ত্রুটিগুলি কী?

৬। গুণক কী? দেখাও যে, গুণকের মান প্রান্তিক ভোগ ও প্রান্তিক আমদানি প্রবণতার উপর নির্ভর করে।

৭। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

(১) গুণক বলতে কী বোঝায়? (২) গুণকের মান কত হয়? (৩) ধর আমাদের দেশে ১ লক্ষ টাকার স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বাড়ল। তাহলে আমাদের দেশের আয় কত বাড়বে—যদি প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার মান ০, ১, $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{৪}{৫}$, $\frac{৯}{১০}$ হয়? (৪) গুণকের মান প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার উপর নির্ভর করে—উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। (৫) যে দেশের সঞ্চয় প্রবণতা বেশি, সেই দেশের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম—এটি কি সত্য? যুক্তি দিয়ে বোঝাও। (৬) গুণক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সঞ্চয় প্রবণতাকে ছিদ্র বলা হয় কেন? আর কী কী ছিদ্র থাকতে পারে?

অষ্টম অধ্যায়

কর্মনিয়োগ ও বেকারি
(Employment and Unemployment)

ভূমিকা : দেশের জনসংখ্যার মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম ও অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে সক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক ও কর্মাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় দেশের মোট শ্রমের যোগান। অন্যান্য বিষয় বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি শ্রমের যোগান আসে জনসংখ্যা থেকে। জনসংখ্যা বেড়ে গেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নির্দিষ্ট মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছুক ও কাজ করতে সমর্থ যারা সেই সব শ্রমিকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। আমরা শ্রমের যোগানকে একটি ক্রমবর্ধমান চলমান হিসেবে দেখতে পারি। যত দিন যায়, শ্রমের যোগান ততই বেড়ে ওঠে। এটা হল শ্রমের যোগানের দিক।

শ্রমের যোগান বাড়লেই যে দেশে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এমন বলা যায় না। দেশে যে সব দ্রব্য ও সেবা উৎপন্ন হয়, সেই উৎপাদনের জন্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা শ্রমিক নিযুক্ত করেন। প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা যতজন শ্রমিক নিয়োগ করেন, তত জন শ্রমিক কাজ পান। কাজেই আমরা বলতে পারি—কর্মনিয়োগ বলতে বোঝায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা কী পরিমাণ শ্রম বা কতজন শ্রমিক নিয়োগ করতে চান। অন্যান্য শব্দের মত কর্মনিয়োগের দুটি অর্থ থাকে, একটি হল সম্ভাব্য কর্মনিয়োগ, অপরটি হল প্রকৃত কর্মনিয়োগ। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করতে চান বা নিয়োগ করার পরিকল্পনা করেন তাকে বলা হয় সম্ভাব্য কর্মনিয়োগ এবং মালিকেরা বাস্তবে যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করেন, সেটা হল প্রকৃত কর্মনিয়োগ।

সম্ভাব্য কর্মনিয়োগ হল শ্রমের চাহিদা। শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান যখন সমান হয়, তখন নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেখা দেয় এবং প্রকৃত কর্মনিয়োগ ও সম্ভাব্য কর্মনিয়োগ পরস্পর সমান হয়। শ্রমের বাজারে ভারসাম্য দেখা দিলে যতজন শ্রমিক নির্দিষ্ট মজুরীতে কাজ করতে চান, তাঁরা সকলেই কাজ পেয়ে যান। এই অবস্থাকেই শ্রমের পূর্ণ কর্মনিয়োগ (Full employment of labour) বলা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট মজুরীতে যতজন শ্রমিক কাজ করতে রাজি থাকেন, তাঁদের সকলে যদি কাজ করার সুযোগ না পান, তাহলে শ্রমের বাজারে অতিরিক্ত শ্রমের যোগান দেখা দেয়। একেই বেকারত্ব (Unemployment) বলা হয়। অনেকে নির্দিষ্ট মজুরীতে কাজ করতে চান না বলে বেকার থাকেন—তাঁদের স্বেচ্ছা-বেকার বলা হয়। অর্থনীতিতে স্বেচ্ছা-বেকারত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয় না। যাঁরা কাজ করতে চান কিন্তু কাজ করার সুযোগ পান না, তাঁরাই অনিচ্ছাকৃতভাবে

বেকার থাকেন। অর্থনীতিতে এই অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব সম্বন্ধেই আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় দেখা হয়—কর্মনিয়োগ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে, দেশে কেন বেকারত্ব দেখা দেয়, কীভাবেই বা বেকার সমস্যা দূর করা যায় ইত্যাদি। আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশেই বেকার সমস্যা একটি বড়ো সমস্যা। আমাদের দেশেও বেকার সমস্যা একটি তীব্রতম সমস্যা। কাজেই কর্মনিয়োগতত্ত্বের একটি বাস্তব গুরুত্ব আছে।

৮১ কর্মনিয়োগ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ঃ

কর্মনিয়োগ নির্ভর করে শ্রমের যোগান ও শ্রমের চাহিদার উপর। তবে কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগানের চেয়ে শ্রমের চাহিদার গুরুত্ব বেশি। কাজেই আমরা বলতে পারি—**কর্মনিয়োগ প্রধানত শ্রমের চাহিদার উপর নির্ভর করে।**

শ্রমের যোগান ও শ্রমের চাহিদা আবার একাধিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কাজেই কর্মনিয়োগও সেইসব বিষয়ের উপর নির্ভর করবে।

(ক) শ্রমের যোগান ঃ

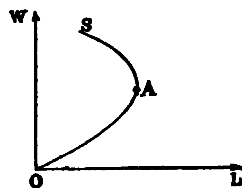
শ্রম বলতে আমরা সাধারণ শ্রম বা অদক্ষ শ্রম এবং দক্ষ শ্রম বা শিক্ষিত শ্রম বুঝি। সাধারণ শ্রমের যোগান নির্ভর করে—দেশের জনসংখ্যার জন্ম, মৃত্যু, নারী-পুরুষের অনুপাত, শিশু, বৃদ্ধ ও প্রাপ্তবয়স্কদের অনুপাত প্রভৃতি অনেক জনসংখ্যাগত (Demographic) বিষয়ের উপর। এর সঙ্গে যুক্ত হবে পরিবারের গঠন, বিবাহ সম্বন্ধে সামাজিক রীতিনীতি, ভৌগোলিক পরিবেশ ইত্যাদি বহু বিষয়। অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে এবং জন্মের হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পাবে।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন জন্মের হার ও শ্রমের যোগান নির্ভর করে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষের খাদ্যের যোগানের উপর। খাদ্যের যোগান বাড়লে নাকি শ্রমিকদের পরিবারের আয়তন বৃদ্ধি পায়। এই তত্ত্বটি ম্যালথাসের তত্ত্ব নামে বিখ্যাত। কার্ল মার্কস ঠিকই বলেছেন যে—এটি একটি তত্ত্ব নয়, এটি হল মানবজাতির উপর একটি কলঙ্ক (A libel on the human race)। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব মতে শ্রমিকদের ততটুকু মজুরী দেওয়া উচিত যাতে তারা কোন মতে বেঁচে থাকতে পারেন। যা হোক ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বটির বিস্তৃত আলোচনার দরকার নেই। আমরা শুধু লক্ষ্য করি যে—তাঁরা মনে করতেন শ্রমের যোগান বাস্তব মজুরীর হারের উপর নির্ভর করে। বাস্তব মজুরীর হার বাড়লে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়, মজুরীর হার কমলে শ্রমের যোগান হ্রাস পায়।

আমরা এখন বলে থাকি—মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান প্রথম প্রথম বাড়তে পারে, কিন্তু পরে শ্রমের যোগান কমে যায়। শ্রমের যোগান বৃদ্ধি করে

শ্রমিকেরা বেশি আয় উপার্জন করেন। কিন্তু তাঁদের আয়ের চাহিদা যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোপুরি না মেটে, ততক্ষণ পর্যন্ত মজুরী বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে। তারপর মজুরীর হার বেশি হলে, শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা কিছুটা উন্নত হলে তিনি কর্মের চেয়ে কিংবা আয়ের চেয়ে বিশ্রামকে বেশি পছন্দ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে মজুরীর হার বাড়লে শ্রমের যোগান কমবে। এটা হল শ্রমের যোগান সম্বন্ধে ক্ল্যাসিক্যাল বা নয়াক্ল্যাসিক্যাল মত। কিন্তু এ ব্যাপারে আর একটি মত আছে, যার নাম কীনসীয় মত।

কীনসের মতে শ্রমের মোট যোগান আর্থিক মজুরীর উপর নির্ভর করে। এই মজুরীর হারটি নির্ধারিত হবে শ্রমিক সংঘ ও মালিক সংঘের যৌথ দর-কষাকষির মাধ্যমে। এই নির্দিষ্ট মজুরীর হারে শ্রমের যোগান হবে পূর্ণনিয়োগ স্তর পর্যন্ত। অর্থাৎ যাঁরা কাজ করতে চাইবেন, তাঁরা সকলেই নির্দিষ্ট মজুরীর হারে শ্রমের যোগান দেবেন, মজুরীর হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান প্রায় স্থির থাকবে। তবে এত দিন যাঁরা কম মজুরীতে কাজ করতে রাজী ছিলেন না, এখন মজুরীর হার বেড়ে গেলে সেই সব স্বেচ্ছা-বেকার ব্যক্তিরাও শ্রমের যোগান দিতে রাজী হবেন। কাজেই মজুরীর হার বাড়লে শ্রমের যোগান সামান্য পরিমাণে বাড়তে পারে।



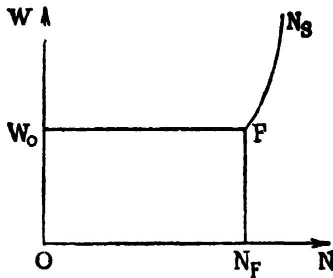
৮.১ রেখাচিত্র : শ্রমের যোগান রেখা

তাহলে আমরা পেলাম—ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে শ্রমের যোগান বাস্তব মজুরীর হারের উপর নির্ভর করে এবং বাস্তব মজুরী বাড়লে শ্রমের যোগান প্রথম দিকে বাড়ে, তারপর কমে যায়। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায়—ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে শ্রমের যোগানরেখা প্রথমে ঊর্ধ্বমুখী ও তারপর পশ্চাৎমুখী হয়। উপরে ৮.১ নং রেখাচিত্রে শ্রমের যোগানরেখা হল OS. এখানে উল্লম্ব অক্ষে বাস্তব মজুরী ($\frac{W}{P}$) এবং অনুভূমিক অক্ষে শ্রমের যোগান (N) পরিমাপ করা হচ্ছে। OS রেখাটি A বিন্দু পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী এবং তারপর পশ্চাৎমুখী হয়েছে। অর্থাৎ A বিন্দু পর্যন্ত শ্রমের যোগান বাড়বে, তারপর মজুরী বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান কমবে।

কীনসের মতে শ্রমের যোগান আর্থিক মজুরীর হারের (W) উপর নির্ভর করে। মজুরীর হার $W=W_0$ হলে শ্রমের যোগানরেখা পূর্ণনিয়োগ স্তর পর্যন্ত পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হবে। তারপর W বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান সামান্য বৃদ্ধি পাবে, কাজেই শ্রমের যোগানরেখা কিছুটা হেলানো অবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী হবে। আমাদের ৮.২ নং রেখাচিত্রে W_0FN_f রেখাটি হল শ্রমের যোগানরেখা।

মজুরীর হার W_0 হলে শ্রমের যোগান হয় ON_F. এটি হল পূর্ণ নিয়োগস্তর

পর্যন্ত শ্রমের যোগান। এরপর FNs অংশে শ্রমের যোগানরেখাটি সামান্য ডানদিকে হেলানো অবস্থায় ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে।



৮.২ রেখাচিত্র : কীন্সের মতে শ্রমের যোগানরেখা

এটা হল সাধারণ বা অদক্ষ শ্রমের যোগানের কথা। অদক্ষ শ্রম ছাড়াও আছে দক্ষ শ্রম। কোন দেশে দক্ষ শ্রমের যোগান নির্ভর করে দেশে শ্রমের দক্ষতা সৃষ্টির হারের উপর। যে দেশের কারিগরিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেশি, শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল, সেই দেশে দক্ষ শ্রমের যোগান স্বভাবতই বেশি হবে। যে দেশে এই সব সুযোগ নেই, সেখানে দক্ষ শ্রমের যোগান কম হবে।

(খ) শ্রমের চাহিদা :

শ্রম হল জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শ্রম ছাড়া কোন দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব নয় বলে মনে করা হয়। শ্রমের এই বিশেষ গুণের জন্যই শ্রমের চাহিদার সৃষ্টি হয়। তবে জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমের যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রাকৃতিক সম্পদ বা জমি, মূলধন, সম্পদ, সংগঠন, কারিগরিক দক্ষতা প্রভৃতির। এদের কথা এখন আলোচনা থেকে বাদ দিলে আমরা বলতে পারি যে, দেশের মোট উৎপাদন শ্রমের নিয়োগের উপর নির্ভর করে।

যদি ধরা হয় যে, Y = মোট উৎপাদন,

N = শ্রমের নিয়োগ

K_0 = অন্যান্য সব উপাদান যাদের স্থির বলে ধরা হয়েছে,

তাহলে মোট উৎপাদন অপেক্ষক (Aggregate Production Functions)টি হবে $Y = F(N, K_0)$।

এই অপেক্ষকটি থেকে আমরা পাই Y নির্ভর করে N-এর উপর। অর্থাৎ N জানতে পারলে আমরা Y জানতে পারব। বিপরীতক্রমে আমরা যদি Y জানি ও Y-এর সঙ্গে N-এর কারিগরিক সম্পর্কটি জানি, তাহলে আমরা বলতে পারব, সেই পরিমাণ Y উৎপাদন করতে কী পরিমাণ শ্রম লাগবে। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝান যায়। ধরা যাক, 100 টাকার দ্রব্য উৎপাদন করতে 70 টাকার শ্রম নিয়োগ করতে হয়। তাহলে 1,000 টাকার দ্রব্য উৎপাদন করতে 700 টাকার শ্রম নিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি শ্রম ও উৎপাদনের অনুপাত (Labour Output Ratio) জানি এবং সেটি যদি

স্থির থাকে, তাহলে কী পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করতে হবে তা আমরা জানতে পারব। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করতে হয়, তাকেই শ্রমের চাহিদা বলা হয়। অতএব আমরা বলতে পারি শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে—

(১) উৎপাদন অপেক্ষকের উপর,

(২) শ্রম ও উৎপাদনের অনুপাতের উপর,

(৩) মোট উৎপাদনের পরিমাণের উপর।

এগুলি হল শ্রমের চাহিদার কারিগরিক দিক। কিন্তু কারিগরিক নির্দেশ মতো যে শ্রমের নিয়োগ হবে এমন কোন কথা নেই। শ্রমিক নিয়োগ করেন উৎপাদনের মালিকেরা। উৎপাদনের মালিক শ্রমিক নিয়োগ করেন কারণ শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা আছে। অন্যভাবে বলা যায়. শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা আছে বলেই শ্রমের চাহিদার সৃষ্টি হয়। দ্রব্যের চাহিদার পিছনে যেমন দ্রব্যের উপযোগিতা বা অভাব পূরণ করার ক্ষমতা থাকে, তেমনি শ্রমের চাহিদার পিছনে থাকে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা।

শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা পরিমাপ করা হয় শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা। অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ ও উৎপাদন কৌশলের কোন পরিবর্তন না হলে, অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয়। যদি শ্রমের নিয়োগ ΔN পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং তার জন্য মোট উৎপাদন ΔY পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহলে শ্রমের নিয়োগ এক একক বৃদ্ধি পেলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে $\frac{\Delta Y}{\Delta N}$ পরিমাণে। এটাই হল শ্রমের প্রান্তিক উপাদান।

শুদ্ধভাবে বলতে গেলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন হবে

$$\operatorname*{Limit}_{\Delta N \to O} \frac{\Delta Y}{\Delta N} = \frac{dY}{dN}.$$

কিন্তু শ্রমের নিয়োগের সঙ্গে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সম্পর্কটি কেমন? আমরা বলি শ্রমের নিয়োগ বাড়লে ও অন্যান্য বিষয় স্থির থাকলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাবে। অপরপক্ষে শ্রমের নিয়োগ কমলে শ্রমের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়বে। অর্থাৎ শ্রমের নিয়োগের পরিমাণের সঙ্গে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের একটি বিপরীতমুখী সম্পর্ক আছে।

এবার প্রশ্ন—শ্রমের জন্য উৎপাদনের মালিকের চাহিদা কেন এবং কীভাবে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে? এর উত্তরে বলা যায়—উৎপাদনের মালিকেরা শ্রম নিয়োগ করে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করতে চান বলেই

এটা হয়। শ্রম নিয়োগ করে উৎপাদনের মালিক পান উৎপাদন। তাকে বাজারে বিক্রয় করে পান বিক্রয়মূল্য।

বিক্রয়মূল্য = দ্রব্যের বাজার দাম × দ্রব্যের পরিমাণ

= PY (এখানে P = দাম, Y = উৎপাদন ধরা হয়েছে)

এই বিক্রয়মূল্য থেকে মালিক শ্রমিকদের মজুরী দেন। যদি N পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হয় এবং প্রতি একক শ্রম নামক সেবার দাম (বা মজুরীর হার) হয় W, তাহলে N পরিমাণ শ্রমের জন্য মোট মজুরী লাগে WN. এটা হল মালিকের ব্যয়। তাহলে উৎপাদন মালিকের নীট আয় বা মুনাফা = মোট বিক্রয়মূল্য − মোট মজুরী। ধরি π = মোট মুনাফা, তাহলে আমরা পাই, $\pi = PY - WN$.

মোট মুনাফা সর্বাধিক হলে $\frac{d\pi}{dN} = O$ হবে। আমরা পাই,

$$\frac{d\pi}{dN} = P\frac{dY}{dN} - W = O$$

অতএব $P\frac{dY}{dN} - W = O$.

অর্থাৎ $P\frac{dY}{dN} = W$.

অতএব $\frac{dY}{dN} = \frac{W}{P}$.

অর্থাৎ উৎপাদনের মালিকেরা এমনভাবে শ্রম নিয়োগ করবেন যাতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ও শ্রমের বাস্তব মজুরীর হার পরস্পর সমান হয়।

মালিকের মুনাফা = $\pi = PY - WN$. এখানে P, Y, W ও N—এই চারিটি বিষয় জড়িত রয়েছে। P হল দ্রব্যের দাম। দ্রব্যের দাম নির্ভর করে দ্রব্যের বাজারের অবস্থার উপর। অর্থাৎ দ্রব্যের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা আছে কি নেই তার উপর P নির্ভর করবে। উৎপাদনের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকলে P প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হবে, অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে তার চেয়ে বেশি হবে। P ছাড়াও এখানে আর একটি দাম রয়েছে। সেটি হল W. W হল শ্রমের মজুরী বা শ্রম-সেবার দাম। এটিও শ্রমের বাজারের অবস্থার দ্বারা নির্ধারিত হবে। শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকলে W শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে শ্রমের বাস্তব মজুরী $\frac{W}{P}$ = শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন = $\frac{dY}{dN}$. অন্য বাজারে $\frac{W}{P}$ কিন্তু $\frac{dY}{dN}$-এর কম হবে। তাহলে আমরা পাই—

শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে

(১) উৎপাদন-অপেক্ষক

(২) শ্রম ও উৎপাদনের অনুপাত,
(৩) মোট উৎপাদনের পরিমাণ,
(৪) শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা,
(৫) দ্রব্যের দাম এবং
(৬) মজুরীর হারের উপর। দ্রব্যের দাম ও মজুরীর হার আবার
(৭) দ্রব্যের বাজার ও
(৮) শ্রমের বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে।

৮.২ নিয়োগ সম্বন্ধে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব (Classical Theory of Employment)

[অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) থেকে শুরু করে কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) এই সময় পর্যন্ত ইউরোপীয় অর্থনীতিতে কতগুলি সাধারণ ধারণা চালু ছিল। এই ধারণাগুলিকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব বলা হয়। ক্ল্যাসিক্যাল সময়ের মধ্যে অনেক অর্থনীতিবিদ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা করেছিলেন। তাঁদের সকলের চিন্তা এক ছিল না। চিন্তার মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য থাকবেই এবং ছিলও। তবু সকলের চিন্তার মধ্যে কয়েক জায়গায় মিল ছিল। সেইজন্য তাঁদের সকলকেই ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ এবং তাঁদের তত্ত্বগুলোকে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব বলা হয়। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্য কী সাংঘাতিক রকমের ছিল সেটা বোঝানোর জন্য মার্কসের নাম করা যায়। মার্কসকে যদিও ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ বলা হয়, তবু তাঁর মতের সঙ্গে অন্য ক্ল্যাসিক্যাল মতের তীব্র বিরোধিতা ছিল। মার্কস যা বলেছেন তা যেন প্রচলিত ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বকে ভাঙবার জন্যই বলেছেন।

পরবর্তী কালে কীনস্ নামলেন আসরে। তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার ঝড়ে তিনি ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের ভুলকে, ভুয়ো খোসাকে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তিনিও ভেবেছিলেন ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব মানে যেন একজন চিন্তাবিদের একটি মাত্র তত্ত্ব। তাঁকেই তিনি ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ বলে খাড়া করেছিলেন এবং সেই বানানো খড়ের মানুষের গায়ে অযথা তাঁর শাণিত যুক্তির তীক্ষ্ণ তীরগুলি ছুঁড়েছিলেন। কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব বলতে কখনই একটি তত্ত্বকে বোঝায় না এবং ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ বলতে যে-কোন একজন অর্থনীতিবিদকেও বোঝায় না। এই কথা মনে রেখে আমরা নিয়োগ সম্বন্ধে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের আলোচনা করব। তবে আমাদের আলোচনাতেও ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বকে একটি মাত্র তত্ত্ব হিসেবে ধরা হবে।]

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন কোন দেশে শ্রমের যোগান ও শ্রমের চাহিদা সব সময় ভারসাম্য অবস্থায় সমান হয়ে থাকে। দেশের কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশে নিতান্ত সাময়িকভাবে বেকার সমস্যা (অতিরিক্ত শ্রমের যোগান) থাকতে

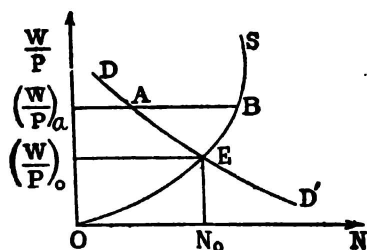
পারে, কিন্তু গোটা দেশে দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ব্যাপক ও অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব কখনই থাকতে পারে না। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে অবশ্য সাময়িক ও স্বেচ্ছাবেকারত্ব ছাড়াও ঋতুগত বেকারত্ব, সংঘর্ষজনিত বেকারত্ব, বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্বের অস্তিত্বের কথাও স্বীকার করা হয়েছিল।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে ধরা হয়েছিল যে, শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা আছে এবং বাস্তব মজুরীর হার সহজেই নমনীয় (flexible)। অর্থাৎ অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে মজুরীর হার বাড়তে পারে কিংবা কমতে পারে। মজুরীর হারের এই ওঠানামার পথে বাধা নেই।

শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা আছে বললে বোঝায় যে, মজুরীর হার শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। শ্রমের চাহিদা ও যোগান পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে এমন একটি মজুরীর হার নির্ধারিত করে, যে হারে শ্রমের চাহিদা ও যোগান সমান হয়। এই মজুরীর হারকে ভারসাম্য মজুরীর হার (Equilibrium wage rate) বলা যায়। অর্থাৎ ভারসাম্য-মজুরীর হারে যতজন শ্রমিক কাজ করতে চাইবেন, তাঁরা সকলেই কাজ পাবেন। কাজেই বেকার সমস্যা থাকবে না। রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখানো যায়।

আমাদের রেখাচিত্রে OS হল শ্রমের যোগানরেখা এবং DD´ হল শ্রমের চাহিদারেখা।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে শ্রমের যোগানকে বাস্তব মজুরীর হার $\left(\frac{W}{P}\right)$-এর উপর সরাসারিভাবে নির্ভরশীল করা হয়েছে। অর্থাৎ $\frac{W}{P}$ বাড়লে (বা কমলে) শ্রমের যোগান বাড়বে (বা কমবে)। কাজেই শ্রমের যোগানরেখা হবে উর্ধ্বমুখী। অবশ্য মজুরীর হার খুব বেশি হয়ে গেলে শ্রমিকেরা শ্রমের যোগান কমিয়ে দিতে পারেন। তাহলে শ্রমের যোগানরেখা কিছুদূরে পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী হয়ে তারপর পশ্চাৎমুখী হতে পারে।



৮.৩ রেখাচিত্র : ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের কর্মনিয়োগ

আমরা জানি, শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে প্রধানত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের উপর। অন্যান্য উপাদানের নিয়োগ স্থির রেখে শ্রমের নিয়োগ এক একক বৃদ্ধি করলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়ে তাকেই শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বলা হয়। অন্য উপাদান স্থির রেখে শ্রমের নিয়োগ যতই বৃদ্ধি করা যায়, শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ততই হ্রাস পায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন

বিধি কার্যকরী হওয়ায় শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে যায়। এই কারণে শ্রমের চাহিদা রেখা DD′ নিম্নমুখী হয়েছে।

রেখাচিত্রে OS রেখা ও DD′ রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হল ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে ভারসাম্য-মজুরীর হার হল $\left(\frac{W}{P}\right)_0$.

এই মজুরীর হারে শ্রমের চাহিদা $= ON_0$ এবং শ্রমের যোগান $= ON_0$. অর্থাৎ $\left(\frac{W}{P}\right)_0$ মজুরীতে ON সংখ্যক শ্রমিক কাজ করতে চান এবং উৎপাদনের মালিকেরা ON_0 সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করতে চান। কাজেই যাঁরা কাজ করতে চান, তাঁরা সকলেই কাজ পাবেন। দেশে অনিচ্ছা-বেকারত্ব (Involuntary Unemployment) বলে কিছু থাকবে না।

কিন্তু প্রকৃত মজুরীর হার (Actual wage rate) $\left(\frac{W}{P}\right)_a$ যদি ভারসাম্য-মজুরীর হার $\left(\frac{W}{P}\right)_0$ অপেক্ষা বেশি হয়, তাহলে সেই মজুরীর হারে শ্রমের যোগানের চেয়ে শ্রমের চাহিদা কম হবে এবং শ্রমের বাজারে দেখা দেবে অতিরিক্ত শ্রমের যোগান (Excess Supply of Labour) বা বেকার সমস্যা। আমাদের রেখাচিত্রে $\left(\frac{W}{P}\right)_a$ মজুরীর হারে শ্রমের বাজারে AB পরিমাণ অতিরিক্ত যোগান থাকবে।

কিন্তু ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে শ্রমের বাজার যদি যথার্থই পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক হয়, তাহলে অতিরিক্ত শ্রমের যোগান বা বেকার সমস্যা দীর্ঘকালে থাকতে পারে না। বেকার সমস্যা থাকলে অচিরেই মজুরীর হারের এমন পরিবর্তন হবে যাতে শ্রমের চাহিদা ও যোগান আবার সমান হবে। ক্ল্যাসিক্যাল যুক্তিকে আর একটু বিস্তৃত করা যাক।

যদি শ্রমের বাজারে বেকার সমস্যা থাকে, তাহলে শ্রমের যোগান চাহিদার চেয়ে বেশি হবে। যাঁরা বেকার তাঁরা বেকার থাকার চেয়ে কম মজুরীতে কাজ করতে রাজী হবেন। কিন্তু যাঁরা কাজ করছেন এবং যাঁরা কাজ পাননি, বেকার আছেন—উভয়ের যোগ্যতা সমান হলে উৎপাদনের মালিকেরা কম মজুরীতে বেকারদের কাজে নিয়োগ করবেন কিংবা নিয়োগ করতে চাইবেন। এর ফলে বেকার শ্রমিকদের সঙ্গে কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাবে। এই প্রতি-যোগিতার ফলেই মজুরীর হার কমবে।

মজুরী হল উৎপাদনের মালিকদের উৎপাদন ব্যয়ের অংশ। একে পরিবর্তনশীল ব্যয় বলা হয়। শ্রমের মজুরী ছাড়াও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে থাকে কাঁচামালের দাম ও অন্যান্য পরিবর্তনশীল উপাদান ও উপকরণের জন্য ব্যয়। অন্যান্য পরি-

বর্তনশীল ব্যয় স্থির থাকলে এবং শ্রমিকদের মজুরীর হার কমে গেলে প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনশীল ব্যয় কমবে। আমরা জানি প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে থাকে পরিবর্তনশীল ব্যয়। কাজেই আমরা বলতে পারি—মজুরীর হার কমলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়ও কমবে।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিতে দ্রব্যের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। অর্থাৎ $P = MC$. কাজেই মজুরীর হার কমলে প্রান্তিক ব্যয় কমবে, প্রান্তিক ব্যয় কমলে দাম কমবে। দাম কমলে মুনাফা বাড়বে। ফলে উৎপাদন বাড়বে। উৎপাদন বাড়লে শ্রমের চাহিদা বাড়বে। শ্রমের চাহিদা বাড়লেই কর্মনিয়োগ বাড়বে এবং বেকার সমস্যা কমবে। যতক্ষণ পর্যন্ত শ্রমের বাজারে বেকার সমস্যা থাকবে—ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে এবং অবশেষে বেকার সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হবে।

এই প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা হল মজুরীর হারের। মজুরীর হার কমে গেলেই এটা হয়। কিন্তু মজুরীর হার যদি কোন কারণে অনড় (rigid) হয়ে যায়, তাহলে বেকার সমস্যা থাকলেও মজুরীর হার কমবে না। কাজেই বেকার সমস্যাও থেকে যাবে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা বলেন—শ্রমিকরা ভারসাম্য-মজুরীর হার গ্রহণে অসম্মত বলেই বেকার সমস্যা দূর করা যাচ্ছে না। অতএব এরকম বেকার সমস্যা হল স্বেচ্ছা-বেকারত্ব (Voluntary Unemployment)।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের ত্রুটি :

(১) ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির এই নিয়োগতত্ত্বের প্রধান সমালোচক হলেন লর্ড কীনস্। কীনস্ যখন "সাধারণ তত্ত্ব" নামক গ্রন্থটি রচনা করেন তখন পৃথিবী-ব্যাপী মন্দার প্রকোপ চলছিল। মন্দার সময় অর্থনৈতিক কাজে ভাটা পড়ে যায়। উৎপাদন কমে যায়। লোকের আয় এত কম হয় যে, তারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে না। ফলে অত্যুৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয়। উৎপাদনের মালিকেরা একের পর এক উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেন। সর্বত্র শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়েন। বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯২৯ সালের মন্দার সময় পৃথিবীর সব দেশেই বেকার সমস্য এমনিভাবে একটি তীব্র সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। অথচ তখনো ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিতে বলা হয়েছিল যে, দেশে বেকার সমস্যা থাকতে পারে না। কীনস্ তাই ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের তীব্র ভাষায় বিদ্রূপ করেছিলেন। তাঁরা যেন বাস্তবকে অস্বীকার করে মূর্খের স্বর্গে বাস করেন। ব্যাপারট্যকে আমরা উট পাখির মত বোকামি বলতে পারি। উট পাখি বিপদের সময় বালিতে মুখ গুঁজে দিয়ে যেমন ভাবে—তার কোন বিপদ নেই। তেমনি ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরাও চারদিকে প্রচণ্ড বেকারত্ব দেখেও বলতেন—বেকারি নেই'। অতএব ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অবাস্তব।

(২) ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে বলা হয়—বেকারত্ব হল কম মজুরীতে কাজ করার অনিচ্ছা। কিন্তু কীন্‌স্‌ দেখিয়েছেন—দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই হল বেকারত্বের কারণ। দেশে যখন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমে যায়, তখনই শ্রমের চাহিদাও কমে যায়। দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা থেকেই শ্রমের চাহিদার উদ্ভব হয়। শ্রমের চাহিদা হল উদ্ভূত চাহিদা (Derived demand)। অর্থাৎ বেকার সমস্যাকে চাহিদার দিক থেকে দেখা উচিত। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে কিন্তু বেকার সমস্যাকে শ্রমের যোগানের সমস্যা হিসেবে দেখা হয়। এ দেখা ঠিক দেখা নয়।

(৩) ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য মজুরীর হার কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। কীন্‌সের মতে বেকার সমস্যাকে যদি রোগীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, তাহলে বলা যায় মজুরী হ্রাসের ওষধটি খাওয়ালে রোগীর মৃত্যু হবার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। কারণ মন্দার সময় মজুরী হ্রাস করলে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় যেমন কমবে, তেমনি শ্রমিকদের আয়ও কমবে। অথাৎ মজুরী হ্রাস একদিকে যেমন ব্যয় কাটে, অন্যদিকে তেমনি এটি আয় কাটে।

(৪) আমরা যদি ধরে নিই যে, মজুরীর হার কমলে শ্রমিকদের আয় কমে যায়, তাহলে ক্ল্যাসিক্যালদের যুক্তি-পরম্পরা কাজ করে না, বরং মজুরী হ্রাস করলে নিয়োগ কমে যেতে পারে। কীন্‌সের মতে মজুরীর হার কমলে শ্রমিকদের আয় কমবে। আয় কমলে চাহিদা কমবে। চাহিদা কমলে দাম কমবে, মুনাফা কমবে, উৎপাদন কমবে, নিয়োগ কমবে। এইভাবে দেখা যায় যে, মন্দার সময় মজুরী কমলে বেকার সমস্যা তীব্রতর হতে পারে।

৮.৩ কীন্‌সের নিয়োগতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ

কীন্‌সের মতে দেশে নিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে মোট চাহিদা বা কার্যকরী চাহিদার (Effective demand) উপর। মোট কার্যকরী চাহিদার মধ্যে থাকে মোট ভোগব্যয় (C) ও মোট বিনিয়োগ ব্যয় (I). অর্থাৎ মোট চাহিদা হল $C+I$. ভোগব্যয় আবার বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাদের মধ্যে আয় (Y) হল প্রধান। তবে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন সঞ্চয় ও ভোগ সুদের হারের (r) উপর নির্ভর। তাহলে আমরা বলতে পারি—ভোগব্যয় নির্ভর করে Y ও r-এর উপর। আমরা পাই $C=C(Y, r)$. তবে কীন্‌সের নিয়োগতত্ত্বে C-এর সঙ্গে Y-এর সম্পর্কটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। Y বাড়লে C বাড়ে, Y কমলে C কমে। Y বাড়লে C যে হারে বাড়ে তাকে আয়জনিত প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (MPC) বলা হয়। কীন্‌সের মতে Y যত বাড়ে MPC ততই কমে যেতে থাকে। দেশে যখন Y কম থাকে, যখন দেশবাসীদের ভোগাকাঙ্ক্ষা পূর্ণমাত্রায় চরিতার্থ হয় না, তখন MPC বেশি থাকে। এরপর Y যত বাড়ে, ভোগাকাঙ্ক্ষা যত চরিতার্থ হয়, তত অতিরিক্ত আয়ের একটি বড়ো অংশ ভোগের কাজে ব্যয়িত না হয়ে সঞ্চিত হতে থাকে। এইজন্য ধনী দেশে সাধারণ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কম হারে বাড়ে।

কিন্তু উৎপাদন খুব বেশি হারে বাড়ে। কাজেই ধনী দেশে ভোগপ্রবণতার দুর্বলতার জন্যই অত্যুৎপাদনের সমস্যা দেখা দেয়। অত্যুৎপাদন থেকে মন্দা আসে। মন্দার ফলেই বেকার সমস্যা দেখা দেয়।

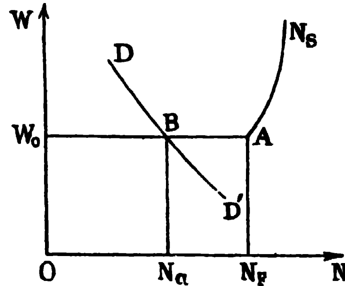
কার্যকরী চাহিদার একটি অংশ হল ভোগব্যয়। অপর অংশটি হল বিনিয়োগ ব্যয়। বিনিয়োগ হল মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি। দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে, কীন্সের মতে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগ যত বাড়ে, আয় তার চেয়ে বেশি বাড়ে। আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে। চাহিদা বাড়লে উৎপাদন বাড়ে এবং উৎপাদন বাড়লে কর্মনিয়োগ বাড়ে। এইভাবে বিনিয়োগ থেকে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন বিনিয়োগ সুদের হারের উপর নির্ভর করে। সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়ে। কিন্তু কীন্সের মতে বিনিয়োগ নির্ভর করে প্রধানত বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে বিনিয়োগকারীদের আশা-আশংকার উপর। এক্ষেত্রে সুদের হার একটি গৌণ বিষয়। বিনিয়োগকারীরা যদি মনে করেন যে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলে দ্রব্যের উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়বে বাজারে তার চাহিদার কোন অভাব হবে না, তাহলেই তাঁরা সহজভাবে বিনিয়োগ করবেন। কিন্তু তাঁরা যদি বাজারের অবস্থায় আস্থাহীন হয়ে পড়েন, তাহলে তাঁরা উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চাইবেন না এবং তার জন্য বিনিয়োগও কমিয়ে দেবেন। সুদের হার কম হলেও তাঁরা এক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে রাজি হবেন না।

মন্দার সময় উৎপাদনের মালিকেরা বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে নিতান্ত হতাশ হয়ে পড়েন। এসময় সুদের হার কম থাকলেও তাঁরা বিনিয়োগ করার মত উৎসাহ পান না। কাজেই মন্দার সময় শ্রমের চাহিদা কম হবে এবং কর্মনিয়োগ কমবে, অর্থাৎ বেকারি বাড়বে।

কীন্সের এই নিয়োগতত্ত্বের মূলকথা দুটি (১) বেকার সমস্যার কারণ উচ্চ-মজুরীর হার নয়, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাই বেকার সমস্যার কারণ, (২) দেশে যদি বেকার সমস্যা থাকে, তাহলে আপনা থেকেই সেই বেকার সমস্যা দূর হতে পারে না। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন, শ্রমের চাহিদা ও যোগান-রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করে, সেই ছেদবিন্দুতেই শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ ঘটে। প্রকৃত মজুরীর হার ভারসাম্য-মজুরীর হারের চেয়ে বেশি হলেই শ্রমের যোগান শ্রমের চাহিদার চেয়ে বেশি হয় এবং বেকার সমস্যা দেখা দেয়। শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে মজুরীর হার কমে যায় ও শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এইভাবে আপনা থেকেই বেকার সমস্যা দূর হয়ে যায়। কীন্সের মতে শ্রমের চাহিদা ও যোগানরেখা যে বিন্দুতে ছেদ করে সেখানেই শ্রমের সম্ভাব্য যোগান শ্রমের প্রকৃত চাহিদার থেকে বেশি থাকে ; কাজেই শ্রমের বাজারে ভারসাম্য অবস্থাতেও বেকার-সমস্যা থেকে যায়। পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখানো হল।

এই রেখাচিত্রে উল্লম্ব অক্ষে আর্থিক মজুরী (W) ও অনুভূমিক অক্ষে শ্রমের নিয়োগ (N) পরিমাপ করা হচ্ছে। কীন্‌সের মতে শ্রমের যোগান আর্থিক মজুরীর হারের উপর নির্ভর করে। শ্রমিক পক্ষ ও মালিক পক্ষ যৌথ দর-কষাকষির মাধ্যমে মজুরীর হার নির্ধারণ করে। ধরা যাক, এই মজুরীর হার হল OW_0. এই মজুরীর হারে শ্রমের যোগানরেখা W_0AN_S A বিন্দু পর্যন্ত সমান্তরাল হয়েছে। অর্থাৎ OW_0 মজুরীর হারে শ্রমের যোগান হবে ON_F. ON_F হল পূর্ণনিয়োগস্তর পর্যন্ত শ্রমের যোগান। A বিন্দুর পর শ্রমের যোগান রেখাটি প্রায় উল্লম্বভাবে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। এ থেকে বোঝায়—মজুরীর হার OW_0 অপেক্ষা বেশি হলে শ্রমের যোগান বাড়বে, তবে খুব কম পরিমাণেই বাড়বে। আগে যাঁরা স্বেচ্ছায় বেকার ছিলেন, মজুরীর হার বেড়ে যাওয়ায় তাঁরা হয় তো শ্রমের যোগান দিতে রাজি হবেন। কাজেই শ্রমের যোগান কিছুটা বাড়বে।



৮.৪ রেখাচিত্র : কীন্‌সের নিয়োগ তত্ত্বে শ্রমের বাজারে ভারসাম্য

এখানে DD′ হল শ্রমের চাহিদা রেখা। এটি স্বভাবতই নিম্নমুখী হবে। রেখাচিত্রে DD′ রেখা W_0AN রেখাকে B বিন্দুতে ছেদ করেছে। B বিন্দুটি শ্রমের চাহিদা রেখা ও যোগান রেখার উপর আছে। কাজেই B বিন্দুটিকে আমরা প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী একটি ভারসাম্য বিন্দু বলতে পারি। B বিন্দুতে শ্রমের প্রকৃত নিয়োগ হবে ON_a এবং মজুরীর হার হবে OW_0. কিন্তু এই মজুরীর হারে শ্রমের যোগান ON_F; কাজেই শ্রমের চাহিদা শ্রমের যোগানের চেয়ে N_aN_F পরিমাণে কম হবে। অর্থাৎ OW_0 মজুরীর হারে শ্রমের বাজারে আপাতদৃষ্টিতে ভারসাম্য থাকলেও N_aN_F পরিমাণ বেকারত্ব থেকে যাবে। এই বেকারত্বকে কোনমতেই স্বেচ্ছা-বেকারত্ব বলা যাবে না। এটা হল অনিচ্ছা-বেকারত্ব এবং এর জন্য শ্রমিকেরা কোনমতেই দায়ী নন।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতির সমর্থকরা বলতে পারেন—এখানে শ্রমিক সংঘ বা মালিক সংঘ থাকার জন্যই মজুরীর হার OW_0 স্তরে অনড় হয়ে আছে। মজুরীর হার নীচের দিকে না নামলে কোনমতেই এই বেকারত্ব দূর করা যাবে না।

শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতাকে নষ্ট করা হয়েছে, দাম ও মজুরীর হারের সহজ পরিবর্তনশীলতাকে নষ্ট করা হয়েছে, তারপর পূর্ণকর্মনিয়োগের কথা ভাবা হচ্ছে। আসলে এটা হল একরকমের স্বেচ্ছা-বেকারত্ব।

কীন্‌সের নিয়োগতত্ত্বের পর্যালোচনা ঃ

(১) **প্রথমেই** বলতে হয় কীন্‌স নিয়োগতত্ত্বকে বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের মত এটি অনুধারণার বেড়ায় বাঁধা অবাস্তব ও বিশুদ্ধ ব্যাপার নয়। মজুরীর হার নির্ধারণে শ্রমিক সংঘের গুরুত্বকে অস্বীকার করা অবাস্তব ও অন্যায়।

(২) **দ্বিতীয়ত,** কীন্‌স মজুরীর হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সামগ্রিক চাহিদার গুরুত্বের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে যোগান যেমন গুরুত্বপূর্ণ; দ্রব্যের যোগান যেমন কর্মনিয়োগ নির্ধারণ করে, কীন্‌সের তত্ত্বে তেমনি চাহিদা গুরুত্বপূর্ণ। দ্রব্যের চাহিদাই কর্মনিয়োগ নির্ধারণ করে। বলাবাহুল্য দুটি মতের মধ্যেই পক্ষপাতিত্ব ও একদেশদর্শিতার দোষ আছে। হয়তো ক্ল্যাসিক্যাল ও কীন্‌সীয় মতের মিলনের ফলে যে তত্ত্বের জন্ম হবে তাই দিয়ে কর্ম নিয়োগকে আরো ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে। কিন্তু এককভাবে দেখলে এই দুটি মতের মধ্যে কীন্‌সের মতটিকেই বেশি বাস্তব বলে মনে হয়। তবে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেই দ্রব্যের চাহিদা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অনুন্নত, দরিদ্র ও জনবহুল দেশে চাহিদার সমস্যাটি গৌণ। সেখানে কীন্‌সের চেয়ে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বই বেশি প্রাসঙ্গিক হতে পারে।

(৩) **তৃতীয়ত,** কীন্‌স আর্থিক মজুরীকে যেভাবে অনড় করে ফেলেছেন, তাতে ক্ল্যাসিক্যাল ব্যবস্থার মধ্যেও বেকারত্বের উদ্ভব হতে পারে। বিপরীতপক্ষে আমরা যদি মজুরীর হারকে নমনীয় বা পরিবর্তনশীল বলে ধরে নিই, তাহলে কীন্‌সের তত্ত্বেও পূর্ণকর্মনিয়োগ আসতে পারে। কাজেই ভারসাম্য অবস্থায় বেকারত্ব থাকতে পারে বলে কীন্‌সের যে বক্তব্য তার মধ্যে চমক ছাড়া আর কোন নূতনত্ব নেই।

(৪) **চতুর্থত,** অনেকে বলে থাকেন ভারসাম্য অবস্থায় বেকারত্ব—(Equilibrium with unemployment) ব্যাপারটি অর্থহীন শব্দ মাত্র। শ্রমের বাজারে ভারসাম্য থাকলে বেকারত্ব থাকতে পারে না, বেকারত্ব থাকলে শ্রমের বাজারে ভারসাম্য থাকতে পারে না। কীন্‌স দেখিয়েছেন শ্রমের বাজারে ভারসাম্য ও বেকারত্ব একই সঙ্গে থাকতে পারে। এটা নিছক কথার জাদু, আর কিছু নয়।

৮.৪ বেকারত্বের শ্রেণীবিভাগ ঃ

কোন দেশের জনগণের মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, অক্ষম ও অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে প্রাপ্তবয়স্ক, সমর্থ ও কর্ম করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে ওঠে সেই দেশের শ্রমিক বাহিনী (Labour Force)। এই বাহিনীর একটি বড়ো অংশ কাজ পান। কিন্তু কিছু মানুষ কাজ পান না। এঁরা প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে চান, অথচ কাজ করতে পান না বলে এঁদের বেকার বলা হয়। যেমন, শ্রমিক বাহিনীতে

যদি একশ জন লোক থাকে, তাদের মধ্যে যদি নব্বুই জন কাজ পেয়ে যান এবং দশ জন বেকার থাকেন, তাহলে আমরা বলতে পারি সেই দেশে বেকারত্বের হার হল দশ শতাংশ।

বেকারত্বকে আমরা প্রথমেই দুভাগে ভাগ করতে পারি যথা, স্বেচ্ছা-বেকারত্ব ও অনিচ্ছা বেকারত্ব। অনিচ্ছা বেকারত্বকে আরো নানাভাবে ভাগ করা যায়। যথা,

(১) ঋতুগত বেকারত্ব (Seasonal unemployment),

(২) বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব (Cyclical unemployment),

(৩) বিরতিমূলক বা সংঘর্ষজনিত বেকারত্ব (Frictional unemployment),

(৪) ছদ্মবেকারত্ব (Disguised unemployment)।

(১) **ঋতুগত বেকারত্ব :** কোন দ্রব্যের উৎপাদন যদি একটি নির্দিষ্ট ঋতুতে বা একটি নির্দিষ্ট মরশুমে হয়ে থাকে তাহলে অন্য ঋতুতে বা অন্য মরশুমে সেই দ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ থাকার জন্য সেই উৎপাদন ব্যবস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তিগণ বেকার হয়ে পড়েন। এইরূপ বেকারত্বকে ঋতুগত বেকারত্ব বা মরশুমী বেকারত্ব বলা হয়। যে দেশে কৃষি প্রকৃতি-নির্ভর, যেখানে সেচের সুযোগ নেই, পর্যায়ক্রমিক চাষের ব্যবস্থা নেই, অন্য সময়ে চাষ করা যায় এমন বীজের আবিষ্কার হয়নি, সেই দেশের কৃষি-ব্যবস্থায় ঋতুগত বেকারত্ব দেখা দেয়, কারণ সেই দেশে প্রাকৃতিক মরশুমের উপর নির্ভর করে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটিমাত্র শস্যের চাষ করা হয়। বাকি সময় চাষীরা বেকার হয়ে পড়েন। ভারতের কৃষিতে ঋতুগত বেকারত্ব এইভাবে একটি প্রধান সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

কৃষি ছাড়াও শহরে বা শিল্পাঞ্চলেও অনেক ক্ষেত্রে ঋতুগত বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। আমাদের দেশে শীতকালে আইসক্রীমের চাহিদা কমে যায়। ফলে আইসক্রীম ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অনেকে শীতকালে বেকার হয়ে পড়েন। অবশ্য তাঁরা যদি অন্য কাজ যোগাড় করে নেন তাহলে আলাদা কথা। আইসক্রীমের মত আরো অনেক ক্ষেত্রেই ঋতুগত বেকারত্ব দেখা দেয়।

(২) **বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব :** কোন দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম কয়েক বছর পর পর প্রায় নিয়মিতভাবে ওঠানামা করে থাকে। এই ওঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয়। বাণিজ্যচক্রের প্রধান ধাপ হল দুটো। কখনো অর্থনৈতিক কাজকর্ম খুব উচ্চস্তরে চলতে থাকে, আবার কখনো বা অর্থনৈতিক কাজকর্মে মন্দা দেখা দেয়। মন্দার সময় উৎপাদন, আয়, চাহিদা সব একেবারে নীচের স্তরে নেমে যায়। এইসময় শ্রমের চাহিদা শ্রমের যোগানের তুলনায় অত্যন্ত কম হয়। কাজেই বেকারত্ব দেখা দেয়। আবার অর্থনৈতিক কাজকর্মের ঊর্ধ্বগতি শুরু হয়। তখন শ্রমের চাহিদা বাড়ে। বেকারত্ব কমতে থাকে। এইভাবে বাণিজ্য

চক্রের ওঠানামার সঙ্গে তাল রেখে বেকারত্ব কমে বা বাড়ে। একে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব বলা হয়।

(৩) **বিরতিমূলক বেকারত্ব :** কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে সেই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়েন। সাময়িকভাবে তাঁদের কর্মনিয়োগে বিরতি দেখা দেয়। এর পর সেই শ্রমিকেরা অন্য প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হবার চেষ্টা করেন। যতদিন তাঁরা অন্য প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোন কর্মে নিযুক্ত হতে না পারেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের বেকার থাকতে হয়। এই বেকারত্বকে বিরতিমূলক বেকারত্ব বলা যায়। বন্দরে মাল খালাসী ও স্টেশনের কুলিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় একটি জাহাজ বা ট্রেন এলে তাঁরা কাজ পান। যতক্ষণ পর্যন্ত আর একটি জাহাজ বা ট্রেন না আসে ততক্ষণ তাঁদের বেকার থাকতে হয়।

(৪) **ছদ্মবেকারত্ব :** যাঁরা আপাতদৃষ্টিতে কাজ করেন, কিন্তু সেই কাজের ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না, তাঁরা কর্মের ছদ্মবেশে বেকার থাকেন। তাঁদের এই বেকারত্বকে ছদ্ম বেকারত্ব বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলা হয়। যাঁরা ছদ্মবেকার তাঁদের কর্মের ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না (হ্রাসও পায় না), কাজেই তাঁদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা শূন্য। এদেরকে যদি সেই উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সেই ক্ষেত্রের মোট উৎপাদন কমবে না।

ছদ্মবেকারত্ব প্রসঙ্গে একটি কথা বলা যায়। যেখানে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক মজুরী দিয়ে ভাড়াটিয়া শ্রমিক নিযুক্ত করেন, সেখানে তিনি কখনই এমন শ্রমিক নিয়োগ করবেন না যাঁর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা শূন্য। যেখানে মালিক নিজের শ্রম ব্যবহার করেন, সেই মালিকের ক্ষেত্রেই ছদ্মবেকারত্ব থাকতে পারে। আমাদের দেশে যেসব মালিক-কৃষক (Owner cultivator) কৃষিকর্মে নিযুক্ত আছেন তাঁদের অনেকেই অন্য কোন ক্ষেত্রে কর্মনিয়োগের সুযোগ না পেয়ে বাধ্য হয়ে কৃষিকর্মে নিজেদের জড়িয়ে রাখেন। কৃষিকর্মে এত লোকের প্রয়োজন নেই। তবু অনেকেই বাধ্য হয়ে কৃষিকর্ম করেন। এর ফলে কৃষিতে জনচাপ দেখা দেয়। এর অন্য নাম ছদ্মবেকারত্ব।

স্বল্পোন্নত দেশের শিল্পক্ষেত্রে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য সেবাক্ষেত্রে কর্মনিয়োগের সুযোগ খুব ধীরগতিতে বাড়ে। অথচ জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শ্রমিক বাহিনীর আয়তন দ্রুতহারে বেড়ে যায়। কাজেই বর্ধিত জনসমষ্টির একটি বড়ো অংশ বাধ্য হয়ে বিকল্পহীনভাবে কৃষিকর্মে জড়িত হয়ে যায়। এতে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। কাজেই অতিরিক্ত শ্রমিকরা ছদ্মবেকারত্বে ভোগেন।

৮.৫ বেকার সমস্যার সমাধান-সূত্র নির্ণয় :

তত্ত্বগতভাবে বেকার সমস্যা সমাধানের উপায় বলে দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু মুখে বলা যত সহজ, কাজে করা ততই কঠিন। বিশেষত গণতান্ত্রিক দেশে বেকার

সমস্যা একটি জটিল সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ধনতান্ত্রিক দেশে যেহেতু অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুব বেশি থাকে না, চাহিদা ও যোগানের অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সেখানে সব কিছু নির্ধারিত হয়, কাজেই বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য এখানে কোন নীতি নির্ধারণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা নিয়ন্ত্রণবিহীন অর্থব্যবস্থার সমর্থক। কাজেই তাঁদের বক্তব্য হল যে, বেকার সমস্যা নিজে থেকেই চলে যাবে। কীন্‌স প্রথম দেখালেন, এই যুক্তি ভুল। বেকার সমস্যা আপনা থেকেই দেখা দিতে পারে। কিন্তু আপনা থেকে চলে যেতে চায় না।

কীন্‌সের মতে বেকার সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকারী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। চাহিদা ও যোগানের হাতে সব কিছু সমর্পণ করে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলে হবে না। সেজন্য অনেকে কীন্‌সকে সমাজতান্ত্রিক ধারণার মানুষ বলে মনে করেন।

যে যাহোক, আমরা কীন্‌সের মত মেনে নিয়ে বলতে পারি—বেকার সমস্যা সমাধান করার জন্য সরকার ব্যাপক ভিত্তিতে চেষ্টা করতে পারেন। সরকার এর জন্য তাঁর আর্থিক নীতি প্রয়োগ করতে পারেন, বাজেটকে ব্যবহার করতে পারেন এবং নিজে প্রত্যক্ষভাবে কর্মনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

দেশে মন্দাজনিত বেকারত্ব দেখা দিলে সরকার মন্দা প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন। বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা মন্দার সময় বিনিয়োগ কমিয়ে দেয়। ফলে মূলধনের চাহিদা কমে এবং সেই সঙ্গে শ্রমের চাহিদাও কমে যায়। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। সরকার আর্থিক নীতি ব্যবহার করে বেসরকারী বিনিয়োগ-কারীদের উৎসাহ দিতে পারেন। যাতে বিনিয়োগকারীরা যথেষ্ট অর্থের বা ঋণের যোগান পায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। সরকার দেশের ভোগব্যয় বৃদ্ধি করার জন্য জনগণের উপর আয়করের হার কমিয়ে দিতে পারেন। এর ফলে ব্যয়যোগ্য আয় (disposable income) বাড়বে এবং আয় বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়বে। ফলে শ্রমের চাহিদা বাড়বে এবং বেকারত্ব কমবে। সরকার আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন করতে পারেন। দেশের দরিদ্র জনসাধারণের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ধনীদের চেয়ে বেশি। কাজেই দরিদ্রদের অনুকূলে আয় বণ্টনের পরিবর্তন করলে দেশের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

তবে সরকার প্রত্যক্ষভাবে নিজের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি করে বেকার সমস্যার উপর কার্যকরীভাবে আঘাত হানতে পারেন। সরকার তাঁর প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনিক কাজে বেশি করে লোক নিযুক্ত করতে পারেন। এর ফলে সরকারের ব্যয় সরকারের আয়ের তুলনায় বাড়বে সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘাটতি ব্যয় নতুন নোট ছাপিয়ে তো সহজেই পূরণ করা যায়? সরকার বেকার সমস্যা সমাধানের জন্যই

নিজের ভোগব্যয় বৃদ্ধি করতে পারেন। আবার সরকার যদি দেশে কলকারখানা গড়ে তোলেন তাতে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে অনেক লোকের কর্মনিয়োগ হবে। অর্থাৎ সরকারী উৎপাদন বৃদ্ধি করে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেও বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

সরকার বেকার সমস্যার সমাধানকে জাতীয় পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গণ্য করতে পারেন। পরিকল্পনায় সেইজন্য বিশেষভাবে অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে।

বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার শ্রম-গভীর উৎপাদন কৌশলের উপর গুরুত্ব দিতে পারেন। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহারকে অপরিহার্য স্তরে নামিয়ে এনে যন্ত্রের পরিবর্তে শ্রমের নিয়োগকে বৃদ্ধি করা যায়।

এগুলো হল শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা। কিন্তু শ্রমের যোগানকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এর জন্য জন্মশাসন পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। প্রয়োজন হলে কঠোরতম পদ্ধতিও গ্রহণ করতে হতে পারে।

শ্রমের যোগানের পরিমাণ হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের গুণগত মান বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করা চাই। এরজন্যে শ্রমের কারিগরিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হয়। দেশে কারিগরিক শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে শ্রমিকেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি কর্মে নিযুক্ত হতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়—বেকারত্ব যেহেতু বহু রকমের, অতএব যে কোন একটি সাধারণ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই সব রকম বেকারত্ব দূর হবে না। ঋতুগত বেকারত্ব দূর করতে হলে কৃষিক্ষেত্রে বহু ফসলের চাষ, সেচের প্রসার ও আশ্চর্য বীজের ব্যবহার করতে হবে। মন্দাজনিত বেকারত্ব দূর করার জন্য বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধকারী ব্যবস্থা নিতে হবে। বিরতিমূলক বেকারত্ব কিন্তু একটি কঠিন সমস্যা হিসেবে থেকে যাবে বলে মনে হয়। অনেক অর্থনীতিবিদ একে অপরিহার্য বেকারত্ব বলে মেনে নিতে চান। এর সমাধান নির্ণয় করা খুবই কঠিন। ছদ্মবেকারত্ব দূর করাও কঠিন। তবে এরজন্য কৃষির আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রের বিকাশ করা যেতে পারে। তবে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে চাই বিপুল পরিমাণ মূলধন। মূলধনের অভাবেই বেকার সমস্যার সমাধান করা যায় না। যে দেশে মূলধন কম, সেই দেশকে এই সমস্যার ভিতরে থেকেই চলতে হবে।

প্রশ্নাবলী

১। কোন দেশের কর্মনিয়োগ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

২। শ্রমের যোগান বলতে কী বোঝ? শ্রমের যোগান সম্বন্ধে ক্ল্যাসিক্যাল ও কীন্সীয় মতের তুলনা কর।

৩। কর্মনিয়োগ সম্বন্ধে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বটির সমালোচনা কর।

৪। তুমি কি মনে কর যে, মজুরীর হার কমিয়ে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায়? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৫। কীন্সের কর্মনিয়োগ তত্ত্বটির পর্যালোচনা কর।

৬। বেকার সমস্যা বলতে কী বোঝায়? বেকারত্ব কত রকমের হতে পারে আলোচনা কর এবং কীভাবে বেকারত্ব দূর করা যায় বা কমানো যায় তার সূত্র নির্ণয় কর।

৭। কর্মনিয়োগ সম্বন্ধে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের ও কীন্সের মতের তুলনামূলক বিচার কর। তোমার মতে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য এবং কেন?

৮। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

টীকা লিখ : (১) শ্রমের চাহিদা, (২) শ্রমের যোগান, (৩) অনিচ্ছা-বেকারত্ব, (৪) পূর্ণকর্মনিয়োগ, (৫) শ্রমের কীন্সীয় যোগান রেখা, (৬) অপূর্ণ নিয়োগে ভারসাম্য, (৭) ঋতুগত বেকারত্ব, (৮) ছদ্মবেকারত্ব।

নবম অধ্যায় | অর্থ ও ব্যাঙ্ক

৯১ অর্থ কাকে বলে? অর্থ কয় প্রকার?

(ক) অর্থের সংজ্ঞা :

অর্থ হল সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময়ের মাধ্যম। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ যার সাহায্যে অন্যের পাওনা মেটাতে পারে—তাকেই অর্থ বলা হয়। ধরা যাক, আমি বাজারে গিয়ে একটি কাপড় ক্রয় করলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা দেনা-পাওনার সৃষ্টি হল। কাপড় বিক্রেতা হলেন পাওনাদার, আমি হলাম দেনাদার। তিনি আমার কাছ থেকে কাপড়ের মূল্য পাবেন। এটা তাঁর দাবি। যার সাহায্যে আমি কাপড় বিক্রেতার এই দাবি মেটাতে পারি তাকেই অর্থ বলা হবে। আমি যদি কাপড় বিক্রেতাকে একটা কলম দিই এবং তিনি যদি সেই কলমটা নিয়ে সন্তুষ্ট হন তাহলে কলমটাকেই অর্থ বলা যাবে। আমরা সাধারণত মুদ্রা, অর্থাৎ ধাতব কিংবা কাগজী মুদ্রার সাহায্যে পাওনাদারদের দাবি মেটাই। সেজন্য ধাতব বা

কাগজী মুদ্রাকে অর্থ বলা হয়। অনেক সময় শুধু লিখিত প্রতিশ্রুতির সাহায্যেও দাবি মেটানো যেতে পারে। তাহলে সেই লিখিত প্রতিশ্রুতিকেই অর্থ বলা যাবে।

যেমন, আমি যদি কাপড় বিক্রেতাকে একটা কাগজে লিখে দিই—"আমি অমুক তারিখের মধ্যে আপনার পাওনা মিটিয়ে দেব' এবং কাপড় বিক্রেতা যদি সেই কাগজটি নিয়ে আমাকে কাপড় দেন, তাহলে সেই প্রতিশ্রুতিটাকেও অর্থ বলা যাবে। অবশ্য কাপড় বিক্রেতা যদি আমাকে বিশ্বাস না করেন, যদি তিনি সেই কাগজের প্রতিশ্রুতি নিতে অস্বীকার করেন, তাহলে আমি সেই কাগজের টুকরোটা দিয়ে তাঁর দাবি মেটাতে পারব না; তখন সেই কাগজের উপর লিখিত প্রতিশ্রুতিকে অর্থ বলাও যাবে না। তাহলে অর্থ হল অন্যের দাবি মেটানোর উপায় (Money is a means of settling claims).

আজকাল আমরা যাকে অর্থ বলে গ্রহণ করি—তা একধরনের প্রতিশ্রুতি মাত্র। প্রতিশ্রুতিটা হল সরকারের কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের। সরকারের প্রতিশ্রুতি সাধারণত ধাতুর উপর লেখা থাকে, কিংবা ধাতুর উপর সরকারী চিহ্ন বা ছাপ (যার নাম মুদ্রা) থাকে, যা দেখে লোকে তাকে সরকারের প্রতিশ্রুতি বা আদেশ বা নির্দেশ বলে মেনে নেয়। একে ধাতব মুদ্রা বলে। আবার সরকারের প্রতিশ্রুতি বা মুদ্রা বা ছাপা কোন কাগজের টুকরোর উপরও লেখা থাকতে পারে। একে সরকারের কাগজী মুদ্রা বলা হয়। সরকার ছাড়াও দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজের টুকরোর উপর প্রতিশ্রুতি বা ছাপা লিখে দিতে পারে। একে কাগজী মুদ্রা বলা যেতে পারে। আমি যাঁর কাছ থেকে কাপড় কিনেছি, তিনি আমার দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিতে অস্বীকার করতে পারেন, কিন্তু সরকারের বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অস্বীকার করেন না।

দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছাড়াও দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোও প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। এগুলোকে চেক বলা হয়। আমি যাঁর কাছ থেকে কাপড় কিনেছি, তিনি আমার প্রতিশ্রুতি নিতে অস্বীকার করলেও আমার ব্যাঙ্কের লিখিত প্রতিশ্রুতি বা চেক নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে চেক হবে একপ্রকার অর্থ।

(খ) অর্থের প্রকারভেদ :

অর্থ হল দাবি মেটানোর উপায়। অর্থাৎ যার সাহায্যে আমরা অপরের দাবি মেটাতে পারি তাকেই অর্থ বলা যাবে। অর্থকে প্রথমেই দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা, (১) দ্রব্যগত অর্থ (commodity money) এবং (২) অদ্রব্যগত অর্থ (non-commodity money)।

(১) **দ্রব্যগত অর্থ :** মানুষ বিভিন্ন দেশে নানা সময়ে বিভিন্ন প্রকার দ্রব্যের সাহায্যে কেনা-বেচা করেছে। কোথাও লবণ ছিল বিনিময়ের মাধ্যম। কোথাও

সমুদ্রের কড়ি, কোথাও ভেড়া, কোথাও ঘোড়া, কোথাও ক্রীতদাস, এমনকি, স্ত্রীলোক পর্যন্ত বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এইসব দ্রব্যকে অর্থ হিসেবে ব্যবহার করায় অনেক অসুবিধা দেখা দিয়েছিল। যেমন, ভেড়াকে যদি অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে ভেড়াকে কেটে কেটে টুকরো না করলে একটি ভেড়া দিয়ে চাল, ডাল, কাপড় কেনা যায় না। ভেড়ার বিভাজ্যতা নেই। তাছাড়া ভেড়া রোগে মারা যেতে পারে, বুড়িয়ে যেতে পারে এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক হল ভেড়ার বাচ্চা হতে পারে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টট্ল্ বলতেন, "অর্থের বাচ্চা হয় না।" কিন্তু ভেড়া বা ঘোড়া কিংবা ক্রীতদাস এইসব প্রাণি-বাচক দ্রব্যকে অর্থ হিসেবে ব্যবহার করলে অর্থের পরিমাণ আপনা আপনি বেড়ে যেতে বা কমে যেতে পারে।

এই কারণে প্রাণিবাচক দ্রব্য ছেড়ে জড়বস্তুকে অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা শুরু হয়। দেশে লবণ, তেল, কড়ি—এই সব দ্রব্যকে অর্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু অনেকটা লবণ বা তেল বা কড়ি বয়ে বেড়াবার দায় থাকে। এদের ওজন একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই মানুষ আবিষ্কার করেছে ধাতুময় অর্থ। সোনা, রুপো, নিকেল, তামা, ব্রোঞ্জ, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম—সব ধাতুকেই অর্থের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ধাতুর ওজন আছে, দুষ্প্রাপ্যতা আছে, ক্ষয় আছে, মূল্যভেদ আছে এবং সর্বোপরি ভেজাল মেশানোর ভয় আছে। কাজেই ধাতুর উপর নানারকম ছাপ দেওয়ার, নানারকম লেখা-জোকার আরম্ভ হল। উদ্ভব হল মুদ্রার।

মুদ্রার আবিষ্কারের পরেই মুদ্রার ধাতুর দামকে মুদ্রার লিখিত দামের চেয়ে কম করা হল, যাতে লোকে মুদ্রা গলিয়ে ধাতুটা বের করে নিতে না পারে। এর ফলে মুদ্রার মধ্যে প্রতিশ্রুতি, বিশ্বাস ইত্যাদি বিমূর্ত ব্যাপারগুলোর উদ্ভব হল।

ধাতব মুদ্রার আভ্যন্তর মূল্য (Intrinsic value) যখন লিখিত মূল্যের চেয়ে কম হল, তখন প্রতিশ্রুতির উদ্ভব হল সত্য, কিন্তু প্রথম প্রথম প্রতিশ্রুতিরও একটা ধাতব বা বাস্তব মান ছিল। পরে অনাবশ্যকবোধে সেই মানেরও অবলুপ্তি ঘটেছে। আগে ১০০ টাকার ধাতব মুদ্রার পরিবর্তে সরকার ১০০ টাকার সোনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিতেন। এখন ১০০ টাকার পরিবর্তে সরকার ১০০ টাকা ছাড়া আর কিছুই দেন না। এটা হল নিছক প্রতিশ্রুতি। দামী কাগজের টুকরোর উপর লেখা সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিশ্রুতিই [যথা—"আমি এই পত্রবাহককে চাহিবামাত্র (on demand) অমুক সংখ্যক টাকা দিতে অঙ্গীকার করিতেছি"] হল আজকালকার অর্থ।

(খ) **অদ্রব্যগত অর্থ :** যে অর্থের নিজস্ব কোন দ্রব্যগত বা বস্তুগত মূল্য নেই, কিংবা থাকলেও তার মূল্য সেই অর্থের মূল্যের চেয়ে অনেক কম, যে অর্থের ভিতরে সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কিংবা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি থাকে তাকে আমরা অদ্রব্যগত অর্থ বলতে পারি।

অদ্রব্যগত অর্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) কাগজী মুদ্রা (paper currency notes),

(২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেক্, ড্রাফট্ ইত্যাদি,

(৩) সরকারের ঋণপত্র,

(৪) অন্যান্য আর্থিক সম্পত্তি।

এগুলোকে অদ্রব্যগত অর্থ বলা হয়। কারণ এগুলো যে কাগজের উপর লেখা হয়, তার দ্রব্যগত মান অত্যন্ত কম। এই সব অর্থের কোন দ্রব্যগত মূল্য নেই বললেই চলে।

আজকাল কোন দেশে তিন রকমের অর্থ দেখা যায়, যথা (১) ধাতব মুদ্রা (২) কাগজী মুদ্রা (৩) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চেক। দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রথম দু প্রকার অর্থের সৃষ্টি করে। একে আমরা নগদ অর্থ (cash money) বলি। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো যে চেক বই দেয় তার মধ্যে নির্দিষ্ট মূল্যের উল্লেখ করে কোন ক্রেতা বিক্রেতার দাবি মেটাতে পারেন। বিক্রেতা যদি সেই চেক গ্রহণ করে তাঁর পাওনা মিটে গেল মনে করেন, তাহলে সেই চেককে অর্থ বলা হবে। চেক হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের দেয়া প্রতিশ্রুতি। বিক্রেতা যদি সেই ব্যক্তির উপর বিশ্বাস করেন, তাহলেই তিনি চেক নেবেন, নাহলে নেবেন না। চেক নেওয়া, না নেওয়া গ্রহীতার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সেজন্য চেককে আমরা আইনত গ্রাহ্য অর্থ (Legal tender money) বলতে পারি না। আইনত গ্রাহ্য অর্থ নেওয়া বাধ্যতামূলক। কেউ নিতে অস্বীকার করতে পারে না। যাহোক চেক নেওয়া, না নেওয়া যখন বিশ্বাসের ব্যাপার এবং বিশ্বাসকে ইংরেজিতে যখন Credit বলা হয়, তাহলে আমরা নগদ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থকে ক্রেডিট অর্থ বলতে পারি। আজকাল পৃথিবীর সব দেশেই নগদ ধাতব মুদ্রার চেয়ে কাগজী মুদ্রার গুরুত্ব বেশি, এবং কাগজী মুদ্রার নগদ অর্থের চেয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ক্রেডিট অর্থের গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে চলেছে। কোন দেশের অর্থের বাজার যত উন্নত হবে, মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য যত বাড়বে, যত বিশ্বাস বাড়বে ততই ক্রেডিট অর্থের গুরুত্ব বাড়বে।

নগদ ও ক্রেডিট অর্থ ছাড়াও অর্থনীতিবিদরা আজকাল সরকারের বণ্ড বা ঋণপত্রকেও অর্থের মত মনে করেন।

কোন ব্যক্তি সরকারকে টাকা ধার দিলে সরকার সেই ব্যক্তিকে ঋণগ্রহণের ও ঋণপরিশোধের শর্ত-সম্বলিত একটি পত্র দিতে পারেন। একে সরকারী ঋণপত্র বা সিকিউরিটি বলা হয়। ঋণদাতার হাতে এই ঋণপত্র থাকে এবং তিনি তাঁর প্রয়োজনে যখন-তখন এই ঋণপত্র ভাঙিয়ে নগদ অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন, কিংবা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নিকট থেকে ঋণ নিতে পারেন, কিংবা সরাসরি বণ্ড দিয়ে কোন দ্রব্য ক্রয় করতে পারেন। তবে শেষের ব্যাপারটা বড় একটা ঘটে না। ঋণদাতারা সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছে সরকারী ঋণপত্র ভাঙিয়ে নেন। কাজেই

সরকারী ঋণপত্রকেও অর্থ বলা যায়। কিন্তু নগদ অর্থ বা ক্রেডিট অর্থের মত সরকারী বণ্ডকে সম্পূর্ণ অর্থ না বলে অর্থের মত কিংবা প্রায়-অর্থ (Near-money) বলা হয়। প্রায়-অর্থকে সম্পূর্ণ অর্থে পরিণত করা যায়। দেশের কোন নামকরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র, শেয়ার প্রভৃতিকেও প্রায়-অর্থের মধ্যে ধরা যায়।

কোন পরিবার বা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাঁদের অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে চলতি আমানতে (current deposit) রাখতে পারে। চলতি আমানতের উপর চেক কাটা যায়। কোন ব্যক্তি বা পরিবার বা প্রতিষ্ঠান যখন কোন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে (যেমন পোস্ট অফিসে) চলতি আমানতে টাকা রাখে তখন ব্যাঙ্ক তার কাছে ঋণী থাকে। বিনিময়ে ব্যাঙ্ক আমানতকারীকে একটি চেকবই দেয়। সেই আমানতকারী সেই চেকবই-এর পাতায় চেক কেটে দ্রব্য কেনাকাটা করতে পারে। তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চলতি আমানতকে আমরা সম্পূর্ণ অর্থ বলতে পারি।

কোন ব্যক্তি বা পরিবার বা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে, পোস্ট অফিসে চলতি আমানত ছাড়াও মেয়াদী আমানত (Time deposit) রাখতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ের আগে এই আমানত থেকে টাকা তোলার জন্য নোটিশ দিয়ে তা করা যায়। কাজেই মেয়াদী আমানতকেও আমরা সম্পূর্ণ অর্থের মধ্যে ধরতে পারি।

তাহলে আমরা পাই,

দেশের মোট অর্থের পরিমাণ =

(১) সরকার দ্বারা প্রচলিত ধাতব মুদ্রা + (২) সরকার কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা প্রচলিত কাগজী মুদ্রা + (৩) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে রক্ষিত চলতি আমানত + (৪) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস প্রভৃতিতে রক্ষিত মেয়াদী আমানত + (৫) বিভিন্নপ্রকার প্রায়-অর্থ যথা, সরকারী ও বেসরকারী ঋণপত্র, শেয়ার, বিল ইত্যাদি আর্থিক সম্পদ।

ধরা যাক—

M = মোট অর্থের যোগান

M_1 = সরকার দ্বারা সৃষ্ট ধাতব ও কাগজী মুদ্রা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা সৃষ্ট কাগজী মুদ্রা

M_2 = বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চলতি আমানত

M_3 = মেয়াদী আমানত

M_4 = বিভিন্ন প্রকার প্রায়-অর্থ (near-moneys)

তাহলে আমরা পাই,

$$M = M_1 + M_2 + M_3 + M_4$$

অনেকে অবশ্য $M_1 + M_2$-কে সঠিক অর্থে অর্থ বা সম্পূর্ণ অর্থ হিসেবে প্রথম শ্রেণীর অর্থ বলেন এবং $M_3 + M_4$-কে সম্পূর্ণ অর্থ না বলে প্রায়-অর্থের মত মনে

করে ওদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখেন। তাঁদের মতে M_1 = সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দ্বারা সৃষ্ট নগদ অর্থ + বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের চলতি আমানত ; এবং M_2 = বিভিন্ন প্রকার মেয়াদী আমানত + বিভিন্ন প্রকার প্রায়-অর্থ বা near-money।

অতএব কোন আধুনিক উন্নত অর্থব্যবস্থায় দুরকমের অর্থ থাকে, যথা, (১) সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট নগদ অর্থ (M_1) এবং (২) বাণিজিক ব্যাঙ্ক কর্তৃক সৃষ্ট আমানত-অর্থ (M_2). সাধারণত এই দু'রকমের অর্থের যোগফলকে মোট অর্থের যোগান বলা হয়।

অতএব অর্থের মোট যোগান $M = M_1 + M_2$.

অর্থের মোট যোগানের মধ্যে সরকারের দ্বারা সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ খুব একটা বেশি নয়। M_1-এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা সৃষ্ট কাগজী মুদ্রার গুরুত্বই বেশি এবং M-এর মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের দ্বারা সৃষ্ট আমানত-অর্থের গুরুত্ব বেশি। আধুনিক অর্থতত্ত্বে সেজন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অর্থ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করা হয়।

(গ) **অর্থের কাজ ঃ** অর্থের কাজ চার রকমের হতে পারে ঃ

অর্থ (১) বিনিময়ের মাধ্যম, (২) মূল্যের পরিমাপক, (৩) মূল্যের তুলনার মাপকাঠি এবং (৪) সঞ্চয় বা সম্পদের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

(১) বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করাই হল অর্থের প্রথম ও প্রধান কাজ। অর্থের আবিষ্কার হওয়ার আগে মানুষ দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় করত। যার চাল আছে, কিন্তু কাপড় নেই—সে এমন একজন লোককে খুঁজে বার করত যার কাপড় আছে, কিন্তু চাল নেই। এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়া কষ্টকর। দুজন মানুষের অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে বিনিময় হত না। দ্রব্য বিনিময় প্রথার সব চেয়ে বড় দোষ ছিল এই যে, বিভিন্ন অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে বিনিময় ঘটত না। অর্থের আবিষ্কার এই অসুবিধা দূর করে। অর্থের সঙ্গে যে-কোন দ্রব্যের বিনিময় ঘটে, কারণ অর্থ হল সর্বজনগ্রাহ্য বিনিময় মাধ্যম। অর্থ সহজেই বিভিন্ন অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে। যার চাল আছে সে চাল দিয়ে অর্থ নেয়। যার কাপড় আছে সে কাপড় দিয়ে অর্থ নেয়। সেই অর্থের সাহায্যে তারা আবার আপন আপন প্রয়োজনমত কাপড় ও চাল কিনে নেয়। এর জন্য চাল বিক্রেতাকে কাপড় বিক্রেতার কাছে প্রত্যক্ষভাবে যেতে হয় না। অথচ উভয়ের মধ্যে বিনিময় হয়—অর্থের মাধ্যমে। অর্থ হল মাধ্যম মাত্র।

(২) অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা যায় কিংবা মূল্য পরিমাপ করা যায়। অর্থকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা যায় বলেই এটা সম্ভব হয়।

প্রত্যক্ষ দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় ঘটে। কিন্তু বিনিময়-

কৃত দ্রব্য দুটির বিভাজ্যতা না থাকলে বিনিময় ঘটতে পারে না। যেমন, আমি একটি ঘোড়া দিয়ে যদি চাল ও কাপড় ক্রয় করতে চাই, তাহলে ঘোড়াটিকে কেটে টুকরো টুকরো করতে হয় এবং সেই টুকরোগুলির বদলে চাল ও কাপড় ক্রয় করতে হয়। কিন্তু ঘোড়াকে কাটলে আমার ক্ষতি হবে তাছাড়া চাল বিক্রেতা বা কাপড় বিক্রেতা—কেউ সেটা নেবে বলে মনে হয় না। ঘোড়ার বিভাজ্যতা না থাকায় বিনিময়ের ক্ষেত্রে অসুবিধা হয়। কিন্তু অর্থ তেমন নয়। অর্থকে ভাগ করা যায় এবং যে দ্রব্যের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু অর্থ দেওয়া যায়। আমরা বলি—অর্থের সাহায্যে দ্রব্যের মূল্য পরিমাপ করা যায়।

(৩) অর্থের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য পরিমাপ করা যায় বলে অর্থকে আমরা বিভিন্ন দ্রব্যের আনুপাতিক মূল্যের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। একটি কলমের দাম ১০ টাকা। একটি কাপড়ের দাম ৫০ টাকা। কাজেই আমরা বলতে পারি—একটি কাপড় একটি কলমের ৫ গুণ মূল্য ধারণ করে থাকে। কলম বা কাপড় ছাড়া আরো অসংখ্য দ্রব্যের মূল্যের তুলনামূলক বিচার করা যায় অর্থের সাহায্যে। অর্থ শুধু মূল্যের তুলাদণ্ডই নয়, বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের তুলনার দণ্ডও হল অর্থ।

(৪) অর্থের আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল যে, অর্থকে মূল্যের ভাণ্ডার (Store of value) হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আগে মানুষ যখন দ্রব্যগত অর্থ ব্যবহার করত তখন অর্থ সঞ্চয় করা সম্ভব হত না। যেমন, লবণ যদি বিনিময়ের মাধ্যম বা দ্রব্যগত অর্থ হয়, তাহলে সঞ্চয় করতে হলে প্রচুর লবণ বাড়িতে জমা করে রাখতে হত। এতে স্থান বা আয়তন লাগত, বৃষ্টিতে, ঝড়ে লবণ নষ্ট হয়ে যাবার ভয় থাকত। তেমনি ধান বা চালকে যদি অর্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তাতেও অসুবিধা দেখা দেয়। ধান, চাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেইজন্য মানুষ ধাতুগত অর্থের ব্যবহার করতে থাকে। ধাতু সহজে নষ্ট হয় না, রাখার জন্য আয়তন কম লাগে। কাজেই ধাতুগত অর্থের সাহায্যে মানুষ উদ্বৃত্ত মূল্য সঞ্চয় করতে পারে। ধাতুগত অর্থের পর আসে কাগজের অর্থের যুগ। বর্তমানে কাগজের অর্থই বেশি ব্যবহৃত হয়। কাগজের মূল্যের চেয়ে কাগজের অর্থের স্বীকৃত মূল্য বেশি থাকে। তাছাড়া কাগজের অর্থ সকলেই গ্রহণ করে এবং এর বিনিময়ে যে-কোন সময় যে-কোন দ্রব্য ক্রয় করা যেতে পারে। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি কোন দ্রব্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করে তাহলে সে সেই দ্রব্যের যতটা প্রয়োজন ততটা ব্যবহার করে এবং বাকি উদ্বৃত্ত অংশ দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে রাখে। কাজেই অর্থ হল সেই দ্রব্যের সঞ্চিত ভাণ্ডার। এইভাবে অর্থ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অর্থের কার্যাবলী সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের ধারণার সঙ্গে কীনসীয় ধারণার পার্থক্য করা যেতে পারে। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা বলতেন—অর্থ হল বিনিময়ের মাধ্যম। তাঁরা অর্থকে সঞ্চয়ের ভাণ্ডার বলে মনে

করতেন না। সঞ্চয়ের ভাণ্ডার বলতে তাঁরা বাড়ি, গাড়ি, জমি, পুকুর, বাগান, মূল্যবান ধাতু, প্রস্তর ইত্যাদি বাস্তব সম্পত্তিকে বোঝাতেন। কিন্তু কীন্‌স্ প্রথম বলেছিলেন যে, অর্থও হল একটি সম্পদ, বরং অর্থ হল অন্য সব সম্পদের চেয়ে বেশি তরল। অর্থকে যে-কোন সময় যে-কোন দ্রব্যে রূপান্তরিত করা যায়; একেই অর্থের তরলতা (liquidity) বলা হয়। তরলতার বিচারে অর্থ হল সবচেয়ে আদরণীয় সম্পদ। কাজেই কীন্‌সের মতে অর্থের কাজ প্রধানত দুটি। একটি হল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের কাজ। দ্বিতীয়টি হল সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে অর্থের কাজ। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা এই দ্বিতীয় কাজটিকে একেবারেই গুরুত্ব দেননি।

কীন্‌সের মতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ দুটো কাজ করে—প্রথমত, আয় ও ব্যয়ের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করে, দ্বিতীয়ত, অদৃষ্টপূর্ব ও আকস্মিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা পরিবার উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে নির্দিষ্ট সময় পর পর আয় পেতে থাকে। আয়প্রাপ্তি অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না, ঘটে বিচ্ছিন্নভাবে; অথচ একটি পরিবার বা প্রতিষ্ঠানকে প্রায় প্রতিনিয়ত নানা দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়। ব্যয় ঘটে অবিচ্ছিন্নভাবে। বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত আয় এবং অবিচ্ছিন্ন ব্যয়—এই দুইয়ের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষার জন্যই কিছু অর্থ হাতে ধরে রাখতে হয়, না হলে পাওনাদারদের হাতে পড়ে লাঞ্ছিত হতে হয়। অর্থ এই অসুবিধা দূর করে। তাছাড়া একজন মানুষের জীবনে আকস্মিকভাবে অর্থব্যয় করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। এই সব ব্যয়কে আগের থেকে দেখা যায় না। হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ে। পরিবারে কারোর অসুখ হতে পারে। মোটর গাড়ি বিকল হতে পারে, কারখানার যন্ত্র হঠাৎ অচল হয়ে পড়তে পারে, বাড়িতে আগুন লাগতে পারে। এমনি কত কী বিপদ-আপদ আসতে পারে। এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও অর্থের প্রয়োজন হয়।

তবে কীন্‌সের মতে, অর্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল যে অর্থের সাহায্যে মানুষ ঋণের কারবার করে প্রচুর লাভ করতে পারে। সুদের হারের পরিবর্তন কী হতে পারে—সে সম্বন্ধে সঠিকভাবে অনুমান করতে পারলে এই লাভ পাওয়া যায়। যদি সুদের হার বেশি হতে পারে বলে অনুমান করা যায় এবং সেই অনুমান বাস্তবে পরিণত হয় তাহলে এখন টাকা ধার না দিয়ে পরে টাকা ধার দিলে লাভ হয়। কীন্‌সের মতে এটা হল অর্থের ফাটকা কারবার। বর্তমান ব্যবসা জগতে এই ফাটকা কারবারের গুরুত্ব অপরিসীম।

৯.২ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে নগদ অর্থের সৃষ্টি করে ?

দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়। দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় এখন অচল। এখন দ্রব্যের সঙ্গে অর্থের এবং

অর্থের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় চলে। এখানে দুটো বিনিময়চক্র একসঙ্গে ঘোরে এবং এই চাকা দুটোকে ঘোরাবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। উপমা দিয়ে বলা যায়, মোটর গাড়ি চালাতে যেমন পেট্রোল লাগে, মবিল তেল লাগে, তেমনি বিনিময়ের চাকা ঘোরাতেও অর্থের প্রয়োজন হয়। দেশে বিনিময়ের চাকা যত বেশি জোরে ঘুরবে, অর্থের প্রয়োজন তত বাড়বে। অর্থের যোগান যদি কম হয়, তাহলে বিনিময়ের চাকায় চাকায় ঘষা লাগবে, বিনিময়ের গতি কমে আসবে।

দেশে কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন সেটা বিচার-বিবেচনা করেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজে প্রত্যক্ষভাবে নগদ অর্থের সৃষ্টি করে, অন্যদিকে পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক সৃষ্ট ঋণ-অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সৃষ্ট অর্থের মধ্যে নগদ অর্থের সৃষ্টিকেই বোঝায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে নগদ অর্থের সৃষ্টি করে। আমরা বলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নোট ছাপায়। ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নাম হল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া (RBI). RBI দুটাকার নোট থেকে শুরু করে পাঁচ, দশ, কুড়ি, পঞ্চাশ, একশ ইত্যাদি মূল্যের নোট ছাপায়।

আগেকার দিনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মোট যত মূল্যের নগদ অর্থের সৃষ্টি করত, তার কোষাগারে ঠিক সেই পরিমাণ মূল্যের সোনা বা অন্য কোন মূল্যবান ধাতু রাখত। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নোটগুলো ছিল স্বর্ণ-সমর্থিত (gold backed)। কোন লোক কাগজের নোট নিতে অস্বীকার করলে ব্যাঙ্ক থেকে সমান মূল্যের সোনা দিয়ে দেওয়া হত। এর ফলে কাগজী মুদ্রার উপর মানুষের অবিচল বিশ্বাস থাকত।

পরে এই ব্যবস্থায় অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কোন দেশের নগদ অর্থের পরিমাণকে যদি দেশের সোনার ভাণ্ডারের উপর নির্ভরশীল করে তোলা হয়, তাতে সোনার যোগান বাড়লে বা কমলে সেই সঙ্গে অর্থের যোগানও বেড়ে যায় বা কমে যায়। এতে অর্থের যোগানের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের বা সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকতেও পারে। কাজেই দেশে অর্থনৈতিক প্রয়োজনে অর্থের যোগানকে বাড়ানোও যাবে না, কমানোও যাবে না। তাছাড়া জনগণ যদি সরকারের কথায় বিশ্বাস করে, তাহলে সেই বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সোনার মত দুষ্প্রাপ্য ধাতুকে আটক করে রাখার কোন প্রয়োজনও নেই। সেই জন্য এখন অর্থের যোগানকে সোনার যোগান থেকে মুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে।

কিন্তু অর্থের যোগানকে সম্পূর্ণরূপে জামিনমুক্ত করলে দেশের সরকারের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে অর্থের যোগান খুব বেড়ে যেতে পারে। তখন দেশবাসীও অর্থের উপর বিশ্বাস হারাবে, বিদেশীরাও সেই দেশের অর্থকে অবজ্ঞা করবে। তার জন্য এখন নিয়ম আছে—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চিত তহবিলে রাখবে এবং তারপর প্রয়োজনমত অর্থ ছাপাবে। এই ব্যবস্থায় অর্থের যোগান একদিকে পরিবর্তনশীল হতে পারে, অন্যদিকে অর্থের যোগানের অবাঞ্ছিত বৃদ্ধির প্রবণতাও কমবে।

(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে অর্থের সৃষ্টি করে ?

অর্থ গুণক (Money Multiplier) : বাণিজ্যক ব্যাঙ্ককে অর্থের ব্যবসায়ী বলা হয়। এই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ দুটো—প্রথমত, ব্যাঙ্ক লোকের সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখে। দ্বিতীয়ত, সেই গচ্ছিত অর্থ থেকে অন্য লোককে ঋণ দেয় এবং তার বিনিময়ে সুদ পায়। যাঁরা ব্যাংক থেকে ঋণ নেন তাঁদের ঋণগ্রহীতা বলা হয়। ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক যে সুদ পায়, তার একটি অংশ আমানতকারীদের সুদ হিসেবে দেয় আর একটি অংশের দ্বারা ব্যাংক তার কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি দেয়, বাড়ি ভাড়া দেয়, অন্যান্য খরচ মেটায় এবং তারপর যা উদ্বৃত্ত থাকে সেটা লাভ হিসেবে পেয়ে থাকে। এটা বাণিজ্যিক ব্যাংকের লাভের দিক।

আমানতকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে দুরকম আমানতে টাকা রাখেন। একটি হল চলতি আমানত (Current deposit); অপরটি হল মেয়াদী আমানত (Time deposit)। চলতি আমানতের টাকা আমানতকারী যখন-তখন তুলতে পারেন (অবশ্য ব্যাংক খোলা থাকলে কাজের সময়ের মধ্যে টাকা তোলা যায়)। আমানতকারী যখনই চাইবেন, তখনই ব্যাঙ্ক তাঁকে তাঁর চাহিদামত টাকা দিতে পারবে এটা হল ব্যাংকের সচ্ছলতা (Liquidity)। ব্যাংক যদি আমানতকারীর সব টাকাই অন্যকে ধার দিয়ে দেয়, তাহলে আমানতকারীর চাহিদামাত্রই (on demand) ব্যাংক তাঁকে টাকা দিতে পারবে না, ব্যাংকের উপর আমানতকারী যে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন—সে বিশ্বাস নষ্ট হবে। ব্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কোন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে দুটো বিপরীত উদ্দেশ্য থাকছে—একটি হল লাভের আশা, অন্যটি হল সচ্ছলতা বজায় রাখা। লাভের লোভ ব্যাংককে বেশি ঋণ দিতে বলে, সচ্ছলতার দিক ব্যাঙ্ককে কম ঋণ দিতে বলে। এদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলাই ব্যাংকের ধর্ম।

তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীদের সব অর্থটাই অন্যকে ঋণ দেয় না। কিছুটা আমানতকারীদের চাহিদা মেটাবার জন্য নগদ অবস্থায় রেখে দেয়, বাকি অংশটি অন্যকে ঋণ দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক কী পরিমাণ অর্থ আমানতকারীদের চাহিদা পূরণের জন্য রাখবে—সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশ থাকতে পারে, ব্যাঙ্ক নিজের অভিজ্ঞতা থেকেও এটা জানতে পারে।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, আমানতকারীরা কখনই তাঁদের জমা টাকার সবটা তুলে নেয় না, একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট অংশ মাত্র নেয়। ব্যাংক নগদ অবস্থায় সেই পরিমাণ অর্থ নিজের কাছে জমা রাখে, বাকি টাকাটা অন্যকে ঋণ দিয়ে দেয়।

ব্যাংক অন্যকে যে ঋণ দেয় সেটা হল ঋণ-অর্থের সৃষ্টি। ব্যাংক যত বেশি ঋণ দেয়, ততই দেশের মোট অর্থের যোগান বাড়ে। তাই বলা হয়—**বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে অর্থের সৃষ্টি করে।**

কোন একটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তার গচ্ছিত অর্থের যে অংশটি আমানতকারীদের জন্য রাখতে বাধ্য থাকে—তার অতিরিক্ত সব অর্থটাই ঋণ দিতে পারে। কাজেই কোন একটি ব্যাঙ্ক তার আমানতের চেয়ে বেশি ঋণ সৃষ্টি করতে পারে না, কিন্তু দেশের সব ব্যাঙ্কগুলি মিলে একত্রে তাদের মোট আমানতের কয়েকগুণ বেশি ঋণ দিতে পারে। কীভাবে এটা সম্ভব হয়, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানো যায়।

এই প্রসঙ্গে দুটি কথা প্রথমেই বলে নিতে হয়। প্রথমত—কোন একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক তার আমানতের বেশি ঋণ দিতে পারে না, কিন্তু সব ব্যাংক মিলে মোট আমানতের কয়েকগুণ বেশি ঋণ দিতে পারে। দ্বিতীয়ত, কয়েকটি বিশেষ অবস্থার মধ্যেই এটা হতে পারে। অবস্থার পরিবর্তন হলে ঋণ সৃষ্টির পরিমাণেরও পরিবর্তন হবে। এখন সব ব্যাঙ্ক মিলিতভাবে কী করে ঋণ-অর্থের সৃষ্টি করতে পারে সেটি বোঝাবার জন্য আমরা কয়েকটি অনুধারণার আশ্রয় নেব।

অনুধারণা ঃ আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নেব যে, (১) দেশের মধ্যে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক আছে,

(২) প্রত্যেকটি ব্যাংক মোট আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ, ধরে নিই ১০ শতাংশ নগদ টাকায় রাখে,

(৩) দেশের লোক নগদ টাকা হাতে ধরে রাখে না, পাবার সঙ্গে সঙ্গে নগদে বা চেকের মাধ্যমে কোন-না-কোন ব্যাংকে জমা দেয়,

(৪) কোন ব্যাংক নির্দিষ্ট জমার অনুপাতের অতিরিক্ত অর্থ নিজের কাছে রাখে না,

(৫) ব্যাংকের ঋণের চাহিদার অভাব নেই,

(৬) সুদের হারের কোন পরিবর্তন হয় না।

এখন ধরা যাক, কোন ব্যক্তি A ব্যাংকে 1,000 টাকা চলতি আমানতে জমা দিলেন। ব্যাংক তার দশ-শতাংশ অর্থাৎ 100 টাকা আমানতকারীর জন্য রেখে 900 টাকা ঋণ দেবে। ঋণগ্রহীতা সব টাকাটাই A ব্যাংক থেকে তুলে নিতে পারেন, আবার কিছুটা তুলতে পারেন, কিছুটা জমা রাখতে পারেন। ধরা যাক, তিনি 900 টাকাই ব্যাংক থেকে তুলে নিলেন। তিনি 900 টাকার সাহায্যে কারো কাছ থেকে 900 টাকার জিনিস কিনতে পারেন। তাহলে টাকাটা বিক্রেতার কাছে আসবে। এইভাবে হাত বদল করতে করতে একদিন না একদিন সেই 900 টাকা হয় ব্যাংক A-তে কিংবা অন্য কোন ব্যাঙ্কে জমা পড়বে। ধরে নিই, সেই 900 টাকা B ব্যাংকে জমা পড়ল। তাতে B ব্যাংকের চলতি আমানত বাড়ল 900 টাকা এবং দেশের মোট চলতি আমানত বাড়ল প্রথমবারে 1,000 টাকা, দ্বিতীয়বারে 900 টাকা। দেশের চলতি আমানতকে অর্থ বলা হয়। কাজেই দেশে অর্থের যোগান প্রথমবারে 1,000 টাকা ও দ্বিতীয়বারে 900 টাকা বাড়বে। দুবারে মোট বাড়ল

1,900 টাকা। এখন B ব্যাঙ্ক 900 টাকার দশ-শতাংশ অর্থাৎ 90 টাকা জমা রেখে বাকি 810 টাকা ঋণ দেবে। সেই টাকা আবার সেই ব্যাঙ্কে কিংবা অন্য কোন ব্যাঙ্কে ফিরে আসবে এবং সেই ব্যাঙ্কের আমানত বাড়বে 810 টাকা, দেশের মোট আমানতের পরিমাণ বেড়ে হবে 1,000 টা +900 টা. +810 টাকা। চতুর্থ পর্যায়ে আমানত বাড়বে 810 টাকার নয়-দশাংশ, অর্থাৎ 729 টাকা। এইভাবে শেষ পর্যন্ত মোট আমানত কী পরিমাণে বাড়বে তা নীচের তালিকায় দেখানো হল।

পর্যায়	আমানত বৃদ্ধি (টাকায়)	ব্যাঙ্কের রিজার্ভ বৃদ্ধি (টাকায়)
প্রথম	1,000	100
দ্বিতীয়	900	90
তৃতীয়	810	81
চতুর্থ	729	72·90
পঞ্চম	656·10	65·61
ষষ্ঠ	590·50	59·05
সপ্তম	53 ·45	53·15
অষ্টম	478·30	47·83
নবম	430 47	43·04
দশম	387·43	38·74
—	——	——
—	——	——
—	——	——
∝ শেষতম	প্রায় শূন্য	প্রায় শূন্য
মোট	10,000	1,000

হিসেব করার সুবিধার জন্য বলা যায়, প্রত্যেক পর্যায়ের আমানত বৃদ্ধি আগের পর্যায়ের আমানতের $\frac{9}{10}$ গুণ হবে। অর্থাৎ আগের পর্যায়ের আমানতকে 9 দিয়ে গুণ করে 10 দিয়ে ভাগ করলেই পরের পর্যায়ের আমানতের হিসেব পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ প্রথমে যদি 1,000 টাকা আমানত বৃদ্ধি পায় এবং নগদ-জমার অনুপাত (cash reserve-ratio) যদি 10% হয়, তাহলে মোট আমানত বৃদ্ধি পাবে

10,000 টাকা। এখানে 10,000 = 10 × 1,000 = প্রাথমিক আমানত বৃদ্ধির দশগুণ। দশগুণ হল কেন? তার কারণ নগদ-জমার অনুপাত ছিল 10 শতাংশ। 10 শতাংশ $= \frac{10}{100} = \frac{1}{10}$. একে উল্টে দিলে হয় 10. কাজেই নগদ-জমার অনুপাতকে 1 টাকার হিসেবে প্রকাশ করে তাকে উল্টে দিলেই আমরা আমানত বৃদ্ধির গুণকটি পেয়ে যাব। তাহলে আমরা বলতে পারি—**সমগ্র ব্যাংক-ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্ট চলতি আমানত বৃদ্ধির গুণকটি হল প্রতি একক অর্থের প্রকাশিত নগদ-জমার অনুপাতের অন্যোন্যক (Reciprocal).** প্রথমে যদি ΔD পরিমাণে আমানত বৃদ্ধি পায় এবং r% যদি নগদ জমার অনুপাত হয়, তাহলে মোট আমানত সৃষ্ট অর্থের পরিমাণ (ΔM) হবে $\Delta M = \frac{\Delta D}{r}$.

এটা কীভাবে হয় তা বীজগণিতের সাহায্যেও দেখানো যায়। আমাদের উপরের উদাহরণ $\Delta D = 1,000$ টাকা। তার পরের বার আমানত বাড়বে 900 টাকা।

$$900 = 1000 \times \frac{9}{10} = 1000\left(1 - \frac{1}{10}\right)$$

তৃতীয়বারে আমানত বৃদ্ধি পাবে 810 টাকা।

$$810 = 900 \times \frac{9}{10} = \left(1000 \times \frac{9}{10}\right) \times \frac{9}{10}$$

$$= 1000 \times \left(\frac{9}{10} \times \frac{9}{10}\right) = 1000\left(\frac{9}{10}\right)^2 = 1000\left(1 - \frac{1}{10}\right)^2.$$

চতুর্থবারের আমানত বৃদ্ধি হল 729 টাকা।

$$729 = 810 \times \frac{9}{10} = \left[1000 \times \left(\frac{9}{10}\right)^2\right]\frac{9}{10}.$$

$$= 1000\left(\frac{9}{10}\right)^3 = 1000\left(1 - \frac{1}{10}\right)^3.$$

এইভাবে পঞ্চমবারে হবে $1000\left(1 - \frac{1}{10}\right)^4$.

ষষ্ঠবারে হবে $1000\left(1 - \frac{1}{10}\right)^5$.

তাহলে n-তম বারে আমানত বৃদ্ধি পাবে $1000\left(1 - \frac{1}{10}\right)^{n-1}$

ধরি নগদ জমার অনুপাত = r,

প্রাথমিক আমানত বৃদ্ধি = ΔD,

তাহলে মোট আমানত বৃদ্ধির পরিমাণ হবে

$$\Delta M = \Delta D[1 + (1-r) + (1-r)^2 + (1-r)^3 + \cdots + (1-r)^{n-1}]*$$

ধরি $1-r=a$. তাহলে আমরা পাই,

$$\Delta M=\Delta D[1+a+a^2+a^3+\cdots+a^{n-1}].$$

$$=\Delta D\left[\frac{1-a^n}{1-a}\right]^*$$

$$\Delta D\left[\frac{1}{1-a}-\frac{a^n}{1-a}\right]=\Delta D\times\frac{1}{1-a}.$$

[কারণ এখানে r হল একের চেয়ে ছোট, কাজেই $1-r=a$ একের চেয়ে ছোট হবে ; কাজেই n যত বাড়বে a^n তত কমবে ।

অবশেষে যখন n অনন্তের কাছাকাছি চলে যাবে তখন a^n শূন্যের কাছাকাছি চলে যাবে। অবশেষে $\frac{a^n}{1-a}$ প্রায় শূন্য হবে

এবং $1+a+a+a^2\cdots+a^{n-1}=\frac{1}{1-a}$ হবে।]

অতএব $\Delta M=\frac{\Delta D}{1-a}=\frac{\Delta D}{1+(1-r)}$ (∵ $a=1-r$)

অতএব $\Delta D=\frac{\Delta D}{1-1+r}=\frac{\Delta D}{r}=\Delta D\frac{1}{r}$

= প্রথমবারের আমানত বৃদ্ধি × $\frac{1}{\text{নগদ জমার অনুপাত}}$

এটি হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার মাধ্যমে ঋণ সৃষ্টির গুণক প্রক্রিয়া (multiplier process)। এই গুণকের মান নগদ জমার অনুপাতের উপর নির্ভর করে। অনুপাত কমলে গুণক বেশি হয়। অনুপাত বাড়লে গুণক কম হয়। যেমন, নগদ জমার অনুপাত যদি 10% ($\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$) হয়, তাহলে গুণক হবে 10, অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আমানতের দশগুণ অর্থ সৃষ্টি করতে পারবে। জমার অনুপাত 20% ($\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$) হলে ব্যাঙ্কগুলি 5 গুণ অর্থ সৃষ্টি করতে পারবে। অনুরূপভাবে জমার অনুপাত 30%, 40%, 50% হলে গুণক হবে যথাক্রমে $3\frac{1}{3}$, $2\frac{1}{2}$,

---

* ধরা যাক $S=1+a+a^2+a^3+\cdots+a^{n-1}\cdots(1)$

উভয়পক্ষকে a দ্বারা গুণ করে পাই,

$$Sa=a+a^2+a^3+\cdots a^{n-1}\cdots(2)$$

এখন (1) নং থেকে (2) নং বিয়োগ করে আমরা পাই,

$S-Sa=1-a^n$ (বাকি সব পদ কেটে যাবে)

অর্থাৎ $S(1-a=1-a^n)$

অতএব $S=\frac{1-a^n}{1-a}$ এটি হল নির্ণেয় যোগফল।

2 ইত্যাদি। এইভাবে দেখা যায়, অর্থ-গুণকের মান জমার অনুপাতের উপর বিপরীতভাবে নির্ভর করে।

(গ) বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক আমানত ও ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি একযোগে মিলে প্রাথমিক আমানত বৃদ্ধির কয়েকগুণ বেশি আমানত বা ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে কতগুলি সীমাবদ্ধতা আছে।

প্রথমত, কোন একটি ব্যাঙ্ক এরকম করতে পারে না। সব ব্যাঙ্ক একসঙ্গে দিলে এটা করতে পারে। অর্থাৎ সমষ্টির পক্ষে যা করা সম্ভব ব্যষ্টির পক্ষে তা করা কখনই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক শূন্য থেকে কখনই ঋণ সৃষ্টি করতে পারে না। তারজন্য প্রাথমিক অবস্থায় ব্যাঙ্কের রিজার্ভ না বাড়লে কখনই ব্যাঙ্ক ঋণ সৃষ্টি করতে পারে না।

তৃতীয়ত, দেশের লোক যদি ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থার সঙ্গে অভ্যস্ত না হয়ে ওঠে—তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাজকর্ম কম হয়—এবং সেই সঙ্গে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাও কমে যায়। যে দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অনুন্নত সে দেশে ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ হবে।

চতুর্থত, দেশের লোক যত নগদ অর্থের সাহায্যে লেনদেন করতে চাইবে, ততই বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হবে। চেকের মাধ্যমে কেনা-বেচা চললেই চলতি আমানত অর্থের পর্যায়ে আসবে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষে অর্থের যোগানকে প্রভাবিত করা সম্ভব হবে।

পঞ্চমত, দেশের লোকেরা যদি নগদ অর্থ বা চেক ব্যাংকে জমা না দেয়, কিংবা যদি নিজেদের কাছে বেশি দিন ধরে রাখে, তাহলে বিভিন্ন পর্যায়ে আমানত সৃষ্টির হার কমে যাবে।

ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে বেশি অর্থ আমানতকারীদের চাহিদা মেটানোর জন্য রাখতে হবে। এতে ব্যাংকের সচ্ছলতা (Liquidity) বাড়বে। ব্যাংকের উপর মানুষের বিশ্বাস বাড়বে সত্য, কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কমে যাবে।

সপ্তমত, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যদি নির্দিষ্ট জমার অনুপাতের চেয়ে বেশি অর্থ নগদ অবস্থায় রাখে, যদি তারা লাভের চেয়ে সচ্ছলতাকে বেশি পছন্দ করে, তাহলে ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা কম হবে।

অষ্টমত, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় মন্দা থাকলে ঋণের চাহিদা কম হবে, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি ঋণ দিতে চাইলেও ঋণসৃষ্টির পরিমাণ কম হবে।

৯.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী :

বাণিজ্যিক ব্যাংক হল ঋণের ব্যবসায়ী। এর কাজ হল ঋণ নামক সেবা উৎপাদন করা। অতএব অন্যান্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মত ব্যাংককেও একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখা যায়। অন্যান্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কাজ হল একদিকে নানারকম উপাদান ও উপকরণ সংগ্রহ করা, অন্যদিকে সেইসব উপকরণের সাহায্যে দ্রব্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রয় করা। অনুরূপভাবে ব্যাংকেরও কাজ হল নানারকম উপকরণ ও উপাদানের সাহায্যে ঋণ নামক সেবা উৎপাদন করা। উপাদান বলতে জমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন ইত্যাদি বোঝায়। ব্যাংককেও এইসব উপাদান সংগ্রহ করতে হয়। এদের জন্য ব্যাংকের ব্যয় হয়; জমির জন্য খাজনা, শ্রমের জন্য মজুরী, মূলধনের জন্য সুদ ইত্যাদি লাগে। ব্যাংক তার সেবা বিক্রয় করে যে আয় পেয়ে থাকে তা থেকে ব্যয় বাদ দিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে তাই হল ব্যাংকের মুনাফা। ব্যাংকের প্রধান কাজ সর্বাধিক মুনাফা লাভ করা।

ব্যাংক তার সেবা উৎপাদন করার জন্য প্রধান কাঁচামাল বা উপকরণ হিসেবে যা ব্যবহার করে তার নাম আমানত। কোন ব্যক্তি বা পরিবার বা কোন প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কে নগদ অর্থ জমা রাখে। সেই নগদ জমা অর্থই ব্যাঙ্কের আমানত। ব্যাংক সেই আমানত থেকে অন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। এই ঋণের জন্য ব্যাংক সুদ পায়। সুদ হল ব্যাঙ্কের আয়। এই আয় থেকে ব্যাংক আমানত-কারীদের সুদ দেয়। সুদের বাকি অংশ নিজের আয় হিসেবে রাখে। তার থেকে বিভিন্ন রকমের ব্যয় বাদ দিয়ে মুনাফা পেয়ে থাকে।

অতএব বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হল দুটি—(১) ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ জমা রাখা এবং (২) সেই অর্থ থেকে অন্যদের ঋণ দেওয়া। বাণিজ্যিক ব্যাংক সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করে কিংবা বিল বাট্টা করে তাতে অর্থ বিনিয়োগ করে।

(৩) নগদ অর্থ জমা রাখা ছাড়াও ব্যাংক ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পত্তি নিরাপত্তার সঙ্গে রক্ষা করতে পারে। এর জন্য ব্যাঙ্কের বিশেষ প্রহরা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা আছে।

(৪) বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন প্রতিষ্ঠানের দেনা-পাওনার হিসেব রক্ষা করতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে কিংবা অন্য কোন সূত্র থেকে যে অর্থ পায় সেই অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে, ব্যাংক সেই প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমত তার পাওনাদারদের অর্থ দেয়। এখনকার ব্যাংক ব্যবসায়ের এটাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

(৫) বাণিজ্যিক ব্যাংক মেয়াদী আমানতে ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় রাখতে পারে। এর ফলে দেশের লোকে সঞ্চয়ে উৎসাহী হয়।

(৬) কোন কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক রাজ্যসরকার কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশমত নানারকম কাজ করে থাকে। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সরকার পেনসন-ভোগীদের পেনসন, বেকারদের বেকারভাতা দেন এবং অন্যান্য স্থানান্তর আয়-ভোগীদের পাওনা মেটান।

(৭) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের পাওনা আদায় করে সেই প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা দেয়। কোন ব্যাংকের মাধ্যমে জীবনবীমার প্রিমিয়াম দেওয়া যায়, বিদ্যুতের, ফোনের বিল দেওয়া হয়। আয়কর বা অন্য কোন করের টাকা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেওয়া যায়।

(৮) বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিষ্ঠানে, ব্যক্তি থেকে প্রতিষ্ঠানে কিংবা অন্য কোনভাবে অর্থের লেনদেন করা যায়। এরজন্য ব্যাংক থেকে ড্রাফট্ কেনা হয়। সেই ড্রাফট্ পাঠালেই টাকা পাওয়া যায়।

(৯) বাণিজ্যিক ব্যাংক ভ্রমণকারীদের সুবিধার জন্য ট্রাভেলার্স চেক ইস্যু করে। এই চেকের সাহায্যে বিদেশে বা দেশের অন্য কোন অংশে জিনিসপত্র কেনা যায়। তার জন্য নগদ অর্থ বয়ে নিয়ে যেতে হয় না।

(১০) বাণিজ্যিক ব্যাংক সরকারের আর্থিক নীতিকে কার্যকরী করে। অনগ্রসর এলাকায়, গ্রামাঞ্চলে সহজ শর্তে উদারভাবে ঋণ দেয়। দেশের কোন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করে। ছোট ব্যবসায়ের মালিকদের, কারিগরদের, স্বয়ং-নিযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থসাহায্য করে। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়, দারিদ্র্য কমে, কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৯.৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

অন্যান্য ব্যাঙ্কের মত কেন্দ্রীয় ব্যাংকও একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলেও অন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মত কেন্দ্রীয় ব্যাংককে একটি ব্যবসায় বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বলা চলে না। বাণিজ্যিক ব্যাংক যেমন জনগণের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে জমা রাখে ও জনগণকে ঋণ দেয় এবং এইভাবে অর্থের ব্যবসায়ে লিপ্ত থেকে মুনাফা অর্জন করার চেষ্টা করে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তেমন কোন কাজ করে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণত জনগণের অর্থ জমা রাখে না, আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণত জনগণকে প্রত্যক্ষভাবে ঋণও দেয় না। মুনাফা অর্জন করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য নয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হল দেশের অর্থব্যবস্থার অভিভাবক ও নিয়ামক। দেশে মোট অর্থের মধ্যে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সৃষ্ট কাগজী মুদ্রা বা নগদ অর্থ ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সৃষ্ট ঋণ-অর্থ।

দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী মুদ্রার বা নগদ অর্থের যোগান দেয়। এটা হল নগদ অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ-অর্থ সৃষ্টির ব্যাপারেও

নানারকম নিয়ম, নির্দেশ ইত্যাদির সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। দেশে যদি মোট অর্থের যোগান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজের সৃষ্ট নগদ অর্থের যোগান বাড়ায়, অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকেও উদার শর্তে বেশি ঋণ দিতে পরামর্শ দেয়। অপরপক্ষে, দেশের মোট অর্থের যোগান কমানোর প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজের সৃষ্ট নগদ অর্থের যোগান কমায় এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যাতে কম ঋণ দেয় তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অতএব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কাজ হল: (১) নগদ অর্থের বিশেষত কাগজী মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করা ও (২) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণ-অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানারকম উপায়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি দুরকম: (ক) ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি ও (খ) ঋণের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বা হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য ব্যাঙ্করেটের পরিবর্তন করে। খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জমার হারের পরিবর্তন করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে।

তাছাড়া (৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের আর্থিক নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে এবং সরকার যে আর্থিক নীতি গ্রহণ করেন তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করে। আর্থিক নীতি বলতে দেশের অর্থের যোগান ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ, মূল্যস্তরের গতিবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক উন্নয়ন, বেকার সমস্যার সমাধান, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা রূপায়ণ সংক্রান্ত সমস্ত প্রকার নীতিকে বোঝাতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর্থিক নীতির মত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারকে সাহায্য ও সেইসঙ্গে দেশবাসীর কল্যাণ সাধনে কাজ করে থাকে।

(৪) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন করে।

(৫) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের মুদ্রার সঙ্গে বিদেশের মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণে সাহায্য করে, নির্ধারিত বিনিময় হার ঘোষণা করে এবং সেইমত বিদেশী মুদ্রার লেনদেন করে দেশের সঙ্গে বিদেশের বাণিজ্য ও অন্যান্য আর্থিক লেনদেনে সাহায্য করে।

(৬) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে সরকারের ব্যাঙ্ক বলা হয়। সরকারের সমস্ত রকম দেনাপাওনার হিসাব রক্ষা করা, সরকারের পাওনা আদায় করা, সরকারের কাছে অন্যের পাওনা অর্থ দেয়া প্রভৃতি কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হয়।

(৭) দেশের বাজেটে ঘাটতি দেখা দিলে এবং অন্য কোনভাবে সেই ঘাটতি

পূরণ সম্ভব না হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নতুন টাকা ছাপিয়ে সরকারকে অর্থ দেয় এবং এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ঘাটতি ব্যয় মেটায়।

(৮) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শুধু যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে তাই নয়, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সব ব্যাপারেই দেখা-শোনা করে। নতুন কোন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হতে হয়; তাহলেই সেই ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য ও সমর্থন পায় এবং প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষা করছে কিনা, ব্যাংক-ব্যবস্থার উপর জনগণের আস্থা যাতে কমে না যায়, কোন ব্যাঙ্ক যাতে হঠাৎ উঠে না যায় ইত্যাদি ব্যাঙ্কের প্রশাসনিক ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে দেশের ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাকে সবল ও শক্তিশালী করে রাখে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণদানকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণের শর্ত, সুদের হার ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও নিয়ম প্রয়োগ করতে পারে।

(৯) কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের উন্নয়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণদান করতে পারে।

(১০) পরিশেষে বলা যায়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার হিসেবে কাজ করে। দেশের অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে তাদের আমানত গচ্ছিত রাখতে পারে, সেখান থেকে প্রয়োজন মত টাকা তুলতে পারে। এব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এই যে—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা (Lender of the last resort) হিসেবে কাজ করতে পারে। কোন ব্যাঙ্কের অর্থের প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাকে ঋণ দিতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের বাট্টাকৃত বিল, হুণ্ডি, বণ্ড ইত্যাদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে পুনর্বাট্টা (Rediscount) করে নগদ অর্থ পেতে পারে।

৯.৫ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি :

(ক) ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা

বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণের অর্থ জমা রাখে, সেই অর্থের একটি অংশ জনগণের জন্য নগদ অবস্থায় রেখে দেয় এবং বাকি অংশটি ঋণগ্রহীতাদের ধার দেয়। তার জন্য ব্যাংক সুদ পায়। সুদ থেকে ব্যাংকের সব রকম ব্যয় বাদ দিয়ে যে উদ্বৃত্ত থাকে সেই উদ্বৃত্ত হল ব্যাঙ্কের মুনাফা। ব্যাংকের মুনাফা বেশি হবে কি কম হবে সেটা নির্ভর করে ব্যাংকের আয় ও ব্যয়ের উপর। ব্যয় সমান আছে ধরে নিলে বলা যায়—ব্যাংকের আয় বাড়লে ব্যাংকের মুনাফা বাড়ে। ব্যাংক যেহেতু মুনাফালোভী প্রতিষ্ঠান—কাজেই ব্যাংক নিজের আয় বৃদ্ধি করার জন্য সুদের হার বৃদ্ধি করতে চাইবে। কিন্তু সুদের হার বাণিজ্যিক ব্যাংকের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কোন একটি ব্যাঙ্কের দিক থেকে দেখলে সুদের হারকে স্থির ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কাজেই মুনাফা সর্বাধিক করার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক চাইবে নির্দিষ্ট সুদের হারে সবচেয়ে বেশি ঋণ দিতে।

ব্যাংক বেশি ঋণ দিলে দেশে ঋণ অর্থের যোগান বাড়ে, জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু জিনিসপত্রের যোগান অস্থিতিস্থাপক হলে দাম বাড়ে। দেশে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা দেখা দেয়। মূল্যবৃদ্ধির ফলে অনেকের অসুবিধা হয়, সম্পদের অপবণ্টন হয়। দেশের বাস্তব বিনিয়োগ বাড়ে না। কিন্তু ফাটকা কারবারে অনেকেই টাকা খাটিয়ে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যেতে পারে। ফাটকা কারবারের সঙ্গে মুনাফাবাজি যুক্ত হয়। ব্যবসায়ীরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের কৃত্রিম ঘাটতি ঘটায়। এর ফলে অধিকাংশ মানুষের কষ্ট হয়।

জনকল্যাণমূলক দেশে এটা চলতে দেওয়া যায় না। সরকার এ দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরামর্শ দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেইমত ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কম ঋণ দিতে থাকে, কিংবা ঋণের যোগান কমিয়ে দেয়। এটা হল ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে ঋণের যোগানকে প্রভাবিত করা। সেই সঙ্গে যাতে ঋণের চাহিদাও কমে, তার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অতএব ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে ঋণের যোগান ও চাহিদা উভয়কে নিয়ন্ত্রণ করা বোঝায়।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি মূলত জনগণের জমা অর্থ থেকেই অন্যদের ঋণ দেয়। এতে ব্যাঙ্কগুলির মুনাফা বাড়ে, কিন্তু সচ্ছলতা (Liquidity) কমে যায়। সব আমানতকারীরা একসঙ্গে তাঁদের জমানো টাকার সবটাই তুলে নেবে না ভেবেই তারা অন্যদের ঋণ দেয়। আমানতকারীরাও ভাবে "ব্যাঙ্কে গেলেই টাকা পেয়ে যাব"। তারা ব্যাঙ্কের উপর আস্থা রাখে। কিন্তু ব্যাংকগুলি মুনাফার লোভে সব টাকা অন্যদের ঋণ দিলে ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের চাহিদা মাত্র টাকা দিতে পারবে না। এতে আমানতকারীরা ব্যাঙ্কের উপর আস্থা হারাবে এবং ব্যাংক-ব্যবসা অচল হয়ে পড়বে। ব্যাংক-ব্যবসা না থাকলে দেশের ক্ষতি হবে। জনকল্যাণমূলক সরকার এটা হতে দিতে পারেন না। কাজেই সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে নির্দেশ দেন, ব্যাংকগুলির নিজেদের সুবিধার জন্য ও দেশের সুবিধার জন্য।

এতক্ষণ যা বলা হল তাতে মনে হতে পারে যে, ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কেবলমাত্র ঋণের পরিমাণ হ্রাস করাই বোঝায়। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা বোঝায়। যখন ঋণের যোগান ও চাহিদা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখন যেমন ঋণের যোগান ও চাহিদা কম হ্রাস করা উচিত, তেমনি যখন ঋণের যোগান ও চাহিদা কম থাকে, তখন ঋণের পরিমাণ, যোগান ও চাহিদার বৃদ্ধি করা উচিত। ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে প্রয়োজন অনুসারে ঋণের যোগান ও চাহিদা হ্রাস বা বৃদ্ধি করা বা স্থিতিশীল রাখা বোঝায়।

দেশে যদি মন্দাবস্থা বিরাজ করে, যদি উৎপাদন কম হয়, আয়, ব্যয়, কর্মসংস্থান,

দাম, মুনাফা, বিনিয়োগ সব কিছুই কম হয়, তাহলে বিনিয়োগকারীদের ঋণের চাহিদাও কম হবে। এসময় সুদের হার কম হলেও কোন লোক ঋণ নিতে চাইবে না। এমন অবস্থায় সরকারের উচিত বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেওয়া। সেজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক মন্দার সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উপর কড়াকাড়ি কমিয়ে দেয়। তারা যাতে সহজেই ঋণ দিতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা নেয়। এইসব ব্যবস্থাও ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নামে পরিচিত।

(খ) ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ঃ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (১) ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি (Methods to Control the Quantity of Credit অথবা Quantitative Credit Control Methods) ও (২) ঋণের মান নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি (Methods to Control the Quality of Credit অথবা Qualitative Credit Control Methods).

১। ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনটি প্রধান পদ্ধতির প্রয়োগ করে ঃ

(ক) ব্যাংক হারের পরিবর্তন,

(খ) খোলাবাজারে কারবার,

(গ) জমার অনুপাতের পরিবর্তন দ্বারা ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ।

(ক) ব্যাংক হারের পরিবর্তন ঃ

আমরা জানি যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হল বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির শেষ পর্যায়ের ঋণ-দাতা (Lender of the last resort)। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির নগদ অর্থের প্রয়োজন হলে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে তাদের বিল পুনর্বাট্টা (Rediscount) করে। এই সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে বাট্টার হার ব্যবহার করে তাকেই ব্যাংকরেট বা ব্যাঙ্ক হার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ব্যাংকরেট বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি তাদের নিজেদের ধার দেওয়ার হার (Lending rates) বাড়িয়ে দেয়। এইভাবে সারাদেশে সুদের হার বেড়ে যায়। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাঙ্কহার হ্রাস করলে সারা দেশে সুদের হার কম হয়।

বাট্টার হার বৃদ্ধি করলে সুদের হার বাড়ে। সুদের হার বিনিয়োগকারীদের বা ঋণগ্রহীতাদের ব্যয়। কাজেই সুদের হার বাড়লে ঋণগ্রহীতাদের ঋণের চাহিদা কম হবে বলে আশা করা যায়। অতএব ব্যাংকরেট বাড়লে সুদের হার বেড়ে যায়, এতে ঋণের চাহিদা কমে।

বাট্টার হার বাড়লে বাট্টাকৃত বিল বা বন্ডের বর্তমান মূল্য কমে যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির বন্ড পুনর্বাট্টা করার সময় বাট্টার হার বৃদ্ধি করলে ঐসব বন্ড বা বিল পুনর্বাট্টা করে ব্যাঙ্কগুলি কম অর্থ পায়। কাজেই তাদের হাতে

ঋণ দেওয়ার মত অর্থ কম থাকে। আমরা বলি ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি পেলে ঋণের যোগান কমে যায়।

দেশে যদি ঋণের যোগান ও চাহিদা খুব বেশী হয়েছে বলে মনে হয়, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার বৃদ্ধি করে ঋণের চাহিদা ও যোগান কমাতে চেষ্টা করে। অপরপক্ষে, দেশে যদি ব্যাঙ্ক ঋণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকহার কমিয়ে দেয়। এইভাবে ব্যাংকহারের হ্রাস-বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের নিয়ন্ত্রণ করে।

ব্যাংকহার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি ঃ

ব্যাংকহার পদ্ধতিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল পদ্ধতি বলা যায়। সব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির সাহায্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। মাত্র কয়েকটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ করা চলে। এই প্রসঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলির উল্লেখ করতে পারি ঃ

(১) কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকহার পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের যোগান কমাতে বা বাড়াতে পারে, কিন্তু ঋণের চাহিদা কমাতে বা বাড়াতে পারে কিনা সন্দেহ। ব্যাংকহার বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির বিল ও বণ্ডের বাট্টাকৃত বর্তমান মূল্য কম হয়। ফলে তারা বিল ও বণ্ড পুনর্বাট্টা করে কম অর্থ পায়। অপর পক্ষে ব্যাংকহার কম হলে বাট্টাকৃত বিল ও বণ্ডের বর্তমান মূল্য বেশী হয়, ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বেশী অর্থ পায়। সেই অর্থ থেকে তারা বিনিয়োগকারী বা অন্যদের ঋণ দিতে পারে।

(২) কিন্তু বাট্টার হার বাড়লে বাজারে সুদের হার বাড়বে এবং তাতে বিনিয়োগ করার জন্য অর্থের চাহিদা কমবে এরকম আশা করা যায় না। বিনিয়োগ সুদের হারের উপর বিশেষ নির্ভর করে না। বাজারে অর্থনৈতিক অবস্থা যদি খুব ভালো হয়, তাহলে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ থেকে লাভ বেশী হয়, কাজেই সুদের হারের এক শতাংশ বা আধ শতাংশ বেশী হলেও বিনিয়োগকারীরা তাতে প্রভাবিত হয় না। অপর পক্ষে বাজারে মন্দা অবস্থা থাকলে সুদের হার কম হলেও বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহী হয় না। জিনিসপত্র উৎপাদন করার পর যদি বিক্রি না হয়, তাহলে লোকসান হবে—সেই ভয়ে বিনিয়োগকারীরা হাত গুটিয়ে বসে থাকে। এই অবস্থায় সুদের হার এক বা আধ শতাংশ কমলেও বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে চায় না।

(৩) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির রিজার্ভ থেকেই তারা ঋণ দেয়। রিজার্ভের একটি বড় অংশই হল নগদ টাকা। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য যত বেড়ে যায়, ততই ব্যাংকের আমানত বাড়তে থাকে ; ব্যাংকগুলি ততই ঋণ দেবার মত অতিরিক্ত রিজার্ভ পেয়ে যায়। তখন তারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে বিল ও বণ্ড পুনর্বাট্টা না করিয়েও প্রচুর ঋণ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার ব্যাংক হারের পদ্ধতি দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণ বৃদ্ধির ক্ষমতাকে খর্ব করতে পারে না।

আবার দেশে যখন মন্দা দেখা দেয়, তখনও বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির হাতে অতিরিক্ত রিজার্ভ দেখা দেয়। ঋণের চাহিদা কমে যায়। কাজেই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে যাবার প্রয়োজন অনুভব করে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে সুসময়ে বা দুঃসময়ের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে না যায়, তাহলে ব্যাংক হারের পরিবর্তন করেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ঋণের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না।

(৪) যে সব ব্যাংকের প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত রিজার্ভ থাকবে, তারা ব্যাংক হার দ্বারা প্রভাবিত হবে না। যাদের অতিরিক্ত রিজার্ভ থাকবে না তারাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দ্বারস্থ হবে এবং ব্যাংক হারের ফাঁস তাদের গলায় চাপানো হবে। অর্থাৎ ব্যাংক হার পদ্ধতির দ্বারা কেবলমাত্র ছোট ছোট ব্যাংকদের ধরা যেতে পারে। যে সব বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের বাজারে প্রবল প্রতাপে থাকে, ব্যাংক হার পদ্ধতি কখনই তাদের ধরতে পারে না।

(৫) ব্যাংকহার পদ্ধতির মধ্যে কোন বাধ্যতামূলক ব্যাপার নেই, কাজেই এর দ্বারা বিশেষ কাজ হতে পারে না। ব্যাংক হারের পরিবর্তনের ফলে বাজারে সুদের হার পরিবর্তিত নাও হতে পারে। ফলে ব্যাংক হার পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে পারে।

(৬) ব্যাংক হার পদ্ধতি বিনিয়োগের ভালোমন্দ বিচার করে ভালো বিনিয়োগকে উৎসাহ দিতে ও মন্দ বিনিয়োগকে কমাতে পারে না। এর মধ্যে বিচার-বিবেচনার কোন ব্যাপার নেই। ব্যাংকহার পদ্ধতির মাধ্যমে যদি ঋণের যোগান কমানো যায়, তাহলে সব ক্ষেত্রেই ঋণের যোগান কমে; মন্দও কমে, ভালোও কমে।

(৭) ব্যাংক হার পদ্ধতির দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে ছোঁয়া গেলেও দেশের অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ছোঁয়া যায় না। যে দেশে ব্যাংক ছাড়াও অন্যান্য অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান যেমন—মহাজন, দালাল, আড়তদার, ব্যবসায়ী ও সরকার স্বীকৃত শিল্প অর্থ করপোরেশন ইত্যাদি থাকে যারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতায় থাকে না—সে দেশে ব্যাংক হার পদ্ধতির ঋণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কম হবে।

ব্যাংকহার পদ্ধতির সাফল্যের শর্ত :

ব্যাংকহার পদ্ধতি বা অন্য যে-কোন ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিগুলির উদ্দেশ্য হল (১) ঋণের চাহিদা (Demand for credit), (২) ঋণের ব্যয় (Cost of credit) এবং (৩) ঋণের প্রাপ্যতা বা লভ্যতাকে (Availability of credit) প্রভাবিত করা। ব্যাঙ্কহার পদ্ধতিতে আশা করা হয় যে—ব্যাংকহার বৃদ্ধি করে ঋণের চাহিদা কমানো যাবে, ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি করা যাবে কিংবা ঋণের সহজ-লভ্যতা হ্রাস করে ঋণ অর্থের যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এই তিনটির মধ্যে যে-কোন এক বা একাধিক যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হলে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি ব্যর্থ হতে পারে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, এই যোগসূত্রগুলিই ব্যাংকহার পদ্ধতির

সাফল্যের শর্ত রচনা করে। এখন আমরা এই শর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

(১) **ব্যাংকহার ও ঋণের চাহিদা :** ব্যাংকহারকে আমরা ঋণের দাম (Price for credit) বলতে পারি। ব্যাংকহার বাড়লে ঋণের দাম বাড়ে। ঋণের চাহিদা ও ঋণের দামের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক থাকলেই ঋণের দাম বাড়লে ঋণের চাহিদা হ্রাস পাবে। ঋণের চাহিদা হ্রাস পেলে ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। বিপরীতক্রমে, যখন ঋণ বৃদ্ধি করতে হবে তখন ব্যাংকহার হ্রাস করতে হবে। ব্যাংক হার কমলে ঋণের দাম কমে এবং ঋণের দাম ও ঋণের চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকলে ঋণের চাহিদা বাড়ে। তাহলে আমরা পাই—**ব্যাঙ্কহার পদ্ধতিকে সফল হতে হলে ঋণের দাম ও ঋণের চাহিদার মধ্যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকতে হবে।**

ঋণের দামের সঙ্গে ঋণের চাহিদার কোন সম্পর্ক না থাকলে ব্যাংক হারের পরিবর্তন করে ঋণের চাহিদায় প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন, ঋণের চাহিদার সঙ্গে ঋণের দামের তেমন কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক নেই। তবে একথা ঠিক যে, আধুনিক কালে ব্যাংক ঋণের চাহিদা প্রায় সব দেশেই হ্রাস পাচ্ছে। প্রথমত, সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তো ব্যাঙ্ক ঋণের উপর নির্ভর করে না। দ্বিতীয়ত, শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ দেওয়ার জন্য ব্যাংক ছাড়া অন্য বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তৃতীয়ত, বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের সঞ্চয় ভান্ডার গড়ে তুলছে এবং সঞ্চিত অর্থকে পুনরায় বিনিয়োগ করছে। চতুর্থত, অনেক দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণ নিয়ন্ত্রণের কাজটি অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়েছে। এই সব ঘটনা ঋণের চাহিদাকে হ্রাস করেছে, ব্যাঙ্কহারের সঙ্গে ঋণের চাহিদার সম্পর্ককে নষ্ট করেছে এবং সেই সঙ্গে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতির কার্যকারিতা হ্রাস পাচ্ছে।

(২) **ব্যাংকহার ও ঋণের ব্যয় :** ব্যাঙ্কহার পরিবর্তন করে ঋণের ব্যয় বাড়ানো-কমানো যায়। ব্যাঙ্কহার বাড়লে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও তাদের ঋণ অর্থের জন্য সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। সুদের হার বাড়লে ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কাজেই ঋণের দামও বেড়ে যায়। এখানে একটি বিষয় ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যাঙ্কহার বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও তাদের ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি করে। ব্যাঙ্ক হারের সঙ্গে বাজার ঋণের সুদের হারের গভীর সম্পর্ক থাকলেই এমন হয়। যেখানে ব্যাঙ্কহারের সঙ্গে বাজারের সুদের হারের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকবে না সেখানে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি কার্যকর হবে না। অনুরূপভাবে বলা যায় যে, ব্যাঙ্কহার হ্রাস করেও বাজারের সুদের হার তখনই হ্রাস করা যাবে যখন ব্যাঙ্কহারের সঙ্গে বাজারের সুদের হারের প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকবে। অতএব **ব্যাংকহার এবং বাজারের সুদের হারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের উপস্থিতি হল ব্যাংকহার পদ্ধতির সাফল্যের একটি অন্যতম শর্ত।**

(৩) **ব্যাঙ্কহার ও ঋণের প্রাপ্যতা:** ব্যাঙ্কহারের পরিবর্তন ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির বিল, বন্ড, সিকিউরিটির বাট্টাকৃত মূল্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ব্যাঙ্কহার বাড়লে বিল, বন্ডের বাট্টাকৃত মূল্য কমে। কাজেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বিল, বন্ড ভাঙিয়ে কম অর্থ পায়।* ঋণ দেওয়ার মত অর্থের যোগান কমে। যোগান কমলে প্রাপ্যতা (availability) কমে। অপর পক্ষে ব্যাঙ্কহার কমিয়ে দিলে ঋণের প্রাপ্যতা বেশি হয়।

তাছাড়া—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন ব্যাঙ্কহারের পরিবর্তন করে তখন দেশের ঋণ অর্থের প্রাপ্যতা সম্বন্ধে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের মনোভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। একে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব (Psychological effect), ঘোষণা প্রভাব (announcement effect) ইত্যাদি নাম দেওয়া যেতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন ব্যাঙ্কহার বৃদ্ধি করে তখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং ঋণদানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও সচেতন হয়ে ওঠে। তারা বুঝতে পারে যে, ঋণের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করা হবে। কাজেই তারাও ঋণের যোগান হ্রাস করে। বিপরীত পক্ষে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন ব্যাঙ্কহার হ্রাস করে তখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি বুঝতে পারে যে ঋণের বাজারে অনুকূল হাওয়া বইবে। কাজেই তারাও ঋণের বন্ধমুষ্টি শিথিল করে দেয়। এইভাবে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও ঘোষণা প্রভাবের মাধ্যমে ঋণের প্রাপ্যতা নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু ঋণের প্রাপ্যতা সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও ঘোষণা প্রভাবের উপর খুব বেশি নির্ভর করা চলে না। কারণ এই প্রভাবগুলি আমাদের আলোচিত পথের বিপরীত দিকেও যেতে পারে। অবশ্য **মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ও ঘোষণা প্রভাব যদি ঠিকমত কাজ করে তাহলে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি ঋণ নিয়ন্ত্রণে সফল হবে।**

---

* বন্ডে যে সুদের হার লেখা থাকে সেই হারে সুদ পাওয়া যায়। বাজারের প্রচলিত সুদের হারের পরিবর্তন ঘটলেও বন্ডের লিখিত হারের কোন পরিবর্তন হয় না। বন্ড নির্দিষ্ট হারে আয় দিয়ে যায়। কাজেই সেই হারে আয় পেতে হলে কী পরিমাণ অর্থ দিতে হবে সেটা বাজারের সুদের হারের উপর নির্ভর করবে। সুদের হার বাড়লে বন্ডে লিখিত হারে আয় পাওয়ার জন্য কম টাকা দিতে হবে। কাজেই বাজারে সুদের হার বাড়লে বন্ডের দামও কমবে। উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ধরা যাক, একটা বন্ডে বার্ষিক ১০ টাকা আয় হয়। বাজারে সুদের হার বার্ষিক ১০% হলে সেই বন্ডের দাম হবে ১০০ টাকা। সুদের হার বেড়ে বার্ষিক ২০% হলে ১০ টাকা আয় পেতে লাগবে ৫০ টাকা। কাজেই সেই বন্ডের দাম হবে ৫০ টাকা। আবার সুদের হার বার্ষিক ৫% হলে সেই বন্ডের দাম বেড়ে ২০০ টাকা হবে।

(৪) **অন্যান্য শর্ত :** (ক) ব্যাঙ্কহার পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দেবার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে যায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অতিরিক্ত রিজার্ভ থাকলে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে যাবে না। সে ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতির সাফল্যের সম্ভাবনা কম থাকবে।

(খ) যে দেশে ঋণের সুগঠিত বাজার থাকে সেই দেশে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি বিশেষভাবে সফল হতে পারে, কারণ সেখানে বিল, বন্ড, সিকিউরিটি, স্টক ইত্যাদি ঋণপত্রের কেনাবেচা চলে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কহারের সঙ্গে বাজার সুদের হারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। যে দেশে বিলবাজার সুগঠিত ও সুসংগঠিত নয় সেখানে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে পারে না।

(খ) খোলাবাজারে কারবার (Open market operations) :

কীভাবে খোলাবাজারে কারবার নামক পদ্ধতির সাহায্যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ?

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা সৃষ্ট ঋণ-অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খোলাবাজারে সরকারী ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন সরকারী ঋণপত্র বা সিকিউরিটি বাজারে বিক্রয় করে তখন যারা সেই সব ঋণপত্র ক্রয় করে তাদেরকে নগদ অর্থ দিয়েই ঋণপত্র ক্রয় করতে হয়। এর ফলে নগদ অর্থ সিকিউরিটি ক্রেতার নিকট থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে চলে যায়। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে দেশবাসীর হস্তে রক্ষিত নগদ অর্থ নিষ্কাশিত করতে পারে। দেশের সাধারণ মানুষ যখন সে ঋণপত্র ক্রয় করে তখন তারা তাদের ব্যাঙ্কের উপর চেক কাটতে পারে। এতে ব্যাঙ্কের নগদ জমা (ক্যাশ রিজার্ভ) হ্রাস পায়। কাজেই ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টি করার ক্ষমতাও হ্রাস পায়। দেশবাসী যদি নগদ অর্থের সাহায্যে ঋণপত্র ক্রয় করে তাহলে তারা আর ব্যাঙ্কে নগদ অর্থ চলতি আমানতে জমা রাখতে পারে না। এর ফলেও ব্যাঙ্কের চলতি আমানত কমে এবং ব্যাঙ্ক সৃষ্ট ঋণ অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়। অবশ্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় করতে পারে। তার ফলে ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত নগদ জমা কমবে এবং তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও কমবে। বাণিজ্যিক ছাড়াও ঋণের যোগান আসে নানারকম অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান থেকে। তারাও সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করতে পারে। তার ফলে তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা হ্রাস পায়। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে।

বিপরীতক্রমে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজার থেকে (অর্থাৎ সাধারণ পাবলিক, ব্যাঙ্ক বা অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে) ঋণপত্র, বন্ড, বিল বা সিকিউরিটি ক্রয় করতে পারে। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ-অর্থের যোগান বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে

খোলাবাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করে। এর ফলে নগদ অর্থ চলে আসে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থেকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বা অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান বা সাধারণ লোকদের কাছে। কালক্রমে এই নগদ অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে গিয়ে হাজির হয় এবং তাদের নগদ জমা বৃদ্ধি করে, যার সাহায্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আরো বেশি অর্থের ঋণ সৃষ্টি করতে পারে।

বর্তমান কালে ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি অপেক্ষা খোলাবাজারের কারবারকেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে বেশি শানানো অস্ত্র বলে মনে করা হয়। ব্যাঙ্কহার পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ত্রুটি হল যে, এই পদ্ধতির সাহায্যে তখনই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে যখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সেই অস্ত্রাঘাত গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হবে। অন্যথায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর কোন আঘাত হানতে পারবে না। অর্থাৎ ব্যাঙ্কহার পদ্ধতির ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে। তারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই ভূমিকা গ্রহণ করলেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাহায্যকারীর ভূমিকা নিতে পারে মাত্র। কিন্তু খোলাবাজারে কারবারের ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রাথমিক উদ্যোগ (Initiative) নিতে হয়। এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকাই সক্রিয়। এখন দেখা যাক, খোলাবাজারে কারবার কীভাবে কাজ করে।

আমরা জানি যে, কোন ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হল ঋণের প্রাপ্যতা (Availability of credit), ঋণের ব্যয় (Cost of credit) এবং ঋণের চাহিদাকে (Demand for credit) প্রভাবিত করা। এখন দেখা যেতে পারে খোলাবাজারে কারবার কীভাবে ঋণের প্রাপ্যতা, ঋণের ব্যয় ও ঋণের চাহিদাকে প্রভাবিত করে :

(ক) খোলাবাজারে কারবার ও ঋণের প্রাপ্যতা (Open market oprations and Availability of credit) :

ঋণ বলতে এখানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির দ্বারা সৃষ্ট ঋণকেই বোঝানো হচ্ছে। খোলাবাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন সরকারী সিকিউরিটি বিক্রয় করে তখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে চলে যায়। ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পরিমাণ কমে যায়। কাজেই তারা ঋণের যোগান হ্রাস করতে বাধ্য হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি বিক্রয়ের মাধ্যমে সরাসরিভাবে ঋণের প্রাপ্যতা বা সহজলভ্যতাকে হ্রাস করতে পারে। বিপরীতক্রমে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অর্থ (Central Bank money) বা নগদ অর্থ সরাসরিভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে চলে আসে এবং তাদের নগদ জমা বৃদ্ধি করে।

ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ঋণের সহজলভ্যতাও বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যখন সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করে তখন প্রত্যক্ষভাবে ঋণের সহজলভ্যতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

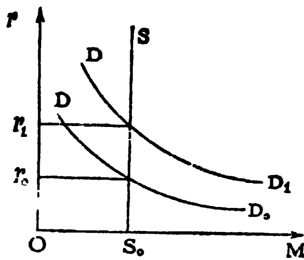
এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সিকিউরিটি বিক্রয় করে সেগুলি কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিই ক্রয় করে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছাড়াও সাধারণ মানুষ বা পরিবারগুলিও সিকিউরিটি ক্রয় করতে পারে, কিংবা অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলিও ক্রয় করতে পারে। যখন পরিবারগুলি সিকিউরিটি ক্রয় করে তখন তাদের নগদ অর্থ দিতে হয়। তারা তাদের নগদ অর্থের ভাণ্ডার কমিয়ে কিংবা তাদের ব্যাঙ্কের উপর চেক কেটে সে সব সিকিউরিটি ক্রয় করতে পারে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমার পরিমাণ হ্রাস পায়, তাদের ঋণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা এবং ঋণের সহজলভ্যতা হ্রাস পায়। অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি যদি সিকিউরিটি ক্রয় করে তাহলেও এরকম ঘটে। কারণ অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে চলতি ও স্থায়ী আমানতে তাদের টাকা রাখে। তারা যখন সিকিউরিটি ক্রয় করে তখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর চেক কেটেই তারা সিকিউরিটির দাম দেয়। এর দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের নগদ জমা কমে যায়। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পরিবার কিংবা অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে সিকিউরিটি বিক্রয় করে পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ও ঋণের সহজলভ্যতা হ্রাস করতে পারে। বিপরীতক্রমে, খোলাবাজার থেকে অর্থাৎ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কিংবা সাধারণ মানুষ বা অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে ঋণপত্র ক্রয় করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে।

(খ) খোলাবাজারে কারবার ও ঋণের ব্যয় (Open market operations and Cost of credit) :

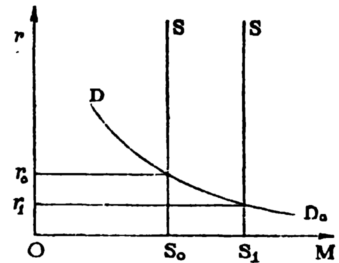
ঋণের ব্যয় বলতে প্রধানত সুদের হারকেই বোঝায়। সুদের হার যত বাড়ে ঋণের ব্যয়ও তত বাড়ে। সুদের হার কমলে ঋণের ব্যয়ও কমে যায়। আবার সুদের হার ঋণপত্রের দামকেও প্রভাবিত করে। সুদের হার বাড়লে ঋণপত্রের দাম কমে। সুদের হার কমলে ঋণপত্রের দাম বেড়ে যায়। উল্টোভাবে বলা যায়—ঋণপত্রের দাম কমলে বা বাড়লে বোঝা যায় সুদের হার বেড়েছে কিংবা কমেছে। এখন দেখা যেতে পারে খোলাবাজারে কারবার কীভাবে ঋণের ব্যয় বা সুদের হারকে প্রভাবিত করতে পারে।

আমরা জানি, সুদের হার নির্ধারিত হয় অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। সুদের হার বাড়লে অর্থের চাহিদা কমে যায়। কারণ তখন নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখার চেয়ে সিকিউরিটি বা অন্য কোন ঋণপত্র ক্রয় করা যেতে পারে। আবার সুদের হার কম হলে নগদ অর্থ তরল সম্পদ হিসেবে হাতে ধরে

রাখাই ভালো। অর্থের চাহিদা সুদের হারের উপর বিপরীতভাবে নির্ভর করে। ধরা যাক নগদ অর্থের যোগান সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যেতে পারে যে, অর্থের চাহিদা রেখা বামদিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয় এবং অর্থের যোগান রেখা পরিমাণ অক্ষের উপর লম্ব হয়। ধরা যাক নীচের রেখাচিত্রে অর্থের চাহিদা রেখা হল DD_0 নামক রেখাটি এবং অর্থের যোগান হল SS_0 নামক রেখাটি। এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষের অর্থ (M) এবং উল্লম্ব অক্ষে সুদের হার (r) পরিমাপ করা হয়েছে।



(a)



(b)

৮.৫ রেখাচিত্র : (a) সুদের হারের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র বিক্রয়ের প্রভাব; (b) সুদের হারের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র ক্রয়ের প্রভাব

(a) চিত্রে দেখা যাচ্ছে প্রথমিক সুদের হার হল Or_0 এই সুদের হারে অর্থের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করতে চায় তাহলে অর্থের চাহিদা রেখাটি উপরের দিকে সর্বাংশে স্থানান্তরিত হবে। ধরা যাক অর্থের নতুন চাহিদা রেখা হল DD_1. তাহলে নতুন সুদের হার হবে $Or_1 > Or_0$. অতএব আমরা বলতে পারি—

দেশে নগদ অর্থের যোগান যদি স্থির থাকে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করতে চায় তাহলে সুদের হার বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি খোলাবাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করতে চায় তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নগদ অর্থ খোলাবাজারে প্রবেশ করবে। এর ফলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাবে। অর্থের যোগান রেখা [(b) চিত্রে] SS_0 রেখার অবস্থান থেকে ডানদিকে সরে গিয়ে SS_1 হবে। অর্থের চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে এর ফলে সুদের হার হবে $Or_1 < Or_0$। অতএব আমরা পেলাম—**অর্থের চাহিদার কোন পরিবর্তন না হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার থেকে ঋণ-পত্র ক্রয় করতে চাইলে সুদের হার কমবে।**

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে কারবারের মাধ্যমে সুদের হারকে প্রভাবিত করতে পারে। একে বলা হয় **সুদ প্রভাব** (Interest effect)।

সুদ হল ঋণের ব্যয়। কাজেই আমরা বলতে পারি যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে কারবারের মাধ্যমে ঋণের ব্যয়কে প্রভাবিত করতে পারে। অবশ্য বাজারে একটি মাত্র সুদের হার থাকলেই এরকম হতে পারে। কিন্তু ঋণের বাজারে স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য সুদের হার বিভিন্ন হয়। সেক্ষেত্রে একটি মাত্র সুদের হারের ধারণাটি অবাস্তব। তবে এখানে যে একটি মাত্র সুদের হারের কথা বলা হয়েছে সেটি হল বিভিন্ন সুদের হারের গড় মাত্র।

তাহলে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি স্বল্পমেয়াদী সিকিউরিটি নিয়ে কারবার করে তাহলে স্বল্পমেয়াদী ঋণের সুদের হারের পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু তার ফলে সব রকম সুদের হারের পরিবর্তন হবে কেন? এবং তা যদি না হয়, তাহলে খোলাবাজারে কারবার নামক পদ্ধতির সুদ-প্রভাব থাকে না।

(গ) খোলাবাজারে কারবার ও ঋণের চাহিদা (Open market operations and Demand for credit) :

খোলাবাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী সিকিউরিটি বিক্রয় করলে সুদ-প্রভাব (Interest effect) ঘটতে পারে। আশা করা যায় এর ফলে বাজারে সুদের হার (Market Rate of Interest) বৃদ্ধি পাবে এবং আশা করা যায় যে, সুদের হার বৃদ্ধি পেলে ঋণের চাহিদা হ্রাস পাবে। সুদের হারের সঙ্গে ঋণের চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্ক থাকলে এটা ঘটতে পারে। কিন্তু যারা স্বল্পমেয়াদী ঋণ নেয়, তারা চড়া সুদেই নেয়। ঋণের টাকায় কোন জরুরী কাজ করে নেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, যারা দ্রব্যের ব্যবসায়ে মজুতদারি বা ফাটকা কারবারী করে তারাই চড়া সুদে স্বল্পমেয়াদী ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে এবং সেই ব্যবসা থেকে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। কাজেই সুদের হার তাদের কাছে বিবেচনার বিষয় হতে পারে না।

অনেকে বলে থাকেন—খোলাবাজারে কারবারের একটি ঘোষণা প্রভাব (Announcement effect) আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করলেই সকলে বুঝতে পারে—এবার ঋণের সহজলভ্যতা কমবে, ঋণের ব্যয় বাড়বে। কাজেই তারা ঋণের চাহিদা কমিয়ে দিতে শুরু করে। অতএব, **খোলাবাজারে কারবার সুদ প্রভাব ও ঘোষণা-প্রভাবের মাধ্যমে ঋণের চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।**

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি করতে চাইলে খোলাবাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করবে। তার ফলে সুদ-প্রভাব ও ঘোষণা-প্রভাব বিপরীত দিকে কাজ করবে এবং ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে, কিংবা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

খোলাবাজারে কারবার-পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা :

খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতিটি ব্যাঙ্কহার পদ্ধতির চেয়ে বেশি শক্তিশালী পদ্ধতি। কারণ ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার বৃদ্ধি করলে যে সব

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বিল, বন্ড, সিকিউরিটি ইত্যাদি ভাঙিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে যাবে কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাবে। যারা যাবে না, তাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি খাটবে না। এখানে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে। কিন্তু খোলা-বাজারে কারবারের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সক্রিয় ভূমিকা ও প্রথম উদ্যোগ নেয় এবং এই পদ্ধতির সাহায্যে একাধিক ব্যাঙ্ক, অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করা যায়। একথা স্বীকার করেও আমরা খোলাবাজারে কারবারের নিম্নলিখিত সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করতে পারি। এই সীমাবদ্ধতাগুলি মূলত এই পদ্ধতির অনুধারণাগুলি থেকে উদ্ভূত হয়।

(১) প্রথমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করে এই অনুধারণায় যে, জনসাধারণ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, অন্যান্য অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানসমূহ সে সব ঋণপত্র বিক্রয় করবে বা ক্রয় করবে। তা যদি করে তাহলে ঋণের প্রাপ্যতা, ব্যয় ও চাহিদার পরিবর্তন হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধ্য করতে পারে? খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতির মধ্যে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অনিচ্ছুক হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শত চেষ্টা করেও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করতে বাধ্য করতে পারে না। ক্রাউথারের অনুকরণে বলা যায়—ঘোড়াকে জলের ধার পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, এমনকি তাকে জলের মধ্যে ডোবান যায়। কিন্তু সে তৃষ্ণার্ত না হলে তাকে জল খাওয়ানো যায় না।

(২) দ্বিতীয়ত, খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণপত্র ক্রয় করলে তাদের নগদ জমা (Cash Reserve) কমবে। কিন্তু ব্যাঙ্কগুলির হাতে যদি অতিরিক্ত রিজার্ভ থাকে, তাহলে তার সাহায্যে তারা ঋণপত্র ক্রয় করতে পারে। এর ফলে ঋণের প্রাপ্যতা, ব্যয় বা চাহিদা কিছুই প্রভাবিত হবে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি নগদ জমার অনুপাত বাড়িয়ে দেয় এবং ঋণপত্র বিক্রয় করে তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদ জমাকে প্রভাবিত করতে পারে। অতএব খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতিকে অন্য পদ্ধতির সঙ্গে মিলিত-ভাবে প্রয়োগ করলে কিছুটা সাফল্য দেখা দিতে পারে।

(৩) তৃতীয়ত, এই পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে প্রবেশ করলে ঋণের বাজারে সুদের হারের পরিবর্তন হবে। অর্থাৎ সুদপ্রভাব দেখা দেবে। কিন্তু ঋণের বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব তীব্র না হতেও পারে।

(৪) চতুর্থত, সুদের হার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। মন্দাবস্থার সময় সুদের হার এত কমে যায় যে, কোন রকম শিথিল ও উদার আর্থিক নীতি প্রয়োগ করে সুদের হারকে আর কমানো যায় না। কমানো সম্ভব হলেও ঋণের চাহিদা কোনমতেই বৃদ্ধি পায় না। অনুরূপভাবে দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তখন সুদের হার বেশি থাকলেও ফাটকাবিনিয়োগ খুব

উচ্চস্তরে থাকে। সেখানে খোলাবাজারে কারবার দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের চাহিদা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না।

৫। পঞ্চমত, খোলাবাজারে কারবার নামক পদ্ধতিটি এককভাবে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায় না। যেমন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রয় করলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ কমে যায়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে যে সিকিউরিটিগুলি আসে বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজেই সেই সব সিকিউরিটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে বাট্টা করে নিতে পারে। এর ফলে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ ফিরে আসে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যায়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে সিকিউরিটি বাট্টা করিয়ে নিতে চায়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি অত্যন্ত বেশি ব্যাঙ্কহারে সেই সব সিকিউরিটি বাট্টা করে তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অপচেষ্টা নিবারণ করা যেতে পারে। এখানে খোলাবাজারে কারবারের সঙ্গে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতির মিলিত প্রয়োগের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপভাবে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি বিধিমত নিম্নতম নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে দেয় এবং খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করে, তাহলে অতিরিক্ত নগদ জমা সম্পন্ন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৬। ষষ্ঠত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করতে চাইলেই যে তা পারবে এমন মনে করা যায় না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে সিকিউরিটি না থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে ঋণপত্র বিক্রয় করার সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা যাবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে কী পরিমাণ সিকিউরিটি থাকবে তা নির্ভর করবে ঋণের বাজারের গঠন ও ঋণ পরিচালনা সম্পর্কে সরকারী নীতির উপর। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করতে পারবে কি না, তাও ঋণের বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে। অনুন্নত ঋণের বাজারে খোলাবাজারে কারবার নামক পদ্ধতির কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হবে।

৭। সপ্তমত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রয় করলে সরকারের ঋণ বাড়ে। সুদের বোঝাও বাড়ে। সরকার কতদূর পর্যন্ত ঋণের বোঝা বহন করতে সমর্থ ও সক্ষম হবেন তার উপরেও এই পদ্ধতির কার্যকারিতা নির্ভর করে।

৮। অষ্টমত, খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, বাজারে একটিমাত্র সুদের হার থাকে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয় কিংবা খোলাবাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করে এই সুদের হারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। কিন্তু ঋণ ও অর্থের বাজারে একাধিক সুদের হার থাকতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে কারবারের দ্বারা স্বল্পমেয়াদী সুদের হারের পরিবর্তন ঘটাতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ঋণের উপর যে

সুদের হার নির্ধারিত হয় তার উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব থাকবে কিনা সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।

খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতির সাফল্যের শর্ত :

কতগুলি নির্দিষ্ট শর্ত পালিত হলেই খোলাবাজারে কারবার নামক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সফল হতে পারে। এই শর্তগুলিকে সাফল্যের শর্ত বলা যেতে পারে। এগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি, অ-ব্যাঙ্ক সঞ্চয় প্রতিষ্ঠানগুলি ও জনসাধারণ এ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ না করলে খোলা-বাজারে কারবার পদ্ধতি কখনই সফল হতে পারে না। অতএব আমরা বলতে পারি যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যাদের কাছে ঋণপত্র বিক্রয় করে কিংবা যাদের কাছ থেকে ঋণপত্র ক্রয় করে তাদের সক্রিয় সমর্থন ও অংশ গ্রহণ না থাকলে খোলাবাজারে কারবার সফল হয় না।

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন সরকারী ঋণপত্র বিক্রয় করতে চাইবে তখন তার হাতে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণপত্র আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে অবস্থা এর বিপরীত হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করা সম্ভব হবে না। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন খোলাবাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করতে চায় তখন ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যাঙ্ক বা অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির হাতে সেরকম ঋণপত্র যথেষ্ট পরিমাণ মজুত থাকে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এর বিপরীত হলে খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতি সফল হবে না।

(৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে ঋণপত্র কেনাবেচা করলে ঋণের বাজারে প্রতিষ্ঠিত সুদের হারের পরিবর্তন হবে বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু যেখানে সুসংগঠিত ঋণের বাজার থাকে না, সেরকম দেশে খোলাবাজারে কারবার যথেষ্ট সাফল্য লাভ করতে পারে না। অতএব সুসংগঠিত ঋণের বাজারের অবস্থিতি এই পদ্ধতির সাফল্যের একটি অন্যতম শর্ত।

(৪) খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতিতে ধরে নেওয়া হয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে সুদের হার বৃদ্ধি করতে পারে, কিংবা খোলাবাজার থেকে ঋণপত্র ক্রয় করে সুদের হার হ্রাস করতে পারে। একে সুদ-প্রভাব বলা হয়। কিন্তু ঋণের বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের আধিপত্য কতখানি তার উপর এই সুদ-প্রভাব নির্ভর করবে। ঋণের বাজারে সরকারী সিকিউরিটি ছাড়াও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার), শেয়ার ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। সেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রবেশ করলে ঋণের চাহিদা বা যোগানের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হবে কিনা তা ঋণের বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাবের উপর নির্ভর করে। ঋণের বাজার পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের খোলাবাজারে কারবারের

দ্বারা ঋণের চাহিদা বা যোগানের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হবে না। অপরপক্ষে ঋণের বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একচেটিয়া আধিপত্য থাকলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে খোলাবাজারে কারবারের দ্বারা সুদ-প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ খোলাবাজারে কারবারকে ঋণ নিয়ন্ত্রণের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত (Necessary condition) মাত্র বলা যায়। এটি যথেষ্ট শর্ত নয়।

(৫) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অতিরিক্ত রিজার্ভ থাকলে তার সাহায্যে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণপত্র ক্রয় করতে পারে। তার ফলে তাদের ঋণসৃষ্টি করার ক্ষমতা কমে না। কাজেই বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অতিরিক্ত রিজার্ভ না থাকাও এই পদ্ধতির সাফল্যের একটি শর্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

(৬) খোলাবাজারে কারবারের মূল উদ্দেশ্য হল ঋণের চাহিদার পরিবর্তন ঘটানো। এরজন্যই ঋণের প্রাপ্যতা ও ঋণের ব্যয় নামক বিষয়গুলির পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু কার্যত ঋণের চাহিদা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতিকে প্রয়োগ করে অর্থের যোগানের বা চাহিদার পরিবর্তন ঘটাতে পারতে পারে, কিন্তু আর্থিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন অনুকূল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। যেখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর্থিক নীতিকে অর্থনৈতিক নীতির অঙ্গ হিসাবে প্রয়োগ করতে পারে সেখানে খোলাবাজারে কারবার সফল হতে পারে।

(৭) পরিশেষে বলা যায় যে, খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতিকে সফল করতে হলে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি, বিধিগত জমার অনুপাত এবং ব্যাঙ্কহার পদ্ধতিকে একই সঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত। কোন একটি পদ্ধতিকে এককভাবে প্রয়োগ করলে তার কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হবে।

(গ) পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত (Variable Reserve Ratio) :

ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি ও খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতিগুলির সীমাবদ্ধতা বেশি থাকায় বহুদিন ধরে বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ও অর্থনীতিবিদদের মধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু হয়। তাঁরা সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রচলিত পদ্ধতিগুলির সাহায্যে কখনই নিশ্চিতভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনা যাবে না। ব্যাঙ্কহার পদ্ধতি এবং খোলাবাজারে কারবারের দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণসৃষ্টির উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এমন একটি পদ্ধতির প্রবর্তন করা প্রয়োজন যার সাহায্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরাসরিভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উদ্বৃত্ত রিজার্ভের উপর আঘাত করতে পারে। এর পরিণাম-স্বরূপ পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত নামক পদ্ধতির প্রচলন; প্রথমে এই পদ্ধতির

প্রবর্তনের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয় ১৯১৭ সালের কাছাকাছি সময়ে। এর পর ১৯৩০ সালে মহামতি কীন্‌স তাঁর A Treatise on Money নামক গ্রন্থে পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত নামক পদ্ধতির প্রয়োগকে সমর্থন করেন। ১৯৩৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই পদ্ধতি চালু হয়। পরে অন্যান্য দেশেও এই পদ্ধতি চালু করা হয়।

এই পদ্ধতিতে স্বীকার করা হয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তার ব্যাঙ্কহার পরিবর্তন করে এবং খোলা বাজারে ঋণপত্রের কেনাবেচা করে কখনই বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত রিজার্ভ হ্রাস করতে পারে না। খোলাবাজারে কারবার তো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে সিকিউরিটি তুলে দেয়; এতে তাদের সম্পদ বেড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে বাড়ে তাদের ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতা। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অতিরিক্ত রিজার্ভ হ্রাস করতে হলে তাদের বাধ্যতামূলক ও বিধিসম্মত নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করতে হবে। তার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে রাখতে বাধ্য হবে। বিধিসম্মত নগদ জমার অতিরিক্ত যে অর্থ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে থাকবে তার সাহায্যেই তারা ঋণ সৃষ্টি করতে পারবে। অর্থাৎ বিধিগত নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি পেলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণযোগ্য-নগদ অর্থ কমবে এবং তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাও কমবে: অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের যোগান বৃদ্ধি করতে চাইলে বিধিগত নগদ জমার অনুপাত হ্রাস করবে। তার ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে উদ্বৃত্ত জমার পরিমাণ বাড়বে এবং তারা বেশি পরিমাণে ঋণ সৃষ্টি করতে পারবে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছে দুরকমের আমানতে জনগণ নগদ অর্থ জমা রাখে। এগুলি হল চলতি আমানত (demand deposit) এবং মেয়াদী আমানত (Time deposit). বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এই আমানতের একটি অংশ আমানতকারীদের জন্য নগদ অবস্থায় জমা রাখে। বাকি অর্থ থেকে অন্যদের ঋণ দেয়। মুনাফার লোভে ব্যাঙ্ক প্রায় সব টাকাটাই ঋণ দিতে চায়। কিন্তু তাতে ঋণের যোগান বৃদ্ধি পায়। দেশে মুদ্রাস্ফীতির চাপ বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে আমানতকারীরা "চাহিবামাত্র" (On demand) তাদের চলতি আমানত থেকে অর্থ পেতে চাইলে ব্যাঙ্ক তাদের সেই চাহিদা পূরণ করতে পারে না। এতে ব্যাঙ্কের সচ্ছলতা নষ্ট হয়। কাজেই আমরা বলতে পারি—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করলে একদিকে যেমন ঋণের যোগান হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমনি ব্যাঙ্কগুলির উপর আমানতকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। এতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রসার লাভ করে। ঋণের বাজারে উন্নতি ঘটে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির চলতি আমানত থেকে গুণক প্রক্রিয়ায় ঋণ সৃষ্টি হয়; কাজেই ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য চলতি আমানতের পক্ষে বেশি হারে বিধিগত নগদ জমার অনুপাত বেশি রাখা উচিত। মেয়াদী আমানত থেকে গুণক প্রক্রিয়ায় ঋণ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম, কাজেই মেয়াদী আমানতের জন্য কম হারে নগদ

জমা রাখলেই চলে। পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত পদ্ধতিতে সেজন্য চলতি আমানতের উপর উচ্চহারে এবং মেয়াদী আমানতের উপর নিম্নহারে নগদ জমার অনুপাত ধার্য করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমে চলতি আমানতের উপর নগদ জমার অনুপাত মোট আমানতের ১৩% থেকে ১৬% এবং মেয়াদী আমানতের উপর ৩% থেকে ৬% ধার্য করা হয়েছিল।

পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত পদ্ধতিটি স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হতে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সরকারী ঋণপত্রের বাজার সংকীর্ণ ও সীমিত পরিসরবিশিষ্ট। কাজেই এখানে খোলাবাজারে কারবার পদ্ধতির প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অতিরিক্ত রিজার্ভ নিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পক্ষে সহজে সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক জমার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তাছাড়া খোলাবাজারে কারবারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত রিজার্ভের প্রান্তিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। খুব বেশি পরিবর্তন ঘটাতে চাইলে সরকারী ঋণপত্রের দামে খুব বেশি ওঠা-নামা দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র নগদ জমার অনুপাতের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

এই পদ্ধতির অসুবিধা :

পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত নামক পদ্ধতির মধ্যে বাধ্যতামূলকতার পরিমাণ বেশি, কাজেই এই পদ্ধতিটির দ্বারা সহজে ঋণ নিয়ন্ত্রণের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই পদ্ধতির নিম্নলিখিত অসুবিধা উল্লেখ করা যায়।

(১) এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির ঋণ দেওয়ার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যে সব বড় বড় ব্যাঙ্কের কাছে অতিরিক্ত রিজার্ভ থেকে যায়, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি করলে তারা সেই অতিরিক্ত রিজার্ভ থেকে টাকা জমা দিয়ে দেয়, কাজেই তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে না।

(২) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে ব্যাঙ্কগুলির সচ্ছলতা (liquidity) বৃদ্ধি করতে পারে বলে মনে হয় না। এতে ছোট ছোট ব্যাঙ্কের ঋণ দানের ক্ষমতা কমে। সুদের লোভে, ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে টিকে থাকার জন্য তারা যদি বেশি পরিমাণ অর্থ ধার দেয়, তাহলে তাদের সচ্ছলতা কমে যাবে। অথচ বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি এর দ্বারা প্রভাবিত হয় না।

(৩) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়িয়ে দিলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে ঋণ দেওয়ার মত টাকা থাকে না সত্য, কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যদি সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণপত্র ভাঙিয়ে নতুন টাকা সংগ্রহ করে নেয় তাহলে

জমার অনুপাত বৃদ্ধির আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। অর্থাৎ পরিবর্তনশীল জমার অনুপাত ও ব্যাঙ্ক রেট পদ্ধতি একে অপরের কার্যকারিতা নষ্ট করে।

(৪) নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণ সৃষ্টির ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছাড়াও কোন দেশের ঋণের বাজারে থাকে বহু অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। উন্নয়নশীল দেশে জমিদার, জোতদার, মহাজন, আড়তদার, বড় বড় ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য সরকার স্বীকৃত বা সরকার গঠিত সঞ্চয়-প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, যারা ঋণ দিয়ে থাকে। এই সব অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি ঋণদানের বাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়মনীতি মেনে চলতে বাধ্য নয়। তাছাড়া তারা জনগণের কাছ থেকে মেয়াদী আমানতে সঞ্চিত অর্থ জমা রাখে, কিন্তু সেই জমার একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে বাধ্য নয়। পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত এদেরকে স্পর্শ করতে পারে না।

(৫) পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত পদ্ধতিকে পক্ষপাতমূলক পদ্ধতি বলা হয়। কারণ এই পদ্ধতি বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির অতিরিক্ত রিজার্ভ হ্রাস করতে পারে না। তা করার জন্য যদি নগদ জমার অনুপাত খুব বেশি বাড়িয়ে দেয় তাহলে ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলি খুবই অসুবিধায় পড়ে যায়। আবার এই পদ্ধতি অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি একেবারেই প্রযোজ্য নয়। কাজেই এ পদ্ধতিকে পক্ষপাতমূলক পদ্ধতি বলার পিছনে সঙ্গত যুক্তি লক্ষ্য করা যায়।

(৬) পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত নামক পদ্ধতির আর একটি ত্রুটি হল এর অনমনীয়তা (Inflexibility)। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একবার জমার অনুপাত পরিবর্তন করলে ঋণের বাজারে স্থায়িত্ব রক্ষার জন্যে তার পক্ষে কিছু দিনের মধ্যে সেই অনুপাতের আর কোন পরিবর্তন করা উচিত নয়। অথচ অর্থনৈতিক কাজে ওঠা-নামা ঘন ঘন হতে পারে। তার সঙ্গে তাল রেখে নগদ জমার অনুপাত ক্রমাগত বাড়ানো-কমানো সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে ঋতুগত প্রভাবজনিত কারণে ঋণের বাজারে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির নগদ রিজার্ভের পরিমাণে ঘন ঘন পরিবর্তন দেখা দেয়। এক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় নগদ জমার অনুপাত পদ্ধতি ভালোভাবে কাজ করতে পারে না।

(২) ঋণের মান নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি :

ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিগুলির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল যে, এরা ঋণের গুণ বিচার না করে সব ঋণকে এক সঙ্গে বাড়াতে কিংবা কমাতে চায়। কিন্তু এমন হতে পারে যে, কতগুলি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা কাম্য এবং কতগুলি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হ্রাস করা কাম্য। যেমন, ব্যবসায়ীরা যদি মুনাফার লোভে চাল, ডাল, কাপড়, কেরোসিন, চিনি, কাগজ প্রভৃতি অত্যাবশ্যক জিনিসপত্রের মজুত

গড়ে তোলে এবং তার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেয়, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত সেই ঋণ বন্ধ করা। অথচ দেশের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি না করলে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব যাবে না। তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত দেশের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য ঋণ নীতি শিথিল ও উদার করা। এখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঋণের পরিমাণ কমাবার জন্য পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি গ্রহণ করে—তাহলে অপ্রয়োজনীয় বিনিয়োগ কমবে এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ কমে যাবে। এতে দেশের ক্ষতি হবে। কাজেই—কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত বেছে বেছে অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগে ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ করা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ঋণের যোগান বৃদ্ধি করা। কিন্তু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিগুলি নির্বিচারে সকল প্রকার ঋণকেই জব্দ করে দেয়। একে ইংরেজিতে Blanket effect বলা হয়।

পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতির এই ত্রুটি দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে। এই পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে বেছে বেছে ঋণ দিতে বলা হয়। যদি জানা যায় ঋণগ্রহীতা ফাটকা কারবারে টাকা খাটানোর জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে চাইছে, তাহলে ব্যাঙ্ক তাকে ঋণ দিতে অস্বীকার করতে পারে, কিংবা ঋণ দিলেও ঋণের শর্ত খুব কড়াকড়ি করতে পারে। এখানে ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরামর্শ ও নির্দেশমত সুদের হার খুব বেশি করতে পারে, ঋণ-প্রাপ্ত অর্থের একটি মার্জিন আটক করে রাখতে পারে, ঋণ শোধের মেয়াদ কমিয়ে দিতে পারে এবং ঋণের জন্য ভালো ও বেশি জামিন চাইতে পারে। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ফাটকা কারবারীরা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে দেশের ক্ষতি করতে পারবে বলে মনে হয় না। অপর পক্ষে যেসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার দরকার সবচেয়ে বেশি সেই সব ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়ার শর্ত উদার করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে।

নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি অনেক রকমের হতে পারে। এর জন্য ঋণের র‍্যাশনিং ব্যবস্থা চালু হতে পারে; অপ্রয়োজনীয় ঋণের উপর নগদ মার্জিন বাড়ানো যেতে পারে, মঞ্জুর করা ঋণের উপর গিলোটিন ফেলে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে, জামিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যেতে পারে, শোধের মেয়াদ কমানো যেতে পারে ইত্যাদি।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরোধ করে ও উপদেশ দিয়ে ঋণের যোগান কমাতে বলতে পারে। এইসব নৈতিক প্রণোদনে কাজ না হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রত্যক্ষ আদেশের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দিষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারে। এগুলি হল ঋণ নিয়ন্ত্রণের শেষ পর্যায়ের পন্থা এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ক্ষমতার চূড়ান্ত ব্যবহার।

(ক) ঋণের পরিমাণ ও ঋণের মান নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতির তুলনা :

পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি ও ঋণের মান নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিগুলির মধ্যে তুলনা করলে কয়েকটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। (১) ব্যাঙ্কহার, খোলাবাজারে কারবার এবং পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত নামক পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিগুলির সাহায্যে সামগ্রিক অর্থব্যবস্থায় ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু ঋণের মান নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতির দ্বারা সমগ্র অর্থব্যবস্থার কয়েকটি নির্বাচিত ক্ষেত্রেই ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ পরিমাণ পদ্ধতির লক্ষ্যস্থলে থাকে সমগ্র অর্থ-ব্যবস্থা, কিন্তু মান নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিতে লক্ষ্যস্থলে থাকে অর্থব্যবস্থার কয়েকটি নির্বাচিত অংশ মাত্র।

(২) পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিগুলি অন্ধভাবে চলে, ঋণের গুণ বিচার করার ক্ষমতা তাদের নেই। ঋণ যখন কমানো হয়, তখন তারা যে ঋণ কমানোর দরকার নেই তাকেও কমিয়ে দেয়। আবার ঋণ বৃদ্ধি করার সময় কাম্য ও অকাম্য সকল প্রকার ঋণকেই বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এমন অন্ধ নয়। দেখে-শুনে বিচার-বিবেচনা করে এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র অকাম্য ঋণকেই নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়। সেইজন্য মান নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিকে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Selective Credit Control Method) বলা হয়।

(৩) কোন্ ঋণ দেওয়া ভালো এবং কোন্ ঋণ দেওয়া ভালো নয় তার বিচার করা নৈতিক ব্যাপার। কিন্তু কী পরিমাণ ঋণ দেওয়া উচিত তা নির্ধারিত হয় ঋণের অর্থনৈতিক প্রভাবের বিচারে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, পরিমাণ পদ্ধতিগুলি হল অর্থনৈতিক পদ্ধতি এবং নির্বাচনমূলক পদ্ধতি হল নৈতিক পদ্ধতি।

(৪) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সিদ্ধান্ত নেয় তখন সেই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলে প্রথমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি প্রভাবিত হয়। তারপর যারা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে আসে তারা ঋণ নিয়ন্ত্রণের ঘোষণার দ্বারা প্রভাবিত হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি হল ঋণদাতা। আমরা বলতে পারি পরিমাণ পদ্ধতিগুলি প্রথমে ঋণদাতাদের প্রভাবিত করে। কিন্তু নির্বাচনমূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণগ্রহীতাদের উপর নানারকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে থাকে। অর্থাৎ নির্বাচনমূলক পদ্ধতিতে প্রভাবিত করা হয় ঋণগ্রহীতাদের।

(৫) পরিমাণ পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ঋণের প্রাপ্যতা, ব্যয় ও চাহিদার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ব্যাপারটা কিছুটা ঘোরা পথে হয়। কিন্তু নির্বাচনমূলক পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রায় সোজাসুজিভাবে ঋণের উপর আঘাত করতে পারে।

(৬) যেখানে ঋণের বাজার সুসংগঠিত নয় সেখানে পরিমাণ পদ্ধতিগুলি কাজ করতে পারে না। সাধারণত স্বল্পোন্নত দেশে ঋণের বাজার সুসংগঠিত

নয়। এখানে পরিমাণ পদ্ধতির প্রয়োগে খুব একটা সাফল্য আশা করা যায় না। স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিই প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়।

(৭) পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিসমূহ অনমনীয় কিন্তু নির্বাচনমূলক পদ্ধতি হল যথেষ্ট নমনীয়। ব্যাঙ্কহার, নগদ জমার অনুপাত ইত্যাদি একবার নির্দিষ্ট হয়ে গেলে দেশের প্রয়োজনে তাদের ঘন ঘন পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু নির্বাচনমূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে কোথাও ঋণ কমানো যায়, কোথাও ঋণ বাড়ানো যায় এবং ঘন ঘন এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা যায়।

(৮) নির্বাচনমূলক পদ্ধতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়। মুদ্রাস্ফীতি দমনে, বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা অপেক্ষাকৃত বেশি; কিন্তু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিগুলির কার্যকারিতা কখনই এমন নির্ভরযোগ্য ও নিশ্চিত নয়।

(৯) ভোগ ও সঞ্চয় কিংবা ভোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে ভোগকে ঠিক রেখে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হলে কিংবা বিনিয়োগকে ঠিক রেখে ভোগ হ্রাস করতে হলে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতি অপেক্ষা নিবাচনমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করাই ভালো। পরিমাণ পদ্ধতিগুলি অবাঞ্ছিত ভোগব্যয় হ্রাস করে কাম্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটাতে অসমর্থ হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই পদ্ধতিগুলি ভালোভাবে কাজ করতে পারে না।

(১০) অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নির্বাচনমূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। দরিদ্র দেশে সঞ্চয় কম। সেই সীমিত সঞ্চয়কে এমনভাবে বিনিয়োগ করা উচিত যাতে বিন্দুমাত্র অপচয় না হয়। যথেষ্ট বিচার-বিবেচনা না করে বিনিয়োগ করা যায় না। নির্বাচনমূলক পদ্ধতিতেই এই বিচার-বিবেচনার অবকাশ আছে, পরিমাণ পদ্ধতিতে নেই।

নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Selective Credit Control Method):

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা হিসেবে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের কাগজ বা ঋণপত্র (বিল, বন্ড ইত্যাদি) ভাঙিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে নগদ টাকা সংগ্রহ করতে পারে এবং সেই টাকা ঋণ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে বাট্টার হার বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু যে বাট্টার হার ঘোষিত হবে সেই হারে যে-কোন ব্যাঙ্ক যে-কোন উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বিল, বন্ড ইত্যাদি বাট্টা করে নিতে পারবে এবং সেই বাট্টাকৃত অর্থ ফাটকা কারবারীদের ঋণ দিতে পারবে। ফাটকা কারবারে লাভ বেশী। সুদের হার দু-চার টাকা বেশি হলেও ফাটকা কারবারীদের বিশেষ অসুবিধা হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক হার বাড়িয়ে ফাটকা কারবারে বিনিয়োগ হ্রাস করতে পারে না। তাছাড়া ফাটকা কারবার

দমন করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্ক হার খুব বাড়িয়ে দেয় তাহলে ফাটকা কারবার কমবে না, অথচ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমে যাবে। কারণ উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ খুব বেশি করতে হয়; দীর্ঘকাল পরে সেই বিনিয়োগের ফল পাওয়া যায়, মধ্যবর্তী সময়ে সুদের বোঝা বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান সমস্যা হল এমন একটি ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবিষ্কার করা, যে পদ্ধতি প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের উপর কোন আঘাত না করে অপ্রয়োজনীয় বিনিয়োগকে হ্রাস করতে পারবে। অতএব বোঝা যাচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যাতে সব ঋণকে না কমিয়ে বিশেষ কোন ঋণকে, বিশেষ করে ফাটকা ঋণকে কমাতে পারা যায়। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে প্রয়োজনীয় ঋণ এবং অপ্রয়োজনীয় ঋণের মধ্যে বাছাই বা নির্বাচন করতে হবে। যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে—বিভিন্ন ঋণের ও বাট্টা-যোগ্য ঋণপত্রের মধ্যে নির্বাচন করা হয় এবং প্রয়োজনীয় ঋণের কোন পরিবর্তন না করে অপ্রয়োজনীয় ঋণ হ্রাস করা হয় কিংবা অপ্রয়োজনীয় ঋণ কমিয়ে প্রয়োজনীয় ঋণ বৃদ্ধি করা হয় তাকেই নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা হয়।

(১) ঋণপত্রেরবাট্টা যোগ্যতা বিধি :

নির্বাচনমূলক পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির বাট্টাযোগ্য ঋণপত্রের যোগ্যতা (eligibility) পরীক্ষা করে এবং যোগ্যতা বিধি (eligibility rules) নিধারণ করে। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বাণিজ্যিক বিল (Commercial bills) বাট্টা করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে নিয়ে যায়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেখে বিলগুলি কী ধরনের। যদি দেখা যায় যে, বিলগুলি ফাটকা কারবারীদের বিল, তাহলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেই সব বিল পুনর্বাট্টা করার জন্য বাট্টার হারকে বিশেষভাবে বাড়িয়ে দেয়। আবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায়-সংক্রান্ত বিলের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক পুনর্বাট্টার হার কম রাখে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের আনা বিল বাট্টা করতে অস্বীকার করতেও পারে। অতএব এই পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থির করে যে, কোন্ কোন্ কাগজ পুনর্বাট্টার জন্য গহণ করবে বা অস্বীকার করবে এবং কোন্ কোন্ কাগজের কী রকম বাট্টার হাব পয়োগ করবে।

(২) বিভিন্ন মার্জিন :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৪ সালে একটি বিশেষ আইন বলে মার্জিন পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করা হয়। তার আগে সেখানে সরকারী সিকিউরিটি নিয়ে প্রচণ্ড ফাটকা কারবার দেখা দেয়। ব্যাংক, অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠান সকলেই সিকিউরিটি কেনার জন্য সিকিউরিটির দাম খুব বেড়ে যেতে থাকে (অর্থাৎ সুদের হার

কমে যেতে থাকে) এবং ব্যাংক ঋণের একটি বড়ো অংশ সিকিউরিটি কেনার পেছনে ব্যয়িত হতে থাকে। এর প্রতিকারের জন্যই নতুন আইন (Securities Exchange Act, 1934) চালু হয় এবং মার্জিন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। যে সব সিকিউরিটির দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল তাদের ক্ষেত্রে সর্বাধিক ৪৫% মার্জিন ধরা হয়েছিল। **মার্জিন বলতে বোঝায় সরকারী ঋণপত্রের দামের সেই অংশ যা নগদে দিতে হবে বলে স্থির করা হয়।** যেখানে ৪৫% মার্জিন ধরা হয়, সেখানে সিকিউরিটি ক্রেতাকে ১০০ টাকার সিকিউরিটি কেনার জন্য ৪৫ টাকা নগদে দিতে হয় এবং সে বাকি ৫৫ টাকা ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে দিতে পারে। সিকিউরিটি কেনা হল ফাটকা কারবারের মত ব্যবসায়। ব্যাংক ঋণের মত প্রয়োজনীয় জিনিস যদি সিকিউরিটির কেনা-বেচায় লগ্নি হতে থাকে তাহলে দেশের ক্ষতি হবে, সরকারকেও ঋণের পরিচালনায় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এই সব কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন হারে মার্জিন প্রয়োগ করে। **কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফাটকা কারবারে ব্যাংক ঋণের ব্যবহার হ্রাস করতে চাইলে মার্জিন বৃদ্ধি করে।** দ্বিতীয় যুদ্ধের পর অত্যধিক মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা রোধ করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪৬ সালে এই মার্জিনকে ১০০% পর্যায়ে তোলা হয়েছিল।

(৩) বাণিজ্যিক ব্যাংকের আচরণ নিয়ন্ত্রণ :

নির্বাচনমূলক পদ্ধতিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে সাবধান করে দেওয়ার জন্য, বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নানা প্রকার উপদেশ, আদেশ ইত্যাদি নৈতিক প্রণোদন দেয়। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মনোভাবের অংশীদার হয়ে ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সাহায্য করে তার জন্যই এরকম নৈতিক প্রণোদন। প্রসংগত বলা যায়, একসময় বৃটেনের অর্থমন্ত্রী কাম্যপথে ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যাংক অব্ ইংল্যান্ডকে অনুরোধ করেন। ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যান্ড সেই অনুরোধ রক্ষা করে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ঋণের ক্ষেত্রে কঠোর হতে অনুরোধ করেছিল। রপ্তানি প্রসারিত হতে পারে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে পারে—এমন সব ক্ষেত্রেই ঋণের যোগান বৃদ্ধির জন্য এবং ফাটকা বিনিয়োগ হ্রাস করার জন্যই কঠোর হবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ঋণের টাকায় কারখানা গড়া হলে বা কোন স্থায়ী মূলধন গঠনে সাহায্যকারী কাজ হলে ঋণ দেওয়া দরকার। কিন্তু ঋণের টাকায় কেউ যদি টি.ভি, গাড়ি ইত্যাদি স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করতে চায় তাহলে সে ক্ষেত্রে যেন বাণিজ্যিক ব্যাংক সহজে ঋণ না দেয়। যেন ভালো করে ঋণের দরখাস্ত পরীক্ষা করে দেখে এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর ঋণ দেয়—এই ছিল সেই অনুরোধের উদ্দেশ্য। নির্বাচনমূলক পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আচরণে পরিবর্তন আনার জন্য নানারকম ব্যবস্থা নিতে পারে।

(৪) **ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট ঋণ নিয়ন্ত্রণ :**

নির্বাচনমূলক পদ্ধতির দ্বারা ব্যাঙ্ক ঋণের সাহায্যে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়কেও নিয়ন্ত্রিত করা হয়। যারা এ ব্যবসায়ে জড়িত থাকে তাদের সবাইকে ঋণ নিয়ন্ত্রণ বিধি মেনে চলতে হয়। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে সেই টাকায় ফ্রিজ, গাড়ি, টি. ভি. এই সব কেনা যায়। কিন্তু কেনার সময় প্রথমে কিছুটা নগদে দিতে (Cash down) হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রাথমিক নগদের পরিমাণ বেশি করতে বলে। তাছাড়া কিস্তির সংখ্যাও বাড়ানো বা কমানো হয়। বসতবাড়ি করার জন্য ঋণের দরখাস্ত পরীক্ষা করার সময় যাতে ব্যাঙ্ক ঋণের বেশির ভাগ বসতবাড়ি নামক ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত না হয়, যাতে অন্য দরকারী বিনিয়োগ কমে না যায় তার জন্য বাস্তব সম্পত্তি (Real estate)-র ঋণের পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়।

(৫) **আমদানির আগে জমা রাখার নিয়ম :**

যারা বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানির জন্য লাইসেন্স বা বিদেশী মুদ্রার জন্য দরখাস্ত করে তাদের সেই আমদানি দ্রব্যের প্রকৃতি পরীক্ষা করে দেখা হয়। অপ্রয়োজনীয় আমদানির ক্ষেত্রে যেমন লাইসেন্স দেওয়ায় কড়াকড়ি করা হয়, তেমনি আমদানি মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ অগ্রিম জমা রাখতে বলা হয়। এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অনেক দেশেই এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

এ ছাড়াও অনেক দেশে (৬) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর বিভিন্ন হারে নগদ জমার অনুপাত ধার্য করা হয় এবং (৭) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, বিভিন্ন দেশ তাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রকার নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে।

নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা :

নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি থেকে প্রথম প্রথম কিছু সাফল্য পাওয়া গেলেও পরে এর ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাগুলি ধরা পড়েছে।

প্রথমত, এই পদ্ধতিতে ঋণ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ঠিক কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে তা নির্ণয় করার কোন উপায় বলে দেওয়া থাকে না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও ফাটকা কারবারীরা যোগসাজস করে এই পদ্ধতিকে বানচাল করে দিতে পারে। ১৯৫৬ সালে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ধান, চাল কেনাবেচার জন্য ঋণের ক্ষেত্রে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল। তাতে ধান, চালের ব্যবসায়ের নামে গৃহীত ঋণের পরিমাণ হ্রাস পেলেও ধান, চালের ফাটকা কারবারীরা অন্য কাগজ দেখিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়ে গিয়েছিল।

অনেকে ঋণের উদ্দেশ্য বোঝার জন্য তিনটি নিরিখ (test) প্রয়োগ করার কথা বলেন, যথা (ক) কাগজ পরীক্ষা, (খ) ঘোষণা পরীক্ষা ও (গ) ফল পরীক্ষা, কিন্তু কোন পরীক্ষাতেই ফাটকা কারবারীদের ধরা যায় না।

দ্বিতীয়ত, এই পদ্ধতির প্রশাসনিক জটিলতা খুব বেশি। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরামর্শমত চলতে চায় তাহলে ঋণের দরখাস্ত পরীক্ষা, ঘোষণা পরীক্ষা, কাগজ পরীক্ষা ইত্যাদি কাজেই তাদের বহু সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হবে। কোন বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তা করতে রাজি হবে কিনা বলা শক্ত।

তৃতীয়ত, স্বল্পোন্নত দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ জানতে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না, কারণ নির্দেশ মানার অভ্যাসই এখানে বিরলতম গুণ। ব্যাঙ্কগুলি তাদের খদ্দেরদের সঙ্গে কাজ করার শর্ত ও পদ্ধতি গড়ে তোলে এবং এর মধ্যেই তাদের ব্যবসায়িক সুনাম থাকে। ব্যাঙ্কগুলি এই সুনাম নষ্ট করতে চায় না বলে তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পাঠানো ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চায় না।

চতুর্থত, স্বল্পোন্নত দেশে দুর্নীতি বেশি বলে অভিযোগ করা হয়। কাজেই নির্বাচনমূলক ঋণ পদ্ধতি দুর্নীতির বেড়াজালে পড়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করা যেতে পারে। নির্বাচনমূলক পদ্ধতিতে ফাটকা কারবার বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এখানেই দুর্নীতির বড়ো গর্ত থাকে।

পঞ্চমত, নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি স্বল্পোন্নত দেশে বিশেষ কার্যকরী হতে পারে না বলে অভিযোগ করা হয়। এখানে যে কোন ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ভাগ্যে যা ঘটে, নির্বাচনমূলক পদ্ধতির ক্ষেত্রেও তাই হয়। স্বল্পোন্নত দেশে ঋণের বাজার অসংগঠিত। মোট ঋণের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণের ভাগ বেশি নয়। ঋণের বাজারের একটি বড়ো অংশে আধিপত্য করে দেশীয় ঋণদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, যারা যে-কোন রকম ঋণ নিয়ন্ত্রণ বিধির আওতার বাইরে থাকে। আইনের মাধ্যমে এই সব প্রতিষ্ঠানকেও যখন ঋণ নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ মানতে বাধ্য করা যাবে তখন যে-কোন ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সাফল্য লাভ করবে।

পরিশিষ্ট : NFI (Non-Banking Financial Intermediaries) এবং ঋণনিয়ন্ত্রণ

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে কয়েকটি নতুন ঘটনার উদ্ভব হয়েছে, যেগুলি ঋণনিয়ন্ত্রণের প্রাচীন পদ্ধতিগুলির প্রয়োগ ক্ষেত্রকে সীমাবদ্ধ করেছে কিংবা তাদের প্রাসঙ্গিকতাকে বদলে দিয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে পারি, যথা (১) অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব ও আধিপত্য বিস্তার এবং (২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ। ভারতের বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ওপর সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে ঋণনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আরো বেশি

আয়ত্তে এসেছে। যেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত হয়, কিংবা যেখানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালনার ব্যাপারে সরকারের প্রাধান্য থাকে সেখানে সরকার তাঁর আর্থিক নীতিকে সরাসরিভাবে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির উপর প্রয়োগ করতে পারেন সরকারী নির্দেশের মাধ্যমে। তার মধ্যে ঋণনিয়ন্ত্রণের প্রাচীন পন্ধতিগুলির প্রয়োগ করতে হয় না, কিংবা হলেও তাদের কার্যকারিতা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে যায়। অথচ আমরা যে ঋণনিয়ন্ত্রণ পন্ধতিগুলির কথা বলেছি তাতে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক বেসরকারী আওতায় আছে! তাবা মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ঘটে।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি বেসরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় থাকে। সেখানে সরকারের আর্থিক নীতি প্রয়োগ করার অসুবিধা দেখা দেয় এবং ঋণনিয়ন্ত্রণের প্রাচীন পন্ধতিগুলির মধ্যে বেছে নিতে হয় কিংবা একাধিক পন্ধতিকে একসঙ্গে প্রয়োগ করতে হয়।

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে বহু অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা NFI (Non-Banking Financial Intermediaries) গড়ে উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠান-গুলি জনগণের সঞ্চিত অর্থ মেয়াদী আমানতে জমা রাখে এবং তার জন্য আমানতকারীদের সুদ দেয়। ভারতে এরকম আর্থিক প্রতিষ্ঠান হল LIC (Life Insurance Corporation), UTI (Unit Trust of India) পোস্টঅফিস, পিয়ারলেস প্রভৃতি সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। এরা সাধারণ ব্যাঙ্কের মত চলতি আমানতে টাকা রাখে না। এদের উপর চেক কাটা চলে না। তাই এদের ব্যাঙ্ক না বলে অ-ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। কিন্তু মেয়াদী আমানত রাখার ক্ষেত্রে এবং ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে এরাও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। অনেক সময় দেখা যায় উচ্চহারে সুদ ও অন্যান্য সুবিধার (যেমন, বীমার সুযোগ) দ্বারা এরা জনগণের কাছ থেকে মেয়াদী আমানতে অর্থ জমা রাখে এবং সেই অর্থ ফাটকা কারবারে বিনিয়োগ করে (বিভিন্ন চিট্ ফান্ডগুলি এ রকম করতে পারে)। এতে তাদের লাভ হয়। তারা বেশি সুদ দিতে পারে। বেশি সুদের লোভে জনগণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছে টাকা জমা না রেখে NFI-গুলির কাছে রাখে। এইভাবে NFI এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। NFI-গুলি যেহেতু চলতি আমানত রাখে না, সেজন্য চলতি আমানতের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কই হল একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং সেক্ষেত্রে তাদেরই প্রাধান্য রয়েছে। কিন্তু মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে এবং NFI-গুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। NFI-গুলি তাদের মেয়াদী আমানত ভাঙিয়ে প্রচুর ঋণ দিতে পারছে। এতে ঋণের বাজারে NFI-গুলির গুরুত্বও বাড়ছে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির গুরুত্ব কমছে।

NFI-গুলির এই গুরুত্ব বৃদ্ধির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে। NFI-গুলি যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান নয় কাজেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু NFI-গুলির ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ঋণের ক্ষেত্রে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে NFI-গুলির প্রাধান্য থাকায় সহজেই বোঝা যায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির কার্যকারিতা খর্ব হবেই।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির, বিশেষ করে ব্যাঙ্কহার পদ্ধতির কার্যকারিতা বিচার করার জন্য ইংলন্ডে Radcliffe Committee নিযুক্ত হন। এই কমিটি ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ বহু ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর M. H. de Kock এই কমিটিতে সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, আগে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ছিল ঋণের একমাত্র ব্যবসায়ী। তখন আর্থিক কর্তৃপক্ষ যা করব বলে ভাবতেন তা করতে পারতেন। কিন্তু তার পর থেকে ব্যাঙ্ক ছাড়াও অন্য বহু অর্থ ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়েছে এবং তাদের ভূমিকা ব্যাঙ্কের চেয়ে বেশি সক্রিয় হয়ে পড়েছে। তারা আরো বেশি করে ব্যাঙ্কগুলির ক্ষমতায় ভাগ বসাচ্ছে। কাজেই এখন আর্থিক কর্তৃপক্ষ যা করব বলে ভাবেন তা করতে পারেন না।

১৯৫৯ সালে Radcliffe Committee রিপোর্ট দেন। এতে NFI-সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, NFI এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মধ্যে একটি মৌল পার্থক্য আছে। NFI-গুলো মূলত মেয়াদী আমানত রাখে, যার মাধ্যমে ঋণ সৃষ্টি করা যায় না, কারণ মেয়াদী আমানতের উপর চেক কাটা চলে না। NFI-গুলো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছেই তাদের টাকা রাখে ; যখন কাউকে ঋণ দেয়, তখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপর চেক কেটে সেই ঋণ দেয়। এতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মাধ্যমেই ঋণ সৃষ্টি হয়। অতএব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোই হল ঋণের সৃষ্টিকারক, NFI-গুলো ঋণের দালাল মাত্র। ইংরেজিতে বলা হয়, Commercial Banks are creators of finance, but the NFIs are only brokers of finance. পরবর্তীকালে R. S. Sayers এই মতবাদকে সমর্থন করেন। অর্থাৎ Radcliffe এবং Sayers-এর মত হল যে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও NFI-গুলোর মধ্যে মৌল পার্থক্য আছে। একে R-S Thesis বলা হয়।

১৯৬০ সালে অধ্যাপক J. G. Gurley ও E. S. Shaw তাঁদের বিখ্যাত গ্রন্থ "Money in a Theory of Finance" প্রকাশ করেন। এতে তাঁরা বলেন যে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং NFI-এর মধ্যে কোন মৌল পার্থক্য নেই। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক এবং NFI উভয়কেই ঋণের সৃষ্টিকারক বলা যায়। উভয়ের ক্ষেত্রেই অর্থ গুণক কাজ করে। একে G-S Thesis বলা হয়।

G-S Thesis থেকে সিদ্ধান্ত করা হয় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঋণ নিয়ন্ত্রণ

করতে চায় এবং আর্থিক নীতিতে যদি সাফল্য লাভ করতে হয় তাহলে পুরানো ঋণ নিয়ন্ত্রণগুলির পরিবর্তে নতুন ধরনের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আবিষ্কার করতে হবে। তাছাড়া সর্বাগ্রে আইনের সংশোধন ঘটিয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে আরো অধিক ক্ষমতা দিতে হবে যাতে সে NFI এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

প্রশ্নাবলী

১। অর্থ কী ? অর্থ কত রকমের হয় ?

২। কোন দেশের মোট অর্থের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে ? বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

৪। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাকে বলে ? কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী বর্ণনা কর।

৫। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতের সাহায্যে কীভাবে অর্থের সৃষ্টি করে সেটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

৬। বাণিজ্যিক ব্যাংক কীভাবে অর্থের সৃষ্টি করে ? এর সীমাবদ্ধতাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৭। অর্থ সৃষ্টির ব্যাপারে একটি ব্যাংক যা করতে পারে না, গোটা ব্যাংক ব্যবস্থা তা করতে পারে—উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।

৮। অর্থ-গুণক কী ? কীভাবে এটি কাজ করে ? এর সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর।

৯। অর্থ-গুণক কী ? এর মান কত হয় ? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

১০। ঋণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায় ? ঋণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বিচার কর।

১১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কীভাবে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে ?

১২। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিঃ পদ্ধতিগুলি পর্যালোচনা কর।

১৩। ঋণনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে (ক) ব্যাংকহারের পরিবর্তন, (খ) খোলা বাজারে কারবার ও (গ) জমাহারের পরিবর্তন—এই তিনটি পদ্ধতির কার্যকারিতা বিচার কর।

১৪। নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝায় ? এই পদ্ধতির কার্যকারিতা আলোচনা কর।

১৫। (ক) ব্যাংকহার পদ্ধতি ও (খ) খোলা বাজারে কারবার—এই দুটি পদ্ধতির কার্যকারিতার শর্তগুলি আলোচনা কর।

১৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

(১) অর্থ একটি প্রতিশ্রুতি—উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। (২) দ্রব্যগত অর্থের অসুবিধাগুলি কী? (৩) অর্থ হল দাবি মেটানোর উপায়—ব্যাখ্যা কর। (৪) ব্যাঙ্কের লাভজনকতা ও সচ্ছলতার সম্পর্কটি সংক্ষেপে বোঝাও। (৫) স্বর্ণ সমর্থিত অর্থ কী? (৬) প্রত্যেকটি ঋণ একটি করে আমানত—ব্যাখ্যা কর। (৭) অর্থ-গুণকের সূত্রটি সংক্ষেপে বোঝাও। (৮) শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা কাকে বলা হয়? (৯) ব্যাঙ্কহার কী? (১০) খোলাবাজারে কারবার বলতে কী বোঝায়? এই পদ্ধতির সাহায্যে অর্থের যোগানকে কীভাবে প্রভাবিত করা যায়? (১১) জমাহার কী? এর সাহায্যে কীভাবে অর্থের যোগানে পরিবর্তন করা যায়? (১২) নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলতে কী বোঝায়?

১০.১ দামস্তর কাকে বলে ? দামস্তরের বৈশিষ্ট্য কী ?

কোন জিনিস কেনার জন্য যে অর্থ দিতে হয়, তাকেই আমরা সাধারণ কথায় দাম বলি। অর্থাৎ অর্থের হিসেবে কোন দ্রব্যের বিনিময় হারকেই দাম বলা হয়। দাম বলতে কোন একটি দ্রব্য বা একটি সেবার দাম বোঝায়। কিন্তু দামস্তর বলতে তা বোঝায় না।

দামস্তর কোন একটি দ্রব্য কিংবা একটিমাত্র সেবার দাম নয়, দামস্তর হল সব দ্রব্য ও সব সেবার দামের একটি গড় মাত্র। **কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে সব দ্রব্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় হয়, তাদের দামের গড়কেই দামস্তর বলা হয়।**

দামস্তরের বৈশিষ্ট্য :

(১) দামস্তর কোন দ্রব্যের দাম নয় ; এটি সব দ্রব্যের দামের একটি গড়মাত্র। এই গড় দু'রকমের হতে পারে। যথা—সরল গড় (Simple average) এবং গুরুত্বযুক্ত গড় (Weighted average) সরল গড়ে দ্রব্যের দামগুলি যোগ করে দ্রব্যের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। এতে কিন্তু অনেক অসুবিধা থাকতে পারে। যেমন, একটি মোটর গাড়ির দাম যদি ৪০,০০০ টাকা এবং একটি কলমের দাম যদি ১০ টাকা হয়, তাহলে সরল গড় অনুসারে কলম ও মোটর গাড়ির গড় দাম (বা দামস্তর) হবে ২০,০০৫ টাকা। এটা কলমের দামও নয়, গাড়ির দামও নয়। অতএব দামস্তর বলতে যদি সব দ্রব্যের দামের সরল গড় ধরা হয় তাহলে সেই দামস্তরের দ্বারা কোন দ্রব্যেরই দাম সম্বন্ধে কিছু জানা যাবে না। সেইজন্য অনেক সময় প্রত্যেকটি দ্রব্যের দামকে সেই দ্রব্যের গুরুত্ব দিয়ে গুণ করে গুণফলগুলিকে যোগ করা হয়—তারপর সেই যোগফলকে মোট গুরুত্ব দিয়ে ভাগ করা হয়। এটা হল গুরুত্বযুক্ত গড় (Weighted average)। যদি বাজারে n সংখ্যক দ্রব্য থাকে, তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়,……n-তম দ্রব্যের দামকে আমরা যথাক্রমে $P_1, P_2, P_3, \cdots, P_n$ বলতে পারি।

এখন ধরলাম W_1 হল প্রথম দ্রব্যের গুরুত্ব।

W_2 হল দ্বিতীয় দ্রব্যের গুরুত্ব।

W_3 হল তৃতীয় দ্রব্যের গুরুত্ব।

... .

W_n হল n-তম দ্রব্যের গুরুত্ব।

ধরি P = দামস্তর।

তাহলে গুরুত্বযুক্ত দামস্তর $P = \frac{W_1P_1 + W_2P_2 + W_3P_3 + \cdots + W_nP_n}{W_1 + W_2 + W_3 + \quad + W_n}$

কিন্তু সরল গড় হিসেবে দামস্তর হবে

$$P = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + \cdots + P_n}{n}$$

দামস্তর বলতে আমরা এমনি একটি গুরুত্বযুক্ত গড়কেই বোঝাই। এই গড়ও কিন্তু সব দ্রব্যের দামকে সমানভাবে তুলে ধরে না। কাজেই **দামস্তরকে কোন এক বা একাধিক দ্রব্যের দামের আভাসদানকারী গড় বলা যায় না।**

(২) দামের ক্ষেত্রে দ্রব্যের ও অর্থের হিসাবকে একসঙ্গে ধরে দাম বলা হয়। যেমন, ১ কেজি চালের দাম ৩ টাকা। এখানে চালের একক কেজি এবং অর্থের একক টাকা থাকছে। তেমনি এক মিটার কাপড়ের দাম ১০ টাকা, এক লিটার দুধের দাম ৪ টাকা ইত্যাদি বলা হয়।

কিন্তু দামস্তর যেহেতু সব দ্রব্যের দামের গড়, অতএব এতে কোন বিশেষ একটি দ্রব্যের একক থাকবে না। যেমন, ১ কেজি চালের দাম ৩ টাকা, ১ মিটার কাপড়ের দাম ৯ টাকা ও ১ লিটার দুধের দাম ৩ টাকা হলে ওদের গড় দাম = $\frac{৩ \text{ টাকা} + ৯ \text{ টাকা} + ৩ \text{ টাকা}}{৩}$ = ৫ টাকা, কিন্তু ৫ টাকা প্রতি কেজি, প্রতি মিটার না প্রতি লিটার—সেটা বলা যাবে না। বিভিন্ন দ্রব্যের গড় দামে দ্রব্যের কোন একক থাকে না। অর্থাৎ **দামস্তরে দ্রব্যের একক থাকে না।**

(৩) শুধু দ্রব্য কেন, দামস্তরে অর্থের এককও রাখা হয় না। দামস্তর একটি অনুপাত। গুরুত্বযুক্ত গড়ে

$$P = \frac{W_1P_1 + W_2P_2 + \cdots + W_nP_n}{W_1 + W_2 + \cdots + W_n}.$$

এই অনুপাতের উপরে বা লবে আছে $W_1P_1 + W_2P_2 + \cdots + W_nP_n$ এটি অর্থের এককে বা টাকায় প্রকাশিত হয়। এখন নীচে বা 'হর' অংশে যে $W_1 + W_2 + \cdots + W_n$ থাকে, তাকেও যদি অর্থের এককে বা টাকায় প্রকাশ করা হয়, তাহলে টাকায় টাকায় কেটে যাবে এবং দামস্তর হবে একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা (A pure number). অতএব **দামস্তর একটি বিশুদ্ধ সংখ্যাও হতে পারে।**

(৪) কোন একটি দেশে অসংখ্য রকমের দ্রব্য ও সেবার ক্রয়-বিক্রয় হয়। কাজেই কোন একটি সীমিত সময়ে দেশের সব দ্রব্য ও সেবার দামকে দামস্তরে ধরা যায় না। এক্ষেত্রে বাস্তব অসুবিধা আছে। সেইজন্য দামস্তর হিসেব করার সময় কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য ও সেবাকে বেছে নিয়ে তাদের দামস্তর বার করা হয়। **অতএব দামস্তর নির্বাচিত দ্রব্য ও সেবার দামের গড় হতে পারে।**

(৫) বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য ও সেবার *দামস্তর গঠন করার* সময় দ্রব্য ও সেবা নির্বাচন করতে হয়। নির্বাচনের সময় একটি সঙ্গতি রক্ষা করে চলা হয়। একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সঙ্গতির সঙ্গে কতগুলি দ্রব্য ও সেবা বেছে নেওয়া হয়। এইভাবে আমরা ধনিকশ্রেণীর মানুষদের বিলাসদ্রব্যের দামস্তর, মধ্যবিত্তদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামস্তর, শ্রমিকশ্রেণীর ভোগদ্রব্যের দামস্তর, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কাঁচা-মালের দামস্তর ইত্যাদির কথা বলতে পারি। **অতএব দামস্তর সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের ব্যবহার্য দ্রব্য ও সেবার দামের গড় হিসেব দেয়।**

(৬) দামস্তর দামের পরিবর্তন দেখায়। একটি সময়ে জিনিসপত্রের দাম কত ছিল, অন্য একটি সময়ে জিনিসপত্রের দাম আগের তুলনায় কতটা বেড়েছে বা কমেছে সেটা বোঝাবার জন্যই দামস্তর শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। কাজেই দামস্তরের মধ্যে দুটো সময় থেকে যায়। সময়কে বছর ধরা যায়। তাহলে দামস্তরের হিসেবে দুটো বছর থাকে ; একটা হল ভিত্তি বছর (Base year), অন্যটা হল চলতি বছর (Current year)। যে বছরের তুলনায় দামস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়, তাকে ভিত্তি বছর বলা হয় এবং যে বছরে দাম কতটা বাড়ল বা কমল নির্ণয় করা হয়, তাকে চলতি বছর বলা হয়। দামস্তর হল ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরের দামের হিসেব।

তাহলে আমরা বলতে পারি—**দামস্তর হল কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে গঠিত অন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের কতগুলি নির্বাচিত দ্রব্য ও সেবার দামের গুরুত্বযুক্ত গড়।**

(৭) দামস্তরে ভিত্তি বছরকে সরানো যেতে পারে। ১৯৭০ সালে জিনিস-পত্রের দাম ১৯৫০ সালের তুলনায় কত বেড়েছে বললে ১৯৫০ সালকে ভিত্তি বছর বলে বোঝান হয়। আবার যদি বলি ১৯৬০ সালের তুলনায় ১৯৭০ সালের দাম বেশ বেড়েছে, তাহলে ১৯৬০ সালকে ভিত্তি বছর ধরা হয়। এইভাবে ভিত্তি বছরকে সরানো হয়। যত দিন যায় ততই ভিত্তি বছরকে সরানো হয়। অতএব **দামস্তরের ক্ষেত্রে ভিত্তি বছর পরিবর্তনশীল হতে পারে।**

(৮) দামস্তরকে বিকল্পভাবে দামসূচক (Price Index) বলা হয়। দামসূচক ছাড়াও দেশে আয়সূচক, ব্যয়সূচক, উৎপাদনসূচক ইত্যাদি অনেক রকমের সূচক থাকতে পারে।

১০.২ কীভাবে দামস্তর বা দামসূচক গঠন করা যায় ?

দামস্তর হল কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে অন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের

কতগুলি নির্বাচিত দ্রব্য ও সেবার দামের গুরুত্বযুক্ত গড়। কাজেই দামস্তর গঠন করতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করতে হয়:

(১) প্রথমে দুটো বছর নিতে হয়। একটি হল ভিত্তি বছর (Base year) এবং অপরটি হল চলতি বছর (Current year)। যেমন, ১৯৪৮ সালের ভিত্তিতে যদি ১৯৮০ সালের দামস্তর জানতে হয়, তাহলে ১৯৪৮ সালটি হবে ভিত্তি বছর এবং ১৯৮০ সালটি হবে চলতি বছর। আবার আমরা যদি ১৯৮০ সালের দামের হিসেবে ১৯৪৮ সালের দাম জানতে চাই, তাহলে ১৯৮০ সাল হবে ভিত্তি বছর এবং ১৯৪৮ সাল হবে চলতি বছর।

(২) বছর নেবার পর দ্রব্য নির্বাচন করতে হয়। আমরা দামস্তরের দ্বারা কোন্ শ্রেণীর মানুষের সুবিধা বা অসুবিধা বোঝাতে চাই, তার উপর দ্রব্য নির্বাচন নির্ভর করবে। আমরা যদি শ্রমিকশ্রেণীর মানুষদের ভোগ্যপণ্যের দামস্তর জানতে চাই, তাহলে আমরা এমন দ্রব্য নির্বাচন করব না যেগুলো শ্রমিকেরা ভোগ করেন না বা ভোগ করতে পারেন না। যেমন, শ্রমিকদের ভোগ্যপণ্যের দামসূচক তৈরি করার সময় আমরা যদি মোটর গাড়ি, টি.ভি., ফ্রিজ—এই সব দ্রব্য নিই, তাহলে হবে না, কারণ শ্রমিকশ্রেণীর মানুষরা সাধারণত এমন ধনী হন না। তবে শ্রমিক বলতে আমরা যদি ম্যানেজার, ইঞ্জিনীয়ার প্রভৃতি কর্মীদের বোঝাই, তাহলে তাঁদের ভোগ্যদ্রব্যের তালিকায় ঐ দ্রব্যগুলি থাকতে পারে।

(৩ বছর ও দ্রব্য নির্বাচন করার পর আমাদের কাজ হল সেই সব দ্রব্যের দাম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। দাম বলতে প্রকাশিত পাইকারী দাম বোঝায়। দেশের বড় বড় ব্যবসা কেন্দ্রে বিভিন্ন দ্রব্যের পাইকারী দাম প্রকাশিত হয়। তাছাড়া সরকারের কাছেও দামের তথ্য থাকে। এখানে প্রত্যেক দ্রব্যের দুটো করে দাম থাকবে। একটা হবে ভিত্তি বছরের দাম (P_0) এবং অপরটা হবে চলতি বছরের দাম (P_n)।

(৪) দাম সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার পর আমরা চলতি বছরের দামগুলোকে ভিত্তি বছরের দামের শতকরা অনুপাতে প্রকাশ করি। একে আমরা $\frac{P_n}{P_0} \times 100$ বলতে পারি। প্রত্যেকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এটা করা হয়। আমরা অন্যভাবেও এটা করতে পারি। এর জন্য আমরা ভিত্তি বছরের সব দামকে 100 ধরতে পারি। তারপর চলতি বছরের সব দামকে তার অনুপাতে প্রকাশ করা হয়। যেমন কাপড়ের দাম ভিত্তি বছরে যদি প্রতিজোড়া 30 টাকা হয়, তবে তাকে 100 টাকা ধরা হয়। চলতি বছরে প্রতি জোড়া কাপড়ের দাম বেড়ে যদি 60 টাকা হয়, তাহলে চলতি বছরের কাপড়ের দামকে আমরা 200 টাকা বলতে পারি।

(৫) চলতি বছরের সব দাম ভিত্তি বছরের দামের শতকরা অনুপাতে প্রকাশিত হলে পর আমরা সেই অনুপাতগুলোকে যোগ করি। যোগফলকে দ্রব্য সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলেই সরল দামস্তর বা দামসূচক পাওয়া যায়।

(৬) আমরা যদি গুরুত্বযুক্ত গড় নিতে চাই, তাহলে গুরুত্ব (weight) কী হবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কোন নির্দিষ্ট দামে কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ ক্রেতারা ক্রয় করেন বা বিক্রেতারা বিক্রয় করেন, সে পরিমাণ (Quantity)-কে আমরা গুরুত্ব হিসেবে ধরতে পারি। এখানে দুটো পরিমাণ থাকতে পারে। একটা হল ভিত্তি বছরের পরিমাণ (q_0), অপরটা হল চলতি বছরের পরিমাণ (q_n), দামস্তর হিসেব করার সময় q_0 অথবা q_n-কে গুরুত্ব হিসেবে ধরা যায়। অনেকে q_0 ও q_n-এর গাণিতিক গড় অর্থাৎ (q_0+q_n) /2-কে গুরুত্ব হিসেবে ধরেন।

(৭) গুরুত্ব পাওয়ার পর ভিত্তি ও চলতি বছরের প্রত্যেকটি দামকে তার নিজস্ব গুরুত্ব দিয়ে গুণ করতে হয়। যদি q_0-কে গুরুত্ব ধরা হয় তাহলে আমরা ভিত্তি ও চলতি বছরের প্রত্যেকটি দামকে q_0 দিয়ে গুণ করব। তারপর গুণফল-গুলোকে যোগ করে আমরা যে যোগফল পাব সেই দুটো যোগফল হবে

চলতি বছরের সব দামের যোগফল $=\Sigma P_n q_0$.

এবং ভিত্তি বছরের সব দামের যোগফল $=\Sigma P_0 q_0$.

এখন দামস্তর হবে $\dfrac{\Sigma P_n q_0}{\Sigma P_0 q_0}\times 100.$

একে লাস্পীয়েরির দামসূচক (Laspeyere's Price Index) বলা হয়। লাস্পীয়েরি ভিত্তি বছরের পরিমাণকে গুরুত্ব বলে ধরে দামসূচক নির্ণয় করেছিলেন। পাশী (Paasche) নামক আর এক জন পরিসংখ্যানবিদ চলতি বছরের পরিমাণ P_n-কে গুরুত্ব হিসেবে ধরেছিলেন। পাশীর হিসেব মত

$$\text{দামসূচক}=\frac{\Sigma P_n q_n}{\Sigma P_0 q_n}.$$

লাস্পীয়েরি ও পাশী ছাড়াও অন্যান্য অনেকে বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে দামসূচক হিসেব করেছেন।

এই পদ্ধতিগুলির সাহায্য কীভাবে দামস্তর পাওয়া যায়—নীচে একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে তা দেখানো হল।

আমরা এখানে হিসেবের সুবিধার জন্য চারটি দ্রব্য (চাল, কাপড়, চিনি ও কেরোসিন) নিয়েছি। নীচের তালিকায় প্রথম স্তম্ভে এই দ্রব্যগুলি নীচে নীচে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তম্ভে দ্রব্যগুলির ভিত্তি বছরের দাম (P_0) নেওয়া হয়েছে। তৃতীয় স্তম্ভে ঐ দামগুলোকে সব 10 ধরা হয়ে, চতুর্থ স্তম্ভে চলতি বছরের দাম (P_1) ধরা হয়েছে। পঞ্চম স্তম্ভে ঐ দামগুলোকে ভিত্তি বছরের দামের শতকরা অনুপাতে প্রকাশ করা হয়েছে। তৃতীয় স্তম্ভের তলায় ভিত্তি বছরের মোট দাম ও গড় দাম এবং পঞ্চম স্তম্ভের তলায় চলতি বছরের মোট দাম ও গড় দাম হিসেবে করা হয়েছে। এখানে আমরা কোন গুরুত্ব নিইনি, কিংবা বলা

যায়, সব দ্রব্যকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরে নিয়েছি। সেইজন্য আমাদের দামস্তরটি হল একটি সরল গড়।

দ্রব্য	P_0	$P_0=100$	P_n	$\frac{P_n}{P_0}\times 100$
চাল প্রতি কিলো	2 টাকা	100	3 টাকা	150
কাপড় প্রতিজোড়া	20 "	100	40 "	200
চিনি প্রতি কিলো	3 "	100	4.5 "	150
কেরোসিন প্রতি লিটার	1 "	100	2 "	200
মোট দাম		400		700
দ্রব্যের সংখ্যা		4		4
গড়দাম বা দামস্তর		100		175

এই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, ভিত্তি বছরের দামস্তর 100 হলে চলতি বছরের দামস্তর হবে 175. অর্থাৎ ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দামস্তর অথবা সব দ্রব্যের গড় দাম 75% বেড়েছে।

১০.৩ দামসূচক গঠনের অসুবিধা বা সমস্যা :

কোন নির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে অন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বা বছরের কয়েকটি নির্বাচিত দ্রব্যের দামের গুরুত্বযুক্ত গড়কে দামস্তর বলা হয়। এই দামস্তর গঠন করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত কয়েকটি অসুবিধা দেখা দেয়।

(১) প্রথমেই ভিত্তি বছর নির্বাচনের অসুবিধার কথা বলা যায়। কোন্ বছরটিকে ভিত্তি বছর করা হবে তা নিয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে। তবে ভিত্তি বছর হিসেবে এমন বছরকে ধরা উচিত যে বছরে জিনিসপত্রের দাম মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল বা থাকে। যে বছরে দামের খুব ওঠানামা হয়, সেই বছরকে ভিত্তি বছর ধরা উচিত নয়। কারণ ভিত্তি বছরটি যদি অস্বাভাবিক বছর হয়, ভিত্তি বছরেই যদি দামের ওঠানামা হয়, তাহলে সেই ভিত্তি বছরের হিসেবে চলতি বছরের দামস্তরের যে হিসেব পাওয়া যাবে—তার সাহায্যে চলতি বছরের দামের গড় পরিবর্তন সম্বন্ধে কোন নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব হবে না। অতএব ভিত্তি বছর বলতে একটি স্বাভাবিক বছর বোঝায় এবং স্বাভাবিক বছর বলতে এমন বছর বোঝায় যে বছরে জিনিসপত্রের দাম মোটামুটি স্থির থাকে, যে বছরে কোন বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা যুদ্ধবিগ্রহের মত মানবিক বিপর্যয় ঘটে না।

(২) দামসূচক গঠনের দ্বিতীয় সমস্যা হল দ্রব্যের নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যা। ভিত্তি বছরে যে সব দ্রব্যের দাম ধরা হয়, চলতি বছরেও সেই সব দ্রব্যের দাম ধরতে হয়। কিন্তু ভিত্তি বছরের দ্রব্যগুলি চলতি বছরে সব সমান থাকবে এমন

কোন মানে নেই। ভিত্তি বছরের অনেক দ্রব্যই চলতি বছরে না থাকতে পারে। আবার ভিত্তি বছরের দ্রব্যগুলোর পরিবর্তন হতে পারে। চলতি বছরের দ্রব্যগুলোর মান ভিত্তি বছরের দ্রব্যের মানের চেয়ে অনেক উন্নত হতে পারে। কাজেই চলতি বছরের দ্রব্যগুলোকে কখনই ভিত্তি বছরের দ্রব্যগুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না। অর্থাৎ দামের সূচক গঠনের সময় দ্রব্যের গুণগত পরিবর্তন অসুবিধার সৃষ্টি করে। তাছাড়া ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দ্রব্যের দাম বাড়লে সেই দাম বৃদ্ধির কতটা দ্রব্যের গুণবৃদ্ধির ফল এবং কতটাই বা নিছক দাম বৃদ্ধি তা জানা যায় না।

(৩) দামসূচক গঠন করার সময় প্রত্যেক দ্রব্যের দুটি করে দাম নিতে হয়, একটি ভিত্তি বছরের দাম, অপরটি চলতি বছরের দাম। কিন্তু দাম বলতে খুচরো দাম বা পাইকারী দাম বোঝাতে পারে। আবার একই দেশের বিভিন্ন অংশে একই দ্রব্যের বিভিন্ন দাম থাকতে পারে। দামসূচক গঠন করার সময় এতগুলো দামের মধ্যে কোন্ দামকে ধরা হবে তা নির্ণয় করা অসুবিধাজনক। আবার একটি বছরে ৩৬৫ দিন বা ১২টি মাস থাকে।

কোন দ্রব্যের দাম বিভিন্ন দিনে বা মাসে বিভিন্ন হতে পারে। কাজেই দাম বলতে কবেকার কোন্ জায়গার কোন্ দাম বোঝাবে সেটা নির্ধারণ করা সহজ নয়।

(৪) দামস্তর গঠনের সময় প্রত্যেক দ্রব্যের দামকে তার নিজস্ব গুরুত্ব দ্বারা গুণ করা হয়। কিন্তু গুরুত্ব নির্ধারণ করাও সমস্যার সৃষ্টি করে। সাধারণত দ্রব্যের পরিমাণকে দ্রব্যের গুরুত্বের সমার্থক বলে ধরা হয়। কিন্তু এমন অনেক দ্রব্য থাকতে পারে যাদের কম পরিমাণে ব্যবহার করা হয় কিন্তু তাদের গুরুত্ব কোন মতেই কম নয়।

(৫) দামসূচক গঠনের আর একটি অসুবিধা হল তথ্যের অভাব। অনুন্নত দেশে তথ্যের অভাব খুব বেশি।

১০৪ দামস্তর বৃদ্ধির কারণ কী ?

(ক) অর্থের পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money) বা ফিশারীয় সমীকরণ ঃ

কোন দেশের দামস্তর কেন বৃদ্ধি পায় সে সম্বন্ধে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা গবেষণা করতে গিয়ে দামস্তর বৃদ্ধির জন্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিকে দায়ী করেন। তাঁদের মতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থের পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পায় দামস্তর ঠিক সেই হারে বৃদ্ধি পায়। অপর পক্ষে অর্থের পরিমাণ হ্রাস পেলে দামস্তর ঠিক সেই হারে হ্রাস পায়। কেন এমন হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের তিনটি প্রধান অনুধারণার উল্লেখ করতে পারি—(১) প্রথমত, দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, কাজেই অর্থের যোগান বৃদ্ধি বা হ্রাস করে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের কোন পরিবর্তন সাধন করা যায় না।

(২) দ্বিতীয়ত, দেশে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয় এবং শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিদ্যমান থাকে, কাজেই দেশের মোট উৎপাদন পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে স্থির থাকে।

(৩) তৃতীয়ত, অর্থ কেবলমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোন লোক অর্থকে সম্পদ বলে মনে করে না এবং অর্থ সঞ্চয় করে না।

এই তিনটি অনুধারণার ভিত্তিতে আমরা সহজেই দেখতে পারি—অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে কীভাবে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এর জন্য আমরা অধ্যাপক আরভিং ফিশারের দেওয়া একটি সমীকরণ ব্যবহার করতে পারি। এই সমীকরণটিকে ফিশারীয় সমীকরণ বলা হয়। কোন দেশের মোট অর্থের পরিমাণের সঙ্গে সেই দেশের দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তরের সম্পর্ক দেখানোর জন্য এই সমীকরণটি প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

ধরা যাক M = অর্থের যোগান,
P = দামস্তর,
V = অর্থের গড় প্রচলন বেগ (Velocity of circulation of money) এবং
T = দেশের দ্রব্যসামগ্রীর বস্তুগত পরিমাণ।

তাহলে ফিশারের মতে কোন একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে $MV = PT$ হবে। আমরা সংক্ষেপে এই সমীকরণটি ব্যাখ্যা করতে পারি।

ফিশারের মতে কোন দ্রব্যের বাজারে যেমন চাহিদা ও যোগান সমান হলেই সেই বাজারে ভারসাম্য রক্ষিত হয়, অনুরূপভাবে অর্থের বাজারেও অর্থের চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হলেই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থের চাহিদা হল দ্রব্যসামগ্রী কেনাকাটা করার জন্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের চাহিদা। কোন দেশে যদি T পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী প্রতি একক P দামে ক্রয় করতে হয়, তাহলে তার জন্য PT পরিমাণ অর্থ লাগবে। এটা হল অর্থের চাহিদা। ফিসারের সমীকরণের ডানদিকে রয়েছে অর্থের চাহিদা বা PT.

আবার, দেশে যদি একটি 100 টাকার নোট থাকে, তাহলে M = 100 টাকা হবে, সেই নোটটি যদি 10 বার হাত বদল করে তাহলে নোটের প্রচলন বেগ হবে $V = 10$. এখানে 100 টাকার নোটটি দিয়ে 10 বারে মোট 1,000 টাকার লেনদেন বা কেনাবেচা হবে। অনুরূপভাবে প্রতি একক অর্থ যদি গড়ে V বার হাত বদল করে, আহলে M পরিমাণ অর্থ থেকে মোট MV পরিমাণ অর্থের কাজ করা যাবে। এখানে MV হল অর্থের যোগান।

ধরা যাক Dm = অর্থের চাহিদা,
Sm = অর্থের যোগান, তাহলে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে আমরা পাই

$Dm = PT$ ··· (i) (অর্থের চাহিদা)

$Sm = MV$ ··· (ii) (অর্থের যোগান)

এবং $Dm = Sm$ ··· (iii) (ভারসাম্যের শর্ত)

অতএব আমরা পাই $PT = MV$ ··· (A)

কিংবা $MV = PT$ ··· (B)

(A) থেকে পাই, $P = \frac{MV}{T}$.

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে ধরা হয় যে, (ক) V স্থির থাকে,

(খ) T পূর্ণ কর্মনিয়োগস্তরে স্থির থাকে। তাহলে আমরা পাই, M বাড়লে P বাড়ে এবং M কমলে P কমে। M যে হারে বাড়ে বা কমে P ঠিক সেই হারে বাড়ে বা কমে। এটাই হল অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের এবং ফিশারের প্রধান বক্তব্য। অতএব ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে দামস্তর বৃদ্ধির কারণ হল অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি।

(খ) অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সমালোচনা ঃ

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে, কোন দেশের অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলেই সেই দেশের দামস্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্তীকালে বহু অর্থনীতিবিদ এই তত্ত্বটির সমালোচনা করেছেন। আমরা এখানে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের কয়েকটি প্রধান ত্রুটির কথা উল্লেখ করব।

১। অর্থের 'পরিমাণ তত্ত্বে বলা হয় অর্থের পরিমাণ (M) বাড়লে দামস্তর (P) বাড়বে। কিন্তু M বাড়লে কীভাবে P বাড়বে—সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি। উইকসেল ছাড়া অন্য কোন ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ এ ব্যাপারে ভেবেছেন বলে মনে হয় না।

২। উইকসেলের মতে M বাড়লে মানুষের হাতে অর্থ বেশি বেড়ে যায়, কিন্তু কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ অর্থ হাতে ধরে রাখতে চায় না। কাজেই M বাড়লে তারা বেশি অর্থ ব্যয় করে। ফলে P বেড়ে যায়। এই যুক্তিতে ধরে নেওয়া হয় যে, অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। কীন্স ও তাঁর অনুগামীরা মনে করেন অর্থ একটি সম্পদ এবং অন্য অনেক সম্পদের চেয়ে সবচেয়ে বেশি তরল সম্পদ। কাজেই বিনিময়ের মাধ্যম ছাড়াও অর্থকে আমরা মূল্যের ভাণ্ডার (Store of value) বলতে পারি। অর্থকে মূল্যের ভাণ্ডার বা সম্পদ হিসেবে দেখলে অর্থের দু'রকম চাহিদা হবে, যথা লেনদেনের উদ্দেশ্যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের চাহিদা এবং সম্পদ হিসেবে অর্থ জমিয়ে রাখার চাহিদা। অতএব অর্থ কেউ ধরে রাখে না—এটা ধরে নেওয়া ঠিক নয়। মানুষ যদি অর্থ হাতে ধরে রাখে তাহলে M বাড়লে P বাড়বে এমন নিশ্চয় করে বলা যায় না।

৩। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা V ও Tকে স্থির বলে ধরে নিয়েছিলেন। V স্থির থাকতে পারে, কিন্তু T স্থির আছে বলা যায় না। কীন্সের মতে কোন দেশে যদি পূর্ণ কর্মনিয়োগ না থাকে, যদি অপূর্ণ নিয়োগ থাকে, তাহলে অর্থের

পরিমাণ বাড়িয়ে কর্মনিয়োগ বাড়ানো যাবে এবং অর্থের পরিমাণ বাড়লে T বাড়বে। এখন M বাড়লে যদি T সমান হারে বাড়ে, তাহলে P স্থির থাকবে। M বাড়লে যদি T বেশি হারে বাড়ে, তাহলে P কমবে এবং M বাড়লে যদি T কম হারে বাড়ে, তাহলে P বাড়বে কিন্তু M যে হারে বাড়বে, P সেই হারে বাড়বে না, তার চেয়ে কম হারে বাড়বে। কাজেই M বাড়লে P সমান হারে বাড়বে এমন বলা যায় না। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সিদ্ধান্ত সত্য নাও হতে পারে। যেখানে পূর্ণ কর্মনিয়োগ নেই সেখানেই এ-কথাটি সত্য হবে।

৪। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে MV = PT নামক যে সমীকরণের সাহায্যে P নির্ধারণ করা হয়, সেটি আদৌ সমীকরণ নয়। MV হল লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত অর্থের পরিমাণ এবং PTও তাই। কাজেই MV ও PT সব সময় সমান। অর্থাৎ MV = PT একটি অভেদ মাত্র। একে MV ≡ PT বলা যাবে। MV ও PT যদি সব সময় সমান হয়, তাহলে ওদের সমতার সাহায্যে P নির্ধারণ করা যাবে না।

৫। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে অর্থের চাহিদা ও যোগান নির্ধারণের ব্যাপারে সুদের হারের কোন সম্পর্ক নেই। এটি অবাস্তব। অর্থের যোগানের মধ্যে যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সৃষ্ট ঋণ-অর্থকে ধরা হয়, তাহলে অর্থের যোগান অবশ্যই সুদের হারের সঙ্গে কমবে বা বাড়বে।

৬। ক্লাসিক্যালদের এই অর্থ তত্ত্বটি তাঁদের দ্রব্যতত্ত্বের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তাঁরা বলতেন দ্রব্য ও সেবার চাহিদা কখনই অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। তাহলে অর্থের পরিমাণ বাড়লে কীভাবে দামস্তর বাড়তে পারে—সেটা বোঝা যায় না। ক্ল্যাসিক্যালদের মতে দ্রব্যের চাহিদা বা যোগান আর্থিক দামের উপর নির্ভর করে না, ওরা নির্ভর করে আপেক্ষিক দাম বা বাস্তব দামের উপর। বাজারে যদি n সংখ্যক দ্রব্য থাকে তাহলে P_1, P_2,…P_n নামক n-সংখ্যক আর্থিক দাম (Money price) থাকবে। কিন্তু n-তম দ্রব্যের হিসেবে

$$\frac{P_1}{P_n}, \frac{P_2}{P_n}, \ldots \frac{P_{n-1}}{P_n} \quad \left(\frac{P_n}{P_n} = 1 \right)$$

নামক n − 1 সংখ্যক আপেক্ষিক দাম (Relative Price) থাকবে।

এখন সব আর্থিক দাম যদি একই হারে বাড়ে বা কমে, তাহলে আপেক্ষিক দামগুলি একই থাকবে। সেক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের কোন পরিবর্তন হবে না। দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের কোন পরিবর্তন না হলে অর্থের যোগান ও অর্থের চাহিদারও কোন পরিবর্তন হবে না। (কারণ অর্থের চাহিদা হল দ্রব্যের যোগান এবং অর্থের যোগান হল দ্রব্যের চাহিদা)—এই অবস্থায় দামস্তরেরও কোন পরিবর্তন হবে না। অতএব অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব অন্যান্য ক্লাসিক্যাল তত্ত্বের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অর্থের পরিমাণ বাড়লে কীভাবে দামস্তর বৃদ্ধি পেতে পারে তার

কোন পরিষ্কার ব্যাখ্যা এতে নেই। এখানে দাম নির্ধারণের ব্যাপারটিকে অত্যন্ত সরল করে দেখানো হয়েছে।

(ক) কেমব্রিজ সমীকরণ (Cambridge Equation) :

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদরা, বিশেষত অধ্যাপক মার্শাল, পিগু, রবার্টসন প্রভৃতিরা পৃথক সমীকরণের সাহায্যে অর্থের পরিমাণতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেন। এই সমীকরণটিকে $M=kPT$ নামক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। এখানে $M=$ মোট অর্থের পরিমাণ, $P=$ দামস্তর, $T=$ কোন একটি দ্রব্যের হিসেবে মোট লেনদেনের বাস্তব পরিমাণ এবং $k=$ একটি ধ্রুবক। অর্থের পরিমাণ-তত্ত্বের প্রচলিত ফিশারীয় সমীকরণটি হল $MV=PT$. এখানে $M=$ অর্থের পরিমাণ, $V=$ অর্থের গড় প্রচলন বেগ, $P=$ দামস্তর এবং $T=$ মোট বাস্তব লেনদেন।

তাহলে আমরা পাই—

$MV = PT$ হল ফিশারীয় সমীকরণ,

এবং, $M = kPT$ হল কেমব্রিজ সমীকরণ।

আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি সমীকরণের মধ্যে একটি পার্থক্য ধরা পড়ে। ফিশারের সমীকরণে V আছে সমীকরণের বাম দিকে, কিন্তু কেমব্রিজ সমীকরণে V নেই, তার জায়গায় আছে k এবং k আছে সমীকরণের ডান দিকে। অন্য কোন পার্থক্য চোখে পড়ে না। কিন্তু এই দুটি সমীকরণের মধ্যে আরো কয়েকটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। তার আগে আমরা এই দুটি সমীকরণের মিল লক্ষ্য করতে পারি।

ফিশারীয় সমীকরণ থেকে আমরা পাই—

$P=\frac{MV}{T}=M\left(\frac{V}{T}\right)$ ফিশারের মতে V ও T হল ধ্রুবক। কাজেই P কেবলমাত্র M-এর উপর নির্ভর করবে। M বাড়লে P সেই হারে বাড়বে ; M কমলে P সেই হারে কমবে।

কেমব্রিজ সমীকরণ থেকে পাই—

$P=\frac{M}{kT}$. এখানেও k ও Tকে ধ্রুবক বলে ধরা হয়। কাজেই P কেবলমাত্র M-এর উপর নির্ভর করে। M বাড়লে বা কমলে P ঠিক সেই হারে বাড়বে বা কমবে।

অতএব আমরা বলতে পারি যে, ফিশারের সমীকরণ এবং কেমব্রিজ সমীকরণের বক্তব্যের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। উভয় সমীকরণই দামস্তর বৃদ্ধিকে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির পরিণাম বলতে চায়। দামস্তর বৃদ্ধির সমস্যা হল মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এখন দেখা যাক—কেমব্রিজ সমীকরণে কীভাবে এই ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করা যায়।

এখানে আমরা কেমব্রিজের প্রধান অর্থনীতিবিদ মার্শালের ভাষায় ব্যাপারটি বোঝাতে পারি।

অধ্যাপক মার্শালের মতে কোন দ্রব্যের দাম (বা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত বিনিময় হার) সেই দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমরা জানি অর্থের দাম হয় না, অর্থের মূল্য হয়। দ্রব্যের দাম যদি P হয়, তাহলে অর্থের মূল্য হবে $\frac{1}{P}$. কারণ—

P পরিমাণ অর্থের দ্বারা কোন দ্রব্যের 1 একক পাওয়া যায়,

অতএব 1 একক " " " " " $\frac{1}{P}$ " " "

এখানে $\frac{1}{P}$ হল অর্থের মূল্য বা অর্থের ক্রয়ক্ষমতা। আমরা বলতে পারি— P বাড়লে $\frac{1}{P}$ কমে ; P কমলে $\frac{1}{P}$ বাড়ে। অর্থাৎ দামস্তর বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে অর্থের মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়। মার্শালের মতে অর্থের মূল্য $\left(\frac{1}{P}\right)$ অর্থের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

অর্থের চাহিদা : মার্শালের মতে অর্থের চাহিদা বলতে বোঝায় অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা নয়, অর্থ হাতে নগদ অবস্থায় ধরে রাখার ইচ্ছা। অর্থ খরচ করলে অর্থের প্রচলন বেগ বাড়ে, কাজেই অর্থ হাতে ধরে রাখার চাহিদা কমে যায়। অপর পক্ষে, অর্থের প্রচলন বেগ যখন কমে, তখন অর্থ নগদ অবস্থায় বেশিক্ষণ ধরা থাকে। রবার্টসন সুন্দর উপমা দিয়ে এই ব্যাপারটি বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে খরচ করা অর্থ হল উড়ন্ত পাখির মত, কিন্তু হাতে যে টাকা ধরে রাখা হয় সেটা হল বসে থাকা পাখির মত। পাখি বেশি ওড়ে বললে বোঝায় পাখি কম বসে থাকে। পাখি বেশি বসে থাকে বললে বোঝায় পাখি কম ওড়ে। ফিশারের সমীকরণে অর্থের যে প্রচলন বেগ (V) আছে তার দ্বারা বোঝায় যে, এই সমীকরণে অর্থকে উড়ন্ত অর্থ হিসেবে দেখা হয়েছে, কিন্তু কেমব্রিজ সমীকরণে যে k আছে তার দ্বারা অর্থকে বসে থাকা অবস্থায় দেখা হয়েছে। V ও k-এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। প্রথমত, আমরা বলতে পারি V ও k পরস্পরের বিপরীত। অর্থাৎ $V=\frac{1}{k}$, কিংবা, $k=\frac{1}{V}$. দ্বিতীয়ত, V হল একটি প্রবাহ (flow) এবং গতিশীল বিষয়, কিন্তু k হল একটি গতিহীন বিষয়। তৃতীয়ত, V একটি নির্দিষ্ট সময় সীমায় (during a period of time) ঘটে থাকে ; কিন্তু k একটি ক্ষণমাত্র সময়ে (at a point of time) ঘটে থাকে।

যাহোক, ফিশারের সমীকরণ থেকে পাই—
$MV = PT.$

অর্থাৎ $M = \frac{1}{V} \cdot PT.$ কিন্তু $\frac{1}{V} = k.$

অতএব $M = kPT$. এখানে kPT হল অর্থের চাহিদা। মার্শালের মতে, P দামে T পরিমাণ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য PT পরিমাণ অর্থ লাগবে। ধরা যাক PT হল 10,000 টাকা। ধরা যাক দেশে 1000 টাকার মুদ্রা আছে। তার সাহায্যে 10,000 টাকার কেনা-বেচা হয়। তাহলে বোঝা যায় যে, $V = 10$, অর্থাৎ প্রত্যেকটি মুদ্রা গড়ে 10 বার হাত বদল করে। $V = 10$ হলে, $k = \frac{1}{V} = \frac{1}{10}$ হবে: মার্শালের ভাষায়—10,000 টাকার ক্রয়-বিক্রয় হলে, এবং $k = \frac{1}{10}$ হলে বুঝতে হবে দেশবাসীরা $\frac{1}{10} \times 10{,}000 = 1{,}000$ টাকা হাতে ধরে রাখবে। এটাই হল অর্থের মোট চাহিদা।

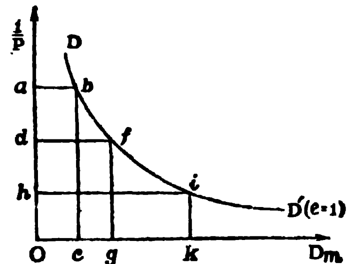
মার্শালের মতে, T হল দেশের মোট উৎপাদন। পূর্ণ কর্মনিয়োগস্তরে T হবে সর্বাধিক। T বাড়বে না, কমবেও না। কাজেই T হল একটি ধ্রুবক।

এখন k ও T ধ্রুবক হওয়ায় kT একটি ধ্রুবক হবে।

ধরা যাক, অর্থের চাহিদা (Demand for money) = Dm. তাহলে আমরা পাই $Dm = kPT$.

অর্থাৎ $\left(\frac{1}{P}\right) Dm = kT$. (উভয় পক্ষকে P দিয়ে ভাগ করে)

এখানে $\frac{1}{P}$ হল অর্থের মূল্য।



১১.১ রেখাচিত্র : কেমব্রিজ সমীকরণে অর্থের চাহিদা রেখা

আমরা পাই—কেমব্রিজ সমীকরণে অর্থের মূল্য ও অর্থের চাহিদার গুণফল একটি ধ্রুবক। রেখাচিত্রের উল্লম্ব অক্ষে $\frac{1}{P}$ এবং অনুভূমিক অক্ষে Dm পরিমাপ করলে আমরা পাশের রেখাচিত্রে অঙ্কিত DD' রেখার মত একটি রেখার সাহায্যে অর্থের চাহিদা প্রকাশ করতে পারি। এই চাহিদা রেখাটি নিম্নমুখী, মূলবিন্দুর দিকে উত্তল এবং এর নীচে Oabc, Odfg, Ohjk নামক যতগুলি আয়তক্ষেত্র আঁকা হোক না কেন তাদের প্রত্যেকটির ক্ষেত্রফল হবে kT নামক ধ্রুবকের সমান। কাজেই DD' রেখাকে আমরা

আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত বলতে পারি। অতএব **কেমব্রিজ সমীকরণ থেকে অর্থের যে চাহিদা রেখা পাওয়া যায় সেই রেখাটি একটি আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত হয় এবং সেক্ষেত্রে অর্থের চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা এক হয়।***

কেমব্রিজ সমীকরণে অর্থের যে চাহিদার কথা বলা হয়েছে তাতে k-এর গুরুত্ব খুব বেশি। k-এর মান একের চেয়ে কম এবং শূন্যের চেয়ে বেশি হয় (অর্থাৎ $0<k<1$)। কিন্তু k-এর মান কত হবে সেটা নির্ভর করছে প্রধানত অর্থের আয়-ব্যয়-সংক্রান্ত সাময়িক পার্থক্যের উপর। যেমন, দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি

***প্রমাণ :** অর্থের চাহিদা $= Dm$

অর্থের মূল্য $= \frac{1}{P}$.

ধরা যাক $e =$ অর্থের চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা।

$\therefore$ $e = \dfrac{\text{অর্থের চাহিদার পরিবর্তনের হার}}{\text{অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের হার}}$

এখানে অর্থের চাহিদার পরিবর্তনের হার $= \dfrac{\text{অর্থের চাহিদার পরিবর্তন}}{\text{মূল চাহিদা}}$

$= \dfrac{\Delta Dm}{D}$ (এখানে $\Delta =$ পরিবর্তন)

অনুরূপভাবে অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের হার $= \Delta\left(\frac{1}{P}\right)\Big/\frac{1}{P}$.

এখানে $\Delta\left(\frac{1}{P}\right) = -\frac{\Delta P}{P^2}$. অতএব $\Delta\left(\frac{1}{P}\right)\Big/\frac{1}{P} = -\frac{\Delta P}{P^2} \div \frac{1}{P}$

$$= -\frac{\Delta P}{P^2} \times \frac{P}{1} = -\frac{\Delta P}{P} \quad \dots \quad \dots \quad (A)$$

$\therefore$ $e = -\dfrac{\Delta Dm}{D}\Big/\dfrac{\Delta P}{P}$. কেমব্রিজ সমীকরণে

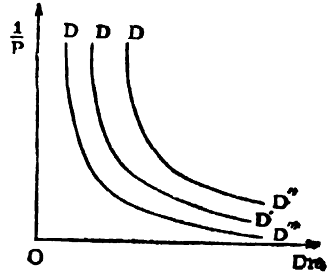
$$Dm = (kT)P \qquad \therefore \quad \Delta Dm = (kT)\Delta P.$$

$$\therefore \quad \frac{\Delta Dm}{D} = \frac{(kT).\Delta P}{(kT)P} = \frac{\Delta P}{P} \quad \dots \quad \dots \quad (B)$$

$\therefore$ (B কে (A) দিয়ে ভাগ করে পাই,

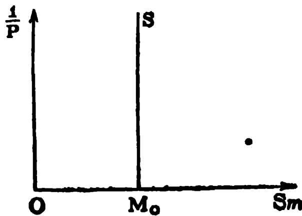
$$e = -\frac{\Delta P}{P}\Big/\frac{\Delta P}{P} = -1.$$

যদি প্রতি সপ্তাহে সব পাওনা (মজুরী, সুদ ইত্যাদি) মিটিয়ে দেয় এবং পরিবারগুলি যদি এক সপ্তাহের মধ্যে সেই আয় খরচ করে তাহলে এক বছরে বাহান্নটি সপ্তাহ থাকায় $k=\frac{1}{52}$ হবে। আবার সব প্রতিষ্ঠান যদি প্রত্যহ সব পাওনা মিটিয়ে দেয় এবং পরিবারগুলি যদি প্রত্যহ সেই অর্থ খরচ করে দেয় তাহলে $k=\frac{1}{365}$ হবে। এখান থেকেও বোঝা যায় অর্থ লেন-দেনের সময় যত কম হয়, ততই অর্থের প্রচলন বেগ (V) বাড়ে, এবং $k=\frac{1}{V}$ ততই কম হয়। কিন্তু একটি দেশে সব প্রতিষ্ঠানে একই সময়-ব্যবধানে পাওনা মেটানো হয় না এবং সব পরিবার সমান হারে ব্যয় করে না, কাজেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পরিবারের অর্থের চাহিদা (k) বিভিন্ন মানের হবে। অর্থাৎ একটি দেশে k-এর বহু মান থাকবে। তাদের একটি গড় হল কেমব্রিজ সমীকরণের k. অর্থের প্রচলন বেগ (V) স্থির থাকলে k স্থির থাকবে এবং DD' রেখার অবস্থান স্থির থাকবে। কিন্তু V বৃদ্ধি পেলে k হ্রাস পাবে, কাজেই kT হ্রাস পাবে (যেহেতু T স্থির)। অতএব, k হ্রাস পেলে DD' রেখাটি বামদিকে ও নীচের দিকে সরে আসবে। বিপরীত পক্ষে, V হ্রাস পেলে অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং DD' রেখা উপরের দিকে ও ডান দিকে সরে আসবে।



১১.২ রেখাচিত্র : অর্থের চাহিদার পরিবর্তন

আমাদের ১০.২ নং রেখাচিত্রে অর্থের চাহিদা রেখার অবস্থানের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। এখানে DD' হল প্রথম চাহিদা রেখা। DD'' হল দ্বিতীয় চাহিদা রেখা যেখানে k বেড়েছে। DD'' রেখাটি DD' রেখার উপরে আছে। কিন্তু DD''' রেখাটি DD' রেখার নীচে আছে। এখানে k কমেছে।



১১.৩ রেখাচিত্র : অর্থের যোগানরেখা

অর্থের যোগান : অর্থের পরিমাণতত্ত্বে অর্থের যোগানকে একটি বহির্ভূত (Exogenecus) বিষয় বলে ধরা হয়। কেমব্রিজের সমীকরণে ধরা হয়েছিল যে, অর্থের যোগান আর্থিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্থিরীকৃত স্তরে নির্দিষ্ট থাকে। ধরা যাক S_m= অর্থের যোগান, তাহলে কেমব্রিজ সমীকরণ মতে S_m=Mo. এখানে Mo হল একটি স্থির পরিমাণ। রেখাচিত্রের ভাষায় বলা যায় S_m=Mo সমীকরণকে আমরা প্রদত্ত

রেখাচিত্রের SMo রেখার মত একটি উল্লম্ব রেখার দ্বারা প্রকাশ করতে পারি। অর্থের যোগান বৃদ্ধি বা হ্রাস পেলে এই রেখাটি সমান্তরালভাবে যথাক্রমে ডানদিকে কিংবা বামদিকে সরে আসবে।

অর্থের মূল্য নির্ধারণ :

কেমব্রিজ অর্থনীতিবিদদের বক্তব্য হল যে, অর্থের মূল্য $\left(\frac{1}{P}\right)$ অর্থের চাহিদা $(D)_m$ এবং অর্থের যোগান (S_m) দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেখানে S_m ও D_m রেখা পরস্পরকে ছেদ করে সেই ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য অর্থমূল্যস্তর $\left(\frac{1}{P}\right)_0$ নির্ধারিত হবে। এখানে আমরা তিনটি সম্পর্ক পাই,

$D_m = k_0PT_0 \cdots\cdots(1)$ (অর্থের চাহিদা)

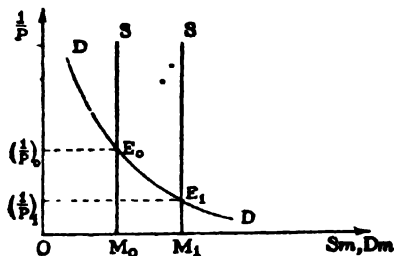
$S_m = M_0 \cdots\cdots(2)$ (অর্থের যোগান)

$D_m = S_m \cdots\cdots(3)$ (ভারসাম্যের শর্ত)

অতএব, $M_0 = k_0PT_0$.

অতএব, $P_0 = \frac{M_0}{k_0T_0}$. অর্থাৎ $\left(\frac{1}{P}\right)_0 = \frac{k_0T_0}{M_0}$.

আমাদের রেখাচিত্রে Eo বিন্দুতে S_m ও D_m রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে এবং ছেদবিন্দুতে $D_m = S_m$ হয়েছে।



১১.৪ রেখাচিত্র : কেমব্রিজ সমীকরণ অর্থের মূল্য $\left(\frac{1}{P}\right)$ নির্ধারণ

এখানে $\frac{1}{P} = \left(\frac{1}{P}\right)_0$.

এটাই হল ভারসাম্য স্তরে অর্থের মূল্য।

এবার যদি ধরা হয় যে, অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেল, তাহলে অর্থের যোগান রেখাটি ডানদিকে সরে গিয়ে হবে SM_1 রেখা। এখন ভারসাম্য বিন্দু হবে E_1. এবং অর্থের মূল্য হবে $\left(\frac{1}{P}\right)_1$. দেখা যাচ্ছে যে,

$\left(\frac{1}{P}\right)_1 > \left(\frac{1}{P}\right)_0$. অতএব $P_1 > P_0$. অর্থাৎ অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কমে, অথবা, দামস্তর বৃদ্ধি পায়।

(খ) কেমব্রিজ সমীকরণের উপর মন্তব্য :

(১) কেমব্রিজ সমীকরণ ফিশারীয় সমীকরণ থেকে উন্নত। এখানে অর্থের চাহিদাকে যে দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে তা হল সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী। মার্শালের মতে অর্থের চাহিদা দেশের আর্থিক আয়স্তর ও সম্পদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আয় ও সম্পদ যত বৃদ্ধি পায় ততই অর্থের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে কীন্‌স্‌ অর্থের চাহিদা নামক বিষয়টির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। কীন্‌সের মতে অর্থের চাহিদা দুরকমের—(ক) একটি চাহিদা হল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থের চাহিদা এবং (খ) দ্বিতীয়টি হল সম্পদ হিসেবে অর্থের চাহিদা। কীন্‌সের ভাষায় প্রথম চাহিদাটি হল $L_1=kPY$ এবং দ্বিতীয়টি হল $L_2=L\ (r)$। কীন্‌সের তত্ত্বে $L_1=kPY$ নামক সমীকরণটি হল কেমব্রিজের সমীকরণ। আমরা বলতে পারি, কেমব্রিজ সমীকরণটি পরবর্তীকালের অর্থ-তত্ত্বের আলোচনার ভিত্তি নির্মাণ করেছে এবং এব্যাপারে পরবর্তীকালের উন্নয়নের সূচনা সৃষ্টি করেছে।

(২) কিন্তু কেমব্রিজ সমীকরণে অর্থের চাহিদার উপর নতুন আলোকপাত করা হলেও এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বক্তব্যের সঙ্গে মিশে গেছে। এর ফলে ক্লাসিক্যাল অর্থতত্ত্বের সব কয়টি ভুল এই তত্ত্বকেও আশ্রয় করেছে। অর্থের বাজারের সঙ্গে দ্রব্যের বাজারের কোন যোগ নেই, কাজেই অর্থের বাজারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের বাজারের ভারসাম্য বিচ্যুত হবে না—এই অনুধারণাই হল ক্লাসিক্যাল অর্থতত্ত্বের অযৌক্তিক অংশ। কেমব্রিজের সমীকরণ এই অযৌক্তিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে, দ্রব্যসামগ্রীর বাস্তব চাহিদা ও যোগান অপরিবর্তিত থাকে এটাই হল এই তত্ত্বের প্রধান স্তম্ভ। কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর যোগান ও চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে অর্থের চাহিদা ও যোগানও অপরিবর্তিত থাকে, কারণ দ্রব্যের যোগান হল অর্থের চাহিদা এবং দ্রব্যের চাহিদা হল অর্থের যোগান। এই অবস্থায় অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে কীভাবে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায় তার কোন ব্যাখ্যা কেমব্রিজ সমীকরণে নেই, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের অন্য ব্যাখ্যাতেও নেই।

(৩) কীন্‌স অর্থের চাহিদাকে অংশত আয়ের উপর এবং অংশত সুদের হারের উপর নির্ভরশীল করেছেন। কেমব্রিজ সমীকরণে অর্থের চাহিদার সঙ্গে সুদের হারের কোন সম্পর্ক স্থাপন করা হয়নি। অর্থাৎ কেমব্রিজের সমীকরণে অর্থকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ছাড়া অন্য কোনভাবে দেখা হয়নি। অর্থ যে সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে সেকথা অন্যান্য ক্লাসিক্যাল অর্থতত্ত্বের মত কেমব্রিজ সমীকরণেও অস্বীকার করা হয়েছে।

(৪) কেমব্রিজ সমীকরণে অর্থের যে চাহিদার কথা বলা হয়েছে সেটা হল ভাণ্ডারবাচক ধারণা (Stock Concept), কিন্তু অর্থের যোগান হল প্রবাহ-

বাচক ধারণা (Flow Concept)। ভাণ্ডার ও প্রবাহের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষার ক্ষেত্রে কিছু ন্যায়গত (Logical) অসুবিধা দেখা দেয়। কেমব্রিজ সমীকরণ সেই অসুবিধার উপর আলোকপাত করে না। এই সমীকরণের প্রবক্তারা এব্যাপারে তাঁদের যথেষ্ট সচেতনতা প্রকাশ করেননি।

১০.৬ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে কী হয় ?

অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে অর্থ-ব্যবস্থার উপর কী প্রভাব পড়ে সেটি দুভাবে আলোচনা করা যায়। (ক) প্রথমে ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব মতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রভাব এবং পরে (খ) কীন্সীয় তত্ত্ব মতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে।

(ক) ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব মতে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু অর্থব্যবস্থার বাস্তব বিষয়গুলি যেমন, আয়স্তর, উৎপাদন ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, সুদের হার প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকবে। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রভাব কেবল মাত্র অর্থের বাজারেই সীমাবদ্ধ থাকবে। দ্রব্য ও সেবার বাজার, যাকে বাস্তব বাজার (Real market) বলা হয়, তার উপর অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির কোন প্রভাব পড়বে না।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে গোটা অর্থ-ব্যবস্থাকে দুটো বাজারে ভাগ করা হয়। একটি হল দ্রব্যের বাজার ও উপাদানের বাজার নিয়ে গঠিত বাস্তব বাজার, অপরটি হল অর্থের বাজার। দ্রব্যের বাজারে থাকে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান, উপাদানের বাজারে থাকে শ্রম ও মূলধনের চাহিদা ও যোগান। অর্থের বাজারে থাকে অর্থের চাহিদা ও যোগান। প্রত্যেকটি বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দাম নির্ধারিত হয়, সেই নির্ধারিত দামে চাহিদা ও যোগান কত হবে তাও জানা যায়। দ্রব্যের বাজারের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয় দ্রব্যের বাস্তব দাম (Real Price) বা আপেক্ষিক দাম (Relative Price)। বাস্তব বাজারে যদি n-সংখ্যক দ্রব্য ও সেবা থেকে যাদের আর্থিক দাম (Money Price) হবে P_1, P_2,…P_n, তাহলে n-তম দ্রব্যের হিসেবে তাদের আপেক্ষিক দাম হবে $\frac{P_1}{P_n}$, $\frac{P_2}{P_n}$, $1 \ldots \frac{P_n - 1}{P_n}$, $\frac{P_n}{P_n} = 1$. এখানে আপেক্ষিক দামের সংখ্যা $n-1$. যে দ্রব্যটিকে বিনিময়ের মাধ্যম বা অর্থ বলে ধরা হয়েছে তাকে বাস্তব বাজার থেকে বাদ দিলে বাস্তব বাজারে থাকবে $n-1$টি দ্রব্য ও সেবা। তাদের ($n-1$) সংখ্যক চাহিদা ও যোগান রেখার সাহায্যে ($n-1$) সংখ্যক আপেক্ষিক দাম নির্ধারিত হবে।

ক্লাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে বাস্তব বাজারে কোন দ্রব্য বা সেবার চাহিদা বা যোগান অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করবে না। কাজেই অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা ও যোগান অপরিবর্তিত থাকবে,

ফলে দ্রব্য ও সেবার আপেক্ষিক দামসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে। সেই আপেক্ষিক দামে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সমান হবে। অর্থের পরিমাণ বাড়লে আয়, উৎপাদন, কর্মসংস্থান (শ্রমের যোগান ও চাহিদা), সুদের হার ইত্যাদি অপরিবর্তিত থাকবে।

অপরদিকে, ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব অনুসারে অর্থের বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হবে অর্থের মূল্য $\left(\frac{1}{P}\right)$. অর্থের যোগান বাড়লে এবং চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলে অর্থের মূল্য $\left(\frac{1}{P}\right)$ কমবে। অর্থাৎ দামস্তর (P) বাড়বে। এইভাবে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে দেখানো হয় অর্থের পরিমাণ বাড়লে দেশের আয় ও উৎপাদন, কর্মসংস্থান, ভোগ, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, সুদের হার ইত্যাদি বাস্তব বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু দামস্তর বৃদ্ধি পায়।

(খ) কীনসের তত্ত্ব অনুসারে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে এমন কথা বলা যায় না। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা ধরে নিয়েছিলেন যে, দেশে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বর্তমান থাকে। এই অবস্থায় দেশে দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন সর্বাধিক স্তরে স্থির থাকবে। অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য ও সেবার যোগান বাড়বে না, কিন্তু দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার জন্য সকলেই বেশি অর্থ ব্যয় করতে চাইবে। এর ফলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে।

কীনসের মতে দেশে পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থা বর্তমান থাকে এটা ঠিক নয়। তাঁর মতে দেশে অপূর্ণ নিয়োগ থাকে। ফলে দ্রব্য ও সেবার মোট যোগান বৃদ্ধি করার অবকাশ থাকে। বিনিয়োগকারীরা হয়তো অর্থের অভাবেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে পারেন না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দিতে গেলে বেশি সুদ চায়। বেশি সুদ দিয়ে বিনিয়োগ বাড়ানো লাভজনক হবে না—এই ভেবে বিনিয়োগকারীরা কম বিনিয়োগ করেন। ফলে দ্রব্যের উৎপাদন কম হয়, আয় কম হয়, কর্মনিয়োগ পূর্ণনিয়োগ স্তরের নীচে থেমে থাকে।

এই অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। কীনসের মতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে জনগণের হাতে অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। তাঁরা বেশি পরিমাণে টাকা ধার দিতে রাজী হন। ফলে সুদের হার কমে যায়। অর্থাৎ কীনসের মতে অর্থের পরিমাণ বাড়লে প্রথমেই সুদের হার কমে যায়। এটা হল অর্থের বাজারে পরিবর্তন। একে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রভাব বলা যেতে পারে।

এই প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে কয়েকটি পরোক্ষ প্রভাবের সৃষ্টি হয়। প্রথমত, সুদের হার কমলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, আয় বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, চতুর্থত, দ্রব্যের চাহিদার বৃদ্ধি ঘটলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পঞ্চমত, তার

ফলে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে চলতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত নিয়োগ বাড়ানোর অবকাশ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ চলে। অবশেষে সব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও সব শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ হয়ে গেলে আর উৎপাদন বাড়ে না, আয় বাড়ে না, নিয়োগ বাড়ে না। এই অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত উপাদানগুলির পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায় এবং ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের কথা সত্য হয়। সেইজন্য বলা হয় অর্থের পরিমাপ তত্ত্বটি পরিণামে কার্যকরী হতে বাধ্য।

প্রশ্নাবলী

১। দামস্তর বলতে কী বোঝায়? দামস্তরের বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা কর।

২। দামস্তর কাকে বলে? কীভাবে কোন দেশের দামস্তর নির্ধারণ করা যায়?

৩। দামসূচক কী? দামসূচক গঠনের ক্ষেত্রে কী কী অসুবিধা দেখা দেয়?

৪। দামস্তর কাকে বলে? কোন দেশের দামস্তরে কেন ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়?

৫। অর্থের পরিমাণতত্ত্বটির পর্যালোচনা কর।

৬। তুমি কি মনে কর যে—অর্থের পরিমাণ বাড়লেই দাম বাড়ে? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৭। অর্থের পরিমাণ ও দামস্তরের সম্পর্কটি বিচার কর।

৮। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে কী হয়?

৯। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) টীকা লেখ : (১) গুরুত্বযুক্ত গড় দাম, (২) দামস্তর, (৩) ভিত্তি বছর ও চলতি বছর, (৪) লাসপীয়েরের দামসূচক, (৫) অর্থের পরিমাণতত্ত্ব, (৬) আর্থিক দাম ও বাস্তব দাম।

(খ) আলোচনা কর : (১) অর্থের পরিমাণতত্ত্বটি আদৌ একটি তত্ত্ব নয়, এটি একটি অভেদ মাত্র। (২) অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে কি না সেটা নিয়োগের অবস্থার উপর নির্ভর করছে।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)

ভূমিকা : ইংরেজী Inflation শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। কিন্তু Inflation শব্দের অর্থ হল শুধু স্ফীতি বা বৃদ্ধি। কাজেই মুদ্রাস্ফীতি শব্দের 'মুদ্রা' শব্দটি অবশ্যই অতিরিক্ত। মুদ্রাস্ফীতি বলতে আক্ষরিক অর্থে মুদ্রা বা অর্থের যোগান বৃদ্ধি বোঝায়। আগেকার দিনের ধারণা ছিল যে, অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলেই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দাম বৃদ্ধি পেতে পারে, কিন্তু তা থেকে আমরা কখনই অর্থের যোগান বৃদ্ধিকে দাম বৃদ্ধির কারণ বলে মেনে নিতে পারি না। কাক বসলে যদি তাল পড়ে, তাহলে কাকের বসাকে তাল পড়ার কারণ হিসেবে দেখলে ভুল হতে পারে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ও দামবৃদ্ধি সমার্থক নয়। তবু প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এখানে দামবৃদ্ধি বোঝাতে মুদ্রাস্ফীতি শব্দটির প্রয়োগ করা হবে।

১১১ (ক) **মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে ?**

অধিকাংশ জিনিসপত্রের দাম যখন খুব বেড়ে যায় তখন দামস্তর বৃদ্ধি পায়। দামস্তরের এই উচ্চাবস্থাকে সাধারণ ভাষায় মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি বলতে দামস্তরের উচ্চাবস্থাকে বোঝায় না। আসলে **মুদ্রাস্ফীতি একটি অবস্থা নয়, মুদ্রাস্ফীতি হল একটি প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দামস্তর ক্রমাগত বেড়ে চলে** (Inflation is not a *situation* of high prices ; it is a *process* of rising prices)। মুদ্রাস্ফীতিকে একটি প্রক্রিয়া বলা হয়, কারণ এখানে দামস্তর একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির হয়ে থাকে না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দামস্তর ক্রমাগত বেড়ে যায়। দামস্তর যদি একটি নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে, তাহলে তাকে গতিহীন অবস্থা বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় দামস্তর এমন কোন গতিহীন অবস্থার মধ্যে থাকে না। মুদ্রাস্ফীতি হল একটি গতিশীল ব্যাপার। দামস্তর কখনই স্থির নয়, সর্বদাই উঠে যাচ্ছে এবং গোটা অর্থব্যবস্থায় এমন একটি ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়েছে যাতে দামস্তর কোন নির্দিষ্ট স্তরে স্থির না থেকে ক্রমাগত বাড়ছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হল একটি গতিশীল ও প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন ভারসাম্যহীন প্রক্রিয়া।

(খ) **মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ**

মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতি, গতি অথবা কারণ অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক ভাগে দুরকমের মুদ্রাস্ফীতিকে রাখা যায়। আমরা এখানে কয়েকপ্রকার মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখ করতে পারি :

১। (ক) পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি (Full Inflation) ও (খ) অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি (Semi-Inflation)। দেশে পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থা বর্তমান থাকলে দ্রব্য ও সেবার যোগান সর্বাধিক ও স্থির থাকে। সেই অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অপরপক্ষে, দেশে অপূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থায় কোন কোন সম্পদের অপ্রাচুর্য বা যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার জন্য যে স্বল্পকালীন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

২। (ক) মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি (Open Inflation) ও (খ) দমিত মুদ্রাস্ফীতি (Suppressed Inflation)। দামস্তর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সরকার যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন, দ্রব্যসামগ্রীর দাম যদি ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে, তবে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অপরপক্ষে মুদ্রাস্ফীতির গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে সরকার যদি দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার উপর নানারকম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন কিংবা রেশন-ব্যবস্থা, দাম নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা চালু করেন তবে সেই অবস্থায় যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে তাকে দমিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

৩। (ক) মৃদু মুদ্রাস্ফীতি (Mild Inflation) ও (খ) দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি (Hyper Inflation)। দামবৃদ্ধির হার যখন কম থাকে তখন তাকে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অপরপক্ষে দাম বৃদ্ধির হার যখন অত্যধিক বেশি হয়ে পড়ে, তখন সেই মুদ্রাস্ফীতিকে দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অবশ্য শতকরা কত হারে দাম বাড়লে তাকে মৃদু বা দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। দাম বৃদ্ধির হার যদি দশ শতাংশ হয় তাকে আমরা মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলতে পারি। দাম বৃদ্ধির হার দশ শতাংশের চেয়ে বেশি হলে তাকে দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি বলা যায়।

৪। (ক) চাহিদা মুদ্রাস্ফীতি (Demand Inflation) ও (খ) ব্যয়-মুদ্রাস্ফীতি (Cost-Inflation)। দেশে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেলে এবং যোগান স্থির থাকলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে চাহিদা বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি বা, সংক্ষেপে চাহিদা-মুদ্রাস্ফীতি বলে। অপরপক্ষে উৎপাদনের উপাদানগুলির মজুরী বৃদ্ধি পেলে এবং তাদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা স্থির থাকলে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে যে দাম বৃদ্ধি পায় তাকে ব্যয় বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি বা, সংক্ষেপে ব্যয়-মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

১১.২ মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব কীভাবে হয়?

দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকলে তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতি হল একটি ভারসাম্যহীন প্রতিক্রিয়াসম্পন্ন গতিশীল প্রক্রিয়া যার মধ্যে দামস্তর ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে যেতে থাকে। অর্থাৎ দামস্তর আগে একটি নিম্নস্তরে থাকে, সেখান থেকে যে-কোন কারণে হোক এর ঊর্ধ্ব গমন শুরু হয়, এবং একবার শুরু হলে নিজস্ব নিয়মে এটি চলতে থাকে। চলতে চলতে

দামস্তর অন্য একটি উচ্চস্তরে এসে স্থির হতে পারে, অথবা চলতেই থাকে। অতএব মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ :

(১) মুদ্রাস্ফীতির শুরু বা সূচনা,
(২) মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া,
(৩) মুদ্রাস্ফীতির স্থিতিশীলতা (Stability), অথবা অস্থিতিশীলতা (Instability)।

মুদ্রাস্ফীতির পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে হলে জানতে হয় (১) মুদ্রাস্ফীতি কীভাবে শুরু হয়, (২) একবার শুরু হলে এটা কীভাবে চলতে থাকে এবং (৩) মুদ্রাস্ফীতির সেই চলা কি থামে, না কি চলতেই থাকে? আমাদের বর্তমান আলোচনায় মুদ্রাস্ফীতির সূচনা বা সূচনার কারণগুলির উপর আলোকপাত করা হবে। মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সামান্য আভাস দেওয়া হলেও এর স্থিতিশীলতা বা অস্থিতিশীলতার সমস্যাটির জটিলতার জন্য তাকে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হবে।

মুদ্রাস্ফীতির কারণ :

মুদ্রাস্ফীতির কারণ সম্বন্ধে ক্ল্যাসিক্যাল ব্যাখ্যা :—ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলেই জিনিসপত্রের দাম বাড়তে শুরু করে এবং মুদ্রাস্ফীতির সূচনা হয়। তাঁদের ধারণা ছিল যে, দামস্তর (P) হল দ্রব্য ও অর্থের অনুপাত। তাঁদের ধারণাকে সংক্ষেপে এইভাবে দেখা যায় :

ধরি, P = দামস্তর,
M = অর্থের পরিমাণ,
G = দ্রব্যের পরিমাণ।

তাহলে $P=\frac{M}{G}$. ক্ল্যাসিক্যালদের মতে M বাড়লে G বাড়ে না। তাঁরা Gকে স্থির বলে ধরেছিলেন। এই অবস্থায় M বাড়লে P বাড়বে। P বাড়লে $\frac{1}{P}$ (অর্থের ক্রয় ক্ষমতা) কমবে। কাজেই M বাড়লে P বেড়ে যায়। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা একেই মুদ্রাস্ফীতি বলে মনে করতেন। মুদ্রাস্ফীতি যে একটি প্রক্রিয়া, দামস্তরের উচ্চাবস্থা মাত্রই যে মুদ্রাস্ফীতি নয়—তাঁরা বুঝতেন না। তাছাড়া M বাড়লে G বাড়বে না—এটাও ঠিক নয়। দেশে পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থা বর্তমান থাকলে G সর্বাধিক হতে পারে। সেক্ষেত্রে M বাড়িয়ে G বাড়ানো যাবে না সত্য, কিন্তু দেশে যদি অপূর্ণ নিয়োগ থাকে, তাহলে M বাড়লে সুদের হার কমবে, সুদের হার কমলে বিনিয়োগ বাড়বে, বিনিয়োগ বাড়লে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বাড়বে, আয় বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়বে, চাহিদা বাড়লে যোগান বাড়বে, যোগান বাড়ানোর জন্য উৎপাদন বাড়বে, উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কর্মনিয়োগ বাড়বে ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, M বাড়লে G বাড়তে পারে।

এখন M বাড়লে যদি G সমান হারে বাড়ে তাহলে P স্থির থাকবে। অতএব আমরা বলতে পারি দামস্তর উচ্চ অবস্থায় থাকলেই তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যায় না। তাছাড়া অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেই যে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে সব ক্ষেত্রে এমন কথা বলা যায় না। যখন দেশে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বর্তমান থাকে, তখনই অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তর বাড়তে পারে। যে দেশে পূর্ণকর্মনিয়োগ অবস্থা বর্তমান নেই, সেখানে কেন দামস্তর বৃদ্ধি পায়—তার কোন ব্যাখ্যা ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে নেই। পৃথিবীর কোন দেশেই পূর্ণনিয়োগ নেই, অথচ প্রায় সব দেশেই জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে।

তবে আমরা বলতে পারি যে, অর্থের পরিমাণ বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি নাও হতে পারে, কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি হলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। জিনিসপত্র কেনাকাটা করতে বেশি টাকা-পয়সার দরকার হয়। কাজেই মুদ্রাস্ফীতির সময় অর্থের যোগান বেশি হবেই। কিন্তু তা থেকে যদি মনে করা হয় যে—অর্থের যোগান বৃদ্ধিই দাম বৃদ্ধির কারণ তাহলে কাকতালীয় সম্পর্কের মত ভুল হয়।

(খ) **কীন্‌স-প্রদত্ত ব্যাখ্যা:**—কীন্‌সের মতে মুদ্রাস্ফীতি বলতে যেহেতু দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি বোঝায়, কাজেই মুদ্রাস্ফীতির কারণ অনুসন্ধান করতে হবে দ্রব্যের বাজারে, অর্থের বাজারে নয়। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা অর্থের বাজারে মুদ্রাস্ফীতির কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যাপারটা যেন যেখানে জিনিসটা নেই সেখানেই সেটার খোঁজ করার ব্যর্থ চেষ্টার মত। এ চেষ্টা ব্যর্থ ও হাস্যকর।

জিনিসপত্রের দাম কেন বাড়ে তার কারণ দ্রব্যের বাজারে সন্ধান করতে হবে। দ্রব্যের বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। দ্রব্যের বাজারে,

(ক) যদি দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যায়, কিন্তু যোগান স্থির থাকে, কিংবা

(খ) যদি চাহিদা স্থির থাকে, কিন্তু যোগান কমে যায়, কিংবা

(গ) যদি চাহিদা বেড়ে যায় ও যোগান কমে যায়, তাহলে দ্রব্যের দাম বাড়বে।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের মত কীন্‌সও বুঝেছিলেন—দ্রব্যের যোগান স্থির না থাকলে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে না, বরং যোগান বেড়ে যাবে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যাখ্যা করতে হলে দ্রব্যের যোগান স্থির আছে বলে ধরে নিতে হবে। দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে একমাত্র পূর্ণনিয়োগ অবস্থাতেই। কাজেই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (True Inflation)-র ব্যাখ্যার জন্য ধরে নিতে হয় দেশে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বর্তমান আছে। এই অবস্থায় কোন কারণে যদি দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায় তাহলে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ব্যবধান দেখা দেয় এবং এই ব্যবধানের ফলেই দ্রব্যের দাম বাড়তে থাকে। কীন্‌স এই ব্যবধানকে মুদ্রাস্ফীতি-জনক ব্যবধান (Inflationary gap) বলেছিলেন।

যদি ধরা হয় যে,

DG = দ্রব্যের চাহিদা (Demand for Goods), SG = পূর্ণ নিয়োগস্তরে দ্রব্যের যোগান (Supply of Goods), IG = মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান (Inflationary Gap)—তাহলে IG = DG − SG হবে। যদি DG = SG হয়, তাহলে IG = O হবে, যদি DG > SG হয়, তাহলে IG > O হবে, যদি DG < SG হয়, তাহলে IG < O হবে। যখন DG > SG হবে ও IG > O হবে, তখনই দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়তে থাকবে। তাহলে কীন্সের মতে পূর্ণ নিয়োগস্তরে দ্রব্যের যোগান যখন স্থির থাকে, তখন দ্রব্যের অতিরিক্ত চাহিদার জন্যই দেশে দামস্তরের ঊর্ধ্বগতি শুরু হয়। এটা হল পূর্ণ বা প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা।

অনেক দেশে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা আসার অনেক আগেই জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। একে অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি অনুন্নত হয়, যদি দেশে কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়, যদি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্য কোন বাধা থাকে তাহলেই অপূর্ণ-নিয়োগ স্তরেও দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে এবং এই অবস্থায় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তাহলে কীন্সের মতে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান স্থির থাকা অবস্থায় অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

(গ) আধুনিক ব্যাখ্যা

আধুনিক অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাকে কীন্সীয় ব্যাখ্যার সম্প্রসারিত রূপ বলা যেতে পারে। কীন্সের মতে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের চেয়ে বেশি হয়ে গেলেই দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়তে শুরু করে। আধুনিক ব্যাখ্যায় বলা হয় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা-ব্যবধান (Demand Gap)-কে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, দ্রব্যের ব্যবধান (Commodity Gap), দ্বিতীয়ত, উপাদানের ব্যবধান (Factor Gap). দ্রব্যের ব্যবধান = দ্রব্যের চাহিদা—দ্রব্যের যোগান = Dc − Sc (এখানে Dc = দ্রব্যের চাহিদা, Sc = দ্রব্যের যোগান) এবং উপাদানের ব্যবধান = উপাদানের চাহিদা—উপাদানের যোগান = $D_f - S_f$ (এখানে Df = উপাদানের চাহিদা ও Sf = উপাদানের যোগান) দ্রব্যের ব্যবধান যত বাড়ে ততই দ্রব্যের দাম বাড়ে। একে চাহিদা-বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand-pull Inflation বা DPI) বলা হয়। উপাদানের ব্যবধানের ফলে উপাদানের দাম বাড়ে। ফলে দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে। উৎপাদনের ব্যয় বেড়ে যাওয়ার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। একে ব্যয়বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost-push Inflation বা CPI) বলা যেতে পারে।

আধুনিক ব্যাখ্যায় মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভবের কারণ খোঁজা হয় দ্রব্যের বাজারে ও উপাদানের বাজারে। এখানে দ্রব্য বলতে প্রধানত ভোগ্যদ্রব্যকেই বোঝায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি হতে পারে।

জনগণের রুচির পরিবর্তন ঘটলেও অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়। সরকার যদি তার ভোগব্যয় বৃদ্ধি করেন তাহলেও দেশে ভোগ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হয়।

ভোগ্যদ্রব্য ছাড়াও থাকে মূলধন দ্রব্য (Capital goods)। মূলধনকে উপাদান বলা হয়। মূলধন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে মূলধন দ্রব্যের সেবার দাম বৃদ্ধি পায়, ফলে উৎপাদন ব্যয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মোট উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ হল শ্রমের মজুরী। কাজেই শ্রমের বাজারে অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি হলেই মজুরী বৃদ্ধি পায় এবং তারজন্য উৎপাদনের ব্যয় বাড়ে ও উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বাড়ে।

অতএব শ্রমের বাজারে শ্রমের যোগান কম এবং শ্রমের চাহিদা বেশি হলেই মজুরীর হার বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলেই ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয়। শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকলে এটা হবে।

কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি অনেক দেশে বেকার সমস্যাও আছে, আবার শ্রমের মজুরীও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ কী? এর অনেক কারণ থাকতে পারে। তাদের মধ্যে প্রধান হল শ্রমিক আন্দোলনের ভূমিকা। শ্রমিকেরা শ্রমিক সংঘের মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে যদি মজুরীর হারকে একটি উচ্চস্তরে বেঁধে রাখেন এবং সময় সময় তার বৃদ্ধি ঘটাতে আন্দোলন করে সফল হন, তাহলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হবে। শ্রমিক আন্দোলনের উদ্ভব হলেই শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতার অবসান হয় এবং অপূর্ণপ্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। কাজেই আমরা বলতে পারি শ্রমের বাজারে অপূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকলে বেকার সমস্যা থাকা সত্ত্বেও মজুরীর হার বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হতে পারে। শুধু শ্রমের বাজার নয়, দ্রব্যের বাজারেও একচেটিয়া কারবার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতা থাকলে বিক্রেতার অপচেষ্টায় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে পারে।

আবার কোন দেশের ব্যয়-বৃদ্ধি-জনিত মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভবের উৎসবিন্দুটি অন্য দেশেও থাকতে পারে। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যদি কোন আমদানিকৃত দ্রব্য ব্যবহার করা হয় (যেমন, পেট্রল, ডিজেল অয়েল ইত্যাদি) এবং সেই দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে আমদানিকারক দেশে ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কোন দেশের মুদ্রাস্ফীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে পৃথিবীর অন্য দেশে সংক্রামিত হতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আধুনিক ব্যাখ্যায় মুদ্রাস্ফীতিকে DPI কিংবা CPI হিসেবে দেখা হয়। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতিকে নিছক DPI কিংবা CPI হিসেবে দেখলে ভুল হবে। বাস্তবে দেখা যায়, মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়ায় DPI ও CPI মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়; তখন বোঝা যায় না—সেই মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে কী পরিমাণ DPI এবং কী পরিমাণ CPI আছে। কিংবা কোনটা আগে আরম্ভ হয়েছে।

কীভাবে এই প্রক্রিয়া চলে তার একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যায়। ধরি কোন দেশে যে-কোন কারণে DPI শুরু হল। তাহলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। শ্রমিকরা তখন দেখবেন যে, তাঁদের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেছে। আগের বেতনে বা মজুরীতে আর চলছে না। কাজেই তাঁরা শ্রমিকসংঘের মাধ্যমে মজুরী বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করবেন। সেই আন্দোলন সফল হলে মজুরী বাড়বে, কাজেই উৎপাদন ব্যয় বাড়বে এবং CPI দেখা দেবে। অতএব DPI থেকে CPI-এর জন্ম হতে পারে। এমনিভাবে দেখানো যায় যে—CPI থেকেও DPI-এর উদ্ভব হতে পারে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হল DPI ও CPI-এর মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) একটি পরিণাম মাত্র। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ রবার্টসনের ভাষার অনুকরণ করে বলা যায়—ক্রমবর্ধমান চাহিদার স্টালাকটাইট্ (stalactite) এবং ক্রমোন্নত ব্যয়ের স্টালাগমাইট (stalagmite) যখন একটি বিন্দুতে বিলীন হয়ে যায় তখনই মুদ্রাস্ফীতির জন্ম হয়।

১১.৩ মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান (Inflationary gap) :

(ক) মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান কাকে বলে :

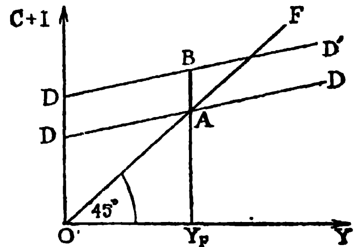
দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান পূর্ণ নিয়োগ স্তরে স্থির থাকলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা যদি দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপেক্ষা বেশী হয়ে যায়, যার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দেয়, তাহলে দ্রব্যসামগ্রীর সেই অতিরিক্ত চাহিদাকে মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান বলা হয়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান = দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা—(পূর্ণ নিয়োগ স্তরে) দ্রব্যসামগ্রীর যোগান।

যদি I.G = মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান (Inflationary gap),

DG = দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা, SG = দ্রব্যসামগ্রীর যোগান হয়,

তাহলে IG = DG—SG হবে।

আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে এই ব্যবধান দেখাতে পারি। নীচের রেখাচিত্রে এটি দেখানো হল।



১১.৫ রেখাচিত্র : মুদ্রাস্ফীতির ব্যবহার

এই রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আয় (Y) এবং উল্লম্ব অক্ষে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা (ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা + মূলধন-দ্রব্যের চাহিদা = C+I) পরিমাপ করা হচ্ছে। এখানে OF হল 45° কোণ-বিশিষ্ট রেখা এবং DD হল মোট চাহিদা রেখা। DD রেখাটি OF রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করেছে। A বিন্দুতে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান = OY_F. এই যোগান হল পূর্ণনিয়োগ অবস্থার মোট যোগান। মোট যোগান এর চেয়ে বেশি হতে পারে না। এখানে মোট যোগান = OY_F

= AY_F এবং মোট চাহিদা = AY_F অর্থাৎ A বিন্দুতে মোট চাহিদা = মোট যোগান AY_F. অর্থাৎ A বিন্দুটি হল আয়ের বা উৎপাদনের ভারসাম্যের বিন্দু।

এখন কোন কারণে মোট চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে চাহিদা রেখাটি উপরের দিকে উঠে যাবে। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে আমাদের রেখাচিত্রে DD রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে গেল। এখন মোট চাহিদা রেখা হল DD' এই চাহিদা রেখাটি থেকে দেখা যাচ্ছে আয় যখন OY_F, তখন দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা $BY_F > AY_F$. কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর যোগান আগের স্তরে স্থির থাকবে। অর্থাৎ যোগান হবে $OY_F = AY_F$'. অতএব AB হবে অতিরিক্ত চাহিদা। এখানে AB হল মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান।

(খ) কীভাবে মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়?

মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান হল দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা ও মোট যোগানের ব্যবধান। এখানে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বা উৎপাদন পূর্ণনিয়োগ স্তরে স্থির থাকে বলে ধরা হয়। উৎপাদন থেকে আয় হয়। উৎপাদন স্থির থাকলে আয়ও স্থির থাকে। সেই স্থির আয়ে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার বৃদ্ধি ঘটলেই মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। আমরা জানি দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা হল ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদা ও অতিরিক্ত মূলধন দ্রব্যের চাহিদার যোগফল। অর্থাৎ মোট চাহিদা = মোট ভোগব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয় = $C+I$. মোট ভোগব্যয়ের মধ্যে দেশের পরিবারগুলির ভোগব্যয় বা বেসরকারী ভোগব্যয় এবং সরকারের ভোগব্যয় থাকে। অনুরূপভাবে মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের মধ্যে বেসরকারী বিনিয়োগ ও সরকারী বিনিয়োগ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

আমরা জানি সরকারী ও বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগের একটি অংশ আয়ের উপর নির্ভর করে, অপর অংশটি স্বয়ম্ভূত হয় অর্থাৎ আয়ের উপর নির্ভর করে না। কাজেই মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের স্বয়ম্ভূত অংশের বৃদ্ধি ঘটলেই মোট চাহিদা আয় নিরপেক্ষভাবে বেড়ে যায়। এর ফলেই মুদ্রাস্ফীতি-জনক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। অন্যভাবে বলা যায় দেশের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয়ের স্বয়ম্ভূত অংশের বৃদ্ধি ঘটলেই মোট চাহিদারেখা সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানের উদ্ভব হয়।

দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদার স্বয়ম্ভূত অংশের বৃদ্ধি আবার নানা কারণে হতে পারে। কয়েকটি কারণ ভোগ বৃদ্ধি করে, কয়েকটি কারণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। ভোগ বৃদ্ধিকারী কারণগুলি আবার দুরকমের হতে পারে—যথা, বেসরকারী ভোগবৃদ্ধিকারী কারণ ও সরকারী ভোগব্যয় বৃদ্ধিকারী কারণ। অনুরূপভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকারী কারণগুলিও দুটি ভাগে বিভক্ত হতে পারে যথা—বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধিকারী কারণ এবং সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধিকারী কারণ। যে সব

কারণে বেসরকারী ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায় তাদের মধ্যে প্রধান হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি, গড় ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি, নতুন দ্রব্যের আবিষ্কার, পরিবারগুলির জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ইত্যাদি। এই সব কারণে স্থির আয়ে পূর্বের চেয়ে বেশি ভোগব্যয় হয়। তবে মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সরকারী ভোগব্যয় বৃদ্ধির দায়িত্ব কোন অংশে কম নয়। সরকার তাঁর আয় বৃদ্ধি-না করেও তাঁর ব্যয় বৃদ্ধি করতে পারেন। পরিবারগুলির পক্ষে এটা এত সহজে সম্ভব নয়। আবার দেশের বিনিয়োগকারীরা নানা কারণে স্বয়ম্ভূতভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রেও সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকেই বেশি দায়ী করা যায়। নতুন উৎপাদন পদ্ধতির আবিষ্কার হলে বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হন। তেমনি যুদ্ধ বাধলে, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে কিংবা উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য সরকার নতুন টাকা ছাপিয়ে ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করেন। এভাবেই মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানের সৃষ্টি হয়।

(গ) কীভাবে এই ব্যবধান দূর করা যেতে পারে:

মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান দুভাবে দূর হতে পারে। যথা—প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে।

দেশের পরিবারগুলি যদি তাদের ভোগব্যয় কমায়, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি তাদের স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ হ্রাস করে তাহলে মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান কমে যেতে পারে। কিন্তু এর সঙ্গে সরকারকেও তাঁর ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ কমাতে হবে। সরকার নিজের ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস করতে পারেন, আবার কর চাপিয়ে বা অন্য কোনভাবে বেসরকারী ভোগ ও বিনিয়োগব্যয় হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারেন। এইভাবে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা কমতে কমতে যখন পূর্বের স্তরে ফিরে আসে তখনই এই ব্যবধান দূরে হয়। এগুলো হল ব্যবধান দূর করার প্রত্যক্ষ পথ। তবে এই ব্যবধানের উদ্ভব হলেই দেশে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। দাম বাড়লে নিম্নলিখিতভাবে মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান কমবে কিংবা দূরে হবে:

১। দাম বৃদ্ধি পেলে পরিবারগুলির আর্থিক আয় সমান থাকলেও বাস্তব আয় কমবে, ফলে তাদের ভোগব্যয় কমবে;

২। দাম বৃদ্ধি পেলে পরিবারগুলির বাস্তব সম্পদের বাস্তব মূল্য হ্রাস পাবে, ফলে পরিবারগুলি সঞ্চয় বৃদ্ধি করে সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চাইবে, কাজেই তাদের ভোগব্যয় কমবে;

৩। মুদ্রাস্ফীতির সময় যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় কিংবা স্থির থাকে, তাহলেও সুদের হার বাড়বে, ফলে বিনিয়োগ কমবে এবং মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কমবে;

৪। মুদ্রাস্ফীতির সময় দেশের রপ্তানি কমবে এবং আমদানি বাড়বে, ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা কমবে;

৫। সরকার যদি তাঁর আর্থিক ব্যয় স্থির রাখেন, তাহলে মুদ্রাস্ফীতির ফলে তাঁর বাস্তব ব্যয় কমবে ;

৬। সরকার অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও অন্যান্যদের যে পেনসন ইত্যাদি স্থানান্তর পাওনা দিয়ে থাকেন, তার বাস্তব মূল্য কমে যাবে, ফলে ভোগব্যয় কমবে ;

৭। মুদ্রাস্ফীতির সময় মুনাফা বাড়ে ও মজুরী কমে, ফলে মোট ভোগব্যয় কমে কারণ শ্রমিকদের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি। এইভাবে মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানের উদ্ভব হলে কতকগুলি পরোক্ষ প্রভাব দেখা দেবে। সেই প্রভাবগুলোর দ্বারা মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান কমবে কিংবা সম্পূর্ণ দূর হবে।

(ঘ) **মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান ধারণার সমালোচনা ঃ**

কীন্‌সের মুদ্রাস্ফীতি আলোচনার মূলস্তম্ভ ছিল মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানের ধারণাটি। এই ধারণার সাহায্যে কীন্‌স মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করে দেন। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের ধারণা ছিল মুদ্রাস্ফীতির কারণ হল অর্থের যোগান বৃদ্ধি। কীন্‌স প্রথম দেখালেন—এটা ভুল। মুদ্রাস্ফীতির কারণ খোঁজা উচিত দ্রব্যের বাজারে। তাঁর মতে যখন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা তাদের যোগানের চেয়ে বেশি হয়, তখন দেখা দেয় মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান এবং এই ব্যবধানের ফলেই মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয়। কাজেই কীন্‌স তাঁর মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান নামক ধারণাটির সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যাকে উন্নত করেছিলেন, আমাদের দৃষ্টিকে আরো স্বচ্ছ করেছিলেন। সে কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে আমরা এই ধারণার কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করতে পারি ঃ

১। মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান একটি গতিহীন অবস্থা (Static Situation), কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি হল একটি গতিশীল প্রক্রিয়া (Dynamic Process). কাজেই এই ব্যবধানের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির ব্যাখ্যা করা যায় না।

২। বাস্তবে পরিসংখ্যানগতভাবে মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান পরিমাপ করা যায় না।

৩। এই ব্যবধানের পরিমাপ করা সম্ভব নয় বলে ব্যবধান কতটা হয়েছে জানা যাবে না। ব্যবধান জানা না থাকলে ব্যবধান দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করাও যাবে না।

সরকার যদি কর চাপিয়ে কিংবা নিজের ব্যয় কমিয়ে এই ব্যবধান দূর করতে চান তাহলে করের হার কী হবে এবং সরকার কী পরিমাণে তাঁর ব্যয় কমাবেন সেটা জানা যাবে না। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানের বিশেষ কোন কার্যকারিতা নেই।

৪। মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান বিষয়ক আলোচনার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল এই যে—এতে ব্যবধানের সঙ্গে দাম বৃদ্ধির হারের কোন স্পষ্ট সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়নি। অর্থাৎ শতকরা কত ব্যবধান হলে দামস্তর শতকরা কত হারে বৃদ্ধি পাবে

সে সম্বন্ধে এই আলোচনা থেকে কিছুই জানা যাবে না। অথচ এটা না জানতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে কিছুই জানা হয় না। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান থাকলে দাম বৃদ্ধি পাবে এটা জানলে কিছুই জানা হয় না। এটা তো একটা সাধারণ ধারণা মাত্র।

১১.৪ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand Pull Inflation) এবং ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Cost Push Inflation)

(ক) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

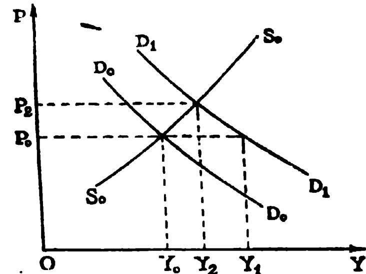
মুদ্রাস্ফীতি বলতে বোঝায় দ্রব্যসামগ্রীর ক্রমাগত দাম বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। দ্রব্যসামগ্রীর দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের দ্বারা। কাজেই দাম বৃদ্ধির কারণ খুঁজতে হয় চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের মধ্যে। দ্রব্যসামগ্রীর যোগান স্থির থাকলে এবং চাহিদার বৃদ্ধি হলে দাম বেড়ে যায়। আবার, চাহিদা যদি স্থির থাকে, কিন্তু যোগান কমে যায় তাহলেও দাম বেড়ে যায়। তাহলে আমরা পেলাম—মুদ্রাস্ফীতির কারণ দুরকমের হতে পারে,

যথা—(১) চাহিদার বৃদ্ধি (যোগান স্থির), অথবা

(২) যোগানের হ্রাস (চাহিদা স্থির)।

এখন প্রশ্ন—চাহিদার বৃদ্ধি কীভাবে হয় এবং কীভাবেই বা যোগান হ্রাস পায় ?

চাহিদার বৃদ্ধি ঘটতে পারে দুভাবে, যথা, স্বয়ম্ভূতভাবে অথবা আয় বৃদ্ধির প্রভাবে। দেশের উৎপাদন ও আয় যখন স্থির থাকে তখন চাহিদার বৃদ্ধি ঘটলে বুঝতে হবে—চাহিদার সেই বৃদ্ধি আয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের পরিবর্তনের জন্য ঘটেছে। একে চাহিদার স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি (Autonomous increase) বলা যায়। সাধারণত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে চাহিদার এরকম স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এর ফলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা রেখা ডানদিকে ও উপরের দিকে সরে যায়। সেই চাহিদা রেখা নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থির যোগান রেখাকে উচ্চতর বিন্দুতে ছেদ করে। সেই বিন্দুতে ভারসাম্য দেখা দেয় এবং দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। একে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Demand Pull Inflation) বলা হয়। পাশের রেখাচিত্রে দেখানো হল কীভাবে চাহিদার স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।



১১.৬ রেখাচিত্র : চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

এই রেখাচিত্রে OY-অক্ষে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ এবং OP-অক্ষে দ্রব্যসামগ্রীর দাম পরিমাপ করা হয়েছে।

এখানে S_0S_0 হল প্রাথমিক যোগান রেখা এবং DD_0 হল প্রাথমিক চাহিদা রেখা। ভারসাম্য দাম হল OP_0. এখন ধরা যাক চাহিদার স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি ঘটল। চাহিদা রেখাটি ডান দিকে সরে গিয়ে D_1D_1 রেখা হল। এখানে OP_0 দামে দ্রব্যের চাহিদা হবে OY_1, কিন্তু যোগান হবে OY_0. কাজেই OP_0 দামে Y_0Y_1 পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা (Excess demand) দেখা দেবে। এই অতিরিক্ত চাহিদার জন্য দাম বাড়বে। দাম বাড়লে চাহিদা কমবে এবং যোগান বাড়বে। অবশেষে চাহিদা কমে এবং যোগান বেড়ে OY_2 হলে চাহিদা ও যোগান সমান হবে। সেক্ষেত্রে ভারসাম্য দাম হবে $OP_2 > OP_1$. এই দাম বৃদ্ধিকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অতএব **যখন যোগান স্থির থাকে কিন্তু কোন কারণে চাহিদার স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি ঘটে, তার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর যে দাম বৃদ্ধি ঘটে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।**

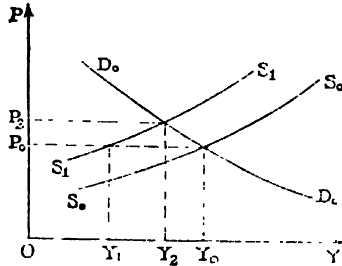
এখন প্রশ্ন হতে পারে—আয় বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধি ঘটলে কী মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়? অর্থাৎ চাহিদার স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি না ঘটে যদি উদ্ভূত বৃদ্ধি ঘটে তাহলেও কী মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে? না, তা ঘটার কথা নয়। কারণ আয় বৃদ্ধি পেলে বুঝতে হবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই দেশবাসীর আয় বৃদ্ধি পায়। কাজেই আয় বৃদ্ধি ঘটলে চাহিদার যেমন বৃদ্ধি ঘটে, তেমনি যোগানও বেড়ে যায়। চাহিদা ও যোগান যেখানে সমান হারে বাড়ে সেখানে চাহিদা বৃদ্ধি দাম বাড়াতে পারে না। অবশ্য যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি হারে বাড়লেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। আমরা এই সম্ভাবনাটিকে বাদ দিতে পারি। তাহলে বলতে পারি—আয় বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বাড়লে দাম বাড়বে না।

(খ) ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি :

দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা যদি স্থির থাকে কিন্তু কোন কারণে যোগানের স্বয়ম্ভূত হ্রাস ঘটে তাহলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যায়। যোগান কমে গেলে বুঝতে হবে পূর্বের দামে এখন কম জিনিস পাওয়া যাচ্ছে, অথবা, পূর্বের সমান জিনিস পেতে হলে এখন বেশি দাম দিতে হচ্ছে। বেশি দাম দিতে হয় কারণ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যের যোগান দাম বেড়ে যায়। অতএব যোগান কমে যাওয়া মানেই হল ব্যয় বেড়ে যাওয়া। সেইজন্য যোগান হ্রাস পাওয়ায় যে দাম বৃদ্ধি ঘটে তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। পর পৃষ্ঠার রেখাচিত্রে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হল।

এখানে D_0D_0 হল প্রাথমিক চাহিদা রেখা, S_0S_0 হল যোগান রেখা। OP_0 হল প্রাথমিক ভারসাম্য অবস্থায় দাম। এখন ধরা যাক কোন কারণে যোগানের হ্রাস ঘটল। এর ফলে যোগান রেখাটি বামদিকে সরে গিয়ে S_1S_1 হল। এখানে

OP_0 দামে অতিরিক্ত চাহিদা হল Y_0Y_1, ফলে দাম বাড়বে। দাম বাড়লে চাহিদা কিছুটা কমবে এবং যোগান কিছুটা বাড়বে। অবশেষে দাম যখন OP_2 হবে তখন চাহিদা OY_0 থেকে কমে হবে OY_2 এবং যোগান OY_1 থেকে বেড়ে হবে OY_2। এখানে চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান। কাজেই OP_2 হবে ভারসাম্য দাম। তাহলে আমরা পাই, **চাহিদা যদি অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু কোন কারণে যদি যোগান স্বয়ম্ভূতভাবে হ্রাস পায় বা ব্যয়বৃদ্ধি পায় তাহলে দ্রব্যসামগ্রীর যে দাম বৃদ্ধি ঘটে তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।**



১১.৭ রেখাচিত্র : ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

এখানে যোগানের স্বয়ম্ভূত হ্রাস কিংবা উৎপাদন ব্যয়ের স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি নামক ব্যাপারটিকে আর একটু স্পষ্ট করে বোঝানো যেতে পারে। উৎপাদন বাড়লে যোগান বাড়ে। কিন্তু উৎপাদন বাড়লে সাধারণত উৎপাদন ব্যয়ও বাড়ে। তাকে স্বয়ম্ভূত ব্যয় বৃদ্ধি বলা যায় না। উৎপাদন বাড়লে যে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণও বলা যেতে পারে না। কিন্তু উৎপাদন যখন সমান থাকে, তখন যদি ব্যয় বেড়ে যায় তাহলেই স্বয়ম্ভূত ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে। এরকম স্বয়ম্ভূত ব্যয়বৃদ্ধির ফলেই যোগান রেখা বামদিকে সরে যায় এবং ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয়। এখন প্রশ্ন—স্বয়ম্ভূত ব্যয়বৃদ্ধি কেন ঘটে? এর উত্তরে আমরা বলতে পারি যে, যখন কোন উপাদানের সেবার দাম বৃদ্ধি পায়, কিংবা উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় তখনই উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি পায়। কোন উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকলেও যদি সেই উপাদানের পারিশ্রমিক বেড়ে যায় তাহলে উৎপাদনের পরিমাণ সমান থাকে, কিন্তু সেই সমান পরিমাণ উৎপাদনের জন্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার উপাদানের পারিশ্রমিক যদি স্থির থাকে কিন্তু উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় তাহলেও সেই একই ঘটনা ঘটে। অতএব আমরা বলতে পারি—**যখন কোন এক বা একাধিক উপাদানের সেবার দাম বেড়ে যায় কিন্তু সেই উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা সমান থাকে, অথবা**

যখন উপাদানের সেবার দাম স্থির থাকে কিন্তু উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় তখন উৎপাদন ব্যয়ের স্বয়ম্ভূত* বৃদ্ধি ঘটে।

কোন উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে সেই উপাদানের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পায়। সেটাই স্বাভাবিক ঘটনা। এর ফলে মোট উৎপাদন ব্যয় যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে উৎপাদন। এখানে গড় উৎপাদন ব্যয় অপরিবর্তিত থাকবে। কাজেই এই ব্যয় বৃদ্ধি মূল্য বৃদ্ধি ঘটাবে না। কিন্তু যখন কোন উপাদানের উৎপাদন ক্ষমতা স্থির থাকে, অথচ সেই উপাদানের মালিকেরা সেই উপাদানের দাম বাড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়; তখনই গড় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়। এর ফলে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ে এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সব উপাদান যে নিজেদের দাম বাড়িয়ে নিতে পারে—তা নয়। কোন উপাদান পারে, কোন উপাদান পারে না। সাধারণত বলা হয় যে, শ্রমিকেরা শ্রমিক সংঘের মাধ্যমে একতাবদ্ধ হলে শ্রমের যোগানের দিকে একচেটিয়া প্রভাব দেখা দেয়। তখন শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়ে নিতে পারে। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা স্থির থাকলেও শ্রমিক সংঘ মজুরী বৃদ্ধির দাবি আদায় করে নিতে সমর্থ হলে উৎপাদন ব্যয়ের স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি ঘটে এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয়।

মজুরী ছাড়াও উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে থাকে উৎপাদন-মালিকদের স্বাভাবিক মুনাফা। অনেক সময় মালিকরা তাঁদের মুনাফার মার্জিন (margin) বাড়িয়ে দিতে পারেন। এর ফলেও উৎপাদন ব্যয় এবং দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে পারে। একেও ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসেবে দেখা যেতে পারে।

---

*'স্বয়ম্ভূত' শব্দটিকে এখানে সীমিত অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে। স্বয়ম্ভূত বলতে বোঝায়—যা আপনা থেকে ঘটেছে, যার পিছনে অন্য কোন 'কারণ' নেই। কিন্তু কারণ ছাড় কিছুই ঘটতে পারে না। সে অর্থে কিছুই স্বয়ম্ভূত হতে পারে না। আমরা যে চাহিদার বা উৎপাদন ব্যয়ের স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধির কথা বলেছি তাদের কোনটিই স্বয়ম্ভূত নয়। তবে উৎপাদন বা আয় নামক আলোচ্য বিষয় বহির্ভূত অন্য কোন বিষয়ের পরিবর্তনের ফলে চাহিদা বা উৎপাদন ব্যয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকেই স্বয়ম্ভূত বৃদ্ধি বলা হয়েছে। এখানে আলোচ্য বিষয় হল উৎপাদনের পরিমাণ কিংবা সেই উৎপাদন থেকে উদ্ভূত আয়। আয়ের পরিবর্তন হলে চাহিদা বা ব্যয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে উদ্ভূত (Induced) বৃদ্ধি বলা হয়। সেই উদ্ভূত বৃদ্ধি থেকে পৃথক করার জন্যই আমরা স্বয়ম্ভূত শব্দটি ব্যবহার করেছি।

(গ) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির পার্থক্য

[Distinction between Demand Pull Inflation (DPI) and Cost Push Inflation (CPI)]

আমরা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে সংক্ষেপে DPI (Demand Pull Inflation) এবং ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে CPI (Cost Push Inflation) বলতে পারি। এবং DPI ও CPI-এর মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি করতে পারি।

(১) DPI-এর ক্ষেত্রে চাহিদা বাড়ে বলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়, কিন্তু CPI-এর ক্ষেত্রে ব্যয় বাড়ে বলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অতএব DPI দ্বারা চাহিদার দিক থেকে মুদ্রাস্ফীতির আবির্ভাব বোঝায়, কিন্তু CPI দ্বারা যোগানের দিক থেকে মুদ্রাস্ফীতির আবির্ভাব বোঝায়।

(২) অর্থনীতির সমষ্টিগত আলোচনায় কীন্‌স ও ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দিয়েও DPI ও CPI-এর পার্থক্য করা যায়। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতি-তত্ত্বে দেশের সমস্যাগুলোকে দেখা হত যোগানের দিক থেকে। কীন্‌সের দৃষ্টিকোণ ছিল ভিন্ন। তিনি অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে দেখেছিলেন চাহিদার দিক থেকে। কাজেই আমরা বলতে পারি DPI মূলতঃ কীন্‌সীয়ান ভাবনাচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত; অপরপক্ষে, CPI হল ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শে গঠিত মুদ্রাস্ফীতির আলোচনা।

(৩) DPI-এর ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাহিদা উপরের দিক থেকে দ্রব্যের দামকে টেনে তোলে। অথচ CPI-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় নীচ থেকে ঠেলা মেরে দামকে বাড়িয়ে দেয়। DPI-এর ক্ষেত্রে থাকে pull এবং CPI-এর ক্ষেত্রে থাকে push. প্রথমটি কাজ করে উপর থেকে, কিন্তু দ্বিতীয়টি কাজ করে তলা থেকে।

(৪) DPI-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে বলে ধরে নেওয়া হয় এবং CPI-এর ক্ষেত্রে চাহিদা স্থির থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। অন্যভাবে বলা যায়—DPI-এর ক্ষেত্রে যোগান স্থির থাকে এবং চাহিদার পরিবর্তনের জন্য দাম বৃদ্ধি পায়। CPI-এর ক্ষেত্রে চাহিদা স্থির থাকে এবং যোগানের পরিবর্তনের জন্য দাম বৃদ্ধি পায়।

(৫) DPI-এর ক্ষেত্রে ব্যয় স্থির থাকে বলে ধরা হয়। এই অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধির ফলে দাম বৃদ্ধি পায়। কাজেই উৎপাদনের মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। CPI-এর ক্ষেত্রে চাহিদা সমান থাকে বলে ধরে নেওয়া হয়। এই অবস্থায় ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দাম বাড়ে সত্য, কিন্তু তার ফলে উৎপাদনের মালিকদের মুনাফা হয় কমে, না হয় স্থির থাকে। অবশ্য অনেক সময় শ্রমিকেরা যত বেশি মজুরী চান মালিকেরা তাদের তত বেশি মজুরী না দিয়ে কিছুটা দেন এবং সেই সঙ্গে নিজেদের মুনাফার হারকেও বাড়িয়ে দেন। এইভাবে দেশে একদিকে মজুরী বৃদ্ধিজনিত

মুদ্রাস্ফীতি (Wage Inflation) এবং অন্যদিকে মুনাফা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি (Profit Inflation) দেখা দেয়।

(৬) DPI-এর ক্ষেত্রে উৎপাদনের মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধি পায় বলে তাঁরা উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এর ফলে দেশে বিনিয়োগ বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে এবং উৎপাদন আয় বাড়ে। CPI-এর ক্ষেত্রে মুনাফা বৃদ্ধি পাওয়ার স্বাভাবিক কোন কারণ থাকে না, কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে, মুনাফা বৃদ্ধি পায় না। তাহলে উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান, বিনিয়োগ প্রভৃতিও বৃদ্ধি পাবে না বলে ধরে নেওয়া যায়। অন্যভাবে বলা যায় DPI দেশে সম্প্রসারণশীল প্রভাবের সৃষ্টি করে, কিন্তু CPI সে রকম কোন প্রভাব সৃষ্টি করে না।

(৭) DPI-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে। কাজেই বেকারত্ব কমে। কিন্তু CPI-এর ক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি পায়, শ্রমের মজুরী বেড়ে যায়। এর ফলে উৎপাদনের মালিকেরা শ্রমের নিয়োগ কমিয়ে দেন। এটা যদি সর্বস্তরে ঘটতে থাকে তাহলে CPI-এর সময় দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশংকা করা যায়।

(৮) DPI-এর ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। অতএব আমরা বলতে পারি DPI প্রত্যক্ষভাবে দেশের উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। আবার DPI-এর সময় মুনাফা বৃদ্ধি পায়। আয়ের বণ্টন মুনাফা প্রাপকদের অনুকূলে সরে আসে। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শ্রমের নিয়োগ বাড়ে। শ্রমিকদের মজুরীর হার এবং/কিংবা মোট মজুরী বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে DPI-এর ফলে মূলধন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে সুদের হার এবং/অথবা মোট সুদ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে CPI-এর ফলে আয়ের বণ্টন প্রভাবিত হয়। কিন্তু সেটা পরোক্ষ প্রভাব। অর্থাৎ DPI প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনকে প্রভাবিত করে এবং পরোক্ষভাবে আয়ের বণ্টনকে প্রভাবিত করে।

অপরপক্ষে, CPI-এর ক্ষেত্রে আগে মজুরী বাড়ে, তারপর ব্যয় বাড়ে, তারপর দাম বাড়ে। দাম বাড়লে পরে উৎপাদন বাড়তে পারে। অর্থাৎ CPI আয়ের বণ্টনকে প্রত্যক্ষভাবে এবং উৎপাদনকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

(৯) শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা না থাকলে শ্রমিকেরা যৌথ দর-কষাকষির সাহায্যে মজুরী নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকলে মজুরী নির্ধারিত হয় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটলে মজুরীর হার বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে দ্রব্যের যোগানও বাড়বে। কাজেই দ্রব্যসামগ্রীর দাম না বাড়তেও পারে। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শ্রমের বাজারে শ্রমিকরা যদি মজুরীর হার বৃদ্ধি করতে পারেন, তাহলে সেই মজুরী বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির কোন যোগ থাকবে না। অর্থাৎ শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেলেও শ্রমের মজুরীর বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এরূপক্ষেত্রে মজুরী বৃদ্ধির ফলে

উৎপাদনের ব্যয় বাড়বে, কিন্তু উৎপাদন ক্ষমতা স্থির থাকায় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপরিবর্তিত থাকবে। এইভাবে CPI-এর উদ্ভব হবে। অতএব আমরা বলতে পারি—শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে CPI-এর উদ্ভব হয় কিন্তু দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকলেও DPI-এর উদ্ভব হতে পারে।

১১.৫ মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল ঃ

মুদ্রাস্ফীতি একটি সামাজিক ঘটনা। অন্যান্য সামাজিক ঘটনার মত মুদ্রাস্ফীতিও সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ও মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা কারো লাভ হয়, কারো লাভ বাড়ে, আবার কারো বা ক্ষতি হয়। যাদের লাভ হয় তারা বলবে মুদ্রাস্ফীতির সুফল আছে। যারা মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তারা বলবে মুদ্রাস্ফীতি খুব খারাপ ব্যাপার। মুদ্রাস্ফীতির সময় জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে, ক্রেতাদের আয়ের ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। তারা আগের চেয়ে কম পরিমাণ জিনিসপত্র ক্রয় করতে ও ভোগ করতে পারে। তাদের তৃপ্তি কম হয়। কাজেই তারা বলবে মুদ্রাস্ফীতি খারাপ। আবার সেই একই সময়ে জিনিসপত্রের বিক্রেতাদের লাভ বাড়বে। তার খুব সুখী হবে। কাজেই তাদের কাছে মুদ্রাস্ফীতি সুফলদায়ী ব্যাপার। এ কথা বলার উদ্দেশ্য হল এটা বোঝানো যে, মুদ্রাস্ফীতির মিশ্র প্রভাব আছে। এই মিশ্র প্রভাবকে ফলাফল বলা হয়।

মুদ্রাস্ফীতির প্রভাবকে আমরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি ঃ (১) উৎপাদনের উপর প্রভাব, (২) বণ্টনের উপর প্রভাব এবং (৩) অন্যান্য প্রভাব।

(১) উৎপাদনের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব।

(ক) প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ও উৎপাদন ঃ

দেশে যদি প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি (True Inflation) থাকে তাহলে বুঝতে হবে দেশে পূর্ণ কর্মনিয়োগ বর্তমান আছে। পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন স্থির থাকবে। কাজেই কোন কারণে দেশের সামগ্রিক চাহিদা যদি আয়-নিরপেক্ষ বা স্বয়ম্ভূতভাবে বৃদ্ধি পায়, তাহলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাবে। একে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে দাম বাড়লে বিক্রেতাদের মুনাফা বাড়বে তারা বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে উৎসাহী হবেন। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বাড়বে। বিনিয়োগ বাড়লে উপাদানগুলির চাহিদা বাড়বে। কিন্তু তারা তো সব কাজে নিযুক্ত আছে। কাজেই তাদেরকে উৎপাদনের কাজে লাগাতে গেলেই বেশি মজুরী দিতে হবে। বেশী মজুরী পেলে তারা আগে যেখানে কাজ করত সেখানের কাজ ছেড়ে নতুন কাজে নিযুক্ত হবে। এখন নতুন কাজে উপাদানগুলির দক্ষতা যদি তাদের পুরানো কাজের দক্ষতার সমান হয়, তাহলে পুরানো কর্মস্থলে উৎপাদন যত কমবে, নতুন কর্মস্থলে উৎপাদন ঠিক ততটা বাড়বে, ফলে দেশের মোট উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু ব্যয় বেড়ে

যাবে কারণ বেশী মজুরী না পেলে উপাদানগুলি পুরানো কাজ ছেড়ে নতুন কাজে আসবে না। তাহলে আমরা বলতে পারি দেশে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বজায় থাকলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি না পেতেও পারে, তবে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবেই, এর ফলে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। অন্যভাবে বলা যায়, উৎপাদনের উপাদানগুলি যদি সব কাজে সমান দক্ষতাসম্পন্ন হয়, তাহলে প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির সময় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকবে। উপাদানগুলির দক্ষতা যদি পুরানো কাজ অপেক্ষা নতুন কাজে বেশি হয়, তাহলেই মোট উৎপাদন বাড়তে পারে। কিন্তু উপাদানগুলির দক্ষতা যদি নতুন কাজে কম হয়, তাহলে উৎপাদন কমবে। অতএব প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির সময় উৎপাদনের কীরূপ পরিবর্তন হবে তা এমনিতে জানা যাবে না।

(খ) অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি ও উৎপাদন :

দেশে যদি অপূর্ণ কর্মনিয়োগ থাকে, তাহলে দেশের অনুন্নত আভ্যন্তর কাঠামো (Infra-structure) ও প্রতিবন্ধকতার (Bottlenecks) জন্য কোন কোন উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হয়ে পড়তে পারে। এই অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। একে অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি (Semi-Inflation) বলা হয়।

অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতির সময় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে গুণক প্রক্রিয়া কাজ করে—এই সময় উপাদানগুলির অপূর্ণ নিয়োগ থাকে। কাজেই বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে যদি অব্যবহৃত, স্বল্প ব্যবহৃত উপাদানের ব্যবহার বাড়ানো যায়, তাহলে একদিকে যেমন নিয়োগ বাড়বে, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদন বাড়বে, অবশ্য দেশটি তার পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করতে না পারলে, উপাদানের যোগান যদি তখনও অস্থিতিস্থাপক থেকে যায়, তাহলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও দেশের উৎপাদন না বাড়তেও পারে। তবে আশা করা যায় যে, অপূর্ণ নিয়োগ স্তরে অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতির সময় দেশের উৎপাদন বাড়তে পারে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, একমাত্র মৃদু মুদ্রাস্ফীতিই উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক। মুদ্রাস্ফীতি যদি খুব দ্রুতগতিসম্পন্ন হয়, তাহলে কেবলমাত্র ক্রেতাদের অসুবিধা হবে এমন বলা যায় না, বিক্রেতাদেরও অসুবিধা হবে। বিক্রেতাদেরও দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে হয়। যারা এইভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত থাকেন তাঁরা মুক্ত ও দ্রুত মুদ্রাস্ফীতির সময় অসুবিধায় পড়ে যান। সাধারণত প্রতিনিয়ত দাম বাড়তে থাকায় ক্রয় থেকে লাভ হয়, বিক্রয় থেকে লোকসান হয় বলে সকলেই ক্রয় করে দ্রব্য মজুত করে রাখতে চান। পরে বেশি দামে বিক্রয় করে লাভ করার লোভ সংবরণ করা মুশকিল হয়ে পড়ে। অতএব আমরা বলতে পারি দ্রুত মুদ্রাস্ফীতির সময় দ্রব্য উৎপাদন করে বিক্রয় করলে যত লাভ হয়, মজুত করে রাখলে বেশি লাভ হয় বলে মানুষের ঝোঁক উৎপাদন করা থেকে মজুত করার দিকে

সরে যায়। এইভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুতদারি দেখা দেয়। দেখা দেয় বিপজ্জনক মাত্রায় ফাটকা কারবার ও মুনাফাবাজি। এগুলো উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক নয়।

মুদ্রাস্ফীতি অতি দ্রুতগতিসম্পন্ন হলে অর্থের ক্রয় ক্ষমতাও অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কমতে থাকে। অর্থের ক্রয় ক্ষমতা কমলে অর্থের মর্যাদাও কমে যায়। কোন মানুষ অর্থ হাতে ধরে থাকতে চায় না। অর্থ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ ছেড়ে দ্রব্য সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়। এইভাবে অর্থের প্রচলন বেগ বেড়ে যেতে থাকে। অবশেষে কোন লোকই আর অর্থ নিতে চায় না। তখন অর্থব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। এটা হল চরম মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম।

তাহলে দেখা যাচ্ছে—মৃদু মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারে। মুদ্রাস্ফীতি বলতে পূর্ণ নিয়োগ স্তরের পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি বোঝালে তা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে পারবে কিনা বলা যায় না। কেবল মাত্র অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রেই উৎপাদন বৃদ্ধির কিছু আশা করা যেতে পারে। দেশে অপূর্ণ নিয়োগ থাকলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে নিয়োগ বৃদ্ধি করা যায়। আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। এটাই হল পরিকল্পিত মুদ্রাস্ফীতির পক্ষে যুক্তি। কিন্তু চরম মুদ্রাস্ফীতি কখনই উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না বরং মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেয়।

(২) আয়-বণ্টনের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ঃ

মুদ্রাস্ফীতির সময় সমাজের বিভিন্ন আয়-শ্রেণীর মানুষ বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হন। কারো আয় বাড়ে, কারো কমে। যেমন বলা যায়—মুদ্রাস্ফীতির সময় যাঁরা লোককে ঋণ দেন তাঁরা ঠকে যান, এবং যাঁরা ঋণ নেন তাঁরা লাভবান হন। ঋণ দেবার সময় অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বেশি থাকে। ঋণ দেওয়া টাকা সুদসহ যখন ফেরত পাওয়া যায়, তখন বেশি টাকা ফিরে আসে সত্য, কিন্তু তার ক্রয় ক্ষমতা পূর্বের আসল টাকার চেয়েও অনেক কমে যায়। কাজেই (ক) মুদ্রাস্ফীতির সময় **ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং ঋণগ্রহীতারা লাভবান হন।**

(খ) মুদ্রাস্ফীতির সময় ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হন, কিন্তু বিক্রেতারা লাভবান হন। অবশ্য সব বিক্রেতারাই যে লাভবান হন এমন বলা যায় না। যদি সব দ্রব্য ও সেবার দাম সমান হারে বৃদ্ধি পায় তবে প্রত্যেকের আপেক্ষিক দাম সমান থাকে, কাজেই কারো লাভ হয় না। •মুদ্রাস্ফীতির সময় যদি সব দ্রব্য ও সেবার দাম সমান হারে না বাড়ে, তাহলে এবং তাহলেই যাদের বিক্রীত পণ্যের দাম অন্য পণ্যের তুলনায় বেশি বাড়বে সেইসব পণ্যের বিক্রেতারাই অন্য বিক্রেতাদের তুলনায় লাভবান হবেন।

(গ) মুদ্রাস্ফীতির সময় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম যদি অন্য দ্রব্যের দামের তুলনায় বেশি বৃদ্ধি পায়, তাহলে আমরা বলতে পারি মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষিজীবীরা

লাভবান হবেন। মুদ্রাস্ফীতির সময় সার, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া কাপড়, ভোজ্য তেল, চিনি, কেরোসিন, ওষুধপত্র ইত্যাদি শিল্পজাত দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পায়। কৃষিজীবীরা বেশী দামে ফসল বিক্রয় করেন সত্য, কিন্তু তাঁদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদির দামও বেড়ে গেলে তাঁদের বিশেষ লাভ থাকে না।

(ঘ) মুদ্রাস্ফীতির সময় যে সব শ্রমিক নিজেদের মজুরীর হার বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন তাঁরা আর্থিক দিক দিয়ে লাভবান হন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যের দাম যে হারে বৃদ্ধি পায়, তাঁদের আর্থিক মজুরী সেই হারে বৃদ্ধি পেলে, তাঁদের বাস্তব মজুরী সমান থাকবে। দেশের সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক শ্রমিকের আর্থিক মজুরীও সমান হারে বৃদ্ধি পেয়ে যায়। এ'রা মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হন না। তবে লাভবানও হন না। তাঁদের বাস্তব অবস্থা একই থাকে। যে সব শ্রমিকের আর্থিক মজুরী দামস্তরের চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়, তাঁদের বাস্তব মজুরী কমে যায়, তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

(ঙ) মুদ্রাস্ফীতির সময় সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয় সেই সব মানুষদের যাঁদের আর্থিক আয় পূর্বচুক্তি মত স্থির থাকে। এ'দের স্থির-আয়-শ্রেণীর মানুষ বলা যায়। দীর্ঘমেয়াদী সুদের হার স্থির থাকে। মধ্যবর্তী সময়ে মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হলে সুদ প্রাপকরা যে আর্থিক সুদ পেয়ে থাকেন, তার বাস্তব মূল্য কমে যায়, অনুরূপভাবে যাঁরা চুক্তিমত স্থির আর্থিক আয় পেয়ে থাকেন, মুদ্রাস্ফীতির সময় তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হন।

(চ) স্বয়ংনিযুক্ত পেশায় যাঁরা নিযুক্ত থাকেন, মুদ্রাস্ফীতির সময় তাঁরাও নিজেদের ফি বাড়িয়ে দেন। ব্যবসায়ীরাও মুনাফার রেট বা হার বেশি রেখে দ্রব্যের দাম আদায় করেন। অর্থাৎ স্বয়ংনিযুক্ত ব্যক্তিরাও মুদ্রাস্ফীতির বোঝা অন্যের ঘাড়ে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করেন। যেমন—কোন মসলার দোকানদার উকিলের কাছে মামলার তদারক করতে গেলেন। মুদ্রাস্ফীতির দোহাই দিয়ে উকিল তাঁর কাছ থেকে বেশি ফি নিলেন। দোকানদার ফিরে এসেই তাঁর মসলার দাম দিলেন বাড়িয়ে। দর্জি দেখলেন মসলার দাম বেড়েছে। তিনিও তাঁর রেট বাড়িয়ে দিলেন। এইভাবে সমাজে একজন অন্যজনের ঘাড়ে ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির বোঝা চাপিয়ে দেন। যিনি অন্যের ছোড়া বল নিজের কোর্ট থেকে তুলতে পারেন না, তিনিই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

(৩) **মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য প্রভাব :**

(ক) মুদ্রাস্ফীতির সময় ধনীব্যক্তিদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। কারণ মুদ্রাস্ফীতির সময় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেশি থাকে বলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। লোকে জিনিস পত্র ক্রয় কমিয়ে দেয়, বাকি টাকাটা সঞ্চয় করে। অর্থনীতিবিদ হায়েক একে পূর্বক সঞ্চয় (Forced Savings) বলেছেন।

(খ) মুদ্রাস্ফীতির সময় দেশের জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় বলে দেশের রপ্তানি কমে যায় এবং আমদানি বেড়ে যায়। ফলে বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতা দেখা দেয়।

(গ) মুদ্রাস্ফীতির সময় বিনিয়োগকারীদের অসুবিধা হয়। দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে এই অসুবিধা বেশি হয়, কারণ প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয় ও শেষব্যয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান গড়ে ওঠে। মধ্যবর্তী সময়ে বিনিয়োগ-প্রকল্পটিকে বদলে নতুন করে প্রকল্প রচনা করতে হয়, কিংবা প্রকল্পের সংশোধন করতে হয়।

(ঘ) মুদ্রাস্ফীতির সময় শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দিতে পারে। শ্রমিকেরা মজুরী বৃদ্ধির জন্য আন্দোলন করতে পারেন। মালিকেরা সেই দাবি মেনে না নিলে আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হয়। উৎপাদন ব্যাহত হয়।

(ঙ) মুদ্রাস্ফীতির সময় অর্থের মূল্য দ্রুত হ্রাস পায় বলে লোকের মধ্যে দ্রব্যপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা এত বেড়ে যায় যে, সকলেই দ্রব্য মজুত করে রাখতে চায়। ফলে সীমিত যোগান আরো কমে যায়। ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলেই ফাটকা কারবারে মেতে ওঠে।

১১.৬ কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় :

দামবৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। এই প্রক্রিয়াটির মধ্যে যদি স্থিতিশীলতা (Stability) থাকে, তাহলে দামস্তর স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি নতুন ভারসাম্যস্তরে এসে থেমে যাবে। তার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন নেই। তবে এক্ষেত্রে ভারসাম্য-স্তরে পৌঁছনোকে ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। দামবৃদ্ধির প্রক্রিয়ার মধ্যে স্থিতিশীলতা না থাকলে দামস্তর ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। সেক্ষেত্রেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। যোগান বৃদ্ধি করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি :

দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা যখন দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অপেক্ষা বেশি হয়ে যায় তখনই মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানের উদ্ভব হয় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কাজেই **মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একদিকে চাহিদা কমানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, অপরদিকে যোগান বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।** কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি পূর্ণমুদ্রাস্ফীতি হলে যোগান বৃদ্ধির সম্ভাবনা বেশি থাকবে না। তবে দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে মোট উৎপাদন ও শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধি করা যায়। সেখানে পূর্ণনিয়োগস্তরের উন্নতি হয় এবং যোগান বৃদ্ধি পায়। আবার সরকার নিজে উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। দেশে পূর্ণ কর্মনিয়োগ না থাকলে যোগান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বেশি করে সফল হতে পারে না। সেখানে যোগান বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যায়। যে সব উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক,

তাদের যোগান বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তাহলে আমরা বলতে পারি—মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যোগানের দিক থেকে মুদ্রাস্ফীতিকে আক্রমণ করা যায়।

২। চাহিদা হ্রাস করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি :

দ্বিতীয় উপায় হল চাহিদা হ্রাস করা। দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার মধ্যে আছে (ক) ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা, (খ) মূলধন দ্রব্যের চাহিদা, (গ) সরকারী চাহিদা ও (ঘ) আমদানির চাহিদা।

(ক) বেসরকারী ভোগব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা :

বেসরকারী ভোগব্যয় কমানোর জন্য সরকার প্রত্যক্ষ কর, যথা—ব্যক্তি বা পরিবারের অতিরিক্ত আয় ও সম্পত্তির উপর আয় কর, সম্পদ কর ইত্যাদি কর এবং যৌথ প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত মুনাফার উপর মুনাফা কর ইত্যাদি বৃদ্ধি করতে পারেন। এর ফলে ব্যক্তি বা পরিবারগুলির ব্যয়যোগ্য আয় (Disposable Income) কমে যাবে এবং ভোগব্যয় কমবে। চাহিদা কমলে মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান কমে যায়। প্রত্যক্ষ কর ছাড়াও পরোক্ষ কর (যেমন, উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয় কর ইত্যাদি) বৃদ্ধি করলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে চাহিদা কমে যায়। এইভাবে সরকার কর-ব্যবস্থার মাধ্যমে আয় প্রভাব ও দাম প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার মজুরী বৃদ্ধি বন্ধ করতে পারেন। মহার্ঘভাতা জমিয়ে (Freeze) দিতে পারেন, চাকুরিজীবী ব্যক্তি ও শ্রমিকদের অতিরিক্ত পাওনা বর্তমানে না দিয়ে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্পের মাধ্যমে জমা করে রাখতে পারেন। এমনকি পেনসন, বেকারভাতা প্রভৃতি হস্তান্তর আয় প্রদানও কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এইভাবে বেসরকারী ভোগব্যয় কমানোর জন্য সরকার আয় কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার চেষ্টা করতে পারেন। আয় কমলে ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়। কাজেই চাহিদা কমে।

আয়ের পথে ভোগব্যয় কমানোর চেষ্টাকে যথার্থভাবে কার্যকরী করতে হলে তার সঙ্গে রেশন ব্যবস্থা চালু করা উচিত। রেশন হল বরাদ্দ ব্যবস্থা। প্রত্যেক লোক বরাদ্দমত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করবে। তার বেশি দ্রব্য কিনতে হলে তাকে খোলাবাজার থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে। এতে দ্রব্যের চাহিদা কমে। রেশন ব্যবস্থার সঙ্গে সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকান (Fair-price shops) খোলার ব্যবস্থা করতে পারেন। দাম বেঁধে দিতে পারেন। এতে দামের উপর সরাসরিভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এগুলো হল মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা (Direct measures)। এদের কার্যকারিতা অবশ্যই বেশি।

কিন্তু ভোগব্যয় হ্রাস করার জন্য সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন তাদের অনেক ত্রুটি আছে। প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি করলে ব্যক্তি বা পরিবারগুলি

পুরানো সঞ্চয় ভেঙ্গে কর দিতে পারে এবং কর দিয়েও নিজেদের ভোগব্যয় অপরিবর্তিত রাখতে পারে। তাছাড়া প্রত্যক্ষ কর বৃদ্ধি করলে মানুষের কর্মস্পৃহা নষ্ট হতে পারে। তাহলে দেশের মোট উৎপাদন কমবে এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়বে। আবার মুদ্রাস্ফীতির সময় মজুরী কমিয়ে দিলে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি বন্ধ করে দিলে ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ ও শ্রমিক আন্দোলন দেখা দিতে পারে। তাতেও উৎপাদন ব্যাহত হবে। আবার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য বৃদ্ধদের পেনসন, বেকারভাতা ইত্যাদি কমিয়ে দেওয়া হল নিষ্ঠুরতম পথ। মানবিক দিক দিয়ে দেখলে বলা যায়—এগুলো কখনই করা উচিত নয়। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু করার ক্ষেত্রেও অসুবিধা আছে। এতে চাহিদা বৃদ্ধির প্রবণতা সাময়িকভাবে কমতে পারে, কিন্তু রেশন ব্যবস্থা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই রুদ্ধ চাহিদা (Pentup demand) ছাড়া পেয়ে যায় এবং অবিলম্বে মুদ্রাস্ফীতির পুনরুদ্ভব ঘটায়। তাছাড়া রেশন ব্যবস্থার সঙ্গে দুর্নীতি হাত মেলায়। কালো বাজার গড়ে ওঠে। মুদ্রাস্ফীতি রোধের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়।

(খ) বেসরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ঃ

বেসরকারী বিনিয়োগ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার বিশেষ আর্থিক নীতি-গ্রহণ করতে পারেন। বিনিয়োগ করতে হলে অর্থ চাই। অর্থের যোগান আসে ঋণের মাধ্যমে। ঋণ দেয় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। মুদ্রাস্ফীতির সময় আবার দেশের আসল বা বাস্তব বিনিয়োগ বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার চেয়ে ফাটকা কারবারেই বিনিয়োগ বেশি বাড়ে। ফাটকা কারবারে টাকা ঢেলে লোকে প্রচুর লাভ করে। দ্রব্যসামগ্রীর কৃত্রিম ঘাটতি ঘটিয়ে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কম দামে ক্রয় করে মজুত করে রাখাই হল এইসব ফাটকা কারবারীদের প্রধান কাজ। এতে জনগণের ভীষণ অসুবিধা হয়।

সেইজন্য সরকার মুদ্রাস্ফীতির সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে পরামর্শ দেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সেইমত কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক (১) ব্যাঙ্ক হার বৃদ্ধি করে, (২) খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে, (৩) বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির বাধ্যতামূলক জমার অনুপাত বৃদ্ধি করে এবং (৪) নির্ধারণমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রয়োগ করে।

ব্যাংকহার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও তাদের ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার (Lending rates) বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে ঋণের চাহিদা কমে, বা কমে বলে আশা করা হয়। ব্যাঙ্কহার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে বিল পুনর্বাট্টা করে যে টাকা পায়, তার পরিমাণ কমে যায়। এতে তাদের ঋণদানের ক্ষমতা কমে যায় অর্থাৎ ব্যাংকহার বৃদ্ধি করলে ঋণের যোগানও কমে যায়।

কেন্দ্রীয় খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করলে যারা ঋণপত্র ক্রয় করে তাদের

হাত থেকে নগদ অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে চলে যায়। এর ফলে দেশে অর্থের যোগান কমে, বিনিয়োগ কমে, মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কমে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ঋণপত্র ক্রয় করলে তাদের ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা কমে যায়।

অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক জমার অনুপাত বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ক্ষমতাকে সরাসরিভাবে কমিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্যে বাছাই করে মুদ্রাস্ফীতির পক্ষে ক্ষতিকারক বিনিয়োগের দিকে ঋণের যোগান বন্ধ করে দিতে কিংবা কমিয়ে দিতে পারে।

এগুলি হল মুদ্রাস্ফীতিজনক বিনিয়োগবৃদ্ধি রোধ করার **আর্থিক ব্যবস্থা**। এগুলি ছাড়া সরকার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি রোধ করতে পারেন। প্রত্যক্ষ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সরকারের স্বাধীনতা বেশি, ফলে প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাগুলি সহজেই কার্যকরী হতে পারে।

কিন্তু আমরা জানি ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণমূলক পদ্ধতিগুলির নানাপ্রকার ত্রুটি আছে। ব্যাঙ্ক হার বৃদ্ধি করলে সব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তাদের সুদের হার বৃদ্ধি না করতেও পারে। সুদের হার বৃদ্ধি করলে বিনিয়োগ যে কমবে এমন বলাও যায় না। মুদ্রাস্ফীতির সময় ব্যবসায়ী বিশেষ করে ফাটকা ব্যবসায়ীদের এত বেশী লাভ হয় যে, তারা ১% বা ২% সুদের হার বৃদ্ধিকে গ্রাহ্যই করে না। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ অর্থ জমে যায়। তারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে ঋণের জন্য যাবেই এমন বলা যায় না।

খোলাবাজারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রয় করলেই যে সবাই সেগুলো কিনবে এমন বলা যায় না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের অতিরিক্ত অর্থের সাহায্যে এগুলো কিনতে পারে। নগদ আমানত থেকেও ঋণপত্র কিনতে পারে। আর এর ফলে দেশে সরকারী ঋণ বেড়ে যায়। সুদের বোঝা বাড়ে।

তবে জমাহার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সত্যই খুব হ্রাস পেয়ে যায়। এই পদ্ধতিটি কিছুটা বেশি কার্যকরী হবার আশা করতে পারে, কারণ এর মধ্যে বাধ্যতার উপাদান আছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও বলা যায়, যে সব ব্যাঙ্কের কাছে প্রয়োজনের তুলনায় বেশি রিজার্ভ থাকে তাদের ক্ষেত্রে জমাহার বৃদ্ধির প্রভাব খুবই কম।

ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণকারী পদ্ধতিগুলির অধিকাংশ বাধ্যতামূলক নয়। তাছাড়া তারা প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বিনিয়োগের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। সব বিনিয়োগকেই একইভাবে কমাতে চায়। সেজন্য নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগ করার কথা বলা হয়। এই সব পদ্ধতির মধ্যে পড়ে ঋণের শ্রেণীবিভাগ করে অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক ক্ষেত্রে ঋণের যোগান বন্ধ করা, ঋণ-বরাদ্দ ব্যবস্থা চালু করা ইত্যাদি। এই পদ্ধতিগুলিরও অনেক অসুবিধা আছে। প্রশাসনিক অসুবিধা, ঋণ পরিচালনার ব্যয়, দুর্নীতি প্রভৃতি হল নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ত্রুটি।

(গ) সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ঃ

দেশের মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারী ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পেলে এবং অন্যান্য বেসরকারী ব্যয় স্থির থাকলে দেশের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। আবার সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধি পেলে বেসরকারী ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। এইভাবে সরকারী ব্যয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানকে বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার যেমন বেসরকারী ব্যয় কমানোর চেষ্ট করবেন, তেমনি নিজের ব্যয় যাতে কম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। সরকারী ব্যয়ের মধ্যে যেগুলি অনাবশ্যক ব্যয় সেগুলোকে নির্মমভাবে বাদ দিতে পারেন। প্রশাসনিক অপব্যয় বন্ধ করতে পারেন। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে না করলেই নয় এমন বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির কাজ শুরু করতে পারেন। অর্থাৎ সরকারের উচিত মিতব্যয়িতার নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা।

সরকার সাধারণত আয় বুঝে ব্যয় করেন না। আগে ব্যয় অনুমান করেন, পরে আয় সংগ্রহে মন দেন। অনেক সময় আয়ের চেয়ে ব্যয় বহু বেশি হয়ে যায়। একে ঘাটতি ব্যয় বলা হয়। সরকার সাধারণত নতুন অর্থের সৃষ্টি করে ঘাটতি ব্যয় করে থাকেন। দেশে পূর্ণকর্মনিয়োগ থাকলে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশের নিয়োগ ও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়তে পারে। এটি একটি সম্ভাবনামাত্র। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ঘাটতি ব্যয়ের ফলে উপাদানের দাম বাড়বে, ব্যয় বাড়ছে এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিচ্ছে। সরকারের উচিত মুদ্রাস্ফীতির সময় ঘাটতি ব্যয়কে একেবারে অপরিহার্য নিম্নতার স্তরে নামিয়ে আনা। সম্ভব হলে সরকার ব্যয় কমিয়ে ও আয় বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত বাজেটের নীতি গ্রহণ করে মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

(ঘ) আমদানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ঃ

মুদ্রাস্ফীতির সময় দেশের রপ্তানি কমে যায় এবং আমদানি বাড়তে থাকে। সেইজন্য আমদানি কমানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আমদানি কমাতে হলে আমদানির উপর আমদানি-শুল্ক বাড়াতে হয়, আমদানির উপর কোটা চাপাতে হয়, বৈদেশিক মুদ্রার যোগান নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং সেই সঙ্গে আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনের স্বদেশী ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। আমদানি কমানোর জন্যও নির্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই ভালো। যে সব দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন স্বদেশে হয় না এবং যেগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য—কেবলমাত্র সেই সব দ্রব্যই আমদানি করতে হয়। অপ্রয়োজনীয় আমদানির ক্ষেত্রে কঠোর হস্তে আমদানি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

মুদ্রাসংকোচন (Deflation)

(ক) **সংজ্ঞা ঃ** মুদ্রাসংকোচন হল মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত প্রক্রিয়া। মুদ্রাস্ফীতির সময় জিনিসপত্রের দাম, উপাদানে সেবার দাম ক্রমাগতভাবে বেড়ে যেতে থাকে। মুদ্রাসংকোচনের সময় জিনিসপত্রের দাম, উপাদানের সেবার দাম এবং উৎপাদনের ব্যয় ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে থাকে। মুদ্রাস্ফীতি যেমন ভারসাম্যবিহীন এক প্রক্রিয়া, মুদ্রাসংকোচনও তেমনি ভারসাম্যবিহীন একটি প্রক্রিয়া। অতএব আমরা বলতে পারি—মুদ্রাসংকোচন বলতে বোঝায় সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন অর্থব্যবস্থায় জিনিসপত্রের দাম এবং উৎপাদনের ব্যয় ক্রমাগতভাবে হ্রাস পেতে থাকে।

(খ) **প্রভাব ঃ** মুদ্রাস্ফীতির মত মুদ্রাসংকোচনেরও প্রভাব পড়ে (১) উৎপাদন, আয়, বিনিয়োগ, কর্মনিয়োগ, মুনাফা ও সুদের হারের উপর এবং (২) আয়ের বণ্টনের উপর। মুদ্রাসংকোচনের সময় জিনিসপত্রের চাহিদা ক্রমশ কমতে থাকে। তার ফলে বাজারে দ্রব্য সামগ্রীর অতিরিক্ত যোগান থেকে যায়। একে মুদ্রাসংকোচনের ব্যবধান (Deflationary gap) বলা যেতে পারে। এই ব্যবধান হল মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানের বিপরীত অবস্থা। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানে দ্রব্যের চাহিদা যোগানের থেকে বেশী হয়ে যায়, যার ফলে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে। কিন্তু মুদ্রাসংকোচনের ব্যবধানের ক্ষেত্রে দ্রব্য সামগ্রীর যোগান তাদের চাহিদার থেকে বেশি হয়ে যায় এবং তার ফলে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদকদের ক্ষতি হতে থাকে। তারা তখন উৎপাদন একেবারে বন্ধ করে না দিলেও খুব কমিয়ে দেয়। উৎপাদন কমলে কর্মনিয়োগ কমে। দেশে বেকারত্ব বেড়ে যায়। বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশবাসীর আয় কমে যায়। কাজেই তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা বা মোট কার্যকরী চাহিদা (Effective demand) হ্রাস পায়। আবার দাম কমে, মুনাফা কমে, উৎপাদন, কর্মনিয়োগ ও আয় ক্রমশ কমতে থাকে। এমনি করে দেশে গভীর মন্দা দেখা দেয়।

মুদ্রাস্ফীতির সময় আয়ের বণ্টনের পরিবর্তন হয়। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদক, ব্যবসায়ী, কৃষক, সংঘবদ্ধ ও রাজনৈতিক শক্তিতে সমর্থ শ্রমিক এবং ঋণগ্রহীতাদের সুবিধা বা লাভ হয়, কিন্তু স্থির আয় প্রাপকদের ও ঋণদাতাদের অসুবিধা বা ক্ষতি হয়। মুদ্রাসংকোচনের সময় এর বিপরীত অবস্থা ঘটে। এখানের উৎপাদক, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিকদের ক্ষতি হয়, কারণ তাদের আয় কমে যায়। কিন্তু স্থির আয়ের মানুষদের লাভ হয়। ঋণদাতাদের সুবিধা হয়।

(গ) **মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে কোন্‌টি কাম্য ?**

প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন যে, মুদ্রাস্ফীতি এবং মুদ্রাসংকোচন উভয়ই হল

অস্বাভাবিক অবস্থা। মুদ্রাস্ফীতির সময় জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বেড়ে যেতে থাকে। মুদ্রাসংকোচনের সময় জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত ভাবে কমে যেতে থাকে।

দেশের উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে কোনটাই ভালো নয়। উৎপাদন ও ব্যবসা-বাণিজ্য চায় দেশে জিনিসপত্রের দাম স্থিতিশীল (Stable) অবস্থায় থাকুক। স্থিতিশীল দামস্তর উৎপাদন, বিনিয়োগ, আয় বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ রচনা করে এবং দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়ন করে। সেদিক থেকে বিচার করলে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে কোনটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে পছন্দ করার কিছু নেই। মুদ্রাস্ফীতি হল হাই প্রেসারের রোগের মত মুদ্রাসংকোচন হল লো প্রেসারের রোগ। কোনটাই ভালো নয়।

কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, দেশে হয় মুদ্রাস্ফীতি, না হয় মুদ্রাসংকোচন থাকবেই, তখন পছন্দের প্রশ্ন দেখা দেবে। এবং এই পছন্দের ক্ষেত্রে মৃদু মুদ্রাস্ফীতির দিকেই পাল্লা ভারী হয়ে উঠবে। লক্ষ্য করা উচিত যে, আমরা শুধু মুদ্রাস্ফীতির কথা বলিনি, আমরা বলেছি মৃদু মুদ্রাস্ফীতির কথা। দুরন্ত মুদ্রাস্ফীতি কখনই ভালো নয়, যেমন ভালো নয় গভীর মন্দা। কিন্তু মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় জিনিস-পত্রের দাম সামান্য বাড়ে। উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের লাভ বাড়তে থাকে। এর ফলে তারা উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি করে। দেশবাসীদের আয় বাড়ে। তাদের ক্রয় ক্ষমতাও বাড়ে। এর ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও তারা বেশি দাম দিয়ে জিনিসপত্র ক্রয় করতে পারে। কিন্তু মুদ্রাসংকোচনের সময় জিনিস-পত্রের দাম কমলেও মানুষজনদের হাতে বেশি আয় বা কেনার মত অর্থ থাকে না। তখন তো বেকারত্ব বাড়ছে, কলকারখানার ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন। চারদিকে মন্দার ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। সেখানে দাম কমে গেলেও মানুষের কেনার ক্ষমতা থাকে না। দোকানে দোকানে, মজুত ভাণ্ডারে অবিক্রীত মাল গাদাগাদি হয়ে থাকে। সে সব দেখে উৎপাদকদের মাথায় হাত পড়ে। এ অবস্থাটা কখনই ভালো নয়।

অবশ্য অনেকে বলতে পারেন মুদ্রাস্ফীতির সময় সকলের লাভ হয় না, কারো কারো হয়। যারা লাভবান হয় তারা চাইবে মুদ্রাস্ফীতি থাকুক। অনুরূপভাবে মুদ্রাসংকোচনের সময় সকলের ক্ষতি হয় না। কারো কারো ক্ষতি হয়। অনেকের লাভ হয়। যাদের লাভ হবে তারা চাইবে মুদ্রাসংকোচন থাকুক। এইভাবে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের পক্ষে ও বিপক্ষে পরস্পর-বিরোধী মত থাকবে। সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে বলা যাবে না কোন্‌টি কাম্য।

তবে একথা ঠিক যে, কোন সামাজিক ঘটনাই অবিমিশ্রভাবে ভালো কি খারাপ হতে পারে না। এখানে কোন একটি ঘটনার কাম্যতা বিচার করতে হলে ক্ষতি-পূরণের নীতি (Compensation Principle) অনুসরণ করতে হয়। এই নীতির প্রয়োগ করে বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতির ফলে যারা লাভবান হবে তারা যদি ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পূরণ করেও বেশি লাভ করে থাকে তাহলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যই কাম্য হবে। আবার মুদ্রাসংকোচনের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা যদি সংখ্যায় কম হয়, যদি

লাভবানের সংখ্যা ও তাদের লাভের পরিমাণ বেশি হয়, সেক্ষেত্রে মুদ্রাসংকোচনই কাম্য বলে বিবেচিত হবে। কাজেই মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচনের মধ্যে কোন একটিকে পছন্দ করতে হলে সমাজে দুটি অবস্থাকেই ঘটিয়ে দেখতে হবে—কোন্‌টিতে সমাজের কতজন মানুষের কী পরিমাণ লাভ ও ক্ষতি হয় এবং তারপর সেই লাভ-ক্ষতির যোগ-বিয়োগে যদি দেখা যায় যে, লাভের ঘরে কিছু থাকছে তাহলেই বলা যাবে মুদ্রাস্ফীতি ভালো কি মুদ্রাসংকোচন ভালো। তবে বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব (ধনতান্ত্রিক) দেশেই মৃদু বা দুরন্ত মুদ্রাস্ফীতি দেখা যাচ্ছে। এথেকেও আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, মৃদু মুদ্রাস্ফীতিই অধিকতর কাম্য। কিন্তু কোন জিনিস থাকলেই যে সেটা কাম্য এমন বলা যাবে না। পৃথিবীতে বহু অকাম্য ব্যাপার রয়েছে।

প্রশ্নাবলী

১। মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে ? মুদ্রাস্ফীতি কত রকম হতে পারে ?

২। মুদ্রাস্ফীতির কারণ কী ?

৩। মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান বলতে কী বোঝায় ? কীভাবে এই ব্যবধান দূর করা যায় ?

৪। মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান বলতে কী বোঝ ? মুদ্রাস্ফীতির ব্যখ্যায় এর গুরুত্ব কী ? এর ত্রুটিগুলির আলোচনা কর।

৫। চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে ? ওদের পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বিচার কর।

৭। কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা যায় ?

৮। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন ব্যবস্থার কার্যকারিতার পর্যালোচনা কর।

৯। মুদ্রা সংকোচন কাকে বলে ? মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচনের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণযোগ্য এবং কেন ?

৯। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

(ক) টীকা লেখ :—(১) পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি ও অর্ধমুদ্রাস্ফীতি, (২) মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি ও দমিত মুদ্রাস্ফীতি, (৩) চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি, (৪) মুদ্রাস্ফীতিজনিত ব্যবধান, (৫) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক ব্যবস্থা।

(খ) পূর্ণ কর্মনিয়োগ স্তরের পূর্বে কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে ?

(গ) তুমি কি মনে কর মুদ্রাস্ফীতি একটি আর্থিক ব্যাপার ? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

(ঘ) উৎপাদনের উপর মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বর্ণনা কর।

(ঙ) বণ্টনের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কীরূপ হয় ?

দ্বাদশ অধ্যায় | অনুপ্রবেশ, নিষ্কাশন এবং আয়ের বৃত্ত-স্রোত

ভূমিকা ঃ কোন একটি দেশে কতকগুলি পরিবার এবং কতকগুলি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থাকে। পরিবারগুলি জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উৎপাদনের মালিক। তারা প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট এইসব উপাদানের সেবা বিক্রয় করে এবং তার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট থেকে খাজনা, মজুরী, সুদ ইত্যাদি আয় পেয়ে থাকে। খাজনা, মজুরী, সুদ ইত্যাদি হল পরিবারগুলির আয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়। প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট থেকে যে সব উপাদান ক্রয় করে তাদের সাহায্যে নানারূপ দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করে এবং সেই সব উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীগুলিকে বাজারে বিক্রয় করে আয় পেয়ে থাকে। পরিবারগুলি তাদের আয়ের সাহায্যে নানারকম ভোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে। এটা হল পরিবারের ব্যয় এবং প্রতিষ্ঠানের আয়। এই আয়ের একটি অংশ প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পরিবারগুলির কাছে যায় খাজনা, মজুরী ও সুদ হিসেবে। বাকি অংশটি প্রতিষ্ঠানগুলির মালিকেরা মুনাফা হিসেবে পেয়ে থাকেন। প্রতিষ্ঠানের মালিকেরাও পরিবারে বাস করেন। কাজেই মুনাফা নামক আয়টিও পরিবারগুলির কাছে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে, পরিবারগুলির মোট আয় হল খাজনা + মজুরী + সুদ + মুনাফা। এটাই হল জাতীয় আয়। এর মধ্যে বণ্টিত মুনাফা এবং অবণ্টিত মুনাফা উভয়কেই ধরা হয়।

এই আয় থেকে পরিবারগুলি ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি নতুন মূলধন দ্রব্য ক্রয় করে এবং তাদের মজুত ভাণ্ডারের সংযোজন করে। এগুলো হল বিনিয়োগ ব্যয়। তাহলে দেশের মোট ব্যয়ের মধ্যে থাকছে পরিবারগুলির ভোগ-ব্যয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ ব্যয়। জাতীয় আয় থেকেই জাতীয় ব্যয়ের উদ্ভব হয় এবং তারা পরস্পর সমান হয়। এখন যদি ধরে নিই যে, পরিবারগুলিই প্রতিষ্ঠানগুলির মালিক তাহলে আমরা দেখতে পাই—যে পরিবারগুলি প্রতিষ্ঠান-গুলি থেকে আয় পায়, সেই আয় ব্যয় করে তারা ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধনদ্রব্য ক্রয় করে, সেই ব্যয় প্রতিষ্ঠানের আয় হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট যায়, সেখান থেকে পরিবারগুলির আয় হিসেবে যায় পরিবারগুলির দিকে, সেখান থেকে আবার প্রতিষ্ঠানসমূহের দিকে এবং পরিবারসমূহের দিকে চক্রাকারে প্রবাহিত হয়। একেই আয়-ব্যয়ের বৃত্ত-স্রোত বা সংক্ষেপে আয়ের বৃত্ত-স্রোত বলা হয়। অতএব **পরিবারগুলি থেকে প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে এবং প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে পরিবারগুলির দিকে যে আয়ের স্রোত প্রবাহিত হয় তাকেই আয়ের বৃত্ত-স্রোত বলা হয়।**

আয়ের এই বৃত্ত-স্রোতের মধ্যে আয়ের অনুপ্রবেশ (Injection) এবং/অথবা বৃত্ত-স্রোত থেকে আয়ের নিষ্কাশন (withdrawal) ঘটতে পারে। অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন উভয়েই আয়ের বৃত্ত-স্রোতকে প্রভাবিত করে।

১২.১ (ক) **অনুপ্রবেশ কাকে বলে?** **আয়ের বৃত্ত-স্রোতের বাইরের কোন সূত্র থেকে যে আয় বা অর্থ বৃত্ত-স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে অনুপ্রবেশ বলা হয়।** অনুপ্রবেশকে আমরা আয়ের বহিরাগমনও বলতে পারি। পরিবারগুলি প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট থেকে আয় পেয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলির আয় আসে পরিবারগুলির ব্যয় থেকে। কিন্তু পরিবারগুলি প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উপাদানের সেবা বিক্রয় করে যে আয় পায়, তার চেয়েও যদি তারা কোনভাবে বেশি আয় পেয়ে থাকে এবং/কিংবা প্রতিষ্ঠানগুলিও যদি পরিবারগুলির ব্যয় ছাড়াও অতিরিক্ত কোন সূত্র থেকে আয় পেয়ে থাকে তাহলেই আমরা বলতে পারি যে, আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। অনুপ্রবেশের ফলে আয়-স্রোতের বৃদ্ধি ঘটে।

(খ) **কোন্ কোন্ সূত্র থেকে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে?** দেশের পরিবারগুলি প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যয় ছাড়াও অন্য কোন সূত্র থেকে আয় পেতে পারে। এটি হল পরিবারসমূহের আয়প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয়ের অনুপ্রবেশ। অনুরূপভাবে প্রতিষ্ঠানগুলিও আবার পরিবারসমূহের ক্রয় ছাড়াও অন্য কোন সূত্র থেকে আয় পেতে পারে। এটি হল প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ। অর্থাৎ আয়ের অনুপ্রবেশ পরিবারবৃত্তে কিংবা প্রতিষ্ঠানবৃত্তে কিংবা একই সঙ্গে উভয় বৃত্তের মধ্যে ঘটতে পারে। দেশের আয়-স্রোতে মোট অনুপ্রবেশ হিসেব করার সময় এই উভয় প্রকার আয়প্রাপ্তিকেই ধরা হয়।

আয়ের বৃত্ত-স্রোতের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে প্রধানত তিনটি সূত্র থেকে। এই তিনটি সূত্র হল (১) ব্যাঙ্ক-ঋণ থেকে কিংবা অন্য কোন বাইরের সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে অতিরিক্ত বিনিয়োগ, (২) রপ্তানি এবং (৩) সরকারী ব্যয়। ধরা যাক, J = মোট অনুপ্রবেশ, I = অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা কৃত বিনিয়োগ, X = রপ্তানি, G = সরকারী ব্যয়। তাহলে আমরা বলতে পারি $J = I + X + G$.

(১) **বিনিয়োগের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ :** প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবারগুলির ব্যয় থেকে যে অর্থ পায় সেই অর্থের একটি অংশের সাহায্যে পুরানো ক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করে। এর দ্বারা তাদের মোট মূলধন ভাণ্ডারের অবচয়জনিত হ্রাস রোধ করা হয়। ফলে মোট মূলধন ভাণ্ডার সমান থাকে। দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনও সমান থাকে।

এখন প্রতিষ্ঠানগুলি যদি অতিরিক্ত বিনিয়োগ করে তাহলে মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটবে। কিন্তু অতিরিক্ত বিনিয়োগ করার জন্য যে অর্থ বা আয়ের প্রয়োজন হবে, সেই অর্থ বা আয় প্রতিষ্ঠানগুলি পাবে কোথা থেকে? তিনভাবে তারা এই আয় পেতে পারে।

প্রথমত, প্রতিষ্ঠানগুলি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সেই টাকায় নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারে। এর ফলে যন্ত্রপাতি বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের আয় বাড়বে। এটা হল প্রতিষ্ঠানবৃত্তে আয়ের অনুপ্রবেশ।

দ্বিতীয়ত, প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবারগুলিকে যে আয় বণ্টন করে তার একটি অংশ পরিবারগুলিকে না দিয়ে তার সাহায্যে নতুন যন্ত্রপাতি কিনতে পারে। একেও বিনিয়োগ বলা হয় এবং এক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠানবৃত্তে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে।

তৃতীয়ত, আমরা জানি প্রতিষ্ঠানগুলিও পরিবারগুলির মত তাদের আয়ের একটি অংশ সঞ্চয় করতে পারে। কোন অতীত সঞ্চয় থেকে তারা অর্থ পেতে পারে এবং সেই অর্থের সাহায্যেও তারা নতুন বিনিয়োগ করতে পারে। এর ফলেও প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বৃদ্ধি পাবে। অতএব উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙ্ক থেকে কিংবা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণের মাধ্যমে যে অর্থ পায় সেই অর্থের সাহায্যে কিংবা পরিবারগুলিকে কম আয় বণ্টন করে অর্থ বাঁচিয়ে তার সাহায্যে কিংবা পুরানো সঞ্চয় ভেঙে যে অর্থ পায় তার সাহায্যে নতুন বিনিয়োগ করলে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করলে যে প্রতিষ্ঠানগুলি সেই সব যন্ত্রপাতি বিক্রয় করে তাদের আয় বেড়ে যায়। ফলে যে পরিবারগুলি সেই সব প্রতিষ্ঠানে উপাদানের সেবার যোগান দেয় তাদেরও আয় বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ নতুন বিনিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির কিংবা পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধি পায়।

অতএব **দেশের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর দেশের পরিবারগুলির ব্যয় অপরিবর্তিত থাকলেও প্রতিষ্ঠানগুলির অতিরিক্ত বিনিয়োগ থেকে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং আয়-প্রবাহের বৃদ্ধি হয়।**

(২) **রপ্তানির মাধ্যমে অনুপ্রবেশ :** কোন দেশের পরিবারসমূহ বিদেশের কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট তাদের শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপাদানের সেবা বিক্রয় করে আয় পেতে পারে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট এইসব সেবা বিক্রয়কে সেবার রপ্তানি বা অদৃশ্য রপ্তানি (Invisible exports) বলা যেতে পারে। অদৃশ্য রপ্তানি থেকে রপ্তানিকারক দেশের আয়ের বৃত্ত-স্রোতে অনুপ্রবেশ ঘটে। আবার কোন দেশের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিও বিদেশের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট তাদের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে আয় পেতে পারে। এগুলো হল দৃশ্য রপ্তানি (Visible exports)। দৃশ্য রপ্তানি থেকেও রপ্তানিকারক দেশের আয়ের বৃত্ত-স্রোতে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে। অতএব **কোন দেশের সমস্ত প্রকার রপ্তানি থেকে আয় প্রবাহের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটে এবং তার ফলে আয় বৃদ্ধি পায়।**

(৩) **সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ :** কোন দেশের আয়ের বৃত্ত

প্রবাহের দুটি মেরু ; একটি মেরুতে থাকে পরিবারগুলি, অপর মেরুতে থাকে প্রতিষ্ঠানগুলি। আমরা যদি সরকার নামক একটি অর্থনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিই, তাহলে দেশের আয়-ব্যয়-প্রবাহের সন্নিকটে সরকার নামক একটি বাহ্যিক উৎস থাকবে। এবং এই সরকারের ব্যয় দেশের আয়-স্রোতের মধ্যে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটাবে।

সরকার যে সব কাজে অর্থ ব্যয় করে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নিম্নলিখিত চারটি কাজ : (১) সরকার দেশের পরিবারগুলির নিকট থেকে সেবা ক্রয় করতে পারেন। এর ফলে প্রতিষ্ঠান ছাড়াও অন্য কোন সূত্র থেকে পরিবারগুলির আয় আসে। আয় স্রোতে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে। (২) সরকার প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে নানারকম দ্রব্য ক্রয় করতে পারেন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবারগুলির ক্রয় ছাড়াও সরকার নামক উৎস থেকে আয় পাবে। এতেও আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটবে। (৩) সরকার কোন কোন ব্যক্তি বা পরিবারগুলিকে অর্থ দান করতে পারেন। সরকার বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিদের যে পেনশন বা অন্য কোন ভাতা দেন, দরিদ্রদের খয়রাতি সাহায্য দেন, বেকারদের বেকার ভাতা দেন, তার ফলেও পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধি পায়। যারা সরকারী সাহায্য পায় তারা সরকারকে কিছু না দিয়েই আয় পেয়ে থাকে। অপর পক্ষে সরকার দেশের উপার্জনশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে করের সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করে দরিদ্রদের দেন। সেইজন্য এই পাওনাগুলিকে হস্তান্তর পাওনা (Transfer payments) বলা হয়। হস্তান্তর পাওনার জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন তার ফলে পরিবারগুলি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট সেবা বিক্রয় করা ছাড়াও সরকার নামক একটি বাহ্যিক উৎস থেকে আয় পেয়ে থাকে। অতএব হস্তান্তর পাওনা খাতে সরকারের ব্যয় থেকে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে।

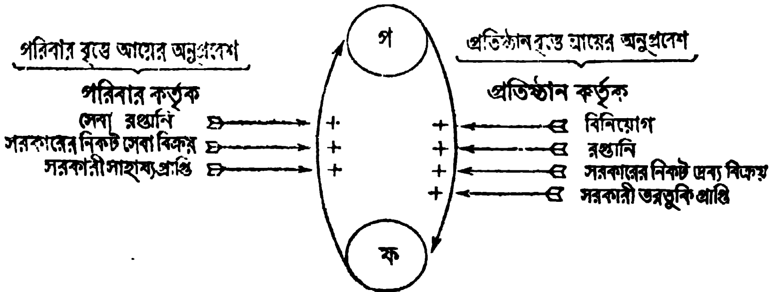
(৪) অনেক সময় সরকার দুর্বল বা রুগ্‌ণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্য করেন। যে সব প্রতিষ্ঠানের গড় উৎপাদন ব্যয় দ্রব্যের দাম অপেক্ষা বেশি, যাদের ক্ষতি হয় সরকার সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় পূরণ করার জন্য অর্থ সাহায্য করেন। একে ভরতুকি বলা হয়। ভরতুকির জন্য সরকারের ব্যয় হয় কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলির আয় হয়। অতএব প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবারগুলির নিকট দ্রব্য বিক্রয় করা ছাড়াও সরকারের কাছ থেকে ভরতুকি পেয়ে থাকে, তার সাহায্যে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে।

এখন এই চারটি কাজের জন্য সরকারী ব্যয়কে একসঙ্গে ধরে মোট সরকারী ব্যয়ের হিসেব পাওয়া যায়। সরকারী ব্যয়ের ফলে আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ ঘটে। তাহলে আমরা পাই—কোন দেশে মোট অনুপ্রবেশ = প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগ + পরিবার ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশে সেবা ও দ্রব্য বিক্রয় + সরকার

কর্তৃক পরিবারসমূহকে স্থানান্তর আয় প্রদান+প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে যথাক্রমে সেবা ও দ্রব্যক্রয়+সরকারের অন্যান্য ব্যয়।

অর্থাৎ মোট অনুপ্রবেশ=প্রতিষ্ঠানসমূহের বিনিয়োগ+দেশের মোট রপ্তানি+সরকারী ব্যয়।

অর্থাৎ $J=I+X+G$. আয়ের বৃত্তস্রোতের কোন্ দিকে কী কী আয় অনুপ্রবেশ হিসেবে প্রবেশ করে তা নীচে রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল। এই রেখাচিত্রে প চিহ্নিত বৃত্তটি হল পরিবার বৃত্ত এবং ফ চিহ্নিত বৃত্তটি হল ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান বৃত্ত। প বৃত্তের ডান দিকে একটি তীর ফ বৃত্তের দিকে



অঙ্কিত হয়েছে। এর দ্বারা বোঝাচ্ছে পরিবারগুলি প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যে অর্থ ব্যয় করে সেই অর্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে বাম দিকে ফ বৃত্ত থেকে একটি তীর প বৃত্তের দিকে আঁকা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবারগুলির সেবা ক্রয় করার জন্য যে অর্থ ব্যয় করে সেই অর্থ পরিবারসমূহের আয়ের সৃষ্টি করে—সে কথাই এই তীরের সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে।

এই রেখাচিত্রের ডান দিকে প্রতিষ্ঠানের এবং বাম দিকে পরিবারগুলির আয় প্রাপ্তি সূচিত হয়েছে। এখানে ডানদিকে চারটি তীর এই প্রবাহ দুটির অভিমুখে অঙ্কিত হয়েছে। ডানদিকের তীরগুলি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ এবং বাম দিকের তীরগুলি পরিবারের ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ দেখায়। অনুপ্রবেশের ফলে আয় বৃদ্ধি পায় বলে তীরের মুখের দিকে যুক্তচিহ্ন বসানো হয়েছে।

১২.২ (ক) নিষ্কাশন কাকে বলে ঃ

কোন দেশের আয়ের বৃত্ত-স্রোতের কোন এক বা একাধিক ছিদ্রপথে যে আয় বৃত্ত-স্রোতের বাইরে বেরিয়ে যায় তাকে নিষ্কাশন বলা হয়। একে আমরা আয়ের বহির্গমনও বলতে পারি। দেশের পরিবারগুলি দেশের প্রতিষ্ঠান থেকে যে আয়

পায় সেই আয়ের পুরোটাই যদি তারা ব্যয় না করে, যদি আয়ের একটি অংশ পরিবারগুলির কাছে অলস সঞ্চয় (Idle savings) হিসেবে জমে যায় তাহলে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে। আবার প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী দ্রব্যের বাজারে বিক্রি করে যে আয় পেয়ে থাকে সেই আয়কে পরিবারগুলির মধ্যে বণ্টন করে। প্রতিষ্ঠানগুলি যে আয় পেয়ে থাকে তার সবটাই পরিবারগুলির মধ্যে বণ্টিত হলে আয়ের কোন নিষ্কাশন ঘটে না। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলি যদি তাদের প্রাপ্ত আয়ের কিছুটা জমা করে রেখে দেয় যদি তারা নিজেরা সেটি খরচ না করে কিংবা পরিবারগুলিকেও না দেয় তাহলে আয়ের কিছুটা আয়-ব্যয় স্রোতে প্রবেশ না করে অন্যত্র অলসভাবে থেকে যায়। এর ফলেও আয়ের নিষ্কাশন ঘটতে পারে।

(ক) **কোন্ কোন্ সূত্রে নিষ্কাশন হতে পারে ?**

নিষ্কাশনের সূত্রগুলিকে আয়-ব্যয়—বৃত্ত-স্রোতের ছিদ্র (Leakages) বলা হয়। এখন যে দেশে সরকারী আয় থাকে, যে দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণ করে সে দেশের আয়-ব্যয়ের বৃত্তস্রোতে তিনটি ছিদ্র থাকতে পারে। এই তিনটি ছিদ্র হল (১) পরিবারসমূহ এবং/কিংবা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছে জমে যাওয়া অলস সঞ্চয় (Idle savings), (২) সরকারের কর ব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রকার কর থেকে প্রাপ্ত সরকারের আয় (Tax-Revenue) এবং (৩) দেশের আমদানির জন্য ব্যয় (Imports). ধরা যাক,

W = মোট নিষ্কাশনের পরিমাণ,

S = অলস সঞ্চয়,

T = সরকারের কর-রাজস্ব,

M = আমদানির মূল্য,

তাহলে আমরা পাই $W = S + T + M$,

(১) **সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিষ্কাশন ঃ**

দেশের পরিবারগুলি তাদের আয়ের একটি অংশ ব্যয় করে স্বদেশের প্রতিষ্ঠান-গুলির কাছ থেকে নানারূপ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে। এই অর্থ প্রতিষ্ঠান বৃত্তে প্রবেশ করে। কিন্তু পরিবারগুলি যদি তাদের আয়ের সেই অংশ সঞ্চয় করে দেয় তাহলে আয়ের সেই অংশ বৃত্তস্রোত থেকে নিষ্কাশিত হয়। পরে সেই সঞ্চয় যদি বিনিয়োগ করা হয় তাহলে সেই অর্থ বৃত্তস্রোতে আবার প্রবেশ করে। কিন্তু সঞ্চয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিনিয়োগ হয় না। কাজেই আমরা ধরতে পারি যে, সঞ্চয় মাত্রই নিষ্কাশন। তাই বলা হয় যে, সঞ্চিত অর্থের ক্ষেত্রে যা ঘটুক না কেন সঞ্চয়ের মাধ্যমে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে।

সঞ্চয় যে কেবল পরিবারগুলির দ্বারাই হয়, এমন নয়। দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিও

তাদের মুনাফা অবণ্টিত রেখে অর্থ বা আয় সঞ্চয় করতে পারে। মুনাফা বণ্টিত হলে প্রতিষ্ঠান বৃত্ত থেকে পরিবার-বৃত্তের দিকে আয়-স্রোত প্রবাহিত হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলি যদি অবণ্টিত মুনাফা রেখে দেয় তাহলে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে। তাহলে আমরা বলতে পারি **পরিবার বা প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে যে অর্থ বা আয় সঞ্চিত হয় তার মাধ্যমে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে। এই নিষ্কাশনের মাধ্যমে আয় বৃত্তস্রোতে প্রবেশ করে না কিংবা বৃত্তস্রোত থেকে বেরিয়ে আসে এবং আয়স্তর নেমে যায়।**

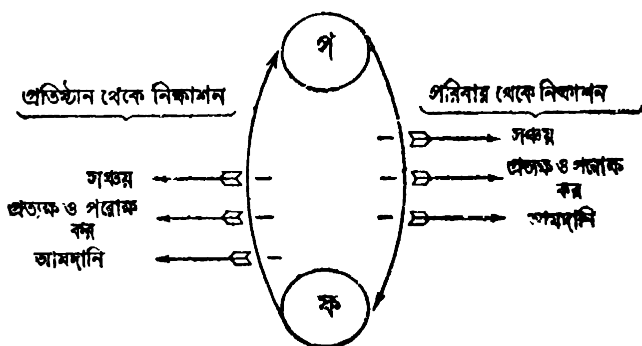
(২) **করের মাধ্যমে নিষ্কাশন ঃ** সরকার পরিবার ও প্রতিষ্ঠানগুলির কাছ থেকে বিভিন্ন প্রকার প্রত্যক্ষ কর আদায় করেন। যেমন, পরিবারগুলির অতিরিক্ত আয়ের উপর আয় কর, সম্পত্তির উপর সম্পদ কর, ব্যয় কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কর বসানো হয়। আবার প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফার উপর মুনাফা কর আরোপ করা হয়। পরিবার-গুলির উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপিত হলে আয়ের একটি অংশ বৃত্তস্রোতে প্রবেশ করে না, সেই আয় নিষ্কাশিত হয়ে সরকারী ভাণ্ডারে জমা হয়। অনুরূপভাবে সরকার প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর মুনাফা কর আরোপ করলে সেই আয় আর পরিবার বৃত্তের দিকে আসে না, কাজেই এর ফলে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে। এইভাবে বলা যায় যে, সমস্ত প্রকার প্রত্যক্ষ করের জন্য আয়ের নিষ্কাশন ঘটে।

সরকার প্রত্যক্ষ কর ছাড়া দ্রব্য ও সেবার উৎপাদন ও বিক্রয়ের উপর নানাবিধ পরোক্ষ কর যেমন, উৎপাদন শুল্ক, আবগারী শুল্ক, বিক্রয় কর আরোপ করতে পারেন। এর ফলে প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যায়। পরিবারগুলি বেশি দামে জিনিসপত্র কেনার জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়। পরিবারগুলির ব্যয় হলেও এই অর্থ প্রতিষ্ঠান বৃত্তের দিকে না এসে সরকারী ভাণ্ডারে জমা হয়। এর ফলে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, **সরকার দেশের পরিবার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের যে প্রত্যক্ষ কর এবং উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর আরোপ করেন তাদের সাহায্যে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে এবং আয়স্তর হ্রাস পায়।***

* সরকার যে শুধুমাত্র কর থেকেই আয় পেয়ে থাকেন এমন নয়। জনগণের কাছ থেকে ঋণ নিয়েও সরকার তাঁর ব্যয় বহন করেন। এই ঋণের ফলেও আয়ের নিষ্কাশন ঘটে। বিশেষ করে পরিবারগুলি যদি তাদের ভোগব্যয় হ্রাস করে সরকারের ঋণপত্র ক্রয় করে তাহলে পরিবারগুলির ব্যয় কমবে। আয়ের নিষ্কাশন ঘটবে। কিন্তু পরিবারগুলি তাঁদের পূর্ব-সঞ্চয় থেকে সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করলে সেই নিষ্কাশন পারিবারিক সঞ্চয়ের অংশভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে পরিবার-গুলি তাদের সঞ্চয় থেকে কর প্রদান করলে কর নামক পৃথক অনুপ্রবেশ থাকবে না। যেখানে $G > T$ হবে সেখানে সরকারকে ঋণ নিতে হয়। অপরপক্ষে $G = T$ হলে ঋণের প্রয়োজন থাকে না। আমরা $G = T$ ধরতে পারি।

(৩) **আমদানির মাধ্যমে নিষ্কাশন ঃ** বিদেশ থেকে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করাকে আমদানি বলা হয়। কোন দেশের পরিবার, প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকার নানা প্রয়োজনে বিদেশ থেকে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারেন। পরিবারগুলি বিদেশে উৎপন্ন ভোগ্যদ্রব্য ব্যবহার করতে পারে। প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্যের সাহায্যে উৎপাদন করতে পারে, বিদেশীদের শ্রম বা মূলধন সেবা ক্রয় করতে পারে। অনুরূপভাবে সরকারও বিদেশ থেকে দ্রব্য ও সেবা আমদানি করতে পারেন। এই তিনটি সূত্র থেকে বিদেশী দ্রব্য ও সেবার মোট মূল্যকে মোট আমদানি বলা যেতে পারে। আমদানির জন্য পরিবারগুলি যে অর্থ ব্যয় করে তা স্বদেশের প্রতিষ্ঠান-বৃত্তে প্রবেশ করে না। আমাদের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলি যে অর্থ ব্যয় করে তা স্বদেশের পরিবার বৃত্তে প্রবেশ করে না। কাজেই আমরা বলতে পারি—**সকল প্রকার আমদানির জন্য আয়ের নিষ্কাশন ঘটে এবং নিষ্কাশনের ফলে আয় স্রোত হ্রাস পায়।**

তাহলে আমরা পেলাম—কোন দেশের মোট নিষ্কাশন = পরিবারগুলির সঞ্চয় + প্রতিষ্ঠানগুলির সঞ্চয় (অবণ্টিত মুনাফা) + সরকারকে প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর + আমদানি। অর্থাৎ $W = S + T + M$. এখন আমরা নীচের রেখাচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ছিদ্রপথে আয়ের নিষ্কাশন দেখাতে পারি।



এই রেখাচিত্রে প হল পরিবারবৃত্ত এবং ফ হল প্রতিষ্ঠানবৃত্ত। ডান দিকে প বৃত্ত থেকে ফ বৃত্তের দিকে অঙ্কিত তীরের সাহায্যে পরিবার থেকে প্রতিষ্ঠানের দিকে প্রবাহিত স্রোত দেখানো হয়েছে। বাম দিকে ফ বৃত্ত থেকে প বৃত্তের দিকে অঙ্কিত রেখার দ্বারা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় ও পরিবারের আয় দেখানো হয়েছে। রেখাচিত্রের ডানদিকে তিনটি বহির্মুখী তীর অঙ্কিত হয়েছে। পরিবারগুলির আয় কোন্ কোন্ ছিদ্রপথে নিষ্কাশিত হতে পারে তা তীরের মুখের দিকে লেখা হয়েছে। নিষ্কাশনের ফলে আয়স্রোত থেকে আয় বেরিয়ে যায় বলে তীরের গোড়ার দিকে

বিযুক্ত চিহ্ন রাখা হয়েছে। অনুরূপভাবে বাম দিকে তিনটি বহির্মুখী তীর এঁকে প্রতিষ্ঠান বৃত্ত থেকে আয়ের নিষ্কাশন দেখানো হয়েছে।

১২.৩ **অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশনের পার্থক্য :** আমরা অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশনের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করি।

প্রথমত, আয়-ব্যয়ের বৃত্তস্রোতের বাইরের কোন উৎস থেকে আয় যখন বৃত্ত-স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করে তখন তাকে অনুপ্রবেশ বলা হয়। অপরপক্ষে, আয়-ব্যয়ের বৃত্ত-স্রোত থেকে যখন নানারকম ছিদ্রপথে আয় বাইরে বেরিয়ে যায় তখন তাকে নিষ্কাশন বলা হয়। অর্থাৎ অনুপ্রবেশের গতি আয়ের স্রোতের অন্তর্মুখে এবং নিষ্কাশনের গতি আয়ের স্রোতের বহির্মুখে হয়।

দ্বিতীয়ত, অনুপ্রবেশের ফলে আয়-প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, কিন্তু নিষ্কাশনের ফলে আয়-প্রবাহ হ্রাস পায়। অনুপ্রবেশ প্রসারণধর্মী এবং নিষ্কাশন হল সংকোচনধর্মী।

তৃতীয়ত, অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু নিষ্কাশনের ফলে পরিবার ও প্রতিষ্ঠানগুলির আয় হ্রাস পায় কিন্তু সরকারের আয় বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত, অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে আয়-নিরপেক্ষ বিষয়গুলির মাধ্যমে, কিন্তু নিষ্কাশন ঘটে থাকে আয়-সাপেক্ষ বিষয়গুলির মাধ্যমে।

১২.৪ **অনুপ্রবেশ, নিষ্কাশন ও আয়-প্রবাহের ভারসাম্য (Injections, Withdrawals and Equilibrium in the circular flow of Income)**

কোন একটি দেশে একদিকে থাকে পরিবারসমূহ, অন্যদিকে থাকে অসংখ্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠান। পরিবারগুলি প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট বিভিন্ন উপাদানের সেবা বিক্রয় করে প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে আয় পেয়ে থাকে। এটা হল পরিবারগুলির আয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়। প্রতিষ্ঠানগুলি আবার বিভিন্ন উপাদানের সাহায্যে নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে এবং সেগুলি দ্রব্যের বাজারে বিক্রয় করে। পরিবারগুলিই তাদের উপার্জিত আয়ের সাহায্যে এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে। এটা হল পরিবার-গুলির ব্যয়, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলির আয়। এই আয়ের সাহায্যে প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবারগুলির নিকট থেকে নানাবিধ উপাদানের সেবা ক্রয় করে থাকে। এর ফলে পরিবারসমূহের আয়ের সৃষ্টি হয়। সেই আয় ব্যয়িত হয়। প্রতিষ্ঠানের আয় হয়, এবং সেই আয় পরিবারের আয় হিসেবে আবার পরিবারগুলির মধ্যে যায়। এইভাবে আয়ের বৃত্ত-স্রোত প্রবাহিত হয়।

আয়ের বৃত্ত-স্রোতের মধ্যে যে আয় পরিবার ও প্রতিষ্ঠান মেরুতে ক্রমাগত যাতায়াত করে তার পরিমাণ সাধারণত স্থির থাকে। সেটা বাড়েও না, কমেও না। আমরা বলি আয়স্তর ভারসাম্য অবস্থায় আছে। আমাদের শরীরের রক্ত-প্রবাহের মধ্যে যে রক্তটা ঘোরাফেরা করছে তার পরিমাণ যদি স্থির থাকে তাহলে এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমাদের শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

রক্তের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। এটা হল বৃদ্ধির ব্যাপার। একটি অর্থ-ব্যবস্থাতেও যদি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি (Economic growth) ঘটে তাহলে সেই দেশের আয় বৃদ্ধি পায়। আমরা যদি ধরে নিই যে, দেশের সে রকম কোন সমৃদ্ধি হয় না, আবার ক্ষয়ও হয় না, তাহলে দেশের আয়-স্রোতের মধ্যে চলমান আয় একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থির থাকবে। কিন্তু স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা ক্ষয় ছাড়াও এই ভারসাম্য আয়-স্তরের (the equilibrium level of Income) পরিবর্তন হতে পারে যদি (১) বাইরের কোন সূত্র থেকে আয় এসে বৃত্ত-স্রোতের মধ্যে ঢোকে এবং (২) বৃত্ত-স্রোত থেকে কোন ছিদ্রপথে আয় বেরিয়ে যায়। বাইরের কোন সূত্র থেকে আয় এসে বৃত্ত-স্রোতের মধ্যে প্রবেশ করলে তাকে বলা হয় অনুপ্রবেশ (Injection)। এর ফলে আয়-স্তর বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে বৃত্ত-স্রোতের কোন ছিদ্রপথে আয় যদি বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে তাকে বলা হয় নিষ্কাশন (Withdrawal)। নিষ্কাশনের ফলে আয়-স্তর হ্রাস পায়।

শরীরের ভিতরে যেমন রক্ত ইনজেক্ট্ করে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, তার ফলে শরীরের রক্ত বৃদ্ধি পায়, আবার শরীর থেকে রক্ত পাম্প করে বের করে দিলে শরীরের রক্ত কমে যায়, ঠিক সেইভাবে অনুপ্রবেশের দ্বারা সমাজ-শরীরে অতিরিক্ত আয় প্রবেশ করে এবং নিষ্কাশনের দ্বারা আয় বাইরে বেরিয়ে আসে। তাহলে আমরা বলতে পারি—অনুপ্রবেশের দ্বারা আয়-স্তর বৃদ্ধি পায় এবং নিষ্কাশনের দ্বারা আয়-স্তর হ্রাস পায়। এখন অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশন যদি একই সঙ্গে ঘটে তাহলে আয়-স্তর বাড়বে এবং কমবে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে এখানে তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে—

(১) **যদি অনুপ্রবেশ নিষ্কাশনের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে আয় বাড়বে ;**

(২) **যদি অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন সমান হয়, তাহলে আয় স্থির থাকবে ; এবং**

(৩) **অনুপ্রবেশ নিষ্কাশনের চেয়ে কম হয় তাহলে আয় কমবে।**

ধরা যাক $Y =$ আয় স্তর, $J =$ অনুপ্রবেশ এবং $W =$ নিষ্কাশন, তাহলে আমরা পাই—

(১) **$J > W$ হলে Y বাড়বে,**

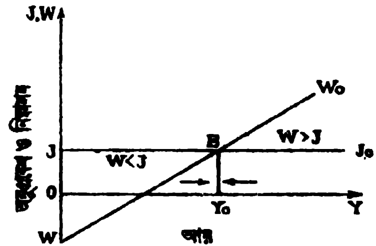
(২) **$J = W$ হলে Y স্থির থাকবে এবং**

(৩) **$J < W$ হলে Y কমবে।**

এই তিনটি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থাটির ক্ষেত্রেই আয়-স্রোতের ভিতর আয়-স্তর সমান থাকবে ; বাড়বেও না, কমবেও না। একেই আমরা আয়-স্রোতের ভারসাম্য অবস্থা বলতে পারি। অতএব **অনুপ্রবেশ এবং নিষ্কাশন একসঙ্গে ঘটলে যদি অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশনের পরিমাণ সমান হয় তাহলে আয়-স্রোতের ভারসাম্য থাকবে। এটি হল ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত (Necessary Condition).** সেইজন্য আমরা বলতে পারি, আয়-স্রোতের মধ্যে ভারসাম্য থাকলে অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশনের পরিমাণ সমান হবে।

আমরা জানি কোন দেশের আয়-স্রোতের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে—নতুন বিনিয়োগের মাধ্যমে, রপ্তানির মাধ্যমে এবং সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে। মোট অনুপ্রবেশ = বিনিয়োগ + রপ্তানি + সরকারী ব্যয়। ধরা যাক, J = মোট অনুপ্রবেশ, I = বিনিয়োগ, X = রপ্তানি এবং G = সরকারী ব্যয়। তাহলে আমরা পাই $J = I + X + G \cdots (1)$ এখানে ধরা হয় যে I, X এবং G সকলেই আয়-নিরপেক্ষ (Independent of income)-বিষয়। অর্থাৎ আয়-স্তর (Y) বাড়লে বা কমলে I, X এবং G বাড়বেও না, কমবেও না। কাজেই J আয়-নিরপেক্ষ হবে। আয়ের পরিবর্তনের ফলে J-এর কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে আয় (Y) এবং উল্লম্ব অক্ষে J পরিমাপ করলে আমরা J-এর আয়-নিরপেক্ষতার বৈশিষ্ট্য থেকে JJ_0 নামক একটি সরলরেখা পাব, সেই রেখাটি আয় অক্ষের সমান্তরাল হবে।

আমাদের নীচের রেখাচিত্রে JJ_0 রেখাটি হল অনুপ্রবেশ রেখা। যদি দেশের আয়-প্রবাহে অনুপ্রবেশের বৃদ্ধি ঘটে তাহলে JJ_0 রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যাবে। অপরপক্ষে অনুপ্রবেশ যদি হ্রাস পায়, তাহলে অনুপ্রবেশ রেখাটি সমান্তরালভাবে নীচের দিকে নেমে যাবে।



১২.৩ রেখাচিত্র : অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশনের সমতা এবং আয়ের বৃত্ত-স্রোতের ভারসাম্য

আমরা জানি—দেশের আয়-প্রবাহ থেকে নিষ্কাশন ঘটে (১) সঞ্চয়, (২) সরকারী কর এবং (৩) আমদানির ছিদ্র পথে। মোট নিষ্কাশন = সঞ্চয় + সরকারী কর + আমদানি। ধরা যাক W = নিষ্কাশন, S = সঞ্চয়, T = কর, M = আমদানি, তাহলে আমরা পাই—

$$W = S + T + M \cdots \quad \cdots \quad (2)$$

আমরা জানি S, T এবং M সকলেই দেশের আয়-স্তর Y-এর উপর নির্ভর করে। Y বাড়লে S, T ও M বাড়ে, কাজেই Y বাড়লে W বাড়ে। বিপরীত পক্ষে Y কমলে W কমে। W এবং Y-এর মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক থেকে আমরা একটি নিষ্কাশন রেখা WW_0 অঙ্কন করতে পারি। এই রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হবে। আমাদের রেখাচিত্রে WW_0 হল নিষ্কাশন রেখা।

উপরের রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে E বিন্দুতে WW_0 রেখা ও JJ_0 রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। অতএব E বিন্দুতে W = J হয়েছে এবং আয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য দেখা দিয়েছে। E বিন্দুর ডানদিকে WW_0 রেখাটি JJ_0 রেখার উপরে আছে। কাজেই এখানে W > J। এখানে আয় কমবে। বামমুখী তীর এঁকে এটি দেখানো

হয়েছে। আবার E বিন্দুর বামদিকে $W<J$ অর্থাৎ অনুপ্রবেশ বেশি। আয় বাড়বে। দক্ষিণমুখী তীর এঁকে এটি দেখানো হয়েছে।

এই ভারসাম্যের শর্ত : অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন একই সঙ্গে ঘটলে আয়ের বৃত্ত-স্রোতে ভারসাম্য দেখা দেবে যদি (১) অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন সমান হয়। অর্থাৎ যে বিন্দুতে অনুপ্রবেশ রেখা ও নিষ্কাশন রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে সেই ছেদবিন্দুতে ভারসাম্য হবে এবং (২) সেই ছেদবিন্দুর ডানদিকে নিষ্কাশন অনুপ্রবেশের চেয়ে বেশি হবে এবং বামদিকে কম হবে। এখানে (১) নং শর্তটি হল প্রয়োজনীয় শর্ত এবং (১) নং ও (২) নং শর্ত দুটি নিয়ে গঠিত হয় যথেষ্ট শর্ত (Sufficient condition).

এখন প্রথম শর্তটির আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা জানি, $W=S+T+M$ এবং $J=I+G+X$। অতএব ভারসাম্যের প্রথম শর্ত অনুযায়ী

$$S+T+M=I+G+X$$

এই শর্তটি পালিত হবে যদি $S=I$, $T=G$ এবং $M=X$ হয়, কিংবা যদি S, T ও M একসঙ্গে I, G ও X-এর সঙ্গে সমান হয়। $S=I$ বলতে বোঝায় সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান; $T=G$ বলতে বোঝায় সরকারের কর-রাজস্ব ও সরকারী ব্যয় সমান (অর্থাৎ বাজেটে ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত নেই) এবং $M=X$ বলতে বোঝায় দেশ রপ্তানি করে যে আয় পায় তাই দিয়ে আমদানি করে (দেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোন উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি নেই)। S থেকে নিষ্কাশন এবং I থেকে অনুপ্রবেশ হয়। $S=I$ হলে বোঝায় সমাজ সঞ্চয়ের মাধ্যমে যে অর্থ নিষ্কাশন করে, বিনিয়োগের মাধ্যমে সেই অর্থকেই আবার সমাজ শরীরে অনুপ্রবিষ্ট করে।

অনুরূপভাবে সরকার কর আদায় করে আয়ের যে নিষ্কাশন ঘটান, সেই অর্থ ব্যয় করে আবার সমাজ শরীরে চালান করে দেন এবং দেশ রপ্তানির মাধ্যমে যে আয় পেয়ে থাকে সেটি অনুপ্রবিষ্ট হয় দেশের শরীরে কিন্তু সমান পরিমাণ আমদানির দ্বারা সেই অনুপ্রবিষ্ট অর্থই যেন আবার বেরিয়ে যায় সমাজ শরীর থেকে। যার ফলে আয়স্তর অপরিবর্তিত থাকে।

আবার S ও I, T ও G এবং M ও X পারস্পরিকভাবে সমান না হলেও আয়ের বৃত্ত-স্রোতে ভারসাম্য থাকতে পারে যদি সব অনুপ্রবেশের যোগফল সব নিষ্কাশনের যোগফলের সমান হয়। প্রত্যেকটি বিষয় এককভাবে সমান না হলেও যোগফলে এই সমতা থাকতে পারে। একটি বিষয়ের বৃদ্ধি অন্য বিষয়গুলির হ্রাস দ্বারা পূরণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা পাই—

$$S+T+M=I+G+X$$

পক্ষান্তর করে পাই $S-I=(G-T)+(X-M)$

এখানে $S-I=$ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ব্যবধান (Saving-Investment Gap), $G-T=$ সরকারের ব্যয় − সরকারের আয় = বাজেটের ঘাটতি (Budget deficit),

X – M = রপ্তানি – আমদানি = বাণিজ্য থেকে দেশের উদ্বৃত্ত (Trade surplus), তাহলে আমরা পেলাম – আয়ের বৃত্ত-স্রোতের ভারসাম্যের শর্ত হল এই যে—

দেশের সঞ্চয় – বিনিয়োগ-ব্যবধান = বাজেটের ঘাটতি + বাণিজ্য থেকে উদ্বৃত্ত ;

এখানে S – I = নীট নিষ্কাশন, (G – T) + (X – M) = সরকারী ক্ষেত্র ও বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত নীট অনুপ্রবেশ।

তাহলে আমরা পেলাম আয়ের বৃত্ত-স্রোতের ভারসাম্যের জন্য—

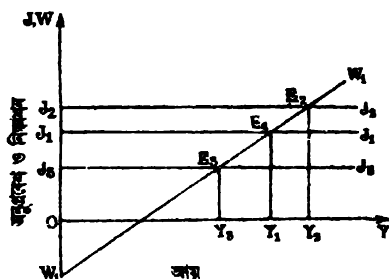
দেশের বাস্তব বাজারের নীট নিষ্কাশন দেশের সরকারী ক্ষেত্র ও বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত নীট অনুপ্রবেশের সমান হবে।

১২.৫ অনুপ্রবেশ বা নিষ্কাশনের পরিবর্তন হলে আয়-স্তরের কী পরিবর্তন হতে পারে ?

(ক) অনুপ্রবেশের পরিবর্তন (বৃদ্ধি বা হ্রাস) এবং আয়স্তর :

যদি অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন পরস্পর সমান হয় তাহলে দেশের আয়স্তরে ভারসাম্য থাকবে।

ধরা যাক প্রথমে অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন পরস্পর সমান ছিল। পরে কোন এক সময়ে কোন অজ্ঞাত কারণে মোট অনুপ্রবেশের বৃদ্ধি হল। এর ফলে অনুপ্রবেশ রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে উঠে যাবে। এর ফলে আয়ের ভারসাম্যের কিরূপ পরিবর্তন হবে তা পাশের রেখাচিত্রে দেখানো হল।



১২.৪ রেখাচিত্র : অনুপ্রবেশের পরিবর্তন ও আয়ের স্তর

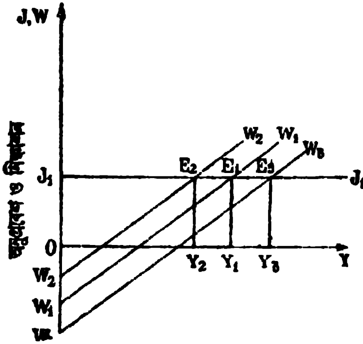
এই রেখাচিত্রে J_1J_1 হল প্রথম অনুপ্রবেশ রেখা এবং W_1W_1 হল প্রথম নিষ্কাশন রেখা। এখানে আয়ের স্তর OY_1. এবার ধরা যাক অনুপ্রবেশের বৃদ্ধি ঘটল এবং অনুপ্রবেশ রেখাটি হল J_2J_2. এখানে আয়ের স্তর বেড়ে হল OY_2, আবার অনুপ্রবেশ যদি হ্রাস পেয়ে যায়, তাহলে অনুপ্রবেশ রেখাটি হবে, ধরা যাক, J_3J_3. এখানে আয়স্তর কমে গিয়ে হবে OY_3.

তাহলে আমরা পাই—**অন্যান্য বিষয় যদি অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু অনুপ্রবেশের বৃদ্ধি ঘটে তাহলে আয়স্তর বাড়বে এবং অনুপ্রবেশ কমে গেলে আয়স্তরও কমবে।**

(খ) নিষ্কাশনের পরিবর্তন (বৃদ্ধি বা হ্রাস) এবং আয়স্তর :

কোন কারণে যদি দেশের নিষ্কাশনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহলে দেশের আয়-প্রবাহ থেকে বেশি আয় বেরিয়ে যাবে। আবার নিষ্কাশন কমে গেলে

কম আয় নিষ্কাশিত হবে। নিষ্কাশন বৃদ্ধি পেলে নিষ্কাশন রেখাটি সমান্তরাল ভাবে বাম ও উপর দিকে সরে যাবে ; নিষ্কাশন কমে গেলে নিষ্কাশন রেখাটি ডানদিকে ও নীচের দিকে সমান্তরালভাবে নেমে যাবে। তার ফলে আয়স্তরের কী পরিবর্তন হবে তা পাশের রেখাচিত্রে দেখানো হল।



১২.৫ রেখাচিত্র : নিষ্কাশনের পরিবর্তন ও আয়স্তর

এই রেখাচিত্রে J_1J_1 হল প্রথম অনুপ্রবেশ রেখা এবং W_1W_1 হল প্রথম ভারসাম্য বিন্দু E_1। আয়স্তর = OY_1. ধরা যাক নিষ্কাশন বাড়ল, ফলে W_2W_2 হল দ্বিতীয় নিষ্কাশন রেখা। এখানে আয়স্তর কমে হল $OY_2 < OY_1$, আবার নিষ্কাশন কমে গেলে নিষ্কাশন রেখাটি হবে W_3W_3 এবং আয়স্তর বেড়ে গিয়ে হবে $OY_3 > OY_1$।

তাহলে আমরা পাই—**অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে এবং নিষ্কাশনের বৃদ্ধি হলে আয়স্তর কমবে এবং নিষ্কাশন কমলে আয়স্তরও বেড়ে যাবে।**

প্রশ্নাবলী

১। অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন কাকে বলে? কোন্ কোন্ সূত্র থেকে অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা কর।

২। একই সঙ্গে অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন ঘটলে আয়ের বৃত্ত-স্রোতের ভারসাম্য কীভাবে বজায় থাকতে পারে—আলোচনা কর।

৩। অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশনের পার্থক্য কর। এদের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে জাতীয় আয়স্তরের কীরূপ পরিবর্তন হতে পারে আলোচনা কর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়	বাণিজ্য-চক্র

ভূমিকা : কোন দেশের আয়, উৎপাদন, কর্মনিয়োগের স্তর কিংবা অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে যদি বিভিন্ন বছরের তথ্য সংগ্রহ করা হয় তাহলে সেই তথ্যগুলিকে কালানুক্রমিক তথ্যপুঞ্জ (Time Series Data) বলা হয়। এখন রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে বিভিন্ন বছর বা কাল এবং উল্লম্ব অক্ষে সেই বিষয়টির পরিমাণ পরিমাপ করলে আমরা রেখাচিত্রে সেই পরিমাণগুলি ও কাল বসালে সেই বিষয়ের একটি কালানুক্রমিক রেখাচিত্র (Time Series Graph) পাব। এই লেখচিত্রটির দিকে তাকালেই দেখা যাবে সেই বিষয়ের পরিমাণের কালানুক্রমিক পরিবর্তনের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এদের একটি হল দীর্ঘকালীন গতি ধারা (Long-Term Trend) এবং অন্যটি হল তরঙ্গায়িত উত্থান-পতন (Fluctuations)। লেখচিত্রটি দেখলে মনে হয় সেই গতিধারার গায়ের উপর উত্থান-পতনের ঢেউগুলি যেন জড়িয়ে আছে। পরিসংখ্যান বিদ্যায় দেখানো হয়—কীভাবে এই দুটি পরিবর্তনকে আলাদা (Isolate) করা যায়। কোন বিষয়ের কালানুক্রমিক তথ্যপুঞ্জ থেকে আমরা যদি দীর্ঘকালীন গতিধারাকে বিশ্লিষ্ট করতে পারি, তাহলে সেই তথ্য-পুঞ্জের মধ্যে থাকবে কেবলমাত্র তরঙ্গায়িত উত্থান-পতন। এই উত্থান-পতন আবার দুরকমের হতে পারে—যথা, নিয়মিত (Regular) ও অনিয়মিত (Irregular)। অনিয়মিত উত্থান-পতনগুলি প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে ঘটতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন নিয়ম নেই, আগে থেকে তাদের ব্যাপার বিশেষ কিছুই জানা যায় না বলে এদেরকে আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাহলে থাকে কেবল-মাত্র নিয়মিত উত্থান-পতনগুলি। এই উত্থান-পতনগুলি আবার একটি বছরের বিভিন্ন ঋতুর মধ্যে ঘটতে পারে, কিংবা একাধিক বছরের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারে। এই দ্বিতীয় ধরনের উত্থান-পতনগুলিকেই চক্রাকার উত্থান-পতন (Cyclical Fluctuations) বলা হয়। এখন যে বিষয়টির উত্থান-পতনের কথা ভাবা হচ্ছে সেই বিষয়টি যদি আয়, উৎপাদন, কর্মনিয়োগ কিংবা এইরূপ কোন অর্থনৈতিক বিষয় হয়, তাহলে সেই চক্রাকার উত্থান-পতনকে বাণিজ্য-চক্র (Business cycle) বলা হয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে চক্রাকার উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। আগেকার দিনে পরিসংখ্যানবিদ্যার বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় বাণিজ্য-চক্র সম্বন্ধে মানুষের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। তবে সাধারণ ধারণা দিয়েও মানুষ বুঝতে পারত জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনেও জোয়ার-ভাটার খেলা চলে, সুসময় ও দুঃসময়গুলি পর্যায়ক্রমে

আসে যায়। পরে বাণিজ্য-চক্রের ধারণা আরো স্পষ্ট হয়েছে। এখন বোঝা গেছে— বাণিজ্য-চক্রের মধ্যে উত্থান-পতন ছাড়াও আরো অন্যান্য পর্যায় (Phase) থাকে। আমরা এখানে এই পর্যায়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

১৩.১ বাণিজ্য-চক্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য :—

(ক) **সংজ্ঞা :** কোন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে আয়, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, দামস্তর, মুনাফা প্রভৃতি বিষয়গুলির ক্ষেত্রে যে নিয়মিত ও চক্রাকার উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায় তাকে বাণিজ্য-চক্র বলা হয়। কোন কোন সময় আয়-উৎপাদন, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলির পরিমাণ ও বৃদ্ধির হার খুবই উচ্চস্তরে থাকে। দেশের অর্থনৈতিক জীবনে জোয়ার আসে। আবার কখন বা আয়, উৎপাদন, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলির পরিমাণ ও পরিবর্তনের হার খুবই নিম্নস্তরে থাকে। এটা হল অর্থনৈতিক জীবনে ভাটার টান। এইভাবে দেখা যায় একটি দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে কখনো খুব উচ্চাবস্থা (Booming conditions), আবার কখনো বা মন্দাবস্থা (Depressionary conditions) বিরাজ করে। কিন্তু কোন একটি অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, নানা কারণে সেই অবস্থাটির পরিবর্তন হয় এবং একটি বিপরীত অবস্থার উদ্ভব ঘটে। যেমন, দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে যে উচ্চাবস্থা দেখা দেয় তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, উচ্চাবস্থা এক সময় গড়িয়ে পড়ে মন্দাবস্থার দিকে। শুরু হয় অবনতি। সেই অবনতি একটি চরম বিপর্যয়ের দিকে অর্থনৈতিক কাজকর্মগুলিকে চালিত করে চরম মন্দাবস্থার সৃষ্টি করে। কিন্তু মন্দাবস্থাও চিরকাল থাকে না। কাল-প্রবাহে অর্থব্যবস্থার শরীরে আবার স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। শুরু হয় সেরে ওঠার কাল। এই অবস্থাটি ক্রমে তুঙ্গে ওঠে। দেখা দেয় চরম সমৃদ্ধি। কিন্তু কালক্রমে সেই সমৃদ্ধি আবার অবনতির ঢালে পা রাখে এবং বিপর্যয়ের দিকে গড়িয়ে পড়ে। অর্থনৈতিক কাজকর্মের এই ওঠানামাকে আমরা চক্রাকার উত্থান-পতন বলে থাকি। আবার অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, এই উত্থান-পতনের মধ্যে মোটামুটি একটি নিয়মানুবর্তিতা থাকে। চরম সমৃদ্ধি ও চরম বিপর্যয় হল বাণিজ্য-চক্রের উচ্চতম ও নিম্নতম বিন্দু। উচ্চতম বিন্দুকে চূড়ান্ত বিন্দু (Peak) বলা যেতে পারে। দেখা যায় বাণিজ্য-চক্রের দুটি পাশাপাশি চূড়ান্ত বিন্দুর সময়গত ব্যবধান মোটামুটি স্থির থাকে। অনুরূপভাবে বাণিজ্য-চক্রের নিম্নতম বিষয়গুলিও একটি নির্দিষ্ট কাল পর পর আসে। সেইজন্য বাণিজ্য-চক্রের উত্থান-পতনকে নিয়মিত (Regular) বলা হয়।

(খ) বাণিজ্য-চক্রের বৈশিষ্ট্য :—

বাণিজ্য-চক্রের সংজ্ঞা থেকেই এর বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে পাওয়া যায়। তবে আর দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা বাড়তি বলা যেতে পারে। তাছাড়া সংজ্ঞার মধ্যে

প্রচ্ছন্নভাবে বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ থাকে, সেগুলির স্পষ্ট উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। সেইজন্য আমরা বলতে পারি—বাণিজ্য-চক্রের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, বাণিজ্য-চক্র বলতে অর্থনৈতিক বিষয়ের উত্থান-পতনের চক্রাকার ধারাকে বোঝায়। অর্থনৈতি বিষয়গুলির মধ্যে আবার আয় (Income), উৎপাদন (Output), কর্মনিয়োগ (Employment), বিনিয়োগ (Investment), মুনাফা (Profit), দামস্তর (Price-level) ইত্যাদি প্রধান বিষয়গুলির কথাই ধরা হয়। বাণিজ্য-চক্রে দেখানো হয় বিভিন্ন বছরে এই বিষয়গুলির প্রত্যেকের ক্ষেত্রে কেমন ওঠানামা হয়েছে। এইভাবে আমরা আয়ের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-চক্র, উৎপাদনের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-চক্র, কর্মনিয়োগের ক্ষেত্রে বাণিজ্য-চক্র ইত্যাদি দেখতে পাই। অবশ্য সব অর্থনৈতিক বিষয়ের গতিবিধি যদি একই রকম হয়, সেক্ষেত্রেই সব বিষয়-গুলিকে একসঙ্গে ধরে অর্থনৈতিক কাজকর্মের বাণিজ্য-চক্রের কথা বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্য-চক্র হল কোন একটি অর্থনৈতিক বিষয়ের চক্রাকার উত্থান-পতন। চক্রটি যদি আয়-সম্পর্কিত হয় তাহলে বুঝতে হবে আয় কখনো একই অবস্থায় থাকে না। আয় কখনো বাড়ে, কখনো কমে। বাড়তে বাড়তে কখনো খুই উচ্চস্তরে এসে পেঁছায়। এটা হল আয়প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তুঙ্গী অবস্থা। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক এই অবস্থায় মধ্যে অবনতির বীজ উপ্ত হয়ে থাকে। সেই বীজ থেকে অবনতির পর্যায় মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেই অবনতি চলতে থাকে। আয় ক্রমাগত কমে যেতে থাকে। এরপর আয় একটি নিম্নতম স্তরে পেঁছায়। একেই বলা হয় চরম মন্দার বিন্দু। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক সেই মন্দাবস্থাও দীর্ঘকাল থাকে না। আয়ের উন্নতি শুরু হয়। এই উন্নতি থেকে আবার অবনতি, তার থেকে আবার মন্দা, উন্নতি ইত্যাদি পর্যায়গুলি ঘুরে ঘুরে আসে। আয় ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয়ের বাণিজ্য-চক্রের ক্ষেত্রেও এরকম হয়ে থাকে। অর্থাৎ পর্যায়ের ক্রমান্বয় হল বাণিজ্য-চক্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়ত, বাণিজ্য-চক্রে একাধিক পর্যায় থাকে। আমরা সহজেই চারটি পর্যায় দেখতে পাই যথা—সমৃদ্ধি বা উচ্চাবস্থা, অবনতি, বিপর্যয় বা মন্দাবস্থা এবং উন্নতি। এখানে সমৃদ্ধি বা উচ্চাবস্থার বিপরীত অবস্থা হল মন্দাবস্থা, অবনতির বিপরীত হল উন্নতি। তাহলে আমরা বলতে পারি—বাণিজ্য-চক্রের উপরের স্তরে থাকে সমৃদ্ধি ও অবনতি এবং নীচের স্তরে থাকে তাদেরই বিপরীত অবস্থা—মন্দা ও উন্নতি।

চতুর্থত, বাণিজ্য-চক্রের মধ্যে একটি স্বয়ংক্রিয়তার ভাব লক্ষ্য করা যায়। একটি পর্যায় থেকে আর একটি পর্যায়ের উদ্ভব ঘটে, মাঝে কোন ছেদ বা বিচ্ছিন্নতা থাকে না এবং মনে হয় আপনা থেকেই এরকম হচ্ছে। এই অবিচ্ছিন্ন স্বয়ংক্রিয়তা আমাদের জীবনচক্রেও (Life-cycle) দেখা যায়। একটি মানুষের জীবনে

শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়তা, বার্ধক্য প্রভৃতি পর্যায়গুলি একটির পর একটি আপনা থেকেই এসে পড়। বাণিজ্য-চক্রের মধ্যেও সমৃদ্ধি, অবনতি, মন্দা, উন্নতি প্রভৃতি পর্যায়গুলি এই ভাবেই একের পর এক আসতে পারে।

পঞ্চমত, বাণিজ্য-চক্রের যে-কোন একটি পর্যায় তার নিজস্ব গতিকে নিজেই ত্বরান্বিত করে। যখন উন্নতি শুরু হয়, তখন উন্নতি ক্রমাগতভাবে তীব্র হতে থাকে। অবশেষে উন্নতি সমৃদ্ধির অবস্থা রচনা করে। সমৃদ্ধি আবার চরম সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যায়। অনুরূপভাবে অবনতি শুরু হলে ক্রমশ অবনতির তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং মন্দাবস্থার উদ্ভব ঘটে। সেই মন্দাবস্থা আবার চরম বিপর্যয় বা সংকটের বিন্দুতে পৌঁছায়।

ষষ্ঠত, বাণিজ্য-চক্রের মধ্যে একটি নিয়মানুবর্তিতা লক্ষ্য করা যায়। সমৃদ্ধির একটি চূড়ান্ত বিন্দু থেকে পরবর্তী চূড়ান্ত বিন্দু পর্যন্ত যে কালগত ব্যবধান তা মোটামুটি স্থির থাকে। অনুরূপভাবে মন্দাবস্থার একটি নিম্নতম বিন্দু থেকে অপর একটি অনুরূপ বিন্দুর মধ্যবর্তী ব্যবধান সমান হয়। একটি মন্দাবস্থার নিম্নতম বিন্দু থেকে অপর মন্দাবস্থার নিম্নতম বিন্দু পর্যন্ত সময়-সীমার মধ্যে বাণিজ্য-চক্রগুলি তিনটি শ্রেণীতে পড়ে, যথা—(ক) স্বল্প পর্যায়ের চক্র (Short Trem Cycles), (খ) মধ্যম পর্যায়ের চক্র (Medium Term Cycles) এবং (গ) দীর্ঘ পর্যায়ের চক্র (Long Term Cycles)। সাধারণত স্বল্প পর্যায়ের চক্রগুলির ক্ষেত্রে ৩—৪ বছর পর পর এক একটি অবস্থার পুনরুদ্ভব ঘটে। মধ্যম পর্যায়ের চক্রগুলির ক্ষেত্রে এই পুনরুদ্ভবের কাল ৮—১০ বছরের হয় এবং তার চেয়ে বেশি ব্যবধানসম্পন্ন চক্রগুলিকে দীর্ঘ পর্যায়ের চক্র বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০—৬০ বছরের চক্রও দেখা যায় বলে অনেকে মনে করেন। কনড্রাতিয়েফ চক্র হল এরকম এক প্রকার সুদীর্ঘ পর্যায়ের চক্র।

সপ্তমত, বাণিজ্য-চক্রের যে-কোন একটি ঢেউ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে এর একটি ভিত্তি থাকে। সেই ভিত্তি থেকে ঢেউ-এর শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত একটি সরলরেখা অঙ্কন করলে আমরা একটি ঢেউ-এর উচ্চতার হিসেব পাই। বাণিজ্য-চক্রের তাত্ত্বিক আলোচনায় বলা হয় যে—বাণিজ্য-চক্রের তরঙ্গশীর্ষের দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা ক্রমশ হ্রাস পেতে পারে। এর ফলে বাণিজ্য-চক্রের উত্থান পতন ক্রমশ মন্দীভূত হবে। অপরপক্ষে প্রত্যেকটি তরঙ্গের উচ্চতা তার ঠিক আগের তরঙ্গের উচ্চতার চেয়ে বেশি হতে পারে। এর ফলে বাণিজ্য-চক্রের উত্থান-পতন ক্রমশ তীব্রতর হতে পারে। আবার বাণিজ্য-চক্রের তরঙ্গগুলির উচ্চতা পরস্পর সমান হতে পারে। সেক্ষেত্রে বাণিজ্য-চক্রের উত্থান পতন একই মাত্রায় স্থির থাকতে পারে। বাস্তবে এগুলিকেই বাণিজ্য-চক্র বলা হয়। বাণিজ্য-চক্র যখন এরকম সমান উচ্চতার তরঙ্গ নিয়ে আবর্তিত হয় তখন আমরা বলি যে, বাণিজ্য-চক্রের উত্থান-পতনগুলি একটি ঊর্ধ্বতম (Ceiling) এবং একটি নিম্নতম সীমার (Floor) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

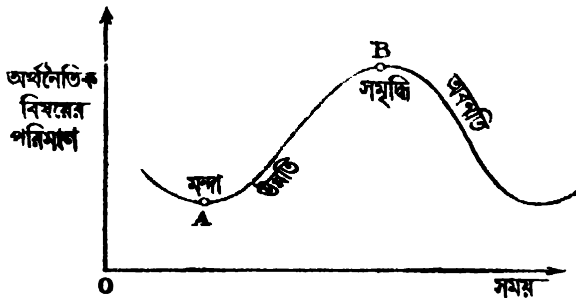
১৩.২ বাণিজ্য-চক্রের পর্যায়সমূহ (Phases of a Business Cycle)

কোন দেশের মোট আয়, উৎপাদন, কর্মনিয়োগ বা বেকারি, মুনাফা, বিনিয়োগ, দামস্তর প্রভৃতি বিষয়ের নিয়মিত উত্থান-পতনকে বাণিজ্য-চক্র বলা হয়। বাণিজ্য-চক্রের রেখাচিত্র অঙ্কন করলে দেখা যায় এর মধ্যে অনেক তরঙ্গায়িত উত্থান-পতন রয়েছে। একটি তরঙ্গের শীর্ষবিন্দু অথবা নিম্নতম বিন্দু থেকে পরবর্তী আর একটি তরঙ্গের শীর্ষবিন্দু বা নিম্নতম বিন্দু পর্যন্ত প্রসারকে ধরে একটি চক্র গঠিত হয়। এই চক্রের মধ্যে চারটি পর্যায় আবার বারবার ঘুরে আসে। যেহেতু বাণিজ্য-চক্র একটি ক্রমান্বয়ী ব্যাপার, কাজেই আমরা এই চারটি পর্যায়ের কোনটিকেই প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায় বলতে পারি না। তবে পর্যায়গুলির আলোচনা করতে হলে যে-কোন একটি পর্যায় দিয়েই শুরু করতে হবে। সেক্ষেত্রে সেই পর্যায়টিই হবে প্রথম পর্যায়। কিন্তু তার দ্বারা এই বোঝাবে না যে, সেই পর্যায়টিই সর্বপ্রথমে ঘটে এবং তার আগে কোন পর্যায় নেই। প্রথম পর্যায়ের আগেও পর্যায় থাকে এবং যে-কোন পর্যায়টিকেই আমরা প্রথম পর্যায় বলতে পারি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা যায় : যে-কোন দুটি বাণিজ্য-চক্র সমরূপ হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। তবে প্রত্যেক বাণিজ্য-চক্রের মধ্যেই চারটি পর্যায় দেখা যায়।

এই পর্যায় চারটি হল : (১) মন্দা (Depression)
(২) উন্নতি (Recovery)
(৩) সমৃদ্ধি (Boom)
(৪) অবনতি (Recession)

আমাদের ১৩.১ নং রেখাচিত্রে একটি কাল্পনিক বাণিজ্য-চক্র অঙ্কন করে তার বিভিন্ন পর্যায়গুলি দেখানো হয়েছে।

এখানে A বিন্দুটি হল বাণিজ্য-চক্রের নীচের দিকের দিক পরিবর্তনের বিন্দু



১৩.১ রেখাচিত্র : বাণিজ্য-চক্রের পর্যায়সমূহ

(Lower Turning Point), এখানে B বিন্দুটি হল উপরের দিক পরিবর্তনের বিন্দু

(Upper Turning Point). এখানে A বিন্দুতে অর্থনৈতিক কাজকর্ম একেবারে নিম্নস্তরে নেমে যায়। আয়, উৎপাদন, কর্মনিয়োগ একেবারে নিম্নস্তরে থাকে। সেইজন্য একে চরম মন্দা (Slump) বলা হয়। সেইরূপ B বিন্দু হল সমৃদ্ধির চূড়ান্ত বিন্দু বা শীর্ষবিন্দু (Peak)। এখানে সকল প্রকার অর্থনৈতিক কাজকর্ম উচ্চতম স্তরে প্রবাহিত হয়। A বিন্দুর ডানদিকে থাকে উন্নতির অংশ এবং B বিন্দুর ডানদিকে থাকে অবনতির অংশ। বাণিজ্য-চক্রের ঊর্ধ্বমুখী অংশে উন্নতি এবং নিম্নমুখী অংশে অবনতির পর্যায় থাকে। এখন আমরা প্রত্যেকটি পর্যায়ের সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি।

১। **মন্দা (Depression)**: মন্দা বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যখন দেশে বেকারি ভীষণভাবে বেড়ে যায়, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী যা উৎপাদন করতে পারে তার চেয়ে অনেক কম পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে। বাজারে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কম থাকে বলেই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উৎপাদন সংকুচিত করে। এর ফলে বেকারি বাড়ে। ভবিষ্যতে অবস্থার অবনতি হবে ভেবে অনেকে নতুন বিনিয়োগের ঝুঁকি এড়িয়ে চলে। এইভাবে বিনিয়োগ ও উৎপাদন কমে, মানুষের আয় কমে, দ্রব্যসামগ্রী কেনার ক্ষমতাও কমে যায়। অনেক দ্রব্য অবিক্রীত থাকে এবং অধিকাংশ দ্রব্যের দাম পড়ে যেতে থাকে। দাম কমে গেলেও লোকে প্রয়োজনমত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে না। এই সময় সুদের হারও কমে। কিন্তু তাতেও বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ আসে না। এই অবস্থাটাই ক্রমে একটি সঙ্কটের বা চরম বিপর্যয়ের দিকে গোটা দেশকে ঠেলে দেয়। তখন আমরা বলি—দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিম্নতম স্তরে এসে পৌঁছেছে।

২। **উন্নতি (Recovery)**: বাণিজ্য-চক্রে মন্দাবস্থার পরেই উন্নতির পর্যায় শুরু হয়। একে পুনর্জীবনের পর্যায়ও বলা হয়। কিন্তু মন্দাবস্থায় সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক কাজকর্মের মৃত্যু ঘটেছে মনে করলেই একে পুনর্জীবন লাভের দশা (Revival) বলা যায়। যাহোক উন্নতির অবস্থায় দেশে আয়, উৎপাদন, কর্মনিয়োগ, বিনিয়োগ, মুনাফা প্রভৃতিতে মন্দাদশার শেষ হয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক শরীরে উন্নতি বা স্বাস্থ্যের চিহ্ন ফুটে উঠেছে বলে মনে হয়। বহুদিন রোগ ভোগ করার পর প্রায় মৃত্যুর দোর থেকে রোগী যখন ফিরে আসে তখন তার শরীরে আবার স্বাস্থ্যের চিহ্ন ফুটে ওঠে, এটাও তেমনি। মন্দাবস্থার সময় বিনিয়োগকারীরা নতুন বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয়। কিন্তু পুরানো ক্ষয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতিকে সরিয়ে নতুন কিছু যন্ত্র আনার জন্যও তারা বিনিয়োগ করে। এর ফলেই বিনিয়োগ কমতে কমতে একটা স্তরে এসে ঠেকে যার নীচে বিনিয়োগ নামতে পারে না। সেই বিনিয়োগ থেকেই পুনরুন্নতি শুরু হয়। কর্মনিয়োগ বাড়তে থাকে। আয় বাড়তে থাকে। তার ফলে বিক্রি-বাটাও একটু একটু করে বাড়ে। বিনিয়োগকারীরা হারানো উৎসাহ ফিরে পায়। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে আগে মন্দার সময় যে অতিরিক্ত

উৎপাদন ক্ষমতা অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল, তার সদ্ব্যবহার হতে থাকে। আগের বেকারিও কমতে শুরু করে। এইভাবে এই পর্যায়টি কাজ করতে থাকে। এই সময় জিনিসপত্রের দাম আর কমে না, হয়তো স্থির থাকে, কিংবা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করে। মুনাফার ক্ষেত্রেও সে রকম ঘটে।

৩। **সমৃদ্ধি (Boom)**ঃ সমৃদ্ধির অবস্থাটি হল চরম উন্নতির অবস্থা। এই সময় সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক কাজকর্ম তুঙ্গে থাকে। আয় ও উৎপাদন, কর্মনিয়োগ, বিনিয়োগ সব কিছুই আগের অবস্থার চেয়ে উচ্চতর অবস্থায় থাকে। উন্নতির অবস্থায় যার সূচনা ঘটে, সমৃদ্ধিতে তাই পূর্ণরূপ পায়। উন্নতির সময় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার ব্যবহার শুরু হয়। বেকার শ্রমিকদের আবার নিয়োগ করা হয়। এই অবস্থা চলতে চলতে একসময় আর কোন অব্যবহৃত ক্ষমতা থাকে না, কাজেই প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে চায় এবং তার জন্য তাদেরকে নতুন বিনিয়োগ করতে হয়।

বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বাড়ে। আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে। চাহিদা বাড়লে যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় এবং আরো বিনিয়োগ করার দরকার হয়। এই সময় শ্রমের চাহিদা খুব বেশী থাকে। মজুরীর হার বাড়তে থাকে। উৎপাদনের ব্যয়ও বাড়তে থাকে। আবার দ্রব্যের বাজারে দ্রব্যের চাহিদা যে হারে বাড়ে, দ্রব্যের যোগান সে হারে বাড়ে না। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দামও বাড়তে থাকে। ব্যয় এবং দাম বাড়ে কিন্তু উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিও হয় না, বরং লাভ বাড়তেই থাকে। ঋণের বাজারে ঋণের চাহিদা বেড়ে যায়। সুদের হার বাড়ে। কিন্তু তাতে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ কমে না।

৪। **অবনতি (Recession)**ঃ বাণিজ্য-চক্রের একটি ঢেউয়ের চূড়ান্ত বিন্দুর পরের অবস্থাকে অবনতির পর্যায় বলা হয়। এই পর্যায়ে আয় বা উৎপাদন, কর্মনিয়োগ, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয়গুলির বৃদ্ধির হার ক্রমশ কমতে থাকে। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাও কমে, এর পিছনে গড় ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার দুর্বলতা কাজ করে। কিন্তু যে ভাবেই হোক, ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কিংবা তার বৃদ্ধির হার একবার কমতে শুরু করলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা বাড়তে থাকে। ফলে বিনিয়োগ কমে, পুরানো বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীদের পুরানো হারে সুদ মেটাতে হয়। তাদের ক্ষতি হয় এবং আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ফলে বেকার সমস্যা তার বিশ্রী রূপ নিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। জিনিসপত্রের দাম কমতে থাকে। প্রতিষ্ঠানগুলির অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা জমতে শুরু করায় তারা ক্ষয়ে যাওয়া যন্ত্রপাতির বদলে নতুন যন্ত্র বসাতে পারে না।

১৩৩ বিনিয়োগের ত্বরণতত্ত্ব (Acceleration Theory of Investment) : ত্বরণ বলতে গতিবেগের বৃদ্ধিকে বোঝায়। এটি একটি আঙ্কিক ধারণা। আমরা জানি মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি বা বৃদ্ধির হারই হল বিনিয়োগ। কোন দেশের মোট মূলধন ভাণ্ডার যদি প্রথমে K পরিমাণে থাকে এবং পরে ΔK পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাহলে মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধির হার হল $\frac{\Delta K}{K}$. শতকরা হিসেবে এই হার হবে $\frac{\Delta K}{K}$. 100. তাহলে বিনিয়োগ হবে $I = \frac{\Delta K}{K}. \quad 100.$ এখানে বিনিয়োগ হল একটি হার, যে হারে দেশের মোট মূলধন ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। এখন কোন কারণে যদি এই বিনিয়োগের হারও বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে বিনিয়োগের ত্বরণ বলা হয়। যেমন, কোন দেশের মূলধন ভাণ্ডার যদি প্রত্যেক বছর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে বিনিয়োগের হার হবে ১০ শতাংশ ; এই হারের কোন পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধির হারের পরিবর্তনের হার (Rate of change of the rate of change of Capital Stock) হবে শূন্য। কিন্তু কোন কারণে যদি মূলধন ভাণ্ডার বৃদ্ধি পায় এবং সেই বৃদ্ধির হার যদি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলেই আমরা বলব যে, বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ত্বরণের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব **ত্বরণ হল মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধির হারের বৃদ্ধি।**

বিনিয়োগের ত্বরণতত্ত্বের মূল কথা যে, দেশের ভোগ্যসামগ্রীর চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে সেইসব ভোগ্যসামগ্রী উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পাবে এবং মূলধন দ্রব্যের চাহিদা ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির চেয়ে অনেক বেশি হবে। একটি সরল উদাহরণের সাহায্যে এটা বোঝানো যায়। আমরা জানি কোন নির্দিষ্ট মূল্যের একটি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করার জন্য তার চেয়ে বহুগুণ বেশি মূল্যের যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় ; যেমন, একটি ১০০ টাকার জামা তৈরি করতে একটি ১,০০০ টাকার সেলাই মেসিন লাগতে পারে। এর কারণ একটি সেলাই মেসিন বহুদিন থাকে এবং তার সাহায্যে বহু জামা তৈরি করা যায়। যা হোক, একটি জামার ক্ষেত্রে সেলাই মেসিনের দাম ও জামার দামের অনুপাতটি একের চেয়ে বেশি হবে। এই অনুপাতকে বলা হয় মূলধন ও উৎপাদনের অনুপাত (Capital. Output Ratio). আমাদের উদাহরণে জামার ক্ষেত্রে এই অনুপাতটি হল ১০০০ : ১০০ অথবা ১০ : ১ অথবা ১০। এখন যদি এই অনুপাত স্থির থাকে তাহলে ৫০০ টাকার জামা তৈরি করতে ৫,০০০ টাকার সেলাই মেসিন লাগবে। এর থেকে বোঝা যায় জামা নামক ভোগ্য-দ্রব্যের চাহিদা যদি ১% বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেলাই মেসিন নামক মূলধন দ্রব্যের চাহিদা ১০% বাড়বে।

কিন্তু এর সঙ্গে আর একটি ব্যাপার জড়িত আছে। সেটি হল অবচয়ের হার ও অবচয় পূরণের জন্য নূতন যন্ত্রের চাহিদা। সেটা ধরলে বিনিয়োগ আরো অনেক

বেশি হবে। ধরা যাক, কোন দেশে এই অবচয়ের গড় হার হল ১০%। অর্থাৎ দেশের মোট মূলধনের ১০ শতাংশ প্রতি বছর ক্ষয়ে যায়। ধরা যাক, দেশে ৫,০০০ টাকার যন্ত্র আছে। তাহলে ৫,০০০ টাকার ১০ শতাংশে, অর্থাৎ ৫০০ টাকার যন্ত্র প্রত্যেক বছর নতুন বসাতে হবে পুরানো ক্ষয়প্রাপ্ত যন্ত্রের পরিবর্তে। এখন ধরা যাক, ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ আগে ছিল ৫০০ টাকার, এখন বেড়ে হল ৫৫০ টাকার। অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ৫০০ টাকাতে ৫০ টাকা বাড়ল, অর্থাৎ ১০০ টাকাতে ১০ টাকা বাড়ল। এই ১০ শতাংশ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির জন্য নতুন যন্ত্র আনতে হবে ৫০০ টাকার (মূলধন ও উৎপাদনের অনুপাত ১০ ধরে)। তাহলে অবচয় পূরণের জন্য ৫০০ টাকার এবং ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণের জন্য ৫০০ টাকার—মোট ১,০০০ টাকার যন্ত্র আনতে হবে। অর্থাৎ মূলধন দ্রব্যের চাহিদা ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ১,০০০ টাকা হবে, অর্থাৎ মূলধনের চাহিদা বাড়বে ১০০ শতাংশ। এইভাবে দেখা যায় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে মূলধনের চাহিদা ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এটাই হল ত্বরণ।

এই ত্বরণতত্ত্বে দেখানো হয় মূলধনের চাহিদা কেমনভাবে পরিবর্ধিত (Magnified) হয়। মূলধনের নিজস্ব কোন চাহিদা নেই। মূলধনের চাহিদার উদ্ভব ঘটে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা থেকেই। সেইজন্য মূলধনের চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা (Derived demand) বলা হয়। ত্বরণতত্ত্বে দেখানো হয় কীভাবে এই উদ্ভূত চাহিদার পরিবর্ধন (Magnification of Derived Demand) ঘটে থাকে।

ত্বরণতত্ত্বের ত্রুটি ঃ এই তত্ত্বটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আছে।

(১) এটি অনেকগুলি অনুধারণার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এই অনুধারণাগুলির কয়েকটি অবাস্তব।

(২) যেমন, এতে ধরা হয় যে, ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়লেই বিনিয়োগকারীরা নতুন যন্ত্র বসাবে। তা না হতেও পারে। যদি প্রতিষ্ঠানগুলির অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা থাকে, তাহলে তারা সেই ক্ষমতার ব্যবহার করে অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করবে। তার জন্য নতুন যন্ত্র বসানোর প্রয়োজন বোধ করবে না। ত্বরণতত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, প্রতিষ্ঠানগুলির কোন অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা নেই।

(৩) আবার, মূলধনের পরিবর্তে অন্য উপাদান যেমন, শ্রম ব্যবহার করেও অতিরিক্ত ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়বেই বলা যাবে না। ত্বরণতত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, মূলধন ও উৎপাদনের অনুপাতটি অপরিবর্তনীয়, অর্থাৎ শ্রম ও মূলধনের মধ্যে কোন পরিবর্ততা চলে না।

(৪) তবে এই তত্ত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হল এই যে, এটি বিনিয়োগের কারিগরিক দিকের প্রতি বেশি দৃষ্টি দেয়, নতুন বিনিয়োগ থেকে লাভ হবে, কি লোকসান হবে সে সম্বন্ধে কোন ভাবনা-চিন্তা করে না। কিন্তু আমরা জানি, বিনিয়োগকারীরা লাভের আশা থাকলেই বিনিয়োগ করে। এরজন্য মূলধন বা বিনিয়োগের প্রান্তিক দক্ষতা, সুদের হার ইত্যাদি সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিতে হয়।

(৫) পরিশেষে বলা যায়—এই তত্ত্ব নতুন বিনিয়োগের কথা বলে, কিন্তু সেই বিনিয়োগের জন্য অর্থের সংস্থান কীভাবে হবে সে সম্বন্ধে একেবারেই নীরব থাকে।

১৩.৪ বাণিজ্য-চক্রের ব্যাখ্যা ঃ

বাণিজ্য-চক্রের মধ্যে থাকে (ক) অবস্থার ক্রমান্বয়ী পরিবর্তন (Cumulative development), (খ) ঊর্ধ্বসীমা (Ceiling) ও নিম্নসীমা (Floor) এবং (গ) বাণিজ্য-চক্রের দিক পরিবর্তনের বিন্দুগুলি (Turning points)। বাণিজ্য-চক্রের ব্যাখ্যায় এদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়, দেখা হয় কীভাবে বাণিজ্য-চক্রের ঊর্ধ্বগতি কিংবা নিম্নগতি একবার আরম্ভ হলে আপন গতিতে চলতে থাকে। কেনই বা সমৃদ্ধি বা মন্দা দীর্ঘস্থায়ী না হয়ে বিপরীত অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং কীভাবে দিক পরিবর্তনের বিন্দুগুলির উদ্ভব হয়।

(ক) **ক্রমান্বয়ী পরিবর্তনের ব্যাখ্যা ঃ**—বাণিজ্য-চক্রে দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উত্থান কিংবা পতন একবার শুরু হলে আপন গতিতে তা চলতে থাকে। একে ক্রমান্বয়ী পরিবর্তন বলা হয়। এর একাধিক কারণ থাকতে পারে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) গুণকের ভূমিকা, (২) বিনিয়োগের ত্বরণের ভূমিকা, (৩) ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা এবং (৪) পূর্ব নির্ধারিত আর্থিক সুদের ভার।

প্রথমত, গুণক প্রক্রিয়ার দ্বারা বাণিজ্য-চক্রের যে-কোন একটি অবস্থার গতি ত্বরান্বিত হয়। যেমন—উন্নতির অবস্থা শুরু হলে কিছু বেকার শ্রমিকের নিয়োগ হয়। তাদের আয় বাড়ে, ভোগব্যয় বাড়ে, উৎপাদন ও সাধারণ কর্মনিয়োগ স্তরও বৃদ্ধি পায়। অবনতির সময় এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। তখন বেকারি বাড়ে, ভোগব্যয় কমে, উৎপাদন কমে।

দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগের ত্বরণের ফলেও বাণিজ্য-চক্রের যে-কোন একটি অবস্থার গতি ত্বরান্বিত হয়। উন্নতির সময় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর জন্য নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে বিনিয়োগ বহুগুণ বেড়ে যায়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে আবার আয় বাড়ে, ফলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাও বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য অনেক বেশি মূল্যের মূলধন বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। এইভাবে ত্বরণের মাধ্যমে উন্নতির গতি ত্বরান্বিত হয়। অবনতির সময় এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। তখন ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা যতটুকু কমে তার চেয়ে অনেক বেশি কমে বিনিয়োগ। বিনিয়োগের এই অস্থিতিশীলতাই বাণিজ্য-চক্রের গতিকে ত্বরান্বিত করে।

তৃতীয়ত, ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশাও বাণিজ্য-চক্রকে ত্বরান্বিত করে। উন্নতির সময় ব্যবসায়ীদের আশা হয় যে, ভবিষ্যতে অবস্থার আরো উন্নতি হবে। সেই আশায় তাঁরা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেন। বিনিয়োগ বাড়লে আয় বাড়ে, আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে এবং বিনিয়োগকারীদের আশা ফলবতী হয়। অপরপক্ষে অবনতির সময় ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করেন যে, ভবিষ্যতে অবস্থা আরো খারাপ হবে। তাঁরা

বিনিয়োগ কমিয়ে দেন। ফলে আয় কমে, ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমে এবং বিনিয়োগ কমে যায়।

চতুর্থত, বিনিয়োগকারীরা নির্দিষ্ট সুদের চুক্তিতে দীর্ঘ বা মধ্যম মেয়াদী ঋণ নেন। উন্নতির সময় জিনিসপত্রের দাম বাড়ে। শ্রমিকদের মজুরী এবং অন্যান্য ব্যয় বাড়ে, কিন্তু সুদের জন্য ব্যয় পূর্বচুক্তিমত স্থির থাকে। ফলে বিনিয়োগকারীদের লাভ বেড়ে যায়। তাঁরা লাভের আশায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেন। অপরপক্ষে অবনতির সময় জিনিসপত্রের দাম কমে কিন্তু সুদের হার সমান থাকে। ফলে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি হয়। তাঁরা বিনিয়োগ কমিয়ে দেন।

(খ) ঊর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমার ব্যাখ্যা :—বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধি বা মন্দা কোনটাই অনন্ত হতে পারে না। সমৃদ্ধির একটি ঊর্ধ্বসীমা (Ceiling) থাকে এবং মন্দা ও অবনতিরও একটি নিম্নসীমা (Floor) থাকে। এই দুটি সীমার মধ্যে বাণিজ্য-চক্রের উত্থান-পতনগুলি সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণত পূর্ণ কর্ম নিয়োগ অবস্থাই ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও দেখা যায় বিনিয়োগ কমতে কমতে অবচয় স্তরে এসে ঠেকে, তার নীচে যেতে পারে না। উন্নতির সময় আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, কিন্তু শ্রম বা অন্য সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ হয়ে গেলে আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধির অবকাশ আর থাকে না। কাজেই সেখানেই ঊর্ধ্বগতি রুদ্ধ হয়, এবং সেই ঊর্ধ্বসীমায় ধাক্কা খেয়ে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নীচের দিকে নামতে থাকে। শুরু হয় অবনতির দশা। তখন বিনিয়োগ কমে, আয় ও উৎপাদন কমে। অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিনিয়োগ কখনই শূন্যের কোঠায় নেমে যেতে পারে না। পুরানো মূলধন দ্রব্যের একটি অংশ নিয়মিতভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং তাদের জায়গায় নতুন যন্ত্রপাতি আনতে হয়। তখন আয় খুব কমে যায়, কিন্তু বিনিয়োগ অবচয় পূরণের স্তরে নেমে গেলেও শূন্য হয় না। অর্থাৎ বাণিজ্য-চক্রের নিম্নগতির একটি নিম্নতম সীমা থাকে।

(গ) দিকপরিবর্তনের বিন্দুগুলির ব্যাখ্যা :—বাণিজ্য-চক্রে দুটি দিক-পরিবর্তনের বিন্দু থাকে—একটি উপরের বিন্দু, অপরটি নীচের বিন্দু। উপরের বিন্দুতে আয় বা উৎপাদন সর্বোচ্চ মাত্রায় এসে পেঁছায়, কাজেই সেখানে আয় বা উৎপাদনের পরিবর্তনের হার শূন্য। ত্বরণতত্ত্ব অনুযায়ী আয় পরিবর্তনের হার শূন্য হলে বিনিয়োগ শূন্য হবে। এটি সহজেই বোঝানো যায়। ধরা যাক, K = মূলধন, Y = আয়, I = বিনিয়োগ এবং b = মূলধন ও আয়ের অনুপাত।

তাহলে আমরা পাই $\frac{K'}{Y} = b$ অর্থাৎ $K = bY$ অর্থাৎ $\Delta K = b\Delta Y$.

(Δ দ্বারা বৃদ্ধি বোঝায়)

$I = b\Delta Y$. (এখানে ΔK = অতিরিক্ত মূলধন = বিনিয়োগ ধরা হয়েছে) যেখানে আয়ের কোন বৃদ্ধি নেই, সেখানে $\Delta Y = 0$, কাজেই সেখানে $I = b \times 0 = 0$ হবে। অতএব বাণিজ্য-চক্রের সমৃদ্ধির চূড়ান্ত বিন্দুতে নতুন বিনিয়োগ শূন্য। এর ফলে

আয় কমবে এবং গুণক প্রক্রিয়ার দ্বারা আয়ের হ্রাস বেশি হবে। এইভাবে গুণক ও ত্বরণের মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) ফলে বাণিজ্য-চক্রের উপরের দিক পরিবর্তন বিন্দুর ব্যাখ্যা করা যাবে।

আয় যদি ক্রমাগত কমতে থাকে তাহলে এক সময় বাণিজ্য-চক্রের ঢেউ গড়িয়ে পড়বে ভূমিতলের নিম্নসীমায়। কিন্তু তখন অবচয় পূরণের জন্যও নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। এর থেকেই শুরু হবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হবে আয় ও উৎপাদনের পুনরুজ্জীবন। এটাই হল নীচের দিক-পরিবর্তন বিন্দুর ব্যাখ্যা।

১৩.৫ বাণিজ্য-চক্রের তত্ত্ব :

অর্থনৈতিক কাজকর্মের মধ্যে কেন উত্থান-পতন দেখা দেয়, কেন সবকিছু চিরকাল সমান তালে চলে না, সে কথা নিয়ে অনেক দিন ধরেই অর্থনীতিবিদরা ভাবনা-চিন্তা করে আসছেন। এর ফলে বহু তত্ত্বে জন্ম হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, বাণিজ্য-চক্র এখন একটি পৃথক বিষয়, যার উপর বহু আলোচনা রয়েছে। তাদের সার-সংক্ষেপ প্রকাশ করতে হলে অনেকখানি জায়গার প্রয়োজন। আমাদের পাঠ্যপুস্তকের স্বল্প পরিসরে আমরা মাত্র তিনটি তত্ত্বের আলোচনা করব। এই তত্ত্বগুলি হল : (১) হট্রের তত্ত্ব (২) কীন্‌সের তত্ত্ব এবং (৩) হিক্সের তত্ত্ব। এত তত্ত্বের মধ্যে এই তিনটি তত্ত্বকে বেছে নেওয়ার কারণ হল এগুলি যথার্থ অর্থনৈতিক তত্ত্ব। বাণিজ্য-চক্র নামক অর্থনৈতিক বিষয়কে দেশের ভিতরকার ঘটনা দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে এই তত্ত্বগুলিতে।

১। হট্রের তত্ত্ব (Theory of Hawtrey)

হট্রের মতে বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটানোয় যাদের কার্যকলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (ক) পাইকারি ব্যবসায়ীরা (খ) উৎপাদক-গণ এবং (গ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ। পাইকারি ব্যবসায়ীরা উৎপাদকের কাছ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে মজুত করে রাখে এবং সেই মজুত থেকে খুচরো ব্যবসায়ীদের চাহিদা মতো দ্রব্যের যোগান দেয়। খুচরো ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের নিকট সেই দ্রব্য বিক্রয় করে। খুচরো ব্যবসায়ীদের চাহিদা মত দ্রব্য সরবরাহ করার জন্য পাইকারি ব্যবসায়ীরা বহু টাকার দ্রব্য মজুত করে রাখে। সাধারণত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার নিয়ে তারা এই মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি এই ঋণের উপর যে সুদ নেয় সেই সুদের উপর পাইকারি ব্যবসায়ীদের লাভ-লোকসান অনেকখানি নির্ভর করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার বাড়িয়ে দিলে পাইকারি ব্যবসায়ীদের সুদ বাবদ ঋণের ব্যয় বেড়ে যায়, লাভ কমে যায়। কাজেই তারা মজুত ভাণ্ডার কমিয়ে দেয়। পাইকারি ব্যবসায়ীরা মজুত ভাণ্ডার কমিয়ে দিলে উৎপাদকগণের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদাও কমে আসে। ফলে উৎপাদকগণ কম দ্রব্য উৎপাদন করে এবং তার জন্য কম উপাদান নিয়োগ করে। ফলে পরিবারগুলির

আয় কমে যায়। তাদের চাহিদাও কমে যায়। খুচরো ব্যবসায়ীদের বিক্রি-বাটা কম হয়। তারা পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কম মাল নেয়। পাইকারি ব্যবসায়ীরাও তাদের মজুত ভাণ্ডার কমিয়ে দেয় এবং উৎপাদকদের কাছে কম অরডার পাঠায়। উৎপাদকগণ উৎপাদন গুটিয়ে দেয়। এইভাবে সারাদেশে অবনতি ও মন্দা ছড়িয়ে পড়ে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের ঋণের উপর কী হারে সুদ ধার্য করবে এবং ঋণের যোগান স্বচ্ছন্দ রাখবে কিনা তার উপর পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাজকর্ম নির্ভর করে। পাইকারি ব্যবসায়ীদের চাহিদা কমে গেলে উৎপাদকদের উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে পরিবারগুলির আয় কমে যায়। তাদের চাহিদা কমে যায়। খুচরো ব্যবসায়ীদের বিক্রি কমে যায়। তারা পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কম মাল ক্রয় করে, এইভাবে চলতে থাকে। অপর পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার কমিয়ে দিলে পাইকারি ব্যবসায়ীরা তাদের মজুত বৃদ্ধি করবে। তারজন্য উৎপাদকদের কাছে বেশি করে অরডার পাঠাবে। উৎপাদকগণ সেই অরডার মত মাল যোগান দেবার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করবে। এর ফলে উৎপাদকগণ বেশি করে উপাদান নিয়োগ করবে। ফলে পরিবারগুলির আয় বাড়বে। তাদের চাহিদা বেড়ে যাবে। খুচরো ব্যবসায়ীদের বিক্রি বাড়বে। তারা পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বেশি মাল কিনবে। পাইকারি ব্যবসায়ীদের মজুত কমবে। মজুত বৃদ্ধির জন্য তারা উৎপাদকদের কাছে বেশি অরডার পাঠাবে। এইভাবে সারাদেশে অর্থনৈতিক কাজকর্মে জোয়ার আসবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে হট্রের তত্ত্বে ব্যাঙ্কসৃষ্ট ঋণের যোগান এবং সেই ঋণের উপর ধার্য সুদের হার—এই দুটি বিষয় অর্থনৈতিক কাজকর্মের উত্থান-পতন ঘটাতে সাহায্য করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কী পরিমাণ অর্থ ঋণ দিতে পারবে তা নির্ভর করছে তাদের অতিরিক্ত রিজার্ভের উপর। ধরা যাক কোন কারণে ব্যাঙ্কগুলির তহবিলে অতিরিক্ত রিজার্ভের সৃষ্টি হল। তারা সেই রিজার্ভ কমাতে চাইবে। তার জন্য তারা বেশি ঋণ দিতে চাইবে এবং সুদের হার কমাবে।

সুদের হার কম হলে পাইকারি ব্যবসায়ীদের পক্ষে মজুত বৃদ্ধি করা লাভজনক হবে। তাদের মজুতকে যদি কাঙ্ক্ষিত মজুত (Desired inventory) এবং প্রকৃত মজুত (Actual inventory)—এই দুভাগে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা বলতে পারি সুদের হার কমলে কাঙ্ক্ষিত মজুতের চেয়ে প্রকৃত মজুত কম হবে। কাজেই তারা মজুত বৃদ্ধি করবে। মজুত বৃদ্ধি করার অর্থ হল উৎপাদকের কাছে বেশি মাল পাঠাবার অরডার যাওয়া। এর ফলে উৎপাদন বাড়বে, আয় বাড়বে। দেশে সমৃদ্ধি দেখা দেবে।

কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘকাল চলতে পারে না। দেশে যত উৎপাদন, আয়, কর্ম-সংস্থান ইত্যাদি বাড়বে ততই নগদ টাকার চাহিদা (লেন-দেনজনিত চাহিদা) বাড়বে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির অতিরিক্ত রিজার্ভ শেষ হয়ে যাবে। আমানত-

কারীদের জন্য যতটুকু অর্থ না রাখলে চলবে না, তাদের কাছে সেই পরিমাণ অর্থ থাকবে। কাজেই তারা ঋণের হাত গুটিয়ে নেবে কিংবা সুদের হার বৃদ্ধি করবে। এর ফলে পাইকারি ব্যবসায়ীদের প্রকৃত মজুত কাঙ্ক্ষিত মজুতের চেয়ে বেশি হয়ে যাবে, কাজেই তারা মজুত হ্রাস করবে। উৎপাদকদের কাছে কম অরডার যাবে। তারা উৎপাদন কমাবে। ফলে আয় কমবে। এইভাবে অবনতি ও মন্দা চলতে থাকবে। দেশে নগদ টাকার চাহিদা কমবে। ব্যাঙ্কগুলির হাতে আবার অতিরিক্ত রিজার্ভ দেখা দেবে। তারা আবার ঋণ বৃদ্ধি করবে এবং এইভাবে চলতে থাকবে।

সমালোচনা :—(১) হট্রের তত্ত্বে ব্যাঙ্ক ঋণের সহজলভ্যতা ও সুদের হার বাণিজ্য-চক্র ঘটানোর ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসৃষ্ট ঋণগত অর্থের যোগান বাড়লে বা কমলে সমগ্র অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কাজকর্মে উত্থান-পতন দেখা দেয় হট্রের তত্ত্বের এই মূল বক্তব্যের জন্যই আমরা একে আর্থিক তত্ত্ব বলতে পারি। হট্রের মতে বাণিজ্য-চক্র হল পুরোপুরি একটি আর্থিক ব্যাপার (Purely monetary phenomenon । এর থেকে মনে হতে পারে যে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিই বাণিজ্য-চক্র ঘটায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেই বাণিজ্য-চক্র নিয়ন্ত্রিত হবে। অর্থাৎ বাণিজ্য-চক্র নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আর্থিক পদ্ধতি গ্রহণ করলেই যথেষ্ট হবে। বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন দেশের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। অতএব বাণিজ্য-চক্র কেবলমাত্র আর্থিক ঘটনা নয় এবং কেবলমাত্র আর্থিক পদ্ধতি গ্রহণ করে বাণিজ্য-চক্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতে পারে না।

(২) হট্রের তত্ত্বে পাইকারি ব্যবসায়ীদের উপর খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাইকারি ব্যবসায়ীরা যে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলে তার সঙ্গে সুদের হারের ওঠা-নামার সম্পর্ক আছে। কিন্তু সুদের হার কম হলেই যে পাইকারি ব্যবসায়ীরা তাদের মজুত ভাণ্ডার বাড়িয়ে দেবে এমন মনে করা চলে না। অবশ্য সুদের হার বেড়ে গেলে তারা হয়তো মজুত কমিয়ে দিতে পারে; সুদের হারের সঙ্গে মজুত ভাণ্ডারের একতরফা সম্পর্ক থাকতে পারে। দুদিকের সম্পর্ক নেই। কাজেই হট্রের তত্ত্ব বাণিজ্য-চক্রের পতন ব্যাখ্যা করতে পারলেও এর উত্থান বা ঊর্ধ্বগতির ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(৩) পাইকারি ব্যবসায়ীরা মজুত ভাণ্ডারের হ্রাস-বৃদ্ধি করে খুচরো ব্যবসায়ীদের চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি করে। খুচরো ব্যবসায়ীদের চাহিদার ওঠা-নামা হয় প্রকৃত ক্রেতাদের চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে। ক্রেতাদের চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি তাদের আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত। আয়ের পরিবর্তনকে যুক্ত করা উচিত উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে। উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে বিনিয়োগকারী উৎপাদকদের ব্যবসায়িক প্রত্যাশার (business expectations) উপর। হট্রের তত্ত্বে এই ব্যবসায়িক প্রত্যাশার কোন ভূমিকা নেই।

(৪) বাণিজ্য-চক্রের হট্রে বর্ণিত তত্ত্বে অর্থনৈতিক কাজকর্মের উত্থান-পতনের

ব্যাখ্যা হয়তো আছে, কিন্তু বাণিজ্য-চক্রের কোন উন্নত ব্যাখ্যা নেই। বাণিজ্য-চক্রে একটি চূড়ান্ত বিন্দু থেকে অন্য চূড়ান্ত বিন্দু পর্যন্ত সময়গত দূরত্ব প্রায় সমান থাকে। ঢেউগুলির নির্দিষ্ট উচ্চতা থাকে। বাণিজ্য-চক্রের ব্যাখ্যায় কালগত দূরত্ব ও উচ্চতা পরিমাপ করার উপায় বলা হয়। হট্রের তত্ত্বে তা আশা করাই যায় না।

(৫) হট্রের তত্ত্বে বাণিজ্য-চক্রের বিভিন্ন পর্যায় ধরে ধরে আলোচনা নেই। কোন্ পর্যায়ে পাইকারি ব্যবসায়ী, খুচরো ব্যবসায়ী, উৎপাদক ও ক্রেতাদের আচরণের পরিবর্তন কেমন হয় সে সম্বন্ধে কোন আভাস এই তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় না।

(৬) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের অসঙ্গতি দেশের আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করে এবং তার থেকে বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটতে পারে। হট্রের তত্ত্বে তার কোন আভাস নেই।

২। কীন্‌সীয়তত্ত্ব (Theory of Keynes)

লর্ড কীন্‌স বাণিজ্য-চক্রের কোন পৃথক তত্ত্ব রচনা করেননি। তবে তাঁর সাধারণ তত্ত্ব ও অন্যান্য রচনা থেকে জানা যায় যে—কীন্‌স অর্থনৈতিক কাজকর্মের উত্থান-পতনের জন্য (ক) মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা (MEC) (খ) প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (MPC) এবং (গ) বাণিজ্যিক প্রত্যাশার (business expectations) পরিবর্তনকে দায়ী করতে চান। কীন্‌সীয়তত্ত্বে বাণিজ্যিক প্রত্যাশাই অর্থনৈতিক কাজকর্মের গতি নির্ধারণ করে। ব্যবসায়ীরা যদি বাজার সম্বন্ধে খুবই আশাবাদী হয়ে ওঠে তাহলে কোন বিনিয়োগ থেকে তারা যে মুনাফা পাওয়ার প্রত্যাশা করে সেই প্রত্যাশা বৃদ্ধি পাবে। অন্যভাবে বলা যায়—এর ফলে ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের MEC বেড়ে যাবে। ফলে বিনিয়োগ বাড়বে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বাড়বে, কর্মসংস্থান বাড়বে, উৎপাদন বাড়বে। কিন্তু পরিবারগুলির আয় যে পরিমাণে বাড়বে তাদের ভোগব্যয় তার চেয়ে কম পরিমাণে বাড়বে (কারণ $MPC<1$)। এর ফলে দেশে অবিক্রীত দ্রব্যের মজুত বাড়বে। বিনিয়োগ কমবে। ঋণাত্মক গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান কমবে। শুরু হবে মন্দার প্রকোপ। আয় কমলে বিনিয়োগ কমে। কিন্তু বিনিয়োগের একটি নিম্নতম সীমা থাকে, যার নীচে বিনিয়োগ নেমে যেতে পারে না। বিনিয়োগ কমতে কমতে যখন নিম্নসীমায় এসে পৌঁছাবে তখন অবপূর্তির জন্যই বিনিয়োগের হার শূন্যস্তর থেকে উঠতে থাকবে। বিনিয়োগের এই উত্থান থেকে ব্যবসায়ীদের উজ্জ্বল প্রত্যাশার জন্ম হবে এবং অর্থব্যবস্থাটি আবার সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কীন্‌সের তত্ত্বে বিনিয়োগকারীদের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগকারীদের MEC কখনো বাড়ে, কখনো কমে এবং এর সঙ্গে তাল রেখে দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাটার খেলা চলে। বিনিয়োগের সঙ্গে হাত মেলায় গুণক প্রক্রিয়া। বিনিয়োগ বাড়লে আয় বাড়ে। বিনিয়োগ যত বাড়ে, আয় তার কয়েকগুণ বেশি বাড়ে। এই আয় বৃদ্ধির ফলে দুটি ঘটনা ঘটে।

প্রথমত, আয় বৃদ্ধির জন্য কেনাকাটা বেড়ে যায়। ফলে নগদ অর্থের চাহিদা বেড়ে যায়। অর্থ ধার দেওয়ার ইচ্ছা কমে যায়। এর ফলে সুদের হার বৃদ্ধি পায়। সুদের হার বেড়ে গেলে MEC হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, দেশের পরিবারগুলির MPC<1 হওয়ায় তাদের আয় যে পরিমাণে বাড়ে, তাদের ভোগব্যয় ঠিক সেই পরিমাণে বাড়ে না, তার চেয়ে কম পরিমাণে বাড়ে। ভোগব্যয় কম পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা কম বাড়ে: অথচ দ্রুত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন খুব বেশী বেড়ে যায়। এর ফলে অবিক্রীত দ্রব্যের মজুত ভাণ্ডার অবাঞ্ছিত-ভাবে বেড়ে যেতে থাকে। এর ফলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে নৈরাশ্য ছড়িয়ে পড়ে। তাদের MEC হ্রাস পায়।

MEC হ্রাস পাওয়ায় বিনিয়োগ কমবে। বিনিয়োগ কমলে আয় কমবে। দেশে মন্দা পরিস্থিতি ছড়িয়ে পড়বে। এই সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ঋণের যোগান বৃদ্ধি করার জন্য শিথিল আর্থিক নীতি প্রয়োগ করে তাহলেও কোন কাজ হবে না। কারণ কীনসের মতে বিনিয়োগ নির্ভর করে প্রথমত বিনিয়োগ-কারীদের প্রত্যাশার উপর। সুদের হার বা ঋণের সহজলভ্যতার সঙ্গে এর বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বিশেষ করে মন্দাবস্থার সময় সুদের হার আপনা থেকেই এত নীচে নেমে যায় যে, বলার নয়। তাতেও বিনিয়োগ উৎসাহিত হয় না। কাজেই সুদের হার কমিয়ে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। সুদের হার নিম্নতম স্তরে নেমে গেলে আর্থিক নীতির আর কিছু করার থাকেও না।

তাহলে কি মন্দাবস্থা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে? তা নয়। কীনসের মতে, বিনিয়োগের একটা নিম্নতম স্তর থাকে। স্থায়ী যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার জন্য সামান্য হলেও বিনিয়োগ থাকবেই। হ্রাস পেতে পেতে শূন্য স্তরে নেমে আসতে পারে। যেখানে অবপূর্তির জন্য যে বিনিয়োগ হবে তার মাধ্যমেই বিনিয়োগের পুনরুজ্জীবন ঘটবে। বিনিয়োগ বাড়তে থাকলে গুণক প্রক্রিয়াটি আবার জেগে উঠবে এবং দেশে উন্নতির বাতাস বইবে। এই অবস্থা ক্রমে সমৃদ্ধির চূড়ান্তবিন্দুর দিকে এগিয়ে যাবে। এইভাবে চক্রাকারে চলতে থাকবে।

মন্তব্য: কীনস যেহেতু স্পষ্টত বাণিজ্য-চক্রের কোন পৃথক তত্ত্ব নির্মাণ করেননি —কীনসের তত্ত্ব বলে যার আলোচনা করা হয় তা নিছক কীনসের উপর আরোপিত ধারণা মাত্র। কীনস অবশ্য তাঁর সাধারণ তত্ত্বে অর্থনীতি তত্ত্বের যে কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্ট আভাস দেন যে, MEC-র মধ্যে চক্রাকার ওঠা-নামার জন্যই অর্থব্যবস্থায় বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটে। MEC নির্ভর করে প্রধানত ব্যবসায়ীদের বাণিজ্যিক প্রত্যাশার উপর। এই ব্যাপারটি একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। কাজেই অনেকে মনে করেন কীনসের বাণিজ্য-চক্র তত্ত্বটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মাত্র।

কীনসের তত্ত্বে MEC সংক্রান্ত প্রত্যাশার ওঠা-নামার সঙ্গে তাল রেখে অর্থনৈতিক কাজকর্মে ওঠা-নামা দেখা দেয়। কিন্তু MEC সংক্রান্ত প্রত্যাশায় ওঠা-নামা কেন ও কীভাবে দেখা দেয় তার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

৩। হিক্সের তত্ত্ব (Theory of Hicks)*

অধ্যাপক হিক্সের তত্ত্বটি হল বাণিজ্য-চক্রের ত্বরণতত্ত্বের পরিমার্জিত রূপ। ত্বরণ-তত্ত্বে বলা হয় যে, দেশে মোট বিনিয়োগের হার (অর্থাৎ মূলধন ভাণ্ডার বৃদ্ধির হার) নির্ভর করে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির হারের উপর। স্যামুয়েলসনের অনুসরণে বলা যায়—জামার চাহিদা যত বাড়বে—ততই বাড়বে সেলাই কলের চাহিদা। কিন্তু জামার চাহিদা যত বৃদ্ধি পায় সেলাই কলের চাহিদা তার চেয়ে বহু বেশি বৃদ্ধি পায়। একেই বলা হয় মূলধন দ্রব্যের উদ্ভূত চাহিদার পরিবর্ধন (magnification of derived demand). কিন্তু কোন কারণে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদাবৃদ্ধির হার হ্রাস পেলে বিনিয়োগের হার দ্রুত হ্রাস পায়। ক্রমে বিনিয়োগের হার শূন্য হয়। কিন্তু বিনিয়োগের হার শূন্যের নীচে নামতে পারে না। কাজেই শূন্য নীট বিনিয়োগ স্তরে অবচয় পূরণের যে বিনিয়োগ হতে থাকে তার থেকেই বিনিয়োগের পুনরুজ্জীবন ঘটে। বিনিয়োগের হার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে থাকলে আয় বাড়ে। আয় বাড়লে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। তার জন্য বিনিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। এইভাবে বিনিয়োগের হারের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আয়, উৎপাদন, কর্ম-সংস্থান প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে উত্থান-পতন দেখা দেয়।

হিক্স তাঁর তত্ত্বে কয়েকটি অতিরিক্ত বিষয় যুক্ত করেন। প্রথমত, তাঁর মতে ভোগ্যদ্রব্য তৈরি করার জন্যই যে যন্ত্রের বা মূলধনের প্রয়োজন হয়, তা নয়। যন্ত্র তৈরি করতে হলেও যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ দেশের ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধন দ্রব্য উভয় প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করার জন্যই মূলধনের প্রয়োজন হয়। দেশের ভোগ্যদ্রব্য ও মূলধন দ্রব্যের সমষ্টিকে বলা হয় মোট উৎপাদন। কাজেই আমরা বলতে পারি—বিনিয়োগের হার ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর না করে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হারের উপর নির্ভর করে।

দ্বিতীয়ত, ত্বরণতত্ত্বে বিনিয়োগকে সর্বাংশে উদ্ভূত বিনিয়োগ (Induced Investment) বলে ধরা হয়। কিন্তু হিক্সের মতে মোট বিনিয়োগ হল উদ্ভূত বিনিয়োগ (Induced Investment) এবং স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ (Autonomous Investment). স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ আয় বা উৎপাদনের উপর নির্ভর করে না। উদ্ভূত বিনিয়োগ করে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, কারিগরিক অগ্রগতি প্রভৃতির ফলে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায়। আবার আয় বা উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

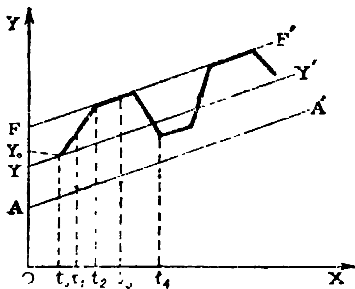
তৃতীয়ত, হিক্সের মতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি তাৎক্ষণিক (Instantaneous) নয়।

---

* হিক্সের তত্ত্বটি আলোচনা করার জন্য যে আঙ্কিক পদ্ধতির প্রয়োগ করতে হয়, বর্তমান আলোচনায় তার অবকাশ নেই। কাজেই এখানে হিক্সের তত্ত্বের মূল বক্তব্যটিকে সহজ ভাষায় উপস্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

যখনই উৎপাদন বাড়ে তখনই বিনিয়োগ বাড়ে না। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় কিছু সময় পর। একে সময়গত ব্যবধান (Time lag) বলা হয়।

চতুর্থত, হিক্স মনে করেন কোন দেশের আয় বা উৎপাদন কোন নির্দিষ্ট সময়ে তার পূর্ণ কর্মসংস্থার স্তরের উপরে উঠতে পারে না। পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তর আয় বৃদ্ধির উর্দ্ধসীমা (ceiling) নির্ধারণ করে। কোন দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে আয় বৃদ্ধি পাবে। অবশেষে আয় এসে ঠেকবে পূর্ণ-কর্মসংস্থান স্তরের সর্বোচ্চ সীমায়। সেখানে ধাক্কা খেয়ে বিনিয়োগ নামবে নীচে। আয় কমবে। উৎপাদন কমবে। বিনিয়োগ কমবে। কমতে কমতে বিনিয়োগ তার নিম্নতম সীমায় এসে ঠেকবে। এই সীমা হল যন্ত্রের অবপূর্তির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের নিম্নতম সীমা। বিনিয়োগ এই স্তরের নীচে নামতে পারবে না। এখানে বাণিজ্য-চক্রের অধোগতি ক্ষান্ত হবে। তারপর শুরু হবে বিনিয়োগের উর্ধ্বগমন। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে আয় ও উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরের সর্বোচ্চ সীমায় ঠেকবে। এইভাবে ক্রমাগত চলতে থাকবে। তাহলে আমরা বলতে পারি হিক্সের তত্ত্বে যে বাণিজ্য-চক্রের কথা বলা হয়েছে তা হল সীমাবদ্ধ (constrained) বাণিজ্য-চক্র। এটি মুক্ত চক্র (free cycle) নয়। এখন আমরা রেখাচিত্রের* সাহায্যে হিক্স বর্ণিত বাণিজ্য-চক্রের গতিপথ দেখাতে পারি।



চিত্র—১৩.২ : হিক্স-বর্ণিত বাণিজ্য-চক্র

এই রেখাচিত্রে AA′, YY′ এবং FF′ নামক তিনটি রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। AA′ রেখা দ্বারা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের পরিবর্তন, YY′ রেখা দ্বারা কেবলমাত্র স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ দ্বারা আয়-পরিবর্তনের গতিপথ দেখানো হয়েছে। FF′ রেখা দ্বারা পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে আয়ের গতিপথ দেখানো হয়েছে। হিক্স ধরেছিলেন যে, পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে আয় বৃদ্ধির হার স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের বৃদ্ধির হারের সমান হবে। ধরা যাক t_0 সময়ে দেশের আয় ছিল y_0. এক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন বিষয়গুলি (জনসংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটাবে। ফলে আয় বৃদ্ধি পাবে। উৎপাদন বাড়বে। ধরা যাক উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন অতিরিক্ত উৎপাদন শক্তি (Excess Capacity) নেই। তাহলে সেই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত

* এই রেখাচিত্রটি সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের বোঝার অসুবিধা হতে পারে; কারণ এটি Semi-logarithmic Scale. এ অঙ্কিত রেখাচিত্র। এর OX-অক্ষে সময় এবং OY-অক্ষে log Y এবং log I পরিমাপ করা হয়েছে। আয় (Y) এবং বিনিয়োগ (I) যখন বক্ররৈখিকভাবে বৃদ্ধি পায় তখন Log Y এবং Log I সরলরৈখিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কাজেই Log Y এবং Log I রেখাগুলি সরলরেখা হয়েছে।

বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। প্রথমে যে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বাড়বে তার ফলে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বাড়বে। তারপরে উদ্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঘটবে ত্বরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে আরো বিনিয়োগ হবে। এইভাবে t_3 সময়ে দেশটি পূর্ণ-কর্মসংস্থান স্তরে আয় বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমায় পেঁছাবে। এখানে কোন স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি না থাকায় মোট বিনিয়োগের হার পূর্বের তুলনায় কম হবে। বিনিয়োগের হার কমলেই উৎপাদন কমবে। বাণিজ্য-চক্রের নিম্নগতি শুরু হবে। উদ্ভূত বিনিয়োগ হ্রাস পেতে পেতে শূন্য স্তরে নেমে যাবে। t_4 সময়ে বাণিজ্য-চক্রের নিম্নতম বিন্দু দেখা দেবে। এর পর আবার ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য, সরকার কর্তৃক স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য এবং পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধির জন্য সরকারী ব্যবস্থার ফলে দেশের আয়বৃদ্ধিতে পুনরুজ্জীবন ঘটবে।

মন্তব্য: হিক্সের বাণিজ্য-চক্রের তত্ত্বে গুণক ও ত্বরণতত্ত্বের যে মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে তার দ্বারা বাণিজ্য-চক্রের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য এই তত্ত্বটি অন্য অনেক তত্ত্বের চেয়ে নিপুণতর। (১) কিন্তু এই তত্ত্বে যে পূর্ণ-কর্মসংস্থান সীমার কথা বলা হয়েছে তার ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নয় বলে অনেকে মনে করেন। (২) পূর্ণ কর্ম সংস্থার সীমাকে উৎপাদন বৃদ্ধির গতিধারা থেকে পৃথক করা হয়েছে; তাও বোধ হয় করা চলে না। আমরা যদি ধরে নিই যে, পূর্ণ কর্মসংস্থান সীমা মূলধন ভাণ্ডারের উপর নির্ভর করে তাহলে দেশে যত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে ততই এই সীমার উত্থান ঘটবে।

(৩) হিক্সের তত্ত্ব থেকে দীর্ঘকালীন গতিধারা (Trend) এবং অর্থনৈতিক কর্মের উত্থান-পতনকে পৃথক করা যায় না।

(৪) হিক্সের তত্ত্বে বাণিজ্য-চক্রকে কেবলমাত্র বাস্তব বিষয় দ্বারা প্রভাবিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এতে আর্থিক বিষয়ের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। অর্থের যোগান বিশেষ করে ঋণের যোগানের পরিবর্তন যে বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটাতে পারে হট্রের তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

তাছাড়া (৫) হিক্সের তত্ত্ব যেহেতু ত্বরণতত্ত্বকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে কাজেই এর ত্রুটিগুলি হিক্সের তত্ত্বকে দুর্বল করবেই।

(৬) পরিশেষে বলা যায় যে, হিক্সের তত্ত্ব প্রধানত আঙ্কিক তত্ত্ব। বাণিজ্য-চক্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এত বেশি অঙ্কের অবতারণা আলোচনাকে জটিল করে তোলে, অথচ মানব আচরণের গভীরতা ও বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয় না। কাজেই এই জটিলতা অনাবশ্যক।

পরিশিষ্ট: গুণক ও ত্বরণের সংঘাত (Interaction between the multiplier and the acceleration).

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যামুয়েলসনের মতে গুণক এবং ত্বরণ যখন একই সঙ্গে কাজ করে তখন তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় আয়ের গতিপথে উত্থান-

পতন দেখা দিতে পারে। কাজেই গুণক ও ত্বরণের সংঘাতের সাহায্যে আমরা বাণিজ্য-চক্রের ব্যাখ্যা করতে পারি।

স্বয়ম্ভুতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধি পেলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বেশি পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করতে হয়। তার জন্য অতিরিক্ত মূলধন চাই। অর্থাৎ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। এখন ভোগ্যদ্রব্যের তুলনায় যন্ত্রের মূল্য বেশি হওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা যত বাড়ে মূলধনের চাহিদা তার চেয়ে বহুগুণ বেশি বেড়ে যায়। একেই বলে মূলধনদ্রব্যের উদ্ভুত চাহিদার পরিবর্ধন বা ত্বরণ।

তাহলে আমরা পেলাম ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়। তার ফলে দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে, আয় বাড়ে। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। তার জন্য বিনিয়োগ বাড়ে। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুণক ও ত্বরণ প্রক্রিয়া আয় বৃদ্ধির হারকে ক্রমাগত ত্বরান্বিত করে দেয়। ব্যাপারটি রিলে রেসের মত। বিনিয়োগ বাড়লে গুণক প্রক্রিয়ার সাহায্যে আয় বাড়ে। আয় বাড়লে চাহিদা বাড়ে, ফলে বিনিয়োগ বাড়ে। দৌড়ের মশাল ত্বরণের হাতে চলে আসে। ত্বরণ থেকে গুণক এবং গুণকে থেকে ত্বরণে পর্যায়ক্রমিকভাবে আবর্তন চলতে থাকে। একে আমরা গুণক ও ত্বরণের সংঘাত বলতে পারি।

সাধারণ ধারণায় মনে হতে পারে যে. গুণক ও ত্বরণের মিলিত প্রভাবে দেশের উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ক্রমাগত বাড়তেই থাকবে। তাই যদি হয়-- তাহলে গুণক ও ত্বরণের সংঘাতের সাহায্যে বাণিজ্য-চক্রের ব্যাখ্যা করা যায় না। স্যামুয়েলসন দেখিয়েছেন—কোন্ কোন্ বিশেষ অবস্থায় গুণক ও ত্বরণের সংঘাতে আয়ের গতিপথে উত্থান-পতন দেখা দিতে পারে। আমরা এখন তার অনুসরণ করব।

স্যামুয়েলসনের মত হল যে, গুণক ও ত্বরণের মিলনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এদের একটি হল MPC, যাকে তিনি α বলেছেন। অপরটি হল ত্বরক (accelerator) বা β। দেশের মূলধনের মোট মূল্য ও মোট উৎপাদনের মূল্যের অনুপাতকে ত্বরক বা β বলা হয়। যেমন, কোন দেশে 100 টাকার ভোগ্যদ্রব্যের জন্য 500 টাকার যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় তাহলে ত্বরক বা $\beta=\frac{500}{100}=5$ হবে। সাধারণত MPC শূন্যের থেকে বড় এবং একের থেকে ছোট হয়। অর্থাৎ α হল একটি ধনাত্মক ভগ্নাংশ। কিন্তু β একের চেয়ে বড় হয়।

গুণকের দ্বারা কতটা আয় বৃদ্ধি ঘটবে তা α দ্বারা নির্ধারিত হয়। আমরা

জানি গুণক $= \frac{1}{1-\alpha}$. বিনিয়োগ যত বাড়বে আয় বাড়বে তার $1/1-\alpha$ গুণ। অপর পক্ষে ত্বরণের গতিবেগ β দ্বারা নির্ধারিত হয়। সহজ ভাষায় বলা যায়, হল পরিবারগুলির ভোগপ্রবণতা এবং β হল বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার। ভোগপ্রবণতা সাধারণত ভদ্র ও শান্ত ব্যাপার। বিনিয়োগ ব্যবহার কিন্তু খুবই অশান্ত ও চঞ্চল। কখনো খুব বেড়ে যায়। কখনো খুব কমে যায়। কাজেই গুণক ও ত্বরণ এক সঙ্গে মিলিত হলে যে আয় উৎপন্ন হবে তার স্বভাবের মধ্যে গুণকের শান্ত চরিত্র ও বিনিয়োগের চঞ্চলতা অনুপ্রবিষ্ট হবে। যদি বিনিয়োগের প্রভাব বেশি হয় তাহলে আয় স্তরে প্রচণ্ড ওঠা-নামা থাকবে। যদি গুণকের প্রভাব বেশি হয় তবে আয় স্তরে উত্থান-পতন থাকলেও তার ঢেউগুলি ক্রমাগত ঝিমিয়ে পড়বে। একসময় আয়স্তর অচঞ্চল ভারসাম্য স্তরে পেঁছাবে। কিন্তু ত্বরণের প্রভাব যদি খুব উগ্র হয় তাহলে এই ঢেউগুলি বাড়তেই থাকবে। আয় সমুদ্র ক্রমাগত উত্তাল ও উদ্দাম হয়ে উঠবে। কিংবা আয়স্তর ক্রমাগত ফুলতে থাকবে। অবশেষে দেশে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে।

স্যামুয়েলসন অঙ্কের সাহায্যে এই বিষয়টিকে খুব সহজভাবে ও কম কথায় ব্যাখ্যা করেছিলেন। আমরা তাঁর সেই অঙ্কটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারি। তার আগে আমরা ধরে নেব যে—(১) দেশটি বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশ নেয় না, (২) কোন সময়ের ভোগব্যয় তার আগের সময়ের আয়ের উপর নির্ভর করে, (৩) প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা একটি ধ্রুবক, (৪) বিনিয়োগ ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে, (৫) দেশে কোন অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা নেই, (৬) মূলধন ও উৎপাদনের (Capital-Output Ratio) স্থির আছে, (৭) দেশে পূর্ণসংস্থান নেই, (৮) দামস্তর, অর্থের যোগান, সুদের হার ইত্যাদি অন্যান্য বিষয়গুলি স্থির আছে। ধরা যাক—

$C_t = t-$ সময়ের ভোগ ব্যয়, $y_t = t-$ সময়ের আয়, $y_{t-1} = t$ সময়ের ঠিক আগের সময়ে আয়, $\alpha =$ প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (MPC), $\beta =$ মূলধন ও উৎপাদনের অনুপাত $I_t = t-$ সময়ের বিনিয়োগ, $G_t = t-$ সময়ের মধ্যে সরকারী ব্যয়।

আমরা পাই $C_t = \alpha Y_{t-1}$ ... ...(1)

$C_{t-1} = \alpha Y_{t-}$ ... ...(2)

$t-$ সময়ের ভোগের পরিবর্তন $C_t - C_{t-1}$......

$= \alpha Y_{t-1} - \alpha Y_{t-2}$ ... ...(3)

(1) থেকে (3) হল ভোগ অপেক্ষক। বিনিয়োগ অপেক্ষক থেকে পাই,

$I_t = (\beta C_t - C_{t-1})$ ... ...(4)

(4) নং সমীকরণে (3) নং সমীকরণ বসিয়ে পাই

$I_t = \alpha\beta(Y_t - Y_{t-2})$ ... ...(5)

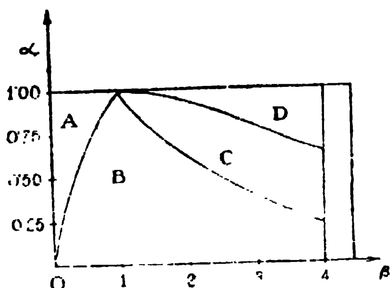
ধরা যাক, $G_t = 1$ ... ...(6)

আয়ের ভারসাম্যের শর্ত হল

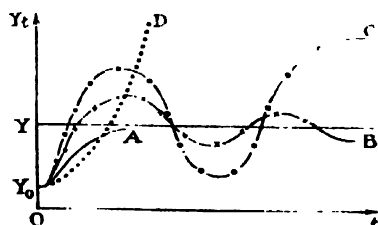
$Y_t = C_t + I_t + G +$ ... ...(7)

অতএব $Y_t = \alpha Y_{t-1} + \alpha\beta(Y_{t-1} - Y_{t-2}) + 1$ ......(8)

এই (৪) নং সমীকরণটির সমাধান থেকে আমরা আয়ের সময়গত গতিপথ (time path) পাব। এই গতিপথের আকৃতি α ও βর মানের উপর নির্ভর করবে। স্যামুয়েলসন α ও βর মান কোথায় থাকলে আয় রেখার গতিপথ কেমন হতে পারে তার কিছু আভাস দিয়েছিলেন। তাঁর মতে α এবং β পাশের রেখাচিত্রে অঙ্কিত চারিটি অঞ্চলের যে কোন একটিতে থাকতে পারে। এখন থেকে আমরা বলতে পারি—(১) α এবং β যদি A অঞ্চলে থাকে (যেখানে β খুবই কম) তাহলে আয়স্তর স্থিতিশীল (stable) হবে ; (২) α এবং β যদি B অঞ্চলে থাকে (যেখানে β বেশি) তাহলে আয়ের গতিপথে উত্থান-পতন থাকবে, কিন্তু সেই উত্থান-পতনের বেগ ক্রমশ মন্দীভূত হবে ; (৩) α এবং β যদি C অঞ্চলে থাকে (যেখানে β বেশ প্রবল) তাহলে আয়ের গতিপথে ক্রমবর্ধমান উত্থান-পতন থাকবে ; এবং (৪) α ও β যদি D অঞ্চলে থাকে (যেখানে β খুবই প্রবল) তাহলে আয়ের গতিপথ বিস্ফারিত গতিতে বৃদ্ধি পাবে।



দ্বিতীয় চিত্রে এই গতিপথগুলি দেখানো হয়েছে। এখানে A চিহ্নিত পথটি A অঞ্চলের B চিহ্নিত পথ B অঞ্চলের, C চিহ্নিত পথটি C অঞ্চলের এবং D চিহ্নিত পথটি D অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্গত α ও β থেকে উদ্ভূত আয়ের গতিপথ দেখাচ্ছে। A পথ ভারসাম্য আয় স্তরের (Y) দিকে যাবে। B পথে চক্রাকার উত্থান-পতন থাকবে, কিন্তু উত্থান-পতন ক্রমশ কমে আসবে। C পথে উত্থান-পতন বাড়বে এবং D পথে আয়স্তর ভারসাম্যহীন-ভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে পেতে দেশে চরম সংকট ডেকে আনবে।



প্রশ্নাবলী

১। বাণিজ্য-চক্র কাকে বলে? এর বৈশিষ্টগুলি আলোচনা কর।

২। বাণিজ্য-চক্রের বিভিন্ন পর্যায়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৩। ত্বরণ বলতে কী বোঝায়? বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ত্বরণ তত্ত্বটি আলোচনা কর। এর ত্রুটি কী?

৪। বাণিজ্য-চক্রের ব্যাখ্যা দাও।

৫। বাণিজ্য-চক্র সম্বন্ধে হট্রে-বর্ণিত ব্যাখ্যার পর্যালোচনা কর।

৬। বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব ঘটে কেন? এ সম্বন্ধে কীন্সীয় মতটি ব্যাখ্যা কর।

৭। বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব সম্বন্ধে হিক্সের তত্ত্বে কী বলা হয়?

৮। তুমি কি মনে কর যে, গুণক ও ত্বরণ প্রক্রিয়ার পারস্পরিক সংঘাতে বাণিজ্য-চক্রের উদ্ভব হয়? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :—(১) বাণিজ্য-চক্রের পর্যায়গুলির উপর টীকা লেখ। (২) মন্দা ও সমৃদ্ধির পার্থক্য কর। (৩) বাণিজ্য-চক্রের দিক পরিবর্তনের বিন্দুগুলি (Turning Points) সম্বন্ধে আলোচনা কর। (৪) গুণক ও ত্বরণের মিথস্ক্রিয়ার সাহায্যে কিভাবে বাণিজ্য-চক্রের উপরের দিক পরিবর্তন করে বিন্দুর ব্যাখ্যা করা যায়?

১৪.১ বাজেট ও বাজেটের প্রকারভেদ :

সরকারের আয় ও ব্যয়ের হিসাবকে বাজেট বলা যেতে পারে। সরকার বিভিন্ন সূত্র থেকে আয় বা রাজস্ব পেয়ে থাকেন। কোন একটি আর্থিক বৎসরের আরম্ভে সরকার বিভিন্ন সূত্র থেকে যে আয় পাবার আশা করেন তাকে বলা হয় অনুমিত বা প্রত্যাশিত আয়। আবার, সরকার সেই বৎসরে বিভিন্ন খাতে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকে বলা হয় প্রস্তাবিত ব্যয়। বাজেট হল **সরকারের অনুমিত আয় ও প্রস্তাবিত ব্যয়ের সিদ্ধান্ত**। সরকারের আয় বা রাজস্ব বিভিন্ন সূত্র থেকে আসে। এই সূত্র বা উৎসগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা—ক) কর-রাজস্ব (Tax Revenue) এবং (খ) অকর-রাজস্ব (Non-Tax Revenue). কর-রাজস্বের মধ্যে থাকে প্রত্যক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব এবং পরোক্ষ কর থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব। অকর-রাজস্বের মধ্যে পড়ে প্রশাসনিক রাজস্ব, দান, অনুদান, সরকারী উৎপাদন ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা, ঋণ ইত্যাদি। তবে যে-কোন আধুনিক রাষ্ট্রের রাজস্বের প্রধান উৎস হল কর। কর দেওয়া বাধ্যতামূলক এবং করের বিনিময়ে সরকার প্রত্যক্ষভাবে করদাতাকে কিছু দেন না ; এটা বিনিময় নয়। যা হোক, করকেই আমরা সরকারের বাজেটের প্রধান উৎস বলে ধরে নেব।

সরকার করের মাধ্যমে যে অর্থ সংগ্রহ করেন- সরকার নানারূপ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার জন্য সেই অর্থ ব্যয় করে থাকেন। সরকারী ব্যয়কে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—(১) প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয়, (২) আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের জন্য ব্যয়, (৩) জনগণের ত্রাণ, সাহায্য, কল্যাণ ইত্যাদির জন্য ব্যয় এবং (৪) উন্নয়নমূলক ব্যয়। এইসব কাজের জন্য সরকার নানারূপ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করে থাকেন। সেইসব দ্রব্য বিক্রয় করে দেশের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহ, এবং নানারূপ উপাদানের সেবা বিক্রয় করে দেশের পরিবারসমূহ। কাজেই সরকারের ব্যয় দেশবাসীদের আয় হয়ে ফিরে আসে।

সরকারী বাজেটকে আমরা সরকারের ব্যয় ও আয়ের পার্থক্য হিসেবে দেখতে পারি। সাধারণত সরকারী বাজেটে আগে ব্যয়ের কথা ভাবা হয়, পরে সেই ব্যয় মেটাবার মত প্রয়োজনীয় আয় সংগ্রহ করা হয়।

সরকারের আয় ও ব্যয়ের তুলনার ভিত্তিতে আমরা বাজেটকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি, যথা (ক) উদ্বৃত্ত বাজেট, (খ) সমতার বাজেট ও (গ) ঘাটতি বাজেট। যে বাজেটে সরকারের অনুমিত আয় তার প্রস্তাবিত ব্যয়ের চেয়ে বেশি

থাকে তাকে উদ্বৃত্ত বাজেট বলে। যে বাজেটে অনুমিত আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আয়ের সমান পরিমাণে ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়, তাকে সমভার বাজেট বলা হয়। অপরপক্ষে যে বাজেটে অনুমিত আয়ের চেয়ে প্রস্তাবিত ব্যয়ের পরিমাণ বেশি ধরা হয়, তাকে ঘাটতি বাজেট বলা হয়।

১৪.২ আয়-ব্যয়ের বৃত্তস্রোতের উপর বাজেটের প্রভাব ঃ

(ক) সরকারী ব্যয়ের প্রভাব

সরকার বাজেটের মাধ্যমে আয়ের সংস্থান করেন এবং ব্যয়ের প্রস্তাব করেন। এই আয় ও ব্যয়ের প্রস্তাব দেশের মোট আয়কে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, **সরকার বাজেটের মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের বৃত্তস্রোতকে প্রভাবিত করেন।** দেশের প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, ত্রাণও কল্যাণ, উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সরকার যে সব দ্রব্য ও সেবা, বিশেষত উপাদানের সেবা ক্রয় করে থাকেন তার জন্য সরকার যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন তাকেই বলা হয় সরকারী ব্যয়। সরকারী ব্যয় থেকে পরিবার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের আয় হয়। সরকার যে সব দ্রব্য ক্রয় করেন সেগুলি যদি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করা হয়, তাহলে সেই ক্রয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বৃদ্ধি পাবে। আবার সরকার পরিবারগুলির কাছ থেকে জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপাদানের সেবাও ক্রয় করতে পারেন। এর ফলে পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধি পায়। অতএব আমরা বলতে পারি—**সরকারী ব্যয় আয়ের বৃত্তস্রোতে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটায়। সরকারী ব্যয় যতই বৃদ্ধি পায় এই অনুপ্রবেশের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে দেশের মোট আয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে।**

সরকারী ব্যয় থেকে আয়ের বৃত্তস্রোতে যে পরিমাণে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে, দেশের আয় প্রাথমিকভাবে সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। যেমন, সরকার যদি ১০০ টাকা ব্যয় করে থাকেন, তাহলে দেশের পরিবার বা প্রতিষ্ঠানগুলির আয় ১০০ টাকা বৃদ্ধি পাবে। এটা হল প্রাথমিক আয় বৃদ্ধি। প্রাথমিক আয় বৃদ্ধি সরকারী ব্যয়ের সমান হবে। কিন্তু এখানেই ব্যাপারটি শেষ হবে না। প্রাথমিক আয় বৃদ্ধি থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি পরবর্তী পর্যায়েও আয় বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এইভাবে আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুণক প্রক্রিয়া কাজ করবে। যেমন—সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন তাতে যদি পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেই বর্ধিত আয় থেকে পরিবারগুলি অতিরিক্ত ভোগব্যয় করবে। পরিবারগুলি তাদের অতিরিক্ত আয়ের কী পরিমাণ ভোগের কাজে ব্যয় করবে সেটা নির্ভর করবে—পরিবারগুলির প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার উপর। পরিবারগুলির প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা যতই বেশি হবে, ততই পরবর্তী পর্যায়ের আয় বৃদ্ধির পরিমাণও বেশি হবে এবং এইভাবে সব পর্যায়ের আয় বৃদ্ধির যোগফল হিসেবে মোট আয় বৃদ্ধিও বেশি হবে।

অনুরূপভাবে সরকারী ব্যয়ের অর্থ যদি প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে যায়, তা থেকে প্রতিষ্ঠানগুলি পরিবারগুলির কাছ থেকে অতিরিক্ত উপাদান সেবা ক্রয় করবে; এর ফলেও পরিবারগুলির আয় বাড়বে, তাদের ভোগব্যয় বাড়বে এবং তার ফলে পরবর্তী পর্যায়ের আয় বৃদ্ধি ঘটবে। এইভাবে দেখা যায়—সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে দেশবাসীদের আয় বৃদ্ধি পায় এবং সরকার যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন, জনগণের আয় তার চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় এবং এইভাবে আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুণক প্রক্রিয়াটি কাজ করে। এই গুণকের মান নির্ধারিত হয় দেশবাসীদের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার দ্বারা। প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা যত বেশি হয়, গুণকের মানও তত বেশি হয়। আমরা বীজগণিতের পদ্ধতিতে এটি দেখাতে পারি।

ধরা যাক Y = আয়, C = ভোগ ব্যয়, I = বিনিয়োগ এবং G = সরকারী ব্যয়। আমরা ধরেছি যে, দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করে না। এই দেশে জাতীয় আয়ের ভারসাম্যের প্রাথমিক শর্ত হল—

$$Y = C + I + G$$

ধরা যাক $C = aY$। এখানে a হল গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা।

অর্থাৎ $a = APC = MPC$. ধরা যাক I এবং G সম্পূর্ণরূপে স্বয়ম্ভূত। তাহলে আমরা পাই,

$$Y = aY + I + G \qquad \ldots(1)$$

এখন ধরা যাক, G বেড়ে হল $G + \Delta G$, তার ফলে আয় বেড়ে হল $Y + \Delta Y$ এবং ভোগব্যয় বেড়ে হল $aY + a\Delta Y$ নতুন ভারসাম্য অবস্থায় আমরা পাব

$$Y + \Delta Y = aY + a\Delta Y + I + G + \Delta G \qquad \cdots(2)$$

(1) নং থেকে পাই $- Y = aY + I + G$

$$- \qquad\qquad - \quad -$$

বিয়োগ করে পাই $\Delta Y = a\Delta Y + \Delta G$

অর্থাৎ $\Delta Y - a\Delta Y = \Delta G$

অর্থাৎ $\Delta Y(1 - a) = \Delta G$

অতএব $\Delta Y = \dfrac{\Delta G}{1 - a} = \Delta G \times \dfrac{1}{1 - MPC}$

এখানে $\dfrac{1}{1 - MPC}$ হল গুণক। MPC যত বড় হবে $1 - MPC$ তত ছোট হবে এবং $\dfrac{1}{1 - MPC}$ তত বেশি হবে।

এখানে সরকার যে ব্যয় বৃদ্ধি করেন, তার জন্য অর্থ কোথা থেকে সংগ্রহ করেন? সরকার যদি তাঁর আয় বৃদ্ধি না করে, কিংবা কর বৃদ্ধি না করে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি করেন তাঁর বাজেটে ঘাটতি দেখা দেবে। সরকার যদি ΔG পরিমাণে ব্যয় বৃদ্ধি করেন তাহলে বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ হবে ΔG এই ঘাটতি বাজেটের

ফলে দেশের আয় বাড়বে $\Delta G\frac{1}{1-a}$ পরিমাণে। আয় বৃদ্ধির অর্থ হল উৎপাদন বৃদ্ধি। দেশে উৎপাদন-উপাদানের নিয়োগের ক্ষেত্রে যদি অপূর্ণ নিয়োগ থাকে, তাহলেই সরকার বাজেটে ঘাটতি ঘটিয়ে বেকার উপাদানগুলিকে উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করে দেশের মোট উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করতে পারেন। এর ফলে দেশের মোট বাস্তব আয় বৃদ্ধি পায়, কর্মনিয়োগও বৃদ্ধি পায়, দেশবাসীদের আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পায়। জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি সম্পদগুলির যদি পূর্ণ নিয়োগ ঘটে থাকে এবং সরকার যদি ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে তাঁর ব্যয় বৃদ্ধি করেন তাহলে কিন্তু বাস্তব উৎপাদন, আয় ও কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে না, কারণ উপাদানগুলির নিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণতো আগেই সর্বাধিক হয়ে আছে, আর বাড়বে কেন? এই অবস্থায় সরকারী ব্যয় বাড়লে জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপাদানের চাহিদা বাড়বে। ফলে তাদের দাম বাড়বে। যে বেশি দাম দেবে উপাদানের মালিকরা তার কাছেই উপাদানের সেবা বিক্রয় করবে। এর ফলে এক জায়গায় যে উপাদান কাজ করছিল—সেই উপাদান অন্যত্র সরে যাবে। এক জায়গায় উৎপাদন কমবে, অন্য জায়গায় বাড়বে। উৎপাদনের হ্রাস ও বৃদ্ধি সমান হলে মোট উৎপাদন সমান থাকবে, কিন্তু উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর দামও বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে দেখা যায়—পূর্ণ নিয়োগ স্তরে সরকারের ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা দেখা দেয়।

আবার দেশে যদিসম্পদের অপূর্ণ নিয়োগ থাকে তাহলেও ঘাটতি ব্যয়ের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে মূল্যবৃদ্ধি পেতে পারে। দেশের যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা যদি অনুন্নত হয়, কারিগরিক জ্ঞান ইত্যাদির অভাব থাকে এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তাহলেও ঘাটতি ব্যয়ের ফলে উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের ব্যয় তার চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। কাজেই অপূর্ণ নিয়োগস্তরেও ঘাটতি ব্যয় যে সকল সময় উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাতে পারবে এমন বলা যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, সরকার কীভাবে ঘাটতি পূরণ করেন তার উপরেও ঘাটতি-ব্যয়ের প্রভাব নির্ভর করে। বাজেটে ঘাটতি থাকলে সরকার সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য জনগণের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারেন, কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিতে পারেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নতুন টাকা ছাপিয়ে সেই ঋণ দিতে পারে।

সরকার যদি জনগণের কাছ থেকে ঋণ নেন তাহলে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় কমবে, জনগণের ব্যয় কমবে—এইভাবে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের মোট আয় বেশি কমবে। অর্থাৎ জনগণ যে পরিমাণে সরকারকে ঋণ দেবে সেই পরিমাণ অর্থ আয়-স্রোত থেকে নিষ্কাশিত হয়ে সরকারের হাতে জমা হবে। সরকার যদি সেই অর্থ ব্যয় করেন তাহলে সেটা আয়ের বৃত্তস্রোতে আবার অনুপ্রবিষ্ট হবে। অবশ্য জনগণ যদি তাদের পূর্ব সঞ্চয় ভেঙে সরকারকে ঋণ দেয়, তাহলে জনগণের ব্যয় কমবে

না। বরং সেই অর্থ যখন সরকার ব্যয় করবেন তখন আয়-স্রোতে নতুন অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটবে। আবার সরকার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি নতুন অর্থের সৃষ্টি করে সেই ঋণ দেয়, তাহলে দেশের আয়ের বৃত্তস্রোতে কেবলমাত্র অনুপ্রবেশই ঘটবে। এর ফলে আয় বৃদ্ধি পাবে।

(খ) সরকারী আয়ের প্রভাব :

সরকার করের মাধ্যমে যে অর্থ সংগ্রহ করেন দেশের আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে সেই পরিমাণ অর্থ নিষ্কাশিত হয়। সরকার সাধারণত পরিবারগুলির আয়ের উপর আয়কর এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফার উপর মুনাফা কর চাপিয়ে থাকেন। দুটি করই হল প্রত্যক্ষ কর। আয়কর পরিবারগুলির ব্যয়যোগ্য আয় (Disposable Income) কমায়। মুনাফা কর প্রতিষ্ঠানগুলির নীট আয় কমায়। আবার প্রতিষ্ঠানসমূহের মুনাফাই পরিবারগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। সরকার যত মুনাফা কর চাপাবেন, ততই পরিবারগুলির মধ্যে বণ্টিত মুনাফার পরিমাণ কমবে। তার ফলে পরিবারগুলির ব্যয়যোগ্য আয় কমবে।

পরিবারগুলির আয় কমলে তাদের ভোগব্যয় কমবে। ফলে প্রতিষ্ঠানগুলির আয় কমবে, ফলে তারা কম পরিমাণে উপাদানের সেবা ক্রয় করবে, ফলে পরিবারগুলির আয় কমবে, ভোগব্যয় কমবে। এইভাবে পর্যায়ক্রমে চলতে থাকবে। অবশেষে সব পর্যায়ের শেষে দেখা যাবে সরকারের আয়কর আদায়ের জন্য দেশের আয় কমেছে এবং বেশি পরিমাণে কমেছে। এখানেও একটি গুণক প্রক্রিয়া কাজ করবে। আমরা বীজগণিতের সাহায্যে এই গুণকটি দেখাতে পারি।

ধরা যাক $Y=$ আয়, $C=$ ভোগব্যয়, $I=$ বিনিয়োগ ব্যয়, $T=$ সরকারের আয়কর $G=$ সরকারী ব্যয়। এখানে পরিবারগুলির ব্যয়যোগ্য আয় হবে $Y-T$ এবং ভোগব্যয় C এই ব্যয়যোগ্য আয়ের উপর নির্ভর করবে। ধরা যাক $C=a\ (Y-T)$ এখানে a হল ব্যয়যোগ্য আয় থেকে উদ্ভূত গড় ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা। ধরা যাক, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নেই। এই দেশের আয়ের ভারসাম্যের শর্ত হল,

$$Y=C+I+G$$

অর্থাৎ $Y=a(Y-T)+I+G$

অর্থাৎ $Y=aY-aT+I+G \qquad \cdots \qquad (1)$

ধরা যাক সরকার করের পরিমাণ বাড়িয়ে $T+\triangle T$ করলেন।

তার ফলে আয় হল $Y+\triangle Y$.

ভোগব্যয় হল $a(Y+\triangle Y-T-\triangle T)$

$=aY+a\triangle Y-aT-a\triangle T$. নতুন ভারসাম্য অবস্থায় হবে

$$Y+\triangle Y=aY+a\triangle Y-aT-a\triangle T+I+G \cdots (2)$$

১নং থেকে পাই $Y \quad =aY \quad -aT+I+G \quad \cdots(1)$

অতএব $\triangle Y=a\triangle Y-a\triangle T$

অতএব $\triangle Y-a\triangle Y=-a\triangle T$

অর্থাৎ $\Delta Y = -\frac{a}{1-a}.\ \Delta T.$ এখানে গুণক হল $-\frac{a}{1-a}$. এই গুণকটি **ঋণাত্মক। এর দ্বারা বোঝায় যে, সরকার তাঁর আয় বৃদ্ধি করলে দেশবাসীদের আয় কমবে।** সরকার যদি ΔT পরিমাণে আয় বৃদ্ধি করেন তাহলে দেশের আয় $\frac{a\Delta T}{1-a}$ পরিমাণে কমবে। অতএব আমরা বলতে পারি—**সরকারের আয়ের ফলে দেশের বস্তুস্রোত থেকে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে।**

(গ) **সরকারের ব্যয় ও আয়ের প্রভাব ঃ**

সরকার যদি ব্যয় করেন তাহলে আয়ের বৃত্তস্রোতে অনুপ্রবেশ ঘটে এবং আয় বৃদ্ধি পায়। সরকার যদি আয়কর চাপান, তাহলে আয়ের বৃত্তস্রোত থেকে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে এবং আয় কমে। এখন সরকার যদি একই সঙ্গে ব্যয় করেন এবং করারোপ করেন তাহলে আয়ের বৃত্তস্রোতে একই সঙ্গে অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশন ঘটবে। সেক্ষেত্রে দেশের আয় পরিণামে বাড়বে, কি সমান থাকবে, কি কমবে সেটা নির্ভর করবে অনুপ্রবেশ ও নিষ্কাশনের পরিমাণ এবং দেশের প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতার উপর। ধরা যাক, সরকারী ব্যয় ΔG পরিমাণে বাড়ল। তাহলে দেশের আয় বাড়বে $\frac{\Delta G}{1-a}$ পরিমাণে। ধরা যাক, সরকারের আয় বাড়ল ΔT পরিমাণে। তার ফলে দেশের আয় কমবে $\frac{a\Delta T}{1-a}$ পরিমাণে।

তাহলে দেশের আয় বাড়বে $\frac{\Delta G}{1-a} - \frac{a\Delta T}{1-a} = \frac{1}{1-a}\quad [\,\Delta G - a\Delta T\,]$ পরিমাণে।

এখন সরকারের বাজেটে যদি সমতা থাকে তাহলে $\Delta G = \Delta T$ হবে, সেক্ষেত্রে আয় বাড়বে

$$\Delta Y = \frac{\Delta G}{1-a} - \frac{a\Delta G}{1-a} \quad (\because \quad \Delta G = \Delta T)$$

অর্থাৎ $\Delta Y = \frac{\Delta G}{1-a}(1-a) = \Delta G$ পরিমাণে।

অর্থাৎ **সরকার যদি ΔG পরিমাণ টাকা ব্যয় করেন এবং সেই সমান পরিমাণ টাকার অতিরিক্ত আয় কর চাপান, তাহলে বাজেটে সমতা থাকবে এবং জাতীয় আয় অতিরিক্ত ব্যয়ের সমান বৃদ্ধি পাবে। এখানে আয়ের গুণক হবে এক। একে সমতার বাজেটের গুণক বলা হয়।**

সমতার বাজেটের একক-গুণক ব্যাপারটি খুবই মজার। সরকার দেশের আয়ের বৃত্তস্রোতে যে পরিমাণ অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটালেন ঠিক সেই পরিমাণ অর্থ করের

সিরিঞ্জ দিয়ে নিষ্কাশন করে নিলেন। তবুও বৃত্তস্রোতে সেই পরিমাণ অর্থ থেকে গেল। ভিখারীর খালি বাটিতে ৫ টাকা দিয়ে ৫ টাকা তুলে নিলেও যদি বাটিতে ৫ টাকা থেকে যায় তাহলে ব্যাপারটা যেমন মজার হয়, এটাও ঠিক তেমনি।

এটা হল আয়ের বৃত্তস্রোতের উপর সমতার বাজেটের প্রভাব। সরকারের বাজেটে সমতা ছাড়াও ঘাটতি কিংবা উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। ঘাটতির ক্ষেত্রে $\triangle G > \triangle T$ হবে। আয় যতটা বাড়বে, তার চেয়ে কম কমবে, ফলে আয় বাড়বে। আবার উদ্বৃত্ত বাজেটে $\triangle G < \triangle T$ হবে। সেখানে আয় যত বাড়বে, তার চেয়ে বেশি কমবে. ফলে দেশের আয় কমে যেতে পারে। উদাহরণের সাহায্যে এটা বোঝানো যায়।

ধরা যাক $a = \frac{1}{2}$. ধরা যাক $\triangle G = \triangle T = 100$ টাকা (বাজেট সমতা আছে)। তাহলে আয় বাড়বে $\frac{\triangle G}{1-a} = \frac{100 \text{ টাকা}}{1-\frac{1}{2}} = 100$ টাকা $\times \frac{1}{\frac{1}{2}} = 100$ টাকা $\times 2 = 200$ টাকা। আবার কর বৃদ্ধির জন্য আয় কমবে $\frac{a\triangle T}{1-a}$ $= \frac{\frac{1}{2}.100 \text{ টাকা}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{50 \text{ টাকা}}{\frac{1}{2}} = 100$ টাকা। তাহলে আয় বাড়ল 200 টাকা এবং কমল 100 টাকা। অর্থাৎ যোগ-বিয়োগে আয় বাড়ল 100 টাকা।

ধরা যাক, $\triangle G = 200$ টাকা এবং $\triangle T = 100$ টাকা (বাজেটে ঘাটতি আছে)। এখন আয় বাড়বে $\frac{200 \text{ টাকা}}{1-\frac{1}{2}} = 400$ টাকা। এবং কর $\triangle T = 100$ টাকা বৃদ্ধি পাওয়ায় আয় কমবে $\frac{a\triangle T}{1-a} = \frac{\frac{1}{2}.100 \text{ টাকা}}{1-\frac{1}{2}} = 50$ টাকা $\times 2 = 100$ টাকা। তাহলে যোগ-বিয়োগে আয় বাড়ল 300 টাকা।

ধরা যাক, $\triangle G = 100$ টাকা এবং $\triangle T = 300$ টাকা (বাজেটে উদ্বৃত্ত আছে)। তাহলে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য আয় বাড়বে 200 টাকা এবং কর বৃদ্ধির জন্য আয় কমবে $\frac{a\triangle T}{1-a} = \frac{\frac{1}{2}.300 \text{ টাকা}}{1-\frac{1}{2}} = \frac{150 \text{ টাকা}}{\frac{1}{2}} = 300$ টাকা। যোগ-বিয়োগে আয় কমবে 100 টাকা। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, $\triangle G = 100$ টাকা এবং $\triangle T = 200$ টাকা হলে আয় বাড়ত 200 টাকা এবং কমত 200 টাকা। ফলে মোট আয়ের কোন

পরিবর্তন হত না। অতএব উদ্বৃত্ত বাজেটের ক্ষেত্রে সকল সময় আয় কমবেই এমন বলা যায় না। এটা নির্ভর করছে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ও প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার উপর।

১৪.৩ ঘাটতি বাজেট ও উদ্বৃত্ত বাজেটের তুলনা ঃ

যে বাজেটে পরিকল্পিতভাবে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি রাখা হয় তাকে ঘাটতি বাজেট বলা হয়। অপরপক্ষে যে বাজেটে ব্যয় অপেক্ষা বেশি আয় আদায় করা হয় তাকে বলা হয় উদ্বৃত্ত বাজেট। সরকারের আয়কে অনুমিত বা প্রত্যাশিত আয় এবং ব্যয়কে প্রস্তাবিত বা পরিকল্পিত ব্যয় বলা যেতে পারে। তাহলে আমরা বলতে পারি- যে বাজেটে সরকারের পরিকল্পিত ব্যয় অনুমিত আয় অপেক্ষা বেশি রাখা হয় সেই বাজেট হল ঘাটতি বাজেট। অপরপক্ষে যে বাজেটে অনুমিত আয় অপেক্ষা প্রস্তাবিত ব্যয় কম রাখা হয় তাকে বলা হয় উদ্বৃত্ত বাজেট। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে—বাজেটে ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত যাই ঘটুক না কেন, তা সরকারের জ্ঞাতসারেই ঘটে। সরকার পরিকল্পিতভাবেই বাজেটে ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করেন। ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত আপনা থেকে বা অপরিকল্পিতভাবে ঘটতে পারে না। পারিবারিক বাজেটের ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম হয় না। পারিবারিক বাজেটে পরিবার যে আয় পেয়ে থাকে তার ভিত্তিতেই তাকে ব্যয়ের পরিকল্পনা করতে হয়। কাজেই পারিবারিক বাজেটে পরিকল্পিতভাবে ঘাটতি ঘটতে পারে না। যদি ঘটে থাকে তা আকস্মিকভাবেই ঘটে। কোন মাসে পরিবারের আয় কমে যেতে পারে, কিংবা কোন আকস্মিক কারণে ব্যয় বেড়ে যেতে পারে। তাহলে সে মাসে সেই পরিবারের বাজেটে ঘাটতি দেখা দেবে। আবার কোন মাসে পরিবারের আয় খুব বেড়ে গেলে এবং ব্যয় কমে গেলে সেই বাজেটে উদ্বৃত্ত দেখা দিতে পারে। অনেক পরিবার সঞ্চয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তার জন্য কম ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেয়। এক্ষেত্রে পারিবারিক বাজেটে যে উদ্বৃত্ত দেখা দেয় তাকে পরিকল্পিত উদ্বৃত্ত বলা যেতে পারে। পরিবারের পক্ষে পরিকল্পিতভাবে উদ্বৃত্ত ঘটানো সম্ভব হলেও পরিকল্পিতভাবে ঘাটতি ঘটানো প্রায়শ সম্ভব হয় না। কিন্তু সরকারী বাজেটের কথা আলাদা। সরকার আগে ব্যয় স্থির করেন পরে সেই ব্যয় অনুযায়ী আয় সংগ্রহ করেন। পরিবারের পক্ষে কখনই তা করা সম্ভব নয়। সরকার যেহেতু আগে ব্যয় ঠিক করেন, পরে সেই ব্যয় অনুসারে আয় সংগ্রহ করতে পারেন, কাজেই সরকারের ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশি বা কম হতে পারে। ব্যয় বেশি হলে বাজেটে ঘাটতি হয়। আয় বেশি হলে উদ্বৃত্ত হয়।

তাহলে আমরা বলতে পারি, বাজেটের

ঘাটতি = সরকারের ব্যয় − সরকারের আয়।

এবং উদ্বৃত্ত = সরকারের আয় − সরকারের ব্যয়।

ধরা যাক, G = সরকারের মোট ব্যয়।

T = সরকারের মোট আয়

D = বাজেটের ঘাটতি

S = বাজেটের উদ্বৃত্ত। তাহলে আমরা বলতে পারি,

বাজেটের ঘাটতি D = G − T ... ... (1)

এবং বাজেটে উদ্বৃত্ত S = T − G ... ... (2)

যেখানে G ও T সমান, সেই বাজেটকে সমতার বাজেট বলা হয়।

এখন প্রশ্ন, সরকার কীভাবে ঘাটতি পূরণ করেন? আমরা বলতে পারি, সরকার প্রধানত দুভাবে তাঁর বাজেট ঘাটতি দূর করতে পারেন—(১) দেশের ভিতর থেকে অর্থাৎ দেশবাসীদের কাছ থেকে) বা বিদেশ থেকে ঋণ নিয়ে, অথবা (২) নতুন টাকা ছাপিয়ে। ঋণকে আমরা যদি আগেই সরকারের আয়ের মধ্যে (T-এর মধ্যে) ধরে থাকি, তাহলে ঋণের সাহায্যে ঘাটতি পূরণ করা যায় না। সেক্ষেত্রে টাকা ছাপিয়ে সরকার এই ঘাটতি ব্যয় মেটাতে পারেন। টাকা ছাপানো হল নতুন অর্থ সৃষ্টি করা। এর ফলে দেশে নগদ অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে দেশের মধ্যে আরো অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। নতুন অর্থের সাহায্যে বাজেটের ঘাটতি দূর করা কেবলমাত্র সরকারের পক্ষেই সম্ভব। পরিবার কখনই নতুন অর্থ সৃষ্টি করতে পারে না।

এখন প্রশ্ন, ঘাটতি বাজেট ও উদ্বৃত্ত বাজেটের মধ্যে কোন্‌টি ভালো এবং কেন ভালো? এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি—এটা বিতর্কের বিষয়। অর্থনীতিতে ঘাটতি বাজেট ও উদ্বৃত্ত বাজেটের বিতর্ক অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিতর্ক। এই বিতর্কের গভীরে প্রবেশ না করেও আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি—আগেকার দিনের অর্থনীতিবিদরা বলতেন—পারিবারিক বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকলে যেমন পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নতি সূচিত হয়, অনুরূপভাবে সরকারী বাজেটে উদ্বৃত্ত থাকলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে। বলা বাহুল্য যে, এই ধারণায় পারিবারিক ও সরকারী বাজেটকে একই দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে এবং কাজেই যা পরিবারের বাজেটের পক্ষে সত্য তাকে জাতীয় বাজেটের পক্ষেও সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এটা ভুল ধারণা। একটি পরিবারের পক্ষে যা সত্য হয় তা একটি দেশের পক্ষে সত্য হবে বলা যায় না।

বাজেটের মাধ্যমে সরকার আয় করেন এবং সেই আয় ব্যয় করেন। সরকার প্রধানত দেশবাসীদের উপর কর আরোপ করে আয় পেয়ে থাকেন। সরকারের আয় হল জনগণের ব্যয়। অপরপক্ষে সরকার যখন করপ্রাপ্ত রাজস্বকে ব্যয় করেন তখন দেশবাসীদের আয় বৃদ্ধি পায়। সরকারী ব্যয় হল দেশবাসীদের আয়। তাহলে ঘাটতি বাজেটে সরকার কম আয় পান, কিন্তু বেশি ব্যয় করেন। অর্থাৎ দেশবাসীদের আয় যে পরিমাণে হ্রাস পায়, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। উদ্বৃত্ত বাজেটে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। উদ্বৃত্ত বাজেটে সরকারের ব্যয় কম, আয় বেশি; কাজেই, উদ্বৃত্ত বাজেটে দেশবাসীদের আয় বেশি কমে যায়। ঘাটতি বাজেটে দেশবাসীদের

আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বাড়লে দেশের পরিবারগুলি বেশি পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করে। সেসব ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করতে হয়। এইভাবে ঘাটতি বাজেটের ফলে দেশের মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পায়। দেশের ব্যয় বৃদ্ধি পেলে জিনিসপত্রের চাহিদা বাড়ে। চাহিদা বাড়লে মধ্যবর্তী সময়ে দাম বাড়ে, মুনাফা বাড়ে। ফলে বেসরকারী উৎপাদকদের কাছে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। তারা উৎপাদন বৃদ্ধি করে। ফলে শ্রম, মূলধন, জমি—সব সম্পদের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই সম্পদগুলি যদি অব্যবহৃত অবস্থায় বা অপূর্ণ নিয়োগস্তরে থাকে তাহলে সমান দামে এই সব উপাদান পাওয়া যায়। তাদের নিয়োগ বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। অতএব ঘাটতি বাজেট দেশের মোট উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এইভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পরিবার ও প্রতিষ্ঠানগুলির আয় বৃদ্ধি পায়। ফলে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় আরো বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ পর্যন্ত সব সম্পদের পূর্ণ-নিয়োগ না ঘটে ততক্ষণ পর্যন্ত ঘাটতি বাজেটের ফলে দেশে একটি সম্প্রসারণমুখী প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘাটতি বাজেট দেশের অর্থনৈতিক কর্মে জোয়ার এনে দেয়। উদ্বৃত্ত বাজেটে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত বাজেটের ফলে দেশে মন্দার ভাব ছড়িয়ে পড়ে। সরকার যদি মন্দা দূর করতে চান, দেশের বেকার সমস্যা সমাধান করতে চান এবং দেশবাসীদের মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে চান তাহলে সরকারকে ঘাটতি বাজেটের নীতি গ্রহণ করতে হবে। ভারতের মত স্বল্পোন্নত দেশে ঘাটতি বাজেটের প্রয়োজন আছে। সেজন্য ভারতের জাতীয় বাজেটে পরিকল্পিতভাবে ঘাটতি রাখা হয়।

ঘাটতি বাজেটের ফলে দেশের আয়, উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি পায় সত্য, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্তই এটা সম্ভব। সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ হয়ে গেলে ঘাটতি বাজেটের ফলে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু উৎপাদন ও দ্রব্যসামগ্রীর যোগান আর বৃদ্ধি পায় না। কাজেই দেশে মুদ্রা-স্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কীভাবে এটা হয়? সংক্ষেপে বলা যায়—পূর্ণ নিয়োগ স্তরে সম্পদগুলি কোন না কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত থাকে। সরকার যখন ঘাটতি বাজেটের দ্বারা যে সব সম্পদ নিয়োগ করতে চান, তার ফলে সে সব উপাদানের দাম বেড়ে যায়। তারা একটি উৎপাদন ক্ষেত্র ছেড়ে অন্য উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়। এতে একস্থানের উৎপাদন কমে, সরকারী ক্ষেত্রের উৎপাদন বাড়ে, ফলে দেশের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এইভাবে সমান পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য মোট বা গড় উৎপাদন ব্যয় পূর্বের থেকে বেশি হয়, যার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। অতএব পূর্ণ নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেটের ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

আমাদের দেশে সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ নেই এবং সরকারও ঘাটতি বাজেটের পদ্ধতি

গ্রহণ করেছেন। তাহলে এখানে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। দাম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু তাও আমাদের দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিচ্ছে কেন? তাহলে বুঝতে হবে অপূর্ণ নিয়োগ স্তরেও দেশে ঘাটতি বাজেট মুদ্রাস্ফীতির জন্ম দিতে পারে। এর প্রধান কারণ হল উৎপাদন ব্যবস্থার অনুন্নত চরিত্র ও উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নানারকমের বাধাবন্ধের (Bottlenecks) উপস্থিতি। বিশেষ করে কোন দেশের আভ্যন্তর মূলধন কাঠামো (Infra Structure) যদি অনুন্নত হয়, তাহলে সেই দেশে ঘাটতি বাজেট ঘটিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা স্বল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হয় না। উৎপাদন বৃদ্ধি করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। মধ্যবর্তী সময়ে বাজেট ঘাটতির ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হতে পারে।

১৪ বাজেট নীতি (Fiscal Policy)

(ক) বাজেট নীতির সংজ্ঞা :

সরকারের অনুমিত আয় ও প্রস্তাবিত ব্যয়ের হিসেবকে বাজেট বলা হয়। সরকার যখন আয় বা রাজস্ব আদায় করেন, তখন আয়-স্রোত থেকে অর্থ নিষ্কাশিত হয়ে সরকারের কোষাগারে জমা হয়। এর ফলে দেশের ভোগব্যয় কমে, উৎপাদন কমে, কর্মনিয়োগ কমে, প্রতিষ্ঠানগুলির লাভ কমে এবং এইভাবে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলির পরিবর্তন হয়। অপরপক্ষে, সরকার যখন নানাখাতে অর্থ ব্যয় করেন এবং দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করেন তখন দেশের আয়-স্রোতের মধ্যে অতিরিক্ত আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে। এর ফলে দেশবাসীদের আয় বাড়ে, ব্যয় বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে, কর্মনিয়োগ বাড়ে, প্রতিষ্ঠানগুলির মুনাফা বাড়ে। এইভাবে দেখা যায়, সরকার তাঁর বাজেটের মাধ্যমে দেশের আয়, উৎপাদন, কর্মনিয়োগ, বিনিয়োগ, মুনাফা, দামস্তর ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। সরকার তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে এবং দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনে অর্থনৈতিক বিষয়গুলির বিপরীত পরিবর্তনের গতি রোধ করার জন্য তাঁর বাজেটকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন এবং বাজেটে ঘাটতি সমতা বা উদ্বৃত্তের সৃষ্টি করার নীতি গ্রহণ করেন। একে বাজেট নীতি বলা হয়। অতএব **বাজেটের মাধ্যমে দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়গুলির কাম্য পরিবর্তন আনার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে বাজেট নীতি বলা হয়।**

(খ) বাজেট নীতির উদ্দেশ্য :

বাজেট নীতির সাহায্যে সরকার (১) মুদ্রাস্ফীতি বা মূল্যহ্রাসের সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেন, (২) বাণিজ্য-চক্র প্রতিরোধ করে দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারেন, (৩) আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য দূর করতে পারেন, (৪) পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন ইত্যাদি। (এখানে বাজেট নীতির প্রথম দুটি প্রধান উদ্দেশ্যের কথাই আলোচনা করা হল।)

(১) মুদ্রাস্ফীতির সময় দেশে মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান (Inflationary gap)

গড়ে ওঠে। পূর্ণকর্মনিয়োগ স্তরে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান সর্বাধিক মাত্রায় স্থির থাকে এবং সেই অবস্থায় কোন স্বয়ম্ভূত ব্যয় বৃদ্ধি পেলেই দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা মোট যোগানের চেয়ে বেশি হয়। এর ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অবস্থায় সরকার তাঁর বাজেটকে ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতিকে দমন করবার চেষ্টা করতে পারেন। মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার তাঁর ব্যয় কমিয়ে ও আয় বাড়িয়ে এটা করতে পারেন। সরকারের ব্যয় কমলে দেশের মোট ব্যয় কমবে। দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা রেখাটি নীচের দিকে নামবে এবং সরকার যদি যথেষ্ট পরিমাণে তাঁর ব্যয় কমান তাহলে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান দূর হয়ে যেতে পারে। আবার সরকার যদি করারোপ বৃদ্ধি করেন তাহলে দেশবাসীদের ব্যয়যোগ্য আয় কমবে। আয় কমলে পরিবারগুলির ভোগব্যয় এবং প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ ব্যয় কমবে। ফলে মোট ব্যয় কমবে এবং মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধান কমবে। অপরপক্ষে মূল্যহ্রাসের সময় সরকার তাঁর ব্যয় বৃদ্ধি করেন এবং কর কমিয়ে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে পারেন।

(২) বাণিজ্য-চক্রের প্রধান দুটি পর্যায় হল মন্দা ও সমৃদ্ধি। মন্দার সময় অর্থনৈতিক কাজকর্ম খুব ঢিলে তালে চলে। এই সময় আয়, উৎপাদন, বিনিয়োগ কর্মনিয়োগ কম থাকে। কাজেই এই মন্দা প্রতিরোধ করার জন্য সরকার বাজেটে ঘাটতি ঘটিয়ে আয়-ব্যয়ের বৃত্তস্রোতে অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটাতে পারেন। তার ফলে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয় বাড়বে। মন্দা প্রতিরুদ্ধ হবে। অপরপক্ষে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্ছভাব দেখা দিলে সরকার উদ্বৃত্ত বাজেটের মাধ্যমে আয়ের নিষ্কাশন ঘটিয়ে তাকে প্রতিরোধ করতে পারেন।

১৪.৫ সরকারী ঋণ (Public Debt) ও তার প্রভাব :

সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। বাজেটে ঘাটতি দেখা দিলে বুঝতে হবে বাকি টাকাটা নিশ্চয়ই কোন-না-কোন সূত্র থেকে এসেছে এবং সেটা এসেছে সরকারের ঋণ হিসেবে। ধরা যাক, G হল সরকারের ব্যয় এবং T সরকারের আয়, তাহলে ঘাটতি বাজেটের ক্ষেত্রে $G>T$ হবে এবং এই ঘাটতির পরিমাণ হবে $G-T$ সরকার ঋণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে এই ঘাটতি পূরণ করেন, কাজেই সরকারী ঋণের পরিমাণও হবে $G-T$.

যদি একটি বন্ধ অর্থব্যবস্থার কথা ভাবা হয়, তাহলে সেই দেশটির সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কোন অর্থনৈতিক যোগাযোগ থাকবে না। কাজেই সেই দেশটি বাইরের কোন দেশ থেকে ঋণ পাবে না। সেই দেশের সরকার কেবলমাত্র দেশের ভিতর থেকে ঋণ নিতে পারেন। কিন্তু দেশটি যদি বাইরের দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাখে, তাহলে সরকারী ঋণের উৎস হবে দুটি (১) আভ্যন্তর এবং (২) বাহ্যিক। আমরা এখানে একটি বন্ধ অর্থব্যবস্থার কথা আলোচনা করব।

বন্ধ অর্থব্যবস্থায় সরকারী ঋণের আভ্যন্তর উৎস তিনটি —যথা (১ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, (২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য অব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান এবং (৩) পরিবার বা ব্যক্তি।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী বণ্ড ক্রয় করে সরকারকে ঋণ দিতে পারে এবং সেই বণ্ডের ভিত্তিতে নতুন টাকা ছেপে অর্থের যোগান বৃদ্ধি করতে পারে। অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন টাকা ছাপিয়েই সরকারকে ঋণ দেয়। সরকার সেই অর্থ ব্যয় করেন। ফলে আয়-ব্যয়ের বৃত্তস্রোতে অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটে। আয় বৃদ্ধি পায়।

সরকার যদি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি থেকে ঋণ নেন তাহলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থের যোগান কমবে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি আগে যদি বিনিয়োগ-কারীদের ঋণ দেবার কথা ভেবে থাকে এবং সেই টাকা সরকারকে ঋণ দেয়, তাহলে যে-বেসরকারী বিনিয়োগ বাড়ত, এখন তা বাড়বে না, কিন্তু সরকারী ব্যয় বাড়বে। আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটবে, আয় বাড়বে এবং গুণকের ফলে আয় বেশি বাড়বে। তবে সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে বণ্ড বিক্রি করে যে ঋণ নেন, সেই বণ্ডগুলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়। বাণিজ্যিক ব্যাংক সেই সম্পত্তি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে জমা রেখে ঋণ নিতে পারে এবং সেই ঋণের সাহায্যে বিনিয়োগকারীদের বেশি পরিমাণে ঋণ দিতে পারে। তাহলে আয়ের বৃত্তস্রোতে দুভাবে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটবে। প্রথমে সরকার ঋণের অর্থ ব্যয় করলে অনুপ্রবেশ ঘটবে। দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সৃষ্ট ঋণের মাধ্যমে আর একবার অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটবে।

সরকার যদি পরিবারগুলির কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বাজেটের ঘাটতি পূরণ করেন, তাহলে সরকার যখন সেই ঋণের অর্থ ব্যয় করবেন তখন আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটবে। কিন্তু পরিবারগুলির ব্যয় কি কমবে? পরিবারগুলি তাদের ভোগব্যয়ের জন্য যে অর্থ রাখে সেই অর্থ যদি সরকারকে ঋণ দিয়ে দেয় তাহলে তাদের ভোগব্যয় কমবে। কিন্তু পরিবারগুলি যদি তাদের সঞ্চয় থেকে সরকারকে ঋণ দেয়, তাহলে তাদের ভোগব্যয় কমবে না। তবে পরিবারগুলি যদি সরকারের কাছ থেকে কেনা বণ্ডগুলি ভাঙিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি থেকে ঋণ পেয়ে যায় এবং সেই ঋণের টাকা দিয়ে নিজেদের ভোগব্যয় বৃদ্ধি করে তাহলে পরিবারগুলির ভোগব্যয়ও সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে চলবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, সরকারী ঋণের প্রভাব নির্ভর করছে কার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হচ্ছে তার উপর।

সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতির উপরও এই প্রভাব নির্ভর করে। ঋণের টাকায় সরকার চলতি ব্যয় মেটাতে পারেন। প্রতিরক্ষা, আভ্যন্তর প্রশাসন, সামাজিক ত্রাণ ও কল্যাণ-মূলক কাজের জন্য সরকার যে সব দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করেন তাকে চলতি ব্যয় বলা যায়। আবার সরকার ঋণের টাকায় মূলধন ব্যয় মেটাতেও পারেন। সরকার ঋণের টাকায় বাঁধ, সেচখাল, বিদ্যুৎব্যবস্থা প্রভৃতি গড়ে তুলতে পারেন। এগুলো সামাজিক মূলধনের অংশ। সরকার ঋণের টাকায় চলতি ব্যয় মেটালে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটবে। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর কোন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়বে না। অথচ মূলধনী ব্যয়ে টাকা ব্যয় করলে দেশের উৎপাদন ক্ষমতার উন্নয়ন হবে।

এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় দীর্ঘকালীন প্রভাব পড়বে। কাজেই আমরা বলতে পারি—

সরকারী ঋণের প্রভাব নির্ভর করে ঘাটতিপূরণের ধরন ও সরকারী ব্যয়ের ধরনের উপর।

১৪৫ সরকারী ঋণের কি ভার আছে?

সরকারী ঋণ দুরকমের হতে পারে, যথা—বৈদেশিক ও আভ্যন্তর ঋণ। কাজেই সরকারী ঋণের ভার বলতে উভয় প্রকার ঋণের ভারকেই বোঝায়। কিন্তু ঋণের ভার বলতে কী বোঝায়? এ প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর নেই। ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে সুদ দেবার শর্তে অর্থ ধার করে। ঋণ শোধ করার সময় মূল টাকাটা শোধ করতে হয়, তার সঙ্গে সুদ দিতে হয়। তাহলে সুদ হল অতিরিক্ত বোঝা। মূল টাকা শোধ করার সময় তো ভার বোধ করার কোন কারণ নেই। ঋণের যে টাকাটা আগে নেওয়া হয়েছে, পরে সেটাই ফিরে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই মূল পরিশোধের ভার নেই। অতএব **ঋণের ভার বলতে বোঝায় ঋণের সুদের ভার।**

কিন্তু এখানে একটি কথা বলার আছে। ঋণ অর্থের হিসেবে নেওয়া হয়, অর্থের হিসেবে শোধ করা হয়। এটা হল ঋণের অর্থগত পরিমাণ এবং এই পরিমাণ মূলের ক্ষেত্রে সব সময় সমান থাকে। ঋণগ্রহীতা যত টাকা ধার নেয়, মূল হিসেবে ঠিক তত টাকাই শোধ দেয় এবং তার উপর সুদ দেয়। কিন্তু অর্থের হিসেবে যে ঋণ নেওয়া হয় বা শোধ করা হয়, তাকে আমরা দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশ করতে পারি। দ্রব্যের হিসেবে প্রকাশিত ঋণকে বস্তুগত ঋণ বলা যায়। ঋণ যে সময়ে নেওয়া হয়, তার কয়েক বছর পর শোধ করা হয়। এখন ঋণ নেওয়ার সময় ও শোধ করার সময় —এই দুটি সময়ের মধ্যে যদি জিনিসপত্রের দামের পরিবর্তন হয়, তাহলে ঋণের বস্তুগত পরিমাণ স্থির থাকবে না। সেক্ষেত্রে, যদি দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ে বা কমে, তাহলে ঋণের বস্তুগত পরিমাণ যথাক্রমে কমবে বা বাড়বে। এখন ঋণ নেওয়ার সময় যে দামস্তর থাকে, ঋণ শোধ করার সময় যদি দামস্তর কমে যায়, তাহলে ঋণের মূল শোধ করার ক্ষেত্রেও ঋণের ভার থাকবে। সেক্ষেত্রে ঋণের ভার = মূল ঋণের ভার + সুদের ভার হবে। কিন্তু দামস্তর যদি অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে মূল ঋণের কোন ভার থাকবে না। কিন্তু দামস্তর সচরাচর বেড়েই যায়। **দামস্তর বাড়লে ঋণের বাস্তব ভার হ্রাস পায়।** এই বাস্তব ভার যে শুধু মূলের বাস্তব ভার তাই নয়, এটা সুদেরও বাস্তব ভার বোঝাতে পারে।

বৈদেশিক ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা দেশ বিদেশী মুদ্রায় ঋণ পেয়ে থাকে। সেই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা দিয়ে কী পরিমাণ স্বদেশী মুদ্রা পাওয়া যাবে, সেটা দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের দ্বারা নির্ধারিত হবে। আবার—সেই পরিমাণ স্বদেশী মুদ্রার সাহায্যে কী পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যাবে সেটা নির্ভর করবে স্বদেশের

দামস্তরের উপর। অনুরূপভাবে, ঋণ শোধ করার সময় যে অর্থ দেওয়া হবে, তার সাহায্যে কী পরিমাণ স্বদেশী ও বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করা যাবে—সেটাও বিবেচনার বিষয়। তাহলে আমরা বলতে পারি—বৈদেশিক ঋণের বস্তুগত ভার নির্ভর করবে (১) দুটি দেশের দামস্তরের উপর এবং (২) বিনিময় হারের উপর। যে সব শক্তির দ্বারা ওরা প্রভাবিত হয়, তারাও বৈদেশিক ঋণের ভারকে প্রভাবিত করবে। দুটি দেশের দামস্তর এবং দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের কোন পরিবর্তন না হলে বৈদেশিক ঋণের বস্তুগত ভার বলতে কেবলমাত্র সুদের ভারকেই বোঝাবে। তাহলে আমরা বলতে পারি বৈদেশিক ঋণের ভার আছে। কিন্তু বিদেশ থেকে যে ঋণ নেওয়া হয়, সেই ঋণের সাহায্যে যদি দেশের উৎপাদন ও আয়, কর্মনিয়োগ, ভোগ্যদ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে ঋণের উপকার (Benefit of debt) পাওয়া যায়। ঋণের ভার আছে কি নেই, সেই প্রশ্নটিকে এই উপকারের ভিত্তিতে বিচার করতে হয়। যদি ঋণের উপকার ঋণের ভারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে ঋণের কোন নীট ভার থাকবে না।

আভ্যন্তর ঋণের ভার আছে কি নেই সেটা ঠিক করা খুবই মুশকিল। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে অর্থনীতির পণ্ডিতরা পর্যন্ত এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেন না। অনেকে বলেন সরকারের আভ্যন্তর ঋণের কোন ভার নেই, কারণ গণতান্ত্রিক দেশে সরকার হল জনগণ। জনগণ যদি জনগণের কাছ থেকে ঋণ নেয় এবং পরে সেই ঋণ শোধ করে তাহলে জনগণের টাকা জনগণের কাছেই থাকে। কিন্তু এটি খুবই দুর্বল যুক্তির কথা। দেশের কয়েকটি পরিবার বা প্রতিষ্ঠান সরকারী দণ্ড কেনে। সকলে কেনে না। কাজেই সরকারী ঋণ বলতে বোঝায়—দেশের সব জনগণকে কিছু সংখ্যক মানুষের ঋণ দেওয়া। আবার সরকার যদি জনগণের উপর কর চাপিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং সেই অর্থ দিয়ে ঋণ শোধ করেন, তাহলে যারা কর দেয় তারাই ঋণের বোঝা বহন করে। তারাই যদি ঋণদাতা হয় তাহলে সরকারী ঋণের কোন বোঝা না থাকতে পারে। কিন্তু ঋণদাতা ও করদাতা যদি পৃথক হয় এবং এটা হওয়াই স্বাভাবিক, তাহলে সরকারকে যারা ঋণ দেবে তারা ঋণের বোঝা বহন করবে না. যারা ঋণ দেয়নি তারাই ঋণের বোঝা বহন করবে। সেক্ষেত্রে ঋণের বোঝা থাকতে পারে।

আবার পরিবারগুলি যদি নিজেদের সঞ্চিত অর্থ থেকে সরকারকে ঋণ দেয় তাহলে তাদের ভোগব্যয় কমবে না। কিন্তু পরিবারগুলি যদি চলতি আয় (Current income) থেকে সরকারকে ঋণ দেয় তাহলে তাদের ভোগব্যয় কমবে। জনগণের ভোগ বিরতি ঘটবে। যে পরিমাণে পরিবারগুলির ভোগব্যয় কমবে তাকেই সরকারী ঋণের সুযোগ ব্যয় বলা যেতে পারে। তবে সরকারকে ঋণ দেওয়া যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে সরকারকে ঋণ দেওয়ায় পরিবারগুলির বর্তমান ভোগ বিরতি ঘটলেও জনগণ ভবিষ্যৎ সুফলের জন্যই সেটা চায় বলতে হবে। কাজেই তার ভার থাকবে না।

ঋণের টাকা দিয়ে সরকার কী করেন সেটাও ঋণের ভার নির্ধারণ করে। সরকার যদি ঋণের টাকায় সমরাস্ত্র কেনেন, কিংবা যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদনের জন্য সম্পদ নিয়োগ করেন, তাহলে সরকারী ঋণের ফলে বেসামরিক দ্রব্যসামগ্রী যেমন খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় ইত্যাদির যোগান কমবে। দেশের লোকের ভোগবিরতি ঘটবে। কিন্তু সরকার যদি ঋণের টাকায় বিদ্যালয়, জলাধার, বিদ্যুৎপ্রকল্প ইত্যাদি গড়ে তোলেন তাহলে দেশের মূলধন ভান্ডার বৃদ্ধি পাবে, ভবিষ্যতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এই দুটো ক্ষেত্রে ঋণের ভার দুরকমের হবে। প্রথম ক্ষেত্রে ঋণের ভার তীব্র হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঋণের ভারকে আমরা সহনীয় ভার বলতে পারব।

অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের মতে আভ্যন্তর সরকারী ঋণের নানারকম প্রভাব থাকতে পারে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব দুটি (ক) বন্টন সম্পর্কিত প্রভাব (Distributional effects) এবং (খ) অর্থনৈতিক যোগসূত্রনাশক প্রভাব (Distortional effects). বন্টনের উপর প্রভাব ঘটে যখন রামের দেনা মেটানোর জন্য সরকার শ্যামের উপর কর চাপান। রাম সরকারকে ঋণ দিয়েছে। শ্যাম সেই দেনা শোধ করেছে। রাম যদি ধনী হয়, শ্যাম যদি গরীব হয়, তাহলে শ্যামের উপর বোঝা চাপিয়ে রামের দেনা শোধ করবেন সরকার। এটা অন্যায়। অনেক সময় এক প্রজন্মের দেনা আগামী প্রজন্মের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। আগামী প্রজন্মের লোকেরা যে ঋণ করেনি, সেই ঋণের ভার তাদেরকে বহন করতে হয়। এইভাবে ঋণের বোঝা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে অথবা আগামী দিনের মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। প্রথম ক্ষেত্রে আয়ের বন্টনের পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বর্তমান বন্টন ও ভবিষ্যৎ বন্টন প্রকৃতির আপেক্ষিক সম্পর্কের পরিবর্তন হয়। আবার রামের ঋণ শোধ করার জন্য সরকার যদি রামের উপরেই কর চাপাতেন তাহলেও বন্টনগত প্রভাব না থাকলেও অর্থনৈতিক যোগসূত্রনাশক প্রভাব দেখা দিত। কর চাপালে ব্যক্তির কর্মস্পৃহা কমে যায়, সঞ্চয় প্রবণতা কিংবা ভোগ প্রবণতার পরিবর্তন হয়। ফলে শ্রমের যোগান, সঞ্চয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি বাস্তব বিষয়ের পরিবর্তন হয়। এর ফলে যদি দেশের আয় কমে, তাহলে সরকারী ঋণের ফলেই সেটা হয়ে থাকে। কাজেই সেখানে ঋণের ভার থাকবে।

সরকারী বন্ড ক্রয় করে পরিবারগুলি সরকারকে ঋণ দেয়। পরিবারগুলির হাতে সরকারী বন্ড থাকে। সরকারী বন্ড হল একটি মূল্যবান আর্থিক সম্পত্তি। যে সব পরিবারের হাতে এইসব বন্ড থাকবে, তারা নিজেদেরকে ধনী বোধ করবে। ফলে তাদের সঞ্চয় প্রবণতা কমে যেতে পারে এবং ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে আয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়তে পারে। এটা হল সরকারী ঋণের প্রভাব। কিন্তু এই প্রভাবটিকে কাম্য প্রভাব বলা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, সরকারী ঋণের ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিভিন্ন-ভাবে প্রভাবিত হয়। কারো লাভ হয়, কারো ক্ষতি হয়। কাজেই কোন একজন

নিরপেক্ষ ব্যক্তির পক্ষে সরকারী ঋণের ভার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

১৪.৬ কর : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের পার্থক্য

সরকারকে বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ দিতে হয় এবং যার বিনিময়ে সরকারের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে কিছু পাওয়ার দাবি করা যায় না তাকে কর বলা হয়। করের ফলে সরকারের আয় বা রাজস্ব আসে, কিন্তু করদাতার ব্যয় হয়। কর দুরকমের হতে পারে। যথা –প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। করদাতা সরাসরিভাবে যে কর সরকারকে দেয় এবং করদাতা যার ভার বহন করে সেই করকে বলা হয় প্রত্যক্ষ কর। প্রত্যক্ষ কর বসানো হয় ব্যক্তি বা পরিবারের আয় এবং/কিংবা সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠানের মুনাফার উপর। অপরপক্ষে যে কর করদাতা সরাসরিভাবে সরকারকে দেয় না, অন্যের মাধ্যমে দেয় তাকে পরোক্ষ কর বলা হয়। পরোক্ষ কর বসানো হয় দ্রব্য ও সেবার ক্রয় কিংবা বিক্রয়ের উপর, উৎপাদনের উপর কিংবা আমদানি ও রপ্তানির উপর। যে দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর বসে বিক্রেতা সেই দ্রব্যের ক্রেতার নিকট থেকে সেই দ্রব্য বিক্রয় করার সময় তার দামের সঙ্গে বিক্রয় করও সংগ্রহ করে এবং সরকারের কাছে জমা দেয়। এখানে বিক্রেতা কর আদায় করে কিন্তু সে করদাতা নয়। করদাতা হল ক্রেতা। কিন্তু ক্রেতা প্রত্যক্ষভাবে সরকারের কাছে এই কর দেয় না। তাহলে আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি করতে পারি।

(১) প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা সরাসরিভাবে সরকারের কাছে কর জমা দেয়. পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা সরাসরি না দিয়ে অন্যের (বিক্রেতার) মাধ্যমে দেয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে সরকার ও করদাতার মধ্যে অন্য কোন তৃতীয় পক্ষের অবস্থিতি থাকে না, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষ থাকে।

(২) প্রত্যক্ষ কর আরোপিত হয় ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত আয়,. সম্পত্তি ও মুনাফার উপর। কিন্তু পরোক্ষ কর আরোপিত হয় সাধারণত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর উৎপাদন, ক্রয়, বিক্রয়, আমদানি ও রপ্তানির উপর।

(৩ প্রত্যক্ষ করের ফলে করদাতার আয় বা ব্যয় করার ক্ষমতা কমে. কিন্তু পরোক্ষ করের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ে এবং ক্রেতা যদি বেশি দাম ;দিয়ে সেই সব দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে, তাহলেই তার ব্যয় বাড়ে।

(৪) ব্যক্তি, পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের আয় ও সম্পত্তি কিংবা মুনাফা নির্দিষ্ট সীমার উপরে গেলেই তাদের উপর আয়কর, সম্পত্তি কর বা মুনাফা কর চাপানো হয়। একবার কর বসানো হলে করদাতার পক্ষে সেই কর দেওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি কর-আরোপিত দ্রব্য ক্রয় না করে, তাহলে তাকে কর দিতে হয় না। অর্থাৎ পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক উপাদান কম থাকে।

(৫) প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতার করদানের ক্ষমতার (Ability to pay Taxes) কথা বিবেচনা করা হয়, কিন্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে তা করা হয় না।

(৬) প্রত্যক্ষ করের ফলে করদাতার আয় কমানো হয়। ফলে করদাতার কর্মস্পৃহা কমে। করদাতা যদি অন্য কোন উপাদানের সেবার যোগান দিয়ে সেই আয় পায়, তাহলেও সেইসব উপাদানের সেবার যোগান কমে, কিংবা দাম বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দ্রব্যসামগ্রীর যোগানও কমে যেতে পারে। কিন্তু পরোক্ষ করের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের চাহিদা হ্রাস পায়।

১৪৭ (ক) **প্রত্যক্ষ করের গুণ ও দোষ ঃ**

গুণ ঃ (১) প্রত্যক্ষ কর যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত হয়, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সেই কর দিতে বাধ্য থাকে। সাধারণত সমাজে যে সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খুব বেশি আয়, সম্পদ বা মুনাফার মালিক হয়, তাদের উপরেই প্রত্যক্ষ কর আরোপিত হয়। যাদের আয় বেশি তাদের কর প্রদানের ক্ষমতা বেশি হবে, কাজেই তাদের উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করলে কোন ক্ষতি হয় না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর কর-প্রদানেব ক্ষমতা তত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(২) যাদের আয় বা সম্পদ বেশি তাদের কর প্রদানের ক্ষমতা বেশি এবং তারা, সমাজ থেকে বেশি সুবিধা ভোগ করে। কাজেই তাদের উপর কর বসালে কোন ক্ষতি হয় না। যারা বেশি সুবিধা পাবে, তারা বেশি কর প্রদান করে তার কিছুটা পরিশোধ করবে—এই সুবিধা তত্বের উপর প্রত্যক্ষ কর প্রতিষ্ঠিত।

(৩) প্রত্যক্ষ কর ধনীদের উপর বসানো হয়। এর ফলে ধনীদের আয় হ্রাস পায় এবং সমাজে আয় বণ্টনের বৈষম্যও হ্রাস পায়। অতএব আমরা বলতে পারি যে, প্রত্যক্ষ কর সাম্যনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(৪) প্রত্যক্ষ কর বাধ্যতামূলক। পরোক্ষ করের সঙ্গে তুলনা করলেই প্রত্যক্ষ করের এই সুবিধা বোঝা যায়। পরোক্ষ কর দ্রব্য বা সেবার উপর আরোপিত হয়। যে সেই দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে তাকেই সেই কর দিতে হয়। যে ক্রয় করে না তাকে দিতে হয় না। এখন কর বসানো হয়েছে দেখে কেউ যদি দ্রব্যটি ক্রয় না করে, তাহলে সরকার ক্রয় করতে বাধ্য করতে পারেন না। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর আরোপিত হলেই যার উপর কর বসে সে রেহাই পায় না।

(৫) প্রত্যক্ষ করের মধ্যে বাধ্যতামূলক উপাদান বেশি থাকে বলে এর থেকে সরকারের আয়-প্রাপ্তির সম্ভাবনা বেশি থাকে। পরোক্ষ কর যেখানে অনিশ্চিত, সেখানে প্রত্যক্ষ কর অনেক নিশ্চিত। এর জন্য প্রত্যক্ষ করকে উৎপাদনশীল (Productive) কর বলা হয়।

(৬) প্রত্যক্ষ কর আদায় করার অসুবিধা কম। এর জন্য বিস্তৃততর কর-জাল ছড়াতে হয় না। বেশি কর্মচারী বা কর সংগ্রাহক নিয়োগ করতে হয় না এবং এই করের প্রশাসনিক জটিলতা কম।

(৭) প্রত্যক্ষ কর সরকারের হাতে বেশি ধারালো অস্ত্র তুলে দেয়। সে অস্ত্রের সাহায্যে সরকার তৎপরতার সঙ্গে সমাজের বৈষম্য নাশ করতে পারেন।

দোষ : (১) প্রত্যক্ষ কর ব্যক্তির কর্মস্পৃহা নষ্ট করে দেয়। যে ব্যক্তি বেশি পরিশ্রম করে সে বেশি আয় পায়। সরকার সেই আয়ের উপর করের আঘাত হানলে ব্যক্তি বেশি পরিশ্রম করতে উৎসাহ পায় না। সমাজে উদ্যোগ গ্রহণ, দক্ষতা প্রদর্শন প্রভৃতি গুণগুলি পুরস্কৃত হওয়া দরকার। কিন্তু প্রত্যক্ষ করের দ্বারা এই গুণগুলিকে যেন শাস্তি দেওয়া হয়।

(২) প্রত্যক্ষ কর করদাতার কাছে সবচেয়ে অপ্রিয় কর। ক্রেতা যখন কোন দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে তখন তার কাছ থেকে কর নিলে সে বিশেষভাবে বুঝতেও পারে না। ক্রেতা ভাবে দ্রব্য ক্রয় করছে বলেই সে বেশি দাম দিচ্ছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ কর করদাতাকে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত হবার সুযোগ দেয় না। সেইজন্য প্রত্যক্ষ কর অপ্রিয় কর।

(৩) প্রত্যক্ষ কর অপ্রিয় বলেই এতে কর ফাঁক দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে যদি করদাতা ও করসংগ্রাহক কর্মীদের দুর্নীতির মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে থাকে তাহলে প্রত্যক্ষ করের যে উৎপাদনশীলতা নামক গুণের কথা বলা হয় তার ছায়ামাত্র থাকবে না।

(৪) প্রত্যক্ষ কর সকলকে স্পর্শ করে না। যারা ধনী ও বিত্তবান তারাই এই করদানের গৌরব বোধ করে। করদানের গৌরববোধ থেকে নাগরিক চেতনা ও দায়-দায়িত্ব বোধ জাগ্রত হয়। যত বেশি সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে এই চেতনার বিকাশ ঘটে ততই ভালো। সেই বিচারে প্রত্যক্ষ কর কাম্য নয়। এতে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটে না।

(৫) প্রত্যক্ষ কর করদাতার আয় কমিয়ে দেয়। আয় কম হলে করদাতার ভোগব্যয় কমে কিংবা সঞ্চয় কমে। করদাতা ভোগব্যয় কমিয়ে দিলে দেশের কার্যকরী চাহিদা হ্রাস পায়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় কমে এবং দেশে মন্দার প্রভাব বিস্তার লাভ করে।

(৬) অপর পক্ষে প্রত্যক্ষ করের ফলে সঞ্চয় হ্রাস পেতেও পারে। সঞ্চয় কম হলে মূলধন গঠন কম হয়। কাজেই আমরা বলতে পারি—প্রত্যক্ষ কর সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সঙ্কুচিত করতে পারে। অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে এর প্রভাব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর পড়তে পারে।

(খ) পরোক্ষ করের গুণ ও দোষ :

গুণ : (১) পরোক্ষ কর দ্রব্য বা সেবার উপর বসানো হয়। ক্রেতা যখন সেই দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করে তখনই তাকে কর দিতে হয়। প্রত্যক্ষ করের মত পরোক্ষ কর এত বেশি বাধ্যতামূলক নয়। এর জন্য জনগণ পরোক্ষ করকে বেশি পছন্দ করে। আমরা বলতে পারি— পরোক্ষ কর কম অপ্রিয় কর।

(২) পরোক্ষ করের পরিমাণ সাধারণত কম হয়। করের ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্য ক্রয় করার সময় ক্রেতা কর সমেত দামকেই দ্রব্যের দাম বলে মনে করে।

সে করের চাপ বেশি বুঝতে পারে না। অর্থাৎ পরোক্ষ করের ভার কম বলে সকলে সহজে এই ভার বহন করতে পারে।

(৩) পরোক্ষ কর ধনী ক্রেতা বা দরিদ্র ক্রেতাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। সরকারের দৃষ্টিতে সকলেই সমান—এই রকম একটি ধারণা পরোক্ষ করের পিছনে কাজ করে থাকে।

(৪) পরোক্ষ কর থেকে সরকারের বেশি আয় হয়। সমাজে মাত্র কয়েকটি পরিবার বেশি আয় উপার্জন করলে তাদের উপর আয় কর চাপিয়ে সরকারের খুব বেশি আয় আসে না। অথচ পরোক্ষ কর সকল দেশবাসীকেই দিতে হয় বলে পরোক্ষ কর থেকে বেশি আয় পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য দ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর আরোপ করা হলে সেই দ্রব্যের দাম বেড়ে যায়। দাম বেড়ে গেলে চাহিদা কমে যায়। কিন্তু চাহিদা কী পরিমাণ কমবে সেটা চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করছে। যে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক, তার দাম বাড়লেও চাহিদা খুব একটা কমে না। কাজেই যে দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক তার উপর করারোপ করলে চাহিদা বেশি কমবে না। এতে সরকারের আয় বেশি বাড়বে।

(৫) দেশের বহু ক্রেতা দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করার সময় পরোক্ষ কর প্রদান করে। কাজেই আমরা বলতে পারি যে—পরোক্ষ কর বহু মানুষকে স্পর্শ করে। এর ভিত্তি বহু-বিস্তৃত।

(৬) কর প্রদান করলে করদাতা নিজেকে রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যয় বহনের অংশীদার বলে ভাবতে পারে। এতে নাগরিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

(৭) পরোক্ষ কর বসিয়ে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করা যায়। আবার পরোক্ষ কর হ্রাস করে দাম হ্রাস করা যায়। দ্রব্যের দামে খুব বেশি ওঠানামা থাকলে পরোক্ষ করের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে সেই ওঠানামাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(৮) পরোক্ষ করের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে দামের ওঠানামায় পরিবর্তন ঘটানো যায়। সেই সঙ্গে দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদানের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়-গুলির মধ্যে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানো যায়।

(৯) পরোক্ষ কর আরোপ করে সরকার অবাঞ্ছিত ভোগ এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভোগ কমাতে পারেন। মদ, গাঁজা, সিগারেট প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের ভোগ কমাতে হলে ঐ সব দ্রব্যের উপর অতি উচ্চহারে কর বসাতে হয়।

(১০) দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি করার জন্য সরকার রপ্তানি দ্রব্যের উপর কর ছাড় ঘোষণা করতে পারেন। আমদানি হ্রাস করার জন্য সরকার আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করতে পারেন। রপ্তানি শুল্ক ও আমদানি শুল্ক নামক পরোক্ষ করের মাধ্যমে সরকার দেশের বাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন।

দোষ ঃ (১) পরোক্ষ করের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি হল যে, এতে ধনী

ক্রেতা ও দরিদ্র ক্রেতার করদানের ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য করে না। এতে ন্যায়-নীতিকে লঙ্ঘন করা হয়।

(২) পরোক্ষ করের ফলে করারোপিত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়: বেশি দামে দ্রব্য ক্রয় করা যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না তারা সেই দ্রব্যটির ভোগ বন্ধ করতে বাধ্য হয়। অনেকে ভোগ কমিয়ে দেয়। এতে তাদের অসুবিধা হয়। করারোপিত দ্রব্যটি যদি চাল, গম, ডাল, লবণ, কাগজ, ঔষধ ইত্যাদি অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য হয় তাহলে সাধারণ ক্রেতাদের অসুবিধা বেশি হয়।

(৩) মাদক দ্রব্যের উপর উচ্চহারে কর চাপিয়ে তাদের ভোগ কমাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু যারা মাদক দ্রব্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, বেশি দামেও সে সব দ্রব্য ভোগ না করলে তাদের চলে না। তখন তারা অন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা কমিয়ে দেয়। এর ফলে তাদের কিংবা তাদের পরিবারের সদস্যদের অসুবিধা হয়।

(৪) পরোক্ষ কর নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের উপর খুবই মারাত্মক হতে পারে। নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের কাছে এই দ্রব্যের চাহিদা খুবই অস্থিতিস্থাপক। কাজেই পরোক্ষ করের ভার নিম্ন আয় ব্যক্তিদের উপর বেশি হারে পড়ে। সেইজন্য পরোক্ষ করকে অধোগতি সম্পন্ন কর বলা হয়।

(৫) পরোক্ষ কর সংগ্রহ করার অসুবিধাও বেশি। এর জন্য বহু অফিস ও কর্মচারী রাখতে হয়। ফলে কর সংগ্রহের ব্যয় বেড়ে যায়। এই দিক থেকে দেখলে বলা যায়, পরোক্ষ কর উৎপাদনশীল কর নয়।

(৬) প্রত্যক্ষ কর যেমন কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয় পরোক্ষ করও তেমনি দেশের দুর্নীতি বৃদ্ধি করে। ক্রেতারা যে কর দেয়, ব্যবসায়ীরা সেই করের ন্যায্য হিসাব মত সরকারের ঘরে করের অর্থ জমা দেবে; সরকারী কর্ম-চারীদের সঙ্গে কোন অশুভ যোগাযোগ করবে না—এমন কথা বলা যায় না। অনুন্নত এবং দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে পরোক্ষ করকে ঘিরে বহু দুষ্ট চক্র গড়ে ওঠে।

(৭) পরোক্ষ কর গণচেতনা বৃদ্ধি করে বলে যে কথা বলা হয় তার মধ্যে ভাবালুতা ছাড়া বাস্তবতা নেই। বরং বলা যায়—পরোক্ষ করের দ্বারা সরকার বেশি সংখ্যক দেশবাসীর কাছে বেশি অপ্রিয় হয়ে পড়েন।

১৪.৮ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সুবিধা ও অসুবিধার তুলনা :

প্রথমেই বলা যায়—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করকে প্রতিযোগী কর বলে ভাবা উচিত নয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়প্রকার করের প্রয়োজন আছে, ওদের কার্যকারিতাও ভিন্ন ধরনের। কাজেই আমরা বলতে পারি না যে, প্রত্যক্ষ করের সুবিধাগুলি পরোক্ষ করের অসুবিধা অথবা প্রত্যক্ষ করের অসুবিধাগুলি পরোক্ষ করের সুবিধা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, কিংবা প্রত্যক্ষ কর কমিয়ে পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করা

উচিত, কিংবা তার বিপরীত করা উচিত। করের সুবিধা বা অসুবিধার আলোচনা করতে গেলে মনে রাখতে হবে করের ক্ষেত্রে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে ; একটি পক্ষে থাকেন জনগণ, অপরপক্ষে থাকে সরকার। জনগণ হল করদাতা এবং সরকার হল করগ্রহীতা। করের বিনিময়ে যেহেতু প্রত্যক্ষভাবে কিছুই পাওয়া যায় না, কাজেই করের ব্যাপারে সরকারের সুবিধা ও জনগণের অসুবিধা থাকবেই। সেটা যে-কোন করের ক্ষেত্রেই হবে। এই দুটি কথা মনে রেখে আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সুবিধা ও অসুবিধার তুলনা করতে পারি।

(১) প্রত্যক্ষ কর করদাতার কর প্রদানের ক্ষমতার কথা বিবেচনা করে। যার কর দেবার ক্ষমতা বেশি (অর্থাৎ যার আয় বেশি) তার উপর বেশি আয়কর চাপানো হয়। যার আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার নীচে থাকে তার উপর আয়কর চাপানো হয় না। কিন্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে এসব বিবেচনা করা হয় না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর ন্যায়-নীতি (Principle of justice) মেনে চলে। কিন্তু পরোক্ষ কর ধনী-দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য করে না।

(২) প্রত্যক্ষ করের মধ্যে বাধ্যতামূলক উপাদান বেশি থাকে, পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে তা কম। কাজেই প্রত্যক্ষ কর থেকে রাজস্ব আদায় হবার সম্ভাবনা ও সুযোগ বেশি। কিন্তু পরোক্ষ করের ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হলে কোন ক্রেতা সেই দ্রব্যটি না কিনতেও পারে। কোন ক্রেতাকেই এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারা যায় না। কাজেই সরকার যদি ভাবেন পরোক্ষ কর থেকে এত টাকা আদায় করা যাবে সেই আশা পূরণ নাও হতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করের টাকা পাওয়া যেতে পারে বলে মোটামুটি আশা করা যায়।

(৩) প্রত্যক্ষ করের দ্বারা দেশের আয় বণ্টনের বৈষম্যকে দূর করা যায়। দেশের লোকেদের ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা নির্ভর করে ব্যয়যোগ্য আয়ের (Disposable Income) উপর এবং আয়ের বণ্টনের উপর। সরকার প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে ব্যয়-যোগ্য আয় ও আয়ের বণ্টন উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারেন। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কম হলে সরকার বাজেট নীতির সাহায্যে প্রত্যক্ষ কর কমিয়ে দিয়ে বেসরকারী ভোগব্যয়কে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করতে পারেন। অপর পক্ষে মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার প্রত্যক্ষ কর বাড়িয়ে দিয়ে ব্যয়যোগ্য আয় এবং এইভাবে ভোগব্যয় কমাতে পারেন। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করই হল সরকারের প্রধান হাতিয়ার। পরোক্ষ করের এই কার্যকারিতা নেই।

(৪) প্রত্যক্ষ কর আদায় করার খরচও কম এবং দেশবাসীদের কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা খুব বেশি না হলে প্রত্যক্ষ করের প্রশাসনিক জটিলতাও কম হয়। কিন্তু পরোক্ষ কর যারা আদায় করে সেই সরকারী কর্মচারীরাই দুর্নীতিগ্রস্ত হলে পরোক্ষ কর আদায়ের হার কম হতে বাধ্য। অর্থাৎ পরোক্ষ কর খুব একটা উৎপাদনশীল কর নয়।

(৫) দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর বিক্রয় কর বা অন্য কোন পরোক্ষ

কর বসানো হলে ঐসব দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়; তখন গরীব ও মধ্যবিত্তদের খুবই অসুবিধা হয়। অর্থাৎ পরোক্ষ করের বোঝা কম আয়ের লোকদের উপর বেশি পড়ে। পশ্চাৎমুখী অধোগতিশীল কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই এটা হয়। সামাজিক দিক দিয়ে এটা গ্রহণযোগ্য নয়।

(৬) কিন্তু প্রত্যক্ষ কর সকলকে স্পর্শ করে না। পরোক্ষ কর বেশি সংখ্যক লোককে স্পর্শ করে। কর দিলে নাগরিক দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। কাজেই প্রত্যক্ষ করের চেয়ে পরোক্ষ করের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তৃততর।

(৭) যে সব দ্রব্যের দাম বাড়লে চাহিদা খুব একটা কমে না, সেইসব দ্রব্যের উপর পরোক্ষ কর বসানো হলে চাহিদা কমে না। অথচ সরকারের রাজস্ব আদায় হয়। প্রত্যক্ষ করের চেয়েও পরোক্ষ কর এসব স্থলে বেশি উৎপাদনশীল হতে পারে।

(৮) প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বেশি হয়। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা কর ফাঁকি দিতে পারে না, কিংবা সে কর ফাঁকি দিতেও চায় না। এখানে সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির জন্যই সরকারের ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা কর ফাঁকি দিতে পারে, তাছাড়া দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপারও এর সঙ্গে যোগ দিতে পারে।

(৯) প্রত্যক্ষ কর করদাতার কর্মস্পৃহা বা সঞ্চয় প্রবণতাকে কমিয়ে দেয়। পরোক্ষ করের সেরকম কোন প্রভাব নেই বলেই মনে হয়।

১৪.৯ সমানুপাতিক ও গতিশীল কর (Proportional and Progressive Taxes) :

আমরা জানি প্রত্যক্ষ কর বসে ব্যক্তি বা পরিবার এবং প্রতিষ্ঠানের আয় বা সম্পত্তির উপর। এখানে আমরা ধরে নেব যে আয়করই হল একমাত্র প্রত্যক্ষ কর। এই আয়কর বসানো হয় ব্যক্তির বা পরিবারের বার্ষিক আয়ের উপর এবং প্রতিষ্ঠানের মোট মুনাফার উপর। আয়কর বসানোর সময়—একটি নিম্নসীমার আয়ের কথা বলা হয়। এই আয়ের উপর কোন কর বসানো হয় না। এই সীমার ঊর্ধ্বে যে আয় থাকবে তাকে বলা হবে করযোগ্য আয় (Taxable Income). যেমন, আমাদের দেশে যদি বার্ষিক ১৫,০০০ টাকা আয়কে নিম্নতম সীমা ধরা হয়, তাহলে যে ব্যক্তি বছরে ১৫,০০০ টাকা কিংবা তার কম আয় পেয়ে থাকে, তাহলে তাকে কোন আয়কর দিতে হবে না। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি ২০,০০০ টাকা আয় পায়, তাহলে তার অতিরিক্ত করযোগ্য আয় হবে ৫,০০০ টাকা। অবশ্য ১৫.০০০ টাকার উপর সরকার জীবনবীমার প্রিমিয়াম, পোস্ট অফিসের কয়েক প্রকার সঞ্চয়, প্রভিডেণ্ট ফান্ড বাবদ দেয় অর্থ ইত্যাদি আরো অনেক প্রকার জমাকে কর ছাড়ের সুযোগ দিতে পারেন। এইসব ছাড় দিয়ে যে অতিরিক্ত আয় হবে, তার উপর আয়কর বসানো হয়। এই আয়ক দুরকমের হতে পারে, যথা, সমানুপাতিক (Propor-

tional) এবং গতিশীল (Progressive). যেখানে আয়করের হার নির্দিষ্ট থাকে, যার ফলে অতিরিক্ত করযোগ্য আয় যেমন বৃদ্ধি পায়, করের পরিমাণও সেই হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাকে বলা হয় সমানুপাতিক আয়কর। যদি Y = প্রাপ্ত আয়, R = সবরকম ছাড় হয়, তাহলে করযোগ্য আয় হবে Y − R. এখন T = আয়কর হলে সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে $T = K(Y - R)$ হবে। এখানে K হল করের অনুপাত। এটি একটি ধ্রুবক।

কিন্তু গতিশীল করের ক্ষেত্রে করযোগ্য আয় যত বৃদ্ধি পায় ততই করের হারও বৃদ্ধি পায়। গতিশীল করের ক্ষেত্রে করের হার পরিবর্তনশীল ও ক্রমবর্ধমান হয়। অনেক ক্ষেত্রে করের হার অতিরিক্ত আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে। একে অধোগতিশীল কর (Regressive Taxation) বলা হয়।

সমানুপাতিক ও গতিশীল (ক্রমবর্ধমান হারে) উভয় করের প্রধান উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির অতিরিক্ত আয় কমিয়ে আয়-বণ্টনের বৈষম্য দূর করা। কিন্তু আয়-বণ্টনের বৈষম্য দূর করার ব্যাপারে সমানুপাতিক করের চেয়ে ক্রমবর্ধমান হারে গতিশীল করের প্রভাব বেশি। সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয় যে, ব্যক্তির আয় যে হারে বাড়ে তার কর দেওয়ার ক্ষমতাও সেই হারে বাড়ে। কিন্তু গতিশীল করে ধরে নেওয়া হয় যে, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির কর দানের ক্ষমতা অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি পেলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা কমে, কাজেই তার কাছ থেকে বেশি অর্থ আদায় করলে তার কোন ক্ষতি হয় না।

তাছাড়া সমানুপাতিক বা গতিশীল করের আর একটি উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক কাজকর্মের চক্রাকার উত্থান-পতন রোধের জন্য স্বয়ংক্রিয় স্থিতিশীলতা (Automatic Stability) সঞ্চার করা। সমৃদ্ধির সময় দেশবাসীদের আয় যত বাড়বে—করের সাহায্যে সেই অতিরিক্ত আয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিষ্কাশিত হবে। ফলে অর্থব্যবস্থার উচ্চচাপ কমবে। আবার মন্দার সময় আয় যখন কম থাকবে তখন আপনা থেকেই করের মাধ্যমে নিষ্কাশন কমবে।

তবে সমানুপাতিক বা গতিশীল উভয় করই ব্যক্তির কর্মস্পৃহাকে নষ্ট করে। সমানুপাতিক করের চেয়ে গতিশীল করের ভূমিকা এ ব্যাপারে বেশি। তাছাড়া গতিশীল করের প্রশাসনিক জটিলতা বেশি। এতে সরলতার নীতি অনুসৃত হয় না।

সমানুপাতিক করের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি :

সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে আয় ও করের পরিমাণের অনুপাত সমান থাকে। সকল আয়স্তরের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করা হয়। এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি হল নিম্নরূপ :

(ক) পক্ষে যুক্তি : (১) অতিরিক্ত আয় যে হারে বৃদ্ধি পায় সেই হারে করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে করদাতার উপর বেশি চাপ পড়ে না। করদাতা করের বোঝাকে সহনশীল বলে মনে করতে পারে।

(২) সমানুপাতিক করের বোঝা সহনশীল মাত্রার মধ্যে থাকে বলে করদাতা করপ্রদানে আগ্রহী হয়। এর ফলে কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা কম থাকে।

(৩) কর-ফাঁকির প্রবণতা কম থাকায় সমানুপাতিক কর আদায় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সেজন্য সমানুপাতিক করকে আমরা উৎপাদনশীল কর বলতে পারি।

(৪) সমানুপাতিক করের ক্ষেত্রে কর হিসাব করার জটিলতা খুবই কম। করদাতাগণ নিজেরাই করের হিসাব করতে পারে। তার জন্য তাদেরকে বিশেষভাবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকদের সাহায্য নিতে হয় না। করের হার বিভিন্ন আয়স্তরে বিভিন্ন হলে কর হিসাব করার অসুবিধা দেখা দেয়।

(৫) সমানুপাতিক করারোপের ফলে দেশের আয়-বণ্টনের কোন পরিবর্তন হয় না। যে করের ফলে আয়-বণ্টনের পরিবর্তন হয় এবং আয়-বণ্টনের ফলে সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত যোগসূত্র নষ্ট হয় সেই করকে অনেকে অবাঞ্ছনীয় কর বলে থাকেন। সমানুপাতিক করের সে রকম কোন অবাঞ্ছিত ফল নেই বলে মনে করা হয়।

(খ) বিপক্ষে যুক্তি : (১) যে হারে ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি পায় সেই হারে ব্যক্তির আয় প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, একথা ঠিক নয়। কাজেই সমানুপাতিক কর করদানের ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল নয়।

(২) সমানুপাতিক কর সুবিধাতত্ত্বের উপরও নির্ভরশীল নয়। সুবিধাতত্ত্বে বলা হয়, যারা সমাজ থেকে বেশি সুবিধা পাবে, তারা বেশি কর দেবে। সমাজ থেকে ধনীরা যে সুবিধা পায় তা আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সমান হারে বাড়ে না; তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে। কাজেই সমানুপাতিক কর যুক্তিযুক্ত নয়।

(৩) পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ক্রমবর্ধমান হারে কর ধার্য করা হয়। সকল ক্ষেত্রে আয় বাড়লে করদানের ক্ষমতাও বেশি বৃদ্ধি পায় না। অতএব সমানুপাতিক কর প্রচলিত রীতির বিপরীত।

(৪) সমানুপাতিক কর আয়-বণ্টনের বৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ সাহায্য করে না। অথচ কর হল সরকারের হাতে একটি বড় অর্থনৈতিক হাতিয়ার। এর সাহায্যে সরকার আয়-বণ্টনের বৈষম্য দূর করতে পারেন। সমানুপাতিক কর এ ব্যাপারে সরকারকে সাহায্য করে না।

(৫) সমানুপাতিক কর থেকে সরকারের কম আয় হয়। কাজেই একে আয়ের বড় উৎস হিসাবে ধরা যায় না।

(৬) সমানুপাতিক কর হিসাব করা সহজ, কিন্তু তার ফলেই যে করদাতাদের কর প্রদানের আগ্রহ বেশি হবে এমন কথা বলা যায় না। অনুরূপভাবে সমানুপাতিক কর যে বেশি জনপ্রিয় হবে এমন কথাও বলা যায় না।

গতিশীল করের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি :

পক্ষে যুক্তি : (১) গতিশীল কর ব্যবস্থায় করযোগ্য অতিরিক্ত আয় যত বৃদ্ধি

পায় করের হারও তত বৃদ্ধি পায়। এর পক্ষে যুক্তি দেখানো হয় যে, যাদের আয় বেশি, তাদের করদানের ক্ষমতাও ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। কাজেই গতিশীল কর করদানের ক্ষমতাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

(২) গতিশীল করের স্বপক্ষে তাত্ত্বিকযুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, ধনী লোকের আয় বেশি হওয়ায় তার আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা খুবই কম। অন্যান্য দ্রব্যের মত অর্থ বা আয়ের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা বিধিটি প্রযুক্ত হতে পারে। যার আয় বেশি তার কাছে এক টাকার উপযোগিতা খুবই কম হবে, অপর পক্ষে একজন কম ধনী ব্যক্তির কাছে সেই টাকাটির প্রান্তিক উপযোগিতা অপেক্ষাকৃত বেশি হবে। এই অবস্থায়—উভয় ব্যক্তির নিকট থেকে উপযোগিতার হিসাবে সমান পরিমাণে কর আদায় করতে হলে যার আয় যত বেশি হবে, তার উপর আর্থিক করের হার তত বেশি হবে।

(৩) গতিশীল কর সমাজে আয়ের বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করতে পারে। ধনী-ব্যক্তিদের আয় বেশি, কিন্তু তাদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম। অপর পক্ষে দেশের মধ্যবিত্ত ও স্বল্পবিত্ত মানুষদের প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বেশি। সরকার গতিশীল হারে ধনীব্যক্তিদের কাছ থেকে আয়কর আদায় করে হস্তান্তর পদ্ধতির মাধ্যমে সেই আয় স্বল্পবিত্ত মানুষদের মধ্যে বণ্টন করতে পারেন। এর দ্বারা আয়ের বণ্টন-বৈষম্য হ্রাস পাবে, সেই সঙ্গে দেশের ভোগ-প্রবণতাও বৃদ্ধি পাবে।

(৪) লর্ড কীনসের মতে দেশে যদি মন্দাবস্থা দেখা দেয়, তাহলে সুদের হার কমিয়ে বা অর্থের যোগান ও সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করে বিনিয়োগকারীদের মনোবল ও আস্থা বাড়ানো যাবে না। মন্দা দূর করতে হলে সরকারকে যথাযোগ্য ফিসক্যাল পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এই পদ্ধতির মূলকথা হল আয়ের বণ্টন-বৈষম্য দূর করে দেশের ভোগপ্রবণতাকে বাড়িয়ে দেওয়া। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে গতিশীল হারবিশিষ্ট করের সাহায্য নিতেই হবে।

(৫) গতিশীল করের মাধ্যমে সরকারের কর-রাজস্ব দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

(৬) বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই গতিশীল কর ব্যবস্থা বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। এর পিছনে যথেষ্ট গণসমর্থন থাকে। যে কোন গণতান্ত্রিক সরকার গতিশীল হারে কর চাপিয়ে অতিশয় ধনীব্যক্তিদের অতিরিক্ত আয় ছেঁটে দেন।

বিপক্ষে যুক্তি ঃ (১) গতিশীল কর অতিশয় অপ্রিয় হয়।

(২) আয়ের উপর যতই কর আরোপ করা হয় ততই করদাতা আয় উপার্জনে অনাগ্রহী হয়ে পড়ে। এর ফলে ব্যক্তির উদ্যোগ ও উৎসাহ দমিত হয়। দেশের উৎপাদনের উপর গতিশীল কর ঋণাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।

(৩) যে কোন প্রত্যক্ষ কর কর ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দেয়। গতিশীল হারের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা বেশি বৃদ্ধি পায়।

(৪) অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রমশ কমে আসে বলে যে কথা বলা হয় তাও

অনেক আধুনিক অর্থনীতিবিদ স্বীকার করেন না। কাজেই গতিশীল করের কোন তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই।

(৫) এই কর হিসাব করার পদ্ধতি বেশ জটিল হয়। আয়করের নিয়মকানুন সম্বন্ধে যারা বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ও দক্ষ—তাদের সাহায্য নিয়ে আয়কর দিতে হয়। এতে কর দেওয়ার ইচ্ছা আরো কমে যায়।

(৬) গতিশীল করের সাহায্যে ভোগপ্রবণতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে তো দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ প্রবণতা কমে যেতে পারে। এর ফলে দেশের মূলধন গঠনের হার হ্রাস পেতে পারে। স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে মূলধন গঠনের প্রয়োজন বেশি। কাজেই তার কাছে গতিশীল কর বিপজ্জনক হতে পারে।

১৪.১০ **কর-কানুন (Canons of Taxation) :**

কর আরোপ করার সময় কী কী অনুশাসন (Canon) বা কানুন মেনে চলা উচিত সে সম্বন্ধে অ্যাডাম স্মিথ চারটি কানুনের উল্লেখ করেছেন। এই চারটি কানুন হল -

(১) সমতার কানুন (Canon of equality or equity),
(২) নিশ্চয়তার কানুন (Canon of certainty),
(৩) সুবিধার কানুন (Canon of convenience) এবং
(৪) মিতব্যয়িতার কানুন (Canon of economy)।

পরবর্তীকালের লেখকরা এর সঙ্গে নিম্নলিখিত আরো ছটি কানুন যোগ করেন, যথা—

(৫) উৎপাদনশীলতার কানুন (Canon of productivity),
(৬) স্থিতিস্থাপকতার কানুন (Canon of elasticity),
(৭) পরিবর্তনীয়তার কানুন (Canon of flexibility),
(৮) সরলতার কানুন (Canon of simplicity),
(৯) বৈচিত্র্যের কানুন (Canon of diversity) এবং
(১০) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কানুন (Canon of achievements of economic objectives).

আমরা সংক্ষেপে এই দশটি কানুন সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারি :—

(১) অ্যাডাম স্মিথ মনে করতেন—রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী একজন নাগরিক রাষ্ট্রের কাছ থেকে যে রকম সুবিধা পাবে এবং তার যে পরিমাণ কর দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে সে সেই পরিমাণে কর প্রদান করবে ; তাহলে করারোপের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতা (Justice and equity) পালিত হবে। সমতার কানুনে কখনই বলা হয় না যে, প্রত্যেকে সমান পরিমাণে বা প্রত্যেকের আয়ের অনুপাতে কর প্রদান করবে। এতে বলা হয় যে, করের হার এমন হবে যাতে প্রত্যেকের উপর করের ভার সমান-ভাবে পড়ে।

(২) নিশ্চয়তার কাননে বলা হয় যে, করের হার, কর প্রদানের সময় ও পদ্ধতি যেন করদাতার কাছে নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাপিত হয়। করদাতা যেন জানতে পারে তাকে কখন, কী পরিমাণে ও কীভাবে কার কাছে কর দিতে হবে। এব্যাপারে কোন ইচ্ছামত পরিবর্তন ঘটানো উচিত নয়। সরকার যদি যখন-তখন করের হার বদল করেন, কিংবা নতুন করারোপের সিদ্ধান্ত নেন তাহলে করদাতারা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে। এতে করদাতাদের উপর অন্যায় করা হয় এবং সরকারেরও ক্ষতি হয়। ইংরেজিতে একটি কথা আছে—"An old tax is no tax", অর্থাৎ পুরানো কর করই নয়। যে কর বহুদিন থেকে চলে আসছে সে কর সম্বন্ধে করদাতারা সকলে অভ্যস্ত হয়ে আছে। তারা নিয়ম মত করের অর্থ বাদ দিয়ে বাকি অর্থ নিয়ে নিজেদের খরচ মেটায়। এতে তাদের উপর কোন চাপ পড়ে না। তাছাড়া সরকারের কাছে নিয়মিতভাবে করের অর্থ গিয়ে পৌঁছায়। গোটা ব্যাপারটি খুবই নিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে কাজ করে। সেজন্য বলা হয় যে, নিশ্চয়তার কানুন হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কানুন।

(৩) সুবিধার কাননে বলা হয় যে, করদানের সময় ও পদ্ধতি যেন করদাতার পক্ষে সুবিধাজনক হয়। যখন করদাতার হাতে টাকা-পয়সা আসে, তখন তাকে কর দিতে বললে তার পক্ষে সুবিধা হয়। আমাদের দেশে যখন ধান ওঠে তখন কৃষকরা খাজনা বা রাজস্ব দিতে পারে। কাজেই রাজস্ব দেওয়ার সময়টা যদি মরশুমের শেষে করা হয় তাহলে কৃষকদের পক্ষে কর দেওয়ার সুবিধা হয়। তেমনি বিভিন্ন পেশার মানুষদের কর দেওয়ার সময় তাদের সুবিধা মতো সময়ে হলেই ভালো হয়। আবার কর কীভাবে দেওয়া হবে, সে সম্বন্ধে নিয়ম ঠিক করার আগে করদাতার সুবিধার কথা যেন ভাবা হয়। চাষীকে যদি নগদ টাকায় কিংবা চেকে কর দিতে বলা হয় তাহলে হয়তো তার অসুবিধা হবে। আবার চাকুরীজীবীকে যদি বলা হয় ব্যক্তিগতভাবে আয়কর অফিসে এসে করের টাকা জমা দিতে হবে তাহলে তার অসুবিধা হতে পারে। আবার করের টাকা একসঙ্গে না দিয়ে কিস্তিতে কিস্তিতে দিতে বললেও করদাতার পক্ষে সুবিধা হয়।

(৪) মিতব্যয়িতার নীতিতে বলা হয় যে, কর আদায়ের ব্যয় যেন সবচেয়ে কম হয়। কর আদায় করার জন্য সরকারকে বহুধরনের অনেক কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়, তাদের বেতন, ভাতা এবং অফিস ইত্যাদির জন্যই সরকারের ব্যয় হয়। অ্যাডাম স্মিথ বলেছেন—এমনভাবে কর আরোপ ও আদায় করতে হবে যাতে কর আদায়ের ব্যয় সর্বনিম্ন স্তরে থাকে।

(৫) উৎপাদনশীলতার কাননে বলা হয় যে, সরকার কর আরোপ ও আদায় করার সময় সেই সব করের দিকে দৃষ্টি দেবেন যাদের থেকে সব চেয়ে বেশি রাজস্ব পাওয়া যায়। এরজন্য কম পরিমাণে রাজস্ব দেয় এমন বহু সংখ্যক কর না বসিয়ে বেশি রাজস্ব দেয় এমন সীমিত সংখ্যক কর বসানোর উপর অগ্রাধিকার দেবেন।

(৬) স্থিতিস্থাপকতার কানুন অনুসারে সরকারের কর-কাঠামো এমনভাবে

নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে সরকারের প্রয়োজনে বেশি পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হয়। আয়কর, আয়করের উপর অতিরিক্ত কর (সারচার্জ) ইত্যাদির সাহায্যে কর-কাঠামোর মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করা যায়।

(৭) পরিবর্তনীয়তার কানুন রাজস্ব আদায়ে স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করে। এতে বলা হয় যে, কর-কাঠামো এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে সহজেই করের হার পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। তা না হলে রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

(৮) সরলতার কানুন অনুসারে কর ব্যবস্থা সহজ, সরল ও সাধারণের বোধগম্য হওয়া উচিত। তা না হলে করদাতার মধ্যে কর-ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। করের হার যদি এমনভাবে ঠিক করা হয় যে করদাতা নিজের বুদ্ধি দিয়ে কোনমতেই বুঝতে না পারে যে তাকে ঠিক কী পরিমাণ কর দিতে হবে তাহলে করদানের ব্যাপারে তার স্বল্প আগ্রহ একেবারে মিলিয়ে যেতে পারে।

(৯) বৈচিত্র্যের কানুন অনুসারে সরকার একই সঙ্গে একাধিক কর আরোপ করবেন। তাতে কর-কাঠামোর মধ্যে বৈচিত্র্য আসবে। করদাতারা কোন একটি কর ফাঁকি দিতে চাইলে অন্য করের আওতায় পড়বে। এর ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে। তবে বহুসংখ্যক কর আরোপ করলে কর-পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি পায় সেকথা মনে রেখেই কর-কাঠামোর মধ্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করা উচিত।

(১০) অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কানুনে বলা হয় যে, কর-ব্যবস্থা এমন হবে যাতে সরকার করের সাহায্যে রাজস্ব সংগ্রহ করা ছাড়াও বিভিন্ন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করতে পারেন। আগেকার দিনে বিশ্বাস করা হত কর-কাঠামো সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাকে যেন "যেমন আছে তেমনি রাখে"। বর্তমানে সে ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে।

বর্তমানে বিশ্বাস করা হয়, সরকার করের সাহায্যে সমাজে আয়-বণ্টন, ভোগব্যয়, বিনিয়োগ প্রভৃতি বিষয়গুলির কাম্য পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। কাজেই করকে এমন হতে হবে যাতে সরকার করের দ্বারা সে সব পরিবর্তন সাধন করতে পারেন।

১৪.১১ করারোপের নীতি (Principles of Taxation)

সরকার যখন দেশবাসীদের উপর কোন কর আরোপ করেন তখন যে নীতি অনুসারে কর আরোপিত হয় তাকে হয় বলা করারোপের নীতি। এক্ষেত্রে আমরা তিনটি তত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি:

(১) (সরকারী) সেবাদানের ব্যয় তত্ত্ব (The Cost of Service Theory)

(২) উপকার বা সুবিধা তত্ত্ব (Benefit Theory)

(৩) কর প্রদানের সামর্থ্য তত্ত্ব (Ability to Pay Theory).

(১) ব্যয় তত্ত্ব: এই তত্ত্বে বলা হয় যে, সরকার যেহেতু দেশবাসীদের নানারূপ সেবা (প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) দিয়ে থাকেন, তার জন্য সরকারের ব্যয় হয়। সরকার কোন একজন ব্যক্তির জন্য যতখানি অর্থ ব্যয় করবেন তার সমান

কিংবা সমানুপাতে সেই ব্যক্তির কাছ থেকে কর আরোপ করবেন। সরকারের ব্যয় যত বৃদ্ধি পাবে, করের হারও তত বৃদ্ধি পাবে।

কিন্তু এই তত্ত্বটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ—(ক) সরকার যে সব সেবা দান করেন তাদের সকলের ব্যয় পরিমাপ করা যায় না।

(খ) এই তত্ত্বে সমতার নীতি অনুসরণ করা হয় না। সরকার যদি গরীব ও দুর্বল মানুষদের কল্যাণার্থে অধিক ব্যয় করে থাকেন তাহলেও গরীবদের কাছ থেকে বেশি কর আদায় করা কখনো উচিত নয়।

(গ) একজন ব্যক্তির জন্য সরকার কী পরিমাণ সেবা দান করছেন তার পরিমাপ করাও প্রায় অসম্ভব।

এবং (ঘ) সরকার যে কর আদায় করেন তার বিনিময়ে সরকার প্রত্যক্ষভাবে কোন কিছু দিতে বাধ্য নন। কোন সেবার বিনিময়ে সরকার কর আদায় করেন না।

২। উপকার তত্ত্ব :

এই তত্ত্বের বক্তব্য হল যে, সরকারের কাছ থেকে দেশবাসীরা উপকৃত হয়। সামগ্রিকভাবে সরকারের কাছ থেকে দেশবাসীরা যে উপকার পায় সামগ্রিকভাবে দেশের জনগণ সরকারকে তার সমান কর দিতে বাধ্য থাকবে। এটি হল সামগ্রিক দিক দিয়ে উপকার তত্ত্বের ব্যাখ্যা। অনেকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বটিকে প্রয়োগ করতে চান। তাঁদের মতে একজন ব্যক্তি সরকারের কাছ থেকে যতটুকু সুবিধা বা উপকার পাবে সে সরকারকে ঠিক তার সমান পরিমাণে কর প্রদান করবে।

এই তত্ত্বের সমর্থনকারীরা বলেন যে, এর ফলে কর-ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজে কেউ যদি সরকারের কাছ থেকে বেশি সুবিধা পায় সে বেশি কর না দিলে যে কম সুবিধা পায় তার উপর বেশি কর আরোপ করলে অন্যায় করা হয়। যে বেশি উপকার পায় সে বেশি কর না দিলে সমতার নীতিও লংঘিত হয়।

কিন্তু এই তত্ত্বের বিরোধীরা বলেন, এই তত্ত্ব বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য নয়।

(১) সরকার যে সব সেবাদান করেন (যেমন, প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, ত্রাণ ও কল্যাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন ইত্যাদি) তাদের থেকে দেশবাসীদের উপকার হয় সত্য, কিন্তু অর্থের হিসাবে সে উপকার পরিমাপ করা যায় না।

(২) ব্যক্তিগত দিক দিয়ে বলা যায়, সরকারের কাছ থেকে একজন ব্যক্তি কী পরিমাণ উপকার পায় তার হিসাব করা যায় না।

(৩) ব্যক্তিগত উপকার হিসাব করার মধ্যে ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দের পার্থক্য কাজ করে।

(৪) সরকার যে সব সেবা ও সুবিধা সরবরাহ করেন তাদের প্রায় অধিকাংশই হল অবিভাজ্য (Indivisible). দেশের অধিবাসীরা সকলেই সেই উপকার পেয়ে থাকে। কাজেই সরকারী সেবা থেকে কোন একজন কী পরিমাণ উপকার পাচ্ছে তা পরিমাপের বিষয় নয়।

(৫) এই তত্ত্বে সমতার নীতি রক্ষিত হয় না, কারণ, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে সরকার গরীব ও দুর্বল মানুষদের জন্য বেশি সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি করে থাকেন। এই নীতি অনুসারে কর আরোপ করলে গরীবদের উপর করের বোঝা বেশি হবে। এরকম হওয়া উচিত নয়।

৩। **কর প্রদানের সামর্থ্যতত্ত্ব :** এই তত্ত্বে বলা হয় যে, ব্যক্তির কর প্রদানের ক্ষমতা বা সামর্থ্য অনুযায়ী তার উপর কর আরোপ করা উচিত। যার কর প্রদানের সামর্থ্য বেশি, সে বেশি কর দেবে ; যার সামর্থ্য কম সে কম দেবে। অতএব আমরা বলতে পারি যে, সামর্থ্যতত্ত্ব সমানুপাতিক কর ব্যবস্থার পক্ষপাতী। এই তত্ত্বের পক্ষে বলা হয় যে—(১) যে ব্যক্তির কর প্রদানের সামর্থ্য বেশি সে নিশ্চয়ই সমাজ থেকে বেশি সুবিধা ভোগ করছে। কাজেই সে সমাজের জন্য সবচেয়ে বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে পারে।

(২) এই তত্ত্ব অনুযায়ী কর আরোপ করলে ধনীদের উপর করের চাপ বেশি হবে এবং দরিদ্রদের উপর কম হবে।

(৩) কর ব্যবস্থা ন্যায় ও সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং (৪) সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়বে।

কিন্তু কোন ব্যক্তির কর প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করাকে কেন্দ্র করেই এই তত্ত্বের অসুবিধা ও সমস্যা দেখা দেয়। কোন একজন ব্যক্তি কী পরিমাণ অর্থ কর হিসাবে দিতে পারবে তা নির্ণয় করার কোন সন্তোষজনক পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন প্রকার প্রস্তাব করেছেন।

জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে ব্যক্তির উপর সেই পরিমাণ কর আরোপ করা যায়, তার ত্যাগ (Sacrifice) বা অসুবিধা অন্যের ত্যাগ বা অসুবিধার সমান হয়। কিন্তু কর-ভার থেকে সকলে সমান অসুবিধা ও কষ্ট বোধ করে না। কাজেই অসুবিধা, ত্যাগ, কষ্ট প্রভৃতি ব্যক্তিগত বিষয় (Subjective Consideration) দিয়ে কর প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করা যায় না।

এজ্‌ওয়ার্থের মতে, করের পরিমাণ এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন যাতে সমাজের উপর করের চাপ ও কর প্রদানের জন্য সমাজের সেই ত্যাগ সবচেয়ে কম হয়। এখানেও করের চাপ বা করের জন্য সমাজের সেই ত্যাগ প্রভৃতির পরিমাপ নিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মিল, এজ্‌ওয়ার্থ যা বলেছেন তা হল ব্যক্তিগত বিষয় দ্বারা নির্ধারিত কর-প্রদানের সামর্থ্য। অনেকে বস্তুগত বিষয় দ্বারা কর-প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করতে চান। তাঁদের মতে কর-প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করা যেতে পারে (১) ভোগ, (২) সম্পত্তি বা (৩) আয়ের হিসাবে। এদের মধ্যে ভোগ দ্বারা কর-প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করার পদ্ধতিটি আপত্তিজনক। ভোগ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে করা হয়। এর পেছনে ব্যক্তিগত সামর্থ্যের চেয়ে বেশি কাজ করে ভোগ করার প্রাথমিক প্রয়োজন। যার ভোগব্যয় বেশি তার উপর যদি অধিক হারে কর আরোপ করা হয় তাহলে

অন্যায় করা হবে। অনেক দরিদ্র পরিবারে বেশি সংখ্যক সদস্য থাকায় সেই পরিবারে যতটুকু আয় হয় তার সবটা হয়তো ভোগব্যয়ে ব্যয়িত হয়। কাজেই যার ভোগব্যয় বেশি তার কর প্রদানের সামর্থ্য বেশি ভাবলে ভুল হবে।

অনেকে মনে করেন ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণ দিয়ে তার কর প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করা যেতে পারে। কিন্তু সম্পত্তি থেকে যে আয় হয় সেই আয় ধরেই কর প্রদানের সামর্থ্য বিচার করা উচিত। সকল প্রকার সম্পত্তি থেকে সমান আয় হয় না। অনেকের সম্পত্তি শূন্য হলেও আয় খুব বেশি হতে পারে। সম্পত্তি ধরে বিচার করলে তার উপর কোন কর আরোপ করাই চলে না। এই অসুবিধাগুলি থাকায় অনেকে ব্যক্তির আয়কেই কর প্রদানের সামর্থ্যের মানদন্ড হিসাবে ব্যবহার করতে চান। কিন্তু এখানেও একাধিক অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। সম্পত্তি, আয় ইত্যাদি দিয়ে কর-প্রদানের সামর্থ্য বিচার করার সময় ব্যক্তির দায়-দায়িত্বের কথা ভাবা হয় না। কিন্তু দুজন ব্যক্তির আয় ও সম্পত্তি সমান হলেও তাদের কর প্রদানের সামর্থ্য পৃথক হতে পারে। সাধারণত যার পরিবারের আয়তন, কিংবা পরিবারে নির্ভরশীল সদস্যের সংখ্যা বেশি তার করদানের ক্ষমতা নিশ্চয়ই কম হবে।

আয়কে যদি কর-আরোপের নীতি হিসাবে মেনে নেওয়া হয় তাহলে, জোসিয়া স্ট্যাম্পের মতে, নিম্নলিখিত পাঁচটি বিচার (Test) মেনে চলতে হয়।

এই বিচারগুলি হল (১) কাল-বিচার (Time Test)
(২) নীট আয় বিচার (Net Income Test)
(৩) উৎস বিচার (Source Test)
(৪) গার্হস্থ্য অবস্থা বিচার (Domestic Circumstances Test)
এবং (৫) উদ্বৃত্ত বিচার (Surplus Test)

(১) কাল-বিচারে বলা হয় যে, ব্যক্তির আয় ধরে করারোপ করার সময় দেখা প্রয়োজন কোন্ সময়ে সেই আয় এসেছে। এখানে দুধরনের ব্যবস্থা হতে পারে। (ক) গত বছরের আয়ের উপর এ বছরে কর আরোপ করা যেতে পারে, অথবা (খ) রোজগার করতে করতে কর দেওয়ার কথা বলা যেতে পারে। এখানে দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি উপযুক্ত ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হতে পারে। আয় নিয়মিত কিনা এবং আয় উপার্জন করার জন্য ব্যক্তিকে সারা বছর পরিশ্রম করতে হয় কিনা ইত্যাদি বিষয়ও কাল-বিচারের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(২) নীট আয় বিচারের বক্তব্য হল যে, মোট আয় নয়, আয় উপার্জনের ব্যয় বাদ দিয়ে যে নীট আয় পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই ব্যক্তির কর প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপ করা উচিত। যদি দুজন ব্যক্তির মোট আয় সমান হয়, কিন্তু একজনকে তার জন্য বেশি খরচ করতে হয়, অর্থাৎ তার নীট আয় কম হয়, তাহলে তার কর প্রদানের সামর্থ্য অন্যজনের চেয়ে কম হবে।

(৩) উৎস বিচারে বলা হয়—কর আরোপ করার সময় দেখা দরকার ব্যক্তির

আয়ের উৎস কী? ব্যক্তির আয় পরিশ্রমজাত অথবা সম্পত্তিজাত হতে পারে। যে দৈহিক কিংবা মানসিক পরিশ্রম করে আয় উপার্জন করে তাকে বেশি কষ্ট বা ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। অথচ যে ব্যক্তি তার সম্পত্তি থেকে আয় পেয়ে থাকে তার কষ্ট কম। কাজেই পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয়ের উপর কম হারে কর আরোপ করা উচিত। অপরপক্ষে সম্পত্তি থেকে আয় পাওয়া যায়, যাকে আমরা অনুপার্জিত আয় (Unearned Income) বলতে পারি তার উপর বেশি হারে কর আরোপ করা যেতে পারে।

(৪) গার্হস্থ্য অবস্থা বিচারে বলা হয়, আয়কে যদি কর-প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপের মাপকাঠি হিসাবে ব্যবহার করতে হয় তাহলে সেই সঙ্গে ব্যক্তির গার্হস্থ্য বা পারিবারিক অবস্থার দিকেও তাকাতে হবে। যার পরিবারের আয়তন বড়, কিংবা দায়-দায়িত্ব বেশি তার কর প্রদানের সামর্থ্য কম হবে।

(৫) উদ্বৃত্ত বিচারে বলা হয় যে কর-প্রদানের সামর্থ্য হিসাব করার সময় মোট বা নীট আয় ছাড়াও আয়ের কতখানি ব্যয় করার পর উদ্বৃত্ত থাকে তার কথাও বিচার করা উচিত। সাংসারিক খরচ মিটিয়ে যার উদ্বৃত্ত বেশি হবে তার কর-প্রদানের সামর্থ্যও বেশি হবে।

১৪.১২ কর-ঘাত, কর-চালন ও কর-পাত (Impact, Shifting and Incidence of a Tax):

(ক) সংজ্ঞা ও পার্থক্য:

কর-আরোপের সঙ্গে তিনটি বিষয় জড়িত থাকে। এই বিষয় তিনটি হল **কর-ঘাত (Impact of a Tax), কর-চালন (Shifting of a Tax)** এবং **কর-পাত (Incidence of a Tax)**। কর-ঘাত বলতে বোঝায় করের প্রাথমিক আঘাত। কর-চালন হল করের ভারকে অন্যের উপর সরিয়ে দেওয়া এবং কর-পাত হল কর-ভারের শেষ স্থিতিলাভ। যে ব্যক্তির উপর কর-আরোপ করা হয় সে অন্যের উপর সেই করকে সরিয়ে দিতে চাইবে। সে যদি তা করতে পারে তাহলে কর-চালন ঘটে। কিন্তু সে যদি তা না করতে পারে তাহলে তাকেই করের শেষভার বহন করতে হয়। এটা হল কর-পাত। আবার যার উপর কর-আরোপ করা হয় সে যদি অন্যের উপর করের ভারকে অপসারিত করে দিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি অন্য আর কারোর উপর সেই ভারকে চালান করে দিতে না পারে তাহলে তার উপর করের ভার পতিত হয়। এটা হল কর-পাত। অতএব আমরা বলতে পারি, **কর-চালন সম্ভব হলে কর-ঘাত ও কর-পাত পৃথক ব্যক্তির উপর পড়ে। কিন্তু কর-চালন সম্ভব না হলে কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর পড়ে।** আমরা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝাতে পারি। ধরা যাক, কাপড়ের উপর অন্তঃশুল্ক (Excise duty) আরোপ করা হল। কাজেই কাপড়ের উৎপাদককে এই শুল্ক দিতে হবে। উৎপাদকের উপর কর-ঘাত পড়বে। কিন্তু সে অন্তঃশুল্ক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের দাম

বা বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধি করতে চাইবে। সে যদি তা করতে পারে তাহলে সে করের বোঝাকে নিজের উপর থেকে ক্রেতার উপর চালান করে দিতে পারবে। এর ফলে কাপড়ের উৎপাদক থেকে কাপড়ের ক্রেতার দিকে কর-চালন ঘটবে। কিন্তু কাপড়ের ক্রেতা অন্যের উপর করের ভার চালান করতে পারবে না। তাকেই করের ভার বহন করতে হবে। অতএব কাপড়ের ক্রেতার উপর কর-পাত ঘটবে। আবার কোন ব্যক্তির উপর যদি আয়-কর বসানো হয় তাহলে তাকেই সে কর দিতে হবে এবং তাকেই তার ভার-বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে কর-ঘাত ও কর-পাত মিলিতভাবে একই ব্যক্তির উপর পড়বে। আমরা জানি, অন্তঃশুল্ক হল পরোক্ষ কর, এবং আয়-কর হল প্রত্যক্ষ কর কারণ অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে কর-ঘাত ও কর-পাত পৃথক ব্যক্তির উপর পড়ে, কিন্তু আয়-করের ক্ষেত্রে কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর পড়ে।

কর-ঘাত ও কর-পাতের পার্থক্য ঘটে কর-চালনার সম্ভাবনার মাধ্যমে। কিন্তু কর-চালন দুধরনের হয় যথা, পশ্চাৎমুখী কর-চালন (Backward shifting of a tax) এবং সম্মুখবর্তী কর-চালন (Forward shifting of a tax). দ্রব্য উৎপাদনের উপ কোন কর আরোপ করা হলে উৎপাদনকারী দুভাগে সেই করকে চালান করতে পারে। প্রথমত, সে যাদের কাছ থেকে কাঁচামাল, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপাদান ক্রয় করে তাদের দাম কমিয়ে দিতে চেষ্টা করতে পারে। এটা হল পশ্চাৎমুখী কর-চালনার দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয়ত, উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করে ক্রেতাদের উপর কর-ভার চালান করতে পারে। এটা হল সম্মুখবর্তী কর-চালনার দৃষ্টান্ত।

কর-চালন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হতে পারে। বিক্রেতা যখন ক্রেতার উপর করের ভার চালান করে তাকে আমরা প্রত্যক্ষ কর-চালন বলতে পারি। আবার প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে দেখা যায়, করদাতা বিভিন্ন পরোক্ষ পদ্ধতিতে করের ভার তার উপর থেকে অন্যের উপর চালান করে দিতে পারে। উকিলের উপর আয়কর আরোপ করা হলে তিনি তাঁর ফি বাড়িয়ে দেন এবং করের বোঝাকে মক্কেলের উপর চালান করে দিতে পারেন। সেই মক্কেল যদি ডাক্তার হন তাহলে তিনি তাঁর ফি বাড়িয়ে দিয়ে রোগীদের উপর কর-ভার চালান করে দিতে পারেন। এইভাবে পরোক্ষ পদ্ধতিতে বহু পর্যায়ে কর-চালন ঘটতে পারে।

(খ) কর-পাত কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

কোন ব্যক্তির উপর কর-আরোপ করা হলে সে কর-ভার অন্যের উপর চালান করে দিতে চাইবে। সেই কর-চালনা সম্ভব না হলে তাকেই করের ভার বহন করতে হবে এবং তার উপর কর-পাত ঘটবে। যেমন, কোন দ্রব্যের উপর বিক্রয়-কর আরোপ করা হলে বিক্রেতা দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করে এবং ক্রেতাদের উপর করের ভার চালান করে দেয়। কিন্তু করের প্রভাবে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে ক্রেতা দ্রব্যের চাহিদা কমিয়ে দেয়। এর ফলে বিক্রয় কম হয় এবং করের বোঝা আংশিকভাবে বিক্রেতার দিকে স্থানান্তরিত হয়।' অবশেষে করের ভার আংশিকভাবে বিক্রেতার

উপর এবং আংশিকভাবে ক্রেতার উপর পতিত হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার উপর কী পরিমাণে কর-পাত ঘটবে তা কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

(১) **স্থিতিস্থাপকতা :** কর-পাত চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। যে দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা হয় তার চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হবে ততই করের ভার বিক্রেতা বা উৎপাদকের উপর বেশি পরিমাণে পড়বে এবং ক্রেতার উপর কম পরিমাণে পড়বে। অপরপক্ষে, দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে কর-পাত ক্রেতার উপর বেশি পরিমাণে হবে। অনুরূপভাবে কর-আরোপিত দ্রব্যের যোগান যত স্থিতিস্থাপক হয় ততই করের ভার ক্রেতার উপর গিয়ে পড়ে ; যোগান অস্থিতিস্থাপক হলে কর-পাত বিক্রেতার উপর বেশি পরিমাণে হয়।

(২) **দাম :** করের প্রভাবে দাম বৃদ্ধি পায় এবং দাম-বৃদ্ধির মাধ্যমে কর-চালন ঘটে। করের প্রভাবে দাম যত বেশি বাড়বে, কর-চালনার সম্ভাবনাও তত বাড়বে। অপরপক্ষে করের ফলে দামের কোন পরিবর্তন না হলে কর-চালন ঘটে না।

(৩) **ব্যয় :** করের ফলে দ্রব্যের দাম বাড়ে। দাম বাড়লে বিক্রয় কমে, উৎপাদন কমে। উৎপাদন কমলে (গড়) উৎপাদন ব্যয় বাড়তে পারে, যদি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পটি ক্রমহ্রাসমান ব্যয় পর্যায়ে উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে উৎপাদন কমলে গড় ব্যয় বাড়ে, ফলে দাম বাড়ে এবং করের ভার ক্রেতার উপর পতিত হয়।

(৪) **বাজারের গঠন :** পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন ক্রেতা বা বিক্রেতা ব্যক্তিগতভাবে দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। এখানে কর-চালনার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া কারবারে উৎপাদক বা বিক্রেতা করের ভারকে ক্রেতার উপর স্থানান্তরিত করতে পারে।

(৫) **করের প্রকৃতি :** কর-পাত করের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যদি দ্রব্যের উপর কর বসে তাহলে সেই দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং করের ভার ক্রেতার উপর স্থানান্তরিত হতে পারে। কিন্তু সরকার যদি উৎপাদকের মুনাফার উপর কর আরোপ করেন তাহলে বিক্রেতা করের ভার ক্রেতার উপর স্থানান্তরিত করতে পারে না, কারণ দ্রব্য বিক্রয় হবার পরেই মুনাফার হিসাব করা হয় এবং সেই মুনাফার উপর কর আরোপ করা হয়।

(৬) **সময় :** দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হলে তার দাম বেড়ে যায়। দাম বাড়লে চাহিদা কমে। কিন্তু স্বল্পকালে বিক্রেতা তার যোগানের পরিবর্তন ঘটিয়ে চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে না। কাজেই স্বল্পকালে করের দ্বারা দাম বৃদ্ধি পেলে বিক্রেতাকেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। সে ক্রেতাদের উপর করের ভার চালান করতে পারে না। দীর্ঘকালে উৎপাদক উৎপাদনের পরিবর্তন করতে পারে। কাজেই দীর্ঘকালে কর-চালনের সুবিধা থাকে।

১৪.১৩ উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টনের উপর করের প্রভাব (Effects of Taxation on Production, Consumption and Distribution) :

(ক) উৎপাদনের উপর করের প্রভাব দুভাবে কাজ করে, যথা. (১) কর্মোদ্যম

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করার **ক্ষমতার** পরিবর্তন ঘটিয়ে এবং (২) কর্মোদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করার **ইচ্ছার** পরিবর্তন ঘটিয়ে। ক্ষমতার পরিবর্তন নির্ভর করে করের প্রকৃতি, করের পরিমাণ, করের প্রতি কর-দাতার প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর। আমরা বলতে পারি আয়-কর কর-দাতার সঞ্চয় করার ক্ষমতা হ্রাস করে। ফলে বিনিয়োগ কমে, কর্ম-নিয়োগ কমে এবং উৎপাদন কমে। মুনাফা-কর সম্বন্ধেও একথা বলা চলে। অনুরূপভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হলে সেসব দ্রব্যের দাম বাড়ে। ফলে ব্যক্তির ভোগ ব্যয় কমে এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। এর জন্য উৎপাদন হ্রাস পায়। অতএব কর্মোদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করার ক্ষমতার উপর করের প্রভাব ঋণাত্মক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

কার্মোদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের **ইচ্ছার** উপর করের প্রভাব ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে। অবশ্য এই প্রভাবটিও করের প্রকৃতি, পরিমাণ এবং করের প্রতি করদাতাদের প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির আয়ের উপর কর আরোপ করলে অনেক সময় করদাতা তার আয় বৃদ্ধির জন্য বেশি পরিশ্রম করতে পারে। কিন্তু আয়-করের হার বেশি হলে করদাতার কর্মোদ্যম হ্রাস পেতে পারে। আয়-কর বৃদ্ধি পেলে করদাতার সঞ্চয় করার ইচ্ছাও হ্রাস পেতে পারে। কিন্তু অন্য কয়েকটি কর, করদাতার কার্মোদ্যমকে প্রভাবিত করতে পারে না। আকস্মিক লাভ (windfall gains), উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি, লটারির পুরস্কার প্রভৃতির উপর কর আরোপ করা হলে করদাতার কর্মোদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ করার ইচ্ছা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আমদানি দ্রব্যের উপর কর আরোপ করা হলে স্বদেশী উৎপাদকরা উৎসাহিত হয়। কাজেই তারা উৎপাদন বৃদ্ধি করে।

কর্মোদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছার উপর করের প্রভাব বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়। এই প্রভাব নির্ভর করে আয় প্রাপ্তির জন্য ব্যক্তির চাহিদা ও তার স্থিতিস্থাপকতার উপর। আয়ের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of demand for income) যত বেশি হবে ততই করের প্রভাবে ব্যক্তির কর্মোদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা হ্রাস পাবে। অপরপক্ষে আয়ের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলে করের প্রভাবে কর্মোদ্যম, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ইচ্ছা তত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। ইচ্ছা কম হলে উৎপাদন কম বাড়বে। ইচ্ছা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

করের প্রভাবে **উৎপাদনের ধরন** (Pattern of Production) পরিবর্তিত হয়। উৎপাদকগণ করারোপিত দ্রব্যের উৎপাদন কমিয়ে কর-মুক্ত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চায়। এরকম হলে সম্পদের বণ্টনও পরিবর্তিত হয়। যে সব দ্রব্যের উৎপাদন কমে সে সব শিল্পে নিযুক্ত উপাদানের নিয়োগ কমে। যে সব দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় সে সব শিল্পে বিভিন্ন উপাদানের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

(খ) **বণ্টনের উপর প্রভাব :** সরকার করের সাহায্যে আয় বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করতে পারেন। ধনীদের আয় ও সম্পত্তির উপর যে কর আরোপ করা হয়

তাতে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য কমে আসে। কিন্তু সরকার যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর আরোপ করেন তাহলে যাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের চাহিদা বেশি তাদের উপর সেই করের বোঝা বেশি পড়ে। প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক, অন্তঃশুল্ক, বিক্রয় কর ইত্যাদি আরোপিত হলে স্বল্প আয়সম্পন্ন ব্যক্তিদের উপরেই বেশি কর-পাত ঘটে। এর ফলে বণ্টন বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

(গ) **ভোগের উপর প্রভাব :** করের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যের ভোগকে প্রভাবিত করা যায়। সাধারণত মাদক দ্রব্য বা ক্ষতিকারক দ্রব্যের ভোগ কমানোর জন্য সরকার ঐ সব দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক আরোপ করেন। ধনীদের ব্যবহার্য বিলাস দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হলে তাদের চাহিদা কমে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপর কর আরোপিত হলে তাদের চাহিদা খুব কমে না। অতএব করের প্রভাবে কোন্ দ্রব্যের ভোগ কীভাবে প্রভাবিত হবে তা করারোপিত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে।

১৯.১৪ কর আরোপণযোগ্য ক্ষমতা বা কর-বহনের ক্ষমতা (Taxable Capacity) :

(ক) **সংজ্ঞা :** কোন দেশের সরকার সেই দেশের ভিতর থেকে কতটা কর রাজস্ব আদায় করতে পারবেন তা নির্ভর করে সেই দেশের কর-বহনের ক্ষমতার উপর। অর্থাৎ কোন একটি অর্থ-ব্যবস্থা থেকে সরকার সর্বাধিক যে পরিমাণ কর-রাজস্ব নিষ্কাশিত করতে পারেন তাকে সেই অর্থ-ব্যবস্থার কর-বহনের ক্ষমতার পরিমাপ কিংবা কর বহনের ক্ষমতা বলা যেতে পারে।

(খ) **পরিমাপের সমস্যা :** কিন্তু কর-বহনের ক্ষমতার এই সংজ্ঞাটি দ্বারা কর-বহনযোগ্যতার প্রকৃতি সঠিকভাবে বোঝা যায় না। কোন অর্থ-ব্যবস্থার সর্বাধিক কর-বহনের ক্ষমতাকে দুদিক থেকে দেখা যায়,—

(ক) কী পরিমাণ কর প্রদান করলে জনগণের সবচেয়ে কম কষ্ট হয়—অথবা (খ) জনগণের কষ্টের কথা চিন্তা না করলে সর্বাধিক কী পরিমাণ কর আদায় করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য এই দুদিক থেকে কর-বহনের ক্ষমতার দুটি ভিন্ন পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে—সর্বাধিক কর-বহনের ক্ষমতা হবে শূন্য। কারণ যে-কোন পরিমাণ কর আরোপ করলেই করদাতাদের কষ্ট হবে। করদাতাদের সবচেয়ে কম (বা শূন্য) কষ্ট হবে যদি তাদের উপর শূন্য কর আরোপ করা হয় (অর্থাৎ কোন কর আরোপ করা না হয়)। আবার—জনগণের কষ্টের কথা যদি বিবেচনা করা না হয়, তাহলে জনগণের উপর যে-কোন পরিমাণ কর আরোপ করা যেতে পারে। এই দিক দিয়ে করের সর্বাধিক পরিমাণ হবে অনন্ত। বাস্তবে বহনযোগ্য করের পরিমাণ অবশ্যই শূন্যের চেয়ে বেশি এবং অনন্তের চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন সসীম পরিমাণ হবে।

কর-বহন করতে কষ্ট হয়। কষ্ট বলতে মানসিক অতৃপ্তি বোঝায়। যে পরিমাণ

কর আরোপ করলে জনগণের অতৃপ্তি সবচেয়ে কম হবে তাকে কর-বহনযোগ্যতার পরিমাণ বলা যায়।

কিন্তু 'অতৃপ্তি' শব্দটি মনস্তাত্ত্বিক ধারণা মাত্র। এর কোন বস্তুগত পরিমাণ নেই, কিংবা থাকলেও তার পরিমাণ জানা যায় না। তাছাড়া 'অতৃপ্তি' শব্দটি স্থান কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কাজেই অতৃপ্তি দ্বারা কর-বহনযোগ্যতার সর্বাধিক পরিমাণ পরিমাপ করা যায় না। কাজেই 'কষ্ট' পরিমাপ করা উচিত অন্য কোনভাবে।

সরকার যখন জনগণের উপর কর আরোপ করে জনগণের আয় নিষ্কাশিত করেন তখন জনগণের ব্যয়-যোগ্য আয় ও ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। কাজেই জনগণের জীবনযাত্রার মান নীচের দিকে নামতে থাকে। অবশেষে জনগণের জীবনযাত্রা নিম্নতম স্তরে (Subsistence level) নেমে আসে। এর পরেও করের হার বৃদ্ধি করলে জনগণের পক্ষে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর, এমনকি অসম্ভব হয়ে পড়বে। অতএব, **যে পরিমাণ কর আরোপ করলে দেশের জনগণকে নিম্নতম জীবনযাত্রার স্তরে নামিয়ে আনা হয় সেই সর্বাধিক পরিমাণ কর দ্বারা জনগণের কর বহনের উর্ধ্বতম সীমা নির্ধারিত হবে।**

স্যার জোসিয়া স্ট্যাম্প মনে করেন—দেশের মোট উৎপাদন থেকে জনগণের নিম্নতম জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ ভোগব্যয়ের প্রয়োজন—সেই পরিমাণ উৎপাদন বিয়োগ করে যে উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়—সরকার তার সমস্তটি কর বসিয়ে নিষ্কাশিত করতে পারেন। অতএব **সর্বাধিক আরোপণযোগ্য করের পরিমাণ = মোট উৎপাদন— জনগণের নিম্নতম ভোগব্যয়।**

সর্বাধিক পরিমাণ কর যা দেশের জনগণ বহন করতে পারবে তা নির্ণয় করতে হলে নিম্নতম জীবনযাত্রার স্তর (Subsistence level of living) নামক একটি ধারণার সাহায্য নিতে হবে। এবং এই ধারণাটিরও অসুবিধে আছে। কোন দেশের নিম্নতম জীবনযাত্রার স্তর বলতে সঠিক কী বোঝায় তা বলা যায় না। দেশভেদে, কালভেদে এর সংজ্ঞা পৃথক হতে পারে।

ফিণ্ডলে সিরাস মনে করেন—যে পরিমাণ করের জন্য জনগণের সবচেয়ে বেশি চাপ লাগে তাই হল কর-বহনযোগ্যতার সর্বাধিক পরিমাপ।

কিন্তু 'চাপ' বলতে ঠিক কী বোঝায় তার ব্যাখ্যা নেই। তাছাড়া 'চাপ', 'কষ্ট' ইত্যাদির পরিমাপযোগ্যতা নেই। এদের সাহায্যে কর-বহনযোগ্যতা পরিমাপ করা বিপজ্জনক। বোধহয় সেইজন্য অধ্যাপক ড্যালটন "কর বহনের ক্ষমতা" নামক বিষয়টিকে অবাস্তব গল্প বলতে চেয়েছেন।

(গ) কর-বহনের ক্ষমতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ঃ

কর বহনের ক্ষমতা নির্ভর করে (১) জনসংখ্যা, (২) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা (৩) আয়ের বণ্টন, (৪) করের ব্যবহার, (৫) কর সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভঙ্গী, (৬) মুদ্রাস্ফীতির হার, (৭) করের বৈচিত্র্য, (৮) কর সংগ্রহের পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর।

(১) জনসংখ্যাবহুল দেশে মোট আয় বেশি হয়। কাজেই সেই দেশে কর আরোপ করে সরকারের দ্বারা বেশি পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব। (২) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যত উন্নত হবে দেশবাসীদের কর বহনের ক্ষমতাও তত বৃদ্ধি পাবে। (৩) আয়ের বণ্টন যদি সমতাযুক্ত হয় তাহলে কর বহনের ক্ষমতা হ্রাস পাবে। অপরপক্ষে আয় বণ্টনে বৈষম্য থাকলে অধিক আয় কম সংখ্যক ব্যক্তিদের হাতে থাকবে এবং তার ফলে তারা বেশি পরিমাণে আয়কর ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কর দিতে পারবে। (৪) করের ব্যবহার থেকে জনগণের আয় বৃদ্ধি পেতে পারে। কিন্তু সরকার যদি অনুৎপাদনশীল কার্যে সেই অর্থ ব্যয় করেন তাহলে জনগণের আয় প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধি পায় না, ফলে তাদের কর প্রদানের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায় না। (৫) যে দেশে করদাতারা করপ্রদানে বিশেষ আগ্রহী হয়, অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে সেই দেশের কর বহনের ক্ষমতাও বেশি হবে। (৬) দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার অধিক হলে জনগণের বাস্তব আয় হ্রাস পায়। এর ফলে তাদের কর-বহনের ক্ষমতাও হ্রাস পায়। (৭) করের মধ্যে প্রধান হল প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর। প্রত্যক্ষ করের ফলে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় ও ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। কাজেই প্রত্যক্ষ কর জিনিসপত্রের দাম কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু পরোক্ষ কর প্রত্যক্ষভাবে দাম বৃদ্ধি ঘটায়। অন্যভাবে বলা যায় প্রত্যক্ষ কর মুদ্রাস্ফীতির হ্রাস ঘটিয়ে জনগণের কর বহনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং পরোক্ষ কর মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়ে কর বহনের ক্ষমতা হ্রাস করে। অতএব সরকার কী পরিমাণ অর্থ প্রত্যক্ষ করের সাহায্যে এবং কী পরিমাণ অর্থ পরোক্ষ করের মাধ্যমে সংগ্রহ করবেন তার উপর জনগণের কর বহনের ক্ষমতা নির্ভর করবে। (৮) কর সংগ্রহের পদ্ধতি যত সহজ ও সরল হবে জনগণের কাছে করের ভার ততই কম ভারী হবে। বিপরীতপক্ষে, কর সংগ্রহের পদ্ধতি যত জটিল ও অনমনীয় হবে ততই কর বহনের ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

প্রশ্নাবলী

১। বাজেট কাকে বলে? বাজেট কত রকমের হতে পারে? ঘাটতি বাজেট কীভাবে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে?

২। আয়ের বৃত্ত স্রোতের উপর সরকারী আয় ও ব্যয়ের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৩। ঘাটতি বাজেট কাকে বলে? তুমি কি মনে কর যে, ঘাটতি বাজেটের প্রভাব নির্ভর করে ঘাটতি পূরণের পদ্ধতির উপর? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৪। সরকারী ঋণ বলতে কী বোঝ? কীভাবে সরকার ঋণ সংগ্রহ করেন? জাতীয় আয়ের উপর প্রত্যেক প্রকার ঋণ সংগ্রহ পদ্ধতির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৫। সরকারী ঋণের কি কোন ভার আছে? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৬। বাজেট-নীতি কাকে বলে? বাজেট-নীতির প্রধান লক্ষ্য কী?

৭। প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ করের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৮। গতিশীল ও সমানুপাতিক করের তুলনামূলক আলোচনা কর।

৯। প্রত্যক্ষ করের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

১০। পরোক্ষ করের গুণ ও দোষ সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১১। সমানুপাতিক করের গুণ ও দোষগুলির আলোচনা কর।

১২। গতিশীল কর কাকে বলে ? এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

১৩। কর-আরোপের ক্ষেত্রে কী নীতি অনুসরণ করা হয় ?

১৪। করের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কানুন সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

১৫। কর-পাত বলতে কী বোঝায় ? কর-পাত কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

১৬। কর-আরোপের ক্ষেত্রে সেবাদানের ব্যয়তত্ত্ব, উপকার তত্ত্ব ও সামর্থ্য তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

১৭। উৎপাদন, ভোগ, বণ্টনের উপর করের প্রভাব আলোচনা কর।

১৮। কর-বহনের ক্ষমতা বলতে কী বোঝায় ? কী ভাবে এই ক্ষমতা পরিমাপ করা যেতে পারে ? এই ক্ষমতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

১৯। **সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ**

(ক) টীকা লিখ ঃ (১) সমতার বাজেটের গুণক, (২) ঘাটতি বাজেটের গুণক, (৩) সরকারী ঋণের প্রভাব, (৪) বাজেট নীতি, (৫) স্বয়ংক্রিয় স্থিতিশীলতা, (৬) কর-পাত ও কর-ঘাত, (৭) কর-চালনা, (৮) কর বহনের ক্ষমতা (Taxable Capacity)।

(খ) "সমতার বাজেটের গুণকের মান একক"—আলোচনা কর।

(গ) "সরকারী ব্যয় হল আয়স্রোতে আয়ের অনুপ্রবেশ এবং সরকারী ব্যয় হল আয়স্রোত থেকে আয়ের নিষ্কাশন"—আলোচনা কর।

(ঘ) "সরকারী ব্যয়ের ফলে দেশের আয় বাড়ে"—সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(ঙ) "পূর্ণ কর্ম নিয়োগ স্তরে ঘাটতি বাজেটের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে"—যুক্তিসহ আলোচনা কর।

ভূমিকা : পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে যে বাণিজ্য চলে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। একটি দেশ কোন এক বা একাধিক দ্রব্য উৎপাদনে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি দক্ষ হতে পারে। তাহলে সেই দেশ অন্য দেশে সেই দ্রব্য বা দ্রব্যগুলি রপ্তানি করবে। এবং অন্য দেশ থেকে সেই সব দ্রব্য আমদানি করবে যেগুলি সেই দেশ নিজে ভালোমত বা কম ব্যয়ে উৎপাদন করতে পারে না। এইভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে বিভিন্ন পণ্যের আমদানি ও রপ্তানি চলে। শুধু দ্রব্য বা সেবা নয়, এক দেশের মূলধন অন্য দেশে যায়। এর ফলে দুটি দেশের মধ্যে লেনদেন চলে। সেই লেনদেনের হিসাব রক্ষা করতে হয়। এ সম্বন্ধে কিছু নিয়মকানুন আছে। তাছাড়া দুটি দেশের মুদ্রার নাম ও মান আলাদা। বাণিজ্যের মাধ্যমে দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় ঘটে এবং এই বিনিময়ের ক্ষেত্রে দুটি দেশের মধ্যে বিনিময় হার নির্দিষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আলোচনায় দেখা হয়—দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হয় কেন, বাণিজ্যের ফলে দুটি দেশের কী লাভ হয়, কীভাবে আন্তর্জাতিক লেনদেনের হিসাব রক্ষা করা হয়, কীভাবে দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। তাছাড়া দুটি দেশের বাণিজ্য অবাধ ও নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। কোন দেশের সরকার যখন সেই দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর নানারকম সরকারী নিয়ম, কর বা শুল্ক আরোপ করে তখনই অবাধ বাণিজ্য আর থাকে না। সরকারের এই নিয়ন্ত্রণের নানারকম উদ্দেশ্য থাকে। তাদের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হল দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিদেশের প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করা। একে সংরক্ষণ বলা হয়। সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করাও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্দেশ্য।

১৫.১ দুটি দেশের মধ্যে কেন বাণিজ্য হয় : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি (Basis of International Trade)

(ক) অ্যাডাম স্মিথের পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব (Theory of Advantage of Absolute Cost Differences)

দুটি দেশ কেন পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য করে সে সম্বন্ধে অ্যাডাম স্মিথের আলোচনাটি আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। অ্যাডাম স্মিথের মতে দুটি দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য ঘটে তার ভিত্তি হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগের প্রভাব। একটি দেশের মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। সাধারণত একজন ব্যক্তি একটি পেশাকেই বেছে নেন, তার কারণ সেই ব্যক্তি সেই পেশার পক্ষে নিজেকে দক্ষ ও উপযুক্ত বলে মনে করেন। তেমনি পৃথিবীর একটি দেশ কোন একটি বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে সবচেয়ে বেশি দক্ষ। অর্থাৎ সেই দেশ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যয়ে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে সেই দ্রব্যটি উৎপাদন করতে পারে, অথবা সেই দেশ সেই দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করতে পারে

সবচেয়ে কম ব্যয়ে। আর অন্য দেশটি অন্য কোন দ্রব্যে এই সুবিধা পায়। তাহলে এই সুবিধাকে পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা (Advantage of Absolute Cost Difference) বলা হয়। এক্ষেত্রে যে দেশটি যে দ্রব্যটি উৎপাদনে পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা পায় সেই দ্রব্যটি বিদেশে রপ্তানি করবে। এইভাবে দুটি দেশ ও দুটি দ্রব্যের মধ্যে বাণিজ্য ঘটবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝানো যায়। ধরা যাক, দেশ দুটি হল A ও B এবং দ্রব্য দুটি হল X ও Y. ধরা যাক শ্রম নামক উপাদানের হিসেবে দুটি দেশেই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় পরিমাপ করা যায় এবং শ্রমের গুণগত মান দুটি দেশেই সমান।

ধরা যাক নির্দিষ্ট ব্যয়ে A দেশটি ২০ একক X-দ্রব্য এবং ১০ একক Y-দ্রব্য এবং B দেশটি ১০ একক X-দ্রব্য ও ২০ একক Y-দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। A দেশে ২টি X দিলে ১টি Y পাওয়া যাবে। B দেশে ১টি X দিলে ২টি Y পাওয়া যাবে। ধরা যাক A দেশের ১০টি X ও ৫টি Y দরকার। ১০টি X উৎপাদন করতে সেই দেশের মোট শ্রমের অর্ধেক লাগবে। বাকি অর্ধেক দিয়ে সেই ৫টি Y তৈরি করতে পারবে। কিন্তু A দেশ তা না করে যদি ২০টি X উৎপাদন করে এবং তার থেকে ১০টি X নিজের দেশের ভোগের জন্য রেখে বাকি ১০টি X দ্রব্যকে B দেশে বিক্রি করে Y নেয়, তাহলে সে B দেশ থেকে ১০টি X দিয়ে ২০টি Y পাবে। বাণিজ্যবিহীন অবস্থায় দেশটি ভোগ করতে পেত ১০টি X ও ৫টি Y. বাণিজ্যের ফলে সে ১০টি X ও ২০টি Y দ্রব্য ভোগ করতে পারবে। কাজেই বাণিজ্যের ফলে A দেশটি লাভবান হবে। কিন্তু B দেশটির কি লাভ হবে ?

আমাদের উদাহরণে দেখা যাচ্ছে B দেশটি ২০টি Y দিয়ে Aর কাছ থেকে ১০টি X নেয়। বাণিজ্য না করলেও সে নিজের দেশেও এটা পেত। কাজেই এই উদাহরণে বাণিজ্যের ফলে B দেশটির লাভ হবে না, কিন্তু কোন ক্ষতিও হবে না। **অর্থাৎ দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ফলে অন্তত একটি দেশের লাভ হবে।**

তাহলে দেখা যাচ্ছে—

এই উদাহরণে A দেশে ২টি X = ১টি Y. অর্থাৎ $\frac{X}{Y}=\frac{১}{২}$. এটা হল A দেশে X ও Y দ্রব্যের আভ্যন্তর বিনিময় হার। B দেশে ১টি X = ২টি Y অর্থাৎ $\frac{X}{Y}=\frac{২}{১}$ এটা হল B দেশের আভ্যন্তর বিনিময় হার। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে X ও Y-এর মধ্যে যে বিনিময় হার প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বাণিজ্যিক বিনিময় হার (Terms of Trade) বলা হয়। আমাদের উদাহরণে বাণিজ্যিক বিনিময় হার = B দেশের আভ্যন্তর বিনিময় হার হয়েছে। ফলে A দেশের লাভ হয়েছে। B দেশের লাভ হয়নি। কিন্তু বাণিজ্যিক বিনিময় হারটি যদি A দেশের আভ্যন্তর বিনিময় হারের চেয়ে বেশি কিন্তু B দেশের বিনিময় হারের চেয়ে কম হত, তাহলে

A ও B উভয় দেশেরই লাভ হত। যেমন, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি ১০টি X = ১৫টি Y (অর্থাৎ ১টি X = $\frac{৩}{২}$টি Y) হত, তাহলে A দেশ ১০টি X বিক্রি করে ১৫টি Y পেত। B দেশের হাতে থাকত ৫টি Y এবং ১০টি X বাণিজ্য না করলে সে ১০টি X পেলে কোন Y পেত না। এখন বাণিজ্যের ফলে ১০টি X পেয়েও সে ৫টি Y পাবে। কাজেই তারও লাভ হবে। এইভাবে দেখা যায়, **বাণিজ্যের ফলে দুটি দেশেরই লাভ হতে পারে।**

এই তত্ত্বের ত্রুটি ঃ—(১) এই তত্ত্বে একটি দেশ যে-কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ দক্ষ হয় এবং অন্য দেশটি অন্য দ্রব্যটি উৎপাদনে দক্ষ হয়। ফলে তাদের মধ্যে বাণিজ্য হয়। কিন্তু যদি একটি দেশ দুটি দ্রব্য উৎপাদনেই দক্ষ হয়, কিংবা দুটি দেশ একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদনেই দক্ষ হয়, তাহলে কি বাণিজ্য হবে? স্মিথের তত্ত্ব এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

(২) স্মিথের তত্ত্বে দেখা যায় যে, একটি দেশ একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন করে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় একটি দেশ একাধিক দ্রব্য উৎপাদন করে। বাস্তবের এই জটিল অবস্থাটির ব্যাখ্যার কোন ইঙ্গিত স্মিথের তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

(৩) স্মিথের তত্ত্বে শ্রম ছাড়া অন্য কোন উপাদানের কথা ধরা হয় না। কিন্তু উৎপাদনের জন্য শ্রম, মূলধন, জমি প্রভৃতি একাধিক উপাদানের প্রয়োজন। এইসব উপাদানের পরিমাণ ও গুণ এবং দ্রব্য উৎপাদনের পদ্ধতিও উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বে সরলতার আবরণে ব্যয় পার্থক্যের ব্যাপারটি অস্পষ্ট হয়ে আছে।

(৪) এখানে ধরা হয়েছে উপাদানের ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাণ সমান হারে বাড়ে। সমহারে ব্যয় বৃদ্ধির নিয়মটি স্মিথের তত্ত্বের ভিত্তি। কিন্তু ব্যয় বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান বা ক্রমবর্ধমান হলে দুটি দেশের ব্যয় পার্থক্যের পরিবর্তন হবে। তখন স্মিথের আলোচনা মত বাণিজ্যের শর্ত পূর্ণ নাও হতে পারে।

(খ) রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধাতত্ত্ব (Theory of the Advantage of Comparative Cost Differences)

অ্যাডাম স্মিথের মতে দুটি দেশ ও দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে বাণিজ্য হবে যদি একটি দেশ কোন একটি দ্রব্য অন্য দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে এবং অন্য দেশটি অন্য দ্রব্যটি কম ব্যয়ে উৎপাদন করতে পারে। যেমন, স্কটল্যান্ডে যদি খুব আঙুর হয়, তাহলে স্কটল্যান্ড যত সস্তায় আঙুরের রস থেকে মদ তৈরি করতে পারবে, ইংলন্ড তত সস্তায় পারবে না। আবার ইংল্যান্ড যত সস্তায় কাপড় তৈরি করতে পারে, স্কটল্যান্ড হয়তো তত সস্তায় পারে না। এই উদাহরণে স্কটল্যান্ড মদ উৎপাদনে দক্ষ এবং ইংল্যান্ড কাপড় উৎপাদনে দক্ষ। অ্যাডাম স্মিথের মতে এক্ষেত্রে স্কটল্যান্ড মদ উৎপাদন ও রপ্তানি করবে এবং ইংল্যান্ড কাপড় উৎপাদন ও রপ্তানি করবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, ইংল্যান্ড মদ ও কাপড় উভয় দ্রব্যই স্কটল্যান্ডের চেয়ে কম

খরচে তৈরি করতে পারে, তাহলে কি স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বাণিজ্য হবে? অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন রিকার্ডো।

রিকার্ডোর মতে একটি দেশ যদি দুটি দ্রব্য উৎপাদনেই বেশি দক্ষ হয়, তাহলে সে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে বেশি দক্ষ হতে পারে, অন্য দ্রব্যটির ক্ষেত্রে তার দক্ষতা তুলনামূলকভাবে তত বেশি নয়। যেমন, ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ডের চেয়ে মদও ভালোভাবে করতে পারে, কাপড়ও ভালোভাবে করতে পারে। কিন্তু এমন হতে পারে যে, ইংল্যান্ড কাপড় উৎপাদনে স্কটল্যান্ডের চেয়ে তিনগুণ বেশি দক্ষ এবং মদ উৎপাদনে দু গুণ বেশি দক্ষ। এক্ষেত্রেও শ্রমবিভাগের ও বিশেষীকরণের সুবিধা অনুযায়ী ইংল্যান্ডের পক্ষে মদ উৎপাদন ও রপ্তানি করাই লাভজনক হবে। অপরপক্ষে স্কটল্যান্ডের পক্ষে কাপড় উৎপাদন ও রপ্তানি করাই লাভজনক হবে, কারণ মদ উৎপাদনে তার দক্ষতা তুলনামূলকভাবে কিছুটা বেশি। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝানো যায়। ধরা যাক, নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম নামক একটি মাত্র উপাদান ব্যবহার করেই ইংল্যান্ড ২০ একক মদ অথবা ৪০ একক কাপড় উৎপাদন করতে পারে। স্কটল্যান্ড সেই পরিমাণ শ্রমের সাহায্যে ১০ একক মদ অথবা ১৫ একক কাপড় তৈরি করতে পারে। এখানে ইংল্যান্ডের আভ্যন্তর বাজারে ২০ একক মদের বিনিময়ে ৪০ একক কাপড় পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ১ একক মদ দিয়ে ২ একক কাপড় পাওয়া যাবে। স্কটল্যান্ডে ১ একক মদ দিয়ে পাওয়া যাবে ১.৫ একক কাপড়। ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ডের চেয়ে দ্বিগুণ মদ উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু কাপড় উৎপাদন করতে পারে দ্বিগুণেরও বেশি। কাজেই ইংল্যান্ডের পক্ষে কাপড় উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়াই উচিত। দেশে যেটুকু মদের দরকার হবে সেটা স্কটল্যান্ড থেকে আমদানি করলেই চলবে। অপরপক্ষে স্কটল্যান্ডের উচিত মদ উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়া। রিকার্ডোর মতে এক্ষেত্রেও বাণিজ্যের শর্ত পালিত হবে এবং বাণিজ্য করে দুটি দেশেরই লাভ হবে। ধরা যাক, ইংল্যান্ড ৪০ একক কাপড় উৎপাদন করল। তার থেকে ৬ একক কাপড় স্কটল্যান্ডে রপ্তানি করল। সেখানে ১.৫ একক কাপড় = ১ একক মদ, কাজেই ৬ একক কাপড় (৬ ৪-এর দেড়গুণ) = ৪ একক মদ। অর্থাৎ ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড থেকে ৬ একক কাপড় দিয়ে ৪ একক মদ পাবে। স্কটল্যান্ড যদি নিজের দেশে ৬ একক কাপড় বিক্রি করত তাহলে পেত ৩ একক মদ। কিন্তু স্কটল্যান্ড থেকে পাবে ৪ একক মদ। ইংল্যান্ডের লাভ হবে। কিন্তু স্কটল্যান্ডের কি লাভ হবে? এই উদাহরণে স্কটল্যান্ডের কোন লাভ হবে না। কারণ স্কটল্যান্ডের আভ্যন্তর দরেই বাণিজ্য হবে বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু বাণিজ্যের হার যদি তার চেয়ে বেশি হয় (কিন্তু ইংল্যান্ডের চেয়ে কম হয়) তাহলে দুদেশেরই লাভ হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে দুটি দেশের উৎপাদন ব্যয়ের পূর্ণ পার্থক্য নয়, তুলনামূলক পার্থক্যই বাণিজ্যের ভিত্তি হতে পারে।

রিকার্ডোর তত্ত্বের ত্রুটি ঃ যদিও রিকার্ডোর তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্বটি অ্যাডাম স্মিথের পূর্ণ ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্বের চেয়েও উন্নততর, তবু রিকার্ডোর তত্ত্বের কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করা যায়।

(১) অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বের মত রিকার্ডোর তত্ত্বও মূল্যের শ্রম-তত্ত্ব (Labour Theory of Value -কে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। শ্রম-তত্ত্বেরও ত্রুটি আছে। সেগুলি স্মিথ ও রিকার্ডোর তত্ত্বকে সমানভাবে প্রভাবিত করে। (২) রিকার্ডোর তত্ত্বও সমহার ব্যয়কে ধরে নেয়। পরিবর্তনশীল ব্যয় ধরলে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যও বদলে যেতে পারে। (৩) এই তত্ত্বে বলা হয় দুটি দেশের মধ্যে উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য থাকায় বাণিজ্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য কেন হয় সে সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। (৪) এই তত্ত্বে দেশের আভ্যন্তর চাহিদার কথা ভাবা হয় না। কোন দেশ যদি কোন একটি দ্রব্য কম খরচে উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু সেই দ্রব্যটির আভ্যন্তর চাহিদা যদি খুব বেশি থাকে তাহলে সেই দেশটিকে সেই দ্রব্যটি আমদানি করতে হতে পারে। (৫) এই তত্ত্বে বলা হয় একটি দেশ একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদন করবে। এটা নানা দিক দিয়ে বিপজ্জনক হতে পারে।

(গ হেক্‌শার-ওলিন তত্ত্ব (Heckscher-Ohlin Theory)

রিকার্ডোর তত্ত্বে বলা হয়—দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ভিত্তি হল তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য। যে দেশটি যে দ্রব্যটি তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়ে উৎপাদন করতে পারবে, সেই দেশটি সেই দ্রব্যটি উৎপাদন করবে ও রপ্তানি করবে। কিন্তু কীভাবে এই তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য দেখা দেয়, সে সম্বন্ধে রিকার্ডোর তত্ত্বে কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। হেক্‌শার ও ওলিনের দুটি পৃথক তত্ত্বের একটি মাত্র বক্তব্য হল যে, দুটি দেশে যদি দুটি উপাদানের প্রাচুর্যের পার্থক্য থাকে এবং দুটি দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি যদি পৃথক হয়, তাহলে দুটি দেশের উৎপাদনের ব্যয়ের পার্থক্য দেখা দেবে। যেমন, একটি দেশে যদি শ্রমের চেয়ে বেশি মূলধন থাকে এবং একটি দ্রব্য যদি তৈরি করতে শ্রমের চেয়ে বেশি মূলধন লাগে তাহলে সেই দেশটি সেই দ্রব্যটি কম খরচে উৎপাদন করতে পারবে। অপরপক্ষে যে দেশে শ্রমের আপেক্ষিক প্রাচুর্য আছে সেই দেশটি শ্রম-গভীর দ্রব্যটি সস্তায় উৎপাদন করতে পারবে।

এইভাবে বলা যায় হেক্‌শার-ওলিন তত্ত্ব অ্যাডাম স্মিথ ও রিকার্ডোর তত্ত্বকেই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করে। উপাদান প্রাচুর্যই যে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের অন্তর্নিহিত কারণ—এই সাধারণ কথাটি প্রমাণ করাই হল এই তত্ত্বের উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বে একাধিক উপাদানের কথা ভাবা হয়। কাজেই এটি বেশি বাস্তব। তবে এই তত্ত্বটিরও অনেক ত্রুটি আছে।

১৫.২ বাণিজ্যের লাভ (Gains from Trade)

দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হলে এবং দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন হলে দুটি দেশই লাভবান হয়। কিন্তু এই ব্যাপারটি বুঝতে ঐতিহাসিকভাবে

আমাদের অনেক দিন লেগেছে। আগেকার দিনে মানুষের বিশ্বাস ছিল—বাণিজ্য হলো খেলার মত। দুটি দলে খেলা হলে একটি দল হারে অন্য দলটি জেতে, কিন্তু কখনই দুটি দল জেতে না। ঠিক সেইভাবে বলা হত বাণিজ্যের ফলে দুটি দেশের লাভ হয় না, একটি দেশ লাভবান হয় এবং অপর দেশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এখন এই ধারণা বাতিল হয়েছে। এখন আমরা বিশ্বাস করি—বাণিজ্যের ফলে দুটি দেশই লাভবান হয়।

কিন্তু এই লাভটা কীভাবে হয়? আমরা যে-কোন একটি দেশের পক্ষ থেকে এই প্রশ্নের বিচার করতে পারি। **বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে একটি দেশের ভোগ সম্ভাবনা (Consumption possibilities) বৃদ্ধি পায়।** দেশটি যদি দেশের জিনিস দেশেই ভোগ করত তাতে যা তৃপ্তি পেত, দেশের কিছুটা জিনিস বাইরে বিক্রি করে তার বিনিময়ে বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানি করলে তার তৃপ্তি বেশি হত। একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, A দেশটি তার সব সম্পদ ব্যবহার করে ১০ একক X-দ্রব্য কিংবা ২০ একক Y-দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। B দেশটি অনুরূপভাবে ২০ একক X-দ্রব্য কিংবা ১০ একক Y-দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। ধরা যাক, A দেশটি ২০ একক Y-দ্রব্য উৎপাদন করে তার থেকে ১০ একক বিক্রি করে X-দ্রব্য ক্রয় করতে চায়। সে যদি স্বদেশে বিক্রি করে তাহলে ১০ একক Y-দ্রব্য দিয়ে ৫ একক X-দ্রব্য পাবে (কারণ A দেশে ১০ একক X = ২০ একক Y. অর্থাৎ ১ একক X = ২ একক Y.) কিন্তু B দেশে ১০ একক Y দ্রব্য বিক্রি করে সে ২০ একক কিংবা তার চেয়ে কম (কিন্তু ৫ এককের চেয়ে বেশি) X-দ্রব্য পাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, A দেশটির কাছে Y-দ্রব্য উৎপাদন করে B দেশে কিছুটা বিক্রি করলেই বেশি X-দ্রব্য পাবে। এর ফলে A দেশের ভোগ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। A দেশটি যদি B দেশের দরে Y-দ্রব্য বিক্রি করে তাহলে B দেশের কোন লাভ হবে না। কিন্তু ক্ষতিও হবে না। কিন্তু Y-দ্রব্যের দর যদি A দেশের চেয়ে বেশি এবং B দেশের চেয়ে কম হয়, তাহলে দু' দেশেরই লাভ হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে—আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অন্ততপক্ষে একটি দেশেরও লাভ হয়।

বাণিজ্যের এই লাভটা আসে রপ্তানি ও আমদানির মাধ্যমে। স্বদেশে কোন দ্রব্য বিক্রি করলে যতখানি অপর দ্রব্যটি পাওয়া যায়, বিদেশে বিক্রি করলে তার চেয়ে বেশি আমদানি দ্রব্য পাওয়া যায়। কিন্তু অনেকে মনে করেন—রপ্তানি থেকে দেশের ভোগ সম্ভাবনা কমে। কোন দ্রব্য বিদেশে পাঠিয়ে দিলে সেই দ্রব্যটি বিদেশীদের ভোগে লাগে, স্বদেশীরা বঞ্চিত হয়। এখন স্বদেশের বাজারে যদি দ্রব্যটির অভাব থাকে তাহলে এ রকম রপ্তানির অর্থ হল দেশবাসীদের ভোগ কমাতে বাধ্য করা। এতে দেশবাসীদের তৃপ্তির মাত্রা হ্রাস পায়। কিন্তু সকল রকম রপ্তানির জন্য এরকম হয় না। রপ্তানি করা হয় আমদানির জন্যই। বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানি করার প্রয়োজনেই বিদেশে দ্রব্য রপ্তানি করতে হয়। যে দ্রব্যগুলো আমদানি করা হয় সেগুলো দেশবাসীদের ভোগের মান ও মাত্রা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। বিশেষত

যে সব দ্রব্য স্বদেশে উৎপাদন করা সম্ভব নয়, অথচ যেগুলো দেশের পক্ষে খুবই দরকারী (যেমন দুষ্প্রাপ্য ঔষধ, যন্ত্র, সার, কৃষি ও শিল্পের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) সেই সব দ্রব্য আমদানি করার জন্যই রপ্তানির দরকার। তবে এক্ষেত্রে দুটি দেশের দ্রব্যের বাণিজ্যের হার (Terms of Trade) একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এই হার দেশের পক্ষে প্রতিকূল হয়, তাহলে বেশি পরিমাণে দ্রব্য রপ্তানি করে কম পরিমাণে আমদানি দ্রব্য পাওয়া যায়। অথচ দেশে উৎপাদন করলে হয়তো অত খরচ পড়ত না। এক্ষেত্রে বাণিজ্যের ফলে যে লাভ হবে এমন বলা যায় না। অতএব **বাণিজ্যের লাভ বাণিজ্যের হারের উপর নির্ভর করে।** বাণিজ্যের হার নির্ধারিত হয় আমদানির চাহিদা ও যোগান এবং রপ্তানির যোগান ও চাহিদার দ্বারা। তাছাড়া দুটি দেশের অর্থের হিসেবে রপ্তানির ও আমদানির লেনদেন হয়। এই দুটি মুদ্রার মধ্যে একটি বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। সেই বিনিময়-হার কোন দেশের প্রতিকূল বা অনুকূল হতে পারে। প্রতিকূল বিনিময়-হার হলে রপ্তানি করে লাভ নাও হতে পারে। অতএব **বাণিজ্যের লাভ নির্ভর করে দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হারের উপর।**

পরিশেষে বলা যায়—বাণিজ্যের যে লাভের কথা বলা হয় সেটা সামগ্রিকভাবে একটি দেশের লাভ। কিন্তু দেশের লাভ বলতে কি সকল দেশবাসীদের লাভ বোঝায়? তা না হতেও পারে। দেশবাসীদের অনেকে বাণিজ্যের ফলে লাভবান হতে পারে, আবার অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাণিজ্যের ফলে যারা লাভবান হবে, তারা বাণিজ্য চাইবে, তারা হবে বাণিজ্য-প্রেমী (Trade lovers); কিন্তু বাণিজ্যের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা বাণিজ্য-বিদ্বেষী (Trade haters) হতে পারে। এই অবস্থায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বাণিজ্যকে সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক বলা যাবে না। যে অর্থনৈতিক কাজের ফলে সমাজের কারো ক্ষতি হয় না, কিন্তু অন্ততপক্ষে একজনেরও ভালো হয়, সেই কাজটিকে আমরা নিঃসন্দেহে ভালো বলতে পারব। কিন্তু যে কাজের ফলে একজন লাভবান হয়, অন্য কোন জন ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাকে সকলের পক্ষে মঙ্গলদায়ক বলা যাবে কিনা সে বিষয়ে অর্থনীতির জটিল তত্ত্বমালা রয়েছে। কিন্তু সে সব তত্ত্বের মধ্যে না গিয়েও বলা যায়—সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষ রায় দেওয়া খুবই কঠিন। কাজেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কোন লাভ আছে কি নেই সেটা নিরপেক্ষভাবে বলা যায় না। তবে কোন দেশ যদি প্রয়োজনীয় দ্রব্য রপ্তানি করে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করে, কিংবা রপ্তানিলব্ধ আয় অন্য কোন অনুৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করে তাহলে বাণিজ্যের থেকে কোন লাভ হবে না।

আর একটি কথা। কোন দেশ যদি বেশি মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে এবং কম দ্রব্য আমদানি করে তাহলে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে সেই দেশ বিদেশে বিনিয়োগ করতে পারে, কিংবা বিদেশকে ধার দিতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে লভ্যাংশ ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সুদ পাওয়া যায়। এই আয় থেকে সেই দেশ ভবিষ্যতে

বেশি দ্রব্য আমদানি করতে পারে। এতে দেশের লাভ হয়। আবার কোন দেশে যদি বেকার সমস্যা থাকে তাহলে সেই দেশ রপ্তানি ক্ষেত্রের বিকাশ সাধন করে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে। এর ফলেও দেশের লাভ হয়। কিন্তু দেশে যদি পূর্ণ নিয়োগ থাকে তাহলে রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে অন্য ক্ষেত্রে উৎপাদন কমে। এতে ক্ষতি হতে পারে।

১৫.৩ আয়-ব্যয়ের বৃত্ত-স্রোতের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে বোঝায় প্রধানত দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা এবং বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশের মধ্যে আমদানি করা। রপ্তানি করে রপ্তানি-কারক দেশের আয় হয়। আমদানি করার জন্য আমদানিকারক দেশের ব্যয় হয়। **অর্থাৎ রপ্তানির ফলে দেশের আয়-স্রোতে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং আমদানির ছিদ্রপথে আয়-স্রোত থেকে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে।**

আমরা জানি দেশের পরিবারগুলি দেশের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রম, জমি, মূলধন ও সংগঠন নামক উপাদানের সেবার যোগান দেয় এবং তার বিনিময়ে যথাক্রমে মজুরী, খাজনা, সুদ ও মুনাফা পেয়ে থাকে। এগুলো হলো পরিবার-সমূহের আয়। এখন দেশের পরিবারগুলি স্বদেশের মধ্যে অবস্থিত রপ্তানি দ্রব্যের প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শ্রম-সেবার বা অন্য কোন উপাদানের যোগান দিয়ে তার বিনিময়ে তারা আয় পেতে পারে। অনুরূপভাবে তারা বিদেশে গিয়েও বিদেশী প্রতিষ্ঠানে শ্রম-সেবা বিক্রয় করে মজুরী বা বেতন ইত্যাদি পেতে পারে। একে দেশের শ্রম-সেবার রপ্তানি বলা যেতে পারে। তাহলে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি যখন বিদেশে দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে তখন তারা যে আয় পায় সেই আয় পরিবার-গুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। এইভাবে দ্রব্যের রপ্তানি থেকে পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধি পায়। আবার পরিবারগুলি বিদেশে শ্রম রপ্তানি করতে পারে। তা থেকেও পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধি পাবে। এইভাবে দ্রব্য বা সেবার রপ্তানি থেকে দেশের আয়-স্রোতে আয়ের অনুপ্রবেশ ঘটে। শ্রম-সেবা ছাড়াও মূলধন ও সংগঠনের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটতে পারে।

কোন দেশ বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানি করতে পারে, কিংবা সেবা আমদানি করতে পারে। দ্রব্য আমদানির জন্য যে ব্যয় হয় সেই ব্যয় বিদেশী পরিবারগুলির আয়। কাজেই আমদানিকারক দেশের আয়-স্রোত থেকে আমদানির জন্য আয়ের নিষ্কাশন ঘটে। আবার বিদেশের পরিবারগুলি এই দেশে শ্রম বা মূলধন বা সংগঠন নামক সেবার যোগান দিতে পারে এবং তার বিনিময়ে এই দেশ থেকে মজুরী, সুদ বা মুনাফা পেতে পারে। **অতএব দ্রব্য ও সেবার আমদানির ফলে আমদানিকারক দেশের আয়-স্রোত থেকে আয়ের নিষ্কাশন ঘটে।**

রপ্তানি হল আয়ের অনুপ্রবেশ এবং আমদানি হল আয়ের নিষ্কাশন। কাজেই রপ্তানি বৃদ্ধি পেলে দেশের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানির বৃদ্ধি ঘটলে দেশের

আয় হ্রাস পাবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আয়ের বৃদ্ধি বা হ্রাসের পরিমাণ নির্ধারিত হবে। রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই গুণকের মান নির্ধারিত হবে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা ও প্রান্তিক আমদানি প্রবণতার দ্বারা।

অর্থাৎ গুণক = ১ (প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা + প্রান্তিক আমদানি)। এই দুটি প্রবণতার যোগফল একের চেয়ে কম হবে, কাজেই তাদের অন্যোন্যক একের চেয়ে বেশি হবে। কাজেই দেশের রপ্তানি যে পরিমাণে বাড়বে, দেশের আয় তার চেয়ে বেশি পরিমাণে বাড়বে।

১৫.৪ অবাধ বাণিজ্য বনাম সবাধ বাণিজ্য (Free Trade *Vs*. Restricted Trade)

দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যখন অর্থনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতে বাণিজ্য হয় এবং দুটি দেশের সরকার কোনভাবে বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করেন না তখন সেই বাণিজ্যকে বলা হয় অবাধ বাণিজ্য। অপরপক্ষে সরকার যদি রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে রপ্তানিকারকদের বিশেষ সুবিধা দেন কিংবা কোন দ্রব্যের রপ্তানির উপর নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ জারি করেন, আমদানি কমাবার জন্য আমদানির উপর শুল্ক বসান কিংবা অন্য কোন ভাবে আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন তাহলে সেই বাণিজ্যকে নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য বা সবাধ বাণিজ্য বলা হয়।

বাণিজ্য অবাধ হবে কি সবাধ হবে সে বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অ্যাডাম স্মিথ, রিকার্ডো প্রভৃতি ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন, বাণিজ্য অবাধ হওয়া উচিত। কারণ দুটি দেশ যদি আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগের সুবিধার ভিত্তিতে বাণিজ্য করে তাহলে কোন দেশ কেবলমাত্র সেই দ্রব্যটি বা দ্রব্যসমূহ উৎপাদন করবে যাতে তার দক্ষতা সবচেয়ে বেশি। দুটি দেশের ক্ষেত্রেই এরকম হলে সারা পৃথিবীতে দ্রব্যের উৎপাদন সর্বাধিক হবে। এতে পৃথিবীর সব দেশ ও দেশ-বাসীদের সুবিধা বেশি হবে। কিন্তু বাণিজ্য যদি নিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে একটি দেশ এমন দ্রব্য উৎপাদন করবে যাতে তার দক্ষতা বেশি নয়। এর ফলে অদক্ষ উৎপাদনে সেই দেশের অনেক সম্পদ নিযুক্ত হবে এবং এইভাবে সম্পদের বণ্টন কাম্যস্তরে থাকবে না। তাছাড়া মোট উৎপাদনও সর্বাধিক হবে। দেশবাসীদের ভোগের সুযোগ-সুবিধা নষ্ট হবে।

অপরপক্ষে যাঁরা নিয়ন্ত্রিত বাণিজ্যের সমর্থক তাঁরা বলেন—একটি দেশের মধ্যেই যদি অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার যুক্তি থাকে তাহলে বাণিজ্যও অবাধ থাকতে পারে না।

আমরা জানি—অবাধ অর্থব্যবস্থা কয়েকটি সংকটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। এই সংকটগুলির মধ্যে প্রধান হল অর্থনৈতিক কাজকর্মে অস্থিতিশীলতা, তীব্র বেকার সমস্যা ও বল্গাবিহীন মূল্যবৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অবাধ বাণিজ্য একটি দেশের অর্থনৈতিক সংকটকে অন্য দেশে ছড়িয়ে দেয়, দেশের লেনদেনের হিসেবে অস্থিতি-

শীলতার সৃষ্টি করে, সম্পদের অপবণ্টন ঘটায় এবং মোট উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে নানারকম ভাঙচুর ঘটায়। কাজেই বাণিজ্য সবাধ হওয়া উচিত। তবে সবাধ বাণিজ্য বলতে বাণিজ্যবিহীনতা বোঝায় না। শূন্য বাণিজ্যের চেয়ে কিছু বাণিজ্যও ভালো, তবে অবাধ বাণিজ্য সবাধ বাণিজ্যের চেয়ে বেশি কাম্য কিনা তা নির্ণয় করা তাত্ত্বিক দিক দিয়ে সহজ নয়।

১৪.৫ সংরক্ষণ :

১। **সংজ্ঞা : দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে বিশেষত দেশীয় শিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কোন দেশের সরকার সেই দেশের আমদানি বাণিজ্যের উপর যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন তাকে সংরক্ষণ বলা যেতে পারে।** সাধারণ আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছায়ায় বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হয়। অন্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের অন্য উদ্দেশ্য থাকতে পারে। অতএব আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল উদ্দেশ্যের পার্থক্য।

২। **সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি :** সংরক্ষণের পক্ষে যে-সব যুক্তি দেওয়া হয় তাদের সব যুক্তিই অর্থনৈতিক যুক্তি নয়। এদের মধ্যে রাজনৈতিক যুক্তি বা অনর্থনৈতিক যুক্তিও থাকে। আমরা এখানে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির আলোচনা করতে পারি।

(ক) শিশুশিল্প সংরক্ষণের যুক্তি (Infant Industry Argument) :

সংরক্ষণের পক্ষে বোধহয় সবচেয়ে প্রাচীন যুক্তি হল শিশুশিল্প সংরক্ষণের যুক্তি। ১৮৪১ সালে জার্মানির প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিজ্ঞ ফ্রেডারিক লিস্ট শিশু-শিল্প সংরক্ষণের প্রয়োজনের কথা বলেন। অবাধ বাণিজ্য নীতিতে তীব্র প্রতি-যোগিতার ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশের নতুন গড়ে ওঠা শিল্পগুলি যে উন্নতি করতে পারবে না, সেই শিশুশিল্পগুলিকে যে বিশেষভাবে সংরক্ষণ দেওয়ার প্রয়োজন আছে সে কথাই ছিল লিস্টের প্রধান বক্তব্য। মা যেমন নবজাত শিশুকে বাইরের প্রতিকুল পরিবেশ থেকে রক্ষা করেন নিজের অঞ্চল ছায়ায়, তেমনি কোন দেশের সরকারকেও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং দেশের সদ্যোজাত শিশুশিল্পগুলিকে বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। এরজন্য সরকার অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করবেন এবং আমদানি নিষেধ কিংবা হ্রাস করার জন্য আমদানির উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক আরোপ করবেন। আমদানি শুল্ক আরোপ করলে আমদানি দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে। তখন দেশবাসিগণ বেশি দাম দিয়ে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় না করে তুলনামূলক-ভাবে স্বল্প দামে স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় করবে। এইভাবে আমদানি কমবে এবং আম-দানির বিকল্পদ্রব্যগুলির বাজার সৃষ্টি হবে। সংরক্ষণমূলক শুল্ক না থাকলে বিদেশী দ্রব্যগুলির দাম স্বদেশে উৎপন্ন দ্রব্যগুলির দামের চেয়ে বেশি হবে, তখন দেশের জনগণ স্বদেশী দ্রব্য ক্রয় না করে সস্তাদরে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করবে। বিদেশের

সুপ্রতিষ্ঠিত ও উন্নত শিল্পগুলির সঙ্গে বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনকারী স্বদেশের শিশুশিল্পগুলিকে অবাধ প্রতিযোগিতার মুষ্টিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দিলে শিশু-শিল্পগুলি কখনই পারবে না। এর কারণ কী ?

এর কারণ হল উৎপাদনের আয়তনজনিত ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা (advantages of economies of scale). বিদেশের প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক দিন আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের উৎপাদনের মাত্রা হল বৃহৎ। বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন করার জন্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ একাধিক ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা পেয়ে থাকে ; যার ফলে তাদের গড় ব্যয় এবং দ্রব্যের দাম কম হয়। অপরপক্ষে স্বল্পোন্নত দেশের শিশুশিল্প-গুলি নতুন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের উৎপাদনের মাত্রাও ছোট। কাজেই তাদের গড় ব্যয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি হবে। তারা বিদেশের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারবে না।

অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, সংরক্ষণের সুবিধা যে-কোন শিল্পকেই দেওয়া চলে না। যে শিল্পগুলি প্রকৃত অর্থে "শিশু" অর্থাৎ যাদের বয়স কম, শুধু তাই নয়, যাদের বড়ো হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া উচিত। যাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই, তাদের সংরক্ষণ দেওয়া উচিত নয়।

শিশুশিল্প সংরক্ষণের প্রধান যুক্তি হল নিশ্চয়ই স্বল্পোন্নত দেশে শিল্প বিকাশের যুক্তি। স্বল্পোন্নত দেশে বাজারের অভাবে নতুন শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। কাজেই মধ্যবর্তী সময়ে সংরক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন। তারপর দেশের শিল্পগুলি যখন পরিণত দশা প্রাপ্ত হবে তখন তাদেরকে প্রতিযোগিতার মুখে উন্মুক্ত করে দেওয়া উচিত। সংরক্ষণের সুবিধা কখনই চিরকাল দেওয়া উচিত নয়। যে শিশু চিরকাল মায়ের কোলে থাকতে চায়—তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। কাজেই তাকে সংরক্ষণের সুবিধা দেওয়া মানে অপচয়কে প্রশ্রয় দেওয়া ও অযোগ্যের জন্য যোগ্যতমকে বঞ্চিত করা।

শিশুশিল্প সংরক্ষণের বিরুদ্ধে যুক্তি : (১) শিশুশিল্প সংরক্ষণের পক্ষে যে সব যুক্তি দেখানো হয় তাদের অনেকগুলির মধ্যে কোন সারবস্তু নেই। (২) শিশু-শিল্পকে সংরক্ষণ দিলে যোগ্যতমের বেঁচে থাকা (Survival of the fittest) নামক প্রাকৃতিক নীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। (৩) দেশের জনগণকে কম দরে উন্নত মানের বিদেশী দ্রব্য ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয় না। (৪) বরং তারা অনুন্নত মানের স্বদেশী দ্রব্য বেশী দাম দিয়ে কিনতে বাধ্য হয়। (৫) এর ফলে ক্রেতাদের ভোগ করার স্বাধীনতা খর্ব হয় এবং (৬) দেশের ভোগ সম্ভাবনা হ্রাস পায়। (৭) শিশুশিল্প সংরক্ষণের নীতি আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগ নীতির বিরোধী। আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাগের নীতিতে বলা হয় একটি দেশের পক্ষে সব দ্রব্য উৎপাদন করে নেওয়া সম্ভব নয় এবং উচিতও নয়। কোন দেশ যে দ্রব্যটি ভালোভাবে উৎপাদন করতে পারে না সেই দেশ অন্য যে দেশ পারে তার কাছ থেকে আমদানি করবে। এর বিপরীত করতে গেলেই দেশের ও সমগ্র পৃথিবীর ক্ষতি হবে।

(৮) সংরক্ষণের প্রশাসনিক জটিলতাও খুব বেশি। এতে নির্বাচনের সমস্যা থাকে। কোন স্বল্পোন্নত দেশ সহজভাবে নির্বাচন সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে মনে হয় না।

(খ) সংরক্ষণ ও শিল্পস্থাপন :

সংরক্ষণের পক্ষে বলা হয় যে, এর সাহায্যে স্বদেশী শিল্পের বিকাশ হয়। প্রতিযোগিতা কম হওয়ায় স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে সন্তোষজনক অবস্থায় আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবস্থা করা যায়। আমদানির বিকল্প শিল্পের বিকাশ ঘটলে সংযোগ প্রভাবে অন্যান্য শিল্পের বিকাশ হয়। এইভাবে দেশের শিল্পায়ন সম্ভব।

(গ) সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন :

কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভর করে সেই দেশের কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের উপর। এর জন্য দেশে মূল ও ভারী শিল্প স্থাপন করতে হয়। শিল্প স্থাপন করতে হলে একদিকে যেমন দেশবাসীদের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হয়, অন্যদিকে তেমনি বিদেশী দ্রব্যের ব্যবহার ছেড়ে স্বদেশী দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হয়। এর সঙ্গে যদি সরকার সংরক্ষণের পক্ষচ্ছায়া দান করেন তাহলে স্বদেশের শিল্পগুলি বাজার পায় এবং শীঘ্র বেড়ে উঠতে পারে। শিল্প স্থাপন হলেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো সহজ হয়।

(ঘ) সংরক্ষণ ও বেকার সমস্যা :

সংরক্ষণের সাহায্যে দেশীয় শিল্পগুলিকে যেমন রক্ষা করা সম্ভব, তার সঙ্গে সেই সব শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের বেকার হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানো সম্ভব। বৃটিশ আমলে ভারতের তাঁত বস্ত্রশিল্প ইংলণ্ডের কলে তৈরি বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার চাপে ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। সেই সঙ্গে বহু দেশীয় কারিগর বেকার হয়ে পড়েছিলেন। সংরক্ষণের সাহায্যে এরকম বেকারত্ব দূর করা যায়।

তাছাড়া দেশে যখন চিরাচরিত শিল্পের পরিবর্তে আধুনিক শিল্প গড়ে ওঠে তখন চিরাচরিত শিল্পে নিযুক্ত কর্মীরা বেকারত্বের শিকার হয়ে পড়েন। একে আমরা বিরতিমূলক বেকারত্ব (Frictional Unemployment) বলতে পারি। সংরক্ষণের সাহায্যে বিরতিমূলক বেকারত্ব বা অন্য কোন স্বল্পস্থায়ী বেকারত্ব দূর করা যায়। সংরক্ষণের সাহায্যে দেশের চিরাচরিত শিল্পগুলিকে রক্ষা করলে যতদিন কর্মীরা নতুন আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পে অভ্যস্ত হয়ে না ওঠে ততদিন সেইসব কর্মীদের বেকার হয়ে পড়তে হয় না।

পরিশেষে বলা যায়, সংরক্ষণের সাহায্যে দেশের শিল্পায়ন হয়। শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে গুণক প্রক্রিয়ায় আয়, দ্রব্যের চাহিদা, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

বিরুদ্ধে যুক্তি :—অনেকে মনে করেন সংরক্ষণের সাহায্যে বেকার সমস্যার সমাধান করা যায় না। বরং সংরক্ষণ পদ্ধতি বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করে। তাঁদের

প্রধান যুক্তি হল এই যে, রপ্তানি শিল্পের বিকাশ ঘটলেই বেকারত্ব দূর হয়। সংরক্ষণ আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পগুলির বিকাশে সাহায্য করে। এই শিল্পগুলি দেশের অপ্রচুর সম্পদে নিবিড় হয়। অপর পক্ষে রপ্তানি শিল্পগুলি সাধারণত সুপ্রচুর সম্পদে নিবিড় হয়। যেমন, কোন স্বল্পোন্নত দেশে যদি শ্রম সুপ্রচুর সম্পদ হয় তাহলে সেই দেশের রপ্তানি দ্রব্যগুলো হবে শ্রম নিবিড়। অপর পক্ষে তার আমদানি দ্রব্যগুলো হবে অপ্রচুর সম্পদ যথা, মূলধনে অপেক্ষাকৃত নিবিড়। সেক্ষেত্রে সংরক্ষণের ফলে শ্রমের চাহিদা কম বাড়বে এবং মূলধনের চাহিদা বেশি বাড়বে। এটি হল স্টলপার-স্যামুয়েলসনের তত্ত্ব (Stolper-Samuelson Theorem).

(ঙ) সংরক্ষণ ও শিল্পের বৈচিত্র্যকরণ :

ফ্রেডারিক লিস্ট্ মনে করতেন, কোন দেশের পক্ষেই একটি মাত্র শিল্পের উপর নির্ভর করে থাকা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপজ্জনক। রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিপজ্জনক, কারণ একটি মাত্র শিল্পে নিযুক্ত হলে এবং যুদ্ধের সময় বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে গেলে দেশের পক্ষে কিছু করার থাকে না। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিপজ্জনক, কারণ একটিমাত্র শিল্প গড়ে তুললে এবং সেই শিল্পে কোন সংকট দেখা দিলেও অসুবিধায় পড়তে হয়। কাজেই শিল্পের বৈচিত্র্য থাকা প্রয়োজন। এর জন্য রপ্তানি দ্রব্য এবং আমদানির বিকল্প দ্রব্যও উৎপাদন করতে হবে। কাজেই সংরক্ষণ চাই।

(চ) সংরক্ষণ ও রাজস্ব :

সংরক্ষণের পদ্ধতি হল আমদানির উপর উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ। এর দ্বারা সরকারের কোষাগারে রাজস্ব জমা হয়। রাজস্বের প্রয়োজন দেখা দিলেও সরকার বাণিজ্যের উপর সংরক্ষণমূলক শুল্ক আরোপ করতে পারেন।

(ছ) সংরক্ষণ ও মূল শিল্প :

প্রত্যেক দেশের পক্ষেই কিছু মূল ও ভারী শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন। মূল শিল্পের ব্যাপারে বিদেশের উপর নির্ভর করে বসে থাকা উচিত নয় এবং মূল শিল্প গড়ে তুলতে হলে সংরক্ষণের প্রয়োজন।

(জ) সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষা :

মূল শিল্পের ক্ষেত্রে যে যুক্তি দেখানো হয় ঠিক সেই যুক্তি দেখানো হয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে। কোন দেশের পক্ষেই প্রতিরক্ষাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় এবং প্রতিরক্ষা-মূলক দ্রব্যের জন্য বিদেশের উপর নির্ভর করাও চলে না। কাজেই যে-কোন মূল্যে প্রয়োজন হলে সংরক্ষণের সাহায্যে প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলা উচিত।

(ঝ) সংরক্ষণ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা :

স্বয়ং-সম্পূর্ণতার প্রয়োজনেও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। বর্তমান যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এমন দ্রুত পরিবর্তনশীল হয়ে পড়েছে যে,

কোন দেশের পক্ষেই অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

(ঞ) সংরক্ষণ ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা :

অনেকে মনে করেন দেশের মূল্যবান সম্পদগুলির ব্যবহার করে যেসব দ্রব্য উৎপন্ন হয় ও বিদেশে চালান যায় তার ফলে দেশীয় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি বন্ধ করতে হলে রপ্তানি বন্ধ করা উচিত। রপ্তানি বন্ধ হলেই আমদানির প্রয়োজন থাকবে না। কাজেই দেশের সম্পদ বিদেশে সরাসরিভাবে বা দ্রব্যের আকারে রূপান্তরিত অবস্থায় বিদেশে চলে যাবে না।

(ট) সংরক্ষণ ও দেশাত্মবোধ :

এটা হল রাজনৈতিক যুক্তি। দেশাত্মবোধের জন্যই বিদেশের কাপড় ছেড়ে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেবার জন্য কবি ডাক দিয়েছিলেন ভারতবাসীদের কাছে। সব দেশেই এমন যুক্তি দেখানো হয়।

(ঠ) সংরক্ষণ ও দেশের অর্থ দেশেই রাখার চেষ্টা :

এই যুক্তিতে বলা হয় যে, আমরা যখন বিদেশীদের কাছ থেকে কোন জিনিস কিনি তখন আমরা জিনিসটা পাই, কিন্তু বিদেশীরা পায় টাকা। কিন্তু আমরা যখন দেশের ভিতর থেকে কোন জিনিস কিনি তখন আমরা জিনিসটা পাই এবং টাকাটাও আমরা পাই।

৩। সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি :

সংরক্ষণের সুবিধা আছে, কিন্তু এর অসুবিধাও কম নয়। এই অসুবিধাগুলি থেকেই সংরক্ষণের বিপক্ষে যুক্তি সাজানো হয়। (১) প্রথমেই বলা যায়—সংরক্ষণ দেশের ভোগকারীদের স্বার্থ উপেক্ষা করে। দেশবাসীরা বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানি করলে কম দামে উৎকৃষ্ট মানের দ্রব্য ভোগ করতে পায়। কিন্তু আমদানি শুল্কের দ্বারা আমদানি দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিয়ে কিংবা আমদানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে সরকার দেশবাসীদের বেশি দামে দেশের তৈরি নিম্নমানের দ্রব্য ভোগ করতে বাধ্য করেন। এতে দেশবাসীদের তৃপ্তির মাত্রা হ্রাস পায়।

(২) দ্বিতীয়ত, সংরক্ষণের নীতি হল অদক্ষ ও অযোগ্যকে সাহায্য করার জন্য যোগ্যকে বাধা দানের নীতি। এর মধ্যে ন্যায়-নীতি থাকে না। যে উৎপাদন ব্যবস্থায় অদক্ষকে সমর্থন করা হয় এবং উৎসাহ দেওয়া হয় সেই উৎপাদন ব্যবস্থাকে যুক্তিপূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা বলা যায় না।

(৩) তৃতীয়ত, সংরক্ষণের নীতি শ্রমবিভাগের সুবিধায় বিশ্বাস করে না। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ সব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারবে— কাজেই তার পক্ষে বিদেশ থেকে কোন দ্রব্য আমদানি করার প্রয়োজন থাকবে না এমন মনে করা ভুল। উপাদান-সম্পন্নতার পার্থক্য (Differences in factor endowment) থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। সংরক্ষণ নীতি একে অস্বীকার করে।

(৪) চতুর্থত, সংরক্ষণ নীতিতে যে জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয় তা কখনই উদার জাতীয়তাবাদ নয়। একটি দেশ যখন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে তখনই সে কঠোর সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগ করে।

(৫) পঞ্চমত, সংরক্ষণ নীতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুস্থ পরিবেশ নষ্ট করে। একটি দেশ তার আমদানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলে অন্যদেশ তার প্রতিশোধ (Retaliation) নিতে পারে এবং সেই দেশ থেকে আমদানি নিষিদ্ধ করার জন্য কঠোর শুল্ক নীতি প্রয়োগ করতে পারে। এর ফলে শুল্ক যুদ্ধ (Tariff war) শুরু হয়ে যেতে পারে এবং দুটি দেশের বাণিজ্যের মোট পরিমাণ (Volume of Trade) হ্রাস পেতে পারে। এতে দুদেশের জনগণের তৃপ্তির মাত্রা কমে যায়।

(৬) ষষ্ঠত, সংরক্ষণ অবাধ প্রতিযোগিতাকে হটিয়ে একচেটিয়া কারবারকে প্রশ্রয় দিতে পারে। এর ফলে সম্পদের অপবণ্টন হয় এবং উৎপাদন ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হয় না।

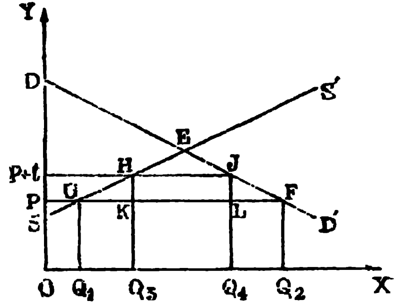
(৭) সপ্তমত, সংরক্ষণ নীতিতে বেকার সমস্যার সমাধানের যে কথা বলা হয় তাও ঠিক নয়। একটি দেশ রপ্তানি বৃদ্ধি করে বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারে। সেক্ষেত্রে আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে যত বেকারের চাকুরি দেওয়া যেতে পারে, তার চেয়ে রপ্তানি বাড়িয়ে বেশি বেকারদের চাকুরি দেওয়া যেতে পারে। কারণ, যে দেশে শ্রমের যোগান বেশি সে দেশ এমন দ্রব্য রপ্তানি করবে যাতে প্রতি একক উৎপাদনের জন্য শ্রমের নিয়োগ বেশি হয় এবং সে দেশ প্রধানত এমন দ্রব্য আমদানি করবে যাতে মূলধন বা যন্ত্র কম লাগবে। এখন সে দেশ যদি সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগ করে আমদানি কমায় এবং আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প গড়ে তোলে তাহলে মূলধনের চাহিদা যত বেশি বাড়বে, শ্রমের চাহিদা তত বেশি বাড়বে না। কাজেই সংরক্ষণ শ্রম-সম্পন্ন প্রচুর স্বল্পোন্নত দেশের বেকার সমস্যা সমাধানে বিশেষ সাহায্য করে না।

১৫.৬ আমদানি-শুল্কের অর্থনৈতিক ফল (Economic effects of an Import duty) ঃ

কোন দেশের সরকার সেই দেশের আমদানির উপর শুল্ক আরোপ করলে তার কয়েকটি অর্থনৈতিক ফল ফলে। প্রথমত, সরকারেব রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। একে রাজস্ব প্রভাব (Revenue Effect) বলা হয়। দ্বিতীয়ত, আমদানির উপর কর বা শুল্ক আরোপিত হলে আমদানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। একে দাম প্রভাব (Price Effect) বলা হয়। তৃতীয়ত, শুল্কের ফলে দ্রব্যের ভোগ কমে। একে ভোগ প্রভাব (Consupmtion Effect) বলা হয়। চতুর্থত, শুল্কের ফলে আমদানি কমে, তার পরিবর্তে দেশের মধ্যে আমদানি-বিকল্প দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। একে সংরক্ষণমূলক প্রভাব (Protective Effect) বলা হয়। পঞ্চমত, আমদানি শুল্কের ফলে আমদানি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে ক্রেতাদের

ভোগোদ্বৃত্ত হ্রাস পায়। ষষ্ঠত, উৎপাদকের উদ্বৃত্ত (Producers' surplus) বৃদ্ধি পায়। সপ্তমত. শুল্কের ফলে আমদানি কমে। আয়ের নিষ্কাশন কমে। এর ফলে দেশের আয় বৃদ্ধি পায়। অষ্টমত, যে দেশের বাণিজ্যে রপ্তানির চেয়ে আমদানির মূল্য বেশি হয়, সেই দেশের বাণিজ্যের হিসাবে ঘাটতি (Deficit in the Balance of Trade) দেখা দেয়। আমদানি শুল্ক বসালে যদি আমদানির মূল্য কমে তাহলে এই ঘাটতি কমে।

এই প্রভাবগুলির মধ্যে প্রথম ৬টি প্রভাবকে ১৫·১ নং রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হল। এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে আমদানি দ্রব্যের পরিমাণ এবং OY-অক্ষে আমদানি দ্রব্যটির দাম পরিমাপ করা হচ্ছে। এখানে SS′ হল দ্রব্যের যোগান রেখা এবং DD′ হল চাহিদা রেখা। এখানে SS′ ও DD′ রেখা দুটি পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হল বাণিজ্যবিহীন অবস্থার ভারসাম্য অবস্থা। বাণিজ্যের ফলে ভারসাম্য ঘটবে E বিন্দুর নীচে। সেখানে দ্রব্যের চাহিদা আভ্যন্তর যোগানের চেয়ে বেশি হবে। বাকি দ্রব্য আমদানি করা হবে। ধরা যাক, দ্রব্যের দাম OP. এই দামে আভ্যন্তর চাহিদা OQ_2, কিন্তু দ্রব্যের যোগান OQ_1। অতএব Q_1Q_2 হল আমদানির পরিমাণ। এখন ধরা যাক, আমদানির দামের উপর t পরিমাণে শুল্ক চাপানো হল। এখন দ্রব্যের দাম হবে P+t. অর্থাৎ আমদানি দ্রব্যের দাম শুল্কের দ্বারা শুল্কের পরিমাণের সমান পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। P+t দামে দ্রব্যের চাহিদা হবে OQ_4 এবং দ্রব্যের আভ্যন্তর যোগান হবে OQ_3. কাজেই আমদানির পরিমাণ হবে Q_3Q_4. আগে আমদানি হত $Q_1Q_2 = GF$. এখন হবে $Q_3Q_4 = HJ$. অতএব আমদানি শুল্কের ফলে আমদানির পরিমাণ কমবে। এখানে শুল্কের পরিমাণ $= t = PM = HK$. আমদানির পরিমাণ $= HJ$. অতএব সরকারের রাজস্ব হবে HK. HJ = KHJL নামক আয়তক্ষেত্রটি। এটা হল রাজস্ব-প্রভাব। এখানে দ্রব্যটির ভোগ OQ_2 থেকে কমে OQ_4 হবে। অতএব ভোগ প্রভাব হল $Q_4Q_2 = LF$. শুল্কের আগে উৎপাদন হত OQ_1. এখন উৎপাদন হবে OQ_3. অতএব উৎপাদন প্রভাব বা সংরক্ষণমূলক প্রভাব হল $Q_1Q_3 = GK$. আগে ক্রেতাদের ভোগোদ্বৃত্ত ছিল PDF. এখন সেই ভোগোদ্বৃত্ত কমে হবে DJM. অতএব ক্রেতাদের ভোগোদ্বৃত্ত PMJF পরিমাণে কমবে। আগে উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত ছিল SPG. এখন হবে SMH. অর্থাৎ উৎপাদকদের উদ্বৃত্ত বাড়বে।



১৫·১ রেখাচিত্র : আমদানি শুল্কের অর্থনৈতিক প্রভাব

১৫.৭ দুটি দেশের বিনিময় হার কীভাবে নির্ধারিত হয় (How the Foreign-Exchange Rate is determined) :

এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে চলে না। তবু দুটি দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর কেনাবেচা চলে। কোন দেশ বিদেশ থেকে দ্রব্য আমদানি করলে সেই দ্রব্যের দাম দিতে হয় বিদেশী মুদ্রায়। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিদেশী দ্রব্য আমদানি করে সে স্বদেশী মুদ্রা দিয়ে বিনিময় ব্যাঙ্ক থেকে বিদেশী মুদ্রা ক্রয় করে নেয়। কিন্তু কী পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাওয়ার জন্য কী পরিমাণ স্বদেশী মুদ্রা দিতে হবে সেটা দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন, কোন ভারতীয় যদি ১ লক্ষ ডলার মূল্যের একটি আমেরিকান যন্ত্র আমদানি করে, তাহলে তাকে ১ লক্ষ ডলারের জন্য কত ভারতীয় মুদ্রা (রুপয়া বা টাকা) দিতে হবে সেটা ডলার ও টাকার বিনিময় হারের উপর নির্ভর করবে। ধরা যাক, ১ ডলার = ৮ টাকা, তাহলে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে ভারতীয় ব্যক্তিকে ৮ লক্ষ টাকা দিয়ে ১ লক্ষ ডলার ক্রয় করতে হবে। এখানে আমেরিকান যন্ত্রের দাম হল ১ লক্ষ ডলার কিংবা ৮ লক্ষ টাকা। অতএব **দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে যে হারে একটি দেশের মুদ্রার বিনিময়ে অন্য দেশের মুদ্রা পাওয়া যায় তাকে বিনিময় হার বলা হয়।** মুদ্রা দুটি যদি ভারতীয় মুদ্রা (টাকা ও আমেরিকান ডলার হয়, তাহলে ডলার ও টাকার বিনিময় হার বলতে বোঝাবে এক একক ডলার পেতে হলে কী পরিমাণ ভারতীয় মুদ্রা দিতে হয়, কিংবা এক একক ভারতীয় মুদ্রা দিয়ে কী পরিমাণ আমেরিকান ডলার পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন এই বিনিময় হার কীভাবে নির্ধারিত হয়? আগেকার দিনে যখন স্বর্ণমান Gold Standard) ব্যবস্থা চালু ছিল, তখন কোন দেশের মুদ্রার একটি স্বর্ণগতমান বজায় রাখা হত। সেক্ষেত্রে দুটি দেশের মুদ্রার স্বর্ণগতমান জানা থাকলে আমরা সহজেই বলতে পারি —কোন্ মুদ্রার কতখানি দিলে অন্য মুদ্রার কতটা পাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য এখন আর স্বর্ণমান প্রচলিত নেই। কাজেই এই তত্ত্বটির আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই। এখন কোন দেশের মুদ্রার পরিমাণ সোনার পরিমাণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল নয়। দেশের অর্থ যোগানের কর্তৃপক্ষ দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের যোগান দেয়, তার পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি করে।

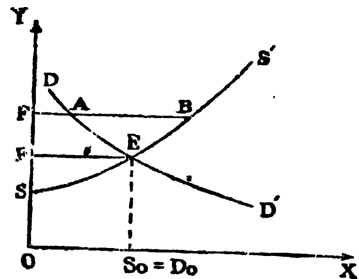
এখন দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার কীভাবে নির্ধারিত হতে পারে? গুস্তাভ ক্যাসেল মনে করেন দুটি দেশের মুদ্রার অর্থের বিনিময় হার নির্ধারিত হয় দুটি দেশের মুদ্রার আভ্যন্তর ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা। ধরা যাক, ভারতে একটি কাপড়ের দাম ২৪ টাকা। আর ঠিক সেই কাপড়টির দাম আমেরিকাতে ৩ ডলার। তাহলে ভারতের ২৪ টাকার ক্রয়ক্ষমতা ও আমেরিকার ৩ ডলার ক্রয়ক্ষমতা সমান। কাজেই ২৪ টাকা = ৩ ডলার, অর্থাৎ ৮ টাকা = ১ ডলার হবে। এখন ভারতে সেই কাপড়টির দাম যদি ৪৮ টাকা হয়, কিন্তু আমেরিকাতে ৩ ডলারই থাকে, তাহলে ৩ ডলার = ৪৮ টাকা, অর্থাৎ ১ ডলার = ১৬ টাকা হবে। আমেরিকার ডলার হিসাবে ভারতের

টাকার দাম কমবে, অপরপক্ষে ভারতের টাকার হিসাবে আমেরিকার ডলারের দাম বাড়বে। এটা হল ভারতীয় মুদ্রার মূল্যহ্রাস (Devaluation of Indian Currency)।

ক্যাসেলের এই তত্ত্বটিকে ক্রয়ক্ষমতার সমতাতত্ত্ব (Purchasing Power Parity Theory) বলা হয়।* কারণ ক্যাসেলের মতে দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার এমনভাবে নির্ধারিত হবে যাতে দুটি দেশের নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দিয়ে সমান পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায়। এখন কোন দেশে যদি মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয় তাহলে সেই দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা কমবে, কাজেই সেই দেশের বিনিময় হারও কমবে। অপরপক্ষে যদি বিদেশে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি দেখা দেয়, তাহলে এই দেশের মুদ্রার বিনিময় হার বাড়বে। ক্যাসেলের এই তত্ত্বটির মধ্যে সারবত্তা আছে। কিন্তু একটি ব্যাপারে অসুবিধা দেখা দিতে পারে। দুটি দেশে একটি দ্রব্য (যেমন, কাপড় উৎপন্ন হলে উৎপাদনের পদ্ধতি ও ব্যয় পৃথক হবে এবং দ্রব্যের গুণগত মানও পৃথক হতে পারে। সেক্ষেত্রে দুটি দেশের অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকে তুলনীয় পর্যায়ে আনা যাবে না।

মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের আর একটি তত্ত্ব আছে। এই তত্ত্বটি হল, চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব। একেই অনেকে আধুনিক তত্ত্ব বলে থাকেন। এই তত্ত্ব অনুসারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার দাম বা বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়। যে হারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান সমান হয় সেটিই হয় ভারসাম্য বিনিময় হার। ১৫.২ রেখাচিত্রের সাহায্যে এটা দেখানো হল।

এই রেখাচিত্রে OX-অক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান এবং OY-অক্ষে বিনিময় হার পরিমাপ করা হচ্ছে। এখানে SS′ হল বৈদেশিক মুদ্রার যোগান রেখা এবং DD′ হল বৈদেশিক মুদ্রার যোগান রেখা। এই রেখা দুটি পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E হল ভারসাম্যের বিন্দু। এখানে OF হল ভারসাম্য বিনিময় হার। অর্থাৎ এক একক স্বদেশী মুদ্রা দিলে তার বিনিময়ে OF পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যাবে। এই হারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান সমান হবে। কিন্তু কোন কারণে যদি বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা যোগানের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বিনিময়-হার বৃদ্ধি পাবে। আবার যোগান যদি চাহিদার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বিনিময়-হার হ্রাস পাবে। আমাদের রেখাচিত্রে একটি বিনিময় হার OF′ >OF নেওয়া হয়েছে। এই হারে বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে যোগান হবে F′B. কিন্তু



১৫.২ রেখাচিত্র : মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

চাহিদা হবে F'A কাজেই যোগান বেশি হবে। এখানে AB হল অতিরিক্ত যোগান। এর চাপে বিনিময় হার কমবে। কমে OF হবে। এখন দেখা দরকার বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান কোথা থেকে আসে। আলোচনার সুবিধার জন্য যদি ধরে নেওয়া যায় যে, দুটি দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার আদান-প্রদান ছাড়া অন্য কোনভাবে মূলধনের আদান-প্রদান হয় না, তাহলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা নির্ভর করবে কেবলমাত্র দ্রব্য ও সেবার আমদানির মূল্যের উপর। দ্রব্য ও সেবার আমদানির জন্যই বিদেশীদের বিদেশী মুদ্রা দিতে হয়। কোন দেশ যত বেশি দ্রব্য ও সেবা আমদানি করবে ততই তার বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়বে। কিন্তু দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ নয় বিদেশী দ্রব্য ও সেবার মূল্যই এখানে বিবেচ্য বিষয়। এখানে দুটি বিষয় জড়িত। একটি আমদানির পরিমাণ (Q) এবং অন্যটি হল আমদানির দাম (P) (বিদেশী মুদ্রায়)। আমদানির মূল্য হল PQ এখন P বাড়লে Q স্থির থাকলে কিংবা Q বাড়লেও P স্থির থাকলে, কিংবা P ও Q বাড়লে আমদানির মূল্য বাড়বে। এখন P বাড়লে Q কমতে পারে, কিন্তু PQ কমবে, কি স্থির থাকবে, কি বাড়বে সেটা নির্ভর করবে আমদানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর।

অনুরূপভাবে বিদেশী মুদ্রার যোগান আসে দেশের রপ্তানি থেকে। বিদেশীরা যে সব দ্রব্য ক্রয় করে তার জন্য তারা তাদের মুদ্রার দাম দেয়। রপ্তানিকারক দেশের পক্ষে এটাই হল বৈদেশিক মুদ্রার যোগান। এই যোগান নির্ভর করে রপ্তানির চাহিদা ও তার স্থিতিস্থাপকতার উপর। আবার আমদানি ও রপ্তানির চাহিদার মত আমদানির যোগান ও রপ্তানির যোগানও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাহলে আমরা পেলাম, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হয় — বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান, আমদানির চাহিদা ও যোগান এবং রপ্তানির চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার দ্বারা।

১৫.৮ লেনদেনের হিসাব (Balance of Payments)

একটি দেশ বিদেশ থেকে নানা সূত্রে আয় বা বিদেশী মুদ্রা পেয়ে থাকে। আবার সেই দেশটিকে নানা কারণে বিদেশে আয় বা বিদেশী মুদ্রা পাঠাতে হয়। এটা হল দেশের ব্যয়। যার থেকে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায় তাকে পাওনা (Credit) বলা হয়। যার জন্য বিদেশী মুদ্রা দিতে হয় তাকে দেনা (Debit) বলা হয়। এখন কোন দেশের সমস্ত প্রকার পাওনা ও দেনার বিষয়গুলিকে একটি দ্বিপার্শ্বিক হিসাবের মধ্যে রাখলে যে হিসাব (Balance) গড়ে ওঠে তাকে লেনদেনের হিসাব বলা হয়। এই হিসাবের দুটি দিক—একটি হল পাওনার দিক (Credit side) এবং অপরটি হল দেনার দিক (Debit side). দেনা বলতে এখানে ঋণ বোঝায় না। যা দেওয়া হয় তাই হল দেনা। যা হোক, এই লেনদেনের হিসাবে পাওনার দিকে থাকে দেশের—

(১) দ্রব্য রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয় (বিদেশী মুদ্রা)।

(২) সেবা রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত আয়।

(৩) বিদেশ থেকে প্রাপ্ত উপহার, অনুদান, দান ইত্যাদি বিনিময়বিহীন পাওনা।

(৪) বিদেশ থেকে প্রাপ্ত মূলধনী আয় যেমন, ঋণপ্রাপ্তি, বিদেশীদের নিকট কোন সম্পত্তি বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত আয়, বিদেশীরা যদি কোন পুরানো ঋণ শোধ করে দেয়তার পাওনা ইত্যাদি।

এখানে (১) হল দৃশ্য রপ্তানি (Visible Exports). (২) এর মধ্যে থাকে পরিবহণ সেবা, বীমা ইত্যাদি থেকে দেশের আয়। বিদেশে কর্মরত দেশীয় শ্রমিক-দের পাঠানো আয়। এ দেশের বিনিয়োগকারীরা যদি বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ করে তার লভ্যাংশ (Dividends) এবং বিদেশে যদি মূলধন ধার দিয়ে সুদ পায় সেই সুদ।

বিপরীতক্রমে কোন দেশের দেনার উদ্ভব ঘটে--

(১) দ্রব্য আমদানির জন্য, (২) সেবা আমদানির জন্য পরিবহণ, বীমা ইত্যাদি. লভ্যাংশ ও সুদ প্রদান ইত্যাদি).

(৩) বিদেশকে দেয় উপহার দান ইত্যাদির জন্য,

(৪) বিদেশকে দেয় ঋণ বিদেশী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য কিংবা বিদেশের পুরানো ঋণ পরিশোধের জন্য। এই লেনদেনের হিসাবের পাওনা ও দেনার দিকে দ্রব্যের রপ্তানি ও দ্রব্যের আমদানি থাকে। এদের নিয়ে গড়ে ওঠে বাণিজ্যের হিসাব (Balance of Trade). তাছাড়াও লেনদেনের হিসাবে থাকে সেবার হিসাব (Balance of Services), বিনিময়বিহীন দেনা-পাওনার হিসাব যেমন, উপহার দাম ইত্যাদির দেওয়া বা নেওয়া এবং মূলধনী দেনা-পাওনা।

কোন দেশের বাণিজ্যের হিসাবে রপ্তানির মূল্য ও আমদানির মূল্য সমান হলে আমরা বলি বাণিজ্যের হিসাবে সমতা আছে। কিন্তু রপ্তানির মূল্য যদি আমদানির মূল্যের চেয়ে বেশি হয় তাহলে বাণিজ্যের হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকে। যেখানে আমদানির মূল্যে রপ্তানির মূল্যের চেয়ে কম হয়, সেখানে বাণিজ্যের হিসাবে ঘাটতি থাকে।

বাণিজ্যের হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকলে বোঝাবে দেশটি বিদেশ থেকে যে পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা পাবে তার চেয়ে কম বিদেশী মুদ্রা তাকে দিতে হবে। বাকি গোটা উদ্বৃত্তটাই বিদেশীদের ঋণ হয়ে থাকবে। বিদেশীরা ঋণগ্রহীতা। উদ্বৃত্ত সম্পন্ন দেশটি হবে ঋণদাতা। কাজেই এই ঋণ তার লেনদেনের হিসাবে দেনার দিকে থাকবে। কাজেই এই দেশের মোট দে ও পাওনা সমান থাকবে। আবার এই দেশের বাণিজ্যের হিসাবে ঘাটতি থাকলে বোঝাবে সেই পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা দেশটিকে ঋণ হিসাবে নিতে হবে। যে দেশের ঘাটতি হবে সেই দেশটি বিদেশ থেকে ঋণ পাবে, কাজেই সেই ঋণ তার লেনদেনেব হিসাবে পাওনার দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এইভাবে মোট দেনা ও পাওনা সমান হয়ে যাবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে (১) বাণিজ্যের হিসাব লেনদেনের হিসাবের একটি অংশ মাত্র এবং (২) বাণিজ্যের

হিসাবে উদ্বৃত্ত, সমতা বা ঘাটতি যাই থাকুক না কেন, লেনদেনের হিসাবে মোট দেনা ও পাওনা সব সময় সমান থাকে।

সেইজন্য বলা হয়, লেনদেনের হিসাব সব সময় সমতায় থাকে (Balance of payments always balances). কিন্তু এখানে মনে রাখা দরকার যে, এই সমতা হল হিসাবশাস্ত্রীয় সমতা (Accounting Balance) মাত্র। হিসাবশাস্ত্রের হিসাব রক্ষার পদ্ধতিই হল যে, হিসাবের দুটি দিকের যোগফলকে সমান রাখা। কিন্তু এই সমতার দ্বারা বোঝায় না যে, লেনদেনের হিসাবে ভারসাম্য আছে বা নেই।

লেনদেনের হিসাবকে আমরা চলতি হিসাব (Current Account) এবং মূলধনী হিসাবে (Capital Account) ভাগ করতে পারি। চলতি হিসাবে থাকে নানরকম চলতি আয় ও ব্যয়, যেমন, দ্রব্যের ও সেবার রপ্তানি ও আমদানি। মূলধনী হিসাবে থাকে দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন মূলধনী আয় ও ব্যয় যেমন, ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণ, সম্পত্তির ক্রয় বা বিক্রয় ইত্যাদি। এখন কোন দেশের বাণিজ্যের হিসাবে বা চলতি হিসাবে যদি সমতা না থাকে তাহলে মূলধনী হিসাবে হয় ঋণ দান বা ঋণ গ্রহণ কিংবা সম্পত্তি ক্রয় বা বিক্রয় থাকবে। এর থেকেই বোঝা যাবে যে, লেনদেনের হিসাবে ভারসাম্য নেই। লেনদেনের হিসাবে যে সমতা থাকে সেটা সৃষ্ট সমতা হতে পারে আবার উদ্ভুত সমতাও হতে পারে। যদি চলতি হিসাবে সমতা থাকে তাহলে মূলধনী হিসাবের পরিবর্তন এনে সমতা সৃষ্টি করতে হবে না। কিন্তু চলতি হিসাবে সমতা না থাকলেই মূলধনী হিসাবে দেনা-পাওনার পরিবর্তন দেখা দেবে এবং এইভাবে সৃষ্ট সমতা ঘটানো হবে। যদি দেখা যায় যে, লেনদেনের হিসাবে চলতিখাতে অসমতা আছে এবং তার ফলে মূলধনী হিসাবের দেনা-পাওনায় পরিবর্তন হয়েছে বুঝতে হবে লেনদেনের হিসাবে ভারসাম্য নেই। ধরা যাক, কোন দেশের বাণিজ্যের হিসাবে ঘাটতি আছে। অর্থাৎ আমদানির মূল্য রপ্তানির মূল্যের চেয়ে কম হয়েছে। তাহলে সেই দেশটি অন্য দেশকে সোনা দিতে পারে। সোনা হল একটি বস্তুগত সম্পত্তি (Physical asset). এর বিক্রয় থেকে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাবে। অতএব সম্পত্তি বিক্রয় থাকবে দেশের পাওনার দিকে। এতেই যদি ঘাটতি মিটে যায়, তাহলে ভালই। না মিটলে সেই দেশটি অন্য দেশটির কাছে ঋণ নেবে। ঋণ নিলে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যায়। কাজেই এটাও দেশের পাওনার দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে। এইভাবে দেশের মোট পাওনা মোট দেনার সঙ্গে সমান হবে। দেশের বাণিজ্যের হিসাবে উদ্বৃত্ত থাকলে চলতি হিসাবে পাওনা দেনার চেয়ে বেশি হবে। কিন্তু এর ফলে বিদেশ থেকে সোনা পাওয়া যাবে কিংবা বিদেশকে ঋণ দিতে হবে। সোনা নামক সম্পত্তির ক্রয় দেশের লেনদেনের হিসাবে দেনার দিকে (Debit side) থাকবে। যে ঋণ দেওয়া হবে সেটাও দেনার দিকে থাকবে। এইভাবে চলতি হিসাবে পাওনার উদ্বৃত্তের জন্য মূলধনী হিসাবে দেনা বাড়বে, এবং এইভাবে মোট দেনা ও মোট পাওনা সমান হবে।

১৩.৯ লেনদেনের হিসাবে ঘাটতি (Deficit in the Balance of Payments)

(ক) কীভাবে ঘাটতি হয় ?

কোন দেশের মোট আমদানির মূল্য যখন সেই দেশের রপ্তানির মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়, তখন সেই দেশের বাণিজ্যের হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয়। একে আমদানি উদ্বৃত্ত (Import surplus) বলা হয়। আবার সেবার হিসাবে কিংবা মূলধনীখাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মূলধন চলাচলের ফলেও লেনদেন হিসাবে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। যেমন, কোন দেশ যদি বিদেশে বেশি পরিমাণে মূলধন বিনিয়োগ করে কিংবা ঋণ দেয় তাহলে সেই দেশের লেনদেনের হিসাবে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। আবার কোন দেশ যদি বিদেশ থেকে কিংবা কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে বেশি ঋণ পায় তাহলে তার লেনদেনের হিসাবে উদ্বৃত্ত দেখা দিতে পারে। ঋণপ্রাপ্তি কিংবা ঋণদান হল স্বয়ংক্রিয় মূলধন চলাচল। অনুরূপভাবে মূলধনের বিনিয়োগ থেকেও ঘাটতি ঘটতে পারে। তবে ঘাটতি বলতে আমরা সাধারণত রপ্তানির তুলনায় আমদানির মূল্যাধিক্যকেই বোঝাতে পারি।

(খ) কীভাবে ঘাটতি দূর করা যায় ?

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিতে বলা হত কোন দেশে যদি স্বর্ণমান বজায় থাকে তাহলে সে দেশের লেনদেনের ঘাটতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে দূর হবে। তার জন্য বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে না। কারণ লেনদেনের হিসাবে ঘাটতি দেখা দিলে সোনা দিয়ে অন্য দেশের পাওনা মেটাতে হবে। এর ফলে যে দেশে ঘাটতি ঘটে, তার সোনার পরিমাণ কমবে। যেহেতু সোনার পরিমাণ সমানুপাতিক, কাজেই সোনার পরিমাণ হ্রাস পেলে ঘাটতি দেশে অর্থের যোগান কমবে। ফলে দাম কমবে। ফলে সেই দেশের রপ্তানি বাড়বে এবং ঘাটতি আপনা আপনি দূর হয়ে যাবে।

বর্তমানে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘাটতি দূর হবে সে বিশ্বাসও করা হয় না। এখন মনে করা হয়, ঘাটতি দূর করার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এই ব্যবস্থাগুলি হল (১) রপ্তানি প্রসার এবং আমদানি হ্রাস করার ব্যবস্থা, (২) মুদ্রা সংকোচন (deflation) ঘটানো, (৩) দেশীয় মুদ্রার মান কমানো বা অবমূল্যায়ন (Devaluation) ঘটানো এবং (৪) বৈদেশিক মুদ্রা-নিয়ন্ত্রণ (Exchange control) আরোপ করা।

(১) **রপ্তানি প্রসারের জন্য** রপ্তানি দ্রব্যের দাম কমানো যেতে পারে এবং নতুন নতুন দিকে রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো যেতে পারে। রপ্তানির দাম কমানোর জন্য সরকার রপ্তানি দ্রব্যের উপর শুল্ক হ্রাস বা ছাড় করতে পারেন, রপ্তানি শিল্পে ভরতুকি দিতে পারেন। তাছাড়া উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য বিভিন্ন কারিগরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতেও পারে। অনুরূপভাবে **আমদানি হ্রাস করার জন্য** দেশে আমদানির বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন, আমদানির উপর শুল্ক আরোপ এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। কিন্তু আমদানি হ্রাসের ব্যবস্থার

প্রধান অসুবিধা হল যে, অন্য দেশও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তখন আমদানির উপর প্রতিশোধমূলক শুল্ক যুদ্ধ শুরু হতে পারে।

(২) ঘাটতি দূর করার জন্য দেশে **মুদ্রা সংকোচন** ঘটানো যেতে পারে। এর ফলে দামস্তর নিম্নগামী হয়। রপ্তানির দাম হ্রাস পায় এবং রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু মুদ্রা সংকোচন অর্থনৈতিক কুফল সৃষ্টি করতে পারে। মুদ্রা সংকোচনের এই কুফল থাকায় ঘাটতি দূর করার জন্য বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

(৩) এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটানো। অবমূল্যায়ন ঘটালে বিদেশী মুদ্রার হিসাবে দেশীয় মুদ্রার দাম কমে, ফলে আমদানি দ্রব্যসমূহের দাম বিদেশী মুদ্রায় বেড়ে যায় এবং রপ্তানি দ্রব্যসমূহের দাম কমে যায়। আশা করা যায় যে, এর ফলে আমদানি কমবে এবং রপ্তানি বাড়বে, ফলে ঘাটতি কমবে বা দূর হবে।

(৪) **বৈদেশিক মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ** দ্বারাও লেনদেনের ঘাটতিজনিত সমস্যার সমাধান করা যায়। যখন কোন দেশের লেনদেনের হিসাবে ঘাটতি দেখা দেয় তখন দেশকে বিদেশ থেকে কিংবা কোন আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে ঘাটতি পূরণ করতে হয় কিংবা দেশে যে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় তহবিল থাকে সেই সঞ্চয় কমিয়ে ঘাটতির অর্থ দিতে হয়। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রা নানা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশ সহসা বৈদেশিক মুদ্রার ভান্ডার কমাতে চাইবে না। সেক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করাই হল অন্যতম পথ। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। দেশের রপ্তানিকারকদের কাছ থেকে সব বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে বরাদ্দ (Ration) ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার সেই বৈদেশিক মুদ্রাকে আমদানিকারকদের মধ্যে বণ্টন করতে পারেন।

১৫.১০ অবমূল্যায়ন (Devaluation)

(ক) **সংজ্ঞা :** কোন দেশ যখন অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করে তখন পরোক্ষভাবে সেই দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় ঘটে। যেমন, ভারতের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘটলে ভারতের টাকার সঙ্গে মার্কিন ডলারের বিনিময় হয় এবং এই বিনিময়ের মাধ্যমে ডলারের হিসাবে টাকার কিংবা টাকার হিসাবে ডলারের বিনিময় হার নির্ধারিত হয়। এখন কোন কারণে যদি ডলারের দাম টাকার হিসাবে বেড়ে যায় তাহলে টাকার দাম ডলারের হিসাবে কমে যাবে। একে বলা হয় মুদ্রামূল্য হ্রাস (Depreciation)। অনেক ক্ষেত্রে এই মুদ্রামূল্য হ্রাসকে অবমূল্যায়ন (Devaluation) বলা হয়ে থাকে। কিন্তু মুদ্রামূল্য হ্রাস (Depreciation) এবং অবমূল্যায়ন (Devaluation) সমার্থক নয়। এই ধারণা দুটির মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। অবমূল্যায়ন বলতে বোঝায় সোনার মূল্যের হিসাবে কোন দেশের

মুদ্রার মান হ্রাস করা। কিন্তু দুটি দেশে সরকার স্বীকৃত সোনার দাম যদি স্থির থাকে তাহলে মুদ্রামূল্য হ্রাস ও অবমূল্যায়ন দ্বারা একই ব্যাপার বোঝাবে। **অতএব সোনার দাম যদি স্থির থাকে তাহলে বিদেশের মুদ্রার হিসাবে কোন দেশের মুদ্রার মূল্যের হ্রাস ঘটানোকে অবমূল্যায়ন বলা হয়।** ধরা যাক, আগে ১০ টাকা দিয়ে ১টি ডলার পাওয়া যেত, এখন ১৩ টাকা দিয়ে ১টি ডলার পাওয়া যায়। এই উদাহরণে ভারতের টাকার ৩০% অবমূল্যায়ন ঘটল।

অবমূল্যায়নের প্রভাব: (১) অবমূল্যায়নের ফলে ১ একক বিদেশী মুদ্রা পাওয়ার জন্য পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে দেশীয় মুদ্রা দিতে হয়।

(২) এর ফলে বিদেশী দ্রব্যের দাম বিদেশী মুদ্রায় স্থির থাকলেও আমদানি-কারক দেশের মুদ্রায় সেই আমদানির জন্য বেশি পরিমাণে দেশীয় মুদ্রা দিতে হবে। উদাহরণের সাহায্যে এই ব্যাপারটি বোঝানো যায়। ধরা যাক, আমেরিকা থেকে ভারতে ১টি যন্ত্র আমদানি করা হল। দাম ৫০ ডলার। ধরা যাক, ১০ টাকা =১ ডলার। তাহলে সেই যন্ত্রটির জন্য আমদানিকারককে দিতে হবে ৫০০ টাকা। এবার ধরা যাক, ভারতের টাকার অবমূল্যায়ন করা হল, যার ফলে ১২ টাকা =১ ডলার হল। এখন ঐ যন্ত্রের দাম ডলারের হিসাবে যদি ৫০ ডলারই থাকে তাহলে টাকার হিসাবে ঐ যন্ত্রের দাম হবে ৬০০ টাকা। **অতএব অবমূল্যায়নের ফলে দেশীয় মুদ্রায় আমদানির দাম বেড়ে যায়।**

(৩) আমদানির দাম বাড়লে চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী আমদানির চাহিদা হ্রাস পাবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। অবশ্য দাম কতটা বাড়লে চাহিদা কী পরিমাণে কমবে তা আমদানির চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করে। এই স্থিতিস্থাপকতা বেশি হলে আমদানি বেশি কমবে এবং এই স্থিতিস্থাপকতা কম হলে আমদানি বেশি কমবে না, অল্প পরিমাণে কমবে।

যাহোক আমরা বলতে পারি, **অবমূল্যায়নের ফলে আমদানির চাহিদা কমবে।**

(৪) অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশী মুদ্রায় রপ্তানি দ্রব্যের দাম কমে। ধরা যাক, ভারত থেকে আমেরিকায় ৬০০ টাকা দামের কোন দ্রব্য রপ্তানি করা হল। আগে ১০ টাকা =১ ডলার থাকায় সেই দ্রব্যের জন্য আমেরিকা থেকে ৬০ ডলার পাওয়া যেত। এখন অবমূল্যায়নের পর যদি ১২ টাকা =১ ডলার হয়, তাহলে সেই ৬০০ টাকা দামের দ্রব্যের দাম ডলার হিসাবে হবে ৫০ ডলার। অতএব **অবমূল্যায়নের দ্বারা রপ্তানি দ্রব্যের দাম বিদেশী মুদ্রায় কমবে।** বিদেশীদের কম অর্থ দিতে হবে।

(৫) রপ্তানি দ্রব্যের দাম কমলে আশা করা যায় যে, রপ্তানির চাহিদা বাড়বে। অবশ্য এই বিষয়টিও নির্ভর করে রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার উপর। এই স্থিতিস্থাপকতা যত বেশি হবে রপ্তানি তত বেশি বাড়বে এবং এই স্থিতিস্থাপকতা যত কম হবে ততই চাহিদা অল্প

পরিমাণে বাড়বে। যাহোক আমরা বলতে পারি, **অবমূল্যায়নের দ্বারা কোন দেশ তার রপ্তানিদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি ঘটাতে পারে।**

(৬) তাহলে আশা করা যায় যে, অবমূল্যায়নের ফলে (ক) আমদানির চাহিদা কমবে এবং (খ) রপ্তানির চাহিদা বাড়বে। অর্থাৎ (গ) অবমূল্যায়নের সাহায্যে বাণিজ্যের ঘাটতি দূর করা যাবে।

(গ) অবমূল্যায়নের কার্যকারিতার উপর মন্তব্য :

(১) অবমূল্যায়নের সাহায্যে আমদানির দাম বাড়বে, এবং রপ্তানির দাম কমবে—এতদূর স্বচ্ছন্দে বলা যায়। কিন্তু অবমূল্যায়নের সাহায্যে ঘাটতি দূর করা যাবে বা কমানো যাবে সে কথা বলতে হলে অতিরিক্ত শর্তের প্রয়োজন হবে। আমরা একটি উদাহরণ নিতে পারি। ধরা যাক, ভারতের আমদানির পরিমাণ ১০ একক, দাম ১০ টাকা ; রপ্তানির পরিমাণ ৮ একক, দাম ১০ টাকা। তাহলে আমদানির মূল্য হবে ১০ × ১০ = ১০০ টাকা এবং রপ্তানির মূল্য হবে ৮ × ১০ টাকা = ৮০ টাকা। ধরা যাক, অবমূল্যায়নের পর আমদানির দাম হল ১৫ টাকা এবং রপ্তানির দাম ১০ টাকাতে স্থির থাকল। ধরা যাক এখন আমদানি কমে হল ৯ একক, রপ্তানি বেড়ে হল ১০ একক, তাহলে এখন আমদানির মূল্য হবে ১৩৫ টাকা এবং রপ্তানির মূল্য হবে ১০০ টাকা। অবমূল্যায়নের ফলে আমদানি কমল এবং রপ্তানি বাড়ল। কিন্তু আগে যেখানে ঘাটতি ছিল ২০ টাকা, এখন সেখানে ঘাটতি হল ৩৫ টাকা। অতএব **অবমূল্যায়নের ফলে ঘাটতি কমবে, সকল ক্ষেত্রে এই কথা সত্য হবে এমন বলা যায় না।**

(২) কোন্ শর্তে অবমূল্যায়ন ঘাটতি দূর করতে পারে সে সম্বন্ধে প্রথমে অধ্যাপক মার্শাল একটি শর্ত দেন। পরে অধ্যাপক লারনার এই শর্তটিকে সম্প্রসারিত করেন। এই শর্তটিকে মার্শাল-লারনার (Marshall-Lerner condition) বলা হয়। এই শর্তে বলা হয় যে, আমদানি ও রপ্তানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এক অপেক্ষা অধিক হলে অবমূল্যায়ন ঘাটতি দূর করতে পারবে।

(৩) অবমূল্যায়ন বাণিজ্যের হিসাবে ঘাটতি (Deficit in the Trade Balance) দূর করতে বা কমাতে পারে, কিন্তু লেনদেন হিসাবে ঘাটতি (Deficit in the Balance of Payments) দূর করতে পারবে কিনা বলা যায় না। অদৃশ্যখাতে দেনা বেশি হলে ঘাটতি হতে পারে। দুটি দেশের মধ্যে সুদের হারের তারতম্য থাকলে অর্থের লেনদেন ঘটবে। তার ফলে লেনদেনে অদৃশ্য দেনা বেড়ে যেতে পারে। অবমূল্যায়ন সুদের হারের পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করে না।

(৪) অবমূল্যায়ন হল ঘাটতি দূর করার একটি কৃত্রিম পন্থা। কাজেই খুব ভেবেচিন্তে এর ব্যবহার করা উচিত। অন্য উপায় না থাকলে শেষ অবস্থায় অবমূল্যায়ন করা যেতে পারে।

(৫) অধ্যাপক মার্শাল ও লারনার যে শর্তের কথা বলেছেন, সেই শর্তগুলি কেমন সে সম্বন্ধে সমীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সমীক্ষায় কোন স্থির সিদ্ধান্ত

পাওয়া যায় নি। একদল স্থিতিস্থাপকতায় খুব আশাবাদী (Elasticity optimists), অন্যরা স্থিতিস্থাপকতায় নিরাশাবাদী (Elasticity pessimists) হয়ে পড়েছেন। যেখানে অর্থনীতিবিদরাই মত ঠিক করতে পারেননি সেখানে অবমূল্যায়নের কার্যকারিতায় সন্দেহ প্রকাশ করা যায়।

(৬) অবমূল্যায়নের ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে। সেই সময় শক্ত হাতে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং বাজেট নীতিতেও কড়াকড়ি করতে হয়। কাজেই অবমূল্যায়ন এককভাবে ভালো কাজ করে না; অন্য নীতির সঙ্গে মিশ্রিতভাবে এর প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৭) স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে অবমূল্যায়ন মারাত্মক হতে পারে। কারণ স্বল্পোন্নত দেশের আমদানির প্রয়োজন বেশি, দাম বাড়লেও তাকে আমদানি বাড়িয়ে যেতে হয়। কাজেই অবমূল্যায়নের ফলে স্বল্পোন্নত দেশের আমদানির মূল্য খুব বেশি বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া স্বল্পোন্নত দেশসমূহের রপ্তানি দ্রব্যসমূহ হল সাবেক বা চিরাচরিত দ্রব্য (Traditional Goods). উন্নত দেশে যেখানে এই দ্রব্যগুলি রপ্তানি করা হয় সেখানে এদের চাহিদা খুব বেশি নয়। সেই চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতাও কম। তাছাড়া আছে বিকল্প দ্রব্য ও দেশের প্রতিযোগিতার সমস্যা। এই সব কারণে স্বল্পোন্নত দেশের রপ্তানির চাহিদাকে দাম কমিয়ে বাড়িয়ে তোলা যায় না। এই অবস্থায় অবমূল্যায়ন স্বল্পোন্নত দেশের ঘাটতি কমানো তো দূরের কথা, ঘাটতি বাড়িয়ে দেয় বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। এই আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক নয়।

১৫.১১ বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ (Exchange Control):

(ক) সংজ্ঞা ও পদ্ধতি: কোন দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার যদি ঘন ঘন পরিবর্তিত হতে থাকে, কিংবা সেই দেশের লেনদেনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যহীনতা বা ঘাটতি থাকে যার ফলে সেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারের অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটে তখন **সরকার বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহারের উপর যে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন তাকে বলা হয় বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ।** বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ হল, কোন দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের উপর সেই দেশের সরকারের দ্বারা আরোপিত একটি প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ (Direct control) ব্যবস্থা।

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ একাধিকভাবে আরোপিত হতে পারে। সাধারণত এই পদ্ধতিতে সরকার দেশের সকল রপ্তানিকারকদের প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট জমা দেবার নির্দেশ দিতে পারেন এবং আমদানিকারকদের মধ্যে প্রয়োজনমত বৈদেশিক মুদ্রার বণ্টন করতে পারেন। যে সব দ্রব্যের আমদানি সরকারের বিচারে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হবে তাদের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার বণ্টন নিয়ন্ত্রিত হতে পারে এবং দেশীয় মুদ্রার সঙ্গে বিদেশী মুদ্রার বিনিময় হারও উচ্চহারে ধার্য করা হতে পারে। আবার প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানির ক্ষেত্রে সরকার বৈদেশিক মুদ্রার বণ্টনের সময় কিছু কিছু সুবিধা দিতে পারেন।

(খ) বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য : যে সব উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) দেশের আমদানি ও রপ্তানির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা,

(২) রপ্তানি ও আমদানির মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানো,

(৩) দেশের বাণিজ্যের হিসাবের সঙ্গে লেনদেনের হিসাবের সঙ্গতি নির্ণয় করা,

(৪) লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান ঘাটতি ঘটলে সেই ঘাটতি সমস্যার মোকাবিলা করা,

(৫) দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন রোধ করা,

(৬) বিনিময় হারের মধ্যে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা,

(৭) দেশের আভ্যন্তর ভারসাম্য ও বাহ্যিক ভারসাম্যের শর্ত পালনের ব্যবস্থা করা,

(৮) দেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হ্রাস পেলে সেই হ্রাস রোধ করা,

(৯) দেশের স্বর্ণভাণ্ডার ও বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডার অবাঞ্ছিত আমদানির জন্য যাতে খরচ না হয় তার ব্যবস্থা করা, এবং

(১০) দেশে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করে, পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রেখে আয়, উৎপাদন, ভোগ ও বিনিয়োগের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করা।

পরিশিষ্ট

ক্রয় ক্ষমতার সমতা-তত্ত্ব (Purchasing Power Parity Theory) ঃ

বর্তমানকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানাপ্রকার কাগজীমুদ্রা প্রচলিত আছে। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় (Gold Standard System) কাগজীমুদ্রাগুলির মান সোনার হিসেবে সুনির্দিষ্ট ছিল। কাগজীমুদ্রার পরিবর্তে সেই নির্দিষ্ট হারে সোনা পাওয়া যেত। কাগজীমুদ্রাকে সোনায় রূপান্তরিত করা যেত বলে সেই মুদ্রাকে বলা হত রূপান্তরযোগ্য (Convertible) মুদ্রা। স্বর্ণমান ব্যবস্থায় দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার স্বর্ণ-সমতা (Gold par) দ্বারা নির্ধারিত হত। অর্থাৎ দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার এমনভাবে নির্ধারিত হত যাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশুদ্ধ সোনা (পরিবহণ ব্যয়সহ) উভয় দেশে পাওয়া যেত। পরবর্তীকালে স্বর্ণমান (Gold standard) পরিত্যক্ত হয়। কাগজীমুদ্রাগুলিও অরূপান্তরযোগ্য (Inconvertible) হয়ে যায়। এখন কোন দেশের কাগজীমুদ্রার বিনিময়ে কতখানি বিশুদ্ধ সোনা পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট হার নেই। এরূপ অবস্থায় দুটি দেশের অরূপান্তরযোগ্য মুদ্রার মধ্যে কী হারে বিনিময় ঘটবে—তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। সুইডেনের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ গুস্তাভ ক্যাসেল তাঁর ক্রয় ক্ষমতার সমতা-তত্ত্বে এর একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেন।

ক্যাসেলের মতে, **দুটি দেশের অরূপান্তরযোগ্য কাগজীমুদ্রার দীর্ঘকালীন বিনিময় হার উক্ত মুদ্রা দুটির আভ্যন্তর ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয় ; বিনিময় হার এমন হয় যাতে উভয় দেশের মুদ্রা দিয়ে সমান পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়।** একটি উদাহরণের সাহায্যে ক্যাসেলের বক্তব্য বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, আমরা ভারতের টাকা ও ইংলণ্ডের পাউণ্ড স্টার্লিং নামক মুদ্রা দুটির বিনিময় হার কীভাবে নির্ধারিত হবে তা জানতে চাই। এর জন্য আমরা যে-কোন একটি দ্রব্য নিয়ে ক্রয় ক্ষমতার সমতা-তত্ত্বটি বোঝাতে পারি। ধরা যাক, দ্রব্যটি হল কাপড়। ধরা যাক, একই কাপড় ভারতে ও ইংলণ্ডে পাওয়া যায় এবং কাপড়ের কোন পরিবহণ ব্যয় নেই। ধরা যাক, সেই কাপড়ের একটির দাম ভারতে ১৫ টাকা, কিন্তু ইংলণ্ডে ১ পাউণ্ড। কাপড় নামক একটি দ্রব্যের এক একক পেতে হলে ভারতে লাগে ১৫ টাকা এবং ইংলণ্ডে লাগে ১ পাউণ্ড। অর্থাৎ ১৫ টাকার ক্রয় ক্ষমতা ও ১ পাউণ্ডের ক্রয় ক্ষমতা পরস্পর সমান। অতএব ক্যাসেলের মতে ভারতের টাকা ও ইংলণ্ডের পাউণ্ডের মধ্যে দীর্ঘকালীন বিনিময় হার হবে ১ পাউণ্ড = ১৫ টাকা। আমরা যদি পরিবহণ ব্যয় ধরি তাহলে এই হারের সামান্য পরিবর্তন হবে কিন্তু এর মূল অংশের কোন পরিবর্তন হবে না।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ক্যাসেল যে বিনিময়-হারের কথা বলেছিলেন তা হল দীর্ঘকালীন বিনিময়-হার। স্বল্পকালীন বিনিময়-হার এই দীর্ঘকালীন হারের কাছাকাছি থাকে। স্বল্পকালীন বিনিময়-হার দুটি দেশের মধ্যে আমদানি ও রপ্তানির চাহিদা ও যোগান, দুটি দেশের মুদ্রার চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত

হয়। এর ফলে কোন একটি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার বাড়তে-কমতে পারে। তার ফলে আমদানি ও রপ্তানির পরিবর্তন হবে এবং বিনিময়-হার ক্রয় ক্ষমতার সমতা সূচক হারে এসে স্থির হবে। একটি উদাহরণ দিয়ে এই ব্যাপারটি বোঝাতে পারা যায়। ধরা যাক, ভারতে ও ইংলণ্ডে দামস্তর সমান থাকল, কিন্তু আগে যেখানে ১ পাউণ্ডের দাম ছিল ১৫ টাকা, এখন তার বদলে হল ২০ টাকা। এর ফলে ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীরা পাউণ্ডকে টাকায় রূপান্তরিত করে লাভ করতে চাইবে। আগে তারা ১ পাউণ্ড দিয়ে পেত ১৫ টাকা এবং তার সাহায্যে ১৫ টাকা দামের ভারতীয় দ্রব্য কিনতে পারত। এখন ১ পাউণ্ড দিয়ে পাবে ২০ টাকা এবং তার সাহায্যে তারা আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করতে পারবে। যা হোক আমরা বলতে পারি যে, টাকার হিসেবে পাউণ্ডের দাম বৃদ্ধি পেলে ভারতের টাকার চাহিদা ও সেই সঙ্গে ভারতের রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে টাকার দাম বাড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত ১ পাউণ্ড - ১৫ টাকা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। অবশেষে ১ পাউণ্ড = ১৫ টাকা হয়। অর্থাৎ দীর্ঘকালে দুটি মুদ্রার বিনিময়-হার তাদের ক্রয়ক্ষমতার সমতায় ফিরে আসে।

এই তত্ত্বের সাহায্যে আর একটি ব্যাপার ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু কোন দেশের মুদ্রার মান সেই দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে, **যখন একটি দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং সেই দেশে জিনিসপত্রের দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তখন দেশের মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং তার ফলে বিদেশের মুদ্রার হিসেবে সেই মুদ্রার দামও হ্রাস পায়।**

যেমন ধরা যাক, আগে ভারতের ১৫ টাকার বিনিময়ে ১ পাউণ্ড পাওয়া যেত। অর্থাৎ ১ পাউণ্ডের ক্রয়ক্ষমতা ১৫ টাকার ক্রয়ক্ষমতার সমান। এখন ধরা যাক, ভারতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল। আগে ১৫ টাকায় যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যেত এখন সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ২০ টাকার প্রয়োজন হয়। ধরা যাক ইংলণ্ডে দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর স্থির আছে। তাহলে ১ পাউণ্ড =২০ টাকা হবে। অর্থাৎ পাউণ্ডের হিসাবে ভারতের টাকার দাম কমবে। আবার ভারত ও ইংলণ্ড উভয় দেশেই যদি সমান হারে দামস্তর বৃদ্ধি পায় তাহলে পাউণ্ড ও টাকার বিনিময় হার অপরিবর্তিত থাকবে।

সমালোচনা: ক্রয় ক্ষমতার সমতা-তত্ত্বের গুণ হল এই যে, এই তত্ত্বেই প্রথম মুদ্রার বিনিময়-হারকে ক্রয় ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কোন দেশের ভিতরে সেই দেশের অর্থের ক্রয় ক্ষমতা বা অর্থের মূল্য (Value of money) দ্রব্য-সামগ্রীর দামস্তরের উপর নির্ভর করে। কাজেই একই নীতি অনুসারে কোন দেশের অর্থের বৈদেশিক মূল্য নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এই তত্ত্ব সেই প্রয়োজন সাধন করে। দ্বিতীয়ত, দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার যদি ক্রয় ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে নির্ধারিত না হয় তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অসুবিধা দেখা দেয়। ক্রয় ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন বিনিময়-হার চালু থাকলে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ে নিযুক্ত

ব্যবসায়ীরা বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে কম দামী মুদ্রার পরিবর্তে বেশী দামী মুদ্রা সংগ্রহ করবে। এর ফলে দামী মুদ্রার অভাব দেখা দেবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নানারূপ সংকট দেখা দেবে। এসব কথা স্বীকার করেও বলা যায়, ক্যাসেল-বর্ণিত তত্ত্বটির একাধিক ত্রুটি আছে।

(১) এই তত্ত্বের সাহায্যে হয়তো দীর্ঘকালীন বিনিময়-হার ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু স্বল্পকালীন বিনিময়-হার কীভাবে নির্ধারিত হয় তার ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে পাওয়া যায় না।

(২) বিনিময়-হার অর্থের ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয় বললে সব বলা হয় না। আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান এবং তাদের স্থিতিস্থাপকতাও বিনিময়-হার নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্যাসেলের তত্ত্বে অন্যোন্যক চাহিদাকে (Reciprocal demand) অবহেলা করা হয়েছে। কীনসের মতে ক্রয় ক্ষমতার সমতা-তত্ত্বের এটা হল বড় ত্রুটি।

(৩) আমরা যদি দামস্তরের মধ্যে কোন দেশের আভ্যন্তর বাণিজ্যের পণ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত পণ্য (Internationally traded goods) সব কিছু অন্তর্ভুক্ত করি এবং দামস্তরকে বিনিময়-হার দিয়ে গুণ করি তাহলে দুটি দেশের অর্থের ক্রয় ক্ষমতা সব সময় সমান হয়। এই অর্থে ক্যাসেলের তত্ত্ব অভেদে পরিণত হয়; এর কোন তাত্ত্বিক মূল্য থাকে না। বোধ হয় সেজন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যসমূহকে এই তত্ত্বে তত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

(৪) ক্যাসেলের তত্ত্বে এক দেশ অন্য দেশ থেকে মূলধন চলাচলের (Capital movements) কোন উল্লেখ নেই। এই মূলধন চলাচলও বিনিময়-হারকে প্রভাবিত করে।

(৫) বিনিময়-হার নির্ধারণে বাণিজ্যের হারও (Terms of trade) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্যাসেলের তত্ত্বে বাণিজ্যের হার সম্বন্ধেও কোন উল্লেখ নেই।

(৬) ক্যাসেলের তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, দামস্তর দ্বারা বিনিময়-হার নির্ধারিত হয়, কিন্তু বিনিময়-হার দামস্তরকে প্রভাবিত করতে পারে না। এই অনুধারণাও ঠিক নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে একদেশ থেকে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অন্য দেশে ছড়িয়ে যায়। এ ব্যাপারে বিনিময়-হারও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

(৭) দুটি দেশের দামস্তরের মধ্যে তুলনা করা হয় অর্থের মূল্যের ভিত্তিতে। অর্থের মূল্য প্রকাশিত হয় দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন ও ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে। কিন্তু দুটি দেশে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে। কাজেই আমরা বলতে পারি না যে, অর্থের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে দেশগতভাবে তুলনা করা যায়।

(৮) ক্যাসেল স্বীকার করেছিলেন যে, বিনিময়-হার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিশেষত কোন দেশ যদি তার আমদানির উপর শুল্ক আরোপ করে সেক্ষেত্রে আমদানির চাহিদা কমবে। ফলে বিদেশী মুদ্রার চাহিদাও কমবে এবং বিদেশী মুদ্রার দাম কমবে। ক্রয় ক্ষমতার সমতা-

তত্ত্বকে বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত করার প্রয়োজন। অসম্প্রসারিত ও অপরিমার্জিত তত্ত্বটি কখনই বিনিময়-হারের পরিবর্তনের সার্থক ব্যাখ্যা করতে পারে না।

(৯) বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে যদি ফাটকা কারবার চলে তাহলে বিনিময়-হার প্রভাবিত হয়। অন্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও ফাটকা কারবার যেমন চাহিদা ও যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটায়, বৈদেশিক মুদ্রার বাজারেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটে এবং এসবের প্রভাব এসে পড়ে বিনিময়-হারের উপর।

(১০) কারিগরিক উন্নয়ন, রপ্তানি প্রসার প্রকল্প অনুসরণ, শিল্প সংরক্ষণ, মূলধন চলাচল ইত্যাদি বিষয়গুলিও বিনিময়-হারকে প্রভাবিত করে কিন্তু এদের পরিবর্তনের সঙ্গে দামস্তরের পরিবর্তনের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকে না। অতএব বিনিময়-হার কেবলমাত্র অর্থের ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয় বললে সব বলা হয় না।

প্রশ্নাবলী

১। দুটি দেশের মধ্যে কেন বাণিজ্য হয়?

২। পূর্ণব্যয় পার্থক্যের সুবিধা ও তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা বলতে কী বোঝায়? ওদের সাহায্যে কীভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে ব্যাখ্যা করা যায়?

৩। তুমি কি মনে কর যে, দুটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে দুটি দেশেরই লাভ হয়? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

৪। বাণিজ্যের লাভ বলতে কী বোঝায়? এই লাভ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৫। আয়ের বণ্টন-স্রোতের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

৬। অবাধ বাণিজ্য ও সবাধ বাণিজ্যের মধ্যে তুমি কোন্‌টি সমর্থন কর? যুক্তি সহ আলোচনা কর।

৭। সংরক্ষণ কাকে বলে? সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি দাও।

৮। শিশু শিল্প সংরক্ষণ বলতে কী বোঝ? কীভাবে এটি করা যায়?

৯। দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময়-হার কীভাবে নির্ধারিত হয়?

১০। ক্রয় ক্ষমতার সমতা-তত্ত্বটির পর্যালোচনা কর।

১১। আমদানি শুল্কের বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা কর।

১২। কোন দেশের লেনদেনের ক্ষেত্রে কখন ঘাটতি দেখা দেয়? কীভাবে এই ঘাটতি দূর করা যেতে পারে?

১৩। অবমূল্যায়ন বলতে কী বোঝায়? অবমূল্যায়নের দ্বারা কি লেনদেন ঘাটতি দূর করা যায়? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

১৪। অবমূল্যায়ন ও মুদ্রামূল্য হ্রাসের মধ্যে পার্থক্য কর। ঘাটতি দূর করার ক্ষেত্রে অবমূল্যায়নের কার্যকারিতা বিচার কর।

১৫। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ কাকে বলে? কীভাবে এই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়? এর উদ্দেশ্য কী?

১৬। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন: (ক) টীকা লিখ: (১) তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের সুবিধা (২) বাণিজ্যের হিসাব ও লেনদেনের হিসাব (৩) শিশু শিল্প সংরক্ষণ (৪) ক্রয় ক্ষমতার সমতা-তত্ত্ব।

(খ) লেনদেনের হিসাবের দুটি দিক সব সময় সমান থাকে—আলোচনা কর।

(গ) বাণিজ্যের হিসাবে কখন ঘাটতি দেখা দেয়? এই ঘাটতি কীভাবে পূরণ হয়?

ষোড়শ অধ্যায়

বিভিন্ন প্রকার অর্থব্যবস্থা
(Different Types of Economic Systems)

ভূমিকা ঃ কোন দেশের প্রধান অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য হল দেশবাসীদের ভোগের জন্য বিভিন্ন রকম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করা এবং ভোগের জন্য দেশবাসীদের মধ্যে বণ্টন করা। দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করার জন্য কতগুলি উৎপাদনের উপাদান (Means of production) থাকে। এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান হল দেশের জমি বা উৎপাদনে ব্যবহৃত অপ্রচুর যোগানসম্পন্ন নানারূপে প্রাকৃতিক সম্পদ, মানুষের দ্বারা নির্মিত নানারকম মূলধন সম্পদ, দেশবাসীদের শ্রমসম্পদ। এই সম্পদগুলিকে উৎপাদন কার্যে সংগঠিত করা হয়। এটা হল উৎপাদনের সংগঠনের দিক। সংগঠনের মধ্যে থাকে উৎপাদনের মালিকানা, ব্যবহার ও ফলভোগ সম্পর্কিত নানারূপে নিয়ম-কানুন। উৎপাদনের উপাদানগুলির উপর মালিকানা ব্যক্তিগত বা বেসরকারী হতে পারে, আবার সামাজিক হতে পারে। ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে দেশের জমি ও মূলধন সম্পদগুলি থাকে পরিবারগুলির অধীনে। পরিবারগুলি দেশের আইন বা সংবিধান দ্বারা এই সম্পত্তির অধিকার বজায় রাখতে পারে। তারাই সেই উপাদানগুলি ব্যবহার করে এবং এইভাবে যে দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হয় তারাই সেগুলির মালিক। উৎপাদনের জন্য যে সব উপাদান ব্যবহৃত হয়, তারাই উৎপাদনকে বণ্টনের মাধ্যমে ভাগ করে নেয় এবং এইভাবে তারাই ভোগ করে। আবার, উৎপাদনের উপাদানের মালিকানা সমস্ত সমাজের উপর ন্যস্ত থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সমস্ত সমাজ কিংবা তার প্রতিনিধি হিসাবে সরকার সেই উপাদানগুলির ব্যবহার করতে পারে। উৎপাদন পরিচালনা করতে পারে এবং উৎপন্ন দ্রব্য দেশবাসীদের মধ্যে নির্দিষ্ট নিয়মে বণ্টন করতে পারে। এই উপাদানের মালিকানার ব্যবহার ও পরিচালনার পদ্ধতির পার্থক্যের ভিত্তিতে, বিভিন্ন প্রকার বণ্টনের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার দেশ বা অর্থব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এখানে তিন ধরনের অর্থব্যবস্থার কথা বলতে পারি, যথা—(ক) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা, (খ) সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা এবং (গ) মিশ্র অর্থব্যবস্থা।

১৬.১ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ ঃ

(ক) সংজ্ঞা ঃ যে অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদান বিশেষত জমি ও মূলধনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনা থাকে এবং যেখানে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে অবদানের ভিত্তিতে দ্রব্যের বণ্টন করা হয় এবং যেখানে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে কোন সরকারী হস্তক্ষেপ থাকে না তাকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বলা হয়। এটা হল নিখুঁত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে সরকার অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর কোনরকম হস্তক্ষেপ করেন না। বাস্তবে এরকম অর্থব্যবস্থা দেখা যায় না যেখানে সরকার সম্পূর্ণভাবে নির্লিপ্ত থাকেন।

(খ) **বৈশিষ্ট্য :** (১) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদন উপাদানের উপর ব্যক্তিগত বা বেসরকারী মালিকানা। এখানে দেশের পরিবারগুলির কেউ জমির মালিক, কারো বা প্রচুর মূলধন, কারো বা শ্রম ছাড়া আর কিছু নেই। আবার কারো বা একাধিক উপাদান আছে। এই পরিবারগুলি নিজেরাই এই সব উপাদানের ব্যবহার করে কিংবা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে সেইসব উপাদানের সেবা বিক্রয় করে।

(২) ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বেসরকারী পর্যায়ে প্রায় সমস্ত রকম দ্রব্যের উৎপাদন হয়ে থাকে। উৎপাদনের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলি সিদ্ধান্ত নেয়।

(৩ উৎপাদন পরিচালিত হয় সর্বাধিক মুনাফার উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্যই সম্পদের বণ্টনকে নির্ধারিত করে। দ্রব্যের দামকে নির্ধারিত করে।

(৪) এখানে বাজারের চাহিদা ও যোগানের শক্তিকে অবাধে কাজ করতে দেওয়া হয়। সমস্ত প্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও উপাদানের দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে। যার চাহিদা বেশি, যোগান কম সে বেশি দাম পায়, যার কম সে কম পায়।

(৫) এখানে বণ্টন নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বা অবদানের ভিত্তিতে। যার যোগ্যতা বেশি, যে বেশি উৎপাদন করতে পারে সে বেশি পায়। যার অক্ষমতা বেশি, অবদান কম, সে কম পায়।

(৬) এইভাবে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা দেয়। একদিকে প্রচণ্ড দারিদ্র্য, তারই পাশে প্রয়োজনের ঢের বেশী ঐশ্বর্য— দুইই থাকে।

(৭) ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় ভোগকারীদের সার্বভৌমত্ব (Consumers' Sovereignty) থাকে। ভোগকারীরা আপন আপন আয় ও ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে দ্রব্য ক্রয় করে। যার আয় বেশি সে ভালো ও বেশি দ্রব্য ভোগ করে। যার আয় কম সে নিজের ক্ষমতায় যা পারে তাই ভোগ করে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়।

(গ) **গুণাগুণ :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার গুণ হল (১) এর দক্ষতা (Efficiency), (২) স্বাধীনতা, (৩) সম্পদের কাম্য বণ্টন ও অপচয় রোধ এবং (৪) বৃদ্ধির প্রেরণা। প্রথমত, এখানে যে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে সে তার পুরস্কার পায়। কাজেই প্রত্যেকেই চায় মন দিয়ে কাজ করতে। এর ফলে উৎপাদনের ব্যাপারে আলস্য বা ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা থাকে না। যে মানুষ বেশি পরিশ্রম করে, বেশি উপার্জন করে সে বেশি দ্রব্য ভোগ করতে পায়। তাছাড়া সে যদি আয় সঞ্চয় করে তাহলেও তার সন্তান-সন্ততিদের সেই আয় দিয়ে যেতে পারে। ফলে উদ্যোগ ও কর্মস্পৃহা বেড়ে যায়। দ্বিতীয়ত, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের ব্যাপারে, ভোগের ব্যাপারে ব্যক্তির চূড়ান্ত স্বাধীনতাকে রাষ্ট্র মর্যাদা দেয়। সে পায় পরিবর্তনের স্বাধীনতা, সমালোচনার স্বাধীনতা ; এর সঙ্গে যুক্ত হয়—নানা রকম রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

তৃতীয়ত, ধনতন্ত্রে চাহিদা ও যোগানের অবাধ শক্তির দ্বারা দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। যার দ্রব্যের দাম সবচেয়ে কম তার দ্রব্যই সকলে ক্রয় করতে চায়। ফলে সব উৎপাদকই চায় সবচেয়ে কম ব্যয়ে দ্রব্য উৎপাদন করতে। বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে। সবচেয়ে কম ব্যয়ে উৎপাদন করার জন্য সম্পদসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়। চতুর্থত, ধনতন্ত্রে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি আয়তন বৃদ্ধি করতে চায়। পরিবারগুলি চায় সঞ্চয় করতে। এর ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অনেক দোষও আছে। (১) এখানে সম্পদ ও আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে নিদারুণ বৈষম্য দেখা দেয়। (২) বৈষম্যের ফলে অর্থনৈতিক সংকট যেমন অত্যুৎপাদনের সমস্যা, বেকারি ও মন্দা ইত্যাদি দেখা দেয়, (৩) এখানে প্রতিযোগিতা অসুস্থ প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়। (৪) শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সুষ্ঠু অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকে না, শ্রমিক শোষণ, ধর্মঘট, লকআউট, ছাঁটাই প্রভৃতি সমস্যা উৎপাদনকে ব্যাহত করে, অর্থাৎ ধনতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রাম তীব্র হয়, (৫) মুনাফার লোভে ব্যবসায়ীরা দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে এমন সব দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে যেগুলি দেশের নৈতিক মান নষ্ট করে।

(২) **সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা :**

(ক) **সংজ্ঞা :** সমাজতন্ত্র বলতে এমন একটি অর্থব্যবস্থা বোঝায় যেখানে উৎপাদনের উপকরণ যথা, জমি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও মূলধনের উপর সামাজিক মালিকানা ও পরিচালনা থাকে, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় সর্বাধিক জনকল্যাণের জন্য সংঘটিত হয়। কার্ল মার্ক্সের মতে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভাঙনের পর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে এবং সমাজতন্ত্র আবার সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থায় চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বস্তুত সমাজতন্ত্র হল একটি পরিবর্তনশীল পর্যায় এবং সাম্যবাদের প্রস্তুতি পর্ব। বর্তমানে পৃথিবীতে প্রায় ১৪ টি দেশকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলা যেতে পারে। এই দেশগুলি হল—আলবানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানি, হাঙ্গেরি, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, সোভিয়েট রাশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া চীন, উঃ কোরিয়া, মোঙ্গোলিয়া, উঃ ভিয়েৎনাম এবং কিউবা*।

বৈশিষ্ট্য : সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার দুটি প্রধান রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল (ক) মার্ক্সবাদ ও লেনিনবাদে পূর্ণ আস্থা এবং (খ) শ্রমিক শ্রেণীদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির হাতে রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রীভবন। এর অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য হল (১) গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন-উপাদানের উপর সামাজিক মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অধিকাংশ প্রাকৃতিক সম্পদ,

* দ্রষ্টব্য : The Economics of Socialism by J. Wilczynski

মূলধন, বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, অর্থ, আভ্যন্তর ও বৈদেশিক বাণিজ্য সামাজিক নিয়ন্ত্রণে থাকে। জাতীয় আয়ের প্রায় ৯১-৯৫ শতাংশ সামাজিক উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে আসে।

(২) **কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা :** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাকে অনিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা বলা হয়। এখানে চাহিদা ও যোগান নামক দুটি অদৃশ্য শক্তিই সব কিছু নির্ধারণ করে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা হল নিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পনা-পরিচালিত অর্থব্যবস্থা। বাজারের চাহিদা ও যোগানকে সরিয়ে কিংবা নিয়ন্ত্রিত করে এখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দ্বারা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরিকল্পনার দায়িত্ব থাকে স্টেট প্ল্যানিং কমিশন বা SPC-র উপর। কমিউনিস্ট পার্টি সামগ্রিক প্রয়োজনবোধে যে সব বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়, সেই লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করা হয়।

(৩) **সামাজিক সমতার ভিত্তিতে জাতীয় আয়ের বণ্টন :** সমাজতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থাকে না, কাজেই অনুপার্জিত আয় যেমন, খাজনা, সুদ ও মুনাফার অস্তিত্ব নেই। এখানে সকলের আয় হল উপার্জিত আয়। কাজ করে আয় পেতে হয় এবং কাজ করে কতটা আয় পাওয়া যাবে সেটা নির্ধারিত হয় কাজের গুণ ও পরিমাণের দ্বারা। সমাজ চায় প্রত্যেকেই তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে তার কাজ অনুযায়ী আয় পাবে।

(৪) **অন্যান্য বৈশিষ্ট্য :** (ক) সমাজতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ও ব্যক্তিগত মুনাফার পরিবর্তে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় মুনাফা থাকে, (খ) সমাজে সকলে সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে (গ) শ্রমিকদের শোষণ করা হয় না।

(গ) **গুণ :** (১) সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আয়ের অযৌক্তিক বৈষম্য থাকে না, (২) কেউ কোন মানুষকে শোষণ করতে পারে না (৩) কাজেই এখানে শ্রেণীসংগ্রাম ও সংঘর্ষ থাকে না, (৪) পুঁজিপতি শ্রেণীর মত সব পরজীবীদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, (৫) কর্মনিয়োগ সম্বন্ধে সকলেই আশ্বস্ত থাকে, কাজেই কাউকে বেকার হয়ে থাকার উদ্বেগের জ্বালা ভোগ করতে হয় না, (৬) সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক কাজকর্মের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে, (৭) কাজেই বাণিজ্যচক্রের উত্থান-পতনের দোলায় দেশ ও দেশবাসীদের উঠতে-পড়তে হয় না, (৮) উৎপাদনক্ষেত্রে অসুস্থ প্রতিযোগিতা থাকে না। ফলে পণ্যের যোগান, নিয়ন্ত্রণ ফাটকাবাজি, অপ্রয়োজনীয় বিজ্ঞাপনও থাকে না, (৯) এখানে অদৃশ্য শক্তির খামখেয়াল থাকে না, কম সময়ে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, এবং (১০) সমাজতান্ত্রিক দেশের সমৃদ্ধির হারও বেশি হয়।

দোষ : (১) সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন দক্ষ উৎপাদন নয় বলে অনেকে মনে করেন। ধনতন্ত্রে উৎপাদনের মালিক মুনাফা পান। কাজেই তিনি সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদন করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সকলেই সরকারী কর্মী, উৎপাদনের উপর কারো ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না। কাজেই

ভালোভাবে কাজ করার আগ্রহ তাদের থাকে না। (২) সমাজতন্ত্রে রাজনীতি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে। রাজনৈতিক নেতারাই অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ফলে রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতে সংঘর্ষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু এটা যে হবেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না। (৩) অনেকে মনে করেন, সমাজতন্ত্রে আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য বেড়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার কাজকে যতই ছড়িয়ে দেওয়া হোক না কেন, পরিকল্পনার জন্য, পরিকল্পনার ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন বহু ব্যক্তির প্রয়োজন। সাধারণ মানুষদের দিয়ে এসব কাজ করানো যায় না। কিন্তু সত্যি বলতে এ'দের কোন উৎপাদনশীল ভূমিকাই নেই, শুধু প্রাধান্য আছে। এই ব্যাপারটি সমাজতান্ত্রিক ধারণার পরিপন্থী। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্য তো ধনতন্ত্রেও থেকে যায়। এর জন্য সমাজতন্ত্রকেই বিশেষভাবে দায়ী করা যায় না। (৪) সমাজতান্ত্রিক সমাজে দুধরনের সিদ্ধান্ত কাজ করে, যেখানে কাজটা হয় সেই ইউনিটের সিদ্ধান্ত এবং উপরওয়ালাদের সিদ্ধান্ত—অনেক সময় এই দুরকমের সিদ্ধান্তে মিলের অভাব দেখা যায়। এ দোষটা সমাজতন্ত্রেই হয় এমন নয়। যে-কোন দেশেই, বিশেষত যেখানে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দেশের কাজকর্ম দেখাশোনা করে—সেখানে হতে পারে। যে-কোন বড় দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সঙ্গতি রক্ষা খুবই কঠিন কাজ। (৫) সমাজতন্ত্রে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বড়ো রকমের ভুল হলে দেশের খুবই ক্ষতি হতে পারে। (৬) এখানে যুক্তিসঙ্গত দামব্যবস্থা থাকে না। শ্রম ব্যতীত অন্য উপাদানগুলি গুরুত্ব পায় না। দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে খাজনা, সুদ ও মুনাফার ভূমিকা নেই। কাজেই এই দাম উপাদানের কাম্য বণ্টন করতে পারে না, (৭) তাছাড়া অনেক সময় সমাজতান্ত্রিক দেশে ভোগকারীদের স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়, (৮) অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য জনগণকে বর্তমান ভোগ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়।

৩। **মিশ্র অর্থব্যবস্থা :**

(ক) **সংজ্ঞা : যে অর্থব্যবস্থায় বাজারের শক্তি ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পনা সংমিশ্রিত হয়ে অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পন্ন করে তাকে মিশ্র অর্থব্যবস্থা বলা হয়।**

এখানে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মত উৎপাদন-উপাদানের উপর বেসরকারী মালিকানা থাকে, মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে উৎপাদন পরিচালিত হয় এবং উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী দ্রব্যের বণ্টন হয়, চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম নির্ধারিত হয় ইত্যাদি, কিন্তু এই সমস্ত রকম কাজের উপর সরকার নজর রাখেন, নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন প্রয়োজনবোধে সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের উৎপাদন ও বণ্টন নিজের দায়িত্বে নেন। কাজেই আমরা বলতে পারি যে মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি থাকে। ধনতন্ত্রে বল্গাবিহীন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও পূর্ণ প্রতিযোগিতা কার্যত মুষ্টিমেয় লোকের ক্ষমতা ও স্বাধীনতায় পরিণত হয়। সমাজতন্ত্রেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভোগের অধিকার খর্ব করা হয়। যার ফলে উদ্যোগ ও কর্মস্পৃহা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই অবস্থায় মিশ্র অর্থব্যবস্থা উভয়ের দোষকে এড়িয়ে ব্যক্তিগত

স্বাধীনতার ও উদ্যোগের সঙ্গে সরকারী শুভেচ্ছা মিশিয়ে একটি কাম্য অর্থব্যবস্থা সৃষ্টি করতে চায়।

(খ) বৈশিষ্ট্য : (১) মিশ্র অর্থব্যবস্থায় ভূসম্পত্তি, জমি, মূলধন প্রভৃতির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে। সরকার আইনের দ্বারা এই অধিকার রক্ষা করে, (২) আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য থাকে, তবে সরকার এই বৈষম্য দূর করার জন্য আইনের সংশোধন করতে পারে। জমি, বাড়ি ইত্যাদির ব্যাপারে ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে, (৩) এখানে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার উদ্যোগ পাশাপাশি থাকতে পারে, আবার যৌথ উদ্যোগও থাকতে পারে। যে সব দ্রব্য ও সেবার যোগান দেওয়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে সম্ভব নয়, কিংবা উচিত নয়, সেগুলির উৎপাদন হয় সরকারী উদ্যোগে। প্রতিরক্ষা, প্রশাসন এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসরকারী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান থাকে।

(৪) বেসরকারী উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারের নানারকম নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে, (৫) এখানে দ্রব্যের উৎপাদন মুনাফার ভিত্তিতে হয়, তবে সরকারী উৎপাদনের ক্ষেত্রে মুনাফার উদ্দেশ্যই প্রধান উদ্দেশ্য নাও হতে পারে, (৬) এখানে ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকে। প্রত্যেকে আপন ক্রয়ক্ষমতা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে ও ভোগ করে। তবে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যোগানে ঘাটতি দেখা দিলে সরকার ভোগের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। এর জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়। (৭) মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় উপার্জিত আয় এবং অনুপার্জিত আয় উভয় প্রকার আয়ই থাকে। উপার্জিত আয় নির্ধারিত হয় উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে। তবে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে যাতে অতিরিক্ত বৈষম্য দেখা না দেয়, তারজন্য সরকার কর ব্যবস্থার মাধ্যমে আয়ের বণ্টনে বৈষম্য দূর করার ব্যবস্থা নিতে পারে। (৮) মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় সমাজতান্ত্রিক সমাজের মত জাতীয় স্তরে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা থাকতে পারে এবং সেই পরিকল্পনা কমিশন সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে মাত্রা বেঁধে দিতে পারে। পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

(গ) গুণ : (১) মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় দক্ষতা ও স্বাধীনতা থাকে কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত অব্যবস্থার কুফলগুলি সরকারী নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দূর হয়। (২) যে সব ক্ষেত্রে খুব বেশি বিনিয়োগ করতে হয়, যেখ . . বেসরকারী বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করে না সেসব ক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ থাকে বলে বেসরকারী বিদিয়োগকারীরা উৎসাহিত হয়। (৩) ধনতন্ত্রে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের শোষণ করে। ফলে শ্রমিকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পায়। তাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থায় সরকার তার বাজেট নীতি ও আর্থিক নীতির সাহায্যে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার এই কুফলগুলি দূর করতে পারে।

(৪) এখানে সরকারের ভূমিকা হল সাহায্যকারী চিকিৎসকের ভূমিকা।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ এই সরকার গঠনে উৎসাহিত হয় এবং সরকারের সহানুভূতিশীল ভূমিকার জন্য সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

(৫) এখানে ভোগকারী ও উৎপাদকদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয় না। সকলেই প্রয়োজনমত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে। উৎপাদকরাও স্বাধীনভাবে দ্রব্য উৎপাদন করে। কাজেই মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় ভোগ হয় সর্বাধিক তৃপ্তির জন্য, উৎপাদন হয় সর্বাধিক মুনাফার জন্য। প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার ভিত্তিতে ভোগ ও উৎপাদন হয়। (৬) এখানে একদলীয় শাসনের কুফল থাকে না।

(ঘ) **দোষ:** (১) কিন্তু মিশ্র অর্থব্যবস্থাকে খিচুড়ি ব্যবস্থা বলে উপহাস করা হয়। (২) এখানে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি থাকে বলে নানাক্ষেত্রে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। (৩) সরকারের পক্ষে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় না। একচেটিয়া আধিপত্য যাদের, তারা সরকারের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে অগ্রাহ্য করে কাজ করার ক্ষমতা রাখে। (৪) এখানে পরিকল্পনা থাকে কিন্তু বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর সরকারের কার্যত কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকলে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। (৫) মিশ্র অর্থব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য থাকে, সরকার তার নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র হয়ে যেতে পারেন। (৬) ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা তাদের আর্থিক ক্ষমতার জোরে রাজনীতিকে প্রভাবিত করে এবং নিজেদের সুবিধা কায়েম করে রাখে। (৭) এখানে সমন্বয়ের অভাব ঘটে ও ব্যয় বৃদ্ধি পায়।

প্রশ্নাবলী

১। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ আলোচনা কর।

২। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যের তুলনা কর।

৩। সমাজতান্ত্রিক গুণাগুণ আলোচনা কর।

৪। মিশ্র অর্থব্যবস্থা কাকে বলে? এর গুণাগুণ বিচার কর।

৫। ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও মিশ্র অর্থব্যবস্থার মধ্যে কোনটিকে তুমি সবচেয়ে ভালো অর্থব্যবস্থা বলে মনে কর এবং কেন কর?

CALCUTTA UNIVERSITY B. A. (Examination)—

ECONOMICS—PASS

First Paper

The figures in the margin indicate full marks.

১। চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা কিরূপে পরিমাপ করিবে ? যে সকল বিষয়ের উপর চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে সেগুলি আলোচনা কর।

২। কোন প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের জন্য মূলধন বাবদ অর্থসংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো আলোচনা কর এবং তাহাদের গুণাগুণের তুলনামূলক বিচার কর।

৩। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফল কি ? মূল্য নিয়ন্ত্রণের সহিত রেশনিং ব্যবস্থার সম্পর্ক কিরূপ ?

৪। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে কোন প্রতিষ্ঠানের স্বল্পমেয়াদী যোগান রেখা কিরূপে নির্ধারিত হয় ?

৫। জমি ব্যতীত উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যেও যে খাজনা থাকিতে পারে তাহা দেখাও।

৬। মুনাফা নির্ধারণে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ভূমিকা আলোচনা কর।

৭। অর্থের পরিমাণতত্ত্বের সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ কর।

৮। দুইটি দেশের মধ্যে দুইটি দ্রব্য লইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইলে বাণিজ্য হইতে লাভ কিভাবে পরিমাপ করা হয় ? যদি একটি দেশে অপর দেশের রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য করে তাহা হইলে বাণিজ্য হইতে লাভ কিভাবে প্রভাবিত হয় ?

৯। দুইটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার কিভাবে নির্ধারিত হয় ?

১০। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে-কোনও দুইটির উপর টীকা লিখ ঃ

(ক) জাতীয় আয়ের বস্তুস্রোত। (খ) অপূর্ণ প্রতিযোগিতা। (গ) চাহিদার আয়ানুগ স্থিতিস্থাপকতা। (ঘ) বাণিজ্য ব্যালেন্স ও লেনদেন ব্যালেন্স।

উৎকর্ষের জন্য ৪

1982

ECONOMICS—PASS

GROUP B

FIRST PAPER

(For 1981-82 Syllabus only)

৫। যে কোন পনেরটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ আয়রেখা এবং প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ আয়রেখা কি অভিন্ন ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

(খ) একটি দরিদ্র দেশে বাজারে সাধারণভাবে জিনিসপত্রের চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা কিরূপ ?

(গ) মূল্য নির্ধারণ তত্ত্ব আলোচনায় "স্বল্পকালীন" সময় বলতে কি বুঝ ?

(ঘ) যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের দায় তাহাদের ক্রীত শেয়ারেই সীমাবদ্ধ থাকে—ইহার অর্থ কি ?

(ঙ) একটি অস্বাভাবিক চাহিদা রেখা অংকন কর এবং উহা কেন অস্বাভাবিক তাহা বর্ণনা কর।

(চ) একটি চাহিদারেখা ও একটি যোগানরেখা অঙ্কিত করিয়া ভারসাম্যের মূল্য নির্দেশ কর। এখন যদি চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে, নূতন ভারসাম্যের মূল্যটি নির্দেশ কর।

(ছ) কোন একটি দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান। যখন এই জিনিসটির মূল্য চার টাকা, বাজারে ইহার চাহিদা ৩০০ একক। যদি এই জিনিসের দাম কমিয়া তিন টাকা হয়, ইহার চাহিদা কত হইবে ?

(জ) একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদন-সংগঠন দামের পরিবর্তন ছাড়া অন্য প্রতিযোগিতার আশ্রয় লইতে পারে। এই প্রকার মূল্য ব্যতিরেকী প্রতিযোগিতার দুইটি উদাহরণ দাও।

(ঝ) একটি দ্রব্যের বিভিন্ন এককের জন্য একজন ক্রেতার সর্বোচ্চ মূল্যের তালিকা নিম্নরূপ হইলে এবং জিনিসটির বাজার দর ৬০ পয়সা হইলে তাহার ক্রয়ের পরিমাণ নিরূপণ কর।

প্রথম ইউনিট সর্বোচ্চ মূল্য—১ টাকা
দ্বিতীয় ইউনিট সর্বোচ্চ মূল্য—৮০ পয়সা
তৃতীয় ইউনিট সর্বোচ্চ মূল্য—৬০ পয়সা
চতুর্থ ইউনিট সর্বোচ্চ মূল্য —৪০ পয়সা

(ঞ) একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে শেয়ার বিক্রয় করিতে চাহিলে সওদাগরি ব্যাঙ্কগুলির জমা নগদের উপর ইহা কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে ?

(ট) দুইটি দেশের মধ্যে একটি দেশ যদি সকল দ্রব্য উৎপাদনে অন্য দেশটি হইতে অধিক দক্ষ হয় তাহা হইলে তাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি সম্ভব ?

(ঠ) যদি জাতীয় আয় আরও সমতার ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে সমাজের সম্মিলিত সঞ্চয়ের উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে ?

(ড) দেশে সুদের হার যদি কমিয়া যায়, বিনিয়োগের উপর ইহার কি প্রভাব আশা কর ?

(ঢ) যদি জনসাধারণের আয় বর্ধিত হয় তাহা হইতে জনগণের নগদ পছন্দের উপর ইহার কি প্রভাব দেখা যাইবে ?

(ণ) যদি চায়ের মূল্য কমিয়া যায়, তাহা হইলে চিনির চাহিদা ও কফির চাহিদা কিরূপে প্রভাবিত হইবে ?

(ত) এমন দুইটি অবস্থা নির্দেশ কর যেখানে টাকার যোগান বাড়া সত্ত্বেও দাম বাড়িবে না।

(থ) ধরা যাক্ বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার অবাধে নিরূপণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এবং ইংলণ্ড ও ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত। যদি ভারত মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়ে কিন্তু ইংলণ্ডে ইহার কোন চিহ্ন না থাকে, এই অবস্থায় পাউণ্ড-স্টারলিং-এর মূল্যের হিসাবে টাকার মূল্যের কি পরিবর্তন পরিলক্ষিত হইবে ?

(দ) একটি উৎপাদন-সংগঠনের ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় কেন প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে প্রবেশ করে না বুঝাইয়া বল।

(ধ) কালো বাজারের দাম খোলা বাজারের দামের চেয়ে বেশী হয় কেন ?

(ন) একটি দেশে মোট বাৎসরিক ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ ১,০০০ কোটি টাকা ঐ দেশে মোট অর্থের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা হইলে মুদ্রার প্রচলন নিরূপণ কর।

Group C

যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও

৬। কোন দ্রব্যের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে বুঝাইয়া দাও। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারক বিভিন্ন বিষয়গুলি কি ?

৭। একচেটিয়া উৎপাদক কিরূপে বাজারে তাহার মূল্য নিরূপণ করে দেখাও। একচেটিয়া মূল্য কি সকল সময় প্রতিযোগিতার বাজারের মূল্য হইতে অধিক হয় ?

৮। পূর্ণ প্রতিযোগিতা কাহাকে বলে ? বাজারে কখন অপূর্ণ প্রতিযোগিতার উপস্থিতি দেখা যায় বর্ণনা কর।

৯। বাস্তব বাজারে কিরূপে মজুরির হার নির্ধারিত হয় বর্ণনা কর।

১০। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কিরূপে টাকার যোগান বাড়াইতে পারে আলোচনা কর। ব্যাঙ্কের অর্থের যোগান বৃদ্ধির সীমা কতদূর দেখাও।

১১। একটি উন্নতদেশে বিভিন্ন সময়ে বিনিয়োগের এত হ্রাসবৃদ্ধি কেন দেখা যায় এবং জাতীয় আয়কে ইহা কিরূপে প্রভাবান্বিত করে আলোচনা কর।

১২। সংরক্ষণমূলক শুল্কের সমর্থনে যুক্তিগুলি পরীক্ষা কর।

CALCUTTA UNIVERSITY B. COM

ECONOMIC PRINCIPLES AND PLANNING—PASS

Group C is Compulsory

Group A

যে-কোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। 'চাহিদা রেখা' কাহাকে বলে ? কখন এই রেখার ঢাল ধনাত্মক হয়, তাহার ব্যাখ্যা দাও।

২। 'স্থির ব্যয়' ও 'পরিবর্তনশীল ব্যয়'-এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর। কোন্ সময়ে 'স্থির ব্যয়', যথার্থ ব্যয়ে রূপান্তরিত হয়, তাহা ব্যাখ্যা কর।

৩। 'ভারসাম্য দাম' কি? বিশদ ব্যাখ্যা দাও। যদি—

(ক) ভোগকারীর আয় বৃদ্ধি ঘটে; (খ) বিক্রয়ের উপর কর ধার্য হয়; (গ) উৎপাদন কার্য ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধির আয়ত্তাধীন হয়; তবে এই দাম কিরূপে পরিবর্তিত হয়, তাহা নির্দেশ কর।

৪। বিবৃতি সহ আধুনিক খাজনাতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান কর।

Group B

৫। যে-কোন পনেরটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ—

(ক) চাহিদা, (১) ক্রেতার আয়ের; (২) দ্রব্য সেবার মূল্যের; (৩) পরিবর্ত দ্রব্য সেবার মূল্যের; (৪) ক্রেতার রুচি ও পছন্দ বোধের; (৫) সব কয়টির, অপেক্ষক অথবা কোনটিরও অপেক্ষক নহে।

(খ) প্রযুক্তিগত কৌশলের পরিবর্তন চাহিদা এবং অথবা সরবরাহ রেখা সমূহকে প্রভাবিত করে কোনদিগকে প্রভাবিত করে না।

(গ) আয়-প্রভাব ধনাত্মক হইলে দাম-প্রভাব ধনাত্মক হইবে ঃ (১) সর্বদা; (২) কদাপি নয়; (৩) প্রায়ই সত্য।

(ঘ) প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখার ন্যূনতম বিন্দু দিয়া অতিক্রম করে। কেন?

(ঙ) সকল নিকৃষ্ট দ্রব্যকেই কি 'গিফেন দ্রব্য' বলা যায়?

(চ) কোথায় প্রতিবেশী ফার্মের আয় ব্যয় সমতা বিন্দু'র অবস্থিতি ঘটে?

(ছ) প্রদত্ত দ্রব্য সমন্বয়গুলি; (১০, ১২), (১১, ১৪) ও (১, ১৬), কয়টি নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থিত?

(জ) আধুনিক তত্ত্বানুসারে সমান অবস্থান ও উর্বরতাবিশিষ্ট দুই খণ্ড জমিতে অবশ্যই খাজনার উদ্ভব হইবে। ইহার সমর্থনযোগ্য দুইটি যুক্তির উল্লেখ কর।

(ঝ) দ্রব্য সরবরাহ বৃদ্ধির সাথে মূল্যস্তর বৃদ্ধি হইলে উহা, (১) মুদ্রাস্ফীতি; (২) মুদ্রা সংকোচন; (৩) বদ্ধাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতি নির্দেশ করে; (৪) কোনটিও নির্দেশ করে না।

(ঞ) 'অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধির ফলে মূল্যস্তরের প্রত্যক্ষ ও আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটে'; এই বিবৃতির পশ্চাতে নিহিত অনুমানগুলি ব্যক্ত কর।

(ট) কখন রাজস্বনীতিকে 'চক্রবিরোধী' বলা যায়?

(ঠ) প্রান্তিক মূল্য-উৎপাদন কোথায় প্রান্তিক আয়-উৎপাদনের সমান এবং কোথায় প্রথমটি দ্বিতীয়টির অধিক হয়?

(ড) একচেটিয়া উৎপাদক কি দীর্ঘকালে ন্যূনতম গড় ব্যয়ে উৎপাদন করিতে সমর্থ?

(ঢ) পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন কেন?

(ণ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কি রাজনৈতিক এবং/অথবা সামাজিক উদ্দেশ্য থাকে ?

(ত) ভারত কি উন্নয়ন এবং/অথবা সুষম বন্টনের স্বার্থে পরিকল্পনা অনুসরণ করিতেছে ?

(থ) ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনার দুটি ধরনের নাম উল্লেখ কর।

(দ) ভারতে পরিকল্পনা রূপায়নে দু'টি প্রধান অন্তরায় নির্দেশ কর।

(ধ) ভারতে মূলধন-প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বনের মূল অসুবিধাগুলি উল্লেখ কর।

(ন) (১ ব্যয়-সুবিধা এবং (২ আয়ের হারে'র মধ্যে কোনটি প্রকল্প নির্বাচনের সঠিক মান হইবে ?

Group C

যে-কোন চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও

৬। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের বিধি কেন কার্যকর হয় তাহা আলোচনা কর। এই সূত্রটিকে বিকল্পভাবে 'ক্রমবর্ধমান ব্যয় বিধি' বলা যায় কি ?

৭। ভোগকারীর ভারসাম্য ধারণাটির ব্যাখ্যা কর। যদি (ক) ভোগকারীর আয় বৃদ্ধি পায়, (খ) একটি দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায় তবে কিরূপে এই ভারসাম্য পরিবর্তিত হয় তাহা দেখাও।

৮। ভারতের ষষ্ঠ পঞ্চম-বার্ষিক পরিকল্পনায় উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত কর। এই পরিকল্পনার জন্য অর্থসংস্থানের মূল উৎসগুলির বিবরণ দাও।

৯। নিম্নে উল্লেখ করা বিষয়গুলির যে-কোন একটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ, (খ) মাত্রাজনিত ব্যয় সংক্ষেপে, (গ) আভ্যন্তরীণ সরকারী ঋণের বোঝা।

১০। লাভ বলিতে কি বুঝ তাহা বিশ্লেষণ কর। অনিশ্চয়তা ও লাভের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি ?

১১। অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন খাতে অধিক সম্পদ বণ্টন কি সমর্থন কর।

১২। মিশ্র অর্থনীতি বলিতে কি বুঝ ? মিশ্র অর্থনীতির সুফলগুলি আলোচনা কর।

ECONOMIC PRINCIPLES AND PLANNING—PASS

Group—A

১। যে কোন পনেরটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(ক) চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে কোন্‌টি প্রাসঙ্গিক :

(i) পরিবর্ত দ্রব্য ; (ii) পরিপূরক দ্রব্য ; (iii) বিপরীতধর্মী দ্রব্য।

(খ) যোগান রেখা ডান দিকে সরিয়া আসিলে ভারসাম্য মূল্যের (i) বৃদ্ধি (ii) হ্রাস ঘটিবে অথবা (iii) অপরিবর্তিত থাকিবে।

(গ) পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগী ফার্মের গড় ও প্রান্তিক আয় সমান হইবে।
(i) সত্য ; (ii) প্রায়শঃ সত্য ; (iii) ভ্রান্ত ধারণা।

(ঘ) পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে মূল্য ও ন্যূনতম গড় ব্যয় পরস্পরের সমান, সুতরাং মুনফার উদ্ভব হয় না। ইহা কি সমর্থনযোগ্য ?

(ঙ) ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি বিবৃত করে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস এবং মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ইহা কি স্বীকারের যোগ্য ?

(চ) শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি ঘটিলে শ্রমশক্তির সরবরাহে (i) বৃদ্ধি ; (ii) হ্রাস ঘটে অথবা (iii) অপরিবর্তিত থাকে।

(ছ) দুটি নিরপেক্ষ রেখা কখনও (i) পরস্পরকে ছেদ করে ; (ii) পরস্পরের সমান্তরাল হয় ; (iii) কিছুই ঘটে না।

(জ) নীট জাতীয় আয়ে (i) আভ্যন্তরীণ সকল উৎপাদনে মোট মূল্য ; (ii) বিদেশ হইতে প্রাপ্ত লভ্যাংশ ; (iii) অবচয়ের মোট পরিমাণ অন্তর্ভুক্ত হয়।

(ঝ) চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি (i) সুদের হার বৃদ্ধি ; (ii) সুদের হারের হ্রাস ; (iii) সরকারী ব্যয় সংকোচন বা রেশনিং-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(ঞ) বর্ধিত অর্থ সরবরাহ মূল্যস্তরের বৃদ্ধি ঘটবে : (i) সত্য ; (ii) প্রায়শঃ ; (iii) কদাপি নহে।

(ট) বাণিজ্যিক চক্রে চারিটি প্রধান স্তর দেখা যায়। এই স্তরগুলির উল্লেখ কর।

(ঠ) চিনির মূল্যবৃদ্ধি ঘটিলে, চায়ের মূল্য (i) বৃদ্ধি ; (ii) হ্রাস ঘটিবে অথবা (iii) মূল্য অপরিবর্তিত থাকিবে।

(ড) পরিবর্তনশীল অনুপাত বিধি এবং ফার্মের আয়তন পরিবর্তনের সূত্র পরস্পরের সমান নহে : (i) সর্বদা (ii) প্রায়শঃ এবং (iii) কদাচিৎ নহে।

(ঢ) কোন পণ্যদ্রব্যের স্থিতিস্থাপকতা যদি একক হয়, তবে ২·০০ মূল্যে ৩০টি দ্রব্য ক্রয় করা হয় ; অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকিলে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া ৫·০০ হয় তখন ঐ দ্রব্যটির কতগুলি ক্রয় করা হইবে, তাহা নির্ণয় কর।

(ণ) অর্থের মূল্য নির্ভর করে (i) অর্থের পরিমাণ, (ii) অর্থের প্রচলন গতির উপর অথবা (iii) জনসাধারণের আর্থিক আয়ের উপর।

(ত) শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতি কাম্য কারণ (i) বেকারত্ব হ্রাস করে ; (ii) মূলধনের স্বল্পতার সমস্যা মিটায়।

(থ) 'দারিদ্র্য সীমার' সংজ্ঞা প্রদান কর। ভারতে জনসমষ্টির কত শতাংশ এই রেখার নিম্নে বাস করে ?

(দ) কোন্ অবস্থায় কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা আঞ্চলিক পরিকল্পনা অপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া বিবেচিত হয় ? এই বিষয়ে তোমার যুক্তি প্রদর্শন কর।

(থ) কোন দেশের পরিকল্পনার জন্য দায়ী এইরূপ দুইটি সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের উল্লেখ কর।

(ন) পরিকল্পিত অর্থনীতিতে কার্যাদি সম্পাদনের কৌশল নির্বাচন কোন্ কোন্ ভিত্তিতে করা হয় তাহা উল্লেখ কর।

Group—B

(যে কোনো চারিটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কাহাকে বলে? যে সকল কারণের উপর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভরশীল, সেগুলির উল্লেখ কর।

৩। একচেটিয়া মূল্য কি সর্বদা প্রতিযোগী কারবারের মূল্য অপেক্ষা অধিক হইবে?

৪। 'ঋণ আমানত সৃজন করে'। মন্তব্য কর।

৫। মজুরী নির্ণয়ে প্রান্তিক উৎপাদনতত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর।

৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে-কোন দুইটির উপর):—

(ক) দেনা পাওনা উদ্বৃত্ত; (খ) করভার; (গ) নগদ পছন্দবোধ; (ঘ) বাজেট রেখা; (ঙ) অর্থের প্রচলন বেগ।

৭। ষষ্ঠ পরিকল্পনার সাফল্য আলোচনা কর।

৮। মিশ্র অর্থনীতিতে পরিকল্পনার সুফলসমূহ বিশ্লেষণ কর।

BURDWAN UNIVERSITY B. A. (Examination)
ECONOMICS (First Paper)

পূর্ণমান—100 সময়—তিন ঘণ্টা

সব প্রশ্ন সমমান

যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দাও।

মোট পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখ।

১। (ক) প্রান্তিক উপযোগের সংজ্ঞা দাও।

(খ) মোট উপযোগের সহিত ইহার পার্থক্য নির্ণয় কর।

(গ) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের নিয়ম ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) ইহার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর। ৩+৩+৮+৬

২। (ক) চাহিদার নিয়মটি ব্যাখ্যা কর।

(খ) চাহিদার আয়গত স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা লিখ।

(গ) চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতা কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

(ঘ) প্রান্তিক আয়, গড়-আয় ও চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩+৩+৬+৮

৩। কোন দ্রব্যের দাম হ্রাসজনিত আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাব চিত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ কর। ২০

৪। (ক) গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় বলিতে তুমি কি বুঝ ?

(খ) গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

(গ) প্রান্তিক আয় ও গড় ব্যয় বলিতে কি বুঝায় ?

(ঘ) পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় এবং একচেটিয়া কারবারের অধীনে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪+৬+৪+৬

৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের অন্তর্গত একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের সর্তগুলি বিশ্লেষণ কর। ২০

৬। অপূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের সর্তগুলি ব্যাখ্যা কর। ২০

৭। (ক) একচেটিয়া কারবার কাহাকে বলে ?

(খ কখন একচেটিয়া কারবারীকে দামস্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারী বলা হয় ?

(গ) কোন্ কোন্ অবস্থায় দামস্বতন্ত্রতা সম্ভবপর ?

(ঘ) কখন দামস্বতন্ত্রতা লাভজনক ? ৩+৩+৮+৬

৮। খাজনার রিকার্ডীয় তত্ত্ব এবং আধুনিক তত্ত্বের মধ্যে প্রভেদ আলোচনা কর। ২০

৯। দেখাও যে সুদের হারে টাকার চাহিদা ও টাকার যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। ২০

১০। মজুরির হার ও শ্রমের যোগানের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর। ২০

পূর্ণমান : ১০০ সময় : তিন ঘণ্টা

সকল প্রশ্নের মান সমান।

যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর দাও।

'ক' বিভাগ হইতে তিনটি এবং 'খ' বিভাগ হইতে দুইটি প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে।

'ক' বিভাগ

১। জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা কি ? জাতীয় আয় পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি কি ? জাতীয় আয়ের পরিমাপের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা আছে ? জাতীয় আয় যে চক্রাকার প্রবাহ আলোচনা করিয়া দেখাও। ৪+৬+৪+৬

২। তোমার মতে কি অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের সাথে সাধারণ মূল্যস্তর একই দিকে ও সমানুপাতে পরিবর্তিত হয়? যুক্তি সহ উত্তর দাও। ২০

৩। ব্যাঙ্করেট বলিতে কি বোঝায়? কিভাবে ব্যাঙ্করেটের পরিবর্তন ঋণের পরিমাণকে প্রভাবিত করে? ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসাবে ইহার কি কি সুবিধা? ইহার সীমাবদ্ধতা কি কি? ৪+৮+৪+৪

৪। উৎপাদনের উপর মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল কি কি? বণ্টনের উপর ইহার ফলাফল কি কি? মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক ব্যবস্থাগুলি আলোচনা কর। ইহা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা কি ভাবে ব্যবহার করা যায়? ৫+৫+৫+৫

৫। ভোগ অপেক্ষক কি? ভোগ অপেক্ষকের কীনসীয় তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। ৮+১২

৬। অর্থনীতিতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের বিশ্লেষণ কর। বেকারত্বের কীনসীয় সমাধানগুলি আলোচনা কর। ১০+১০

ECONOMIC THEORY

B. Com.

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। চাহিদার সূত্রটি ব্যাখ্যা কর। এই সূত্রের পশ্চাতে কোন্ কোন্ শক্তি কাজ করে?

২। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সংজ্ঞা দাও। কিভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাহার স্বল্পকালীন উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে তাহা আলোচনা কর।

৩। সমালোচনা সহ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটি আলোচনা কর।

৪। আয়ের চক্রাকারে প্রবাহ বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে আয়ের চক্রাকার প্রবাহে ভারসাম্য অর্জিত হয় তাহা দেখাও।

৫। মুনাফা নির্ধারণে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার যে ভূমিকা থাকে তাহার পর্যালোচনা কর।

৬। (ক) স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং (খ) প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের ধারণা ব্যাখ্যা কর। প্রান্তিক ব্যয় মাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় লইয়া গঠিত হয় কেন?

৭। টাকা-কড়ির মূল্য বলিতে কি বুঝ? অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি সমালোচনা সহকারে বিবৃত কর।

৮। মুদ্রাস্ফীতির অর্থনৈতিক ফলাফল পর্যালোচনা কর। মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইলে তুমি কোনটিকে বাছিয়া লইবে এবং কেন বাছিয়া লইবে?

৯। কোন্ কোন্ কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাধীনতার উপর বাধানিষেধ আরোপ করা একটি দেশের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে—তাহা আলোচনা কর।

১০। সমাজতন্ত্রের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। সমাজতন্ত্রের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

ECONOMICS (Pass) B. A.

Second Paper

পূর্ণমান : ১০০ সময় : তিন ঘণ্টা

প্রত্যেকটি প্রশ্ন সমমান।

যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর প্রদান বিধেয়।

'ক' বিভাগ থেকে তিনটি এবং 'খ' বিভাগ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর কর।

'ক' বিভাগ : —পূর্ণমান : ৬০

১। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সংজ্ঞা দাও। কি অর্থে এরা সর্বদা পরস্পর সমান হয়। ভারসাম্য আয়স্তরে কিভাবে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা অর্জিত হয় চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

২। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা বলতে কি বোঝায়? অর্থনীতিতে বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণে এর গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। ব্যাঙ্ক আমানত কয় প্রকার? সকল প্রকার আমানত কি দেশের অর্থের যোগানের অংশ হিসাবে গণ্য হয়? বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলি কিরূপে ঋণ সৃষ্টি করে? এদের ঋণ-সৃষ্টি ক্ষমতার সীমা কোথায়?

৪। উৎসারের সংজ্ঞা দাও। চাহিদার টান ও যোগানব্যয় চাপের ফলে উদ্ভূত উৎসারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

৫। পরিমাণগত ও নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়

কর। নির্বাচনমূলক ঋণ-নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা কর এবং এদের সুবিধাগুলির মূল্যায়ন কর।

৬। কেইন্সীয় গুণকতত্ত্ব আলোচনা কর।

ECONOMIC THEORY (B. Com..)

প্রত্যেকটি প্রশ্ন সমমান।

যে কোন ছটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। চাহিদা রেখার কোন একটি বিন্দুতে তুমি কিভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপ করবে ?

২। নিরপেক্ষ রেখা কি ? একটি নিরপেক্ষ মানচিত্রের সাহায্যে ভোগকারীর ভারসাম্য অবস্থার শর্তাবলী ব্যাখ্যা কর।

৩। কোন একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার আকৃতি কি রকম হবে ? দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার সঙ্গে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখাগুলোর সম্পর্ক আলোচনা কর।

৪। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্তসমূহ আলোচনা কর।

৫। একচেটিয়া কারবারের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি ? একচেটিয়া কারবারে কি ভাবে দাম এবং উৎপাদন নির্ধারিত হয় ?

৬। অর্থনীতিতে খাজনা বলতে কি বোঝায় ? খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।

৭। ভোগ অপেক্ষকের ধারণাটি সংক্ষেপে আলোচনা কর। ভোগ অপেক্ষক নির্ধারণকারী বিষয়গুলো ব্যাখ্যা কর।

৮। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হতে প্রাপ্ত লাভসমূহ আলোচনা কর।

৯। মিশ্র অর্থনীতি কাকে বলে ? এই ব্যবস্থার প্রধান সুবিধে ও অসুবিধেগুলো আলোচনা কর।

১০। বাজেট বলতে কি বোঝ ? বাজেটের সহিত একটি দেশের অর্থনীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

ECONOMICS (First Paper)

সকল প্রশ্ন সমমান।

যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর প্রদান বিধেয়।

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। (ক) আয়-প্রভাবের সংজ্ঞা দাও।

(খ) আয়-প্রভাব ও বিনিময়-প্রভাবের পার্থক্য নির্ণয় কর।

(গ) নিকৃষ্ট দ্রব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

২। (ক) স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

(খ) প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

(গ) দীর্ঘকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সব ব্যয়ই পরিবর্তনশীল ব্যয় হয় কি? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

৩। (ক) সমতুল রেখার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

(খ) সমতুল রেখা মূল-বিন্দু O এর দিকে সাধারণতঃ উত্তল হয় কেন আলোচনা কর।

৪। (ক) চাহিদা রেখা কেন ডানদিকে নিম্নগামী হয় ব্যাখ্যা কর।

(খ) এমন উদাহরণ আছে কি যেক্ষেত্রে চাহিদা রেখা দক্ষিণে ঊর্ধ্বমুখী হয়?

৫। (ক) চাহিদার মূল্যসংবেদনশীলতার সংজ্ঞা লেখ।

(খ) পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের সঙ্গে অপূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের পার্থক্য নির্দেশ কর।

(গ) পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়?

৬। স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন সময়ে দাম নির্ধারণে উৎপাদন ব্যয়ের প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

৭। (ক) একচেটিয়া কারবারী কিভাবে তার উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করে তা বিশ্লেষণ কর।

(খ) একচেটিয়া কারবারী কি সব সময়ই অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে?

(গ) একচেটিয়া দ্রব্যের চাহিদা-বৃদ্ধির ফলাফল বিচার কর।

৮। বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সমালোচনামূলক পর্যালোচনা কর।

৯। (ক) আর্থ ভাটকের সংজ্ঞা লেখ।

(খ) ভাটক ও প্রায়-ভাটকের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

(গ) সর্ববিধ উৎপাদকের আয়ের মধ্যে ভাটকের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে কিনা আলোচনা কর।

১০। (ক) মুনাফার উপাদানগুলি নির্দেশ কর।

(খ) মুনাফা কি দামের অন্তর্ভুক্ত?

(গ) দীর্ঘকালীন সময়ে মুনাফার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কিনা বিচার কর।

॥ পরিভাষা ॥

indifference curve - সমতুল রেখা

economic rent = আর্থ ভাটক

quasi-rent = প্রায়-ভাটক

price-elasticity of demand = চাহিদার মূল্যসংবেদনশীলতা

—

CALCUTTA UNIVERSITY (B. A.)

ECONOMICS—(Pass)

First Paper

Group A

১। যে-কোন দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ২ × ১০ = ২০

(ক) শ্রমের সচলতা এবং অন্য যে-কোন উৎপাদনের সচলতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি ?

(খ) কোন্ অবস্থায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ ও প্রান্তিক বিক্রয়লব্ধ অর্থ পরস্পরের সমান এবং কোন্ অবস্থায় উহারা পরস্পর হইতে পৃথক হইবে ?

(গ) চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর।

(ঘ) চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা যদি ১ হয়, তবে প্রান্তিক আয় কত হইবে ?

(ঙ) "বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত" এবং "লেনদেন-উদ্বৃত্তে"র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর।

(চ) মূল্য নির্ধারণতত্ত্ব আলোচনায় "স্বল্পকালীন সময়" বলিতে কি বুঝায় ?

(ছ) "নিকৃষ্ট" দ্রব্য বলিতে কি বুঝায় ?

(জ) উৎপাদন সম্ভাবনা সীমারেখা বলিতে কি বুঝায় ?

(ঝ) কোন পণ্যের যোগান রেখা ডানদিকে সরিয়া গেলে, ভারসাম্য দামের কি পরিবর্তন হইবে, যদি চাহিদা রেখা (১) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় এবং (২) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় ?

(ঞ) গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় সাধারণতঃ গড় মোট ব্যয় হইতে কম কেন ?

নিম্নোক্ত উক্তিগুলি ঠিক না ভুল ?

(ট) (১) গড় ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বগামী হইলে প্রান্তিক ব্যয় রেখা উহার (গড় ব্যয় রেখার) উপরে থাকে।

(২) গড় ব্যয় রেখা প্রান্তিক ব্যয় রেখার উপরে থাকিলে, প্রান্তিক ব্যয় রেখাটি ঊর্ধ্বগামী অথবা নিম্নগামী হইতে পারে।

(ঠ) প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা কত হইবে নির্ধারণ কর, যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা (১) ০'৭৫ এবং (২) $\frac{২}{৩}$ হয়।

(ড) উপাদানের চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদা বলা হয় কেন ?

(ঢ) যদি আইনত সংরক্ষিত নগদ অর্থের অনুপাত ১০ শতাংশ হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত ১০০ টাকা নগদ অর্থ জমা পাইলে সমস্ত ব্যাঙ্ক মিলিয়া অতিরিক্ত কত টাকা ঋণ দিতে পারে ?

(ণ) উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আচর... কি মৌলিক প্রেরণা কাজ করে বলে অনুমান করা হয় ?

Group B

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। কোন দ্রব্যের মোট চাহিদা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও। নিম্নলিখিত পরিবর্তন সমূহের ফলে কেরোসিনের চাহিদা কিভাবে পরিবর্তিত হইবে ঃ

(ক) রান্নার গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি, (খ) কেরোসিন স্টোভের মূল্য-হ্রাস ?

৩। চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা কিরূপে পরিমাপ করিবে ? যে সকল বিষয়ের উপর ইহা নির্ভর করে সেগুলি বিশ্লেষণ কর।

৪। দাম-নিয়ন্ত্রণ বলিতে কি বুঝায় ? কখন ঐ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ? এই প্রসঙ্গে আইনানুগ সর্বোচ্চ দাম ধার্যের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

৫। একটি শিল্পের যোগান রেখাকে, (ক) স্বল্প সময় এবং (খ) দীর্ঘ সময় বিবেচনা করিয়া কিরূপে পৃথকভাবে অঙ্কন করা যায় তাহা বুঝাইয়া লেখ।

৬। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে সর্বোচ্চ মুনাফা সংগ্রহকারী একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প সময় এবং দীর্ঘ সময়ে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছিতে গেলে যে-সকল সর্তপূরণ করিতে হয় আলাদা আলাদাভাবে তাহা বুঝাইয়া দাও।

৭। পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যগুলি কি কি ?

৮। জমিসহ সমস্ত উৎপাদনের আয়ের মধ্যে যে খাজনা থাকিতে পারে তাহা দেখাও।

৯। লোকের নগদ অর্থ ধরিয়া রাখার ইচ্ছা এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ করিবার ইচ্ছা এই উভয়ের উপর সুদের হার হ্রাসের ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

১০। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা কিভাবে জাতীয় আয়ের ভারসাম্য আনে ব্যাখ্যা কর।

১১। শিল্প সংরক্ষণের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। কোন্ কোন্ অবস্থায় ইহা একটি উন্নীয়মান দেশের পক্ষে অনুকূল হইতে পারে ?

CALCUTTA UNIVERSITY (B. COM.)

ECONOMIC PRINCIPLES AND PLANNING—PASS

Group A

১। যে-কোন **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

(ক) ভারতে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার ৪ (চারটি) লক্ষ্যের বর্ণনা দাও।

(খ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সামাজিক মানসিক উপাদান বলতে কি বোঝায় ?

(গ) ভারতে পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়া দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব কি ? তোমার উত্তরের সপক্ষে দুইটি যুক্তি দেখাও।

(ঘ) ভারতের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের উৎসগুলি কি কি ?

(ঙ) মূলধন-উৎপন্ন অনুপাত (C : O) বলিতে কি বোঝায় ?

(চ) 'উৎপাদনের শ্রম-নিবিড় কৌশল' বলতে কি বোঝায় ?

(ছ) 'ভোগকারীর উদ্বৃত্ত' বলতে কি বোঝায় ?

(জ) সমাজে মৌলিক অর্থনৈতিক ইউনিট কি কি ?

(ঝ) চাহিদা রেখার ঢাল ধনাত্মক / ঋণাত্মক। কোন্‌টি সত্য ?

(ঞ) স্বাভাবিক দ্রব্য ও নিকৃষ্ট দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(ট) একথা কি ঠিক যে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয় (SAC) কখনও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (LAC) অপেক্ষা কম হয় না? কেন?

(ঠ) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার বলতে কি বোঝায়?

(ড) খোলাবাজারী বেচা-কেনা (O.M.O.) কাকে বলে?

(ঢ) একটি যথাযথ বাণিজ্য চক্রের চারটি পর্যায়ের নাম কর।

(ণ) দুইটি দেশ যদি উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতার সমান হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বাণিজ্য ঘটবে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

Group B

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। একটি উৎপাদক সংস্থার গড় খরচ রেখা ও প্রান্তিক খরচ রেখার মধ্যে সম্পর্কটি আলোচনা কর।

২। (ক) চাহিদার পরিবর্তন, এবং (খ) চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন—এই দুইটির পার্থক্য আলোচনা কর।

৩। দাম স্বতন্ত্রতা কাকে বলে? এটা কখন সম্ভব হয়? দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ভারসাম্য অবস্থা ব্যাখ্যা কর।

৪। 'একচেটিয়া বাজারের তুলনায় নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য দাম কম হয় ও ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হয়।' —আলোচনা কর।

৫। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক কিভাবে দেশে টাকার যোগানকে প্রভাবিত করে? ব্যাঙ্কের এই ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ কর।

৬। অরূপান্তরযোগ্য কাগজী মুদ্রার যুগে কিভাবে বৈদেশিক বিনিময় হার নির্ধারিত হয়?

৭। খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্কটি আলোচনা কর।

৮। ভারতের মত পরিকল্পিত অর্থনীতিতে মূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

৯। ভারতের পরিকল্পনা রচনার কৌশল সম্বন্ধে একটি টীকা লেখ।

১০। ভারতের পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় অর্থ সংস্থানের উৎস হিসাবে করের (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) ভূমিকা আলোচনা কর।

BURDWAN UNIVERSITY

অর্থনীতি (স্নাতক)

প্রথম পত্র

প্রতিটি প্রশ্ন সমমান

যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর প্রদান বিধেয়।

যে-কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। নিরপেক্ষ রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি? একটি নিরপেক্ষ মানচিত্রের সাহায্যে

ভোগকারী কিভাবে তাহার দুইটি দ্রব্যের ভারসাম্য ক্রয়ের পরিমাণ স্থির করিবে, তাহা দেখাও।

২। দাম পরিবর্তনের 'পরিবর্ত প্রভাব' কি তাহা ব্যাখ্যা কর। আয় প্রভাবের সঙ্গে ইহার পার্থক্য কর। দেখাও যে দামপ্রভাব হইল আয়প্রভাব এবং পরিবর্ত-প্রভাবের যোগফল।

৩। চাহিদার সূত্রটি বিবৃত কর ও ব্যাখ্যা কর। চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাওয়া এবং চাহিদা রেখার নিম্নাভিমুখে অপসরণ ঘটার মধ্যে পার্থক্য দেখাও। চাহিদা-রেখার অপসরণ কি কি কারণে ঘটিয়া থাকে?

৪। নিম্নলিখিত যে-কোন দুইটি বিষয়ের উপর টীকা লিখ:

(ক) ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগবিধি ও ক্রেতার ভারসাম্য;
(খ) স্বল্পকালীন গড়ব্যয় রেখা;
(গ) নিকৃষ্ট দ্রব্যের দাম-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব;
(ঘ) খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক।

৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্তগুলি বিচার কর। দীর্ঘকালে একটি ফার্ম শিল্প হইতে কোন্ অবস্থায় বিদায় গ্রহণ করে?

৬। একজন একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন কর। দেখাও যে প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হইলেই সে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে।

৭। উৎপাদন-উপাদানের দাম উহার প্রান্তিক উৎপাদন দ্বারা নির্ধারিত হয় কি না, আলোচনা কর।

৮। সুদের হার সম্পর্কে তারল্য-পছন্দ তত্ত্বটি আলোচনা কর।

৯। মোট মুনাফা এবং নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কর। মোট মুনাফার গঠনকারী বিষয়গুলি কি কি? মুনাফা কি দীর্ঘকালে শূন্য হইতে পারে?

১০। যদি বাজারে মজুরীর হার বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে একজন শ্রমিক ব্যক্তিগত-ভাবে সর্বদাই অধিকতর সময় পরিশ্রম করিবে—একথা কি সর্বদাই সত্য? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও। শ্রমের বাজার যোগান-রেখার আকৃতি কেমন হইবে তাহা বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় পত্র

প্রতিটি প্রশ্ন সমমান

যথাসম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর প্রদান বিধেয়।

ক-বিভাগ থেকে তিনটি এবং খ-বিভাগ থেকে দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ: পূর্ণমান—৬০

১। পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগের সমতার দ্বারা কিভাবে ভারসাম্য আয় প্রতিষ্ঠিত হয় দেখাও। এ দুটি যদি পরস্পর সমান না হয় তবে কি হবে?

২। বিনিয়োগ বলতে কি বোঝায়? মোট বিনিয়োগ ও নীট বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য কর। বিনিয়োগ কিভাবে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হার দ্বারা নির্ধারিত হয়, ব্যাখ্যা কর।

৩। মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা কি? উৎপাদন ও আয়বণ্টনের উপর মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল আলোচনা কর।

৪। ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি কি ঋণ সৃষ্টি করতে পারে? যদি পারে, তবে কিভাবে এবং কতদূর পর্যন্ত পারে?

৫। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জমার অনুপাত বলতে কি বোঝায়? জমার অনুপাতে পরিবর্তনের দ্বারা কিভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, ব্যাখ্যা কর। ঋণ নিয়ন্ত্রণের এই পদ্ধতিটির সীমাবদ্ধতা কি কি?

৬। ভারসাম্য জাতীয় আয়ের স্তরের উপর স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের বৃদ্ধির প্রভাব আলোচনা কর।

খ-বিভাগঃ পূর্ণমান—৪০

৭। অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধন গঠনের ভূমিকা নিরূপণ কর।

৮। কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক সাহায্য কিভাবে সহায়তা করে দেখাও।

৯। উদ্বৃত্ত শ্রম কাকে বলে? এর অস্তিত্ব কোন অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কিভাবে সাহায্য করতে পারে?

১০। নীচের যে-কোন দুটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখঃ

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন; (খ) শ্রমবিভাজন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন; (গ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধকগুলি; (ঘ) স্বয়ং-সাধিত উন্নয়নের শর্তগুলি।

ECONOMIC THEORY (Pass) B. Com.

The questions are of equal value. Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. Answer any six questions.

১। নিম্নলিখিত বিবরণগুলি ঠিক না ভুল তাহা যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করঃ

(ক নিরপেক্ষতা রেখাগুলি কেন্দ্র বিন্দুর দিকে অবতল

(খ) নিরপেক্ষতা রেখাগুলি পরস্পর ছেদ করিতে পারে না

(গ) নিরপেক্ষতা রেখাগুলি ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

২। গড় ব্যয় বলিতে কি বোঝ? স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় রেখার সম্পর্ক আলোচনা কর।

৩। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার সংজ্ঞা লিখ। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্তগুলি আলোচনা কর।

৪। খাজনার সংজ্ঞা দাও। যে-কোন উপাদানের আয়ের মধ্যে কিরূপে খাজনার অংশ থাকে তাহা ব্যাখ্যা কর।

৫। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বলিতে কি বোঝ? গড় ভোগ প্রবণতার সহিত ইহার পার্থক্য কি? আয় ও ভোগের মধ্যে সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর।

৬। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কিরূপে ঋণ সৃষ্টি করে? ইহার সীমাবদ্ধতা কি কি?

৭। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের আয়-প্রবাহ বিনিময় সমীকরণ ভাষ্যটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা কর।

৮। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য দেখাও। প্রত্যক্ষ করের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

৯। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তুলনামূলক ব্যয় তত্ত্বটি উপযুক্ত দৃষ্টান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

১০। মিশ্র অর্থনীতি কাহাকে বলে? ইহার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

THE NORTH BENGAL UNIVERSITY

ECONOMICS (Pass) B. A.

First Paper

1. (a) Explain with illustration the relation between marginal utility and total utility.

(b) What would be the value of marginal utility when total utility is maximum?

(c) Explain the Law of demand with the help of the Law of diminishing marginal utility.

2. (a) What do you mean by an indifference curve?

(b) Why is it convex to the origin?

(c) What will be the shape of such a curve if two goods are perfect substitutes?

(d) Draw a budget line when the prices of the two goods are Rs. 5 and Rs. 3 respectively and the consumer's money income Rs. 15.

3. (a) Define income elasticity and price elasticity of demand.

(b) How would you measure the elasticity of supply?

(c) Given the values of income elasticity as +2, −2, +0·5, state what should be the nature of the goods corresponding to those values.

4. (a) Explain the law of diminishing returns, indicating the premises on which it is based.

(b) What shall be the behaviour of average and marginal product under diminishing returns ?

5. (a) W at is marginal cost ?

(b) Does fixed cost influence marginal cost ?

(c) Does a firm incur any cost if it closes down temporarily ?

(d) Show that the average variable cost curve will be U-shaped in the short-run.

6. (a) What are the conditions of perfect competition ?

(b) Why is demand curve of a firm under perfect ompetition horizontal and under monopoly down-ward sloping ?

(c) What would be the relation between average revenue and marginal revenue in a perfectly competitive firm and in a monopoly ?

7. (a) When does competition become imperfect ?

(b) How is 'Group equilibrium' established under monopolistic competition ? Illustrate diagrammatically.

8. (a) What are joint products ? Give an example.

(b) How are the prices of joint products determined in a perfectly competitive market ?

9 (a) What are the assumptions of marginal productivity theory of distribution ?

(b) Explain, with suitable examples, the terms marginal physical, marginal value and marginal revenue products ?

(c) How is wage determined under marginal productivity theory ?

10. (a) What is Loanable fund ?

(b) How is rate of interest determined by demand for and supply of loanable fund ? Illustrate your answer with suitable diagram.

ECONOMICS (Pass)—Second Paper

1. Explain the idea o effective demand and discuss its role in the Keynesian theory of employment.

2. (a) Define average propensity to consume [APC] and marginal propensity to consume [MPC].

(b) When income is equal to consumption determine the values of APC and MPC.

(c) Calculate the different multipliers when marginal propensities to save are 0·6 and 0·2.

(d) What do you mean by autonomous consumption and induced consumption ?

3. (a) What is value of money ?

(b) How would you measure it ?

(c) What difficulties would you face in its measurement ?

4. (a) Distinguish between (i) investment and disinvestment and (ii) autonomous investment and induced investment ?

(b) Discuss the relationship between marginal efficiency of capital and rate of interest

5. "Saving is always equal to investment." "Saving is not always equal to investment"—Elucidate the above two statements and distinguish between them.

6. (a) How would you determine IS and LM curves ?

(b) How are the rate of interest and the level of income determined by those curves ?

7. Elucidate the statement that comparative, and not absolute, cost differences lead to international trade.

8. Distinguish with suitable examples between

(a) direct and indireet taxes.

(b) shifting and incidence of tax.

(c) public debt and private debt.

9. (a) What is bank rate ?

(b) How can this rate control credit created by commercial banks ?

10. (a) Explain diagrammatically inflationary gap.

(b) Distingu sh between open and suppressed inflation.

BUSINESS ECONOMICS (Pass B. Com.)

1. (a) What constraints does a consumer face in seeking to maximise the total utility from his expenditure ?

2. (b) Suppose that a consumer seeks to maximise his total utility from the purchase of two goods X and Y. Explain the condition of consumer's equilibrium in the case.

(c) Explain why the quantity demanded for a commodity increases if its price falls.

2. Why do most demand curves slope downwards ? Can you suggest instances where demand curves may slope upwards to the right ?

3 Define marginal revenue product, distinguish it from marginal physical-product. Explain the proposition that profit is not at a maximum unless each factor-price exactly equals its marginal-revenue-product.

4. (a) Show why marginal cost equals price at equilibrium position of a firm under perfect competition.

(b) Distinguish between monopoly and monopolistic competition.

5. (a) Explain the relationship between rent and price.

(b) How does profit differ from other kinds of factor income ?

Group B

6. What are the merits and demerits of direct tax and indirect tax ? Would you always prefer direct taxes to indirect taxes ? Give reasons.

7. Discuss critically the different methods of credit control by the central bank.

8. Examine critically the Monetary Theory of Interest.

9. Explain the comparative cost principle of international trade.

10. Write notes on any two of the following :

(i) Keynes' multipl er.
(ii) Effect of devaluation.
(iii) Open market operation.
(iv) Margin·ˈ efficiency of capital.

BURDWAN UNIVERSITY

ECONOMICS B. A. (Pass)

First Paper

১। অর্থনৈতিক যুক্তি দেখাও (যে কোন দুইটি) ঃ

(ক) ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা উচ্চ-ঢাল-সম্পন্ন হইলেও বাজার চাহিদা রেখা সর্বদাই ডানদিকে নিম্ন-ঢাল-সম্পন্ন।

(খ) ভারসাম্য দামে পরিবর্তন বাজার চাহিদা রেখায় পরিবর্তন অথবা বাজার যোগান রেখায় পরিবর্তনের জন্যই ঘটে।

(গ) চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান বিভিন্ন হইবে।

(ঘ) নিরপেক্ষ রেখা নিম্নাভিমুখী এবং ভূমির দিকে উত্তল।

২। একজন ভোগকারীর নিরপেক্ষ মানচিত্র অপরিবর্তিত ধরিয়া—(১) তাহার আয়ের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে এবং দ্রব্য দুইটির দাম সমান আছে (২) একটি দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং আয় ও অন্য দ্রব্যের দাম সমান আছে—এই অবস্থায় তাহার ভারসাম্যে কি পরিবর্তন হইবে ব্যাখ্যা কর।

৩। একটি ফার্মের গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে কিরূপে পার্থক্য করিবে? স্বল্পকালীন গড় ব্যয় ও স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

৪। গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কাহাকে বলে? চাহিদার দামগত স্থিতিস্থাপকতার সঙ্গে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক কি?

৫। পূর্ণ প্রতিযোগী ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের শর্ত বিশ্লেষণ কর। কখন ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে এবং কেন?

৬। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা কর এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সহিত ইহার পার্থক্য উল্লেখ কর।

৭। বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে একই জিনিস একটি ফার্ম কোন অবস্থায় বিক্রয় করিতে পারে? বিভেদকারী একচেটিয়া কারবারীর ক্ষেত্রে ভারসাম্যের শর্তগুলি ব্যাখ্যা কর।

৮। অর্থনৈতিক খাজনার সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে, যে-কোন উৎপাদনের উপাদানই খাজনা অর্জন করিতে পারে।

৯। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা সত্ত্বেও বিভিন্ন পেশায় মজুরীর হার বিভিন্ন হইয়া থাকে, —ইহা কিভাবে ব্যাখ্যা করিবে? শ্রমিক সংঘ মজুরীর উপর কতদূর প্রভাব ফেলিতে পারে?

১০। "সুদের হার মূলধনের চাহিদা ও যোগানের দ্বারাই নির্ধারিত হয়" —এই মত কি তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য? যুক্তি দেখাও।

ECONOMICS (Pass)

Second Paper

'ক' বিভাগ থেকে তিনটি এবং 'খ' বিভাগ থেকে দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

'ক' বিভাগ ঃ পূর্ণমান—৬০

১। কোন দেশে নিয়োগের স্তর যে সকল বিষয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয় উহাদের বর্ণনা দাও।

২। গড় সঞ্চয় প্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার সংজ্ঞা লিখ। কোন দেশের সামগ্রিক ভোগ্যব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলির আলোচনা কর।

৩। ব্যাঙ্ক রেট কাহাকে বলে? ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইহার কার্যকারিতা আলোচনা কর।

৪। তুমি কি মনে কর অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন সর্বাবস্থায় সাধারণ দামস্তরে পরিবর্তন আনিবে? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৫। অনিচ্ছাকৃত বেকারী কাহাকে বলে? বাণিজ্যচক্রজনিত, ঋতুগত ও ছদ্ম-বেকারত্বের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৬। নিম্নের বিষয়গুলি হইতে যে-কোন দুইটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:

(ক) নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ; (খ) বিনিয়োগ গুণক; (গ) উৎপাদন ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি; (ঘ) মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা।

'খ' বিভাগ: পূর্ণমান—৪০

৭। স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। এই প্রতিবন্ধকগুলি কতটা দূর করা সম্ভব? ১৪+৬

৮। আয়তনজনিত ব্যয় সংক্ষেপ কাহাদের বলে? কিভাবে উহাদের শ্রেণীবিভাগ করা যায়? দৃষ্টান্তসহ উত্তর দাও। ১০+৬+৪

৯। জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক জটিল কেন বুঝাইয়া দাও। ২০

১০। রস্টো উপস্থাপিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের 'স্তর' তত্ত্বের পর্যালোচনা কর। ২০

ECONOMIC THEORY B. Com. (Pass)

যে-কোন ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখ।

১। (ক) চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংজ্ঞা লিখ।

(খ) চাহিদার দামগত-স্থিতিস্থাপকতা কোন্ কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করে?

২। স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ কর। সকল ব্যয়ই পরিণামে পরিবর্তনশীল—এই বক্তব্যকে তুমি কি সমর্থন কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

৩। নিরপেক্ষরেখার সাহায্যে (ক) আয় প্রভাব, (খ) পরিবর্তন-প্রভাব বর্ণনা কর।

৪। একচেটিয়া কারবারী (ক) ক্রমবর্ধমান ব্যয় থাকিলে এবং (খ) ক্রমহ্রাসমান ব্যয় থাকিলে কিভাবে তাহার উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করে—তাহা বিশ্লেষণ কর।

৫। মজুরীর প্রান্তিক উৎপাদিকা মতবাদ আলোচনা কর।

৬। আভ্যন্তরীণ (সরকারী) ঋণের ভার আছে কি? সমুচিত যুক্তিসহ বিচার কর। জাতীয় ঋণ কাহাকে বলে?

৭। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ঋণ নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহা বর্ণনা কর।

৮। সংরক্ষণ নীতির সপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তিসমূহ পর্যালোচনা কর।

৯। সঞ্চয় এবং লগ্নী বলিতে কি বোঝ? এই প্রসঙ্গে কেইন্সীয় নিয়োগ ও আয়-নীতিটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

১০। যে-কোন দুইটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ:

(ক) মুদ্রামান হ্রাস, (খ) অদৃশ্য আমদানি ও অদৃশ্য রপ্তানি, (গ) ঘাটতি ব্যয় এবং (ঘ) মিশ্র অর্থব্যবস্থা।

CALCUTTA UNIVERSITY

ECONOMIC PRINCIPLES AND PLANNING—PASS

Seventh Paper

Group A

প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পূর্ণমান নির্দেশক

১। যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :—

(ক) 'সুযোগ খরচ' কাকে বলে ?

(খ) যে-কোনো দেশের মূল অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মধ্যে যে-কোনো চারিটি সমস্যা উল্লেখ কর।

(গ) 'আয় প্রভাব' কাকে বলে ?

(ঘ) ক্রেতারা একই দামে যদি আগের চাইতে বেশি পরিমাণে কিনতে চায়, তাহলে সে ঘটনাকে তুমি কি চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন বলে গণ্য করবে, না চাহিদার অবস্থার পরিবর্তন বলে গণ্য করবে ?

(ঙ) 'উৎপাদন অপেক্ষক' কাকে বলে ?

(চ) 'স্বল্পকালীন সময়' কাকে বলে ?

(ছ) টাকার দাম বা অর্থের মূল্য বলতে কি বোঝায় ?

(জ) মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় যে-কোনো দুটি পদ্ধতি উল্লেখ কর।

(ঝ) 'ঘাটতি ব্যয়' কাকে বলে ?

(ঞ) 'দৃশ্য আমদানি-রপ্তানি' এবং 'অদৃশ্য আমদানি-রপ্তানি'—এই কথা দুটির দ্বারা কি বোঝায় ?

(ট) 'অর্থনৈতিক পরিকল্পনা' কাকে বলে ?

(ঠ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্যের চারিটি প্রধান শর্তের উল্লেখ কর।

(ড) উৎপাদনের 'পুঁজি-নিবিড়' বা 'পুঁজি-প্রগাঢ়' কৌশল বলতে কি বোঝায় ?

(ঢ) ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।

(ণ) ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় যে যে বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে চারিটির উল্লেখ কর।

Group B

প্রশ্নগুলির মান সমমূল্যের

যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও

২। স্থিতিস্থাপকতা সাধারণত কত প্রকারের দেখা যায় ? চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ও চাহিদার নিয়মের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।

৩। বাজারে নির্দিষ্ট দামে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মোট ব্যয়ের দ্বারা, একসঙ্গে দুটি ভিন্ন ভিন্ন পণ্য কোন্ কোন্ পরিমাণে কিনলে একজন ক্রেতা সর্বাধিক তৃপ্তি বা উপযোগ লাভ করতে পারে তা ব্যাখ্যা কর।

৪। নিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদক সংস্থার ভারসাম্য লাভের একটি শর্ত হল, বাজার দাম তার প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান হওয়া চাই। কিন্তু বাজার দাম তার প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান হলেও,—(ক) তার গড় পরিবর্তনীয় খরচ যদি তখন তার প্রান্তিক উৎপাদন খরচের বেশি থাকে, কিংবা (খ) তার গড় উৎপাদন খরচ যদি তখন তার প্রান্তিক উৎপাদন খরচের বেশি থাকে—তাহলে, ওই দুটি অবস্থায় সে ভারসাম্য লাভ করতে পারে কি? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দেখাও।

৫। একচেটিয়া কারবারী কিভাবে তার ভারসাম্য লাভ করে তা ব্যাখ্যা কর।

৬। 'স্বাভাবিক মুনাফা' কাকে বলে? পূর্ণ প্রতিযোগিতার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক মুনাফা থাকে কি? তোমার উত্তরের যুক্তি দাও।

৭। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে? ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্তনের দ্বারা ঋণ-নিয়ন্ত্রণ করা যায় কি?

৮। লেনদেন ব্যালেন্স ও বাণিজ্য ব্যালেন্সের পার্থক্য কি? লেনদেন ব্যালেন্সের ঘাটতি কিভাবে দূর করা যায় আলোচনা কর।

৯। মুদ্রাস্ফীতি বলতে কি বোঝায়? মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে?

১০। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি কি কি? এই উদ্দেশ্যগুলি কতটা পরিমাণে পূর্ণ হয়েছে বলে তুমি মনে কর?

১১। সপ্তম পরিকল্পনার রূপরেখা বর্ণনা কর।

১২। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সামাজিক মানসিক উপাদানগুলির গুরুত্ব আলোচনা কর।

ECONOMICS—B. A. (PASS)

First Paper

Group A

১। যে-কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ—

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি?

(খ) নিম্নোক্ত উক্তিগুলি ঠিক না ভুল?

(অ) জমির যোগান সম্পূর্ণ অপরিবর্তনশীল।

(আ) ক্রমহ্রাসমান উৎপন্নের বিধিসকল উপাদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

(গ) চাহিদার আয়-স্থিতিস্থাপকতা ঋণাত্মক হইলে উহার তাৎপর্য কি?

(ঘ) মনে কর কোন উৎপাদকের গড় বিক্রয়লব্ধ অর্থ (average revenue) রেখা একটি অনুভূমিক সরলরেখা। এই অবস্থায় উহার মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থরেখা আঁকিয়া দেখাও।

(ঙ) (অ) মনে কর প্রতি কিলোগ্রাম চিনির দাম ৫ টাকা হইতে কমিয়া ৪ টাকা

হওয়ায় চিনির চাহিদা ১০০০ কুইন্টাল হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০০ কুইন্টাল হইল। ইহা কি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার না চাহিদার পরিবর্তনের উদাহরণ ?

(অ) মনে কর চিনির দাম অপরিবর্তিত আছে, কিন্তু চিনির চাহিদা ১০০০ কুইন্টাল হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৫০০ কুইন্টাল হইল। ইহা কি চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার না চাহিদার পরিবর্তনের উদাহরণ ?

(চ) প্রতিযোগিতা পূর্ণাংগ হইলে দীর্ঘকালীন সময়ে দ্রব্যের দাম উৎপাদন-ব্যয়ের বেশী বা কম হইতে পারে না। কেন ?

(ছ) অপূর্ণাংগ খাজনা কাহাকে বলে ?

(জ) অবাধ দ্রব্য ও অর্থনৈতিক দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(ঝ) (অ) উৎপাদনের উপকরণগুলিকে সচরাচর কি কি তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় ?

(আ) কখনও কখনও উপকরণগুলিকে চারিটি ভাগে ভাগ করা হয়। ওই চতুর্থ ভাগটির কি নাম দেওয়া হয় ?

(ঞ) দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিকট ভবিষ্যতে নিম্নগামী হইবে জনসাধারণের মনে এই ধারণা হইলে টাকার প্রচলন গতি কিরূপে প্রভাবিত হইবে ?

(ট) যদি জাতীয় আয় আরও সমতার ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তবে সমাজের সম্মিলিত সঞ্চয়ের উপর তাহার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে ?

(ঠ) বাণিজ্য-সর্তের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

(ড) আয়ের চক্রাকার প্রবাহ বলিতে কি বুঝায় ?

(ঢ) অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য বলিতে কি বুঝায় ?

(ণ) শিল্প-প্রতিষ্ঠানের গড় স্থির ব্যয়রেখা কিরূপ অঙ্কন করিয়া দেখাও।

Group B

যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

২। কোন্ কোন্ কারণে যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় সংগঠনের অন্যান্য রূপের উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে কর ?

৩। উৎপাদনের মোট, গড় এবং প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা U-আকৃতির হয় কেন ?

৪। ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক যে-কোনো অর্থব্যবস্থায় মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও।

৫। কোন দ্রব্যের মোট যোগান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাও। উল্লম্ব যোগান রেখার অর্থ কি ?

৬। কখন একচেটিয়া কারবারী তাহার দ্রব্যের জন্য পৃথক পৃথক দাম ধার্য করিতে পারে ? দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হইলে একচেটিয়া কারবারীর মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বাড়িবে কি ?

৭। কোন উপকরণের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপাদন ও প্রান্তিক আয়-উৎপাদন কাহাকে বলে ? পণ্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে যে প্রান্তিক আয়-উৎপাদন হইবে,

তাহার সহিত বাজারে উৎপাদনকারীর একচেটিয়া অধিকার থাকিলে প্রান্তিক আয়-উৎপাদনের কি পার্থক্য হইবে ?

৮। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ কিভাবে অর্থ সৃষ্টি করিতে পারে তাহা দেখাও। উহাদের এই ক্ষমতা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

৯। 'গুণক' কাহাকে বলে ? গুণকের সহিত প্রান্তিক ভোগ্যপ্রবণতার সম্পর্ক দেখাও।

১০। কোন্ অবস্থায় শ্রমিকসংঘ নির্দিষ্ট শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ও নিয়োগ উভয়ের পরিমাণই বাড়াইতে সমর্থ হয় ব্যাখ্যা করিয়া বল।

১১। অনিয়ন্ত্রিত বাজারে দুইটি বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পরস্পর বিনিময়ের হার কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহা বুঝাইয়া দাও।

NORTH BENGAL UNIVERSITY

ECONOMICS (Pass)

First Paper

১। (ক) চাহিদা রেখার স্থানান্তর এবং চাহিদা রেখা অবলম্বন করিয়া চাহিদা পরিবর্তনের পার্থক্য নির্ণয় কর।

(খ) একটি পরিবর্ত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাইলে কোন একটি পণ্যের ভারসাম্য (equilibrium) দাম ও ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ কিভাবে পরিবর্তিত হয় ?

(গ) চিনির দাম বৃদ্ধি পাইলে এবং কমিলে "চা"-এর চাহিদা রেখা কিভাবে পরিবর্তিত হয় ? ৬+৬+৬

২। (ক) কোন পণ্যের নিজ মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হইলে দেখাও যে উহার দাম পরিবর্তনে ফলে দ্রব্যের উপর ব্যয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

(খ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখাইবার রেখা অঙ্কন কর :

(১) চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা শূন্য এবং (২) চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা অসীম।

(গ) চাহিদা রেখাটি একটি নিম্নগামী সরলরেখা হইলে উহার মধ্য-বিন্দুতে চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতার মান কত ? উক্ত চাহিদা রেখার যে অংশে চাহিদা স্থিতিস্থাপক এবং যে অংশে অস্থিতিস্থাপক তাহা দেখাও। ৬+৬+৬

৩। (ক) X দ্রব্যের সহিত Y দ্রব্যের প্রান্তিক বিনিময় হারের (Marginal Rate of substitution) অর্থ কি ?

(খ) উহা দ্রব্য দুটির দামের সহিত ভারসাম্য অবস্থায় কিভাবে সম্পর্ক যুক্ত ?

(গ) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য দুইটি দ্রব্যের মধ্যে নিরপেক্ষ (সম-উপযোগ) রেখাগুলি অঙ্কন কর :—

(১) অপরিবর্তিত প্রান্তিক বিনিময় হার।

(২) বর্ধমান প্রান্তিক বিনিময় হার।

(৩) হ্রাসমান প্রান্তিক বিনিময় হার। ৬+৬+৬

৪। (ক) প্রকৃত ব্যয় (Real cost) ও সুযোগ ব্যয়ের (Opportunity cost) পার্থক্য নির্ণয় কর।

(খ) কোন উপাদানের সুযোগ ব্যয় শূন্য হইলে উহার আয়ের মধ্যে খাজনার (Rent) পরিমাণ কত হইবে?

(গ) জমির সকল অংশ সমান উর্বর হইলে খাজনার উৎপত্তি ঘটে কি? তোমার উত্তর ব্যাখ্যা কর। ৬+৬+৬

৫। (ক) স্বল্পকালীন গড় ব্যয় (short-run average cost) স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় (short-run marginal cost)-এর পরিবর্তনশীল গড় ব্যয়ের (Average variable cost) সংজ্ঞা দাও।

(খ) গড় স্থির ব্যয় (average fixed cost) রেখার আকৃতি কিরূপ হইবে? একটি চিত্র অঙ্কন কর।

(গ) মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (Total variable cost) রেখার আকৃতি কিরূপ হইবে? একটি চিত্র অঙ্কন কর। ৬+৬+৬

৬। একচেটিয়া কারবার (Monopoly) এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দামের সহিত প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ১৮

৭। (ক) অর্থনীতিতে মুনাফা কাহাকে বলে?

(খ) মুনাফা ও খাজনার পার্থক্য নির্ণয় কর। ৯+৯

৮। ক্লাসিকালতত্ত্বে সঞ্চয় (savings) ও বিনিয়োগ (investment) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে সুদের হার নির্ধারিত হয় ব্যাখ্যা কর।

৯। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের 'Break-even point' এবং 'Shut-down point' (উৎপাদন বন্ধ রাখার বিন্দু) চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর।

১০। একচেটিয়া কারবারে কিভাবে ভারসাম্য দাম ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারিত হয় চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ১৮

ECONOMICS (Pass)

Second Paper

১। (ক) কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের "মূল্য সংযোজন" কাহাকে বলে? একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা কর।

(খ) উৎপাদন ব্যয়ভিত্তিক মোট জাতীয় উৎপাদন এবং বাজার মূল্য ভিত্তিক মোট জাতীয় উৎপাদনের পার্থক্য নির্ণয় কর।

(গ) মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে কিভাবে নীট জাতীয় উৎপাদনের হিসাব করিবে? ৮+৫+৫

২। (ক) টাকার প্রচলন বেগ কাহাকে বলে?

(খ) পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যস্তরের উপর কি প্রভাব ঘটিবে? (গ) দেশে অপূর্ণ নিয়োগাবস্থা থাকিলে (ঘ) প্রশ্নের উত্তর কিভাবে পরিবর্তিত হইবে? ৬+৬+৬

৩। (ক) চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মূল্যস্ফীতি ও ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মূল্যস্ফীতির পার্থক্য নির্ণয় কর।

(খ) চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মূল্যস্ফীতির কারণ কি? ৯+৯

৪। (ক) দেখাও যে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার যোগফল সর্বদা এককের সমান।

(খ) কেইনসীয় আয় নির্ধারণ তত্ত্বে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা শূন্য এবং এককের মধ্যে থাকে, এই মনে করার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ৬+১২

৫। (ক) সঞ্চয় ও মজুতের পার্থক্য নির্ণয় কর।

(খ) কোন সম্পদের তারল্যের অর্থ কি?

(গ) টাকার ফাটকা জনিত চাহিদার সহিত সুদের হারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৬+৪+৮

৬। নিম্নলিখিত কর ব্যবস্থাগুলিকে প্রগতিশীল অথবা সমানুপাতিক হিসাবে চিহ্নিত কর—

(ক) (১) সর্বস্তরের আয়ের উপর শতকরা দশভাগ কর ধার্য আছে।

(২) আয়ের প্রথম দশ হাজার টাকা ছাড় দিয়া অবশিষ্ট অংশের উপর দশভাগ হারে আয়কর ধার্য আছে।

(৩) চিনির উপর পাঁচ শতাংশ অন্তঃশুল্ক ধার্য আছে।

(খ) প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর। ৬+১২

৭। (ক) বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবের চলতি খাত ও মূলধন খাতের উভয় দিকের যে বিষয়গুলি প্রদর্শিত হয় তাহা উল্লেখ কর।

(খ) বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে ঘাটতি দেখা দিলে দেশ কিভাবে তাহার মোকাবিলা করে?

(গ) ঘাটতি দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকিলে দেশ কি সমস্যার সম্মুখীন হয়? ৬+৬+৬

৮। বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ। ১৮

৯। টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সুদের হার ও আয়ের উপর ভারসাম্য অবস্থায় যে প্রভাব ঘটে তাহা বিশ্লেষণ কর। ১৮

১০। (ক) খোলা-বাজারী কারবারের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর।

(খ) ইহার মাধ্যমে দেশের ঋণের পরিমাণ সর্বদা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব কি? বিশদভাবে লেখ। ৯+৯

BUSINESS ECONOMICS (Pass)

ক-বিভাগ

১। (ক) বাণিজ্যিক অর্থনীতির বিষয়বস্তুর আলোচনার পরিধি কতটুকু? আলোচনা কর।

(খ) কখন প্রকৃতির দান অর্থনৈতিক সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা কর।

২। (ক) স্থিরব্যয় ও পরিবর্তশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। (খ) প্রান্তিকব্যয় কি? (গ) প্রান্তিকব্যয় শুধুমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয়কে অন্তর্ভুক্ত করে কেন? (ঘ) দেখাও যে স্বল্পকালীন সময়ে গড়ব্যয় রেখা ইংরাজী 'U' অক্ষর আকৃতির হইবে।

৩। (ক) "মজুরীর প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা" এই তত্ত্বটির সমালোচনা সহ ব্যাখ্যা কর। (খ) কশাইদের উপার্জন অপেক্ষা কুশলী শল্য চিকিৎসকদের উপার্জন বেশি হয় কেন?

৪। (ক) মূল্যানুগ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা, আয়ানুগ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং চাহিদার ক্রমস্থিতিস্থাপকতার অর্থ ব্যাখ্যা কর। (খ) 'চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা' ধারণাটির বাস্তব তাৎপর্য কি? (গ) চাহিদা রেখার কোন একটি বিন্দুতে তুমি স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ কিভাবে করিবে?

৫। (ক) পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় স্বল্পকালীন অবস্থায় একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান লোকসান সত্ত্বেও উৎপাদন চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত করে কেন?

(খ) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার পার্থক্যগুলি কি কি?

খ-বিভাগ

৬। (ক) 'চলতি খাতের সমতা' কাহাকে বলে? 'লেনদেনের সমতার' সহিত ইহার পার্থক্য কি?

(খ) বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের হার কিরূপে নির্ধারিত হয়?

৭। ঘাটতি ব্যয় কাহাকে বলে? উহা কি সবসময় মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা সৃষ্টি করে? সংক্ষেপে বিবৃত কর।

৮। (ক) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা কি ঋণ সৃষ্টি করিতে পারে? (খ) এই ঋণ সৃষ্টির সীমাবদ্ধতা কি?

৯। (ক) প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা কাহাকে বলে? (খ) 'গুণক' বলিতে কি বুঝ? উদাহরণ দাও। (গ) প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ০'৫ এবং ০'৮ হইলে গুণকের মান কত হইবে?

১০। টিপ্পনি লিখ (যেকোন দুইটি):

(ক) ত্বরণ বা গতিবিধির নীতি; (খ) কাঠামোগত বেকারত্ব; (গ) কর স্থাপনের নিয়মাবলী; (ঘ) বাণিজ্যশর্ত।